Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৮ ভাগ।
১ম সংখ্যা।

১লা মাঘ, শনিবার, ১৩৩৯ সাল, ১৮৫৪ শক, ১০৪ ব্রাহ্মাব্দ।
14th January, 1933.

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

মা নববিধান-বিধায়িনী, নিত্য নব নব উৎসবদায়িনী তুমি। মৃত্যুর পর মৃত্যুর উৎসব সাধন করাইয়া, তুমি আমাদিগের পুরাতন জীবনের অস্তিত্ব হরণ করিলে। আবার ব্রহ্মানন্দ, ব্রহ্মনন্দন ও ব্রহ্মনন্দিনীর জন্মোৎসবের সম্ভোগদানে, নববিধানের নবজন্মলাভের আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপন করিলে। ধন্য তুমি, কেননা পুরাতন জীবন না গেলে, আমরা ত নবজন্ম লাভ করিতে পারি না ; আবার তাহা লাভ না করিলে আমরা কেমন করিয়া, নববর্ষাগমে নববিধানের মহামহোৎসবের দ্বারে প্রবেশের অধিকার পাইব ? নববিধান নবজীবনের বিধান, নবজীবন বিনা প্রকৃত নববিধানের নব মহোৎসব সম্ভোগ হয় না। তাই নববর্ষাগমে প্রতিদিন এক এক নূতন উৎসব, নূতন সাধনা দিয়া, নব মহামহোৎসবের জন্য প্রস্তুতির ব্যবস্থা করিয়াছ। নববর্ষ দিনে নবদেবালয়ে প্রবেশের উৎসব, রাজর্ষি ও মহর্ষির স্মরণে, নববিধানাচার্য্য ও প্রেরিতগণ সঙ্গে, নববিধানের প্রতি, মাতৃভূমির প্রতি, গৃহের প্রতি, শিশুগণের প্রতি, দাসদাসীর প্রতি, দীনজনের প্রতি শ্রদ্ধাদানান্তে, আচার্য্যদেবের তিরোধান দিনে তীর্থসমাগম সাধন করাইয়া ধন্য করিলে। তাহার পর মহাজনসমাগম, জনহিতৈষিসমাগম, মিত্রসমাগম, বিরোধিসমাগম, আত্মানুগমন এবং চিত্তশুদ্ধি-সাধন এক একটি বিশেষ উৎসবরূপে সাধন করাইয়া, আমাদিগকে যেন হাতে ধরিয়া সাধনমার্গে উত্তোলন করিতে করিতে মহামহোৎসবের মহাবক্ষে লইয়া আসিলে। আমরা নিতান্ত দীনহীন কৃপাপাত্র বলিয়াই, তুমি এবার আমাদের জীবনের ভার যেমন লইয়াছ, তেমনি আমাদের ধর্ম্মসাধন, উৎসবসাধনের ভারও স্বয়ং লইয়াছ। আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা তোমার এই অলৌকিক বিধানের অলৌকিক কৃপার উপযুক্ত হইতে পারি। তোমার বিশ্বমানব নবভক্ত সঙ্গে এবং সমগ্র মণ্ডলী, দেশ, জাতি ও জগজ্জন সঙ্গে, [illegible] যোগে তোমার উজ্জ্বল প্রেমমুখ দেখিতে দেখিতে [illegible]মহোৎসব-সম্ভোগে কৃতার্থ হই। তব ভক্তবৃন্দ [illegible] সঙ্গে তুমি আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

মহামহোৎসবের মহা আহ্বানধ্বনি।

"ডেকেছেন প্রিয়তম কে রহিবে ঘরে, ডাকিতে এসেছি তাই চল ত্বরা করে'।" সেই প্রিয়তম প্রাণেশ্বর যিনি, তিনি নিত্যই আমাদিগকে তাঁর স্বর্গের আনন্দোৎ-

সব দিবার জন্য বারবার ডাকিতেছেন। ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা সেই ডাক শুনিয়া, তাঁহারই আকর্ষণে সংসারের অসার কাজকর্ম্ম ফেলিয়া, ব্যাকুল অন্তরে তাঁহার সমীপে আগমন করেন ও তাঁহার আশীর্ব্বাদপ্রসাদরূপ উৎসবানন্দ-লাভে কৃতার্থ হন।

অমরলোকবাসী অমরাত্মাগণ তাঁহারই ডাক শুনিয়া বিহ্বল হইয়া, এই পার্থিব দেহত্যাগ করিয়া, দৈহিক জীবনের যাবতীয় মোহমায়ার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া, সেই পরম প্রিয়তম পিতামাতার নিত্য সঙ্গসহবাসরূপ মহামহোৎসবসম্ভোগে চিরমগ্ন হইয়া আছেন। তাঁহারা আর ইহলোকের দুঃখ যন্ত্রণা, রোগ শোক ভোগ করিতে ফিরিয়া আসিবেন না। কিন্তু দেহপুরবাসী আমরা, আমাদের ভাগ্যে সে নিত্য উৎসবসম্ভোগের সৌভাগ্য ত হয় না। তাই, আমরা যাহাতে সশরীরে থাকিয়া, সেই স্বর্গবাসী অমরাত্মাদের সম্ভোগ্য উৎসব ব্রহ্মকৃপায় সময়ে সময়ে সম্ভোগ করিতে পারি, তাহারই জন্য আমাদের সন্তানবৎসলা মা আমাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া, তাঁহার স্বর্গস্থ ভক্তবৃন্দ ও অদেহী সন্তান সন্ততি-দিগের সঙ্গে মিলাইয়া, উৎসবানন্দদানে ধন্য করেন।

নববর্ষাগমে আবার আমাদিগকে মা মহামহোৎসবে ডাকিতেছেন। এস, আমরাও তাঁহারই সুরে সুর মিলাইয়া, তাঁহার ভক্ত সঙ্গে এক হইয়া সকলকে ডাকিয়া বলি, এস ভাই ভগ্নী, এস দেশবাসী জগদ্বাসী, এস রাজা প্রজা, দুঃখী ধনী, জ্ঞানী মূর্খ, রোগী ভোগী, শোকে তাপে তাপিত, পাপভারে ভারাক্রান্ত যে যেখানে আছ, এস। এস হিন্দু, এস মুসলমান, এস বৌদ্ধ, এস খ্রীষ্টান, এস শিখ, এস ইহুদী, এস শাক্ত, এস বৈষ্ণব, এস পার্সী, এস জৈন, এস শৈব, এস যে যে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমতা[illegible] আছ, সকলে এই সার্ব্বজনীন সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় নববিধানের মহামহোৎসবে আগমন কর। এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকাবাসী সকলে এস, সকল প্রকার আপন আপন বৈশিষ্ট্য লইয়া আমাদের আনন্দ ময়ী মার আনন্দোৎসবে শুভাগমন কর। সকলকার সহিত সমতানে গাই, "সাড়া পেয়ে ছুটে আসিলাম নিকটে, তেমনি করে একবার দাঁড়াও না।" তিনি নিশ্চয়ই সকলকে তাঁহার জীবন্ত দর্শনদানে এবং মহামহোৎসবের মহা আনন্দদানে কৃতার্থ করিবেন।

—•—

সার্ব্বজনীন নববিধান।

নববিধান নবযুগধর্ম্ম-বিধান, সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়বিধান। নববিধান সার্ব্বজনীন বিধান, ইহা অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম-বিধান। সকল ধর্ম্ম, সকল শাস্ত্র, সকল সাধুভক্ত, সকল সাধনপ্রণালী, সকল যোগ ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞান জপ তপ এবং সকল সম্প্রদায়, সকল জাতি, সকল দেশবাসী নরনারীকে এক করিবার জন্য, স্বয়ং বিশ্ববিধাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত। ইহা কোন মানুষের বুদ্ধি-নিষ্পন্ন ধর্ম্ম নয়, কিম্বা মানুষের মধ্যবর্ত্তিতা ইহাতে নাই।

এই বিধানের উপাস্য একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম, যিনি সত্তারূপে সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বক্ষণ সবার অন্তরে বাহিরে বিদ্যমান রহিয়াছেন, তিনি প্রত্যক্ষভাবে সর্ব্ব-জনকে দর্শন দিবার জন্য কাছে কাছেই আছেন; সকলকে জ্ঞান চৈতন্য দিবার জন্য গুরু হইয়া বিবেকবাণী শুনাই-তেছেন এবং প্রত্যেক শুভকার্য্যের পরিচালক হইয়া প্রত্যাদেশ দিতেছেন। তিনি মানবকে চির উন্নতির পথে সমুন্নত করিবার জন্য অনন্ত শক্তি ধারণ করিয়া রহিয়া-ছেন এবং প্রতিনিয়ত আমাদের ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা, জড়ত্ব ভাঙ্গিয়া ও আমিত্বসূচক অহং নির্ব্বাণ করিয়া, তাঁহারই মহিমা দেখাইয়া, আমাদিগকে অনন্তের দিকে আকৃষ্ট করিতেছেন। তিনি নিত্য ক্রিয়াশীল এবং স্বীয় প্রেমে উচ্ছ্বসিত হইয়া, অনন্ত পিতৃমাতৃস্নেহে আমাদের লালন পালন, রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন ও আমাদের সর্ব্বস্ব হইয়া আছেন। মা যেমন রুগ্ন শিশুর সকল দোষ ত্রুটী উপেক্ষা করিয়া, কেবলই তাহার সেবা শুশ্রূষা করেন, তেমনি আমাদের সহস্র পাপ অপরাধ, আমাদের অপূর্ণতা ও পাপ-প্রবণতা রূপ রোগের ফল জানিয়া, তিনি আমাদের জীবনের সকল ভার লইয়া রহিয়াছেন। তিনি নিজ পুণ্যবলে আমা-দের ইচ্ছাকৃত পাপের ন্যায়দণ্ড বিধান করিয়া, শুদ্ধ ও সং-শোধিত করিবার জন্য ব্যস্ত এবং সকল পাপ হইতে মুক্ত করিয়া আমাদিগকে নিত্য আনন্দ, নিত্য শান্তি দিবার জন্যই জীবন্ত ব্যক্তিরূপে আনন্দময়ী মা হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন।

নববিধানের এই উপাস্য যিনি, তাঁহাকে যে যে নামে, যে যে ভাবে ডাকি না কেন, তিনি সকল নামেই অভিহিত হন। তাই নববিধানে ব্রহ্ম, গড্, খোদা, আল্লা, জিহোভা, পুরুষোত্তম, হরি, মা সকলই সেই একই

পরম দেবতা। তিনি নিরাকার, তাঁহার কোন বাহ্য আকার নাই, তিনি কোন প্রকার জড়মূর্ত্তিও ধারণ করেন না। তিনি কোন প্রকার জ্যোতিঃ বা বিভূতিতেও দেখা দেন না। তাঁহার দর্শন শ্রবণ আধ্যাত্মিক; তবে বাহ্য নিদর্শনে তিনি তাঁহার প্রেমের ও কৃপার পরিচয় আমাদিগকে দেন।

এই জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসনা ও প্রার্থনাই নববিধান-সাধনের সর্ব্বোচ্চ উপায়; কিন্তু এ উপাসনা প্রার্থনা কেবল মুখের কথা বা ভাবের উচ্ছ্বাস নয়, ইহা প্রত্যক্ষ ঈশ্বরের প্রেরণায় করিতে হয়।

নববিধান সকল ধর্ম্মের সকল সাধনের সম্মান করেন। যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান, জপ, তপ, বৈরাগ্য, আত্মনিগ্রহ, ধ্যান, চিন্তা, পাঠ, প্রসঙ্গ, প্রচার, সেবা, শিক্ষা, সকলই ইঁহার আচরণীয়; তবে কোন প্রকার অস্বাভাবিক কৃচ্ছ্রসাধ্য সাধনাকে ইনি প্রশ্রয় দেন না। ঈশ্বরের নীতি, বিধি, নিয়মাদি অনুসরণে সংযমাদি সাধন ব্যক্তিগত অধ্যাত্ম উন্নতির জন্য অবলম্বন করা যাইতে পারে; কিন্তু সকল সাধনই প্রত্যক্ষ ঈশ্বর-নির্দ্দেশেই অবলম্বনীয়।

নববিধান ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞানকে এক করিতে অবতীর্ণ; সুতরাং বিজ্ঞানের বিধি অতিক্রম করা নববিধানের অনুমোদিত নয়। ধর্ম্মবিজ্ঞান যেমন, মনোবিজ্ঞান, বস্তুবিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাজ্যবিজ্ঞান, সকলই নববিধানের অন্তর্ভুক্ত; সকল বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য ও একত্ব সম্পাদনের জন্য নববিধানবিজ্ঞান রচিত।

বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ, ললিতবিস্তর, গ্রন্থ, আবেস্তা প্রভৃতি সর্ব্বধর্ম্মশাস্ত্রই নববিধানে আদৃত ও অনুসৃত; ইহার ভিতর যাহা সত্য, যাহা ঈশ্বরোক্ত, তাহার সমন্বয়সাধনে নববিধান মীমাংসাশাস্ত্ররূপে বিধাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত। বেদ বেদান্তে ঈশ্বরের জ্ঞান ও যোগ, আবেস্তা ও পুরাণে তাঁর প্রেমলীলা ও মহিমা, কোরাণে ও বাইবেলে তাঁহার নীতি ও বিধি, ললিতবিস্তরে প্রজ্ঞানীতি বিশেষভাবে শিক্ষণীয়। সকল শাস্ত্রকেই গ্রহণ করিতে হইবে, কাহাকেও উপেক্ষা করিলে চলিবে না, ইহাই নববিধানের শিক্ষা।

নববিধান সাধু ভক্তগণকে ব্রহ্মনন্দন, ব্রহ্ম প্রেরিত, মানবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারূপে গ্রহণ ও সম্মান দান করেন। তাঁহারা ব্রহ্মচরিত্রের এক এক ভাব ও আদর্শ প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত। মুষা বিশ্বাস ও বিবেকের, ঋষিগণ ও সক্রেটিস আত্মজ্ঞানের, বুদ্ধ বাসনা-নির্ব্বাণ ও বৈরাগ্যের, গৌরাঙ্গ প্রেমোন্মত্ততার, মহোম্মদ একেশ্বর-বিশ্বাসের, ঈশা আত্মইচ্ছাশক্তি-বিনাশের ও শুদ্ধতার শিক্ষাদাতা। ইঁহাদের সকলকার মিলনে নববিধানের মূর্ত্তিমান ব্রহ্মানন্দ। সর্ব্বভক্তগণের সহিত যোগ, সমাগম ও তীর্থসাধন নববিধানের বিশেষ সাধন।

নববিধান রাজা প্রজা, দুঃখী ধনী, জ্ঞানী মূর্খ, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক, নর নারী সকল মানবকে এক অখণ্ড মানবদেহের অঙ্গরূপে সম্মান করেন এবং পরস্পরের মধ্যে ভেদাভেদ মহাপাপ মনে করেন।

নববিধান হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, আর্য্য, ব্রাহ্ম, ইহুদী, পার্শী, শাক্ত, বৈষ্ণব সকলকেই একই মার সন্তান, অতএব পরস্পর ভাই ভাই বলিয়া বিশ্বাস করিয়া, সকলকেই সমাদর করেন এবং সকলকে নববিধানের অন্তর্গত বলিয়া গ্রহণ করেন।

নববিধান-মতে আসিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা একই ভূখণ্ডে যেমন গ্রথিত, তেমনি এই সকল দেশবাসী নরনারীও এক অখণ্ড পরিবারভুক্ত। সুতরাং সমগ্র জগতে এক প্রেমপরিবার, এক অখণ্ড ধর্ম্মমণ্ডলী, এক স্বর্গরাজ্য বা স্বরাজ স্থাপনের জন্যই নববিধান অবতীর্ণ। মানবে মানবে, ধর্ম্মে ধর্ম্মে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে যে অসদ্ভাব, অপ্রীতি ও অশান্তি রহিয়াছে, তাহা উচ্ছেদ করিয়া, প্রীতি, সদ্ভাব ও শান্তি সংস্থাপন করাই নববিধানের উদ্দেশ্য।

আর্য্য হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী, খ্রীষ্টীয়, বৈষ্ণব, শিখবিধান, যুগে যুগে মানবের পাপ হইতে পরিত্রাণ, শান্তি ও স্বর্গলাভের জন্য যিনি প্রেরণ করিয়াছেন, [illegible] যুগে সর্ব্বধর্ম্মবিধান মিলাইয়া, এই নববিধান সকল জাতির পরিত্রাণ ও শান্তিলাভের জন্য লইয়া, তিনিই স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন। নববর্ষে যেমন নব পঞ্জিকা, নবযুগেও তেমনি নববিধান।

যিনি ধর্ম্মপিতামহ রাজর্ষি রামমোহন রায়ের প্রাণে ব্রহ্মজ্ঞান সঞ্চার করিয়া, এই নববিধানেরই বীজ বপন করেন, তিনিই ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দিয়া এই নবযুগধর্ম্মকে ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে অভিহিত করিয়া, ইহার সাধনপ্রণালী নির্দ্ধারণ ও মণ্ডলী গঠন করেন এবং তিনিই মাতৃরূপে প্রকট হইয়া নববিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ

কেশবচন্দ্র সেনকে দিয়া জীবনে তাহা সাধন করাইলা, তাঁহাকে নববিধানমূর্ত্তিমান নবশিশু করিয়াছেন। আমরাও যেন সেই ব্রহ্মকৃপাগুণে ব্রহ্মানন্দের সহিত একাত্মা হইয়া, পরস্পরকে ভাই ভাই, ভগ্নী ভগ্নীরূপে গ্রহণ করিয়া, নববিধানমূর্ত্তিমান নবশিশুদল হইয়া, নব জীবন প্রাপ্ত হই। নববিধান-বিধায়িনী জননী আমাদিগকে ইহাই আশীর্ব্বাদ করুন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

মানুষকে ভালবাসা।

ঈশ্বরকে ভালবাসা সহজ, মানুষকে ভালবাসা কঠিন। প্রাচীন বিধানে কেহ কেহ ঈশ্বরকে অধিকতর ভালবাসিতে গিয়া সংসারকে ত্যাগ করিলেন; কিন্তু বর্ত্তমান যুগধর্ম্মবিধানে ঈশ্বরকে ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে মানুষকেও ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া ভালবাসিতে হইবে। নদীর জল যখন কম থাকে, তখন তাহা কেবল সাগরের দিকে যায়; কিন্তু বান ডাকিলে নদীর জল উচ্ছ্বসিত হইয়া পার্শ্বস্থ ভূমিকেও সিক্ত করে। তেমনি কেবল ঈশ্বরকে ভালবাসা সকলেই দিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের উচ্ছ্বসিত প্রেম হৃদয়ে না আসিলে মানুষকে ভালবাসা দেওয়া যায় না।

ভক্তের রক্তে মানুষের পরিত্রাণ।

চিকিৎসা-বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছেন, কেহ যদি রক্তহীনতা বশতঃ জীবনীশক্তিহীন হয়, অপরের রক্ত সঞ্চালন করিলে তাহার জীবনীশক্তি লাভ হইয়া থাকে। তেমনি যে ব্যক্তি পাপব্যাধিতে দুর্ব্বল, বিশুদ্ধাত্মা ভক্তের তেজোময় রক্ত তাহার অন্তরে সঞ্চার করিয়া দিলে, তাহার পাপ দুর্ব্বলতা দূর হইয়া স্বজীবন সঞ্চার হইবে। এই জন্যই ঈশা বলিলেন, "আহার সহিত আমার রক্ত মাংস আহার পান কর, তাহা দ্বারা পাপাসক্তি গিয়া পুণ্যশক্তি লাভ হইবে।" অর্থাৎ ঈশার বিশুদ্ধ ভাগবতী তনু আমাদেরও হইবে এবং তদ্দ্বারা তাঁহার নিষ্পাপ আত্মা ও মন আমাদের হইবে। ইহাই ত পরিত্রাণ। অর্থাৎ নিষ্পাপাত্মার আত্মায় আত্মস্থ হওয়াই পরিত্রাণ।

সুনীতি-স্মরণে।

(গত ১৭ই ডিসেম্বর, শনিবার, কমলকুটীরে, মহারাণী সুনীতি দেবীর স্মৃতি-তর্পণ সভায় পঠিত)

তুমি ছিলে মহারাণী, তবু ছিলে একান্ত আত্মীয়,
আপনার জন বলি' জেনেছি তোমায়;
কত না সুখের স্মৃতি, হৃদয়ের অন্তিমান প্রিয়,
তোমার অভাবে প্রাণ ভরে' বেদনায়।
ব্রহ্মানন্দকন্যারূপে তোমার প্রথম পরিচয়,
মহীয়সী রাণী বলে' জানি তার পরে;
ভক্তি-প্রীতি উচ্ছ্বসিত মুক্তধারা প্রার্থনা-নিচয়,
স্মরণে জাগিয়া র'বে চিরদিন তরে।
বহু শোক পেয়েছিলে, তীব্র দুঃখে বিদ্ধ হৃদিখানি—
নিবেদিয়া হাসি মুখে বহিয়াছ ব্যথা;
যে জেনেছে কাছে হ'তে, সেই জানে তব মর্ম্মবাণী,
সেই জানে সৌজন্য অন্তর-বারতা।
গেছ যোগ্য পুণ্য লোকে, দেখাইলে স্নেহে সমাদরে
পদ মান রাখা যায়, কি সহজে, সবারেই আপনার করে'।

প্রিয়ম্বদা দেবী।

মহারাণী সুনীতি দেবীর

স্মৃতি-তর্পণ।

(১৮ই ডিসেম্বরের, 'মহবাণী' হইতে গৃহীত)

গতকল্য ১৭ই ডিসেম্বর, শনিবার, অপরাহ্ণ ৪॥০ ঘটিকার সময়, অপার সার্কুলার রোডস্থ কমলকুটীরে, ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউসনের প্রাঙ্গণে, কুচবিহারের স্বর্গগতা মাননীয়া মহারাণী সুনীতি দেবীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাতর্পণ করার জন্য এক জনসভার অনুষ্ঠান হয়। সভায় বিরাট জনসমাগম হইয়াছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কুচবিহারের মহারাজকুমারী ইলা, আয়েষা ও মেনকা, মহারাজকুমার গৌতমনারায়ণ, কুচবিহারের রিজেন্সী কাউন্সিলের ভাইস্ প্রেসিডেন্ট লেঃ কর্ণেল ইভান্স গর্ডন, ময়ূরভঞ্জের মাননীয় মহারাজা, নসগাঁওএর রাজাসাহেব, নাটোরের মহারাজা যোগীন্দ্রনাথ, কন্সাল জেনারেল ইটালী, কন্সাল জেনারেল নেদারল্যাণ্ডস, কলিকাতার মেয়র ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, নাটোরের ভূতপূর্ব্ব মহারাণী, লেডী অবলা বসু, লেডী সরকার, শ্রীযুক্তা প্রসন্নময়ী দেবী, সরলা দেবী, হেমলতা দেবী, মিঃ ও মিসেস পি, কে, সেন, মিঃ ও মিসেস এস, সি, মহলানবিশ, মিঃ ও মিসেস এস, সি, সেন, মিসেস এস, এন, সেন, মিসেস এ, এন, চৌধুরী, মিস ম্যাকলিউড, মিঃ এন, এন, মুখোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, মিঃ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ ডি, এন, বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ ও মিসেস, এস, সি, মুখোপাধ্যায়, মিঃ ও মিসেস এস, সি, রায়, ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন বহু মহিলা ও ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউসনের ছাত্রীবৃন্দ সভায় উপস্থিত

ছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী ও সুষমা সেন একটি সময়োচিত সঙ্গীত দ্বারা সভার উদ্বোধন করেন। অতঃপর শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী স্বর্গীয়া মহারাণীর উদ্দেশ্যে একটী কবিতা পাঠ করিলে, পূজনীয় সভাপতির আহ্বানে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু নিম্নলিখিত প্রস্তাব আনয়ন করেন :—

"কলিকাতা নগরীর পৌরজন ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের প্রতিনিধিদের এই সভা মাননীয়া, জনহিতকর কার্য্যে আত্মসমর্পিতা কুচবিহারের মাননীয়া মহারাণী সুনীতি দেবীর পরলোকগমনে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে। এই সভা পরলোকগতা মহারাণীর রাজপরিবারকে তাঁহাদের অপূরণীয় ক্ষতিতে আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছে।" শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়া উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন।

ইহার পর লেডী অবলা বসু স্বর্গগতা মহারাণীর স্মৃতিরক্ষাকল্পে মহারাণীর জনহিতকর শেষ কার্য্য ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউসনের উন্নতি সম্পর্কে এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন। উক্ত প্রস্তাব মিঃ পি, কে, সেন সমর্থন করেন।

অতঃপর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সভাপতির আসন হইতে স্বর্গীয়া মহারাণীর পুত স্মৃতির উদ্দেশ্যে হৃদয়ের শ্রদ্ধা তর্পণ করেন।

রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা-তর্পণ।

"ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে হৃদয়ের সেতু অবরুদ্ধ হয় না, এই আশা মনে রেখে আজ এসেছি স্বর্গগতা সুনীতি মহারাণীর উদ্দেশে এই কথা জানাতে যে, আমাদের সম্বন্ধ ঐহিক সীমা অতিক্রম করে অক্ষুণ্ণ আছে।

"মহারাণীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ এক অংশ পৈতৃক, এক অংশ ব্যক্তিগত। কেশবচন্দ্র যখন একদিন জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তার অনতিকাল পূর্ব্বেই আমার জন্ম। সেই সময়ে মহারাণীর মাতৃদেবী আমাকে তাঁর যে ক্রোড়ে লালন করেছিলেন, সেই ক্রোড়েই তার অনেক বৎসর পরে সুনীতি দেবী মাতৃস্নেহ সম্ভোগ করেছেন।

"অবশেষে তিনি যখন স্বামিগৃহের অধীশ্বরী হলেন, তারপরে কতবার কতদিন তাঁদের আলিপুরের বাড়ীতে, কমলকুটীরে, দার্জ্জিলিঙে তাঁর আতিথ্য লাভ করেছি। সেই সকল আনন্দ-হিল্লোলিত কলহাস্যমুখর দিনগুলি তাঁর প্রসন্ন মুখের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত হয়ে আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। দুঃখের দিনেও শান্তির জন্যে, সান্ত্বনার জন্যে তিনি আমাকে স্মরণ করিতে কুণ্ঠিত হননি। আমাদের পরস্পর দেখা হবার অবকাশ সর্ব্বদা ঘটত না; কিন্তু আত্মীয়তার যোগসূত্র আমার আমার নিরবচ্ছিন্ন ছিল।

"তারপরে অকস্মাৎ তাঁর মৃত্যুর সংবাদ এসে পৌঁছিল। আমার যে বয়স, তাতে মৃত্যুকে আমার ভুল বোঝবার আশঙ্কা নেই। মৃত্যু-লোকের নিকটে এসেছি। আমার জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর ব্যবধান স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। জানি উদয়দিগন্ত ও অস্তদিগন্তের মাঝখানে বিচ্ছেদ নেই। জানি, "যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ"—অমৃত যাঁর ছায়া, মৃত্যুও যাঁর ছায়া, সেই এক পরম সত্যের মধ্যে আমাদের চিরস্থিতি। মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে শোক করবার দিন আমার নয়।

"দিনের বেলার আলোতে নিকট সংসারের সীমার মধ্যেই নিজেকে জানি। সে আলো যখন নিভে যায়, তখন নিজেকে উপলব্ধি করি অসীম নক্ষত্রপরিবেষ্টিত জগতের মধ্যে। সীমার মধ্যে যে ক্ষতি, অসীমের মধ্যে তার পূরণ। আমাদের এই সীমার সংসার থেকে যিনি গেছেন, তিনি আজ প্রকাশ থাকেন অসীমের অন্তহীন আলোকে। যা কিছু ক্ষণিক, যা কিছু ক্ষয়শীল, ধূলির পৃথিবী থেকে তা অন্তর্হিত, যা চিরন্তন ভূমার মধ্যে, তাই নিত্য হয়ে রইল, এই কথা মনে করে তাঁকে জানব যে, তিনি মর্ত্ত্য সুখ দুঃখের অতীত। 'তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ।' সে বেদনীয় পুরুষকে জানো, মৃত্যু তোমাদের ব্যথা না দিক। জীবন ও মৃত্যু সেই পরম পুরুষের মধ্যে অখণ্ড সম্মিলিত। 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।' আনন্দ হতেই সকল জীব জন্ম গ্রহণ করে, আনন্দের অভিমুখে প্রয়াণ করে, আনন্দের মধ্যে প্রবেশ করে।"

তারপর সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে উপরোক্ত প্রস্তাব দুইটী গৃহীত হয়। সভাপতি রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে দ্বিতীয় প্রস্তাব অনুযায়ী স্বর্গীয়া মহারাণীর স্মৃতিরক্ষাকল্পে সভায় একটী কমিটি গঠিত হইয়াছে। অতঃপর ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভাভঙ্গ হয়।

মহারাণী সুনীতি দেবীর মহাপ্রয়াণ।

গত ১০ই নবেম্বর, এই রাঁচি সহরে, কুচবিহারের মাননীয়া মহারাণী সুনীতি দেবী পরলোক গমন করিয়াছেন, এই সংবাদ সকলেই শ্রবণ করিয়াছেন। অনেকে তাঁহার শেষ ক'দিনের বিষয় একটু বিশেষ ভাবে জানিতে ইচ্ছা করেন; সেজন্য এই প্রবন্ধে তাঁহার জীবনের শেষ দিন কয়টির বিষয় একটু লিখিব।

গত ২০শে অক্টোবর, তিনি স্বাস্থ্যের উন্নতি জন্য রাঁচিতে আগমন করেন। শরীর অত্যন্ত অসুস্থ থাকাতে, তিনি বি, এন, আর, হোটেলে উঠিয়াছিলেন। একটু সুস্থ হইলে, বাড়ীভাড়া করিয়া কিছুদিন এখানে থাকিবেন, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হওয়াতে, তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্র বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। রাঁচিতে

আসিয়া প্রথম দিন কয়েক একপ্রকার কাটিল, কিন্তু গত ২৬শে অক্টোবর, তাঁহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হয়। সে যাত্রা তিনি কোনও প্রকারে সামলাইয়া উঠেন। তারপর গত ৮ই নবেম্বর হইতে তাঁহার পীড়ার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হয়। ৯ই নবেম্বর সারাদিন নিশ্বাসের অত্যন্ত কষ্ট হয়, তিনি সমস্তক্ষণ মুখ দিয়া নিশ্বাস গ্রহণ করেন ও বারবার বলিতে থাকেন, "আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দাও, আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দাও।"

সন্ধ্যার পর হইতে তাঁহার কষ্টের একটু উপশম হয়, ও কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি বলেন, "অজানা রাজ্যের ডাক এসেছে।" হায়রে, আত্মীয় স্বজন যাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তখনও বুঝিতে পারেন নাই, যে সত্যই অজানা রাজ্যের ডাক আসিয়া পৌঁছিয়াছে। চিকিৎসকগণ অবশ্য সকলেই বুঝিয়াছিলেন যে, এ যাত্রায় তাঁহাকে রক্ষা করা যাইবে না। তাঁহার নাড়ীর অবস্থা ও হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া ক্রমশই খারাপ হইয়া আসিতেছিল। এই প্রকরে ধীরে ধীরে তাঁহার জীবন-প্রদীপ ভোর ৫টার সময় চিরকালের মত নির্ব্বাপিত হইল।

মৃত্যুর সময় তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা সপরিবারে ও তাঁহার বোনঝি সুধা দেবী ও তাঁহার স্বামী, তাঁহার নিকটে উপস্থিত ছিলেন।

গত ১০ই নবেম্বর, রাঁচির ইতিহাসে একটি বিশেষ দিন। এই প্রকার অভাবনীয় দৃশ্য রাঁচিতে কখনও দৃষ্ট হয় নাই— ভবিষ্যতেও হইবে কি না, সন্দেহ। প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পরলোকগমনসংবাদ সমস্ত সহরে ছড়াইয়া পড়ে ও বহু ভদ্রলোক ও মহিলা আসিয়া হোটেলে সমবেত হন। তখন গৌরীপ্রসাদ মজুমদার মহাশয় প্রার্থনা করেন। ক্রমে ক্রমে সমস্ত বিদ্যালয়ে এই সংবাদ প্রচারিত হয়। তাঁহার মহাপ্রস্থান-সংবাদ পাইবামাত্র সমস্ত বিদ্যালয় বন্ধ হইয়া যায়।

বেলা ১টা হইতে হোটেলে জনসমাগম আরম্ভ হয়। দলে দলে স্কুলের ছাত্রগণ ও শত শত অন্যান্য লোক সমবেত হইতে থাকে। রাঁচি-প্রবাসী অধিকাংশ বাঙ্গালী সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অনেক ইংরাজ নরনারীও উপস্থিত ছিলেন। বেলা ১॥০টার সময় হাজারীবাগ হইতে ব্রজকুমার নিয়োগী মহাশয় আসিয়া, রাচির ব্রাহ্মমণ্ডলীর সহিত একত্র হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করেন।

বেলা ৩টার সময় মহারাণীকে হোটেল হইতে ডুরেণ্ডা শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়। স্থানীয় এ,জি, আফিসের বাবুরাই বহন করিবার সমস্ত কার্য্য করেন। হোটেলে স্থিত সেই বিপুল জনবাহিনী সঙ্গে সঙ্গে গমন করেন। "জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে" এই সংকীর্ত্তনটী গাহিতে গাহিতে ও পয়সা বিতরণ করিতে করিতে জনতা অগ্রসর হইতে থাকেন। শ্মশানের নিকটে বহু মহিলা এই ধর্ম্মপ্রাণা ভক্তিমতী দেবীকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া অপেক্ষা করিতে থাকেন ও সকলেই শ্মশান অবধি তাঁহার অনুগমন করেন। এই স্থানে বালিকাবিদ্যালয়ের বালিকাগণ তাঁহাকে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করিয়া প্রণাম করে।

সেদিন শ্মশানের সেই দৃশ্য বর্ণনা করিতে পারি, এমন শক্তি আমার নাই। আবালবৃদ্ধবনিতা যে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়াছে, সেই ছুটিয়া আসিয়াছে। ছোট সুবর্ণরেখা নদীটির দুই তীর মহিলা দ্বারা পূর্ণ। জননীরা সব শিশু সন্তান বক্ষে করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছেন; নব পরিণীতা বধূ, যাঁহাকে কখনও বাহিরে দেখি নাই, তাঁহাকেও সেদিন শ্মশানে দেখিয়াছি। স্থানীয় বিদ্যালয় সমূহের ছোট বড় সমস্ত বালকবালিকা শ্মশানে। হিন্দু, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান, মুসলমান, বাঙ্গালী, অবাঙ্গালী, শিশু, যুবক, বৃদ্ধ, নরনারী সকলেই শ্মশানে ছুটিয়া আসিয়াছেন। সে স্বর্গীয় দৃশ্য কেমন করিয়া বর্ণনা করিব? যাঁহারা সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সেই শ্মশানঘাটকে 'মহামিলনক্ষেত্র' বলিয়া নিশ্চয়ই মনে প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছেন। মৃত্যুর দুয়ার সেদিন অমৃতেরই সোপান বলিয়া অনুভব করিয়াছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সেদিন এ পারে যেমন আমরা সকলে মিলিত হইয়াছিলাম—ওপারেও তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য বহু আত্মা সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ভক্ত পিতার ভক্তিমতী কন্যা মহারাণী হইয়াও অন্তরে অন্তরে সত্যই তপস্বিনী ছিলেন। মৃত্যুর সময় কোথায় তাঁহার রাজ্য পড়িয়া রহিল, কোথায় তাঁহার রাজপ্রাসাদ রহিল, বিশ্ব[illegible] সে সকল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, তাঁহার শান্তিময়ী প্র[illegible]তর মধ্য হইতে তাঁহাকে আপন কোলে তুলিয়া লইলেন তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাই পূর্ণ হইয়াছে। তিনি সেই পবিত্র আত্মার অনন্ত কল্যাণ বিধান করুন ও শোক-সন্তপ্ত পরিজনদিগকে সান্ত্বনা দান করুন, ইহাই প্রার্থনা।

রাচি, সুচরিতা সেন

—•—

মহারাণী সুনীতি দেবী।

(রাঁচিতে স্মৃতিসভা)

গত ১০ই নবেম্বর, এই রাঁচিতে যে পুণ্যাত্মা ইহধাম হইতে সেই অমরধামে তিরোহিত হইলেন, সহস্রাধিক নরনারী পরিবেষ্টিত হইয়া সময়োচিত গাম্ভীর্য্য সহ সুবর্ণরেখার আববাহিকায় যাঁহার নশ্বরদেহ দেখিতে দেখিতে পঞ্চভূতে মিলাইয়া গেল, আজ (২৭শে নবেম্বর) সেই মহারাণী সুনীতি দেবীর ভস্মস্থাপন উপলক্ষ্যে, কলিকাতা ব্রাহ্মমণ্ডলীর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইতেছে। তাহারই সহিত যোগ রক্ষা করিয়া, ৺দেবীর বোনের কন্যা সুধা দেবী প্রাতঃকালে এখানে শ্মশানভূমিতে বিশেষ প্রার্থনা করিলেন।

বৈকাল [illegible]ঘটিকায় স্থানীয় নারীসমিতির উদ্যোগে বালিকাবিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে একটী বিশেষ স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়।

স্থানীয় হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান সকল সম্প্রদায়ভুক্ত ভদ্র-মহিলাগণ যোগ দেন। শ্রদ্ধেয়া মিসেস্ পি, এন, বোস একটী ব্রহ্মসংগীতের পর উপস্থিত সকলকে সভার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া, ৺মহারাণী স্বয়ং যে তাঁহার বাল্যসহপাঠিনী ছিলেন, তৎকালীন তাঁহার সকলের সহিত কি মধুর ব্যবহার, এবং পরবর্ত্তী জীবনে উপাসনাকালে ও কথকতা করিবার কালে তাঁহার যে ভক্তি-বিহ্বল মুখচ্ছবি ফুটিয়া উঠিত, এই সকল স্মরণ করিয়া শুণমুগ্ধ-হৃদয়ে স্বর্গগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

তৎপর মাননীয়া সুধা দেবী শোককাতরকণ্ঠে তাঁহার স্বর্গীয়া জ্যেষ্ঠ মাসীমাতার পারিবারিক জীবনের কয়েকটি সাধারণ ঘটনা উল্লেখ করেন। রাজরাণী হইয়াও তাঁহার কিরূপ সরল স্বাভাবিক প্রকৃতি ছিল ও স্বামীর প্রতি তাঁহার কিরূপ স্ত্রী-সুলভ সেবাপরায়ণতা ছিল, তাহা বর্ণন করিয়া, শ্রোতৃবৃন্দের মনে চমৎকার কয়েকটী চিত্র ফুটাইয়া তোলেন। বিবাহিত জীবনে কিরূপে লেখাপড়া শিক্ষা করেন এবং সীতা সাবিত্রী প্রভৃতির আখ্যান কি সুন্দর ইংরাজি ভাষায় রচনা করেন, তাহাও বর্ণন করেন। তাঁহার দানশীলতা, দাসদাসীর প্রতিও সুমিষ্ট ব্যবহার, তাঁহার দৈনিক পূজা পদ্ধতি ও ভগবদ্ভক্তির কথা সুন্দরভাবে বর্ণনা করেন। একদিকে রাজৈশ্বর্য্য, সুখসম্পদ, মান সম্মান, আর একদিকে শোকতাপ মনঃপীড়ার মধ্য দিয়া, তাঁহার এই সুদীর্ঘ জীবন অতিবাহিত হইয়াছে; আজ তিনি এ জগতের অতীত হইয়াছেন। প্রতিদিন উন্নততর লোকে তাঁহার অমর আত্মার গতি হউক, তাঁহার পুণ্য আদর্শগুলি আমাদের জীবনে প্রতিফলিত হউক, লীলাময়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক—এই রূপ প্রার্থনা করেন। তৎপর শ্রদ্ধেয়া মিসেস্ জে, কে, দত্ত নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন :—

আপনারা সকলেই জানেন যে, গত ১০ই নবেম্বর, কুচবিহা-রের মাননীয়া মহারাণী সুনীতি দেবী অমরধামে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন; আজ আমরা তাঁহার তিরোধানে শোকপ্রকাশ করিবার জন্য এখানে সম্মিলিত হইয়াছি। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে আমি অল্পই জানি; যতটুকু তাঁহাকে দেখিয়াছি, তাহাতে অনুভব করিয়াছি, তিনি একজন পবিত্রচেতা নিষ্ঠাবতী এবং ভক্তিমতী নারী ছিলেন। ধর্ম্মে নিষ্ঠা এবং ভগবানে অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল, ভক্ত পিতার উপযুক্ত কন্যা তিনি ছিলেন। তাঁর দীর্ঘ জীবনে কত দুঃখ শোক এবং দুর্দ্দিনের ঝড় বহিয়া গিয়াছে, কিন্তু তিনি দয়াময়ের দয়ার প্রতি কখন সন্দিগ্ধ হন নাই এবং তাঁহার চরণে আস্থা ও বিশ্বাস হারাণ নাই; নিষ্ঠার সহিত প্রাতঃ সন্ধ্যা তাঁহার পূজা অর্চ্চনা না করিয়া জল গ্রহণ করেন নাই। কত সময় তিনি মহিলাদের মধ্যে উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহার উপদেশ ও আরাধনা কেমন সরল ও ভক্তিপূর্ণ ছিল, তাহা এখনও স্মরণ হইতেছে।

মহারাণী অতিশয় দয়ালুহৃদয় এবং দানশীলা রমণী ছিলেন, কত দরিদ্র অনাথকে তিনি গোপনে অর্থসাহায্য করিতেন, তাঁহার পরিবারস্থ কেহ তাহা জানিতে পারিতেন না; তাঁহার অভাবে আজ তাঁহারা মাতৃহীন হইলেন। কেহ তাঁহার নিকট অভাব জানাইলে, তিনি তাঁহার অভাব মোচন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। বিধাতা তাঁহাকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী করিয়াছিলেন, তাঁহার দীর্ঘ জীবনে তিনি ধনের সদ্ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।

সুনীতি দেবী স্ত্রীশিক্ষার একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং উৎসাহদাতা ছিলেন। তাঁহারই অদম্য চেষ্টায়, উৎসাহে এবং অর্থসাহায্যে কলিকাতায় ভিক্টোরিয়া স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি চিরদিন ইহাকে সাহায্য করিয়াছেন; ঐ বিদ্যালয়ের গৃহ না থাকাতে অসুবিধা হইত, সেজন্য তিনি কয়েক বৎসর হইল, বর্ত্তমান গৃহ ও তৎসংলগ্ন জমি দান করিয়াছেন। দার্জ্জি-লিং এর মহারাণী স্কুল তাঁহার নিকট সাহায্য লাভ করিয়াছে এবং এইজন্য বিদ্যালয়টি তাঁহারি নামে অভিহিত হইয়াছে। সকলেই জানেন, দার্জ্জিলিং এর মত স্বাস্থ্যকর স্থানে বাঙ্গালী মেয়েদের জন্য এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে কত সুবিধা হইয়াছে। তিনি আরও কত সাহায্য করিয়া গিয়াছেন, বিশেষ রূপ না জানার জন্য আমি উল্লেখ করিতে অসমর্থ। আপনারা ক্ষমা করিবেন।

মঙ্গলময়ের চরণে আমরা আজ এই সর্ব্বগুণসম্পন্না শ্রদ্ধেয়া ভগ্নীর আত্মার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করি; (জীবনে তাঁহাকে অনেক শোক দুঃখ সহ্য করিতে হইয়াছে, আজ তাঁহার সকল দুঃখের অবসান হইয়াছে।) তিনি তাঁহার অমর আত্মাকে অনন্ত শান্তি এবং আনন্দ বিধান করুন, ইহাই আমাদের মিলিত প্রার্থনা।

নববিধান-সঙ্গীত

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে সামাজিক উপাসনায় বিবৃত)

নববিধান উদার ধর্ম্ম, কেহ ইহাকে সঙ্কীর্ণ করিতে চেষ্টা করিলেও, ইহা নিজে সঙ্কীর্ণ স্থানে থাকিতে পারে না। নব-বিধান সাধনের ধর্ম্ম, মতের ধর্ম্ম নহে। ইহাকে বুঝিতে হইলে, উপরের দিকে দৃষ্টি ও অন্তরে প্রবেশ করিতে হয়।

নববিধানতত্ত্ব ও নববিধান-সাধন-প্রণালী নববিধানের এক একটী সঙ্গীতে বিশেষভাবে পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। এক একটী সঙ্গীত যে কি অমূল্য ধন, তাহা কথায় প্রকাশ করা যায় না। সাধন-পথে সাধক ভক্তগণ যেমন অগ্রসর হইতে থাকেন, তাঁহাদের হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া গিয়া এক অপরূপ রাজ্যে তাঁহারা উপনীত হন। তখন যে সকল তত্ত্ব ও সৌন্দর্য্য তাঁহাদের অন্তরের দৃষ্টিতে পড়ে, যাঁহারা সঙ্গীতাচার্য্য, তাঁহাদের মুখে তাহা সঙ্গীতরূপে

প্রকাশিত হয়। সেই সঙ্গীত-রচনায় তাঁহাদের কবিত্বের, কিম্বা মনুষ্যবুদ্ধি দ্বারা ওজন করিয়া বাক্য ও শব্দ নির্ব্বাচনের, কিম্বা লোকের মনোরঞ্জনের দিকে দৃষ্টি থাকে না। তাঁহারা নিজে যাহা তাঁহাদের অন্তর মধ্যে দেখেন এবং সেই সময় স্বর্গ হইতে যে আলোক ও দৃষ্টি প্রাপ্ত হন, তাহাই স্বভাবতঃ সঙ্গীতরূপে প্রসূত হয়। সেই সঙ্গীতের মর্ম্ম বুঝিবার জন্য সাধককে সেইস্থানে উপস্থিত হইতে হয়, যে স্থানে দাঁড়াইয়া ভক্তের প্রাণ হইতে সঙ্গীত উত্থিত হয়। অপরদিকে আমাদের মত দুর্ব্বল প্রকৃতির এবং ক্ষীণ সাধনের লোকেরও, সাধন-পথে অগ্রসর হইবার জন্য, নিষ্ঠার সহিত ঐ সকল সঙ্গীত পাঠ, গান ও শ্রবণ বিশেষ সাহায্য করে।

সজন ও নির্জ্জন উপাসনায়, আরাধনায়, যোগ ও ভক্তির সাধনে, মনন সময়ে ও নিভৃত চিন্তার সময়ে, বন্ধুরসে, দুঃখ কষ্ট ও শোকের সময়ে, ভগবৎসঙ্গীততুল্য বন্ধু আর কেহই নহে। বিশেষ ভক্তের সাধন-প্রসূত হৃদয়স্পর্শকারী সংগীতগুলি। এই প্রকার সংগীতের আদর বিশেষ প্রয়োজন। এখন দৃষ্টান্তস্থলে একটী সংগীত লইয়া অদ্য কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

ভক্তের সংগীত আরম্ভ হইল :—

"অন্ধকার চিদাকাশে কে যেন একজন,
আপনার ভাবে আপনি করে সদা বিচরণ।"

সাধক বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করিলেন, সমস্ত অন্ধকার প্রথমে পাইলেন। সাধক নিরাশ না হইয়া অপেক্ষা করিলেন। তখন কে যেন একজন আপনার ভাবে পূর্ণ স্বাধীনতায় দেবতারূপে—অন্যের ইচ্ছা দ্বারা চালিত না হইয়া—চলাফেরা করছেন, আবছায়া আবছায়া সাধকের এই অনুভূতি হইল। এখানে বলা আবশ্যক যে, সাধক সম্বল-স্বরূপ দৃঢ় বিশ্বাস লইয়া সাধন-পথে বহির্গত হইয়াছেন। যে বিশ্বাস প্রাণান্তেও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না—ইহাই সাধনের মূলধন। সাধকের তাঁহায় দেবতায় নিত্যতার-ও সদা স্থিতির আভাস এখানে লাভ হইল। ইহাই পরে প[illegible]স্ফুট হইবে।

এই অ[illegible] ভক্ত গাহিলেন :—

"কাণে কাণে কথা বলে', হেসে হেসে যায় চলে',
নিদ্রাবেশে দেখি যেন কত সুখের স্বপন"।

সাধনের প্রথম অবস্থায় সাধকের যে অবস্থা হয়, ভক্ত সাধক তাই বলিতেছেন। এখনও ভগবানের সঙ্গে সাধকের গাঢ় সম্বন্ধ হয় নাই। বাণী সাধকের বিবেক-কর্ণে অল্প অল্প দিয়া, হেসে হেসে সরে' গিয়ে ভগবান্ দেখছেন, সাধনপথের নূতন পথিক কি করেন। বাণী আসছে—সাধকের মনে তাহা তখন সুখের স্বপ্নমত বোধ হইতেছে মাত্র।

স্বপ্নে যাহা নূতন (Novice) সাধক দেখিলেন এবং যিনি ঐ বাণী প্রেরণ দিচ্ছেন, তাঁকে ধরিতে সাধক ইচ্ছুক হইলেন। সেই অবস্থাটি সংগীতে এইরূপ আছে :—

"ধরিবারে যদি যাই, খুঁজে দেখা নাহি পাই,
কিন্তু নিজে কাছে এসে দেয় দরশন;
দুয়ারে ঠেলিয়া কভু করে পলায়ন;
লুকোচুরী খেলে যেন শিশু ছেলের মতন।"

সাধক তো ধরিবার জন্য চেষ্টিত হ'লেন, কিন্তু সে জন্য যে মূল্যের আবশ্যক। তখন পর্য্যন্ত তাহার জন্য যথেষ্ট সম্বল হয় নাই। ধরিবার জন্য খোঁজা খুঁজি আরম্ভ হ'ল, কিন্তু সে পথের সব রাস্তা ঘাট তখনও সাধকের জানা নাই। সাধক পথ খুঁজিতে খুঁজিতে শ্রান্ত ক্লান্ত। সাধনের দেবতা সব দেখছেন। ঠিক পথে যে এলে তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়, সাধক তাহা ঠিক করে তখনও ধর্ত্তে পাচ্ছেন না—মনে নিরাশা আসছে, মন দোদুল্যমান। ভগবান্ দেখলেন, আর দেরী করলে চলে না—নবাগত সাধক যাহাতে মনঃক্ষুণ্ণ হ'য়ে ফিরে না যায়, সেজন্য নিজে কাছে এসে একবার দেখা দিলেন, কখন বা দুয়ার ঠেলিয়া সাড়া দিয়েই, সাধকের তৃষ্ণা আরও বাড়াবার জন্য, তীব্র করবার জন্য লুকিয়ে পড়লেন, আবার আর এক সময়ে দেখা দিলেন, আবার লুকোলেন—ঠিক যেমন শিশুছেলেদের লুকোচুরী খেলার মতন।

এই রকম অবস্থার ভিতর দিয়ে সাধক আর এক অবস্থায় এসে পড়লেন—অনন্তস্বরূপের আর এক স্বরূপ তাঁর দৃষ্টিতে পড়িল।—শিশুছেলের মত তিনি কেবলই ক্রীড়া করেন না; কিন্তু তাঁর রুদ্র অগ্নি মূর্ত্তিও আছে। পাপ তাঁর সহ্য হয় [illegible] তাই রুদ্রমুখ দেখিয়ে পাপীর প্রাণে ভয় আনয়ন করেন। তাঁর সন্তান হ'য়ে পাপ করছে দেখে, পাপমুক্তির উপায়স্বরূপ, ঠিক যেন অভিমান হয়েছে দেখাবার জন্য, তাঁর প্রসন্ন মুখ ঢেকে রাখেন, যাতে পাপীর প্রাণে অনুশোচনা (Repentance) অনুতাপ আইসে। অনুতাপানলে যখন পাপীর প্রাণ একটু দ্রবীভূত হইল, তখন আবার নূতন বেশে এসে ভগবান্ প্রাণের ভিতরে দেখা দিলেন। ঠিক যেমন কাল মেঘের মধ্যে সহসা চপলা বিদ্যুৎ দেখা দিল। চপলার মত দেখা দিয়েই আবার কোথায় মিলাইয়া গেলেন। একবার দেখা দিয়ে আবার লুকান, এইরূপ বারম্বার চলতে লাগল সাধকের সঙ্গে। সাধক উস্তুং কুস্তুং হয়ে উঠল। ভাবল, এ কি আবার ভগবানের কাণ্ড, ঠিক যেন খ্যাপামী। সাধক তখনও বুঝেন নাই যে, তাঁকে গড়বার জন্য—লৌহকে যেমন কর্ম্মকার কোন অস্ত্রে পরিণত করবার সময়, কখন অগ্নিতে উত্তপ্ত করে, আবার পরক্ষণে জলের ভিতর ডুবাইয়া লয়, আবার উত্তপ্ত করে ও আবার জলে ডুবায় —সেইরূপ কখন ভগবান্ দর্শন দিয়া ও পর ক্ষণে অদর্শন দ্বারা সাধকের জীবন গড়িতে থাকেন। তাই নববিধানের ভক্ত গাহিলেন :—

"কখন দেখায় ভয় না কহে বচন,
অভিমানে ঢেকে রাখে প্রসন্ন বদন;

আবার নূতন বেশে প্রাণের ভিতর এসে,
ঝলকে ঝলকে খেলে চপলা যেমন,
হাসায় কাঁদায় করে উন্মত্ত কুহক,
খ্যাপালে এবার আবার খ্যাপা নিরঞ্জন।"

সাধক দর্শন অদর্শনের ভিতর দিয়া পথ চলিতে চলিতে তাঁর গতি আবার শিথিল হইয়া পড়ে—তখন পূজা উপাসনাও শিথিল হয়, কিম্বা মৃত ও নির্জীব ভাবে হয়, ঠিক যেমন পথশ্রান্ত পথিক নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে। তখন আবার রুদ্র স্বরূপের আবির্ভাব, তখন প্রাণের ভিতর সেই রুদ্র দেবতার তর্জ্জনগর্জ্জন-যুক্ত তীব্র তিরস্কারধ্বনি উত্থিত হয়। সাধকের অন্তর যেন অশনিনাদে কাঁপিয়া উঠে। সাধক স্তম্ভিত। বিশ্বরূপের অশেষরূপ দর্শনে মনের বোধ যেন লোপপ্রাপ্ত হয়। সেই ভগবান্ যে কি জিনিষ, মন তাহা বুঝিয়াও বুঝিয়া উঠিতে যেন পারে না। ভগবানের লীলা দেখেও দেখে না, যেন ধরিয়া উঠিতে পারে না। ভক্ত তাই গাহিয়া উঠিলেন :—

"কখন ধমক দিয়ে, দেয় ঘুম ভাঙ্গাইয়ে,
করে তিরস্কার কত তর্জ্জন গর্জ্জন,
কাঁপায় অশনিনাদে যেন ত্রিভুবন ;
তবু তাঁর মর্ম্ম নাহি বোঝে এ অবোধ মন।"

সাধক কিন্তু সঙ্গে "বিশ্বাস"-অস্ত্রটী নিয়ে এসেছেন। উঠ্‌ছেন, পড়্‌ছেন কতবার, তবু যে পথ নিয়েছেন, তা ছেড়ে যেতে পাচ্ছেন না। নিরাশা আসছে, কিন্তু প্রাণের ভিতর থেকে যে নিরন্তর আশার ধ্বনি উঠছে, সেটা তুচ্ছ কি অগ্রাহ্য কর্ত্তে পাচ্ছেন না। তিনি যে "বিশ্বাস"-কবচ পরে' পথে বেরিয়েছেন। পিতামাতা পুত্রের মঙ্গল জন্য আবশ্যকমত শিশুকে তাড়না করেন—যখন তাড়না খেয়েও মা বাপের কাছ ছাড়ে না, তখন সেই শিশুর একান্ত নির্ভর দেখে, স্নেহভরে তাহাকে ক্রোড়ে তুলে, তাহার যে পিতামাতাই যথার্থ সুহৃদ, তাহারই পরিচয় দেন; এবং ঠিক শিশুর মতন ব্যবহার করিয়াই, শিশুকে সান্ত্বনা দিবার জন্য, যেন শিশুর মতন নাচেন ও গান করেন। সেইরূপ ভগবান্ তাঁর শিশুভাবব্যঞ্জক কোমল স্বরূপ প্রকাশ করিয়া সাধককে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করেন। বিশ্বাসী ভক্ত এইরূপে তাঁহাতে আকৃষ্ট হইয়া, তাঁর কাছে কাছে থাকিতে, তাঁর সঙ্গে যোগযুক্ত হইতে প্রয়াসী হন; এবং সে জন্য সদা জাগ্রত ভাবে তাঁহার করুণার উপর নির্ভর করিয়া, সাধন আরও গাঢ় করিতে থাকেন। পরিণামে ভগবানের সহিত যোগযুক্ত হইয়া, বিমল আনন্দে ভাসিতে থাকেন। নববিধানের ভক্তের সঙ্গীত তাই এইভাবে শেষ হইয়াছে :—

"কভু পিতৃমাতৃসখা সুহৃদের প্রায়,
কখন রাখালগোপাল বেশে নাচে গায় ;
জ্বালায়ে বিশ্বাস বাতি, জেগে আজ সারারাতি
দেখিব কেমন সেই পুরুষরতন ;
ধরিয়া ফেলিব তাঁর অভয় চরণ ;
বড় মজা হবে রে ভাই, দুজনে মিলে তখন।"

বিশ্বাসে যখন ভক্তির যোগ হয়, তখন আত্মা ও পরমাত্মার যে যোগ হয়, তাহা যে কত সুমিষ্ট ও রসাল, তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস এই সঙ্গীতে দেখা যায়। এই যোগ উপলব্ধির সহজ উপায় "নববিধান-সাধন"। ইহার মূল 'বিশ্বাস', ফল 'ভক্তি'। সর্ব্বপ্রকারে ভগবানে নির্ভর ইহার অন্যতম উপাদান—এই জন্যই নববিধানের সাধক ভগবান ছাড়া আর কাহাকেও গুরু স্বীকার করিতে পারেন না। যাহাতে ভগবানের তুষ্টি, তাহা ছাড়া মনুষ্যের তুষ্টির জন্য ব্যগ্র হওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই "চৌদ্দ ভুবন ধ্বংস হলেও আপনাকে বানায় ঘর"। তাঁর এই প্রথা। নববিধানের সাধকের লক্ষ্য—সুখ দুঃখ মান অপমান—সকলেতেই সমভাব। রোগ শোক তাঁহাকে মুহ্যমান করিতে পারে না। এরূপ সাধক সৌভাগ্যক্রমে আমরা আমাদের জীবনে দেখেছি, ধন্য হয়েছি। এখন তাঁহাদের পদ অনুসরণ করে, যাহাতে আমরা তাঁহাদের মতন নববিধানের লোক হতে পারি, মা দয়াময়ী পতিতপাবনী তাহাই করুন। আর সাধনের সহায়স্বরূপ, উপরোক্ত ও তদ্রূপ অমূল্য সংগীতগুলি যাহাতে আমরা ভবিষ্যদ্‌বংশের জন্য রক্ষা করিয়া যাইতে পারি, সেইরূপ বিধান করুন এবং আশীর্ব্বাদ করুন, যাহাতে আমরা এই কার্য্য সমাধার জন্য অকাতরে পরিশ্রম করিতে পারি। যে উপায় অবলম্বনে তাহা সুসম্পন্ন হইতে পারে, তাহারও বিধান বিধাতা করিয়া দিন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

—•—

উদ্বোধন।

(১৯শে নবেম্বর, ১৯৩২, সন্ধ্যায় উড্‌ল্যাণ্ডে, স্বর্গগতা মাননীয়া মহারাণী সুনীতি দেবীর স্মরণার্থ উপাসনায় উদ্বোধন বিবৃত)

সঙ্গীত—"মহাসিন্ধুর ওপার হ'তে কি সঙ্গীত ভেসে আসে"।

"Consider the lilies of the field how they grow."
"Seek ye first the Kingdom of God."

স্বর্গস্থ পিতার প্রিয় সন্তান বলিলেন, "স্বর্গের পারিজাত সকল কেমন আনন্দে প্রস্ফুটিত হয়।" "সর্ব্বপ্রথমে স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর।"

ভগবানের আশীর্ব্বাদে, ভক্তপরিবারে, স্বর্গের কুসুম ফুটিয়াছিল; আপন গৌরব, সৌরভ চারিদিকে বিকীর্ণ করিয়াছিল। ধরাধামে স্বর্গরাজ্য-প্রতিষ্ঠার জন্য অমূল্য জীবন ব্যয় করিয়া, আনন্দময়ী মার আনন্দক্রোড়ে চির আনন্দে নিমগ্ন হইলেন।

সিন্ধুপারে তিনি গিয়াছিলেন; কিছু দিন সেখানে বিদেশে বনবাস করেছিলেন; এক মায়ের সন্তানজ্ঞানে অনেকের সঙ্গে

আত্মীয়তা সংস্থাপিত করেছিলেন। ফিরে এলেন স্বদেশে, নিজের জন্মভূমিতে, রক্তের যোগ যাঁদের সহিত ছিল, তাঁদের আকর্ষণে। শরীরের রোগনিরাকরণের জন্য, সিন্ধুপারে পুনরায় যাবার প্রস্তাব উঠিল, যাওয়া হইল না। আর একজনের কথা মনে পড়ে, তিনিও অতি আপন জন। রোগনিরাকরণের জন্য, যখন সিন্ধুপারে যাবার প্রস্তাব হইল, তিনি বলিলেন, সেই গানটা প্রাণেকোণে বাজাও—"এই দেশেতেই জন্ম আমার, যেন এই দেশেতেই মরি"। ইঁহারও মনে অহরহ এই ভাব জাগিতেছিল কি না জানি না।

কলিকাতা সহর হইতে স্বল্প দূর রাঁচি সহরে স্বাস্থ্যসঞ্চয়ের জন্য গমন করিলেন। আমরা সেইখানে অবস্থান করিতেছিলাম। শৈশবকাল হইতে ইঁহাকে দিদি বলিয়া ডাকিবার অধিকার পাইয়াছিলাম; রাজরাণীর পদে অভিষিক্ত হইবার পর হইতে, এতাবৎকাল রাণীদিদি বলিয়াই সম্বোধন করিয়াছি। ভাই বোনের সম্বন্ধ, অতি আদরের সম্বন্ধ, অতি ভালবাসার সম্বন্ধ, এই দীর্ঘকাল ধরিয়া সম্ভোগ করিয়াছি। নববিধানবিশ্বাস-ভাণ্ডারসংস্থাপনে, নববিধানের নববৃন্দাবনপ্রতিষ্ঠায় তিনি মাতিয়াছিলেন, আমাকেও মাতাইয়া ছিলেন। "ভাই বোনে মিলে, এবার সকলে, গড়িব ভুবন নূতন করে।" এই প্রতিজ্ঞায় আমরা আবদ্ধ হইয়াছিলাম। কিন্তু "মিছে আশা, ভাঙ্গা দশা, প্রথমে পঞ্জুড়ি হল।" মনের সাধ মনেই রহিয়া গেল।

আমাদের সহোদরা জ্যেষ্ঠা ভগিনী রাঁচিতে অবস্থান করেন। তাঁদের কাছেই সংবাদ পাইলাম, রাণীদিদি রাঁচিতে আসিতে-ছেন। ষ্টেশনেই ছুটিলাম; রেলগাড়ী হইতে তাঁহাকে নামাই-লাম। আমাদের দেখিয়া তাঁর কত আহ্লাদ, কত আনন্দ। স্নেহাশীর্ব্বাদে হৃদয়মন ভরিয়া দিলেন। পাঁচদিন পরে রাঁচি হইতে ফিরিবার আগে, সন্ধ্যার সময় তাঁহার সহিত দেখা করিলাম, কত মধুর আলাপ, আমাদের সকলের কত খবরাখবর নিলেন, কত আনন্দ প্রকাশ করলেন। সকল পরিবারে [illegible] সংবাদে, সমাজ, মণ্ডলী, আত্মীয় স্বজনের প্রতি শুভাকাঙ্ক্ষা জানাইলেন; কত সদনুষ্ঠানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া, তাঁহার রোগবৃদ্ধির সংবাদ পাইলাম, সাতিশয় চিন্তিত হইলাম; তার কয়েকদিন পরেই শেষ সংবাদ উপস্থিত হইল, সকলে শোকসন্তপ্ত ও মর্ম্মাহত হইলাম।

মহাসিন্ধুর ওপার হ'তে কি সঙ্গীত ভেসে এল। মধুরতানে, কাতর প্রাণে আয় চলে আয় বলে' তাঁহাকে আহ্বান করিল। প্রাণ তাঁর অতিশয় কাতর ছিল, আনন্দময়ীর মধুর ডাক পেয়ে; তিনি তাঁরই আনন্দক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। মহাসিন্ধুর ওপারে কত আপনার জন অগ্রে গমন করিয়াছেন; পিতামাতা, ভাই ভগিনী, স্বামী, পুত্র কন্যা, কত আত্মীয় স্বজন, প্রাণের যোগ যাঁদের সহিত অকাট্য। আপনার জনের সংখ্যা অধিক এ পারে, কি ওপারে, হিসাব করিয়া ঠিক করা যায় না। তাই যখন ডাক এল ওপার থেকে, তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। প্রস্তুত তিনি ত বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই হইয়া ছিলেন; ডাকের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিয়াছিলেন। এখান-কার কোন বন্ধনই আর তাঁকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। স্বর্গের ফুল চারিদিক সৌরভে সৌরভান্বিত করিয়া, স্বর্গাধিপতির বেদীতলে, চরণতলে উৎসর্গীকৃত হইল। ভালবাসা, ভালবাসামাখা সেবা, উদার-প্রেমপূর্ণ জীবন সমগ্র ব্যয় করিয়া, নববিধানের তরী সুখে আরোহণ করিয়া, বিজয়নিশান উড্ডীয়মান করিয়া, ব্রহ্মকৃপাস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে, অমরধামে চলিয়া গেলেন।

আর আমরা তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা, মণ্ডলীর ভাই ভগিনীরা এখানে পড়িয়া রহিলাম, তাঁহারই বিরহে, শোকে সন্তপ্ত ও মুহ্য-মান হইয়া। ধ্বংসশীল দেহ ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, পাবকসংযোগে ভস্মীভূত হইল, পঞ্চভূত পঞ্চভূতে মিলা-ইয়া গেল। সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা সামান্য যে বস্তু, যার কোনও মূল্য কেহ কোন দিন দেয় না, সেই দেহভস্ম অস্থ্যাবশিষ্ট ছাই—তাহাও সাদরে গৃহীত হইল, সঞ্চিত হইল। এও যে ভালবাসামাখা; ভাল যাকে বেসেছ, তাকে কি কোনও দিন ভুলিতে পার? ভালবাসার জিনিষকে কোনও দিন কি কেহ পরিত্যাগ করিতে পারে? সেই সুন্দর মূর্ত্তি, সেই সুন্দর দেহ, সকলেরই প্রিয়, সকলেরই ভালবাসার জিনিষ হইয়াছিল। তাই অবশেষে তাহার অবশিষ্ট ভস্মও [illegible] এত আদরের, এত প্রিয়, এত শ্রদ্ধার বস্তু হইল; মাথায় পাতিয়া লইলেন, বুকের ভিতর সাদরে স্থান দিলেন, সসম্ভ্রমে অতি সঙ্গোপনে সংস্থাপিত করিবার জন্য সঞ্চিত রহিল।

আর সেই অবিনাশী আত্মা, যাহা সেই দেহের ভিতর এতদিন বর্ত্তমান থাকিয়া উহাকে প্রাণময় করিয়া রাখিয়াছিল, শেষ মুহূর্ত্তে, কোন্ সময়ে, কোন্ দিক দিয়া সেই দেহকে পরিত্যাগ করিল, তাহা ত কেহই দেখিতে পাইলেন না। সকলেই ত উৎসুকচিত্তে, সশঙ্কিত ভাবে, সেই প্রিয়জনকে ঘেরিয়া ছিলেন; কিন্তু প্রাণপাখী কখন কিরূপে, দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া, অনন্ত চিদাকাশে উড়িল, কাহারও অবগতি হইল না। সেই পাখীর সন্ধানে সকলেই ব্যস্ত, কোথায় গেলে, কি করিলে তার দরশন মিলিবে।

জ্ঞানী পণ্ডিতেরা বলিলেন, "কে তোমার স্বামী, কে তোমার ভার্য্যা, কে তোমার পুত্র, কে তোমার কন্যা, কোথা হতে তুমি এসেছ, কোথায় বা চলেছ, এ সকলি অতীব রহস্যময়। এই মায়াময় অখিল সংসার পরিত্যাগ করিয়া, সেই ব্রহ্মপদকে শীঘ্র জান, এবং তাহারই আশ্রয় গ্রহণ কর।" বাউল (বাতুল) গেয়ে গেল—"মন পাখী চল যাই ঘরে, আর কি সুখ আছে, থেকে দেহপিঞ্জরে"। ঘরের সন্ধান কি তুমি জান? কোন্ ঘরে, চিরদিনে তরে সকলে স্ববিহিত করে? যেখানে বিরহ নাই,

বিচ্ছেদ নাই, যেখানে শোক নাই, সন্তাপ নাই, যেখানে "সুধাসিন্ধু উছলিছে, পূর্ণ ইন্দু পরকাশে," সেইখান থেকে মধুর ডাক এসেছে, সেই মা আনন্দময়ীর নিকট হতে। আমাদের প্রফুল্ল কিশোর নিত্যানন্দের মত, "আর চলে আর আমার পাশে," এই বলেই তিনি সুবিরাম আহ্বান করছেন। তবে চল সকলে তাঁরই কাছে, তাঁরই চরণতলে বসি, তাঁর প্রসন্ন মুখ দেখি, তাঁরই পূজা বন্দনা করি, আর তাঁরই ক্রোড়ে, ইহজগতে যে সকল আপনার জনকে হারায়েছি, তাঁদের দেখে প্রাণমনকে শান্ত ও সমাহিত করি। করুণাময়ের করুণা আমাদের একমাত্র ভরসা। তাঁরই আশীর্ব্বাদে, তাঁরই দয়ার উপর নির্ভর করিয়া, পূজার আরম্ভে তাঁরই চরণে বার বার প্রণাম করি।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন।

—•—

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ২৬শে ডিসেম্বর, কমলকুটীরের নবদেবালয়ে, ভক্ত ব্রহ্মানন্দের সহধর্ম্মিণী সতী জগন্মোহিনী দেবীর জন্মদিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। আচার্য্যকন্যা শ্রীমতী মণিকা দেবী পিতামাতার আশীর্ব্বাদ পরিবারের সকলের জন্য ভিক্ষা করিয়া প্রার্থনা করেন।

৭ই জানুয়ারী, এণ্টনিবাগানে শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের জন্মদিন উপলক্ষে, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

নববর্ষোৎসব—গত ১লা জানুয়ারী, নববর্ষদিন উপলক্ষে, প্রত্যূষে সঙ্গীত করিতে করিতে নবদেবালয়ে প্রবেশপূর্ব্বক, ভ্রাতা সরলচন্দ্র সেন শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের প্রার্থনা আবৃত্তি করিলে, নবদেবালয়ের প্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক সম্পাদিত হয়। ৯টার সময় মহামহোৎসবে প্রাত্যহিক সাধনার উপাসনা ভাই প্রিয়নাথ সম্পাদন করেন। ভ্রাতা ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ আচার্য্যদেবের নববর্ষ উপলক্ষে ইংরাজী ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। ধর্ম্মপিতামহ রাজর্ষি রামমোহন ও ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধার্পণবিষয়ক আচার্য্যদেবের উক্তি ও সতী ব্রহ্মনন্দিনী দেবীর প্রার্থনা আবৃত্তি করিয়া, ভাই প্রিয়নাথ শান্তিবাচন উচ্চারণ করেন।

৮ই জানুয়ারী—শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে, নবদেবালয়ে উপাসনা ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক করেন। সন্ধ্যায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উপাসনা করেন। আচার্য্যজীবনী অবলম্বনে আত্মনিবেদন করেন। ৯ই জানুয়ারী, সন্ধ্যায় এলবার্টহলে স্মৃতিসভা হয়। প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রারম্ভে সঙ্গীত ও প্রার্থনা হইলে, সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও ডাক্তার এ, কে, আয়াংগারী ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনী অবলম্বনে বক্তৃতা করেন। ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ সভাপতি মহাশয়কে ও অপর বক্তাদ্বয়কে ধন্যবাদ দিয়া নিজের মন্তব্য প্রকাশ করিলে সভাভঙ্গ হয়।

পরলোকগমন—আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, আমাদের পরম শ্রদ্ধের বন্ধু এলাহাবাদপ্রবাসী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র প্রিয়তমা কন্যা (ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত সুধাংশুমোহন বসুর সহধর্ম্মিণী) শ্রীমতী রমলা দেবী বহুদিন কঠিন পীড়ায় শয্যাশায়ী থাকিয়া, গত ৫ই জানুয়ারী, ৩নং ফেডারেশন ষ্ট্রীট, পিতামাতা, ভ্রাতা, স্বামী, তিন কন্যা ও জামাতা প্রভৃতি বহু আত্মীয়স্বজনদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, ৪৪ বৎসর বয়সে, শান্তিময়ী পরমজননীর অনন্ত স্নেহ-ক্রোড়ে স্থান লাভ করিয়াছেন। পিতামাতা শেষ সময়ে অনেকদিন কাছে থাকিয়া সন্তানের সেবা শুশ্রূষা করিয়াছেন। ভগবান্ পরলোকগত আত্মাকে তাঁহার শান্তিক্রোড়ে রক্ষা করুন এবং শোকার্ত্ত সকলের প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

পারলৌকিক—৩রা জানুয়ারী, এণ্টনিবাগানে শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের গৃহে, তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর স্বর্গারোহণ উপলক্ষে, বিশেষ উপাসনা হয়। শচীনবাবু তাঁহার ভগ্নীর জীবনের দেবগুণ উল্লেখ করিয়া প্রার্থনা করেন।

সাম্বৎসরিক—গত ৩০শে ডিসেম্বর, কলুটোলায় কৃষ্ণভবনে, স্বর্গীয় রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রনাথ খাস্তগীরের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

গত ১লা জানুয়ারী, শান্তসাধক ভাই কেদারনাথ দের সহধর্ম্মিণীর সাম্বৎসরিক দিনে, ৩২নং রাজা দিনেন্দ্র ষ্ট্রীটে কন্যা শ্রীমতী অশোকলতা দাসের গৃহে এবং ৬।৪ই ওয়ার্ডস ইন্‌ষ্টিটিউশন ষ্ট্রীটে পুত্র শ্রীযুক্ত মনোনীতধন দের গৃহে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। পাটনায় কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী বনলতা দের গৃহেও উপাসনা হয়। এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত মনোনীতধন দে প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

অদ্য হাওড়ায়, ৫৩নং কালীপ্রসাদ বানার্[illegible] লেনে, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাসের গৃহে, তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গী[illegible]রকালী দাসের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাস[illegible] করেন।

অদ্য হাওড়ায়, স্বর্গীয় কালিদাস দাসের সাম্বৎসরিকে, শ্রীযুক্ত জগবন্ধু পাল উপাসনা করেন। সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী বিনোদিনী দাস এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

৫ই জানুয়ারী, ১০নং নারিকেলবাগান লেনে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের গৃহে, তাঁহার মাতৃদেবী, স্বর্গগত ভক্তিভাজন ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়ের সহধর্ম্মিণীর স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

৬ই জানুয়ারী, স্বর্গগত ভক্তিভাজন ভাই প্যারীমোহন চৌধুরীর স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিকস্মরণে নবদেবালয়ে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

পুরীর সংবাদ—পুরী নবশ্রীক্ষেত্রস্থ নবপর্ণকুটীরে শ্রীঈশার জন্মোৎসব উপলক্ষে, ২৫শে ডিসেম্বর, প্রাতঃ সন্ধ্যায় বিশেষ উপাসনা হয় এবং ২৬শে সন্ধ্যায় ক্লার্ক হলে সাধারণ সভা হয়। শ্রদ্ধেয় ভাই প্রিয়নাথ প্রার্থনা করিয়া, শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের "শ্রীঈশা কে?" সম্বন্ধে ইংরাজী বক্তৃতার সার সংগ্রহ আবৃত্তি করেন। অতঃপর শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন এবং শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা বেণীমাধব দাস ঈশার জীবনতত্ত্ব বিষয়ে আত্মনিবেদন করেন। আরম্ভ ও শেষে যুবকদল নূতন সংগীত করেন।

গত ২৬শে ডিসেম্বর, শ্রীব্রহ্মানন্দসতী ব্রহ্মনন্দিনী জগন্মোহিনী দেবীর জন্মদিন উপলক্ষে, পুরী নবপর্ণকুটীরে বিশেষ উপাসনা ও প্রীতিভোজন হয়।

সেবা—কটকবাসী কোন শ্রীষ্টধর্ম্মবিশ্বাসী আত্মীয়ের কন্যা এবং পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে বিশেষ ভাবে আহূত হইয়া, গত ৩১শে ডিসেম্বর, ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা, প্রার্থনা ও বরকন্যাকে উপদেশ দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন।

নববর্ষ উপলক্ষে পুরী নবপর্ণকুটীরে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা বেণীমাধব দাস উপাসনা করিয়াছেন।

৮ই জানুয়ারী, শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণদিন স্মরণেও ঐখানে বিশেষ উপাসনা হয়। ভ্রাতা বেণীমাধব দাস উপাসনা করেন।

"বিশ্রামকুটীরে" গত সপ্তাহে একদিন ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক পারিবারিক উপাসনা করেন।

পত্রপ্রাপ্তি-স্বীকার।

মণ্ডলীর শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসুর একখানি পত্র যথাসময়ে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাঁহার পত্র ও পত্রের উত্তর স্থানাভাবে এবারের কাগজে বাহির হইতে পারিল না। আগামীবারে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা হইবে।

উৎসব।

কার্য্যপ্রণালী।

১লা মাঘ, ১৩৩৯, ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৩৩, শনিবার—ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যা ৬৷[illegible]য় আরতি।

২রা মাঘ, ১৫ই [illegible]জানুয়ারী, রবিবার—ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৮টায় ও সন্ধ্যা ৬৷৹টায় উপাসনা।

৩রা মাঘ, ১৬ই জানুয়ারী, সোমবার—সন্ধ্যা ৬৷৹টায় কমলকুটীরে নবদেবালয়ে মহিলাগণ কর্ত্তৃক নিশান-বরণ।

৪ঠা মাঘ, ১৭ই জানুয়ারী, মঙ্গলবার—শ্রীদরবারের উৎসব।

৫ই মাঘ, ১৮ই জানুয়ারী, বুধবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৯টায় শান্তিকুটীরে ব্রাহ্মিকা-উৎসব। সন্ধ্যা ৬৷৹টায় ব্রহ্মমন্দিরে যুবকদের উৎসব।

৬ই মাঘ, ১৯শে জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার—শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বর্গারোহণ-সাম্বৎসরিক; ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৭৷৹টায় উপাসনা ও সন্ধ্যা ৬৷৹টায় স্মৃতিসভা।

৭ই মাঘ, ২০শে জানুয়ারী, শুক্রবার—প্রাতে মঙ্গলবাড়ীর উৎসব; সন্ধ্যা ৬৷৹টায় ব্রহ্মমন্দিরে সঙ্কীর্ত্তনে-উপাসনা।

৮ই মাঘ, ২১শে জানুয়ারী, শনিবার—বালকবালিকাদিগের নীতি বিদ্যালয়ের উৎসব। প্রাতে ৮টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা; অপরাহ্ণ ৪৷৹টায় পুরস্কার-বিতরণ ও বালকবালিকা-সম্মিলন। (প্রবেশের জন্য নিমন্ত্রণপত্র-প্রদর্শন আবশ্যক হইবে)

৯ই মাঘ, ২২শে জানুয়ারী, রবিবার—ব্রহ্মমন্দিরে সমস্ত-দিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে ৭৷৹টায় কীর্ত্তন, ৮৷৹টায় উপাসনা; মধ্যাহ্ণ ৩টায় উপাসনা, তৎপরে পাঠ ও আলোচনা, ধ্যান ও ব্যক্তিগত প্রার্থনা; ৫৷৹টায় কীর্ত্তন ও সন্ধ্যা ৬৷৹টায় উপাসনা।

১০ই মাঘ, ২৩শে জানুয়ারী, সোমবার—প্রাতে ৭৷৹টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা; সন্ধ্যা ৬টার সময় ব্রহ্মমন্দির হইতে নগর-সঙ্কীর্ত্তন বাহির হইবে।

১১ই মাঘ, ২৪শে জানুয়ারী, মঙ্গলবার—ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৭৷৹টায় ও সন্ধ্যা ৬৷৹টায় উপাসনা।

১২ই মাঘ, ২৫শে জানুয়ারী, বুধবার—নববিধান-ঘোষণার দিন। প্রাতে ৭৷৹টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা; সন্ধ্যা ৬৷৹টার সময় ব্রহ্মমন্দিরে আনন্দ-সম্মিলন।

১৩ই মাঘ, ২৬শে জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৯টায় কমলকুটীরে নবদেবালয়ে আর্য্যনারী-সমাজের উৎসব। সন্ধ্যা ৬৷৹টায় ব্রহ্মমন্দিরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভা। ৫ ও ৮টায় কেশব একাডেমী বিদ্যালয়ে উৎসব।

১৪ই মাঘ, ২৭শে জানুয়ারী, শুক্রবার—৩ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে, অপরাহ্ণ ৫টায়, প্রচারকার্য্যালয়ের উৎসব।

১৫ই মাঘ, ২৮শে জানুয়ারী, শনিবার—সন্ধ্যা ৬৷৹টায় শান্তিকুটীরে "আমাদের সঙ্গের" উৎসব।

১৬ই মাঘ, ২৯শে জানুয়ারী, রবিবার—ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৮টায় ও সন্ধ্যা ৬৷৹টায় উপাসনা। অপরাহ্ণ ৩টার সময় ব্রহ্মমন্দিরে নববিধানবিশ্বাসিগণের সভা (Conference)।

১৭ই মাঘ, ৩০শে জানুয়ারী, সোমবার—সন্ধ্যা ৬৷৹টায় ব্রহ্মমন্দিরে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর বার্ষিক সভা।

১৮ই মাঘ, ৩১শে জানুয়ারী, মঙ্গলবার—সন্ধ্যা ৬৷৹টায় কমলকুটীরে নবদেবালয়ে শান্তিবাচন।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.
কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি এন, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Rev. P. M. Chowdhury's works :—

England & India	1 0	0 8
God's Treasury Part I	0 8	0 4
The Apex of Man	2 0	1 0
God and Man	1 0	0 8

Minister K. C. Sen's works :—

Lectures in India (Published in England by Cassell & Cassell & Co.) Part I and II (Cloth) each	3 0	2 8
Lectures in England (Part I)	1 4	1 0
Yoga—Subjective & Objective	0 4	0 3
Keshub Chunder Sens Portrait	1 0	0 8
Minister in the Attitude of Prayer	0 8	0 4
The New Samhita (In English)	0 4	3 0
Essays. Theological and Ethical—in one Volume.	1 8	1 0
Discourses and Writings—Part I	0 8	0 6
The New Dispensation—The Religion of Harmony—Vol. I. & Vol. II. each	1 8	1 0
প্রচারকগণের সভার নির্দ্ধারণ	৷৵০	৷০
দৈনিক প্রার্থনা (কমলকুটীর) ৩য়—৮ম, প্রতিখণ্ড	৶০	
হিমালয়ের প্রার্থনা ১ম খণ্ড (নূতন সংস্করণ)	৷৵০	৷০
হিমালয়ের প্রার্থনা ২য় ও ৩য় (প্রতি খণ্ড)	৶০	
মাঘোৎসব (নূতন সংস্করণ, পরিবর্দ্ধিত)	॥০	৷৵০
ব্রহ্মগীতোপনিষৎ (নূতন সংস্করণ)	৸০	॥০
সাধুসমাগম	৷০	৶০
ঐ (পরিশিষ্ট)	৴৫	
সেবকের নিবেদন ১ম ও ২য় খণ্ড (নূতন সংস্করণ)	১	৸০
ঐ ঐ ৩য় খণ্ড	১৲	৸০
ঐ ঐ ৪র্থ খণ্ড	৸০	॥০
ঐ ঐ ৫ম খণ্ড		৷৵০
দৈনিক প্রার্থনা, ১ম ও ২য়, প্রতি খণ্ড	৸০	
আচার্য্যের উপদেশ ১ম খণ্ড (নূতন সংস্করণ)	৸০	॥০
ঐ ২য় খণ্ড ঐ	১৲	৸০
ঐ ৩য় খণ্ড ঐ	৸০	॥০
ঐ ৪র্থ খণ্ড ঐ	১৲	৸০
ঐ ৫ম খণ্ড ঐ	১৲	৸০
ঐ ৬ষ্ঠ খণ্ড ঐ	১৷০	১৲
ঐ ৭ম খণ্ড ঐ	১৲	৸০
ঐ ৮ম খণ্ড ঐ	১৲	৸০
ঐ ৯ম খণ্ড ঐ	১৷০	১৲
ঐ ১০ম খণ্ড ঐ	১॥০	১৵০
দৈনিক উপাসনা (নূতন প্রকাশিত)	৷০	৶০
সঙ্গত—(সঙ্গত সভার আলোচনা)	১৲	৸০
জীবনবেদ	॥০	৷৵০
প্রার্থনা—(ব্রহ্মমন্দির)	৷৵০	৷০
বিধানভগ্নীসঙ্ঘ (ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি উপদেশ	১৷০	১৲
কালানুক্রমিক সূচীপত্র	৵০	
পরিচারিকাব্রত	৴১০	
অধিবেশন—(ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ)	॥০	৷৵০
উপাসনাপ্রণালী	৴০	৴১০
নবসংহিতা (নূতন সংস্করণ)	৸০	॥০
আচার্য্যের উপদেশ (পুরাতন সংস্করণ) প্রতি খণ্ড	৶০	
Brahmo Pocket Diary 1933 (cloth)	0 6	
Do. do. (paper)	0 5	

Rev. P. C. Mozoomdar's works :—

আশীষ (নূতনসংস্করণ	১৲	৸০
The Silent pastor	0 8	0 6
The Spirit of God (New Edition	2 0	1 8

নববিধান ট্রাষ্ট।

Life & Teachings of Keshub Chunder Sen by P. C. Mazumdar (New Ed.)	3 0	2 8
Life of Protap Chunder Mozumdar Vol. I & II (Bound together)	2 0	1 0
Life of Benoyendranath Sen (In English)	3 0	2 0
,, ,, (In Bengali)	2 0	1 0
উপদেশ ১ম খণ্ড (ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার কৃত)	৷০	৵০
উপদেশ ২য় খণ্ড ঐ	৷৵০	৷০
উপদেশ ৩য় খণ্ড ঐ	৷০	৶০
Intellectual Ideal (By Prof. B. N. Sen	1 0	
Lectures & Essays Vol. I. (Literary) do.	1 8	1 0
Vol. II. (Theological do.	1 0	0 12
Vol. III. (Sermons) do.	0 12	0 8
আরতি do.	৸০	॥০

বিজ্ঞান ও বিশ্বাসের সমন্বয় (ভাই মহিমচন্দ্র সেন	৴০	৴১০
শ্রীমদ্গীতাপ্রপূর্ত্তি (সংস্কৃতের বঙ্গানুবাদ) ঐ ভাল বাঁধাই)	৫৲	৩৲
ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশ (কাপড়ে বাঁধাই) ঐ	৸০	॥০
নববিধানের নূতনবেদ জীবনবেদ (ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ)	৵০	৴১০
বৌদ্ধধর্ম্ম ও নববিধান— ঐ	৷৵০	৷০
Fragments, Part I and II, each Do.	0 1	
Do. Part III Do.	0 4	
Do. Part V Do.	0 4	
The Apostles and Missionaries of Navavidhan Prof. N. Niyogi Cloth bound	5 0	4 0
Do. Paper bound	3 12	3 0
ভক্ত-কেশব—(অধ্যাপক নন্দন নিয়োগী	৶০	৴০
কেশব-সমাগম—শ্রীমতিলাল দাস	১৲	॥০
Keshub as seen by his Opponents— G. C. Banerjee	1 0	0 8
Keshub Chunder & Ramkrishna G. C. Banerjee	2 0	1 8
The Way to Prakriti Land—Sujata Devi	-/6/-	-/4/-
Why New Dispensation— Do	-/1/-	
পরলোকের সন্ধান— ঐ	৷০	৶০
Jeevan Veda, Hindi translation	0 8	0 6
The New Veda (Translation of Jeevan Veda) by J. K. Koar	0 8	0 6
The Evolution of Navavidhan— By Miss N. Ghosh	1 0	0 12
Sloka Sangraha—(Translated in Hindi— By Late Hari Sundar Bose	0 8	0 6
In the Sanctuary of Silence, (Nandalal Sen)	-/8/-	-/6/-
Faith and Culture of the New Dispensation— Part I	-/2/-	
মানুদার চিঠি ১ম ভাগ	১৲	
ঐ ২য় ভাগ	১৲	
Navavidhan Diary on 1933 (cloth)	0 5	
Do. (Paper)	0 3	

শ্রীঅক্ষয়কুমার লধ
কার্য্যাধ্যক্ষ।

নববিধান প্রেস্—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ধর্ম্মতত্ত্বের ক্রোড়পত্র

১লা মাঘ, ১৮৫৪ শক, ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৩৩।

ত্র্যধিকশততম মাঘোৎসব উপলক্ষে ১লা মাঘ, ১৩৩৯, (১৪ই জানুয়ারী, ১৯৩৩) হইতে আরম্ভ করিয়া ৩০শে মাঘ, (১৪ই ফেব্রুয়ারী) পর্য্যন্ত, নিম্নলিখিত পুস্তক সকল স্বল্পমূল্যে, ৮৯নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে এবং ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীটস্থ প্রচারকার্য্যালয়ে পাওয়া যাইবে।

অর্ডার পাইলে মফঃস্বলে ভিঃ পিঃ যোগে বই পাঠান হইবে।

পুস্তকের তালিকা।

পুস্তক		
ব্রহ্মসঙ্গীত (নূতন দ্বাদশ সংস্করণ, পরিবর্দ্ধিত)	২৷৷৵	
ব্রহ্মসঙ্গীত, ১ম ভাগ (একাদশ সংস্করণ)	২৷৷০	১৲
ব্রহ্মসঙ্গীত, ২য় ভাগ (১২৮টী সঙ্গীত)	।০	৶০
অনুষ্ঠান-সঙ্গীত ১ম (ভাই কালীনাথ ঘোষ)	৷৷০	।৵০
ঐ ২য় ঐ	।০	৶০
নামসুধা ঐ	।০	৶০
আত্মদান ঐ	।০	৶০
বিবিধ ধর্ম্মসঙ্গীত (স্বর্গীয় ভাই প্রসন্নকুমার সেন)	১৲	৷৷০
নগরকীর্ত্তন (নূতন প্রকাশিত)	৷৷০	।০
হিন্দি শতগান (শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ)	৷৷০	।৵০
উপদেশাবলী (প্রেরিতগণের উপদেশ)	১।০	৸০
ধর্ম্মবিজ্ঞানবীজ, চারি খণ্ড (৺কালীশঙ্কর দাস)	১৲	৷৷০
যোগ (রায় সাহেব বিপিনমোহন সেহানবিশ)	।০	৶০
অখণ্ড জীবন (স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার)	৴০	৴১০
কার্লাইল ও বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম (By N. C. Mitter.)	৵০	৴১০
নিবেদন ঐ	৷৷০	।৵০
দীনচরিত (ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক)	১।০	৷৷০
নববিধান অপরিহার্য্য	৵০	৴১০
ব্রহ্মময়ীচরিত (তৃতীয় সংস্করণ)	।০	৶০
প্রেরিত কালীশঙ্কর দাস (জীবনচরিত)	৷৷০	।৵০
উপাসনার স্বাভাবিকত্ব (ডাঃ ৺পরেশরঞ্জন রায়)	৴০	৴১০
খ্রীষ্ট ও ব্রাহ্মসমাজ (স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ সেন)	৴০	৴১০
শাক্যমুনিচরিত (সাধু অঘোরনাথ কৃত)	১।০	৸০
গোস্বামী রঘুনাথ দাস ঐ	৶০	
ধ্রুব ও প্রহ্লাদ ঐ	৷৷০	।০
দেবর্ষি নারদের নবজীবনলাভ	৴১০	
নানকপ্রকাশ ১ম ও ২য় (ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু) প্রতিখণ্ড	৸০	৷৷০
বুদ্ধদেবের স্থান (ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী)	৵০	৴১০
মহাপরিনির্ব্বাণসূত্র ঐ	৷৷০	।৵০
নিত্যভিক্ষা ঐ	।০	৶০
যুবকদের প্রতি উপদেশ ঐ	৶০	৵০
জীবনবেদের পরি[illegible], (অরুণপ্রকাশ বন্দোপাধ্যায়)	৵০	৴০
শ্রীশ্রীহরিলীলামৃতসিন্ধু (শ্রীযুক্ত শশিভূষণ তালুকদার প্রণীত) ১ম ও ২য় (প্রতি খণ্ড)	১৲	৸০
নবতত্ত্বামৃতম্ (সংস্কৃত) (নূতন পুস্তক) ঐ	১৲	৸০
সতী জগন্মোহিনী দেবী (ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক)	১৲	৷৷০
ঐ (কাপড়ে বাঁধা)	১।০	৸০
ঋগ্বেদ, ১ম ও ২য় (অধ্যাপক দ্বিজদাস দত্ত) প্রতিখণ্ড	২৷৷০	২৲
শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ও শাঙ্কর দর্শন, ১ম ঐ	২৲	১৷৷০
ঐ ২য় ঐ	৩৲	২৲
ইসলাম ঐ	১৷৷০	১৲
কোরাণের সুরা ও বেদের সূক্তসংগ্রহ ঐ	১৲	৸০
সার্ব্বভৌমিক ব্রাহ্মধর্ম্ম বা নববিধান ঐ	।০	৶০
Behold the Man ঐ	১৷৷০	১৲
Rigveda Unveiled Do.	5 0	3 0
Vedantism Do.	1 0	0 12
Order of Service	0 1	

G. P. Mazumder's works :—

Life of Bhai Balodeb Narayan	0 4	0 3
The Echoes from Within	0 8	0 6
A Glimpse of the life of K. C. Sen	0 8	0 4
Keshub Chunder Sen	1 0	0 8

[স্বর্গগত উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় প্রণীত।]

পুস্তক		
ধর্ম্মতত্ত্ব (বিবেক ও বুদ্ধির কথোপকথন) ১ম	৷৷৵০	।৵০

(স্বর্গগত উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় প্রণীত)

পুস্তক		
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং তাঁহার স্বভাবনিষ্ঠ যোগ (প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ) প্রতি অংশ	৷৷০	।০
শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম	১৷৷০	১৲
বেদান্তসমন্বয় (বাঙ্গালা)	৫৲	৩৲
গীতাসমন্বয়ভাষ্যম্ (সংস্কৃত)	৩৲	২৲
বেদান্তসমন্বয়ঃ ঐ (কাপড়ে বাঁধাই)	৪৷৷০	৩৲
গীতাপ্রপূর্ত্তিঃ ঐ	৩৲	২৲
নবসংহিতা ঐ	৸০	৷৷০
ভাষ্যসঙ্গমনী (১ম খণ্ড) ঐ	১৲	৸০
কেশবচন্দ্র ১ম ভাগ—উপাধ্যায়ের বক্তৃতা	১৷৷০	১৲
কেশবচন্দ্র ২য় ভাগ— ঐ	৸০	৷৷০
উপাসনাপ্রণালীর ব্যাখ্যা	৶০	৶০
শ্রৌতাচারের পুনরাবৃত্তি	৴০	৴১০
ত্রিবিধ জন্ম	৴০	৴১০
কেশবচন্দ্রের আরূঢ়াবস্থা	৴০	৴১০
বৈদান্তিক পরলোকতত্ত্ব	৴০	৴১০
আর্য্যধর্ম্ম ও তদ্ব্যাখ্যাতৃগণ	৶০	৶০
গায়ত্রীমূলক ষট্‌চক্রের ব্যাখ্যান ও সাধন	৴১০	৴-

[স্বর্গগত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন প্রণীত]

পুস্তক		
রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবন ও উক্তি	৶০	৵০
মহালিপি	।৵০	।০
ধর্ম্ম[illegible]	।৵০	
চারিটী সাধ্বী মুসলমান নারী (নূতন সংস্করণ)	।৵০	
ধর্ম্মবন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্য	৶০	৴১০
মহাপুরুষ মোহম্মদ ও তৎপ্রবর্ত্তিত এস্লামধর্ম্ম	৸০	৷৷০
হদিসের বঙ্গানুবাদ (পূর্ব্ব ও উত্তর বিভাগ) প্রতি খণ্ড	৷৷০	।৵০
তত্ত্বসন্দর্ভমালা (নূতন সংস্করণ)	।৵০	।০
এমাম হসন ও হোসয়নের জীবনী (নূতন সংস্করণ)	১।০	৸০
চারিজন ধর্ম্মনেতা (নূতন সংস্করণ)	৸০	৷৷০
হাফেজের বঙ্গানুবাদ (প্রথম ভাগ) ভাল বাঁধান)	১৲	৸০
হিতোপাখ্যানমালা ১ম ভাগ (গোলস্তান)	।৵০	।০
" ২য় ভাগ (বোস্তান)	৸০	।৵০
" ১ম ও ২য় (মনোনীতাংশ) প্রতি খণ্ড	।০	৶০
নীতিমালা (কিমিয়ায় সাদত হইতে সঙ্কলিত)	।৵০	।০
তাপসমালা (৬ ভাগে সমাপ্ত)	৩৲	২৲
তত্ত্বরত্নমালা মস্নেকোত্তর ও মওলানা রোম	৷৷৵০	।৵০
মহাপুরুষ চরিত প্রথমভাগ নূতন সংস্করণ	৷৷৵০	।৵০
দরবেশী	।০	৶০
তত্ত্বকুসুম	৴০	৴১০
আত্মজীবন	১৲	৷৷০

Keshub Chunder Sen—Correct statement of some disputed facts in his life	0 8	0 6

ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল প্রণীত :—

পুস্তক		
ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা	১৲	৷৷০
ব্রহ্মগীতা সম্পূর্ণ	১৷৷০	১৲
ঈশাচরিতামৃত ১ম ও ২য় ভাগ প্রতি খণ্ড	৸০	৷৷০
কেশবচরিত নূতন সংস্করণ ভাল বাঁধাই	১৷৷০	[illegible]

Rev. P. M. Choudhury's works :—

পুস্তক		
সত্য-রত্ন নূতন পুস্তক	১৲	৷৷০
সুনীতি কুসুম	১৲	।০
প্রতিমা (নূতন সংস্করণ	।০	৶০

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৮ ভাগ। ৪র্থ সংখ্যা। | ১৬ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৩৩৯ সাল, ১৮৫৪ শক, ১০৩ ব্রাহ্মাব্দ। 28th February, 1933. | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

মা, নববিধানাচার্য্য বলিলেন, "কেউ নিলেও আছি, না নিলেও আছি, ছাপ মারা দলিল আছে আমাদের হাতে।" এই কথার প্রমাণ দিতেই ত, মা, তুমি আমাদিগকে তোমার নিয়োজিত ভৃত্যদলভুক্ত করিয়াছ। আমরা ত জানিনা যে, তুমি আমাদের কপালে এই নিয়োগ-পত্র দিয়া আমাদিগকে মাতৃগর্ভেই জন্ম দিয়াছিলে; কেমন করিয়া, কোন ঘটনার ভিতর দিয়া, কোথা হইতে কাহাকে ধরিয়া আনিয়া, এই এক বিশাল বিশ্বজনীন বিধানের ভিতর আমাদিগকে আনিয়া ফেলিলে, আমরা কিছুই জানিনা। তোমার কাণ্ড কারখানাই এক অদ্ভুত। তুমিই না সেই, যে তুমি তোমার প্রিয় পুত্রের সঙ্গে জেলে মালাদের জুটাইয়া দিয়া, তোমার স্বর্গরাজ্য পৃথিবীতে স্থাপন করিতে এক বিধান পাঠাইয়া ছিলে; আর কতই অলৌকিক লীলা দেখাইয়া লোকগুলোকে অবাক্ করিয়াছিলে! এযুগেও, আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী যাঁরা, তাঁহাদিগকেও তোমার বিশ্বমানব ব্রহ্মানন্দ সঙ্গে মিলাইয়া, কেমনে তাঁহাদিগকে শক্তিসম্পন্ন করিয়া, তোমার নববিধানের অভিনয় করাইয়াছ। সেই তুমিই ত এই মুটে মজুর আমাদিগকে ধরিয়া এই কর্ম্মে লাগাইয়াছ। আমরা যে এত বড় বিধানের সেবার একেবারেই উপযুক্ত নই, তাহা কি তুমি জান না? এবং পদে পদে কত আমরা অপরাধ করি, তাহাও ত তুমি দেখিতেছ। তথাপি যখন তুমি অকর্ম্মণ্য বলিয়া তাড়াইয়া দাও নাই, তখন যতদিন এ দেহে রাখিবে, যেন সেবায় বঞ্চিত না হই। পাপী অক্ষম অধম বলিয়া পরিত্যাগ করিও না। তোমার অলৌকিক অসম্ভবসম্ভবকারিণী কৃপাগুণে আমাদিগের সকল ত্রুটী অপরাধ ক্ষমা কর এবং যাহাতে তোমার নিয়োজিত সেবকত্বের প্রমাণ দিয়া স্বধামে চলিয়া যাইতে পারি, এমন আশীর্ব্বাদ কর। তোমার নির্দ্দিষ্ট সেবাই আমাদের জীবন, সে সেবা হইতে বঞ্চিত হওয়াই আমাদের মৃত্যু।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

—০—

মহামহোৎসবের প্রসাদ।

নববিধানের মহামহোৎসব যে ধরায় স্বর্গের অবতারণা, ইহা উৎসবযাত্রী মাত্রেই স্বীকার করিবেন। হিন্দু ভাই বলেন, দুর্গোৎসবের সময় মা দুর্গা কৈলাস হইতে সসন্তানে তিনদিনের জন্য শুভাগমন করেন; আবার সন্ধিক্ষণে মাহেন্দ্রক্ষণে এক নিমেষের জন্য মার

শুভদৃষ্টি পৃথিবীতে পড়ে। এ সকল কথার ভিতর কল্পনা বা ভাবুকতা কিম্বা ভক্তির উচ্ছ্বাস থাকিতে পারে, কিন্তু নববিধানবিশ্বাসী মাত্রেই নিশ্চয় উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন যে, উৎসবোপলক্ষে জীবন্ত ব্রহ্মের সমাগম হয়। তিনি মাতৃরূপে প্রকট হইয়া, স্বর্গস্থ অমরাত্মা সাধু সন্তান সন্ততিগণকে সঙ্গে লইয়া, পৃথিবীর দীনাত্মাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি বিধান করেন এবং তাহাদিগের সকলকেই স্বর্গীয় ভাব ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত ও আনন্দিত করেন। অন্ততঃ উৎসবের এই কয়দিনও যে অপার্থিব ভাবে মন প্রাণ বিগলিত, উৎসাহিত ও আনন্দিত হয়, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

"অন্ধ চক্ষু পায়, বোবায় গীত গায়, পঙ্গুতে গিরি লঙ্ঘায়," এই যে সঙ্গীত গীত হইয়া থাকে, ইহা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য, তাহা আমরা অন্ততঃ এই কয় দিন যে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, ইহা মুক্তকণ্ঠে সাক্ষ্য দান করিবই করিব। কেন যে ইহা হয়, কেমন করিয়া ইহা হয়, তাহা হয়ত বুদ্ধি বিচার করিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি না। কিম্বা তর্ক যুক্তি দ্বারা, যাঁহারা সন্দিগ্ধচিত্ত বা সংশয়বাদী, [illegible]কে বুঝাইয়া দিতে পারিব না। কিন্তু এই উৎ[illegible] যে একটা অলৌকিক স্বর্গীয় ভাবের অবতারণা হয়, কি জানি, কোথা হইতে একটা স্বর্গীয় হাওয়া বহিয়া যায়, ইহা বিশ্বাসী মাত্রেই যে সম্ভোগ করিয়া থাকেন, তাহা নিঃসংকোচে সকলেই বলিবেন।

এই উৎসব-সময়ে যে একেবারেই কিছু বাহ্যাড়ম্বর নাই, [illegible]াহিরের আমোদ আহ্লাদের ব্যাপার নাই, কিম্বা মা[illegible]য় মৌখিক ভাব কাহারও নাই, ইহা আমরা বলিতেছি না; কিন্তু যাঁহারা ভক্তি [illegible] প্রণোদিত হইয়া উৎসবে যোগদান করেন, তাঁহারা বিধাতার অনির্ব্বচনীয় কৃপায়, বাহ্যব্যাপারের অভ্যন্তরেও স্বর্গীয় অধ্যাত্ম ব্যাপারই উপলব্ধি করিয়া থাকেন, এবং তাঁহারা সত্যই যেন ইহলোকেই পরলোক সম্ভোগ করেন।

"চল ভাই যাই সবে, মহা মহোৎসবে, অমরধামে যোগবলে" এই গান উৎসবযাত্রীদিগকে মা অক্ষরে অক্ষরে সম্ভোগ করিতে দেন। অর্থাৎ এ সময় স্বর্গের কি এক মহাযোগবল আসিয়া, আমাদিগকে অমরধামে লইয়া গিয়া, অমরাত্মাদিগের সহিত উৎসবানন্দদানে উন্মত্ত করে। কিন্তু হায়, হিন্দু ভাই যেমন তিন দিন দুর্গোৎসব সম্ভোগ করিয়া, তিন দিন পরে ইষ্টদেবীকে বিসর্জ্জন দিয়া, পূজার দালান যেই অন্ধকার, সেই অন্ধকার রাখিয়া, সংসারের দুঃখ ধান্ধায় মজিয়া সম্বৎসর কাটান, নববিধানের জীবন্ত মার উৎসবকারীদেরও কি দুর্গতি, দুর্দ্দশা তেমনই হইবে? আমাদেরও উৎসবের এই উৎসাহ উদ্যম অধ্যাত্ম সম্ভোগ কি এক মাসের পর ফুরাইয়া গিয়া, আমাদের যে পূর্ব্বেকার অবস্থা, সেই অবস্থায় আমাদিগকে ফেলিয়া যাইবে?

মূর্ত্তি-উপাসকের উৎসব তিন দিনে ফুরাইতে পারে, ফুরাইয়া যাওয়া সম্ভব; কিন্তু অনন্ত জীবন্ত ঈশ্বরের উৎসবকারীদেরও উৎসবের নেশা ভাঙ্গিয়া গিয়া যদি সে দুরবস্থা হয়, তাহা হইলে আমাদেরও উৎসব যে কেবল বাহ্যাড়ম্বর, যথার্থ অধ্যাত্ম উৎসব নয়, ইহা কি প্রমাণ হইবে না?

আমাদের জীবনের যে একেবারে উত্থান পতন হইবে না, তাহা বলিতেছি না; কিন্তু প্রত্যেক উৎসব যদি আমাদের জীবনকে খানিকটা স্বর্গের দিকে অগ্রসর করিয়া না দেয়, যে উচ্চ অধ্যাত্ম যোগ ভক্তির সম্ভোগ উৎসবে আমরা সম্ভোগ করিলাম, লাভ করিলাম, তাহার কতকটা চাপ যদি আমাদের অন্তরে স্থায়িভাবে বসিয়া গিয়া না থাকে, তাহা হইলে আমাদের উৎসব করা বাহিরে বা[illegible] হইয়াছে, মার অন্তঃপুরে আমাদের প্রবেশ হয় নাই, কিম্বা মা উৎসব লইয়া আমাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন নাই, ইহাই বলিতে হইবে।

নদীতে যখন বান ডাকিয়া ডাঙ্গা ডহর ভাসিয়া যায়, বানের জল ভাটিয়া গেলেও জমিতে পলি বা স্তর পড়িয়া থাকে; তেমনি উৎসবের বানের জলে আমাদের হৃদয়ে যদি কিছু যোগ ভক্তি, কর্ম্ম জ্ঞান, নীতি চরিত্র এবং শুদ্ধতা শান্তির স্তর না পড়ে, তবে আমাদের উৎসব প্রকৃত উৎসব হয় নাই।

ফল দ্বারা বৃক্ষের পরিচয় পাওয়া যায়; জীবনের উন্নতি, চরিত্রের সংকল্প, ব্রহ্মদর্শনশ্রবণের প্রগাঢ়তা, ভ্রাতৃপ্রেমের বৃদ্ধি, দুর্নীতি পাপ সাংসারিকতার প্রতি একটা বিতৃষ্ণা দ্বারা উৎসবের ফল সপ্রমাণ হইবে। ভাই আচার্য্যদেব বলিলেন, "এবার উৎসবে কেবল ব্রহ্মসমাগম নয়, ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠা।" অর্থাৎ ব্রহ্ম কেবল এলেন, আবার চলিয়া গেলেন, তাহাতে হইবে না; তিনি প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিলেন, ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে। তিনি হাড়ে হাড়ে বসিয়া গিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার উৎসবও জীব

বসিয়া গিয়াছে। আমার কোন নীচ কামনা বাসনা তাঁহাকে, তাঁহার উৎসবকে আর তাড়াইতে পারিবে না। কিছুতে আর মনের শান্তি ভঙ্গ করিতে পারিবে না। পাপ করা, মিথ্যা কথা বলা, কুদৃষ্টি, কুকামনা যেমন এখন আমাদের স্বভাব হইয়া গিয়াছে, তেমনি ব্রহ্মবলে, উৎসবের ঝড়ের প্রভাবে এমনই হইবে যে, ব্রহ্মদর্শন-শ্রবণই আমাদের স্বভাব হইবে, ব্রহ্মের ভিতর দিয়াই তখন পরস্পরকে দেখাশুনা, কাজ কর্ম্ম করা হইবে। ইহাই নববিধানের উৎসবের ফল। ব্রহ্মকৃপায় ইহা যেন কিয়ৎ পরিমাণেও এবার হয়, মা এমন আশীর্ব্বাদ করুন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

দশজনে একজন।

নববিধানের মানুষের এক মাথা, শত শত হস্ত, শত শত চক্ষু, শত শত কর্ণ। শত শত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বিশিষ্ট একদেহ বিশ্বমানব যিনি, তিনিই নববিধানের মানুষ। এ মানুষ একজন মানুষ, যাঁর পশ্চাতে "অদৃশ্য আমরা", বাহিরে দৃশ্যমান একব্যক্তি। তাই সবার এক মা, এক মত, এক ইচ্ছা, এক রুচি, এক দর্শন, এক শ্রবণ। এই এক মা, এক সন্তান, এক বিধান; স্বর্গেও একমেবাদ্বিতীয়ম্, মর্ত্তেও একমেবাদ্বিতীয়ম্। ইহাই প্রতিষ্ঠা করিতে নববিধানের অবতারণা। একত্বই ইহার বিধি, একত্বই ইহার নীতি, একত্বই ইহার প্রতিষ্ঠান। বহুত্ব, বহুজনমত, স্ব স্ব প্রাধান্য, স্বাধীনতা, স্বতন্ত্রতা, ভিন্নতা নববিধানের বিরুদ্ধ। বহুদেহধারী এক মাথা, একাত্মতা, এক নেতা নববিধানে; দশমাথা যেখানে, রাবণের রাজ্য সেখানে। সে রাবণ বধ করিতেই নববিধানের এক প্রাণারাম অবতীর্ণ। দশের মত এখানে নাই, দশে মিলে এক হইতেই হইবে। অন্যথা নববিধান হইবে না।

বিচার।

আমরা যখনই কাহাকেও বিচার করি, তখনই তাহাকে অমানুষ ভাবিয়াই বিচার করি, মানুষের চেয়েও তাহাতে শ্রেষ্ঠত্ব আরোপ করিয়া দেখিয়া থাকি; কাজেই সে ব্যক্তি যাহা নয়, তাহাই তাহাকে মনে করিয়া, তাহার কতই দোষ দুর্ব্বলতা ত্রুটী দেখিতে পাই, এবং কেন সে সমুদয় দোষ তাহাতে রহিয়াছে, এই বলিয়া তাহাকে দণ্ডিত করিতে বদ্ধপরিকর হই। তাই বিচার করা নিশ্চয়ই ভ্রান্তি-মূলক। মানুষকে মানুষ বলিয়া মনে থাকিলে, আর বিচার করা যায় না। মানুষ মাত্রেই যে দোষাশ্রিত, দুর্ব্বল, পাপসঙ্কুল, ইহা নিজকে দেখিলেই আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি; এবং আপনার শত দুর্ব্বলতাও যেমন উপেক্ষা করি, বিচার করি না, তেমনি অপর মানুষকেও মানুষ মনে করিলে, আর কি কাহাকেও বিচার করিতে পারি? শত দোষ ত্রুটী দুর্ব্বলতা ক্ষমা করিয়া আপনি যেমন আপনাকে ভালবাসি, তেমনি অন্যের সম্বন্ধে করাই আমাদের সমুচিত। এই জন্যই ঈশা বলিলেন, "অপরকে আত্মবৎ প্রীতি করিবে।" নববিধানের আচার্য্য আরও বলিলেন, "আপনার চেয়েও ভাইকে অধিক ভালবাসিবে।" বাস্তবিক বিচার যদি করিতে হয়, বরং নিজকে বিচার করিব; অপরকে ভালবাসিব, ভক্তি শ্রদ্ধা করিব, সেবা করিব, তার আনুগত্য স্বীকার করিব।

ভ্রাতৃত্ব-সাধন।

ধর্ম্মের সারতত্ত্ব সাধু বলিলেন, এক ঈশ্বর পিতামাতা, আর নরনারী সকলে ভ্রাতাভগ্নী। ঈশ্বর যে পিতামাতা, ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সকল বিধানই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ঈশ্বর যে আছেন, এবং তিনি যে সবার পিতামাতা, সকল ব্যক্তিই স্বীকার করেন, কোন ধর্ম্মাবলম্বীরই ইহার সম্বন্ধে দ্বিতীয় মত নাই। কিন্তু শাস্ত্রে, নীতিবিধিতে এবং মতে নরনারী যে ভাইভগ্নী ইহা স্বীকৃত হইলেও, কার্য্যতঃ ইহা এখনও কোন ধর্ম্মই প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। তাহা হইলে পৃথিবীতে এত বিবাদ বিসম্বাদ, যুদ্ধ বিগ্রহ, অশান্তি অকল্যাণ, পাপ ব্যভিচার, দুরাচার অনাচার অত্যাচার থাকিত না; প্রেম, সদ্ভাব ও শান্তিতে জগৎ পূর্ণ হইত। তাই বিধাতা সেই ভ্রাতৃত্বের মিলনস্থাপনের জন্যই বিশেষ ভাবে বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম-বিধান নববিধান লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। এ বিধানে কেবল ঈশ্বরের পূজায় সম্যক্ সাধন হইবে না। নরনারীকে যদি না ঈশ্বরখণ্ড বলিয়া পূজা করিতে, সেবা করিতে পারি, তবে যথার্থ জগতে ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা হইবে না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে সাধু ভক্তদিগকে ঈশ্বরখণ্ড, ঈশ্বরাবতার বলিয়া পূজা করা হইয়াছে; সে ভাবে পূজাও ঈশ্বরপূজা। সকল নরনারীই ঈশ্বরপুত্র, ঈশ্বরকন্যা, অতএব ভাই ভগ্নী, অথচ মানুষ এই বোধ থাকিবে; কিন্তু সবার ঈশ্বর-সন্তানের প্রতি যে শ্রদ্ধা ভক্তি পূজা সেবা, তাহা অধিকারে দিতে হইবে। এই জন্যই বর্ত্তমান যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক আপনাকে জগজ্জন ভাই বলিয়া আত্মপরিচয় দান করিলেন এবং সকল নরনারীকে আপন দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপে ভালবাসিলেন, সেবা করিলেন এবং সকলকে ব্রহ্মখণ্ড বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তিনি বলিলেন, "ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব জীবের মুখে দেখিতে হইবে। জীব-উৎপীড়নে, জীব-অপমানে কলঙ্কিত হইলাম। পরাৎপর পরব্রহ্ম জীবশরীরে আছেন, এ ভেবে জীবের সেবা করি নাই, দয়ার পাত্র ভাবিয়া সেবা করিয়াছি। হে জীব, ক্ষমা কর; হে ব্রহ্মের ক্ষুদ্র খণ্ড, দেবতার অংশ, তুমি ক্ষমা কর। তোমার যে টুকু নীচ, সে টুকু আমার দেখিবার নয়। যে টুকু ভাল, সেই টুকু আমার দেখিবার। হে কৃপাময়, জীবকে অপমান করিলে যে তোমার অপমান হয়, এইটি বিশ্বাস করিয়া, জীবকে যেন খুব ভালবাসি।"

বাস্তবিক বাহ্য দৃষ্টি ক্ষীণ হইলে, অদূরস্থ ব্যক্তিও কে কি, তাহা আমরা দেখিতে পাই না ; কেবল দেখি, একজন মানুষমাত্র। তেমনি কে কিরকম মানুষ না দেখিয়া, না বিচার করিয়া, যদি কেবল মানুষরূপে, ব্রহ্মসন্তানরূপে দর্শন করি এবং শ্রদ্ধা করি, তাহা হইলেই আমরা মানুষ, যে ব্রহ্মের প্রতিমা, উপলব্ধি করিয়া ধন্য হই।

শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দদেবের কন্যা মহারাণী সুনীতি দেবী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মহারাজা শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ যখন খুব অসুস্থ হইয়া পড়েন, তখন সমুদ্রতীরে বেক্‌সিন সহরে একটি বাড়ীভাড়া করিয়া অবস্থান করেন। মহারাণী সুনীতি দেবী প্রাণপণে তাঁর সেবায় নিরত হন ; তখনও তিনি জানেন নাই, অচিরে তাঁর ভাগ্যলক্ষ্মী পলায়ন করিবেন। একদিন মহারাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুনীতি, এখন তোমার কাজের প্রস্তাব কি ?" সুনীতি বলিলেন, "তোমার প্রস্তাব যা, তাই আমার, আমার আর আলাদা কি ?" মহারাজা তখন বলিলেন, "আমার যা করবার, তা ত সিদ্ধান্ত হয়েই গেছে ; এখন তোমার কি, বল " তখনও দেবী বুঝিতে পারেন নাই, বলিলেন, "কেন, তুমি একটু ভাল হলেই, তোমাকে নিয়ে দেশে যাব।" তখন মহারাজা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সহধর্ম্মিণীর দিকে প্রেমনয়নে এবং সন্তান সন্ততি ও অমাত্যগণের দিকে কত‌ই স্নেহনয়নে তাকাইলেন। আচার্য্যদেবের আলেখ্য দেখিয়া একবার মহারাণীকে বলিয়াছিলেন, "তুমি কার মেয়ে, মনে রেখো।" শেষ নিশ্বাসত্যাগের সময়ও চিরসঙ্গিনীর হাত জোরে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "হায় ! দুঃখিনী !" এই বলিয়া আচার্য্যদেবের মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে, "পরিণামে শান্তি" বলিয়া প্রার্থনা করিয়া দেহত্যাগ করিলেন। মুখে কি মৃদু হাসাই ফুটিয়া উঠিল !

সম্রাজ্ঞী [illegible] আলেকজান্দ্রা ও সম্রাট্‌ সম্রাজ্ঞী তখনই সংবাদ পাইয়া, মহারাণীকে সহানুভূতিসূচক তার পাঠাইলেন এবং মহারাজের যাহাতে সৈনিকসম্মানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়, তাহার অনুজ্ঞা পাঠাইলেন। ভাই প্রমথলালও তখন সেখানে ছিলেন, তিনিই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উপাসনা করেন ও মহারাজ রাজরাজেন্দ্র নবসংহিতার প্রার্থনাযোগে অগ্নিদান করেন। কোচবিহারে এই নিদারুণ শোক পৌঁছিবা মাত্র, সেখানকার প্রথানুসারে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আশ্চর্য্য, নাকি মহারাজার প্রিয় হাতীটি সে শোভাযাত্রায় দুনয়নে বারিধারা বর্ষণ করিতে করিতে যাইতেছে দেখা গিয়াছিল !

মহারাণী সসন্তানে স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিলে, কোচবিহারে নবসংহিতানুসারে শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ভ্রাতৃগণ সঙ্গে শ্রীরাজরাজেন্দ্রনারায়ণ প্রধান শোককারীর প্রার্থনা করেন। দারুণ বৈধব্য-যন্ত্রণা অনুভব করিয়া মহারাণী সুনীতি বলেন, "আগে স্বামী সঙ্গে যাঁহারা সহমরণ করিতেন, সে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেওয়ার যন্ত্রণা অপেক্ষা এ যন্ত্রণা সহস্রগুণ অধিক"। বাস্তবিক তখন রাজপুত্র ও রাজকন্যাদের লইয়াও তিনি যেন পৃথিবী অন্ধকারময় দেখিয়াছিলেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণের পরলোকগমনে শ্রীরাজরাজেন্দ্রনারায়ণই রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। রাজপুরোহিতগণ তাঁহাকে দেশাচার অনুসারে অভিষেকমন্ত্র পড়াইতে চাহিলে, রাজরাজেন্দ্র তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, "পুরোহিতের পর আর কে অভিষেক দিতে পারেন ?" তাঁহারা উত্তর করিলেন "আপনার রাজমাতা"। "তবে আমি মার নিকট অভিষেক লইব", এই বলিয়া মাতৃদেবীর নিকটই অভিষেক গ্রহণ করেন এবং নববিধানমতে এই অভিষেক-অনুষ্ঠান ব্রহ্মোপাসনা-যোগে সম্পন্ন হয়। দরবারে সিংহাসনে বসিবামাত্র যখনই তাঁহাকে পান আতর ও পুষ্পার্ঘ্য দেওয়া হইল, তখনই তাহা মাতৃদেবীকে দিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। বাস্তবিক তিনি বড়ই মাতৃভক্তিপরায়ণ সন্তান ছিলেন। সুনীতি দেবী পূর্ব্বে যেমন ভাবে থাকিতেন ও যেমন পেন্‌সন পাইতেন, রাজা তাহারই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

কিন্তু হায় ! তিনি ত আর অধিকদিন দেহে রহিলেন না ; দুই বৎসর পরই "আমার ডাক আসিয়াছে, আমার যে জন্যে আসা তাহা সম্পন্ন হইয়াছে" বলিয়া রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ দেহত্যাগ করেন।

শ্রীরাজরাজেন্দ্রনারায়ণ ত্রিশবর্ষের অধিক দেহে থাকিবেন না, ইহা পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারিয়া, বিবাহ করিতে সম্মত হন নাই ; কিন্তু দেহত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বেই, বরদারাজকুমারী শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর সহিত মধ্যম ভ্রাতা শ্রীমৎ জিতেন্দ্রনারায়ণের নববিধানপদ্ধতি অনুসারে বিবাহ দিয়া এবং তাঁহাকেই রাজপদে মনোনীত করিয়া পরলোক যাত্রা করেন।

স্বামি-শোকের উপর এই আদরের জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু-শোক যথার্থই মহারাণী সুনীতি দেবীর অন্তরকে একেবারে বজ্রসম চূর্ণ করিয়া দিল। রাজাকেও শেষ চিকিৎসার জন্য সুনীতি দেবী বিলাতে লইয়া গিয়াছিলেন, সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয় এবং সেই পিতৃশ্মশানেই তাঁহারও দেহ ভস্মীভূত হয়। কোচবিহারে তাঁহার নবসংহিতা অনুসারে শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণই প্রধান শোককারীর প্রার্থনা করেন।

এই প্রথম পুত্রশোকই মহারাণী সুনীতির জীবনে মহা আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তন আনয়ন করিল। এতদিন প্রায় দেশাচার অনুসারে অনেকটা অবরুদ্ধ ভাবে কাটাইতেন ; এখন হইতে প্রকাশ্য ভাবে ধর্ম্মের সেবায়, মণ্ডলীর সেবা ও নববিধানের সেবায় জীবন শেষ করিতে প্রণোদিত হন। ইহার পর চতুর্থ পুত্র হিতেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু, দ্বিতীয়া কন্যা প্রতিভার মৃত্যু, তাঁহার যাহা কিছু সংসারের বন্ধন ছিল, সকলই যেন কাড়িয়া লইল। তিনি এখন হইতে যেন শীঘ্র শীঘ্র পরলোকযাত্রার জন্যই প্রস্তুত হইতে আরম্ভ

করিলেন। তিনি বলেন, "এখন হইতে যেন অজানা দেশ অতি নিকট বলিয়া অনুভূত হইতে লাগিল। এখন আমার যাহা কিছু করিবার আছে, তাহা যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিতে পারি, তাঁহার চিন্তা করিতে লাগিলাম।"

দীন সেবক—প্রিয়নাথ মল্লিক।

১২ই মাঘের অভিনন্দন।

(নববিধান-ঘোষণা)

(১)

বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছেন, পৃথিবী প্রদক্ষিণপথে সময়ে সময়ে সূর্য্যের নিকটতর হয়। ভক্ত প্রমাণ করিলেন, যুগসমন্বয়ে অন্তররাজ্য স্বর্গরাজ্যের নিকটবর্ত্তী হয়। নবযুগে নবভক্তের জীবনে তাহা প্রমাণিত হইল; সেই সংস্পর্শে সামান্য দুর্ব্বল মানবজীবনেও তাহা অল্প পরিমাণে প্রমাণিত হইল। বিজ্ঞান এক নূতন আশ্চর্য্য জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ অবিষ্কার করিয়া জগৎকে চমৎকৃত করিলেন। যুগধর্ম্মের আবির্ভাবে জগতে যে নূতন আলোক আবিষ্কৃত হইল, তাহাতে সমগ্র মানবমণ্ডলী স্তম্ভিত, আশান্বিত ও ধন্য হইল। সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হওয়াতে ধরণী নানারূপে পরিবর্ত্তিত হইল। অন্তররাজ্যে মানবমণ্ডলী যুগধর্ম্মের প্রভাবে এক নূতন জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হইল। স্বর্গ হইতে নববিধান নূতন আশা, নূতন জ্ঞান, নূতন প্রেম লইয়া জগতে অবতীর্ণ হইলেন।

মানবহৃদয়ে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। নূতন ধর্ম্মের প্রকাশে নিরাশের আশা, শক্তিহীনের বল, পাপীর নবজীবন লাভ হইল। যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ব্রহ্মানন্দ ধর্ম্মরাজ্যে নূতন বার্ত্তা ঘোষণা করিলেন। নববিধানের আগমনে এক নবচেতনা মানবপ্রাণকে অনুপ্রাণিত করিল। নববিধানবিশ্বাসী ভাই বোন, আমরা আজ নিজ নিজ জীবনে যাহা দেখিয়াছি ও লাভ করিয়াছি, তাহা বিশেষভাবে স্মরণ করি। আজ বিধাতার নিকট ঋণ স্বীকার ও সাক্ষ্যদান করিবার দিন। জীবনের দিন যতই সংক্ষিপ্ত হইতেছে, ইহলোক ও পরলোকের সন্ধিস্থলে উপস্থিত হইয়া এক অপরূপ দৃশ্য দেখিতেছি। ইহজীবনের কার্য্যকলাপ ও নিত্যক্রিয়ার মধ্যে এক অদ্ভুত জীবনের সায় লাভ করিতেছি। মৃত্যুর আবরণ ভেদ করিয়া এক নূতন জ্যোতির্ম্ময় লোক প্রকাশিত। মর্ত্ত্যলোকের সীমাবদ্ধ জীবনের অন্তরালে এক মহাজীবনের আহ্বানে স্তম্ভিত হইতেছি।

কুটিরবাসী প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ-দর্শনে যেমন আনন্দিত হয়, বর্ত্তমান জীবনের অবসানে ভাবী রাজ্যের অতুলানন্দ-সন্দর্শনে প্রাণ পুলকিত। ইহজীবন ও পরজীবনের মধ্যে যে এক অপূর্ব্ব সংযোগ, যাহা মানবশক্তির উপর অধিষ্ঠিত, নববিধানের আলোকে তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত। পরলোক সুদূরে অবস্থিত নহে। ভবিষ্যতে যাহা পূর্ণতা লাভ করিয়া বিশ্বব্যাপী রাজ্য বিস্তার করিবে, সেই নববিধানের পুণ্যাশ্রমে স্থান লাভ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি। যে রত্ন রাজা সম্রাট্ ধনী জ্ঞানী লাভ করিয়া নিজেদের ধন্য জ্ঞান করিবেন, আজ আমরা সেই রত্নের অধিকারী। যে নববিধানের আলোকে সকল সংশয় বিদূরিত হইবে, সকল ভেদজ্ঞান ঘুচিবে, সকল তর্কের মীমাংসা হইবে, সকল সম্প্রদায়ে সমভাব ও প্রেম বিস্তারিত হইবে, সকল ধর্ম্মের লোক একস্বরে পরমজননীর গুণগান করিবে, সেই প্রাণের নববিধানকে আদরে আমরা জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্নবান্ হই। বিধানজননীর কৃপাই একমাত্র সম্বল, সেই কৃপার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারই চরণে প্রণত হই।

শ্রীমণিকা দেবী।

—০—

(২)

অসুস্থতা-নিবন্ধন আশঙ্কা হইয়াছিল, আজ এ আনন্দোৎসবে যোগ দিতে পারিব না; কিন্তু আজিকার দিনের আকর্ষণ অতিক্রম করিতে পারিলাম না। তাই কাতর দেহ ও ভগ্নকণ্ঠ লইয়া আপনাদের মাঝে উপস্থিত হইলাম, ভক্তকন্যার সঙ্গে আমারও নিবেদন জানাইবার জন্য।

স্বর্গের বাতায়ন মাঝে মাঝে প্রশস্তরূপে উন্মুক্ত হয়, বুঝি বা মর্ত্ত্যের লোকদের সেই দিব্যধামের আভাস দিবার জন্য। সেই আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষের স্বর্গরাজ্য হইতে বিকীর্ণ যে পুণ্যালোকচ্ছটায় নবযুগের ভারত প্লাবিত—তাহার গৌরবে জগদ্বাসীকে উদ্বোধিত করিতে—১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীব্রহ্মানন্দ দেবের সুগম্ভীর বাণী উচ্চারিত হইল:—"Behold that heavenly light in the midst of India! How bright! How beautiful! How it ascends, extends, and expands from day to day! Do you see it? It is the light of a *New Dispensation* vouchsafed by Providence for India's salvation." ভারতের মাঝে ঐ স্বর্গীয় আলোক অবলোকন কর! ইহা কি দীপ্তিময়, কি সুন্দর! ইহা কেমন উত্থিত হইতেছে, কেমন ব্যাপ্ত ও দিন দিন প্রসারিত হইতেছে। তোমরা কি ইহা লক্ষ্য করিয়াছ? ভারতের পরিত্রাণের জন্য—ব্রহ্মকৃপায় স্বর্গরাজ্য হইতে এক নববিধান অবতীর্ণ হইয়াছে—এ তাহারই আলোক।

ভক্তমণ্ডলী নববিধানের এই সুস্পষ্ট পূর্ব্বাভাস পাইয়া আশান্বিত হইলেন এবং ইহার পূর্ণ অভিব্যক্তি দর্শনেচ্ছায় ব্যাকুল ও তাহার ঘোষণা শ্রবণের জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন। ইহার পাঁচ বৎসর পরে, ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে, ২৫শে জানুয়ারী (১২ই মাঘ)—যে দিনের বার্ষিক উৎসব আজ অনুষ্ঠিত হইতেছে—শুভক্ষণে নবশিশুর জন্ম হইল। স্বর্গের উন্মুক্ত বাতায়ন দিয়া ব্রহ্মকৃপার জ্যোতিঃ মর্ত্ত্যে

আসিল ও শ্রীব্রহ্মানন্দদেবের হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়া ভক্তমণ্ডলীকে নিরুপম সৌন্দর্য্যের ছবি দেখাইল।

বৃষ্টির কণায় রবির কিরণ পড়িয়া কেমন আকাশ জুড়িয়া রামধনু দেখা দিল। বৈজ্ঞানিক বলিলেন, ঐ ইন্দ্রধনুকে ধরিবেন! এক স্ফটিক কাচের ভিতর সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিল,—আর সেই কিরণ অপূর্ব্বশোভন সপ্তবর্ণে পরিণত হইল! বৈজ্ঞানিকের স্ফটিক কাচের ন্যায়, পুণ্যসলিলবিধৌত ব্রহ্মানন্দহৃদয়ের মধ্যে স্বর্গের জ্যোতিঃ প্রবেশ করিল—আর দেখ, তাহা ভুবনমোহন নববিধানের অপূর্ব্ব ছটায় জগতে প্রকটিত হইল। বিশ্বাসিদল মুগ্ধ হইলেন। সমন্বয়ের ধর্ম্ম—প্রেমের ধর্ম্ম—জগতে প্রতিষ্ঠিত হইল। শ্রীব্রহ্মানন্দদেব সুমধুরকণ্ঠে বলিলেন—"The battle-cry is hushed, and the sword of sectarian hate has found rest in the sheath. No longer do we see scriptures arrayed against scriptures, churches against churches, sects against sects—endless groups of fighting zealots. It is one undivided spirit-world, in which there is neither caste nor sect nor nationality. This is heaven indeed."—সমরহুঙ্কার নিস্তব্ধ হইয়াছে, জাতিগত ঘৃণার অসি এখন স্বকোষে বিশ্রাম লাভ করিয়াছে। শাস্ত্রে শাস্ত্রান্তরে প্রতিকূলতা, বিভিন্ন ধর্ম্মালয়ে বিরোধ, দলাদলির বৈষম্য ও অসংখ্য গোঁড়ামীর যুদ্ধ এখন ঘুচিয়াছে। এক অখণ্ড অধ্যাত্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল, যেখানে বর্ণ, দল বা জাতির পার্থক্য নাই। এই ত স্বর্গরাজ্য।

নববিধানে সকল বৈষম্য মিটিল, সকল বিরোধ ঘুচিল। প্রেমের আগুনে গলিয়া সর্ব্বসমন্বয় সম্ভব হইল। নববিধানের নামান্তর প্রেমের ধর্ম্ম। নববিধানের প্রথম অক্ষর প্রেম—শেষ অক্ষর প্রেম—নববিধানের আদ্যোপান্ত প্রেমময়। নববিধানের মন্ত্র "প্রীতি[illegible] পরমসাধনং"। নববিধানের অনুজ্ঞা—প্রেমব্রত-গ্রহণ। [illegible] প্রেমপ্রাণ নববিধান-প্রবর্ত্তক প্রার্থনা করিলেন, "হে দয়াময়[illegible] প্রেমস্বরূপ, আদর্শ তুমি, গুরু তুমি, দৃষ্টান্ত তুমি, তোমার নাম প্রীতি, তোমার উপাধি প্রেম, স্বভাব তোমার দয়া, বস্ত্র তোমার করুণা। জগদীশ্বর, তোমার সকল স্বরূপের মধ্যে এই প্রেমটি সুখময়। তুমি নবধর্ম্ম পাঠাইয়াছ, পৃথিবীতে প্রেমের মিলনের জন্য। তুমি আচার্য্য হইয়া সর্ব্বাগ্রে প্রেমের মন্ত্রে আমাদিগকে দীক্ষিত করিলে। যখন ১৮০০ বৎসর পূর্ব্বে শিষ্য মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'প্রথম মন্ত্র কি'? তিনি বলিলেন, 'প্রেম'। সমুদায় শাস্ত্রের আগে প্রেম। অতএব তোমার নিকট প্রার্থনা, আমাদের ভিতর প্রেম প্রচার কর। কলহ বিবাদ মিটাইয়া দাও। মা, দয়া করিয়া তোমার বিধানের তরীকে বাঁচাও। আজ আমরা পৃথিবীকে সাক্ষী করিয়া প্রেমের নিশান ধরিলাম।"

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী হইল, শ্রীব্রহ্মানন্দদেবের বাণী নীরব হইয়াছে—কিন্তু সে আকুল প্রার্থনার প্রতিধ্বনি যুগযুগান্তর ভেদ করিয়াও বিধানবিশ্বাসীর হৃদয়ের দ্বারে আঘাত করিবে।

আজ আবার স্বর্গের বাতায়ন উন্মুক্ত হইয়াছে—বিধান-বিশ্বাসী দিব্যচক্ষে দেখিতেছেন—সে আনন্দলোকে শ্রীদরবার অধিষ্ঠিত—সেখানে আজ নববিধানের বৈজয়ন্তী উড়িতেছে। সে শ্রীদরবারে সকল যুগের সকল সাধু ত্রিলোকবিজয়ী প্রেমে মিলিয়াছেন। প্রেমময় কৃপা করিয়া নববিধানে সেই প্রেমের স্বর্গরাজ্য আমাদের মাঝে আনয়ন করুন।

শ্রীসুবোধচন্দ্র মহলানবিশ।

নববিধান-সাধন

(২৯শে জানুয়ারী, সন্ধ্যায়, ব্রহ্মমন্দিরে নিবেদিত)

আজ 'নববিধান' এমন মৃতপ্রায় কেন দেখা যাইতেছে? কারণ অন্বেষণ করিতে গেলে দেখা যায় যে, তাহার মূল 'অবিশ্বাস'। সত্য বলিলে, আমরা ভাবি, তাহা অসত্য। ভক্তের বাণীতে আমাদের আস্থা নাই। ভক্ত সাধকেরা নিজ নিজ সাধনের ফল যাহা নিজ নিজ জীবনে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা আপনার মধ্যে না রাখিয়া অন্যের উপকারের জন্য প্রকাশ করেন। ইহা বিধাতারই বিধি। কিন্তু আমরা এমন হইয়া পড়িয়াছি যে, তাহাতে কর্ণপাত করি না। অধিকন্তু তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিতেও চাই না।

আমরা নববিধানের লোক, নববিধানসমাজভুক্ত নিজেদের বলি; কিন্তু নববিধান বস্তুটা কি, তাহা কি জানি? এবং তাহা সাধন করিতেও আমরা একান্ত উদাসীন। আমরা একপক্ষে অতিশয় সৌভাগ্যশালী, কারণ আমরা যে সময়ে জন্মিয়াছি, সে সময়ে সাধনলব্ধ অনেক বিষয় আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। বিনা আয়াসে তাহা, আমরা ইচ্ছা করিলে, আমাদের উপকারে লাগাইতে পারি। অন্যদিকে আলস্যবশতঃ কিম্বা ইচ্ছার অভাবে আমাদের দুর্দ্দশার সীমা নাই। কত সাধু ভক্তের বহুদিনের সাধনের ফল আমাদের সম্মুখে। কত পুস্তকে তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, অন্য কত প্রকারে তাহা আমাদের সম্মুখে ও চারিদিকে জাজ্বল্যমান; অথচ আমাদের সেদিকে দৃক্‌পাত নাই। এত সুবিধা রহিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে কি? ঐ সকল বিষয়ে আমাদের ঘোর অরুচি। যেন মুখের কাছে আনিলেই গা বমি বমি করে। মুখের কাছে আনতে দিই না। শুষ্ক বুদ্ধিরূপ পিত্তে আমাদের মুখ ও উদর পরিপূর্ণ। যে সকল ঔষধে ঐ পিত্ত দমন হয়, তাহার উপর আমাদের ঘোর অবিশ্বাস। পীড়িতের যেমন ঔষধ-সেবনে বিরক্তি, আমরাও আধ্যাত্মিক ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া তাহার ঔষধ-সেবনে বিরক্ত। সাধনরূপ ঔষধি-সেবনে আমরা বড়ই নারাজ। ভক্ত সাধকদিগের অভিজ্ঞতা আমাদের

নিকট অবিশ্বাস ও উপহাসের বস্তু। নিজ শুষ্ক বুদ্ধি ও আত্মম্ভরিতার উপরই আমাদের প্রগাঢ় আস্থা। নববিধান ইহার বিপরীত কথাই প্রচার (নির্দ্দেশ) করেন। নববিধান বলেন—নিজ বুদ্ধি, মানুষের বুদ্ধির উপর নির্ভর করিও না—শুভবুদ্ধির সাগর দিব্য জ্ঞানের আধার হইতে কলস পূর্ণ কর। করিতে করিতে সকল অন্ধকার দূর হইবে। সকল ভ্রমের, সকল মায়ার, সকল দুর্দ্দশার অবসান হইবে।

আজ উৎসবের শেষ সীমায় আমরা উপনীত। মহোৎসব শেষ করিয়া শান্তিবাচন উচ্চারণ করিয়া গৃহে ফিরিব। কি লইয়া আমরা ফিরিব? ফিরিয়া গিয়া এক বৎসর ধরিয়া তাহার ফল ভোগ করিব, কিম্বা ঐ ফল হইতে বঞ্চিত থাকিব? আমাদের মন ও আত্মা যেরূপ রোগগ্রস্ত, তাহাতে ভয় হয় যে, উৎসবের দান আমাদের রুচিকর হইবে কি না? এখানে যে সকল স্বর্গের সমাচার পাইলাম, তাহা কি আমাদের প্রাণে বিদ্ধ হইয়া থাকিবে, কিম্বা বিস্মৃতির অতল তলে ডুবিয়া যাইবে? উৎসবের হাওয়ায় আমাদের প্রাণ তাহা ধারণ করিয়া রাখিতে প্রস্তুত হইয়াছে কি? সুস্থ অবস্থায় তাহা ধারণ করিতে সক্ষম বটে, কিন্তু আমাদের ত সুস্থাবস্থা নহে। যত প্রকার রোগ থাকা সম্ভব, তাহার সকল প্রকারই যে আমাদের রহিয়াছে। সত্যের অপলাপ, অপ্রেম, অধৈর্য্য, আলস্য, একাগ্রতার অভাব, পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, অমার্জ্জনা, একত্রে কার্য্য করিতে অক্ষমতা, সমন্বয়ের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সর্ব্ববিধ অসমন্বয়ের ভাব পোষণ, নিজ দোষদর্শনে অক্ষমতা বা ইচ্ছার অভাব, পরদোষদর্শনে তৎপরতা, পরদোষজপমালা, নিজ বুদ্ধির অভ্রান্ততা ও অন্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা-জ্ঞান, নিষ্ঠার অভাব, কুচিন্তা, কুঅভিপ্রায়, ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য, স্বেচ্ছাচারিতা, অহঙ্কার, দাম্ভিকতা, অসত্যব্যবহার, অবিনয়, বাহ্যাড়ম্বর, এই সমস্ত রোগ আমাদিগকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে। এতগুলি রোগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াও আমরা ভাবি যে, প্রতিকারার্থে আমাদের কোন ঔষধেরই আবশ্যক নাই। নিজ বুদ্ধির জোরে আমাদের জীবন এক রকম কাটাইয়া যাইতে পারিব। এক কথায় বলিতে গেলে, আমরা ভগবান্ হইতে ক্রমে বহুদূরে গিয়া পড়িতেছি। নববিধানরাজ্য হইতে ভাসিয়া বহুদূরে চলিয়া গিয়াছি। ক্রমে মহা আবর্ত্তের দিকে সবেগে দৌড়িয়া যাইতেছি। নিজের দোষগুলি আমরা প্রাণপণে লাঘব করিতে উদ্যোগী, এই ব্যাধি যে সকল উন্নতির অন্তরায়, তাহা আমরা ভুলিয়া যাই।

এই উৎসবকালে চারিদিক হইতে সাধক ও তৃষিত নরনারীর সমাবেশ হওয়ায়, এই মহামেলায় এক স্বর্গীয় ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে। আকাশের ঘন মেঘ কথঞ্চিৎ কাটিয়া গিয়া, আমাদের একটু জীবন সঞ্চার হইয়াছে। আমাদের রোগের ঔষধ যে আবশ্যক, তাহা মনে হইতেছে। ঔষধের বিষয় পরস্পরের মধ্যে আলোচনা হইতেছে। ঔষধের তালিকাও অনেক পাওয়া যাইতেছে। নববিধান-আয়ুর্ব্বেদে যে এ সব রোগের মহৌষধ আছে এবং তাহার প্রস্তুতির প্রক্রিয়া ও তাহার বিশেষ বিশেষ অনুপানের বিষয়ও অনেক আলোচনা হইতেছে। কিন্তু কেবল মাত্র বিবরণ আলোচনা ইত্যাদিতে, ঔষধের গুণ শ্রবণ দ্বারা রোগমুক্ত হওয়া সম্ভব নহে। ঔষধ প্রকৃত ভাবে প্রস্তুত ও তাহা সেবন আবশ্যক। উপযুক্ত ভাবে ঔষধ সেবন করিয়া যে সকল রোগী সুফল পাইয়াছেন, রোগমুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, তাঁহারা যে প্রক্রিয়ায় ঔষধ প্রস্তুত করিয়া ও যে ভাবে ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই সকল করা আবশ্যক। তাহা না করিলে, কিরূপে আমরা আশা করিতে পারি? কেবল মাত্র ঔষধের বিজ্ঞাপন পাঠ দ্বারা রোগের উপশম কি সম্ভব?

যাঁহারা ঔষধের ব্যবহার করিয়া হাতে হাতে ফল পাইয়াছেন দেখিতে পাইতেছি, তাঁহাদের কি প্রকারে অবিশ্বাস করিয়া চলিতে পারি? যাঁহারা ঔষধ নিজে ব্যবহার করেন নাই, কিম্বা কাহাকেও ব্যবহার করিতে দেখেন নাই, তাঁহাদের মুখে ঔষধের গুণ-বর্ণনা কোন কাজেরই নহে। আমাদের প্রকৃতি এতই বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে যে, যথার্থ অভিজ্ঞতা যাঁহাদের হইয়াছে, কুটতর্কের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ভ্রমপূর্ণ, ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করি, এবং অন্যের প্রকৃত অভিজ্ঞতাকে তুচ্ছ করিয়া নিজ আত্মম্ভরিতা ও কুটবুদ্ধিকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিই।

একজন একটী সুরসাল সুমিষ্ট ফল নিজে আস্বাদন করিয়া বলিতেছেন যে, ফলটী অতি মিষ্ট, এমন সুন্দর সুমিষ্ট ফল কখনও খাই নাই, ইহা অমৃততুল্য। আমরা কস্মিন্ কালেও যে ফল খাই নাই, চক্ষেও দেখি নাই, অথচ জোর গলায়, যিনি যথার্থই ঐ ফল খাইয়াছেন, আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহাকে মিথ্যাবাদী ভণ্ড বলিয়া সাব্যস্ত করিতে প্রয়াসী হই। সে বিষয়ে আমাদের কিছু মাত্র কুণ্ঠা নাই। আমরা এইরূপই বিকারগ্রস্ত হইয়াছি।

আমরা লঘুচিত্ততার পরিচয় দিয়া, ভিতরে প্রবেশ না করিয়া, কিম্বা যথার্থতত্ত্বের অনুসন্ধানে উদ্যোগী না হইয়া, কত সময়ে কত ভক্তের প্রতি অযথা রূঢ়বাক্য প্রয়োগ করি, তাঁহাদের যথার্থ স্বভাব বিকৃত করিয়া চারিদিকে রটাই, তাঁহাদিগকে লোকচক্ষে হেয় করিতে চেষ্টা করি, তাঁহাদিগকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করি, তাহা আর কি বলিব! ভক্তের অপমান, তাঁহাদের প্রতি অবিশ্বাস, তাঁহাদের বাক্য উপেক্ষা ইত্যাদি প্রকৃত পক্ষে আমাদের সকল উন্নতির পথে অন্তরায় হইয়াছে। এই রোগই আমাদিগকে নববিধান বুঝিতে অপারক করিতেছে। ভক্তের অপমানে ভগবানের অপমান। "যেখানে ভকতবৃন্দ সেইখানে ভগবান্।" ভক্তের অপমানে স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ হয়।

ভক্ত নিজের বুদ্ধিজাত কথা বলেন না। ভক্তিরাজ্যে শুষ্ক বুদ্ধির প্রবেশ নিষেধ। ভক্ত নিজেই বলেন যে, তাঁহার মুখ হইতে যে ভক্তিসম্বন্ধীয় কথা বহির্গত হয়, তাহা তাঁহার নিজের

কথা নহে। ভগবান্ তাঁহাকে দিয়া যাহা বলান, তিনি তাহাই বলেন, অতএব সেগুলি অভ্রান্ত—সাধারণ লোক তাহা শুনিয়া, বুঝিবার ক্ষমতার অভাবে তাহার মর্ম্মগ্রহণে অসমর্থ। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যখন বলিলেন, "যদি ঈশ্বরকে না দেখিয়া থাক, আমাকে দেখিলেই তাঁহাকে দেখা হইবে", "আমি যাহা বলিতেছি, তাহা অভ্রান্ত", তখন তাঁহাকে কতই না লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল। এই সকল উক্তি যে যোগস্থ অবস্থার কথা, তাহা বুঝিতে না পারিয়া, তাঁহাকে মহা অহঙ্কারী, দাম্ভিক এবং আবতারপদপ্রার্থী ইত্যাদি নানাবিধ বিশেষণে ভূষিত করা হইয়াছিল। তিনি দম্ভের কথা কিছু মাত্র বলেন নাই। সত্যের খনি হইতে যে সকল রত্ন পাইয়াছিলেন, তাহা নিজস্ব না করিয়া, নিজের বলিয়া দাবী না করিয়া, তাহা সকলের সম্মুখে ধরিয়াছিলেন মাত্র। তবু তাঁর নিস্তার নাই। এ প্রকার হয় কেন? নববিধান কি, তাহা না বুঝায়—যে শাস্ত্রপাঠে তাহা বুঝা যায়, তাহা পাঠ না করায়। আমরা নববিধানসমাজভুক্ত হইলেও, নববিধান কি, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করি না এবং নববিধানসাধনপথে যাই না। অহংকে নির্ব্বাণ করিতে পারি না, সে দিকে চেষ্টাও নাই। নববিধানে প্রবেশ করিতে পারিলে, আপাততঃ যাহা জটিল বোধ হয়, তাহা অতি পরিষ্কার হইয়া যায়। ভক্ত সাধকেরা প্রবেশ করিয়াই এমন সকল তত্ত্ব পাইয়াছিলেন, যাহা আমাদের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য। তাঁহারা যে সকল জিনিষের সুমিষ্ট আস্বাদন পেয়েচেন, তার আস্বাদন আমাদিগের নিকট অপরিচিত। তাঁহারা এই আস্বাদন পেয়েই, সকলকে তাহা উপভোগ কর্ত্তে না দেখে, তৃপ্তি পান নাই। স্বার্থপরের মত নিজেদের মধ্যেই তাহা রেখে দিতে পারেন নাই, তাহা প্রচার না করে থাকতে পারেন নাই। প্রচার করে গালাগালি খাইয়াও, প্রচারে নিরস্ত থাকিতে কিম্বা শিথিলতা দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহাদিগের ভিতর সাধনবলে যে সত্যের অবতরণ হয়, তাহা তাঁহারা প্রকাশ করেন এবং সকলকে সেই সাধন অবলম্বন করিয়া সেইরূপ ফললাভ করিতে আগ্রহ দেখান, যাহাতে তাঁহাদের ন্যায় সুখ শান্তি সকলে প্রাপ্ত হয়েন। নববিধানের লোকেদের এইতো সেই পথ। নববিধানের উদ্দেশ্য ইহাই। নববিধান সর্ব্বপ্রকার সত্যের সমষ্টি। ইহার রাজ্যে আসিতে হইলে, সর্ব্বপ্রকারে মনে, কার্য্যে, কথায়, চিন্তায় সত্যের আশ্রয় অবলম্বন করিতে হইবে। সত্যস্বরূপের রাজ্যে, তাঁহার বিধানে অসত্যের স্থান নাই। জীবনে দেখা যায়, একটু সত্যের দিকে অগ্রসর হইলেই, চারিদিক হইতে রাশি রাশি সত্য, স্বর্গের আলোক ও স্বর্গীয় ভাব স্রোতের ন্যায় আসিয়া, প্রাণের মধ্যে যেন বন্যার আবির্ভাব সৃষ্টি করে। তাই বলি, নববিধানসাধনের অন্যনাম সত্যসাধন। সত্যের প্রতি অনুরাগ যত বাড়িতে থাকে, ততই নববিধানে প্রবেশের দ্বার মুক্ত হয়। তখনই নববিধান যে কি অমূল্য ধন, তাহা বুঝা যাইবে এবং তখনই ইহার রসের আস্বাদন পাওয়া যাইবে। "নববিধান" শব্দ তখন আর কাণে কর্কশ বোধ হইবে না। তখন এই শব্দটী এত মিষ্ট, এত রসাল বোধ হইবে যে, আপনা হইতে ঐ শব্দ মুখ হইতে নির্গত হইতে থাকিবে। এত মিষ্ট ইহা যে, এই নাম না লইয়া পারা যাইবে না। অন্যের এই নাম ভাল লাগিবে না বলিয়া ইহার ব্যবহার কম কর—এই যে মানুষের শুষ্ক বুদ্ধির উপদেশ, তাহার কোন মূল্যই থাকিবে না।

মনুষ্যের পরিত্রাণের জন্য যে নববিধান অবতীর্ণ, এই নাম যে এত সুমিষ্ট, ইহা পূর্ব্বে তেমন বুঝিতাম না; সেজন্য ইহার মর্য্যাদা পূর্ব্বে তেমন করিতে পারি নাই। ক্রমে ভগবৎকৃপায় একটু একটু ইহার রসাস্বাদলাভ হইতেছে এবং ইহা যে কত মিষ্ট এবং ইহা ছাড়িয়া একপদও অগ্রসর হওয়া যায় না, বুঝিতেছি। এ অবলম্বন, এ আশ্রয় ছাড়া আমাদের গতি নাই। তাই সকলের চরণ ধরে মিনতি করিতেছি যে, এই উৎসব হইতে এই ব্রতটী লইয়া যান যে, সকলে একান্ত নিষ্ঠা, ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত নববিধানসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন।

সমগ্র জগতের উপহাস অত্যাচার যেন আমাদিগকে এই মহান্ সংকল্প হইতে এক চুলও হঠাইতে না পারে। আমরা কেবল ভগবানের কথা শুনিতে বাধ্য। মনুষ্যের শুষ্ক বুদ্ধির সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। ভগবৎ-প্রেরণার নিকট মনুষ্যের উপদেশ কিছুই নহে।

মা জগজ্জননী কৃপা করিয়া আমাদিগকে উপযুক্ত বল বিধান করুন, তাঁহার বলে বলী করুন এবং আমাদিগকে তাঁহার নববিধান সাধন ও প্রচার করিবার জন্য উপযুক্ত শক্তি প্রদান করুন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীহট্টে ব্রহ্মোৎসব।

আমি গত নভেম্বর থেকে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য শ্রীহট্টে আসিয়া জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দের সঙ্গে বাস করিতেছি। গত ত্রাধিকশততম মাঘোৎসব এবং স্থানীয় শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজের সপ্ততিতম ব্রহ্মোৎসবে আদ্যোপান্ত যোগদান করিয়াছিলাম। এতৎ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তালিকানুযায়ী উৎসবের বিবরণ প্রেরিত হইল।

এই উৎসব উপলক্ষে ভাগলপুর হইতে শ্রীমান্ প্রেমসুন্দর ও ময়মনসিং হইতে শ্রদ্ধেয় প্রচারক মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় ক্রমান্বয়ে আসিয়া, উৎসবকার্য্য ঈশ্বর-পরিচালিত হইয়া সমাধা করেন। সমুদয় ব্যাপারে ঈশ্বরের হস্ত দেখিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।

৫ই মাঘ, বুধবার—এই উৎসবের মধ্যে আমার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী নরেশনন্দিনীর পবিত্রস্মৃতি উপলক্ষে আমাদের বাসগৃহে প্রাতে উপাসনা হয়। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই অনুষ্ঠান অতি গাম্ভীর্য্যের সহিত সম্পন্ন করা হয়।

৬ই মাঘ, বৃহস্পতিবার—প্রাতে ৭॥৹টার সময় উৎসবের উদ্বোধন দীন সেবক কর্তৃক ব্রহ্মমন্দিরে করা হয়। সন্ধ্যা ৬॥টার সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতিসভায় বক্তৃতা হয়।

৭ই মাঘ, শুক্রবার—সন্ধ্যা ৬॥টার সময় স্থানীয় মুনসেফ শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাসের বাড়ীতে তাঁর স্বর্গস্থ পিতৃদেবের সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

৮ই মাঘ, শনিবার—সন্ধ্যা ৬॥টার সময় স্থানীয় রাজার স্কুলগৃহে "ধর্ম্মবিরোধ ও সামঞ্জস্য" বিষয়ে বক্তৃতা হয়। বক্তা অধ্যাপক ডাঃ প্রেমসুন্দর বসু। বক্তৃতা গভীর গবেষণাপূর্ণ ও সকলের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

৯ই মাঘ, রবিবার—প্রাতে ৭॥টার সময় ব্রহ্মমন্দিরে কীর্ত্তন ও তৎপরে উপাসনা। অপরাহ্ণ ৩.টার সময় বালকবালিকাগণের সম্মিলন। সন্ধ্যা ৬॥টায় কীর্ত্তন ও উপাসনা।

১০ই মাঘ, সোমবার—প্রাতে ৭॥টার সময় মন্দিরের উপাসনা দীনসেবক কর্ত্তৃক করা হয়। সন্ধ্যা ৬টার সময় ব্রহ্মমন্দির-প্রাঙ্গণে কীর্ত্তন ও তৎপরে মন্দিরে উপাসনা।

১১ই মাঘ, মঙ্গলবার—সমস্তদিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে কীর্ত্তনের পর শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের উপাসনা। ৩টার সময় আলোচনা ও পাঠ। তৎপরে ভিখারী বিদায়। সন্ধ্যায় কীর্ত্তন ও তৎপরে অধ্যাপক প্রেমসুন্দর বসুর উপাসনা। অদ্যকার সমুদয় ব্যাপারই সুন্দর হইয়াছিল।

১২ই মাঘ, বুধবার—প্রাতে ৭॥টায় Lt. Col. J. L. Senএর বাসভবনে পারিবারিক উপাসনা অধ্যাপক প্রেমসুন্দর বসু কর্তৃক সম্পাদিত হয় এবং নববিধান ঘোষণা করা হয় ও আচার্য্যের উপদেশ হইতে পঠিত করা হয়। সন্ধ্যায় মন্দিরে মহিলাগণের উৎসবের প্রার্থনা দীন সেবক কর্ত্তৃক করা হয় ও পরে অধ্যাপক প্রেমসুন্দর বসু কর্তৃক "ভক্তমাল" গ্রন্থ হইতে সাধু সাধ্বী নরনারীগণের জীবনবৃত্তান্ত পঠিত হয়। তন্মধ্যে করমৈতি বাইএর কৃষ্ণানুরাগ আখ্যায়িকা অতি সুন্দর হইয়াছিল।

১৩ই মাঘ, বৃহস্পতিবার—প্রাতে ৭॥৹টার সময় আমাদের বাসভবনে পারিবারিক উপাসনা শ্রদ্ধেয় মহিমচন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়। আমি প্রার্থনা করি এবং শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক প্রেমসুন্দর বসু আচার্য্য কেশবচন্দ্রের শেষ প্রার্থনা তাঁর উপদেশ হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যায় "আশীষ-ভবনে" (শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় Inspector of Schoolsএর বাড়ীতে) সঙ্গতসভার উৎসব সম্পন্ন করা হয়।

১৪ই মাঘ, শুক্রবার,—আখালিয়ার সর্ব্বানন্দ সদয় ভবনে কীর্ত্তন ও উপাসনা। সন্ধ্যা ৬॥৹টার সময়ে মন্দিরে শান্তিবাচন।

১৫ই মাঘ, শনিবার,—প্রাতে ৮টার সময় শ্রদ্ধেয় প্রচারক মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় মন্দিরে উপাসনা করেন ও সন্ধ্যায় "অতীতের ব্রাহ্মসমাজ" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

১৬ই মাঘ, রবিবার—আজ মন্দিরে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের সমস্তদিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে কীর্ত্তনান্তে উপাসনা মহিমচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় করিলেন। বৈকালে ৩টায় সময় শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত পাঠ ও আলোচনা। সন্ধ্যায় কীর্ত্তনান্তে উপাসনা শ্রদ্ধেয় মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় করিলেন। উপদেশ—"ব্রহ্মসঙ্গীতের মধ্যে ঈশ্বরের কৃপার পরিচয়"।

১৭ই মাঘ, সোমবার—প্রাতে ১০॥টার সময় সহর হইতে কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী এক পাহাড়ের উপর বৃক্ষতলে সকলে বসিয়া উপাসনা। অদ্য শ্রীপঞ্চমীর দিন। শ্রদ্ধেয় মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় সরস্বতীপূজা সম্বন্ধে স্ত্রীলোকদের আধ্যাত্মিকভাব বিষয়ে উপদেশ দেন। উপাসনা খুব সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। পরে নিম্নে অবতরণ করিয়া একস্থানে বৃক্ষতলে খেচরান্ন ভোজন করা হয়। একশতজন আন্দাজ উপস্থিত ছিলেন। বেলা ২॥টার সময় প্রত্যাগমন করা হয়।

১৮ই মাঘ, মঙ্গলবার—প্রাতে ৮টার সময় শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দেবের মালিনীতটস্থ উদ্যানে চন্দ্রাতপতলে উপাসনা মহেশবাবু করেন। সর্ব্বঘটে ব্রহ্মদর্শন, বিশেষতঃ প্রকৃতির মধ্যে—এইভাবে উপাসনা করা হয়। সন্ধ্যা ৬॥টার সময় বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বিগণের সম্মিলন রাজার স্কুলগৃহে হয়। বক্তৃতার বিষয়:—১ম, হজরত মোহম্মদের জীবনী ও ধর্ম্মোপদেশ; ২য়, যীশুখৃষ্টের জীবনী ও ধর্ম্মোপদেশ; ৩য়, ভারতের ব্রহ্মজ্ঞান।

২৩শে মাঘ, রবিবার—প্রাতে ৮টার সময় স্থানীয় ব্রহ্মমন্দিরে বৃদ্ধ সাধক শ্রীযুক্ত রামদয়াল দাসের (৬০ বৎসর বয়সে) দীক্ষাগ্রহণ অনুষ্ঠান শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়। রামদয়ালবাবু একজন প্রাচীন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম। তাঁর জীবনের ইতিহাস অলৌকিক কাহিনীতে পূর্ণ। দীক্ষার্থীর জন্য নূতন সঙ্গীত রচিত ও গীত হয়। সন্ধ্যায় কলিকাতা হইতে আগত শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পরিচালনায় সংকীর্ত্তনে ব্রহ্মোপাসনা হয়। ইহা এখানে একটি নূতন ব্যাপার। মন্দিরগৃহ লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

দীক্ষার সঙ্গীত।

(সুর—জয় জ্যোতির্ম্ময় জগদাশ্রয়, জীবগণ-জীবন)

আজ দীক্ষার দিনে, দীন সেবকে, কর প্রভু বর দান হে।
যেন, জগতের হিতে, পারি সমর্পিতে, তুচ্ছ মম এ প্রাণ হে॥
যেন, পারিগো পালিতে, কায়মনোচিতে, মঙ্গল তব বিধান হে।
যেন, দুঃখে সুখেতে, পারিগো গাইতে, কল্যাণ তব গান হে॥
ওহে! তব বাণী শুনে, চলিতে জীবনে, পাই যেন দিব্য জ্ঞান হে।
তুমি, হও হে আমার, ওহে প্রাণাধার! জীবনের লক্ষ্য,
ধ্যান হে॥
ওহে, করিতে নির্ভর, তোমার উপর, কর মোরে শিক্ষা দান হে!
যেন, পরীক্ষার মাঝে, পারি দেখাইতে, জীবনে তাহার
প্রমাণ হে॥

সর্ব্বোপরি হ'ক, তোমার করুণা আশা ভরসার স্থান হে।
তুমি বিনা এবে, কে রাখিবে বল, শরণাগতের মান হে॥

২৪শে মাঘ, সোমবার—প্রাতে ৭॥টার সময়, Lt. Col. J. L. Senএর বাসভবনে তাঁর স্বর্গগত পিতৃদেবের প্রথম সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠান শ্রদ্ধেয় মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্তৃক সম্পাদিত হয়। জ্যোতিলাল পিতৃদেবের জীবনী আবেগে অবরুদ্ধকণ্ঠে পাঠ করেন। সন্ধ্যায় সত্যেন্দ্রনাথের কীর্ত্তনে অনেকে অদ্ভুত হইয়াছিলেন। কীর্ত্তনান্তে হবিষ্যান্ন পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করান হয়।

বিনীত
শ্রীদামোদর পাল

ত্র্যধিকশততম মাঘোৎসবের বিবরণ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৯ই মাঘ, ব্রহ্মমন্দিরে সমস্তদিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে ৭॥টায় কীর্ত্তন। কীর্ত্তনান্তে ৮॥টায় উপাসনা আরম্ভ হয়। ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ এ বেলার উপাসনার কার্য্য করেন। তাঁহা কর্তৃক উদ্বোধন, আরাধনা, পাঠ ও উপদেশাদি তাঁহার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ও সরসতায় পূর্ণ ছিল। "বাল্যখেলা" আচার্য্যদেবের প্রার্থনা এবং "অখণ্ডজীবন" প্রতাপচন্দ্রের উপদেশ ও স্বর্গীয় প্রকাশচন্দ্রের উপদেশ তাঁহার পঠিত বিষয়ের মধ্যে বিশেষ উল্লেখের বিষয়। এই পঠিত বিষয় অবলম্বনে তিনি উপদেশ দান করেন। উপদেশের বিশেষ কয়েকটী কথা এখানে উল্লেখ করা গেল।

ব্রহ্ম যিনি ক্রমাগত বাড়িতে থাকেন, যিনি ফুরাইয়া যান না, সেই ব্রহ্ম আমাদের উপাস্য। অনন্ত ব্রহ্ম আপনাকে আপনি নিত্য অপরিবর্ত্তনীয়, কিন্তু সেই বৃহৎ ব্রহ্ম সাধকজীবনে বর্দ্ধনশীল। তিনি নিজগুণে দয়া করে নিত্য নূতন দর্শন দেন। তিনি সাধকজীবনে ক্রমাগত বাড়িয়া যান; মানবজীবনে তাঁহার ক্রমাগত বৃদ্ধিতেই মানবাত্মার ক্রমাগত বর্দ্ধনশীল অখণ্ড জীবন। সর্ব্বত্র, সকল ধর্ম্মবিধানে, সকল সাধু, ভক্ত, মহাজনের জীবনে তিনি বিরাজিত। সকল ধর্ম্মবিধান, সকল সাধু ভক্ত মহাজনদিগের জীবন, সকলই আমার জন্য, আমাদের জন্য। যত আমরা সকলকে গ্রহণ করি, ততই আমাদের জীবনে ব্রহ্মের বৃদ্ধিলাভ। যত গ্রহণ করি, ততই তিনি আমাদের মধ্যে বাড়িয়া যান, আমরাও বৃদ্ধি লাভ করি, বিরাট জীবন প্রাপ্ত হই। তোমরা মনে করিতে পার, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র মহাপুরুষ ছিলেন, তাঁহার জীবনে যে সাধন সম্ভব হইয়াছিল, আমাদের জীবনে কি করে' সে সাধন সম্ভব হবে? ঐ ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট প্রকাশচন্দ্র রায়ের কথা ভাব। তাঁহার উক্তিতে যাহা পাইলাম, তাহা ঐ অখণ্ডজীবন। আমাদের বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়, জীবনের বিভিন্ন স্তর আমাদের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া, মনে হয়, আমাদের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। এখন যে জীবন চলিতেছে, কাল আর থাকিবেনা। কিন্তু সকলই আমাদের মধ্যে থাকিয়া যায়, কিছুই আমরা হারাই না। স্বপ্নাবস্থায় তাহারা ফিরে আসে, তাহা দ্বারা প্রমাণ হয়, কিছুই আমরা হারাই না, সবই আমাদের মধ্যেই আছে। কিছুই আমরা হারাই নাই। পিতা, মাতা, বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয়, যাঁহাদিগকে হারাইয়াছি, কাহাকেও হারাই নাই। এ বৎসর যাঁহাদিগকে হারাইয়াছি, তাঁহাদের কাহাকেও হারাই নাই। সকলই আমাদের হয়ে, আমাদের মধ্যে আছেন। সেই অতীত জীবনে দেখেছি, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও রামকৃষ্ণ "মা আমাদের আমরা মায়ের" বলে' প্রমত্তভাবে নৃত্য করেছেন। সেই স্পর্শ এখনও পাই, হারাই নাই। তাই বলি, কিছুই হারাই নাই, হারাই না।

মধ্যাহ্ন ৩ ঘটিকায় মধ্যাহ্নের উপাসনা ভাই অখিলচন্দ্র রায় নির্ব্বাহ করেন। তৎপর পাঠ ও প্রসঙ্গ হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ, ডাক্তার অনুকূলচন্দ্র মিত্র পাঠের কার্য্য করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ, শ্রীযুক্ত বলরাম সেন, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রসঙ্গের কার্য্য করেন। জীবে ব্রহ্মে মিলনে স্বর্গের পরমানন্দ; ব্রহ্মের ভিতর দিয়া, নিঃস্বার্থ প্রেমের ভিতর দিয়া মানুষে মানুষে মিলনেও স্বর্গের পরমানন্দ। জীব ও ব্রহ্মে মিলনে, সেইযোগে মানুষে মানুষে মিলনে যে পরমানন্দের ব্যাপার, আমাদের এই উৎসবক্ষেত্র তাহারই শ্রেষ্ঠ নিদর্শন—ভাই গোপালচন্দ্র গুহের প্রসঙ্গের ভিতর এই কথা বিশেষ ভাবে ছিল। শ্রীযুক্ত বলরাম সেন যাহা বলেন, তাহার মর্ম্ম এই:—ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত মানবের ইচ্ছার মিলন করে' তাঁর সঙ্গে মিলন; সম্পদ, বিপদ সকলই তাঁর দান জেনে সম্পদ বিপদের মধ্য দিয়াও তাঁর সঙ্গে মিলন। মানুষে মানুষে কাজের ভিতর দিয়া মিলন, পৃথিবীতে ইহার বিপরীত ভাব আছে, পৃথিবীর কার্য্যক্ষেত্রে কত বিচিত্রতা আছে। ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিলে তাহার সহিত যথার্থ মিলন, তাঁর ভিতর দিয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিলে আমাদের মধ্যে যথার্থ মিলন। ভক্তি হইতে প্রেম শ্রেষ্ঠ। ভক্তির মধ্যে ছোট বড় ভাব আছে, প্রেমে একেবারে একভাবে মিলে যাওয়া, এক হয়ে মিলে যাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রবাবুর কথার মর্ম্ম:—শ্রীমদাচার্য্যদেবের কথায় জ্যেষ্ঠ ভাই সাধু মহাজনদিগের মধ্যে খৃষ্ট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, জড় জগতে যেমন সূর্য্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আচার্য্যদেব যে পথ দেখাইয়াছেন, সেই পথে গেলে মিলন হবে, স্ব স্ব ভাবে গেলে মিলন হবে না। ইহার পর ধ্যানের সময়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ধ্যানের উদ্বোধন করিলে কিছু কাল ধ্যান হয়, তৎপর তিনিই প্রার্থনা করেন। তৎপর কীর্ত্তন হয়। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কীর্ত্তনে নেতৃত্ব করেন। কীর্ত্তনান্তে ৬॥টায় উপাসনা আরম্ভ হয়। ভাই

অক্ষয়কুমার নধ এ বেলার উপাসনার কার্য্য করেন। তাঁহার স্বাভাবিক ভাবোচ্ছ্বাসে তিনি উদ্বোধন আরাধনার কার্য্য সম্পন্ন করেন। "নিত্য নূতন করি" আচার্য্যদেবের প্রার্থনা পাঠ করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মধ্যে নিম্নলিখিত কথাগুলি বিশেষ ভাবে ছিল।

আনন্দময়ীর উৎসব, মায়ের জয় গান করা, যাহাতে শোক, তাপ, দুঃখ, বেদনা সব চলিয়া যায়। গত বৎসর আমাদের মণ্ডলী ভেঙ্গে গিয়েছে। কতজনকে হারিয়েছি। ভাঙ্গা হাঁড়ি জোড়া লাগে না। জড় শরীর নশ্বর, তা ভেঙ্গে গেলে ফিরে পাই না। কিন্তু জড় শরীরের ভিতর যে আত্মা আছে, তাহা নিত্য অমর। ভূতত্ত্ববিদ্ যাঁরা, তাঁরা বাহিরের বিষয় লইয়াই থাকেন না, পৃথিবীর ভিতরেও রত্ন সংগ্রহ করেন। আজ আমরা কি সেই চক্ষু লাভ করিতেছি না, সেই দৃষ্টিতে দেখিতেছি না, যে দৃষ্টিতে বাহিরের রূপ আর থাকিতেছে না, আছে কেবল অপরূপ অরূপ আত্মা? আজ সকল ভাই বোনের ভিতর যদি আত্মার খোঁজ পাই, তবে দেখবো, আত্মায় আত্মায় যে যোগ, যে মিলন, তাহা চিরদিন থাকবে। প্রার্থনায় শুনলাম, ঈশা, গৌর চির নূতন। যদি আত্মার খোঁজ পাই, তবে দেখবো, ঈশ্বরের সব পুত্র কন্যা চির নূতন। মৃত্যু নাই, জীবনের শেষ নাই, লোকলোকান্তরে একই অখণ্ডজীবন নিত্য নূতন। উৎসবের প্রসাদরূপে যদি আমরা এই প্রার্থনার ভাব প্রাণে [illegible]রা যাই, আজ যদি সকলকে সেই ভাবে গ্রহণ করি, ভাই নূতন, ভগ্নী নূতন, মণ্ডলী নূতন—যদি এই আত্মার সম্পর্ক জেগে উঠে, আর সকল আত্মাকে নিত্য নূতনরূপে দেখতে পাই, তবেই দেখবো, ইহপরলোকে আমাদের অখণ্ড মণ্ডলী, কিছুই ভাঙ্গে নি। তবে আর নিরাশা কোথায়?

বেদী হইতে প্রার্থনার মর্ম্ম:—মা, নূতন ভাবে সকলকে মার্জ্জিত করে দেও। আজ উৎসবক্ষেত্রে যেন সকলকে নূতন করে পাই। তুমি নূতন হয়ে প্রকাশিত হও, আর সব নূতন হউক। জীবন, সংসার, গৃহ, পরিবার, দেশ, সব নূতন হউক। তোমার নিত্য নূতন প্রকাশে সব নূতন হউক। নববিধান জয়যুক্ত হউক। নববিধানের নিত্য নূতনত্বের ভিতরে ইহপরলোকে আমরা এক পরিবার হয়ে থাকি। (ক্রমশঃ)

—•—

একখানি পত্র।

শ্রদ্ধাস্পদ ধর্ম্মতত্ত্বসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন,

ধর্ম্মসম্বন্ধে আমার কোন অভিজ্ঞতা নাই, কিন্তু কিছু শিক্ষা পাবার ইচ্ছা সময় সময় মনে হয়, সেজন্য আপনার শরণ গ্রহণ করছি। আশা করি, আপনার বহুমূল্য সময়ের কিয়দংশ এ ধর্ম্মহীনের কথায় নষ্ট হ'লে আপনি অপরাধ নেবেন না। আমি একজন নববিধানাশ্রিত, তাতো আপনি জানেন। আর নববিধানের গৌরবকে আমি আমার নিজের গৌরব বলে মনে করি। নববিধানের আশ্রয়ে থেকে, সকল ধর্ম্মই যে সত্য, আর যুগে যুগে যে সকল ধর্ম্ম প্রচার হয়েছে, সে সমস্তই দেশ, কাল, পাত্র অনুসারে জীবের ও জগতের মঙ্গলের জন্য ভগবানের প্রেমের বিধান, এ বিশ্বাস লাভ করে'ছি। তাই সময়ে সময়ে যখন নববিধানবিশ্বাসীদের লেখায়, উপদেশে কিম্বা আচরণে ইহার অন্যথা দেখি, তখন তা বুঝতে না পেরে এক একবার সে সকলের অর্থ জানবার কথা মনে হয়। যখন নববিধান-শ্রীমন্দিরের বেদী থেকে, ধর্ম্মতত্ত্বপত্রিকায় ও অন্যত্র "হিন্দুধর্ম্ম সচ্চিদানন্দ ভগবানকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলেছেন," কিম্বা নব-বিধানপ্রচারের পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্ম "বিরামদায়িনী নিশ্চেষ্টতা" "কাপুরুষোচিত কর্ম্মত্যাগ", "একা একা নির্জ্জন সাধন, যাতে সাধারণের কোন কল্যাণ হয় না" এবম্প্রকার শিক্ষা ও ভাবই কেবল হিন্দুধর্ম্মের সাধনের উপায় ছিল বলে প্রচার করা হয়, তখন মনে হয়, শ্রীমদ্ভাগবতে, উপনিষৎ প্রভৃতিতে ও ভগবদ্গীতায় আমার নিতান্ত অসম্পূর্ণজ্ঞানে যে দেখি, ভগবানের অখণ্ড সচ্চিদানন্দ স্বরূপ কেমন উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত এবং বিশেষ করে' ভগবদ্গীতায় "বিরামদায়িনী নিশ্চেষ্টতা" "কাপুরুষোচিত কর্ম্মত্যাগের" কিম্বা এ রকম সকল ভাবের যে কেবল বিপরীত কথা ও বিশেষ নিন্দাবাদ দেখি, তখন নিজের বুঝবার ভুল হয়েছে মনে করে, প্রকৃত সত্য জানবার ইচ্ছা হয়। আপনি যদি দয়া করে আমায় প্রকৃততত্ত্ব বুঝিয়ে দেন ও যদি হিন্দুধর্ম্মপুস্তকের আমার উল্লিখিত ভাবের সমর্থনে উক্তি সকল, আমার সামান্য যা' কিছু জানা আছে তা', উল্লেখ করে আমায় প্রকৃত অর্থ বুঝিয়ে দেন, তা' হ'লে আমি অত্যন্ত কৃতার্থ হ'ব। তবে সংক্ষেপের জন্য বলা যায় যে, ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রত্যেকটীই এক একটী সাধনের স্তর এবং শেষ স্তরে যখন অনাসক্ত বৈরাগী সাধক—

"বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্‌কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥"

তখনও কর্ম্মত্যাগের কোন কথাই নাই, বরং ভগবানকে আশ্রয় করে' তাঁরই উদ্দেশে কর্ম্ম করার উপদেশ দিয়ে বলেছেন—

"সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥"

* * * *

"স্বভাবজেন কৌন্তেয়! নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥"

তার পরেও পরমপদপ্রাপ্ত সাধকের প্রতি সর্ব্বগুহ্যতম পরম উপদেশ-বাক্য বলেছেন—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

কিন্তু তখনও কর্ম্মত্যাগের কোন কথাই নাই এবং তখন ধর্ম্মপ্রচারব্রত গ্রহণ করবার উপদেশ দিয়ে বলেছেন—

"য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ॥"

কিন্তু তার পূর্ব্বে অশুচি, অনাচারী, অজ্ঞানীর প্রচারক বেশ ধারণ করে ধর্ম্মকে কলঙ্কিত করবার কোন উপদেশ দেখি নাই। আমার মনে হয়, অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত সাধকের জন্য গীতার উপদেশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপদেশ আর কোথাও নাই। আশা করি, আপনি দয়া করে, ধর্ম্মতত্ত্বপত্রিকায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে, আমার সত্যপ্রাপ্তির সহায়তা করবেন। ইতি।

১০৫নং অপারসার্কুলার রোড, কলিকাতা। — বিনীত শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসু।

পত্র-লেখক শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু ধর্ম্মতত্ত্বে তাঁহার পত্রের বিস্তৃত আলোচনা ইচ্ছা করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ধর্ম্মতত্ত্বে এ বিষয়ে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিতে অক্ষম। তাঁহার আলোচ্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে, শ্রীমন্দিরের বেদী হইতে, ধর্ম্মতত্ত্বপত্রিকায় ও অন্যত্র কখন কে কি ভাবে এই সকল প্রচার করিয়াছেন, তাহা ধরিয়া আলোচনা করিবারও উপায় নাই। তিনি যেমন সাধারণ ভাবে লিখিয়াছেন, আমরাও সাধারণ ভাবে দু'একটী কথা বলিতেছি।

"হিন্দুধর্ম্ম সচ্চিদানন্দ ভগবান্‌কে খণ্ড খণ্ড করে ফেলেছেন" এই কথা কিরূপ সঙ্গত, এই তাঁহার প্রথম কথা। গীতা বা বেদ বেদান্তের সত্য ধর্ম্ম লইয়া নয়, বঙ্গভারতের সাধারণ প্রচলিত এবং আচরিত ধর্ম্ম লইয়াই, সমাজসংস্কারের ভাবে এসব কথা বলা হয়, তাহা আমাদের স্মরণে রাখিতে হইবে। এ বিষয়ে "সেবকের নিবেদন" প্রথম খণ্ডের "এক কি তেত্রিশকোটী" হইতে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের উক্তি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:— "হিন্দুস্থান আপনার ব্রহ্মকে ভুলিয়া গিয়া তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন এক একটী রূপ স্বতন্ত্র মূর্ত্তিতে স্থাপন করিয়া পূজা অর্চ্চনা করিল। এই ভ্রমে মহা অনিষ্টের উৎপত্তি হইল। যাই বিভিন্নগুণ বিভিন্নরূপ ধারণ করিল, অমনি ব্রাহ্ম হিন্দুস্থান পৌত্তলিক হিন্দুস্থান হইল। পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করিবার জন্য এবং আদি সনাতন ব্রহ্মরূপকে সাকার গঠন হইতে প্রমুক্ত করিবার জন্য নববিধান স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইলেন।" উপরের লিখিত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের উক্তি পরিষ্কাররূপে প্রদর্শন করে, হিন্দুস্থান, ভিন্ন কথায় হিন্দুস্থানের সামাজিক আচরিত এবং প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম সচ্চিদানন্দ ভগবান্‌কে খণ্ড খণ্ড করে ফেলেছেন। প্রকৃত কথা এই, সুদীর্ঘ দিন হইতে হিন্দুস্থানের প্রচলিত এবং আচরিত ধর্ম্ম উপনিষদের ধর্ম্ম ও গীতার ধর্ম্ম হইতে কতকটা পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে এপর্য্যন্ত নবযুগের নবধর্ম্মপ্রচার-ক্ষেত্রে প্রচলিত পৌত্তলিকতা বা খণ্ড খণ্ড ভাবের পূজার প্রতিবাদ করিয়া, আবার অখণ্ড ঈশ্বরের পূজার প্রতিষ্ঠা জন্য, পূর্ব্বোক্ত ভাবের কথা বলা হয়, কি বলা হইয়া থাকে। ইহাতে প্রাচীন ভারতের উপনিষদ্ কি গীতা প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধে কিছু বলা হয় না, কিম্বা অন্য কোন প্রকৃত ধর্ম্মশাস্ত্র কি ধর্ম্মের বিরুদ্ধেও বলা হয় না।

তাঁহার দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়—"বিরামদায়িনী নিশ্চেষ্টতা" "কাপুরুষোচিত কর্ম্মত্যাগ" "একা একা নির্জ্জন সাধন, যাতে সাধারণের কোন কল্যাণ হয় না, এবম্প্রকার শিক্ষা ও ভাবই কেবল হিন্দুধর্ম্মসাধনের উপায় ছিল বলে প্রচার করা হয়"। প্রাচীন ভারতে এক সময়ে ধর্ম্মের ও কর্ম্মের উচ্চ যোগ ছিল, ধর্ম্মের উচ্চ নীতি অবলম্বনে কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইত, কর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ধরিয়া ধর্ম্মব্রত জীবনে উদ্‌যাপিত হইত, গীতাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহাই তো এখনও আমাদের জাতীয় গৌরব। "ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাত্তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ। যদ্যৎকর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥" এখনও নববিধান-ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতের অবলম্বিত এই উচ্চ আদর্শ আমাদের কর্ত্তব্যপথের আদর্শ। কিন্তু ভারতের সুদীর্ঘ জীবনে ধর্ম্মক্ষেত্রে কত বিভিন্ন ভাবের, বিভিন্ন আদর্শের, উচ্চ ও হীন কত ভাবের অভিনয়ই না হইয়া গিয়াছে। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্তের প্রণীত "ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়" গ্রন্থ যাঁহারা একটু পাঠ বা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মনে হীনভাবের অভিনয়গুলি স্মরণের বিষয় হইতে পারে। বঙ্গভারতের ধর্ম্ম ও সামাজিক জীবনের অধঃপতিত অবস্থায়, গৃহত্যাগী নানাশ্রেণীর সন্ন্যাসী ও ভেকধারী বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্যে এবং অনেক গৃহী ব্যক্তির মধ্যেও যেরূপ হীনভাবের অভিনয় হইয়া গিয়াছে ও এখনও অনেকস্থানে হইতেছে, পূর্ব্বোক্ত বাক্যগুলি সেই সকল দৃশ্য স্মরণ করাইয়া দেয় এবং সম্ভবতঃ সেই সকলের সংস্কার উপলক্ষেই এই সকল কথার প্রয়োগ হইয়া থাকে। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই পর্য্যন্ত।

শ্রীগোপালচন্দ্র গুহ।

সংবাদ।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান—গত ১২ই জানুয়ারী, ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ বসুর কন্যা এবং শ্রীমান্ নৃপেন্দ্রনাথ মিত্রের পত্নী শ্রীমতী ননীবালা মিত্র বি,এর, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান শান্তিকুটীরে নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। পিতা বিশেষ প্রার্থনা করেন। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন।

স্থানাভাবে এবার আর সংবাদ দিতে পারা গেল না।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক ১৮ই ফাল্গুন মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৮ ভাগ।
৫ম সংখ্যা।

১লা চৈত্র, বুধবার, ১৩৩৯ সাল, ১৮৫৪ শক, ১০৩ ব্রাহ্মাব্দ।
15th March, 1933.

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে নিত্য কর্ম্মঠ, জীবন্ত জাগ্রত পুরুষ! তোমার সৃষ্টিকার্য্যও যেমন নিত্য নূতন ভাবে চলিতেছে, সমস্ত বিশ্বজগতে তোমার লীলাখেলাও তেমনি নিত্য নূতন ভাবে চলিতেছে। সৃষ্টির ব্যাপারও যেমন সাধারণ ও বিশেষ, লীলার ব্যাপারও তেমনই সাধারণ ও বিশেষ। এই যুগকে তুমি বিশেষ ভাবে নূতন যুগে পরিণত করিয়া, এই যুগে তুমি নবযুগধর্ম্ম নববিধান প্রকটন করিয়াছ, এবং তোমার পুত্রকন্যাদিগের মধ্যে সেই লীলার ব্যাপার পরিচালন করিতে আরম্ভ করিয়াছ। আমরা এই নূতন যুগের মানুষ; যদি আমরা তোমার মনের মত নূতন না হই, তবে আমরা তোমারও হইলাম না, এ যুগেরও লোক হইলাম না, সত্যতঃ আমরা আমাদেরও হইলাম না। এ যুগ যে নূতন যুগ, তাহার প্রমাণ বাহ্যজগতে, অন্তর্জ্জগতে, আমাদের জীবনে ও গৃহ পরিবারে। আমরা নিতান্ত অযোগ্য, অপাত্র, অপরাধী হইয়াও, তোমার নবযুগের ও নবধর্ম্মের কত প্রসাদ সম্ভোগ করিতেছি, কত আশীর্ব্বাদ লাভ করিতেছি। সেই প্রসাদ ও আশীর্ব্বাদের মধ্যে, তোমার নব নব দর্শন ও তোমার নব নব বাণীশ্রবণ এবং নানা পরীক্ষার মধ্যে তোমারই বলে তোমার স্বর্গের ইচ্ছার অনুসরণ ও পালন সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ। তোমার এত প্রসাদ সম্ভোগ করিয়াও দেখিতেছি, এখনও আমরা কত দুর্ব্বল, কত মলিন। "বলেছ বলেছ তুমি হে, পাপী ডাকিলে আসিব আমি"।—যখনই অভাবে পড়িয়া, পরীক্ষায় পড়িয়া তোমায় ডাকি, তখনই আমাদের জীবনে তুমি স্বয়ং জীবন্ত জাগ্রত অনন্ত শক্তিময়, জ্ঞানময়, প্রেমময়, পুণ্যময়, আনন্দময় রূপে অবতীর্ণ হইয়া ঐ বাণীকে সত্য কর, সার্থক কর। আমাদের জীবন যে তোমার নিত্যলীলার ক্ষেত্র, তাহার সাক্ষ্য দান কর। যদি আমরা একাধিকবার আমাদের জীবনে তোমার এই অবতরণের সাক্ষ্য, কৃপার সাক্ষ্যলাভ করিয়া থাকি, তবে আশীর্ব্বাদ কর, আর যেন জীবনের পরীক্ষায় নিজেকে বিপন্ন মনে করিয়া হতাশ হইয়া না পড়ি, নিরাশার অন্ধকারে যেন ডুবিয়া না যাই। জীবনে যখন তোমার কৃপার প্রমাণ পাইয়াছি, তখন জীবনের সকল পরীক্ষায়, সকল অভাব অনটনে, তোমার শরণাপন্ন ভাল করিয়া হইব, প্রাণ খুলিয়া, প্রাণ ভরিয়া তোমাকে ডাকিব, তোমার নিত্যলীলাধীন হইয়া তোমারই দেওয়া নব নব শক্তিতে, নব নব বলে তোমার আদিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ধন্য হইব; এবং প্রত্যক্ষ করিব, অভাব, অনটন, বিপদ, পরী-

ক্ষার মধ্য দিয়াই, বিশেষভাবে আমাদের নিত্য নব জীবন, মুক্তির জীবন, অমরজীবন লাভ হয়। আমরা অবিশ্বাসী হইয়া, যেন আর জীবনের কোন অবস্থায় তোমার শরণাপন্ন হইতে, তোমার নিকট ব্যাকুল প্রার্থনা করিতে, তোমার লীলাধীন হইতে না ভুলি। তুমি এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

আমাদের দায়িত্ব।

ধর্ম্মক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব অতি গুরুতর। যুগে যুগে স্বর্গ হইতে পরিত্রাণপ্রদ ধর্ম্মবিধান জগতে সমাগত হইয়াছে। ধর্ম্মবিধানের প্রথম যুগ যাইতে না যাইতে, যাঁহাদিগের জীবন-যোগে নবভাবে একটী ধর্ম্মবিধান সমাগত হয়, সেই সকল মহাপুরুষদিগের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে, সত্যধর্ম্মবিধানের মধ্যে নানা প্রকার মানবীয় রুচি, ভাব ও সিদ্ধান্ত সকল প্রবেশ করিয়া, ধর্ম্মবিধানকে অল্পদিনের মধ্যেই বিকৃত করিয়া ফেলে। অন্ততঃ সর্ব্বসাধারণের সামাজিক জীবনের ধর্ম্ম, মানবীয় ভাব, রুচি ও বুদ্ধির সহিত মিশিয়া, স্বর্গীয় বিধানের তুলনায় হীন হইয়া পড়ে। এজন্য যাঁহাদের জীবন-যোগে স্বর্গের ধর্ম্মবিধান সকল সমাগত হয়, সেই সকল মহাপুরুষগণ ধর্ম্মকে বিশুদ্ধ রাখিবার অভিপ্রায়ে, আপনাদের জীবনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া যান, সংহিতার আকারে ধর্ম্মের মূল বিধি ও ব্রত নিয়মাদির ব্যবস্থা করিয়া যান এবং আপনাদের ছাঁচে অনুবর্ত্তিগণের ধর্ম্মজীবন যথাসম্ভব [illegible] করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহাদের যথেষ্ট সাবধানতা [illegible]ত্ত্বেও, জীবন্ত ধর্ম্ম জীবন্তভাবে বেশী দিন সাধারণ মানবমণ্ডলীতে তিষ্ঠিতে পারেনা, অতীত ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দান করে।

ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য যে, যতদিন কোন ধর্ম্মমণ্ডলীর নরনারীর জীবনে সাধনার তীব্রতা থাকে, ঈশ্বরের পূজা বন্দনা, ধ্যান ধারণা, পাঠ প্রসঙ্গ, সজনে নির্জ্জনে তাঁহার অনুধ্যান ও তাঁহাকে জীবনে চরিত্রে গ্রহণের ঐকান্তিকতা থাকে, ততদিন সে সমাজে ধর্ম্ম জীবন্ত থাকে। কেন না, নরনারীর ব্যক্তিগত জীবন লইয়াই পরিবার ও সমাজ। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে সাধনার তীব্রতা কমিয়া গেলে, আর সে সমাজে ধর্ম্মমণ্ডলী আশানুরূপ গঠিত হইতে পারে না। তাহার ফলে সামাজিক জীবনে জীবন্ত ধর্ম্মের স্রোতঃ বন্ধ হইয়া যায়; যাহা থাকে, তাহা গতানুগতিক বাহ্য আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র। এরূপ অবস্থায় ধর্ম্মসমাজ প্রাণহীন হইয়া পড়ে, সামাজিক জীবনে নানা প্রকার দুর্গতি উপস্থিত হয়।

ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের জীবনে যাহা ঘটিয়াছে, আমাদের ধর্ম্মজীবনে, আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে তাহা অবশ্যই ঘটিতে পারে, এ কথা স্মরণে রাখিয়া, আমাদের কত সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। আমরা জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসক, তিনি আমাদের ধর্ম্মপথে পরম গুরু, পরম সহায়, পরম নেতা। তাঁহার পদাশ্রয় ভাল করিয়া গ্রহণ করিলে, তিনি যেমন আমাদের ধর্ম্মপথে প্রয়োজনীয় শিক্ষক, সঙ্গী ও সহায় যোগাইয়া বাহিরের অভাব পূরণ করেন, তেমনি তিনি স্বয়ং আমাদের অন্তরে দিব্য বল দান করেন, দিব্য আলোক ঢালিয়া দিব্য চক্ষু উন্মেষ করেন, দিব্য দর্শন দিয়া, দিব্যবাণী শ্রবণ করাইয়া আশা উৎসাহদানে সাধনসিদ্ধির পথে অগ্রসর করেন। ইহাতো আমাদের জীবনের অল্লাধিক পরীক্ষিত সত্য।

তাঁহার দিক দিয়া অন্তরে বাহিরে কোন ত্রুটি নাই, ত্রুটী হইতে পারে না, ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্য। ত্রুটি যাহা কিছু হয়, আমাদের দিক দিয়া। ঈশ্বরের দিক্ হইতে আয়োজনের শুধু অভাব নাই তাহা নহে, তাঁহার দিক্ হইতে আমাদের সম্মুখে স্বর্গ মর্ত্তের সব লইয়া বিপুল আয়োজন উপস্থিত। সঙ্গীতে ঘোষিত হইল, "অনন্তের মহাপূজায় অনন্ত আয়োজন।" এত আয়োজন সাধনপথে সাধক সাধিকাদিগের জন্য আর কোন্ যুগে উপস্থিত হইয়াছে? তাই আমাদের বড় গুরুতর দায়িত্ব। ধর্ম্মের বিপুল আয়োজন আমরা পাইয়াছি বটে, কিন্তু ধর্ম্মের ক, খ, হইতে সাধন আমাদের প্রতিজনের অন্তর ক্ষেত্রে আরম্ভ করিতে হইবে; সকল দর্শন শ্রবণ, ইচ্ছাপালন, আত্মিক জীবনের ক্রমিক গঠনলাভ, সকল সাধন ও সিদ্ধি আমাদের প্রত্যেকের জীবনে নূতন করিয়া ফলাইয়া লইতে হইবে। ধারে কিছুই হইবে না, এইটীই আমাদের মৌলিক দায়িত্ব, ধর্ম্মজীবনের গোড়ার কথা।

আমরা বলিলাম, আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের ক, খ, হইতে আরম্ভ করিয়া, প্রত্যেক জীবনকে ক্রমাগত সত্যের পথে,

সাধনের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। এই নিরাকার চিন্ময়রাজ্যে সাধনের পথে ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মবাণী-শ্রবণই আমাদের প্রত্যেক জীবনে প্রধান ও প্রথম উপায়। ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মবাণীশ্রবণ এই দুয়ের উপর, আমাদের ধর্ম্মজীবনে বিশ্বাসের গঠন, ভক্তির উন্মেষ, জ্ঞানের উৎকর্ষ, যোগের সঞ্চার ও ক্রমোন্নতি, কর্ম্মের বল ও বিশুদ্ধতা সকলই নির্ভর করে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র Perception and hearing এই দুইকেই বিশ্বাসের মূলশক্তি ও ভিত্তিরূপে বর্ণনা করিলেন। বিশ্বাস আমাদের অন্ধবিশ্বাস নহে, জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত দর্শনে, জীবন্ত উপলব্ধিতে, জীবন্ত বাণীশ্রবণে বর্দ্ধনশীল জীবন্ত বিশ্বাস, অটল অচল বিশ্বাস। আমাদিগের প্রতিজনকে সত্য চিন্ময় ঈশ্বরের সত্য দর্শনের ক,খ, হইতে, সত্য চিন্ময় ঈশ্বরের সত্যবাণী-শ্রবণের ক,খ, হইতে আত্মিক ধর্ম্মজীবন আরম্ভ করিতে হইবে। এখনও বঙ্গ ভারতের সাধনক্ষেত্রে, বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায় মধ্যে, মূর্ত্তিপূজা অথবা বাহ্য মূর্ত্তির অবলম্বনে পূজাকে ধর্ম্মজীবনের ক,খ, অথবা সাধনপথের ক,খ, বলিয়া প্রচার করা হইতেছে। কিন্তু সর্ব্বদা স্মরণে রাখিতে হইবে, চিন্ময় সত্য ঈশ্বরের সত্য দর্শন এবং সত্যবাণীশ্রবণের আরম্ভিক ক,খ, হইতেই আমাদের আত্মিক ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ, এবং এই ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মবাণীশ্রবণের ক্রমবিকাশে, তাঁহার সঙ্গে আমাদের সত্য পরিচয়, বিচিত্র পরিচয়, আত্মীয়তা-স্থাপন ও আত্মীয়তার বৃদ্ধি। তাঁহার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধের শ্রেষ্ঠ পরিণতি হইতেই, যোগ, ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম্মের ক্রমবিকাশে, জীবনে শ্রেষ্ঠ সাধন ও উচ্চ সিদ্ধি লাভ হয়।

ঈশ্বর আছেন, তাঁহার জীবন্ত সত্তার উপলব্ধিতেই আমাদের জীবনে তাঁহার দর্শনের আরম্ভ। বিধি-নিষেধ-যোগে তাঁহার শ্রীমুখের বাণী আমরা জীবনের সকল স্তরেই শুনিবার অধিকারী। কাহার জীবনে, কোন্ অবস্থার ভিতর দিয়া, প্রথমে তাঁহার কোন্ সত্যবাণী সমাগত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু তাঁহার জীবন্ত, জীবনপ্রদ, শক্তিপ্রদ, অগ্নিময় সত্তার দর্শনপিপাসু সাধক-হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া, "আমি আছি"" আমি আছি" এই ধ্বনিতে যখন আশা ও উৎসাহপ্রদ আপনার বাণী তিনি প্রকাশ করেন, সাধকের আরম্ভিক জীবনে সে বাণীর গুরুত্ব গৌরব কে বর্ণনা করিবে? এই "আমি আছি" ধ্বনি শুনিবার অধিকার সকলেরই। যথাসময়ে ঈশ্বর-দর্শন পিপাসু প্রতি সরল সাধকের অন্তরেই এই বাণীর ধ্বনি হইয়া থাকে। এই স্বর্গের দিব্যবাণী-যোগে ঈশ্বরের দর্শন শ্রবণের সাক্ষ্যলাভ সকলেরই অধিকার। সার্ব্বভৌমিক সাধনপথের সার্ব্বভৌমিক এই ফললাভ সকলের ভাগ্যেই সম্ভবপর। "তোমার 'আমি আছি' ধ্বনি, তুমি শুনাও জীবে দিন রজনী।"—ইহা কেবল কবিত্বের শূন্যগর্ভ উচ্ছ্বাসপূর্ণ বাক্য নয়, কিন্তু ইহা নিত্য-কালের সত্য বেদবাক্য। ইহা এই নবযুগে প্রতি সাধক-জীবনের অভিজ্ঞতার সত্য সাক্ষ্যদানে প্রকাশিত। প্রেরিত-প্রবর প্রতাপচন্দ্র তাঁহার আত্মজীবনের অভিজ্ঞতা-পূর্ণ কথায় প্রকাশ করিতেছেন—"Yield thy whole nature to the sense of the Divine presence when it visits you; and believe me there is no man, sinner, mourner infidel or fool whom the spirit of God the veritable unspeakable presence, doth not at times visit and touch."—যখন পরমদেব তোমার নিকট প্রকাশিত হইয়া তাঁহার স্বর্গীয় সাক্ষাৎকার তোমাকে দান করেন, তখন তুমি তাঁহার বর্ত্তমানতার উপলব্ধির মধ্যে আপনার প্রকৃতিকে ঢালিয়া দাও; বিশ্বাস কর, এমন কোন পাপী, সমস্ত এমন কোন আক্ষেপকারী, এমন কোন অবিশ্বাসী, এমন কোন নির্ব্বোধ মানুষ জগতে নাই, যাহার নিকট ঈশ্বর পবিত্রাত্মারূপে সময়ে সময়ে প্রকাশিত না হন এবং তাহাকে আপনার দিব্য স্পর্শ দান না করেন।

এ যুগে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়াচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বলিলেন, "আমি পাপীর সর্দ্দার", "কেশবচন্দ্র সকলের নিকট আশার চন্দ্র" "যাহা আমার জীবনে সম্ভব হইয়াছে, সকলের জীবনেই তাহা সম্ভব হইতে পারে"। ঈশ্বরের কৃপার সীমা নাই, সাধুমহাজনদিগের জীবনের জীবন্ত দৃষ্টান্তের অভাব নাই, অপরদিকে আমাদের দায়িত্বেরও শেষ নাই। তাঁহার সত্যদর্শন, সত্যবাণী-শ্রবণ, তাঁহার স্বর্গের ইচ্ছাপালন ক্রমাগত জীবনে সাধন করিতে হইবে, সাধনের পর সাধন করিয়া নব জীবন লাভ করিতে হইবে, অনন্ত জীবনে অনন্ত মিলনে অগ্রসর হইতে হইবে। প্রাচীন একটি কথা আছে, "মা লক্ষ্মী, দয়া করো, তুমি একটু নড়ো চড়ো"। এই ছোট কথাটীর ভিতরে কি প্রকাণ্ড সত্য রহিয়াছে।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

নববিধানের আলোক কবে জ্বলিল ?

• যদিও ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী, ব্রহ্মমন্দিরে নববিধান-ঘোষণা হয়, কিন্তু নববিধানের আলোক নববিধানের প্রবর্ত্তক ব্রহ্মানন্দের ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ হইতেই তাঁহার হৃদয়ে জলিয়াছিল। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদে বৃত ছিলেন, তখনই "ইণ্ডিয়ান মিরার" পত্রে লিখিয়াছিলেন, "এই যুগধর্ম্ম ভারতের ভবিষ্যৎ ধর্ম্ম '*New Dispensation*' বা 'নববিধান'।" তখন হইতেই এই নববিধানের ভাব ক্রমে ক্রমে তাঁহার জীবনে ও সাধনে স্ফূর্ত্তি লাভ করিতেছিল। সুতরাং যাঁহারা শ্রীকেশবচন্দ্রকে খর্ব্ব করিবার জন্য বলিয়া বেড়ান, তিনি কোচবিহার বিবাহের অপরাধ ঢাকিবার জন্য "নববিধান" ঘোষণা করিলেন, কিম্বা যাঁহারা বলেন, পরমহংস রামকৃষ্ণের কাছে তিনি সমন্বয়ধর্ম্ম শিখিয়া তাহাই নববিধান বলিয়া প্রচার করিলেন, তাঁহাদিগকে সত্যের অনুরোধে, ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের *Indian Mirror* পত্রের ফাইল খুঁজিয়া পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন।

সুখের বিষয়, বর্ত্তমান সময়ে মহাত্মা গান্ধীর প্রেরণায় দেশে অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জনের জন্য বিশেষ ভাবে আন্দোলন হইতেছে। এই আন্দোলনের মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়া, অনেকে কোন কোন দেশনেতার উদ্দীপনী শক্তির উল্লেখ করিয়া, তাঁহাদিগকেই ইহার প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রশংসা করিতেছেন; কিন্তু যদি সত্যের অনুসন্ধিৎসু হইয়া আমরা অনুধাবন করি, তবে দেখি, জীবনের আচরণ দ্বারা নববিধানাচার্য্য কেশবচন্দ্রই বর্ত্তমান নবযুগে অস্পৃশ্যতা-নিবারণের প্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান প্রবর্ত্তক এবং হিন্দুনারীদিগের মধ্যে তাঁহার সহধর্ম্মিণী সতী জগন্মোহিনী দেবীই তাঁহার প্রধান সহায়। উভয়েই গোঁড়া হিন্দুপরিবার হইতে বাহির হইয়া কেশবচন্দ্র যখন "পিরালী" ঠাকুর পরিবারে গিয়া অন্ন গ্রহণ করিলেন, তখন তাঁহার বালিকা সঙ্গিনীও গোঁড়া হিন্দু সেন পরিবারের কর্ত্তাদিগের শত বাধা অগ্রাহ্য করিয়া স্বামীর অনুসরণ করিয়াছিলেন; এজন্য উভয়ে পরিবার কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও জাতিচ্যুত হন। আবার কেশবচন্দ্রই প্রথম কোচবংশীয় কুচবিহারের মহারাজাকে কন্যাদান করিয়া ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃকও পরিত্যক্ত হন। সুতরাং অস্পৃশ্যতা কার্য্যতঃ বর্জ্জন করিতে কে এত আত্মত্যাগ করিয়াছেন এবং কেই বা এমন উচ্চকণ্ঠে ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়া বলিয়াছেন—"মেথরের সঙ্গে কেন আপনাকে সমান করিনা? উপকারী বন্ধুরা ছদ্মবেশে উপস্থিত। উজ্জ্বল চক্ষে মেথরের ভিতরে ঠাকুরকে দেখিব। যাহারা বাড়ীর ময়লা পরিষ্কার করে, তাহার সামান্য নয়। যেমন মা বাপ উপকার করে, তেমনি চাকর চাকরাণী উপকার করে।" এমন উচ্চ শিক্ষা আর কে দিয়াছেন এবং এমন জাতিভেদের মূলে পদাঘাত করিতে কেই বা পারিয়াছেন?

সতীর মহত্ত্ব এত কেন ?

বৈরাগ্য-প্রণোদিত হইয়া ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র নব পরিণীতা পত্নীর সহিত প্রথম বহুদিন পরিচিত হন নাই। এমন সময় ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদে অভিষিক্ত হইবার জন্য তাঁহার ডাক আসিল। "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ" এই ধর্ম্মবাণী তাঁহার প্রাণে ধ্বনিত হইল। বিবাহিতা পত্নীকে ত্যাগ করিয়া কেমন করিয়া তিনি আচার্য্যব্রত লইবেন? বালিকা পত্নীকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "তুমি আমার সঙ্গে যাইবে কি, না?" একাদশবর্ষীয়া বালিকা অপরিচিত স্বামীর ডাক পরম স্বামীর ডাক বলিয়া অনুভব করিলেন, পরিবারের কর্ত্তাদের তীব্র প্রতিবাদ, ধন, মান, খ্যাতি, কুল ও ঐশ্বর্য্যের সমুদয় প্রলোভন অবাধে তুচ্ছ করিয়া স্বামীর সহিত গৃহত্যাগিনী হইলেন। তখনকার কালে সম্ভ্রান্ত হিন্দুমহিলাদের ভিন্নজাতির অন্নগ্রহণে জাতিচ্যুত হওয়া যে কি বিষম পরীক্ষা, তাহা এখন কে অনুভব করিবে? সেই ভীষণ ক্লেশে আত্মদান যিনি করিতে পারিয়াছিলেন, তিনি কি সামান্যা নারী? কোচবিহার বিবাহের অনলেও তিনি অগ্নিপরীক্ষা বহন করেন। তাহাতেই ব্রহ্মানন্দ তাঁহার সহিত অধ্যাত্ম উদ্বাহ সমাধান করিয়া স্বীকার করিলেন, "আমরা দুজনে একজন হইলাম। বামে বামা, অন্তরের অন্তরে ভগবান্, এই তিন জনে এক।"

"ধর্ম্ম-সাধন"।

(আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের সঙ্গতের আলোচনা)

৪৫সংখ্যা—১৫ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৭৯৪।

(গিরিধির ডাঃ ভি, রায় হইতে প্রাপ্ত)

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রশ্ন—আমরা ধর্ম্মজীবনে যথার্থ উন্নতি দেখিতে পাই না কেন?

উত্তর—ইহার দুটী কারণ আছে। ভার-গ্রহণের ও ভারপ্রদানের অভাবের জন্য আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন সংগঠিত হইতে পারিতেছে না। এই ভারের আদান প্রদানের উপরেই ধর্ম্মজীবনের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি নির্ভর করে।

প্র—আমরা ভারগ্রহণ কাহার করিব?

উ—ভারগ্রহণ নিজের জীবনের করিতে হইবে না, ভ্রাতা ভগিনীর ভার লইতে হইবে। ভাই ভগিনীর সেবা করিতে

আপনাকে বিশেষরূপে দায়ী মনে করিয়া, তাঁহাদের শরীর মন আত্মার সুখ ও উন্নতির জন্য যত্ন করাই ভারগ্রহণের প্রকৃত অর্থ।

প্র—আপনার জীবনের ভার কাহার উপরে অর্পণ করিব ?

উ—আমাদের জীবনের ভার আমরা নিজেও লইতে পারি না, আর কাহাকেও দিতে পারি না, তাহা একমাত্র ঈশ্বরেতে সমর্পিত হইবে। অনন্যগতি হইয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়া, শরীর মন আত্মার কল্যাণের জন্য সকল সময়ে, সকল অবস্থাতে একমাত্র তাঁহার প্রতি নির্ভর করা অর্থাৎ তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করাই ভারার্পণ।

প্র—আমরা কিরূপ ভাবে ভারগ্রহণ করিতে পারি ?

উ—আমাদের ভারগ্রহণের বিশেষ অভাব। ভ্রাতা ভগিনীর সেবার জন্য যে আমরা দায়ী, এই ভাবই আমাদের হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হয় নাই। আমাদের পিতা পরমেশ্বর সকল সন্তানের ভার লইয়াছেন। পিতার স্বভাবকে আদর্শ করিয়াই আমাদের উন্নতি লাভ করিতে হইবে। ভ্রাতা ভগিনীর কিছু না কিছু ভার বহন করা পিতার আদেশ। ভারগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের দান আসে; ধর্ম্মজগতে যিনি সাহায্য করিতে যান, তিনি সাহায্য প্রাপ্ত হন। কোন বন্ধু এক এক সময়ে এই অমূল্য সত্যটী বলিয়াছেন যে, "ঈশ্বর অবিশ্রাম দান করেন, কিন্তু কাপড়ে বাঁধিলে আর কিছুই দেন না।" বাস্তবিক যিনি দান পাইয়া দান করেন না, পরে তাঁহার দান পাইবার পথ রুদ্ধ হয়। মহাত্মা ঈশার এই উপদেশ যে, "হে জগতের পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত পথিকগণ। আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে শান্তি দান করিব। কিন্তু আমা হইতে একটী সহজ ভার লইতে হইবে"। ভার বহন না করিলে শান্তি লাভ হয় না।

প্র—যে ভারটী গ্রহণ করিলাম, তাহা ঈশ্বরাভিপ্রেত কি না, তাহা কিরূপে জানিতে পারিব ?

উ—যে ভারটী গ্রহণে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ভক্তি বাড়িবে ও তাঁহার নৈকট্য বোধ হইবে, তাহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য, তাহাতে নিশ্চয়ই কল্যাণ লাভ হইবে।

ভক্তের দীনতা।

জগতে পরম সুন্দর কে? কাহার সৌন্দর্য্য-জ্যোতিঃ সমুদায় সৌন্দর্য্যকে পরাস্ত করে, কাহার মুখ পানে তাকাইলে চক্ষু পরিতৃপ্ত ও প্রাণ শীতল হয়? সে ঈশ্বরের দীন ভক্ত। দেখ, তাঁহার দীনতাপূর্ণ মুখে কি সৌন্দর্য্যরাশি, কেমন পবিত্র জ্যোতিঃ, তাঁর কাতরতার মধ্যে কি লাবণ্য, অশ্রুধারার মধ্যে কেমন শোভা! তিনি যখন করযোড়ে অশ্রুপাত করিতে করিতে দীনভাবে পিতার দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকেন, তখন তাঁকে দেখিলে যে প্রাণ জুড়ায়, তাঁর চরণধূলি মাথায় করিতে যে ইচ্ছা হয়। পৃথিবীর সমুদায় সৌন্দর্য্য একত্র কর, ভক্তের সেই দীনতার সঙ্গে তুলনা হইবে না। কল্পনাতে কি কেহ এমন সুন্দর ছবি চিত্র করিতে পারে, যে সেই দীন ভাইয়ের মুখের সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে? কখনই না। তাঁর সেই ছিন্ন মলিন বস্ত্র এবং সেই ভিখারীর বেশের নিকটে রাজার মণিময় ভূষণ পরিচ্ছদও কিছুই নয়। এমন হইতে পারে, তিনি অন্ধ, খঞ্জ বা কুব্জ বা ব্যথিতকলেবর; অথবা এমন হইতে পারে, যে, তাঁহার বাহ্য আকৃতিতে কোনই মূল্য নাই। কিন্তু তথাপি দেখ, তাঁহার কেমন কান্তি, তাঁর মুখের কেমন আকর্ষণ! কেন তাঁকে এত মনোহর দেখি, কেন তাঁকে ভক্তি করিতে ইচ্ছা হয়, তাঁর কাছে কাছে থাকিতে কেন প্রাণ ব্যাকুল হয়? এমন দীনহীনকে দেখিবার জন্য চারিদিক হইতে সহস্র আবালবৃদ্ধ নরনারী কেন দৌড়িয়া আসে? সকলে মুগ্ধ অবাক্ হইয়া কি জন্য তাঁর মুখ নিরীক্ষণ করে? তাঁর মুখের একটা কথা শুনিয়া কেন লোকের চক্ষের জল বিগলিত হয়? এ কিসের আকর্ষণ? ইহার মধ্যে কি কোন পার্থিব কারণ বিদ্যমান? তাহা নয়। ভক্তের সেই মলিন বেশ ও দীনতার মধ্যে যে স্বর্গের লাবণ্য, তাঁহার মুখে যে পিতার প্রেমপূর্ণ অনন্ত মুখজ্যোতিঃ, চক্ষে পিতার পুণ্য দৃষ্টির আলোক পড়িয়া তাঁহাকে পরম মনোহর করিয়া তুলিয়াছে; তাঁর কথা যে পিতার প্রেমনিকেতনের সংবাদ, এইজন্য তাঁহার এত আকর্ষণ।

আমি আর কিছুই চাহি না, ঐশ্বর্য্যের বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ ধনী মানীদিগকেও ইচ্ছা করি না, জ্ঞানীদিগকে চাহি না; সেই দীন ভাইদিগকে চাহি। আমি তাঁহাদের কথা শুনিব, তাঁহাদের কাছে থাকিব ও তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া পিতাকে ডাকিব; তাহাতেই আমার স্বর্গ, তার মধ্যেই আমার মুক্তি। আমি ধনী হইতে চাহিনা, সেই দীনতা চাই, যাহা ভক্তদিগের জীবনে প্রকাশ পায়। ধনমানের সৌন্দর্য্য নয়, চির জীবন দেখিব, দীনতার কি শোভা! আমি তাহারই সাধন করিব, তাহা পাইলেই আমি পিতাকে পাইব, পিতার প্রেমরাজ্য আমার হইবে। দূর হউক ধনমান প্রভুত্ব, দীনতা আমার জীবনের ভূষণ হউক, পৃথিবীর ধূলির সঙ্গে আমার মস্তক অবনত থাকুক। আমি পিতার দ্বারে দীন ভিক্ষুক হইয়া যেন চিরজীবন থাকিতে পারি, তিনি এই আশীর্ব্বাদ করুন।

"যে চায়, সেই পাই"।

ঈশ্বরকে কে পায়? যে চায়, সেই পায়। এ কথা সহসা শুনিতে যেমন সহজ বোধ হয়, আশার সঞ্চার হয়, তেমনি ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া গভীর ভাবে দেখিতে হইলে যেন নিরাশ হইয়া পড়িতে হয়। যিনি বাক্য মনের অতীত, নিরাকার অনন্ত দেব, তাঁহাকে চাহিলেই পাওয়া যায়, এমন কথা কে বিশ্বাস করিতে পারে? জ্ঞানী পারেন? না; ধনী পারেন? না; ধনী, মানী, গুণী, জ্ঞানী, দরিদ্র মূর্খ রাজা নরনারী কেহই পারেন না। তবে কে পারেন? যিনি সরল সাধক, বিশ্বাসী ভক্ত, তিনি

পারেন। ঈশ্বরকে মুখে চাহিলে পাওয়া যায় না, মুখের চাওয়া চাওয়া নয়; হৃদয়ের চাওয়া চাই। নতুবা মুখে চাহিবে, "হে ঈশ্বর! আমি কেবল তোমাকেই চাই, আর কিছু নাহি চাই", হৃদয় অমনি ভিতর হইতে বলিয়া উঠিবে, "না, ঈশ্বর না, আমি কেবল তোমাকে চাই না, সংসারকেও চাই, সংসারের সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে চাই। সাংসারিক সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য তোমাকে চাই, নতুবা নয়। সংসারই আমার জীবনের লক্ষ্য, তুমি তাহার উপায়। তোমাকে আমি সেই জন্য চাই, সাংসারিক সুখ যেন পাই। তোমাকে ভিন্ন যদি তা পাই, তাহা হইলে তোমাকে আর কি প্রয়োজন? তোমার জন্য সংসার নয়, সংসারের জন্য তোমাকে চাই।" এই ভাবে চাহিলে অন্তর্য্যামীকে পাওয়া যায় না। হৃদয়নাথ হৃদয় দেখেন। যাঁর হৃদয় তাঁকে চায়, সেই তাঁকে পায়। সর্ব্বাগ্রে হৃদয়ের অভাব বোধ হওয়া চাই। অভাব বোধ না হইলে ব্যাকুলতা উপস্থিত হয় না। ব্যাকুলতা না হইলে প্রকৃত প্রার্থনা হয় না। প্রার্থনা যথার্থ না হইলে প্রার্থনায় ফল লাভ হয় না। ঈশ্বরের দান প্রার্থনা-সাপেক্ষ নহে। আমরা যদি প্রার্থনা না করিলে তিনি না দিতেন, তাহা হইলে আমাদের নামও থাকিত না। তিনি উদার করুণায় সকলি দিয়াছেন, কেবল প্রার্থনার অপেক্ষায় আপনাকে আপনার হাতে রাখিয়াছেন। না চাহিলে সকলি দেন, কেবল আপনাকে দেন না। যেমন পিপাসাতুর জল বিনা প্রাণে বাঁচে না, তেমনি ঈশ্বর বিনা যাহার প্রাণনাশ হয়, সেই চাইলে ঈশ্বরকে পায়। যে পর্য্যন্ত শঠতা, কপটতা পরিত্যাগ করিয়া, হৃদয়দ্বার খুলিয়া দিয়া, সরল অন্তরে ব্যাকুল হইয়া ঈশ্বরকে না চাহিব, সে পর্য্যন্ত বলিতে পারি না, "যে চায়, সেই পায়।"

ঈশ্বরকে লাভ করিবার নিমিত্তই আমাদের এই সংসারে আসা, আর কিছুর জন্য নয়। ধন উপার্জ্জন করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহা নয়; সাংসারিক অকিঞ্চিৎকর সুখ-ভোগই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, তাহাও নয়; ইন্দ্রিয় সেবা করাই যে আমাদের জীবনের কার্য্য, তাহাও নয়। এই সমস্ত ঈশ্বরপ্রাপ্তির এক একটী উপায়। ঈশ্বরলাভই আমাদের সমস্ত জীবনের কার্য্য ও লক্ষ্য। রোগীর পক্ষে ঔষধ-সেবন যেমন রোগ-শান্তির উপায়, তেমনি ঈশ্বরলাভ জন্য সংসার। পীড়িত ব্যক্তির ঔষধ-সেবনই উদ্দেশ্য নহে, তেমনি সংসার ভোগ ও ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করাই আমাদের উদ্দেশ্য নহে। যেমন ঔষধ-সেবন রোগশান্তির জন্য প্রয়োজন, তেমনি সংসারধর্ম্ম পালন করা ঈশ্বরলাভের জন্য আবশ্যক। ঈশ্বর যদি সাংসারিক সুখ দেন, ভালই; ঈশ্বরের দান অবনতমস্তকে গ্রহণ করিব এবং তাঁহার আদেশ অনুসারে তাহা উপভোগ করিব। ঈশ্বর যদি সংসারকে পরিত্যাগ করিতে বলেন, তৎক্ষণাৎ তৃণবৎ পরিত্যাগ করিব। ঈশ্বরকে লইয়া ইহকাল, পরকাল, অনন্তকাল থাকিব। প্রাণ দিয়া পরিত্রাণ লইব। যে সাধকের এইরূপ ভাব, পাপ তাঁহার সন্তাপদায়ক হয় না, তিনি পাপের সন্তাপক হয়েন। ছিদ্রান্বেষী পাপ ঈশ্বরপ্রাণ সাধকের অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইবার পথ না পাইয়া দূর হইতেই পলায়ন করে। পাপ কোন্ হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে? ইন্দ্রিয় ও সংসারাসক্তির সুতীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা যে হৃদয় সচ্ছিদ্র হইয়াছে। পাপান্ধকার দূর করিয়া দিয়া, ঈশ্বরের জ্যোতিঃ সাধকের হৃদয় নিত্য আলোকময় করিয়া রাখে। যাঁহার চরিত্র পবিত্র হইয়াছে, মনে মুখে কাজে যাঁহার মিল হইয়াছে, সেই মহাত্মাই বলিতে পারেন, 'ঈশ্বরকে যে চায়, সেই পায়'।

(ক্রমশঃ)

শ্রীব্রহ্মানন্দদেবের কন্যা মহারাণী সুনীতি দেবী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীমতী মহারাণী সুনীতি দেবী পুত্রকন্যা-শোকে আহত হইয়া হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে এই সময় লিখিয়াছিলেন, "আমি কতই সুখে সুখী হইয়াছিলাম, ভগবান্ কতই অমূল্য নিধি দিয়াছিলেন। আমাকে যে সুখের ঘর দিয়াছিলেন, তাহার চারিটী পাথরের মত দেওয়াল এবং ছাদটী শক্ত, যাহা আমাকে আশ্রয় দিয়াছিল, সে ছাদও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, দুইটী দেওয়ালও খসিয়া ভূমিসাৎ হইয়াছে। আমার শরীরের সকল শক্তিই যেন চলিয়া গিয়াছে। জানিনা, কেন এতদিন আমি বাঁচিয়া আছি। সে সুখের স্মৃতি চলিয়া গিয়াছে। এখন যেন আমি অন্য এক জগতে বিচরণ করিতেছি। জীবনের স্রোতঃ দুঃখে শোকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলিয়া যাইতেছে। আমার এখন এই মাত্র সাধ, যেন শেষ কটা দিন আমার আত্মীয় স্বজনদের ও আমার নববিধানমণ্ডলীর সেবায় কাটাইয়া যাইতে পারি।"

তিনি অন্যত্রও লিখিয়াছেন, "মৃত্যু যেন পরলোকের দ্বার আমার জন্য আরও একটু বেশী করিয়া খুলিয়া দিয়াছে, আমার প্রিয়জনেরা যেন আরো একটু নিকটতর হইয়াছে।" যখন এ সব কথা লেখেন, তখনও তিনি মনে ভাবেন নাই, তাঁহার "প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহের" আর একটি দেওয়ালও অচিরে ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে।

যাহা হউক, তখনও তাঁহার কতই আশা, স্নেহের সন্তান জিতেন্দ্রনারায়ণ দীর্ঘজীবী হইয়া, রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, কোচবিহারে পিতৃদেবের আশানুরূপ রাজ্য পালন করিবেন এবং তাঁহার কীর্ত্তি সকল অক্ষুণ্ণ রাখিবেন। মহারাজকুমার ভিক্টর বাবাও তাঁহার সহযোগী হইয়া, দুই সহোদরে রাজ্য পরিচালন

করিবেন, এই আশাতে তাঁহারও বিবাহ নবসংহিতানুসারে দিয়াছিলেন।

বাস্তবিক মহারাণী ইন্দিরা দেবীর সাহচর্য্যে, শ্রীমান্ জিতেন্দ্রনারায়ণ যথার্থ ই পিতৃ-ভ্রাতৃ-বৎসল হইয়া, রাজ্যের সুশাসন ও পালনে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রথম নবকুমারের জাতকর্ম্মানুষ্ঠান নবসংহিতানুসারে এ দীন সেবক দ্বারা সম্পন্ন হয়, মহারাণী মাতা সুনীতি দেবীও প্রার্থনা-যোগে কতই আশীর্ব্বাদ করেন।

ইহার অনতিবিলম্বে কোন রাজকীয় দুর্ঘটনাবশতঃ, নববিধান-সমাজের একনিষ্ঠ সেবক এবং সম্পাদক কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ সাহেবকে সপরিবারে রাজ্যত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতে হয়। তখন মহারাজকুমার ভিক্টর বাবা সম্পাদকের কার্য্যভার লইয়া সমাজপরিচালনে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় শ্রীমান্ জিতেন্দ্রনারায়ণের সমাধিপ্রতিষ্ঠাকালে, কোন প্রচারক তথায় উপস্থিত না থাকায়, জিতেন্দ্রনারায়ণ স্বয়ংই নবসংহিতার প্রার্থনা পাঠ করিয়া সমাধিতে ভস্মস্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু জানিনা, কি দৈব দুর্ব্বিপাকে মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণের নববিধানের প্রতি আস্থা ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইতে আরম্ভ হইল।

মহারাণী সুনীতি দেবীর মণ্ডলীর সেবা-স্পৃহা তখন হইতে বিশেষ ভাবে উদ্দীপিত হয়। যখন তিনি ১৯১৪সনে লক্ষ্ণৌয়ে নববিধানসংঘ উপলক্ষে সভানেত্রীর পদে বৃত হন, তখন হইতে তিনি কতই নূতন নূতন সঙ্গীত রচনা করিয়া এবং কতই নূতন নূতন অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন দ্বারা মণ্ডলীতে নব জাগরণ সঞ্চার করেন।

প্রাচীন পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক গল্প সকল কথকতাচ্ছলে অভিভাষণ করা তাঁহার প্রচারের বিশেষ অঙ্গ ছিল। এমন সুললিত ভাষায় ও স্বাভাবিক পৈতৃক মধুরকণ্ঠে যখন কথকতা করিতেন, শত সহস্র শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধচিত্তে শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইত। উপাসনা প্রার্থনাও বেশ মিষ্ট ও ভক্তিগদগদভাবে সম্পন্ন করিতেন। আর্য্যনারীসমাজের উৎসবে প্রতি বৎসরই এক একটি সুন্দর উপদেশ দিতেন।

উৎসব-উপলক্ষে প্রতিবর্ষে কমলকুটীরের ছাদে ও নবদেবালয়ে নিশান-উত্তোলন, ঠিক নববর্ষের আরম্ভ-মুহূর্ত্তে রাত্রি ১২টা বাজিবা মাত্র ঘড়ী ধরিয়া হয়; অতি নিষ্ঠার সহিত তিনি তাহা সম্পন্ন করাইতেন। উৎসবের নিশানবরণ ও নবদেবালয়ের দৈনন্দিন ফুল সাজান এবং অন্যান্য পারিবারিক অনুষ্ঠানগুলি যাহাতে নিয়মিত নিষ্ঠার সহিত পবিত্রভাবে সম্পাদিত হয়, তাহার জন্য তাঁর কতই আগ্রহ। ভাই ফোঁটা ও বিশেষভাবে নববিধান-ঘোষণার সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে আনন্দমিলনে, আপনার সহোদর ভ্রাতাদিগের সঙ্গে মণ্ডলীর ভ্রাতৃগণকে চন্দনের ফোঁটা দিয়া ভ্রাতৃসম্ভাষণ করা মহারাণী সুনীতি দেবীর এক বিশেষ সাধন ছিল।

লক্ষ্ণৌ সংঘের পর গিরিধি ব্রহ্মমন্দিরপ্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানও মহারাণী সুনীতি দেবীর দ্বারা সম্পাদিত হয়। তাহার পর ১৯১৫সালের মহোৎসব উপলক্ষে, মহারাণী সুনীতি দেবী ও মহারাণী সুচারু দেবী উভয়েই প্রকাশ্য ভাবে ব্রহ্মমন্দিরে সেবিকা-ব্রত যখন গ্রহণ করেন এবং সাশ্রুলোচনে প্রার্থনা-যোগে প্রেরিত অভিভাবক ভক্তিভাজন "কাকাবাবু" কান্তিচন্দ্র যখন তাঁহাদিগকে উপস্থিত করেন, তখনকার সে পবিত্র দৃশ্য যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা তাহাতে ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা স্মরণ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কোচবিহার-বিবাহের সময় দেবী সুনীতিকে বলিয়াছিলেন, "আমি রাণী চাই না, আমি চাই ঈশ্বরের দাসী"। মহারাণীদ্বয়ের সেবিকা-ব্রত-গ্রহণে ভক্ত পিতৃদেবের সেই অনুজ্ঞা কার্য্যতঃ সম্পাদিত হইতে দেখিয়া, কোন্ বিশ্বাসীর প্রাণ না মুগ্ধ হইয়াছিল? মহারাণী হইয়া সেবিকা-ব্রতধারিণী ঈশ্বরের দাসী হইলেন, ইহা নববিধানের এক নূতন ব্যাপার। দেবী সুনীতি ইহাই তাঁর ঈশ্বরদত্ত ব্রত বিশ্বাস করিয়া, এতদনুসরণে সমস্ত শেষ জীবন যাপন করেন।

নববিধানের ঈশ্বর এবং মণ্ডলীর সেবায় এই ভাবে জীবন উৎসর্গ করিলেও, তাঁহার জীবনের পরীক্ষা তখনও শেষ হয় নাই। তাই বুঝি, তাঁর দ্বিতীয় অঞ্চলের নিধি, বৃদ্ধ বয়সের যষ্টি, ভবিষ্যৎ জীবনের আশা, কোচবিহারের রাজসিংহাসনে ব্রহ্মানন্দের পবিত্র রক্তবিন্দু মহারাজা শ্রীমৎ জিতেন্দ্রনারায়ণকেও ভগবান্ অকালে তুলিয়া লইলেন। প্রথম মহারাজকুমার রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ যেমন পিতামাতার পরম আদরের, মধ্যম মহারাজকুমার জিতেন্দ্রনারায়ণও কম আদরের ছিলেন না। প্রথম রাজকুমারের জন্মে যেমন আনন্দোৎসব, দ্বিতীয় রাজকুমারের জন্মেও ততোধিক; কেন না, তিনি জন্ম গ্রহণ না করিলে, হয় ত বিরোধিগণের ষড়যন্ত্রে, মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হইতে হইত ও সুনীতিকে সপত্নীর ঈর্ষা সহিতে হইত। তাই জিতেন্দ্রনারায়ণের কত অধিক আদর। তাহার উপর রাজকার্য্যের পরিচালন, শিক্ষার সহিত ইংরাজী পদ্যরচনা, গ্রন্থরচনা ইত্যাদি ও বিনয় সরলতা শিষ্টাচার দয়া দাক্ষিণ্যাদি কত গুণেই তিনি ভূষিত হইয়াছিলেন! এমন আদরের গুণধর পুত্রের পরলোকগমনে, বিশেষতঃ জিতেন্দ্রনারায়ণ যে বিদুষী পরমাসুন্দরী বরোদারাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া, তাঁহার সহায়তায় রাজ্যের কতই কল্যাণ-সাধনে নিরত হইয়াছিলেন, সেই বধূও অকালে বিধবা হইলেন বলিয়া, এই শোককর ঘটনা যথার্থই বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় মহারাণী সুনীতির প্রাণকে একেবারে ক্ষত বিক্ষত করিল। ইহার সঙ্গে ভগ্নীদ্বয়ের বৈধব্য অর্থাৎ ময়ূরভঞ্জের মহারাজা শ্রীরামচন্দ্রের আকস্মিক মৃত্যু ও কুমার গজেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু এবং পুত্র ভিক্টরের পারিবারিক পরীক্ষা ও তাঁহার প্রথম পুত্র সন্তানের বিয়োগ মহারাণী সুনীতির প্রাণের প্রত্যেক পঞ্জরাস্থি পর্য্যন্ত যেন চূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। অন্য কেহ হইলে, এত দূর পরীক্ষা বহন করিতে পারিত কিনা, জানি না। কিন্তু এ সকল সহ্য করিয়াও তিনি জীবন্ত বিশ্বাস

কখনও হারান নাই এবং তাঁহার গম্ভীর বিষাদবিনিন্দিত অধরে মধুর হাস্য কখনও পরিত্যাগ করে নাই।

(ক্রমশঃ)

দীন সেবক—প্রিয়নাথ মল্লিক।

ব্রাহ্মিকাসমাজের উদ্দেশ্য।

(শান্তিকুটীর, ১৮ই জানুয়ারী, ১৯৩৩)

শ্রীমদ্ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ভারতাশ্রমে, ১৯শে মার্চ্চ, ১৮৭৪ সনে প্রদত্ত উপদেশ পাঠ ও স্থানে স্থানে তাহার ব্যাখ্যানসূত্র নিম্নলিখিত ভাবের কথাগুলি বলা হয়।

ব্রাহ্মিকাসমাজ বৎসরান্তে একটী প্রাণহীন মৃত অনুষ্ঠান মাত্র নহে। ইহার যে জন্য উদ্দীপন, তাহা স্মরণে রাখা নিতান্ত প্রয়োজন। শ্রীমদাচার্য্যদেব যে জন্য ইহা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করা ও ভাবিয়া দেখা একান্ত আবশ্যক। তিনি স্বয়ং নানাস্থানে, নানা সময়ে, নানা উপলক্ষে তাহা বিশদ ভাবে বলিয়া গিয়াছেন। ভক্তিভাজন শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও, উপদেশে ও কথাবার্ত্তা প্রভৃতিতে তাহা প্রাঞ্জল ভাবে অনেকবার আলোচনা করিয়াছেন।

ব্রাহ্মিকাসমাজই হউক, আর সমগ্র ব্রাহ্মসমাজই হউক, উভয়েরই উদ্দেশ্য একই। ব্রাহ্মসমাজ শিক্ষা দিতেছেন যে, আমাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য আত্মার উন্নতি। তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে জগতের সেবায় নিযুক্ত হইতে হইবে, স্বার্থকে খর্ব্ব করিয়া নিঃস্বার্থভাবে জগতের কার্য্য করিতে হইবে, অহংকার পরিহার করিয়া বিনয় অবলম্বন করিতে হইবে, চরিত্র নির্ম্মল করিতে হইবে এবং নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে অবহেলা ত্যাগ করিতে হইবে। সর্ব্বোপরি ভগবানে সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, প্রেম, ভক্তি, ন্যায়পরতা ও নিষ্ঠা সাধনপূর্ব্বক, ঈশ্বরের আদেশানুযায়ী জীবন যাপন করিয়া, আমাদের চিরবাসস্থান পরলোকের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে; এবং ইহ সংসারে অবস্থানকালে, বিশ্বাসী পরিবার গঠনপূর্ব্বক, তাহারই মধ্যে সাধনের স্থান রচনা করিতে হইবে। এক কথায় "নববিধান-সাধন" করিতে হইবে।

অবশ্য, ব্রাহ্মসমাজে বা ব্রাহ্মিকাসমাজে যোগ দিবা মাত্র এক দিনেই কেহ সকল দোষ হইতে মুক্ত হইয়া, দেবতা হইয়া যাইতে পারেন না। আত্মার উন্নতির জন্য নিরন্তর সাধন আবশ্যক। অনবরত সাধন ব্যতিরেকে মনুষ্যচরিত্র গঠন হয় না। কতবার উত্থান পতনের মধ্য দিয়া মানুষের চরিত্র গড়ে। জগতে আসিয়া যদি চরিত্র শুদ্ধভাবে গঠিত না হইল, তদপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? এই চরিত্রগঠন-সাধন ব্রাহ্মিকাসমাজের একটী প্রধান উদ্দেশ্য। নচেৎ বৎসরান্তে একদিন সকলে মিলিত হইয়া, উপাসনাদি করিয়া নিয়ম রক্ষা করা ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। অবশ্য এরূপ একত্রে মিলনে অনেক উপকার আছে বটে, কিন্তু আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ভুলিলে চলিবে না। চরিত্র-সাধনই একটী প্রধান উদ্দেশ্য, ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে। অপর প্রধান সাধন—ঈশ্বরের দিকে চক্ষু রাখিয়া, তাঁহার আদেশানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করা। মনুষ্যমতের উপর নির্ভর না করিয়া, আলোকের নিমিত্ত নিরন্তর ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা। মনুষ্য আমাদের সর্ব্ববিষয়ে পথপ্রদর্শক হইতে পারে না। এমন যদি কেহ থাকেন, যাঁহার উপর সকল বিষয়েই নির্ভর করা যায়, তিনি ভগবানই। যে সাধন অবলম্বন করিলে মানুষ সেই উপরের আলোক পাইতে পারে, সেই সাধনও ব্রাহ্মিকাসমাজের অন্যতম উদ্দেশ্য। নববিধানাশ্রয়ী নরনারী ঈশ্বর ভিন্ন অন্যদিকে তাকাইতে পারেন না। ইহকাল অপেক্ষা পরকালের সঙ্গেই তাঁহাদের সম্পর্ক বেশী। ইহকাল সেই পরকালে প্রবেশের শিক্ষা-ভূমি। ইহকাল অন্যদিকে বড়ই বিপদসঙ্কুল। "এ সংসার বড় বিষম ঠাঁই।" সাধ্য কি, মানুষ নিজ বলে সেই বিপদ্রাশির মধ্যে নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে পারে বা তাহাদের তীব্র দংশন সহ্য করিয়া উঠিতে পারে? একমাত্র ভগবানের কৃপা অবলম্বন ভিন্ন উহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ নাই। ভগবানের কৃপাবলেই মানুষ এ সংসারের দুঃখ কষ্ট শোক তাপের জ্বালায় স্থির থাকিতে পারে। এই যে সব দুঃখ কষ্ট প্রভৃতি, তাহাও সেই ভগবানের লীলার বিধিতেই উপস্থিত হয়। তিনি চান, তাহার ভিতরে পড়িয়াও, মানুষ তাহার চক্ষু ভগবানের দিকেই রাখে। অনেকেই দুঃখ কষ্টেতে অভিভূত হইয়া পড়েন; এমন কি, ঈশ্বরে বিশ্বাস পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলেন। শেষে পথভ্রষ্ট হইয়া নানা দুর্দ্দশায় পড়েন। কিজন্য ভগবানের দানস্বরূপে দুঃখ কষ্ট আইসে, তাহা ভুলিয়া যান।

মানবসমাজের এইরূপ দুর্দ্দশা যখন সীমা অতিক্রম করে, তখনই বিধির কৃপায় নব নব বিধান জগতে অবতীর্ণ হয়। আমরা সুসময়েই জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমাদের জন্য যুগধর্ম্ম নববিধান আসিয়াছেন। জগতের দুঃখ কষ্টের জ্বালা হইতে বাঁচিবার একমাত্র উপায় নববিধানের আশ্রয়গ্রহণ। যাঁহারা এই দুর্গে আশ্রয় লইয়াছেন, তাঁহারাই নিরাপদ স্থান অধিকার করিয়াছেন। এই নববিধানপথের পথিক এই নববিধানরূপ অমৃতের খনির সুমিষ্ট রসের আস্বাদন পাইয়া, অন্য সকল কিছু ভুলিয়া যান। এমন কি, সংসারের দুঃখ কষ্টেও তাঁহাদের প্রাণের শান্তি চলিয়া যায় না। যতই দুঃখ কষ্ট রোগ শোক তাপ তীব্রতর হইতে থাকে, ততই তাঁহাদের প্রাণে বিশ্বাসের অগ্নি প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে থাকে। ততই তাঁহারা ভগবচ্চরণ আরো দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া ধরেন। তাঁহাদের নিকট ঐ চরণতুল্য মিষ্ট আর কিছুই নাই। তাঁহারা উহা ছাড়িতে পারেন না, ছাড়িবার সাধ্য তাঁহাদের থাকে না। সমস্ত জগৎ তাঁহাদের বিরুদ্ধে

দাঁড়াইলেও তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। নববিধানের দেবতা অনন্তমাধুর্য্যময়ী, সুখশান্তিদায়িনী, ক্ষেমঙ্করী, জগজ্জননী যে সম্মুখে বর্ত্তমান। তাঁহারা যে দিব্যচক্ষে তাঁহাকে দেখিতেছেন ও তাঁহারা তাঁহারই পুত্র কন্যা ইহা স্পষ্ট বুঝিতেছেন। তাঁহারা অন্য কাহারও আর ভয় রাখেন না। কেহই তাঁহাদিগকে আর পথভ্রষ্ট করিতে পারে না। যে পথ ধরিলে মানুষকে নববিধানের মধুর রস আস্বাদন করিতে সমর্থ করে, নারীদিগকে সেই পথ প্রদর্শন করিবার জন্যই ব্রাহ্মিকাসমাজের অভ্যুদয়। ব্রাহ্মিকা-সমাজ সঙ্কুচিত অবিশ্বাসিনীদের সমাজ নহে। ভগবানের অভিপ্রায়, ব্রাহ্মিকাসমাজ হইতে ক্রমাগত বিশ্বাসিনীর দল—স্বার্থপরতা-বিহীনা, কুটিলতাবিহীনা, সেবাপরায়ণা, ভক্তিমতী, সাধন-পরায়ণা, সরলা, কোমলহৃদয়া, স্নেহশীলা, মাতৃভাবসম্পন্না, দয়ার্দ্রহৃদয়া, শীলতা-শোভিতা, ভগবানে দৃঢ়বিশ্বাসিনী, বিধান-বিশ্বাসিনী সেবিকার দল বাহির হয়। ভগিনীগণ, কন্যাগণ, চিন্তা করিয়া দেখুন, ব্রাহ্মিকাসমাজের এই প্রধান উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতেছে কি, না। নহিলে যাহাতে হয়, সে জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হইবে, এবং তাহা অতিশয় দৃঢ়পণের সঙ্গে করিতে হইবে, কারণ আজকাল সময় বড়ই মন্দ। চারিদিকে নিরীশ্বর-তার, সাংসারিকতার, নীতিহীনতার জঘন্য বিষাক্ত হাওয়ার ঝড় বহিতেছে। সকল সৎ উদ্দেশ্যের তরু তাহাতে নিস্তেজ ও মৃত-প্রায় হইয়া পড়িতেছে।

এই বিষস্রোতকে রোধ করিতে হইবে, প্রবলভাবে বাধা দিতে হইবে। ব্রাহ্মিকাসমাজকে যথার্থ ব্রাহ্মিকাসমাজ হইতে হইলে, এই নিরীশ্বর উত্তপ্ত মরুবায়ুর সঙ্গে তুমুল যুদ্ধে নামিতে হইবে। তাঁহাদের দেখিতে হইবে যে, মণ্ডলীর কন্যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাইতেছেন কি না—তাঁহাদের নীতিজ্ঞান শিথিল হইতেছে কি না—তাঁহারা জাতীয় ভাব হারাইতেছেন কি না—তাঁহারা কোমলতা-বিচ্যুত হইতেছেন কি না—সুকোমল নারীরা কঠোর পুরুষভাবাপন্ন হইতেছেন কি না—তাঁহারা অস্বাভাবিক ভাবগ্রস্ত হইতেছেন কি না।

শ্রদ্ধেয় আচার্য্যদেব এই কথাই ব্রাহ্মিকাদিগকে পঠিত উপদেশে বলিয়াছেন। ভগবান্ করুন, নারীগণ এই তুমুল যুদ্ধে মা কল্যাণী শক্তিরূপার আশীর্ব্বাদে জয়যুক্তা হউন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

আর্য্যনারীসমাজের উৎসব।

(১৩ই মাঘ, কমলকুটীরে, মাননীয়া মহারাণী সুচারু দেবীর আরাধনা ও প্রার্থনা)

আজ আমরা সম্বৎসর পরে আর্য্যনারীসমাজের উৎসবে মিলিত হোলাম। আমাদের বড় সৌভাগ্য যে, আমরা ভক্তের নববিধানের আশ্রয় পেয়েছি। শোক দুঃখ ভুলে, মা, তোমার চরণতলে বসে', পরলোকস্থ প্রাণপ্রিয়জনদের হৃদয়ের মধ্যে দেখ্‌ছি। আজ আমাদের পূজনীয়া ভগ্নীর আসন শূন্য, তাঁর সুমিষ্ট উপদেশ আর আর্য্যনারীসমাজের উৎসবে শুন্‌তে পাবো না; কিন্তু তিনি অন্তরের মধ্যে রয়েছেন। তাঁর আত্মা আমাদের সঙ্গে মিলিত। এই মিলনের আর বিচ্ছেদ নাই। মা, তোমার ভক্ত সন্তানেরা তোমায় ডাক্‌লে তো তুমি দেখা দাও; আর যারা তোমাকে ডাকে না, তোমা থেকে দূরে থাকে, তাদেরও কাছে ছুটে এসে, সুযোগ পেলেই তাদের মন অধিকার কর। দুঃখী সন্তান, যাদের কোন যোগ্যতা নেই, তাদের তুমি ফেলে দাও না; তাদের অন্তরে এসে তোমার মধুররূপে ভুলিয়ে, মধুর স্পর্শ দিয়ে সকল বেদনা দূর করে দাও। মা, তুমি এত সুলভ, সহজ হয়েছ, তাই তোমার আদর কোর্‌তে পারি নি। বিনা সাধনে, মনের ভিতর এমন বস্তু পেয়েছি, তাই তার মূল্য বুঝি নি। মা, তুমি বোল্‌ছো, দুঃখের বোঝা ফেলে দিয়ে আনন্দধামের যাত্রী হোতে।

হে চির সত্য! তোমার কত রূপ, কত বেশ—তোমার প্রকাশ আজ দেখি ভাল করে'। তুমি অনিমেষ স্নেহদৃষ্টিতে দেখ্‌ছো। তুমি কাকেও ফেল্‌তে পার না। যেমন সূক্ষ্ম তোমার বিচার, তেমনি পরিত্রাণের জন্য আমাদের উপায়, মন্ত্র বলে দাও। তুমি নিয়ত বোল্‌ছো, প্রার্থনা বিফল হবে না। যদি আকুলপ্রাণে তোমায় ডাকি, তোমার কাছে যদি নীরবে প্রশ্ন পৌঁছিয়ে দিই, তুমি তার উত্তর দাও। প্রতিজনের প্রাণের অভাব, বেদনা খুঁজে তুমি মোচন কর। কত সময় তোমায় ভুলি, অস্বীকার করি, কিন্তু তুমি ক্ষণেকের জন্য আমাদের ভোলো না। কত শুভ মুহূর্ত্ত আসে, তার ভিতর তোমার মধুর ডাক শুন্‌তে পাই—যদি চক্ষু খুলি, হৃদয়দ্বার খুলি, তবে তোমায় দেখি, হৃদয়ে পাই। আবার যখন দেবত্ব হারিয়ে পশু হয়ে যাই, তখন জীবন্তরূপ ধরে' জ্বলন্ত বাণীতে প্রাণে চেতনা এনে দাও। তোমার অনন্ত ডাকতো ফুরায় না। আজ আর্য্যনারীসমাজের উৎসবে, ভগ্নীগণ সকলে তোমার চরণতলে মিলেছি। প্রাণের ভিতর তোমার সুমিষ্ট স্বর শুনাও, সব অভাব চলে যাবে। অনন্তের সন্তান আমরা—যদিও অযোগ্য, তবু তোমার অমৃতের অধিকারী। আজ সকল দুঃখ, রোগ, শোক ভুলে যাবার জন্য, তোমার হাতের নিমন্ত্রণ পত্র এসেছে। আমরা চিন্ময়ী নিরাকারা জননীর সন্তান; এ শুধু কল্পনা নয়। কেবল মা মা বলে ডাকতে পারলে সকল অভাব দুঃখ মোচন হবে—সাধনার দরকার হবে না। শিশু জানে কেমন করে মাকে ডাকতে হয়, তার সাধনার প্রয়োজন হয় না। সকল অবস্থায়, সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে মা বলে তোমার কাছে ছুটে আসবার অধিকার দিয়েছ। যে যে ভাবে ডাকুক,—তাকে সাড়া দাও। ডাক শুনে নীরব থাকতে পার না। যে তোমায় ডাকে না, তারও প্রাণে দেখা দাও। মা, আজ এ উৎসবে যোগদান যেন বৃথা না হয়। তুমি অদ্বিতীয় দেবতা, মহাশক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছ।

আমরা এই অনন্ত দেবতার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুসম। এত ক্ষুদ্র ছোট, তবু আমরা তোমার বিধানে পরিচিত। তুমি বিশ্বজননী হয়ে এক প্রকাণ্ড বিশ্বপরিবার রচনা করেছ। তোমার উপর যদি এ জীবনের ভার দিতে পারি, তবে এ জীবন ব্যর্থ হবে না। মা, তোমার পুণ্যের জ্যোতিতে আমাদের পাপকলুষিত জীবনকে স্পর্শ করে, পুণ্যময় জীবন করে দাও। মা, তুমি রেখেছ সম্মুখে পুণ্যগঙ্গা, তার ভিতর ডুবতে হবে, সব ময়লা পাপ ধুয়ে শুদ্ধ হতে হবে। আমরা বংশ কুল, পিতামাতার নাম ভুলে আত্মবিস্মৃতিতে জীবন কাটাচ্ছি। তুমি চেতনা এনে দাও। শোকের আঘাত দিয়ে তোমার কাছে টেনে নাও, প্রাণের জিনিষ কেড়ে নিয়ে তোমার দিকে মন আকৃষ্ট কর। তোমার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হউক। দুঃখ না পেলে সুখ এত মধুর হোত না। না কাঁদলে, হাসির মূল্য আমরা বুঝি না। মা, দেখাও আমাদের তোমার স্বর্গের ছবি, যাহা অমরাত্মাদের সঙ্গে আমাদের পূর্ণ মিলনের স্থান। তোমার আনন্দময় রূপের হাসি আমাদের অশ্রুমুক্ত কোচ্ছে। আজ, বিচ্ছেদ বেদনা সব ভুলে যাই, অশ্রুধারা মুছিয়ে দাও। তোমার অমৃত স্পর্শে মৃত দেহ মন সঞ্জীবিত কর। শূন্যমনকে তোমাতে পূর্ণ কর। তোমায় আজ প্রাণভরে মা বলে ডাকি। তুমি আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ কর। তোমার চরণে সকল ভগ্নী মিলে বার বার প্রণিপাত করি।

ক্ষণকাল নিস্তব্ধ ধ্যানরাজ্যে তাঁর মধুময় প্রকাশ দেখে ধন্য হই।

উৎসবের দেবতা আজ স্বর্গের সিংহাসন হতে নেমে এসেছেন, ক্ষুদ্র হৃদয়ের সিংহাসনে। প্রতি ভগ্নীর প্রাণের প্রার্থনা তিনি পূর্ণ করুন। শোকের প্রহারে আজ প্রাণের ভিতর একটা দিক ভেঙ্গে গিয়েছে। আজ আবার উঠে এসে এ উৎসবে যোগ দিতে পারবো, ভাবি নি। মঙ্গলময়ী জননী, তুমি যে নিয়ত সন্তানের মঙ্গল সাধন কোচ্ছ, তবে আর কেন আমরা কাঁদবো; তোমার হাতের দান তুমি দাও, আবার তুমিই তুলে নিয়ে যাও ভালর জন্যে। যদি সুখের অন্ন খেতে পারি, তবে দুঃখের অন্নও অমৃত বলে [illegible]ত হবে। তোমার সান্ত্বনা-বাণী শুনাও, সকল বোঝা বহন করবার ক্ষমতা দাও। কত তোমার লীলা অভিনয়। চির মঙ্গলময়ী মা, তুমি হাসাও কাঁদাও, ভাঙ্গ গড়, সব তোমার হাতের দান। আমাদের প্রতিজনকে নূতন ব্রতে ব্রতী কর। সতীর প্রার্থনায় এই শুনলাম যে, নববিধানের আলোকে পুরাকালের ধর্ম্ম মেশানো। যখন জীবনটা নিরাশ হয়ে পড়ে, তখন তোমার অনন্ত আশার ছবি দেখাও। মুখে আজ আর কি চাইব, মা, তোমার কাছে, সবই তো তুমি জান। যখন ডাক আসবে, তখন হাসিমুখে যেন যেতে পারি। হোলামই বা ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র শক্তি মিলিত হলে একখানি মহাশক্তি হবে। ভগ্নীর সুন্দর প্রবন্ধে শুনলাম, আমরা সকলে মিলিত হয়ে এ জগতে তোমার কাজ করবার জন্য এসেছি। যদি পরস্পরের উপকার করি, একমনে জগতের সেবা করি—তবেই আমাদের মঙ্গল, দেশের ও জাতিরও উন্নতি, মঙ্গল হয়। মা, তোমার মঙ্গল স্পর্শাশীর্ব্বাদ আজ দাও। যে ভগ্নী আজ স্বর্গে, তাঁর সুন্দর উপদেশ, মাতৃদেবীর আশীর্ব্বাদ, ব্রহ্মানন্দের আশার বাণী আমাদের জীবনকে উপযুক্ত করে অনুপ্রাণিত করুক। নিরাশ হব না, যদি তাঁদের শক্তি প্রভাব আমাদের হৃদয়ে জীবিত থাকে। উৎসবের দিনে আজ, মা, সকলকে তোমার মঙ্গলাশীর্ব্বাদ দাও। সব দুঃখ আজ দূর হয়ে যাক, আজ পূর্ণ মিলনের ছবি দেখি। অমৃতে পূর্ণ হৃদয় নিয়ে ফিরে যাব। উৎসবান্তে তোমার মঙ্গলময় শ্রীচরণে আমরা সকলে মিলে বার বার প্রণিপাত করি।

শ্রীস্নেহলতা দত্ত।

আর্য্যনারীসমাজের কার্য্যবিবরণ।

পরমজননীর কৃপায় আর্য্যনারীসমাজের আর একবৎসর বয়োবৃদ্ধি হইল। চতুঃপঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দদেব নারীগণের হিতকল্পে আর্য্যনারীসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এতদিন তাঁহার প্রতিনিধিরূপে যিনি উৎসাহ, দয়া ও যত্ন দ্বারা ইহাকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছিলেন, আমাদের শ্রদ্ধেয়া স্নেহময়ী ভগিনী মহারাণী সুনীতি দেবী পরমজননীর আহ্বানে পরলোকধামে চলিয়া গিয়াছেন। যিনি সর্ব্বদা ইহার মঙ্গল সাধন করিয়াছেন, প্রবাসবাসকালেও ইহার সহিত নিত্যযোগ রাখিয়া ইহাকে দয়া ও অর্থ দ্বারা পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন, যিনি উৎসবে অধিবেশনে উপদেশ ও প্রার্থনা দ্বারা ইহাকে নূতন জীবন দান করিয়াছিলেন, সেই সতী কন্যার অভাবে সমিতি শোকে মুহ্যমান। আজ সমিতির সভ্যাগণের কাতর অন্তর হইতে সেই মহান্ আত্মার উদ্দেশে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা উত্থিত হইতেছে। যে লোকে অন্ধকার নিরাশা রোগ শোক বিচ্ছেদ নাই, সেই পরমলোক হইতে তিনি আশীর্ব্বাদ করুন, এই সমিতির মঙ্গল হউক, দিন দিন সতেজ ও উন্নত হউক।

গত বৎসর মহারাণী সুনীতি দেবী প্রবাস হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া, তাঁহার গৃহে মহাসমারোহে আর্য্যনারীসমাজের অধিবেশন ও তৎপরে প্রীতিভোজে সকলকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। গত বৎসর সাম্বৎসরিক উৎসবে তাঁহার উৎসাহপূর্ণ স্বাভাবিক সুমিষ্ট ও তেজোময় উপাসনা ভগ্নীগণের প্রাণে চিরমুদ্রিত থাকিবে। গত সেপ্টেম্বর মাসে আমাদের মাননীয়া প্রিয়তমা ভগ্নী শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী, শ্রীআচার্য্যদেবের দ্বিতীয়া কন্যা সমিতির আসন শূন্য করিয়া পরমমাতার অমৃতনিকেতনে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবন প্রকৃত আর্য্যনারীর জীবন ছিল। তিনি সদাচারা, পতিব্রতা, হিন্দু রমণীর শ্রেষ্ঠগুণসম্পন্না ছিলেন; তাঁহার চরিত্র আমাদের দৃষ্টান্তস্থল ছিল। আজ তাঁহাকে হারাইয়া আর্য্যনারীসমাজ শোকের অশ্রু পাত করিতেছেন। তিনি আজীবন পরমারাধ্য পিতৃদেবের

আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, জীবনের শত পরীক্ষা জয় করিয়াছিলেন। সমাজস্থ আর একটি ভগিনীও আমাদের কাঁদাইয়া অসময়ে স্বর্গধামে চলিয়া গেলেন। স্নেহের ভগিনী শ্রীমতী সুনীতি রায় অল্পায়ু জীবনে নববিধানের আদর্শ সাধন করিয়া পরম জননীর আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। সুনীতি আমাদের অতি আদরের ও স্নেহের পাত্রী। তাঁহার জীবন আমাদের সম্মুখে দৃষ্টান্তস্থল হইয়া চির প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

গত বৎসর সম্পাদিকার অসুস্থতার জন্য নিয়মিত অধিবেশন হয় নাই। প্রার্থনা করি, এ বৎসর সেই পরমজননীর আশীর্ব্বাদ ও পরলোকগতা প্রিয়তমা ভগ্নী সুনীতি দেবীর উৎসাহের ভাব হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক, এই সমাজের কার্য্য সকলে করিতে পারিবেন। এখন সভ্যগণের নিকট বিনীত প্রার্থনা, তাঁহারা উৎসাহ ও দয়া দ্বারা এই সমিতির মঙ্গল সাধন করিয়া আমাদের কৃতার্থ করুন। যে সকল ভগ্নী এই সমিতির জন্য কত পরিশ্রম করিয়াছেন, উপাসনা, প্রার্থনা, সঙ্গীতাদি ও অর্থ দ্বারা সেবা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট সমিতি চিরঋণী। মাননীয়া ভগ্নী শ্রীমতী মহারাণী সুচারু দেবী তাঁহার হৃদয়ের প্রেম, উৎসাহ ও দয়া দ্বারা ইহাকে কতরূপে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহার নিকট সমিতি বিশেষরূপে ঋণী। শ্রীমতী সরলা দাস বহুদিন ধরিয়া বহু পরিশ্রম করিয়া সম্পাদিকার কার্য্য করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। পরম জননী তাঁহার স্নেহস্পর্শে সকলকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। গত বৎসরের আয় ও ব্যয়ের হিসাবের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আয় :—	ব্যয় :—
শ্রীমতী মহারাণী সুনীতি দেবীর চাঁদা জানুয়ারী হইতে নবেম্বর অবধি—২৬৪৲	জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর অবধি দাতব্য—২১২৸৹
অন্য চাঁদা জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর অবধি—৬২৷৴৹	দরোয়ানের মাহিনা—৩৬৲
	বিধবা আশ্রম— ১৫৲
	গাড়ীভাড়া— ১২৲
	মনি অর্ডার— ৪৲
মোট— ৩২৬৷৴৹	প্রেস, খাতা বাঁধানো ও পোষ্টকার্ড—১৫৷৴৹
হাতে জমা ৩১৲ টাকা।	২৯৫৷৴৹
ব্যাঙ্কে জমা ১২৬৲ টাকা।	

শ্রীমণিকা দেবী।

সংবাদ।

নামকরণ—গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৭৪নং লোয়ার সার্কুলার রোডে, ডাঃ অমরেন্দ্রনাথ বসুর দ্বিতীয় শিশু কন্যার শুভনামকরণ অনুষ্ঠানে ডাঃ সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন ও শিশুকে "নন্দিতা" নাম প্রদান করেন। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

শুভবিবাহ—গত ২৮শে ফাল্গুন, ৩নং রায় ষ্ট্রীটে অমরাগড়ী-নিবাসী, মাড়োয়াড়ী হাসপাতালের ডাঃ রায় সাহেব প্রবোধচন্দ্র রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ প্রশান্তকুমারের সহিত, শ্রীহট্ট-নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধামাধব রায়ের কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী গীতার শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় উপাসনা ও শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাসগুপ্ত পৌরোহিত্যের কার্য্য করেন। ভগবান্ নবদম্পতিকে শুভাশীষ দান করুন।

বিশেষ উপাসনা—গত ১২ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার, সন্ধ্যা কালে, লাহিরিয়াসরাই শ্রীমতী প্রিয়বালা ঘোষের "বিনয়ভূষণ বালিকাবিদ্যালয়" গৃহে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীমতী নির্ম্মলা বসু উপাসনার কার্য্য করেন, কল্যাণীয়া সুষমা দত্ত সঙ্গীত করেন। স্থানীয় মহিলাসমিতির অনেকগুলি মহিলা যোগদান করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন, কয়েকটী মহিলা স্বর্গীয় ভক্ত রুবেণের হিন্দি সঙ্গীত শিখিবার চেষ্টা করেন। ভক্তের সঙ্গীত-গুলির প্রতি অনেকের শ্রদ্ধাপূর্ণ ভাবে দেখা গেল।

কৃতজ্ঞতা-দান—শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমের সেবিকা হেমন্তকুমারী মল্লিক বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া ভগ্নীর বাড়ীতে শয্যাশায়ী হন। ভগ্নীর সেবায় ও কবিরাজের চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করিয়া আশ্রমে পুনরায় গমন করিলে, ঈশ্বরের করুণাস্মরণে গত ৬ই মার্চ্চ আশ্রম-দেবালয়ে কৃতজ্ঞতাদানসূচক বিশেষ উপাসনা হয়। যাঁহারা সেবা, চিকিৎসা ও সাহায্যদান করিয়াছেন, সকলকার কল্যাণ প্রার্থনা করিয়া কৃতজ্ঞতা দান করা হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন ও সেবিকা প্রাণগত প্রার্থনা করেন।

পারলৌকিক—আমরা সন্তপ্তচিত্তে প্রকাশ করিতেছি, স্বর্গীয় ক্ষীরোদচন্দ্র সিংহের পত্নী শ্রীমতী গোলাপসুন্দরী দেবী গত ১১ই ফেব্রুয়ারী, বর্দ্ধমান জেলার আবুজহাটী গ্রামে তাঁহার পিতৃভবনে দেহমুক্ত হইয়া মাতৃক্রোড়ে আরোহণ করিয়াছেন। ইনি বেশ নিষ্ঠাবতী সন্তানবৎসলা ও সুগৃহিণী ছিলেন। পুত্রদ্বয় শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র ও ক্ষিতীশচন্দ্র সিংহ নবসংহিতানুসারে গত ১০ই মার্চ্চ, তাঁহাদের ৯নং ষ্টার লেন ভবনে, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পাদন করেন। ভাই প্রিয়নাথ আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করেন। সানুজ শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র প্রধান শোককারীর প্রার্থনা আবৃত্তি করেন। এই উপলক্ষে শ্রীমান্ ক্ষিতীশচন্দ্র কলিকাতা নববিধান-প্রচারকদিগের সেবার্থে ২৲, পুরীর সার্ব্বজনীন নববিধান প্রতিষ্ঠানে ২৲ ও শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে ১৲ দান উৎসর্গ করিয়াছেন।

গত ১লা মার্চ্চ, ৬৫।১ হ্যারিশন রোডে, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্তের গৃহে, তাঁহার শ্যালক স্বর্গীয় বসন্তকুমার চৌধুরীর আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র উপাসনা করেন, ভাই অক্ষয়কুমার লধ শাস্ত্রাদি পাঠ করেন। পুত্র শ্রীমান্ সুকুমার নবসংহিতার প্রার্থনা পাঠ করেন। এই উপলক্ষে নববিধান প্রচারভাণ্ডারে ২৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ২৲ ও সাধনাশ্রমে ২৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

ভগবান্ পরলোকস্থ আত্মার কল্যাণ করুন এবং শোকার্ত্ত পরিবারে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

সেবা—ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক পুরীতে গিয়া, গত ১২ই ফেব্রুয়ারী, নবপর্ণকুটীরে সামাজিক উপাসনা, ১৪ই ফেব্রুয়ারী কটকে গিয়া মধুভবনে সন্ধ্যায় বিশেষ উপাসনা, ৫ই মার্চ্চ, চাওড়া ব্রাহ্মসমাজে বিশেষ উপাসনা করেন। ৯ই মার্চ্চ, নিজজন্মস্থান সাচড়াগ্রামে কন্যার সমাধিতীর্থে উপাসনা ও "গঙ্গানারায়ণ-নবশিশুপাঠশালায়" বালকবালিকাদিগকে নীতি উপদেশ দেন।

স্মৃতি-সভা—গত ৮ই জানুয়ারী, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণ দিনে, শান্তিপুরে, রামনগর বালিকাবিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বন্দোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে স্মৃতিসভা হয়। শ্রীযুক্ত কালীপদ দাস প্রবন্ধ পাঠ করেন, শ্রীযুক্ত বিশ্বমোহন সান্যাল, শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন গোস্বামী, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বাণীকণ্ঠ, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ দাস প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

সাম্বৎসরিক—১২ই জানুয়ারী, ৪৭।১ হাজরা রোডে, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুপ্তের গৃহে, তাঁহার পিতৃদেবের সাম্বৎসরিকে, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১০নং আলিপুর নিউরোডে, শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্না-নাথ সেনের মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিকে ডাঃ সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন।

গত ৩১শে জানুয়ারী, শ্রদ্ধেয় ভাই রামচন্দ্র সিংহের শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর স্বর্গদিন, ১লা ফেব্রুয়ারী স্বর্গীয় সাধক রাজমোহন বসুর কন্যা শ্রীমতী কুসুমকুমারীর সাম্বৎসরিক দিন স্মরণে নবদেবালয়ে এবং ২৪শে ফেব্রুয়ারী, স্বর্গীয় লোকনাথ মল্লিকের সাম্বৎসরিকে রামকৃষ্ণপুরে "নিত্যধামে" ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন।

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১এ মন্মথ ভট্টাচার্য্য ষ্ট্রীটে, স্বর্গীয় মদনমোহন সেনের সাম্বৎসরিক দিনে উপাসনা, দান ১৲ টাকা। ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ৬৫।১নং হ্যারিশন রোডে, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্তের কন্যা স্বর্গীয়া সুরমা দত্তের সাম্বৎসরিক দিনে উপাসনা। ২২শে ফেব্রুয়ারী, সন্ধ্যাকালে, বেলেঘাটায়, স্বর্গীয় মোহিতলাল সেনের কনিষ্ঠা কন্যা ও শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার গুপ্তের সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া উমা দেবীর সাম্বৎসরিকে উপাসনা। ২৬শে ৯১।১ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ হালদারের সহধর্ম্মিণীর সাম্বৎসরিকে উপাসনা—কন্যা শ্রীমতী সুষমা বাগচির দান প্রচারভাণ্ডারে ১৲, কমলকুটীরে সমাধিতে মাল্যচন্দনের জন্য ১৲ টাকা। এই সকল স্থানে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী, ময়ূরভঞ্জের রাজর্ষি মহারাজা শ্রীরাম-চন্দ্র ভঞ্জদেবের সাম্বৎসরিক দিন স্মরণে, ৭নং বজবজ রোডে, রাজাবাগ প্রাসাদস্থ সমাধিমণ্ডপে বিশেষ উপাসনা হয়। আচার্য্যপরিবারস্থ ও মণ্ডলীস্থ অনেকেই এই পার-লৌকিক তীর্থযাত্রায় যোগদান করেন। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন, ভাই অক্ষয়কুমার লধ শাস্ত্রপাঠে সহায়তা করেন। শ্রীমতী মহারাণী সুচারু দেবী আকুল প্রাণে প্রার্থনা করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহও প্রার্থনা করেন। অপরাহ্নে কথোপকথন কথা হয়, সন্ধ্যায় ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন উপাসনা করেন।

গত ১লা মার্চ্চ, শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের পত্নী শ্রীমতী ব্রহ্মনন্দিনী সতী জগন্মোহিনী দেবীর স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক দিন উপ-লক্ষে নবদেবালয়ে বিশেষ উপাসনা হয়। এই দিন উপাধ্যায় শ্রদ্ধেয় ভাই ঋষি গৌরগোবিন্দ রায়ের এবং ভাই উমানাথের পুত্রবধূ শ্রীমতী মৃণালিনী দেবীরও স্বর্গদিন। উপাসনা-যোগে সকল পরলোকগত আত্মাকে স্মরণ করা হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। ভগ্নী মাধববালা বসু এবং মহারাণী সুচারু দেবী বিশেষ প্রার্থনা করেন। ভ্রাতা নির্ম্মলচন্দ্র আচার্য্য দেবের প্রার্থনা এবং ভ্রাতা সরলচন্দ্র সতী দেবীর প্রার্থনা আবৃত্তি করেন।

৮ই মার্চ্চ, শান্ত সাধক স্বর্গগত ভাই কেদারনাথ দের সাম্বৎ-সরিক দিনে, কলিকাতায় ৬।৪ই ওয়ার্ডস্ ইন্‌ষ্টিটিউটসন্ ষ্ট্রীটে, পুত্র শ্রীযুক্ত মনোনীতধন দের গৃহে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ এবং ৩২নং রাজা দিনেন্দ্র ষ্ট্রীটে কন্যা শ্রীমতী অশোকলতা দাসের গৃহে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। পাটনায় Girls' High Schoolএর লেডি প্রিনসিপ্যাল শ্রীমতী বনলতা দের গৃহেও উপাসনা হয়। এই উপলক্ষে জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী হেমলতা চন্দ কলিকাতা নববিধান প্রচারভাণ্ডারে ২৲, বাঁকিপুর ধীরানন্দ-কুটীরনির্ম্মাণে ২৲ ও দরিদ্রদিগকে চাউল ও পয়সা ১৲ এবং কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী বনলতা দে প্রচারভাণ্ডারে ১০৲ এবং পুত্র শ্রীযুক্ত মনোনীতধন দে প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

দান—স্বর্গীয় ডাঃ শরচ্চন্দ্র দত্তের সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া কুমারী দেবীর আদ্যশ্রাদ্ধে প্রচারভাণ্ডারে ১০৲, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ১০৲ ও বস্ত্রাদিতে ১০৲ টাকা দান করা হইয়াছে। এবং পৌত্রী শ্রীমতী মনোরমা সেন ব্রাহ্মরিলিফ ফণ্ডে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। ভগবান্ দাতাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

কোচবিহারের সংবাদ—১৫ই ডিসেম্বর, শ্রীমান্ মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের শুভ জন্মদিনে প্রচারাশ্রমে, এই দিনে শ্রীকেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যার শুভ জন্মদিনে তাঁহার কুটীরে, ২০শে ডিসেম্বর, স্বর্গীয় মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণের শুভ জন্মদিন ও স্বর্গদিন স্মরণে প্রচারাশ্রমে, ১লা জানুয়ারী নববর্ষ উপলক্ষে প্রাতে কেশবাশ্রমে ও মধ্যাহ্নে প্রিন্‌সিপাল মনোরথধন দের মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তাঁহার বাসভবনে, ৮ই জানুয়ারী ব্রহ্মানন্দের স্বর্গারোহণদিনে আশ্রমকুটীরে, ১১ই মাঘ, মাঘোৎসব উপলক্ষে দুইবেলা ব্রহ্মমন্দিরে, ৩০শে জানুয়ারী, কেদারবাবুর মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিকে তাঁহার কুটীরে, ৭ই ফেব্রুয়ারী নবীনবাবুর দৌহিত্রের (পূর্ণবাবুর কনিষ্ঠ পুত্রের) শুভ জন্মদিনে প্রচারাশ্রমে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র আইচ সর্ব্বত্র উপাসনা করেন।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priya-nath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে", শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক ২রা চৈত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C-37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৮ ভাগ। ৬ষ্ঠ সংখ্যা। | ১৬ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৯ সাল, ১৮৫৪ শক, ১০৪ ব্রাহ্মাব্দ। 30th March, 1933. | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩

প্রার্থনা।

মা, তুমি প্রকৃতিরূপিণী, তুমিই আবার প্রকৃতি-প্রসবিনী। জড়প্রকৃতি, জীবপ্রকৃতি দুইই তুমি আপন প্রকৃতিস্বরূপে প্রসব করেছ। জড় প্রকৃতিকে প্রসব করিয়া, যখন যেমন তোমার ইচ্ছা, তাহাকে সাজাইতেছ; জীবপ্রকৃতিকেও তুমি প্রসব করিয়া, তাহাকেও তোমার প্রকৃতি অনুসারে গঠিত করিতেছ। জীবের মধ্যে আবার মানবকে তোমারই প্রতিকৃতিতে গঠিত করিয়াছ, তাহাকে বিশেষভাবে তোমার আত্মশক্তি, ইচ্ছা-শক্তি দিয়াছ; এই জন্য যে, সে স্বাধীনভাবে তোমার অনুরূপ আদর্শ অবলম্বনে গঠিত হইবে। তাই তোমার জড় প্রকৃতিকে তোমার ইচ্ছামত যেমন সাজে সজ্জিত করিতেছ, মানবপ্রকৃতিকে ঠিক তেমন ভাবে গঠন কর না। মানুষ ইচ্ছাপূর্ব্বক তোমার মনের মত তোমার দ্বারা গঠিত হইতে চাহিলে, তবে তুমি তাহাকে তেমনি সাজে সজ্জিত কর। জড় প্রকৃতি যেমন ইচ্ছাবিহীন হইয়া, যখন যেমন সাজে তাহাকে সাজাইতেছ, তেমনি ভাবে সাজিতেছে, মানুষও যাহাতে স্ব ইচ্ছার বলিদান দিয়া, তোমার ইচ্ছামত সজ্জিত হয়, ইহাই তুমি চাও। এই জন্যই তোমার ভক্ত মানবপ্রকৃতিতে জন্ম লাভ করিয়া, তুমি যখন যেমন ভাবে তাঁকে সাজাও, তেমনি ভাবে সাজেন এবং তেমনি ভাবে তোমারই দ্বারা গঠিত হইয়া মানবজীবনের উৎকর্ষ ও আদর্শ প্রদর্শন করেন। তাই দেখি, এই জড় প্রকৃতিকে যেমন ষড় ঋতুতে বিচিত্র ভাবে সজ্জিত করিয়া আমাদিগকে তাহারই আদর্শানুরূপ গঠিত করিতে চাহিতেছ, তেমনি তোমার এক এক ভক্তকেও এক এক আদর্শে তব ইচ্ছায় গঠিত করিয়া, মানুষ হইয়াও কেমনে তোমার দেব সন্তান হইতে হয় বা তোমার প্রকৃতিতে প্রকৃতিস্থ হইতে হয়, তাহাই তাঁহাদের জীবনে তুমি দেখাইলে। এই সময়ে যেমন তুমি প্রকৃতিতে বসন্তপূর্ণিমায় পূর্ণচন্দ্রের প্রকাশ করিলে, বসন্তের স্নিগ্ধ সমীরণ প্রবাহিত করিলে, কোকিলকণ্ঠে তোমার মধুর নাম ধ্বনিত করিলে, নব পত্র পুষ্পে বৃক্ষ লতাকে কতই নব সাজে সজ্জিত করিলে, তেমনি আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তচন্দ্রকেও নবদ্বীপে মানব-কুলে জন্ম দিয়া, তোমার গৌরাঙ্গরূপে তাঁহাকে প্রতিভাত করিলে। আকাশে বসন্ত-পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র যেমন তোমার আলোকে উদ্ভাসিত, পৃথিবীতে গৌরচন্দ্রও তেমনি আত্ম-ইচ্ছা, বিদ্যা বুদ্ধি, গৃহ সংসার সকলই তোমার চরণে উৎসর্গ করিয়া, তব প্রকৃতির চির বসন্তের সমাগমে, মানবচন্দ্ররূপে তোমারই দ্বারা গঠিত হইলেন। মা, তাই

করযোড়ে ভিক্ষা করি, আশীর্ব্বাদ কর, এই পুণ্য বসন্তসমাগমে, জড় প্রকৃতিকে যেমন এমন সুন্দর শোভায় শোভিত করিলে, আকাশের পূর্ণ চন্দ্রের জ্যোৎস্নার বিকাশে অমানিশার অন্ধকার দূর করিলে, স্নিগ্ধ সমীরণের হিল্লোলে শীত গ্রীষ্মের সমন্বয়ে বিশ্ব-প্রকৃতিকে মধুময় করিলে, নব নব পল্লব ও ফুলের সৌরভে চারিদিক প্রফুল্ল এবং আমোদিত করিলে, পক্ষিগণের সুমিষ্ট সঙ্গীতধ্বনিতে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিলে, আবার তোমার মানবপ্রকৃতিতে গৌরচন্দ্রের জীবনেও এই প্রকৃতির ভাবই যেমন একাধারে বিকশিত করিলে, তেমনি এই আদর্শেই যেন আমাদের জীবনও তোমার হস্তে সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্পণ করিয়া, তোমারই ইচ্ছামত গঠিত হই এবং তদ্দারা প্রকৃত মানবসন্তানত্ব বা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া মানবজন্ম সার্থক করি।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

বসন্তোৎসব ও চৈতন্যোৎসব।

শ্রীনববিধানাচার্য্য বলেন, "তুমি চিন্তা করিয়া থাক, 'কি আমার হওয়া উচিত?' যখন তোমার বসন্তকাল মনে হইবে, তখন তোমার ইচ্ছা হইবে, 'চিরবসন্ত যেন আমার জীবনের অবস্থা হয়'। বসন্তের সঙ্গে জীবনের উৎকৃষ্ট অবস্থার তুলনা হয়। বসন্তকালে শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হয়, বসন্তকালে বিচিত্র পক্ষী সকল সুস্বরে গান করে। এই সময় মানুষের মন অত্যন্ত সুখী হয়। দয়াসিন্ধু ঈশ্বর আমাদিগকে সুখী করিবার জন্য, তাঁহার স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে বসন্তকালকে প্রেরণ করেন। ভাবুক ব্যক্তি অভিলাষ করেন, বসন্তকালে যেমন শরীরের অবস্থা হয়, আত্মার অবস্থা যেন সেইরূপ হয়। আত্মার চিরবসন্ত যথার্থ মোক্ষধামের অবস্থা। বসন্ত স্বর্গের আভাস প্রকাশ করে।"

তিনি আরো বলেন, "যেমন বসন্তকাল স্বর্গীয় লক্ষণাক্রান্ত, সেইরূপ পূর্ণিমার চন্দ্রও স্বর্গের ভাব উদ্বোধন করে। চন্দ্র যেন ভাবুককে বলিতে থাকে, 'আমি স্বর্গে আছি, স্বর্গের ভিতর থাকিয়া পৃথিবীকে আমার কিয়দংশ রূপ লাবণ্য দেখাইতেছি।' এইরূপে পূর্ণিমার চন্দ্রে, সুশীতল সমীরণে, ক্ষুদ্র শিশুর মুখে এবং পাখীর সুমিষ্ট কণ্ঠে ভক্ত ভাবুক স্বর্গ অনুভব করেন। এই ফুলগুলিও নিশ্চিত স্বর্গের জিনিষ।"

বাস্তবিক বসন্তকাল যেন মর্ত্তে পৃথিবীতে স্বর্গ। ইহার সকলগুলিই স্বর্গীয় বা স্বর্গের আভাসব্যঞ্জক। বিশ্বপ্রকৃতি যে স্বর্গের প্রকৃতি, স্বর্গের ছাঁচে ঢালাই করিয়া যেন বিশ্বপতি এই প্রকৃতিকে গঠন করিয়াছেন। স্বর্গ কি? যেখানে ঈশ্বর এবং যাহা ঈশ্বরের স্বহস্ত-রচিত বা ঈশ্বরের শক্তির বিকাশ প্রকাশ করে, তাহাই ত স্বর্গ। আমরা কল্পিত স্বর্গ মানিনা। আমাদের ঈশ্বরও যেমন কল্পনা নন, প্রত্যক্ষ, তেমনি তাঁহার স্বর্গও কল্পিত বস্তু নয়। এই বিশ্বপ্রকৃতিস্থ যাহা কিছু, সকলই ত আমাদের ঈশ্বর স্বহস্তে রচনা করিয়া, তাঁহার শোভা সৌন্দর্য্যের, তাঁহার কারুকার্য্যের এবং নিজ স্বরূপের পরিচয় দিতেছেন; তাই প্রকৃতির বিভিন্ন বিকাশ ও প্রকাশ সকলই ঈশ্বরের এবং স্বর্গের পরিচায়ক; সেই জন্যই ত আমাদের বৈদিক পুরুষগণ এই বিশ্বপ্রকৃতিকেই ঈশ্বরবোধে পূজা করিতেন বা তিনি এবং তাঁর প্রকৃতি অভেদ জানিয়া, প্রকৃতিতেই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেন।

দ্বৈতবাদ-প্রণোদিত বিজ্ঞান-চক্ষে যদিও চৈতন্যময় স্রষ্টা ও জড় সৃষ্টিকে বিশ্লেষণ বা ভিন্ন করিয়া আমরা দেখিতে শিখিয়াছি, কিন্তু দ্বৈতাদ্বৈত চক্ষে আমরা প্রকৃতিকে দেখিলেই প্রকৃতির ঈশ্বরকে দেখিতে পাই। ব্রহ্মানন্দ যেমন বলিলেন, তেমনি বিশ্বপ্রকৃতিও আমাদিগকে বলেন, "যে আমাকে দেখিয়াছে, সেই আমার ঈশ্বরকেও দেখিয়াছে"। তাই ভাবুক ভক্ত যোগী যিনি, তিনি প্রকৃতিদর্শনেই ব্রহ্মদর্শন-যোগে মগ্ন হন এবং প্রকৃতির বিচিত্র বিকাশ দর্শনে উৎসবানন্দে উন্মত্ত হন। এই জন্যই নববিধান শরৎসমাগমে আমাদিগকে শারদীয় উৎসবসম্ভোগে প্রণোদিত করেন, বসন্তসমাগমে বসন্তোৎসবসাধনে ধন্য করেন।

বাস্তবিক প্রকৃতির সকল বিকাশই স্বর্গের উদ্দীপক। আবার বিশেষ ভাবে বসন্তকালদর্শনে মানব-মন যেমন উৎফুল্ল আনন্দিত এবং নব জীবনে সঞ্জীবিত হয়, এমন আর অন্যকালে হয় না। সত্যই বসন্তকাল স্বর্গের ও চির মোক্ষধামের বিশেষ আভাস দান করে। এই জন্যই নববিধানের সঙ্গীতাচার্য্য নববিধানকেই পৃথিবীতে বসন্তসমীরণ বলিয়া তুলনা করিয়াছেন এবং ভক্তজীবনকে চিরবসন্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ইহার কারণ আর কিছু নয়, বসন্তকালের বাতাস

স্নিগ্ধ এবং মনোরম, ইহার পাখীর গান, ইহার ফুলের সৌন্দর্য্য এবং সৌরভ, ইহার পূর্ণচন্দ্রের মধুর জ্যোৎস্না সকলই অপার্থিব। একে ত ইহার কিছুই মানুষের রচিত নয়, আবার ইহা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সচরাচর পাওয়াও যায় না; তাই প্রকৃতির সর্ব্বোচ্চ এবং সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম ভাব এই কালে বিকাশ প্রাপ্ত হয় বলিয়া, ইহা নিশ্চয়ই মহোৎসবব্যঞ্জক।

যাহা দেখিলে, সম্ভোগ করিলে, সহজেই মন আনন্দে উৎফুল্ল হয় এবং শরীর মনের সকল প্রকার দুঃখ কষ্ট অপসারিত হয়, তাহাই ত উৎসবানন্দদায়ক এবং তাহাই ত মনের ভক্তিভাব-উদ্দীপক। চন্দ্রের জ্যোৎস্না দেখিয়াই ত আমরা ঈশ্বরকে "প্রেমচন্দ্র" বলিয়া ভক্তির উচ্ছ্বাসে নামকরণ করিতে প্রণোদিত হই। ফুলের কোমলতা ও সৌন্দর্য্য দেখিয়াই ত আমরা তাঁর চরণকে "কমল" বলিয়া অনুভব করি। বসন্ত-সমীরণ সম্ভোগ করিয়াই ত ভক্তজীবনের স্নিগ্ধতা ও আনন্দ আমরা উপলব্ধি করি। নিষ্কলঙ্ক শিশুর মুখকমল এবং পবিত্র হাসি দেখিয়াই ত আমরা প্রত্যক্ষ স্বর্গের নিদর্শন দর্শন করি। এ সকল কথা ভাবের কথা, ভক্তির উচ্ছ্বাস; কিন্তু যাহা ভাব ভক্তি উদ্দীপন বা উচ্ছ্বসিত করে, তাহা ধর্ম্মসাধন ও ভক্তিসাধনের সহায় বলিয়া কেন না গ্রহণ করিব?

সাধারণতঃ লোকে বলেন বটে, ভক্ত ভাবুক প্রকৃতির উপমা-দর্শনে, আপনাপন মনের ভাবানুসারে, ভক্তিভাব উদ্ভাবন করেন। কিন্তু বিশ্বাসী যোগী ভক্ত বলেন, স্বয়ং ভক্তসখা ভগবান্‌ই আপন প্রকৃতি হইতে স্বর্গের প্রকৃতি সম্পন্ন করিয়া, বিশ্বপ্রকৃতিকে ভক্ত মানবের ভক্তিলাভে আদর্শপ্রদর্শন জন্যই রচনা করিয়াছেন। এবং তদ্দ্বারা স্বয়ং তাঁহাদের প্রাণে ভক্তি সঞ্চার করেন। এই ভাবে আমাদের জীবনে ভক্তির সঞ্চার করিয়া উৎসবানন্দে পূর্ণ করিবার জন্যই, তিনি বসন্তকাল এমন স্বর্গীয় ভাবে রচনা করিয়াছেন। ইহার তাঁহারই স্বরূপের প্রকাশ। সূর্য্য এবং সূর্য্যরশ্মি যেমন অভেদ, তেমনি এই বসন্তকালে তাঁহারই প্রকৃতি বিকশিত।

এই বসন্তসমাগমে পুরাতন পত্র স্খলিত হইয়া নব পত্র পুষ্পে বৃক্ষলতা সজ্জিত হয়, আকাশে পূর্ণচন্দ্রোদয়ে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় সমস্ত পৃথিবী জ্যোতির্ম্ময় হয়, বসন্তসমীরণে শরীর মন স্বাস্থ্যসুখে পূর্ণ হয়, ফুলের সুগন্ধে ও সৌন্দর্য্যে চারিদিক শুদ্ধতা ও আনন্দে ভরিয়া যায় এবং পক্ষীর সুমিষ্ট গানে সবার মন উৎফুল্ল হয়; এবং ইহারই প্রভাবে যেমন আমরা এ সময় বসন্তোৎসব-সম্ভোগে ধন্য হইলাম, তেমনি আমরা কেবল বাহ্যভাবে সম্পাদন করিয়া যেন ক্ষান্ত না হই, সত্যই যাহাতে আমাদের জীবন চিরবসন্তময় হয়, তাহারই জন্য আমরা আকাঙ্ক্ষিত হই।

আবার এই বসন্তসমাগম-সময়ে যেমন বিধাতার অনির্ব্বচনীয় বিধানে, নিত্য বসন্তোপম জীবন, পুণ্য-প্রেমোন্মত্ত ভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অবতারণা হইল, তেমনি তাঁহারও আদর্শজীবনের সমাগমসাধনে আমাদেরও জীবন যেন গৌরাঙ্গময় হয়।

নববিধানে কেবল উৎসবসমাগম সাধন করাই আমাদের সম্যক্ নয়। প্রকৃতি যেমন সহজে মার কৃপায়, মার প্রভাবে বসন্তের সৌন্দর্য্যে পূর্ণ হইল, ভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গও যেমন ভগবৎকৃপায় এবং তাঁহারই স্বরূপ-গঠনে, তাঁহারই স্বরূপসম্পন্ন হইয়া ভক্তাবতার হইলেন বা নর হইয়াও নারায়ণ হইলেন, আমরাও যেন নীচ মানব-প্রকৃতিপরিহারে ব্রহ্মকৃপাবলে সেই জীবনলাভে একান্ত আকাঙ্ক্ষী হই। তিনি তাঁহারই অনির্ব্বচনীয় শক্তি-প্রভাবে ও কৃপাগুণে, আমাদিগের শুষ্ক তরুসম জীবনকেও নববিধানের নবজীবনে মুঞ্জরিত করিয়া লইবেন। নববিধানে সাধন ও জীবনে প্রদর্শন যেন একই হয় এবং ইহার জন্য যখন তিনি আমাদিগকে এই বিধানে স্থান দিয়াছেন, তখন তিনিই আমাদের জীবনে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া লইবেন। এই বিশ্বাস করিয়া যেন তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করি।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

নিশ্বাস ও বিশ্বাস।

শরীরের পক্ষে নিশ্বাস যেমন, আত্মার পক্ষে বিশ্বাস তেমনি। শরীর বাঁচিয়া আছে নিশ্বাস দ্বারা বুঝা যায়, দেহাভ্যন্তরে যে জীবনীশক্তি আছে, তাহাকে কেহ দেখিতে পায় না, নিশ্বাস দ্বারা সে নিরাকার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। নিশ্বাস প্রশ্বাসিত করে, "আমি আছি"। তেমনি বিশ্বাস প্রশ্বাসিত করে, "তুমি আছ"। বিশ্বাসই ঈশ্বরকে অন্তরে প্রত্যক্ষ করিয়া, তাঁহার উপর নির্ভয়ে, নির্ভাবনায়, নিশ্চিন্ত মনে নির্ভর করে, তাঁহার সহিত

মনে মনে কথা কয় এবং তিনি যে দিকে টানেন সেই দিকে যায়, যাহা করিতে বলেন তাহাই করে, যেখানে রাখেন সেই খানে থাকে, যাহা খাইতে দিতে দেন তাহাই খাইয়া পরিয়া আনন্দমনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। বিশ্বাস আছে যার, দুঃখ অভাব নাই তার।

সহজ ও স্বাভাবিক সাধন নববিধানে।

নিশ্বাস ফেলা যেমন সহজ ও স্বাভাবিক, নববিধানসাধন তেমনি সহজ ও স্বাভাবিক। কোন রকম অসহজ অস্বাভাবিকতা নববিধানে নাই। আহার পান যেমন সহজ ও স্বাভাবিক, সদ্যজাত শিশুও যেমন সহজে ও স্বাভাবিকভাবে আহার পান করে, নববিধানের উপাসনাসাধনও তেমনি। সহজে স্বাভাবিক ভাবে মনে যে আত্মার অভাব বোধ হয়, তাহাই অনুভব করিয়া প্রার্থনা করা নববিধানের প্রার্থনা-সাধন। সম্মুখস্থ আকাশ দর্শন ও বাতাস সম্ভোগ যেমন সহজ ও স্বাভাবিক, বিশ্বাসচক্ষে, এই সম্মুখে ঈশ্বর আছেন, দর্শন করা ও তাঁহার উপাসনা সম্ভোগ করা তেমনি সহজ এবং স্বাভাবিক। শরীর-নিগ্রহ বা কষ্টসাধ্য উপবাস বা দুঃখ-কষ্ট-বহন নববিধানের অনুমোদিত নয়। দুঃখ কষ্ট, অনাহার, বিপদ পরীক্ষা, রোগ শোক সকলই মার অনুগ্রহ জানিয়া এবং সন্তানপালনের বিবিধ স্নেহবিধান-বোধে আনন্দমনে সহজে ও স্বাভাবিক ভাবে তাহা বহন ও কল্যাণপ্রদ আশীর্ব্বাদ বলিয়া সম্ভোগ করাই নববিধানের বৈরাগ্য-সাধন।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সাধনা।

(বরিশাল ব্রহ্মমন্দিরে, ৮ই জানুয়ারী, স্মরণার্থ সভায়, কুমারী মণিকুন্তলা সেন বি, এ, কর্ত্তৃক পঠিত)

জীবলোকের অন্তরে বাহিরে যে প্রবাহ বা গতি অবিশ্রান্ত চলিয়া যায়, তাহার প্রকৃতি অনুসন্ধান করিয়া দেখি—কেবল দ্বন্দ্ব, কেবল বিরোধ। প্রবল দুর্ব্বল, সত্য অসত্য, সুন্দর অসুন্দরে যে অমিল অসামঞ্জস্য উপস্থিত হয়, তাহা লইয়াই এই গতি সচল ও সজীব এবং যে চিরপ্রবহমাণ লহরীলীলার সৃষ্টি করে, তাহারই চলার পথে ইহার উত্থান ও পতন। দ্বন্দ্ব যেখানে, বিরোধ সেখানে—জয় পরাজয়, শান্তি অরাজকতাও সেখানে থাকিবেই। এই ঘাতপ্রতিঘাত, বিরোধ বিদ্রোহ মানুষের অন্তরে বাহিরে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান এবং এই দ্বন্দ্ব বিরোধ লইয়া গতির ধারা যে দিকে মুখ ফিরাইবে, সে দিকের শেষ সীমানায় না পৌছিয়া তাহার বিরাম নাই—পরাজয় নাই। অন্যায় অসত্য যখন বাড়িয়াই চলে, গতি তার তখন এমনিই অপ্রতিহত এবং শেষ সীমানায় যখন উপস্থিত হয়, তখনই জমিয়া ওঠে পুঞ্জীভূত গ্লানি। দুর্ব্বলতা অক্ষমতার অপরাধে যত লাঞ্ছনাই অদৃষ্টে ঘটুক, চিরকাল মানুষ তাহাকে ক্ষমা করে না, সহিয়া যায় না। মানবের সৌভাগ্য অথবা বিধাতার বিধান—যত নিম্নেই সে নামিয়া আসুক, তাহার এ গতিবেগ এক সুরের শেষ ঘাটে আসিয়াই বিলীন হইয়া যায় না, আবার নূতন সুরের নূতন সঙ্গীতের সাধনা তাহার আরম্ভ হইয়া যায়। পতন যেখানে শেষ হয়, তাহারই চিতাভস্মের উপর উত্থানের জয়যাত্রা ঘোষণা করে। কোন এক অশুভ মুহূর্ত্তে মানবের দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া অনেক অসত্যের ভিত্তি পত্তন হয়, মানুষ তাহা জানিতেও পারে না ; কিন্তু ফুলের হার যে দিন সত্যই গলায় ফাঁসি টানিয়া দেয়, সেই দিনই মানুষ লুপ্ত চেতনাকে ফিরিয়া পায় এবং বাঁচিবার জন্য পাগল হইয়া ওঠে। এক একটা জাতি এমনি করিয়াই এক একবার মরে এবং তাহাকে বাঁচাইতে আবার এমনিই পাগলের প্রয়োজন হয়।

এমনি একবার মরণের মুখে এই বাংলার জাতিকে প্রাণ দিতে আসিয়াছিলেন কেশবচন্দ্র। মরণের বুকে নির্ভয়ে পা রাখিয়া কেশবচন্দ্র প্রথমেই দীক্ষা নিলেন অগ্নিমন্ত্রে এবং অগ্নির পূজারী হইয়া বাংলার পাষাণবুকে হোমানল জ্বালাইতে বসিলেন। যত কিছু গ্লানি, যত কিছু দুর্যোগে আগুন জ্বালাইয়া নূতন জীবনের মন্ত্রোচ্চারণ করিলেন। অন্ধতার অন্ধকারে নিমজ্জিত এই জাতির সম্মুখে নূতন প্রাণের প্রথম প্রদীপ জ্বালিয়া ছিলেন রামমোহন। বেদের সাধনায় তৃপ্ত না হইয়া ভারতীয় ঋষি অনুভূতির সাধনায় ডুবিয়া গিয়াছিলেন এবং উপনিষদের ব্রহ্ম-সত্তায় পৌঁছিয়া নির্ব্বাণ-প্রয়াসী হইলেন। উপনিষদের এই সত্যানুভূতিকে সাধনালব্ধ সত্য বলিয়া পাইয়াও ভারতীয় সমাজ বেদের আচার অনুষ্ঠানকে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, এবং ধীরে ধীরে আত্মানুশীলন হইতে বিচ্যুত হইয়া ইহলোকের লাভ ক্ষতিতেই ধর্ম্মকে টানিয়া আনিল। বাংলার ধর্ম্ম, ভারতের সাধনা কুসংস্কারের বোঝা বহিয়া শুধু কঙ্কালমূর্ত্তিতেই পরিণত হইল। হিন্দুধর্ম্মের এই শোচনীয় অবস্থাতে শিক্ষা, সভ্যতা ও ধর্ম্মের নূতন আলো লইয়া আসিল খ্রীষ্টান সমাজ। আত্ম-বিস্মৃত ভারতীয় জাতি পতঙ্গপালের মত সেই আলোতে ঝাপাইয়া পড়িল। আর্য্য ঋষির শিক্ষা, সভ্যতা, উপনিষদের ব্রহ্মজ্যোতি তাহাদের আর গতি রোধ করিতে পারিল না।

জাতির জীবন মৃত্যুর এই সন্ধিক্ষণে রামমোহনের প্রতিভা ও শক্তি তাহাকে রক্ষা করিল। ব্রাহ্মণের কাল্পনিক ব্যাখ্যা হইতে উপনিষদ্‌কে মুক্ত করিয়া রামমোহন তাহার স্বরূপ প্রকাশ করিলেন। ভারতবাসী বুঝিল, তাহাদের ঋষির উপলব্ধ তত্ত্ব-দর্শনকে অতিক্রম করিয়া খ্রীষ্টান সমাজ নূতন কিছু প্রকাশ করে নাই। রামমোহনের চেষ্টায় জাতি আবার আত্মপ্রতিষ্ঠ হইল—তাহার গতির মুখ ফিরিয়া গেল ; কিন্তু যে প্রাণধারা লইয়া রামমোহন আসিয়াছিলেন, তাহার উজ্জ্বলতর বিকাশ দেখিতে পাই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচ-

চন্দ্রের মধ্যে। জাতিকে আত্মপ্রতিষ্ঠ এবং আত্মবিশ্বাসী করিলেন রামমোহন, কিন্তু আধ্যাত্মিকতার চরম পরিণতিতে লইয়া চলিলেন এই ঋষিমণ্ডলী। সমস্ত কুসংস্কার হইতে জীবাত্মাকে মুক্ত স্বাধীন পুরুষ বলিয়া পরিচয় দিলেন কেশবচন্দ্র। মানবাত্মার স্বাধীন সত্তা, স্বাধীন বিকাশ এবং বিশ্বাত্মার সহিত মিলনেই তাহার পরম গতি—আপন জীবনে কেশবচন্দ্র এই সত্য অনুভব করিলেন এবং অকুণ্ঠিতচিত্তে সকলের সম্মুখে তাহার সাক্ষ্য দিলেন। বিরাট মানবাত্মার অসীমতার অবমাননা তিনি কোন দিন সহিতে পারিলেন না। যে অগ্নিমন্ত্র জীবনপ্রভাতে তাঁহার গতি নির্দ্দেশ করিয়া দিল, যে আগুন অহরহ বুকের ভিতর জ্বলিয়া তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল, সেই অগ্নিকুণ্ডে একে একে তাঁহার মুক্ত আত্মার সকল বন্ধন, সকল শৃঙ্খল আহুতি হইয়া গেল। দেহের বন্ধন, মনের কুসংস্কার, আত্মার জড়তা সব সে অগ্নিসাধনার উগ্রতায় দগ্ধ হইয়া গেল। সেই মুক্ত সুন্দর সুনির্ম্মল আত্মার পরমাত্মার প্রকাশ অতি সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া কেশবচন্দ্রের সসীম অস্তিত্বকে অসীম সত্তায় উপনীত করিল। সকল সংস্কার, সকল বন্ধন, সকল অসত্যকে মনের দুয়ার হইতে রুদ্ধ করিয়া, সেই মুক্ত মনের নির্জ্জনপুরে বসিয়া পরমসুন্দরের, চরম সত্যের আবির্ভাব লাভ করাই ছিল কেশবচন্দ্রের জীবন এবং এই সত্যের ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁহার সাধনা। মানবসমাজের আবিষ্কৃত ও প্রতিষ্ঠিত সকল সত্যকে তিনি সাগ্রহে স্বীকার করিলেন, সকল সত্যদর্শী পুরুষকে হৃদয়ের অতি বড় শ্রদ্ধার অঞ্জলি দান করিলেন; কিন্তু কাহারও চরণতলে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলেন না। খ্রীষ্ট তাঁহাকে প্রেমোন্মাদ করিলেন, বুদ্ধ তাঁহাকে তপস্যায় ডুবাইলেন, চৈতন্য তাঁহাকে হরিনামে নৃত্য করাইলেন; কিন্তু নিঃসংশয়ে কাহারও পায়ে আপনাকে অঞ্জলি দিতে তিনি পারিলেন না। সত্যের সন্ধানে সকল প্রশ্ন, সকল সমস্যা তিনি ভগবানের চরণেই নিবেদন করিতেন এবং সেখানেই তাঁহার সকল সমস্যার মীমাংসা হইত।

কেশবচন্দ্রের এই স্বাধীন আত্মানুশীলন এবং সুস্পষ্ট আত্মদর্শনের সাধনা আরম্ভও হইল পরমাত্মার সহিত যোগে এবং তাহার পরিসমাপ্তিও করিলেন অপূর্ব্ব মিলনানন্দে। মানুষ যাহাকে সাধনার সিদ্ধি ও পরাকাষ্ঠা বলিয়া জানে, ভগবানের সহিত সেই একাত্মবোধ ও যুক্তাবস্থাই হইল কেশবের সাধনার গোড়ার কথা। তাঁহার স্বাধীন আত্মা যে কাহারও পায়ে মাথা নত করে নাই, সে আশ্রয় ও নির্ভরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছিল বলিয়াই। কোন সত্যকে যে পূর্ণ বলিয়া নিঃসন্দেহে গ্রহণ করিতে পারেন নাই, সে তাঁহার পরম সত্যের সহিত সাক্ষাৎকারলাভ হইয়াছিল বলিয়াই। পরমাত্মার সহিত তাঁহার এই যোগকে সম্ভব করিয়া দিল তাঁহার অকপট বিশ্বাস এবং তাঁহাকে পাইবার জন্য তীব্র ব্যাকুলতা। যে ব্যক্তি এক মুহূর্ত্তের জন্যও কাহারও অধীনতাকে স্বীকার করিতে পারেন নাই, প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার ভগবানের চরণে কত প্রার্থনা, কত কাতরতা, কত ভিক্ষা! কেশবচন্দ্র ভগবান্‌কে সাধনার পথে সঙ্গী রূপে, সহায়রূপে সর্ব্বদা সম্মুখে, পশ্চাতে, পার্শ্বে রাখিয়া চলিয়াছেন। যখন সংশয় আসিয়া পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়ায়, দৈন্য আসিয়া জীবনের আশা আনন্দকে নির্ম্মূল করে, প্রশ্ন আসিয়া জীবনকে জটিল করিয়া তোলে, তখন প্রার্থনাই তাঁহার পথে আলো জ্বালিয়া দেয়। বাল্যকালে কোন্ দিন কে তাঁহার বুকের ভিতর বলিয়া গেল, "প্রার্থনা কর"—সেই দিন হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই প্রার্থনাই তাঁহার সকল অভাব পূর্ণ করিয়াছে। কেশবচন্দ্র চাহিতে জানিতেন, তাই তিনি চাহিয়া একবারও বিমুখ হইয়া ফিরিয়া আসেন নাই। এই প্রার্থনা ও বিশ্বাসের ভিতর দিয়াই তিনি ভগবান্‌কে হৃদয়ে খুঁজিয়া পাইলেন। হৃদয়ে দেবতার আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া সেখানে শুধু তিনি এই দেবতারই অধীন হইয়া রহিলেন। সুখ, শান্তি, ভোগ, আরাম, মোহ, ভয় কোন কিছুই যাঁহাকে এতটুকু আটকাইতে পারে নাই, তাঁহার এ অধীনতা কেন? মুহুর্মুহু আপনার অক্ষমতা জানাইয়া ভিক্ষা চাহিতে তো সঙ্কোচ হইল না। স্বাধীনতা আমরা জানি না, বুঝি না; তাই স্বাধীন হইতে গিয়া বাহিরে সাজি উচ্ছৃঙ্খল, ভিতরে ফণা তুলিয়া দাঁড়ায় অহংকার। তাই বিশ্বাসে আমরা শিথিল, প্রার্থনায় আমাদের সঙ্কোচ। সত্যকে যারা চিনিয়াছে, তাহারা অসত্যকে ভাঙ্গিতে পারে, কারণ গড়িতেও তারা জানে। কিন্তু ধ্বংসই যাহার প্রকৃতি, সে যে সত্যকেও গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলে। কেশবচন্দ্র সত্য পাইয়াছিলেন, তাই সত্যের সঙ্গে তাঁর এত সখ্য, সত্যের কাছে তাঁর এই মিনতি। এই সত্যকে রক্ষা করিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে আত্মপরীক্ষায় হৃদয়কে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিতেন—পাপের গন্ধও সেখানে সত্যকে মলিন না করে। তীব্র বিচারে হৃদয়কে দগ্ধ করিয়া পাকা সোণা করিয়া তুলিতেন, সে সোণায় সত্যের যে ছাপ লাগিয়া যাইত, তাহা নিখুঁত, তাহা অবিকৃত, তাহা সুন্দর।

কেশবচন্দ্রের এই যোগের সাধনা তাঁহার নিকট মধুর হইয়া ফুটিয়া উঠিল ভক্তি ও প্রেমের রস লইয়া। বিচারে যোগ সিদ্ধি দিয়াছে, কিন্তু তৃপ্তি আনিল না। বিচারের সাধনার তীব্রতায়, উত্তেজনায় দেহের সর্ব্বত্র বিন্দু বিন্দু রক্ত বহিয়া যাইত, চোখ ফাটিয়া রক্তের ফোটা পড়িয়া যাইত; কিন্তু এও তাঁহাকে আনন্দ দিল না, তৃপ্তি দিল না, যতদিনে না রক্তের পরিবর্ত্তে আবেগে, উচ্ছ্বাসে অশ্রুবন্যা তাঁহার বক্ষ ভাসাইয়া দিয়াছে। এই অপূর্ব্ব মিলনানন্দে বিভোর হইয়া যেদিন উন্মত্ত নৃত্য করিতে পারিলেন, সেই দিনই চিত্ত শান্ত হইল, প্রাণ তৃপ্তি লাভ করিল। ভগবানের বিশাল বিশ্বমূর্ত্তি, আবার মধুর প্রেমঘন মূর্ত্তি ভক্ত দুইই চায়, নতুবা তার তৃপ্তি কোথায়?

নিজের বুকের ভিতরে যে নূতন আলো, নূতন সত্য কেশবচন্দ্র

খুঁজিয়া পাইলেন, মানবের নিকট সে অমূল্য রত্ন স্থাপন করিতে তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। যিনি মানবাত্মার স্বাধীন সত্তায় বিশ্বাসবান্, স্বাধীন অনুশীলনের একান্ত অনুরাগী, তিনি মানবের নিকট ঘোষণাও করিলেন তাহাই। যিনি অপরের নিকট আপনাকে সমর্পণ করিতে কোন দিন পারেন নাই, তিনি অপরকেও আপনার নিকট সমর্পিত করিয়া লইতে স্বীকার করিলেন না। যে যোগ তাঁহাকে পথ দেখাইয়াছে, তাহা অসাধারণ, আয়াসলব্ধ বস্তু নয়, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। সুতরাং এই যোগই সকলের পথের কথা কহিয়া দিবে নিজের জীবনের সাক্ষ্যদ্বারা, শুধু এই কথাটাই তিনি সকলকে জানাইলেন। তাই তিনি গুরু হইতে চাহিলেন না, বন্ধুরূপে পরস্পরে স্নেহ ভালবাসার বিনিময়েই সকলকে আপন করিয়া লইলেন। আচার্য্য হইয়া উপদেশ দেওয়া তাঁহার সহ্য হইল না, সেবক হইয়া নিবেদন জানানোই ছিল তাঁর প্রকৃতি। প্রভু হইয়া সেবা ও সম্মান গ্রহণ করিতে তিনি পারিলেন না। বন্ধুদের পায়ের জুতার উপরে মাথা রাখিয়া ভুক্তাবশিষ্ট কুড়াইয়া খাইয়াই তাঁহার তৃপ্তি হইল। অতবড় স্বাধীনচেতা বীর প্রেমে বিনয়ে এ বৈষ্ণবধর্ম্ম কোথায় শিখিলেন, ভাবিয়া অবাক হই। তিনি শুধু আত্মমর্য্যাদাকে ভালবাসিলেন না, অপরের মর্য্যাদাকেও সমান চোখেই দেখিলেন। যে প্রেমের উন্মাদনা তাঁহাকে হরিসঙ্কীর্ত্তনে টানিয়া নিল, সেই প্রেমধারার স্পর্শ পাইয়া তাঁহার সঙ্গিগণ তৃপ্তিতে পূর্ণ হইয়া যাইতেন। দ্বিধা সঙ্কোচ বলিয়া কোন জিনিস কেশবচন্দ্রের নিকটে তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ জানিতেন না, এমন কি প্রভু ভৃত্যের সম্পর্কটিও ছিল এইরূপ। শাসন করিয়া মানুষকে তিনি সংশোধন করিতে তেমন সুবিধা পাইতেন না, কাঁদিয়া বুকে জড়াইয়া সংশোধন করাই তাঁহার পক্ষে সহজ হইত বেশী। বন্ধুবান্ধবকে পরিবারের বাহিরে বাহিরে রাখিয়া তিনি ভালবাসিতে পারিলেন না, তাই 'ভারত আশ্রম' গড়িয়া সকলকে লইয়া এক বিরাট পরিবার সৃষ্টি করিলেন। পিতার বিশ্বপ্রেমে সন্তানগণও বুঝিতে পারে নাই, কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদের অনাত্মীয়, কে তাঁহাদের পর। নিজেকে এমন করিয়া সকলের সঙ্গে সমান করিয়া রাখিতেন। বন্ধু, দরদী ছাড়া কাহারও প্রভু হইতে পারিতেন না বলিয়াই, লোক তাঁহার নিকট আপনিই আত্মসমর্পণ করিয়া যাইত।

আত্মহারা প্রেমিক কেশবচন্দ্র নিজেকে এমন করিয়া বিলুপ্ত করিলেন, কিন্তু এ প্রেমবারি তাঁহার অগ্নিমন্ত্র, তাঁহার স্বাধীনতাকে কখনও নিস্তেজ, দুর্ব্বল করিতে পারে নাই। যে নীতি, যে পথ বিবেকরূপে ভগবদ্‌বাণী তাঁহার অন্তরে থাকিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে, সে নীতি, সে পথকে শিথিল করিতে পারে, টলাইতে পারে, এমন কোন শক্তি বা প্রভাব তাঁহাকে জয় করিতে পারে নাই। যাহা সত্য জানিয়াছেন, তাহা প্রতিষ্ঠা করিতে তাঁহার বিন্দুমাত্র ভয় ছিল না। তাঁহার প্রেম, তাঁহার বিনয় কোন দিন তাঁহাকে দুর্ব্বল করে নাই। বীরত্ব ও বিনয়ের এই অপূর্ব্ব সংমিশ্রণই ছিল কেশবচন্দ্রের জীবনের বড়কথা।

এই বীরত্ব, এই আত্মসম্মানবোধ তাঁহার নিকট ধরাইয়া দিল তাঁহার জাতির দুর্ব্বলতা। জাতির জড়তা, দুর্ব্বলতা এবং আত্মবিস্মৃতি দেখিয়াই তিনি আগুনের সাধনা লইয়া দাঁড়াইলেন। আত্মমর্য্যাদাবোধে, জাতীয়তাবোধে, তাহাদের প্রবুদ্ধ করিতেই ছিল তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগঠনেই ছিল সে অফুরন্ত কর্ম্মপ্রেরণার অভিব্যক্তি। আপনার অর্থ, আপনার সামর্থ্য সব কিছু এই কর্ম্মযজ্ঞে নিঃশেষে দান করিয়া আপনি ফকির হইয়া দাঁড়াইলেন। শক্তিমান সমাজই শক্তিমান জাতি সংগঠন করে। তাই সমাজগঠনেই ছিল তাঁর আগ্রহ। শিক্ষাহীনতা এবং কুশিক্ষা, ধর্ম্মহীনতা এবং কুসংস্কার পাষাণের মত বাংলার বুকে চাপিয়া বসিয়াছিল, কাজেই নরনারীকে সুশিক্ষা ও সুধর্ম্ম দান করাই ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। এই ব্রত উদ্‌যাপনে আপনার সকল শক্তি সম্পূর্ণ ব্যয় করিয়া তবে তিনি তৃপ্ত হইলেন, নিশ্চিন্ত হইলেন।

জাতির অধঃপতন যখন ঘটে, মৃত্যু যখন ঘনাইয়া আসে, তখনই হয় এই সব ব্রতধারী জীবনের আবির্ভাব। যে শক্তি, যে প্রেরণা, যে নব চেতনা তাঁহারা জাতিকে দান করিয়া যান, তাহাই হয় আবার জাতির বহুদিন ধরিয়া বাঁচিবার উপাদান। বাংলার সমাজে কেশবচন্দ্রের দান এমনিই বহুকালের সম্পত্তি। বিদ্যায় ও পাণ্ডিত্যে কেশবচন্দ্র বাংলার শ্রেষ্ঠ পুরুষ নহেন, কিন্তু প্রাণের প্রাচুর্য্যে, সাধনার তীব্রতায়, শক্তির প্রভায় কেশবচন্দ্র বাংলায় যে জাগরণের চেতনা আনিয়া দিলেন, যে বিকাশের প্রেরণা আনিয়া দিলেন, তাহা লইয়া বাংলা সত্যই বাঁচিয়া উঠিয়াছে এবং সত্যই বহুদিন বাঁচিবে। ধ্যানী কেশবচন্দ্র, বিবেকবান কেশবচন্দ্র, বিরাগী কেশবচন্দ্র মানবতার যে আদর্শ রাখিয়া গেলেন, মানবাত্মার ক্ষুদ্রত্বকে যে অসীমত্বে পৌঁছাইয়া দিলেন, তাহার পরিচয়, তাহার আস্বাদ বাংলায় নূতন, সন্দেহ নাই। মানবাত্মার স্বাধীনতার এমন সুসংবাদ বহুদিন এ জাতি পায় নাই, তাই কেশবচন্দ্রের দান বাংলায় অপরিমেয়। ব্রহ্মের সহিত মিলনলাভের এমন সহজ স্বাভাবিক প্রণালী ও কৌশল কেশবচন্দ্রই প্রথম আপন জীবন দিয়া দেখাইলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন, সকল মানুষই অনায়াসে ব্রহ্মানন্দ লাভ করিতে পারে, কিন্তু তিনি জানিতে পারেন নাই, কত সঞ্চিত মালিন্য সাধারণ মানবহৃদয়ে ব্রহ্মবিকাশের পথ রোধ করিয়া দেয়, কত ক্লেশ যে মলিনতায় তাহারা পায়; কিন্তু তাহাকে দূর করিবার ক্ষমতা ভাগ্যবানেরই থাকে। কেশবচন্দ্র যাহা বিশ্বাস করিতেন, আজ তাহাই আশীর্ব্বাদ বলিয়া তাঁহার প্রেমিক প্রাণের নিকট প্রার্থনা করি।

(১৩৩৯ সালের মাঘের 'ব্রহ্মবাদী' হইতে উদ্ধৃত)

অনুভূতিকে রূপ দান করো।

অনুভূতিকে রূপ দেওয়াই মানবের ধর্ম্ম। অনুভূতিকে রূপে রসে অলঙ্কৃত করিতে গিয়া জগতে এক একটী ধর্ম্ম বা সাধনার সৃষ্টি হইয়াছে। অনুভূতির প্রথম রূপ ভাব, ভাব হইতে অন্তরে রসোদয় হয়। এই রস হইতে যেমন একদিকে কবিতা ছন্দ ও সংগীতের সৃষ্টি হইয়াছে, অন্যদিকে ধর্ম্মতত্ত্ব, দর্শন, সেবা, শিল্প ও কর্ম্মের সূচনা হইয়াছে। অনুভূতিই সৃষ্টির মূল। পরিবার-প্রতিষ্ঠা, মণ্ডলীপ্রতিষ্ঠা, সমাজপ্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের মূলে সত্যের অনুভূতি আছে। মহাপুরুষ-দিগের অনুভূতির পূর্ণ অবয়ব ধর্ম্মমণ্ডলী বা ধর্ম্মসঙ্ঘ। মণ্ডলী-প্রতিষ্ঠান সাধকদিগের দীর্ঘ সাধনার সাক্ষাৎ সিদ্ধি।

প্রত্যেক মহাপুরুষ বা সাধক নিজের অনুভূতিকে নিজের মধ্যে রূপ দান করেন, তখন তাঁহার নিজের অন্তরে একটী নূতন সৃষ্টির বীজ অঙ্কুরিত হয়। সৃষ্টির প্রকাশ হয় বাহিরে—ভিতরের বীজ বাহিরে ফল ফুলে ফুটিয়া উঠে। ইহাই প্রকৃতির বিধান। চক্ষের অগোচর একটী সূক্ষ্ম জীবাণুবীজ মাতৃগর্ভে রোপিত হয়, অল্পে অল্পে বর্দ্ধিত হয়, একটী রূপের পর আর একটী রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মানবদেহে বাহিরে ফুটিয়া উঠে। ভিতরে যাহা বীজরূপে স্থিতি করে, তাহার প্রকাশ বাহিরে। সৃষ্টির মূল কি? তাহার ভিতরের প্রাণ। প্রাণের প্রকাশেই সৃষ্টি শোভা সৌন্দর্য্যে পূর্ণ হয়। বাহিরের দিক হইতে সৃষ্টি কোন দিন প্রস্ফুটিত হয় না।

হে সাধক। তোমার অনুভূতিকে তোমার নিজের মধ্যে রূপ দান কর। তোমার অনুভূতি যখন তোমার অন্তরে রূপে রসে পূর্ণ হইবে, তাহার প্রকাশ হইবে তখন বাহিরের আধারে—দেহে, মনে, আচারে, দৃষ্টিতে চিন্তায়, বাক্যে, সেবায় ও কর্ম্মে; বহির্জগতে তাহার প্রকাশ ফুটিয়া উঠিবে—তোমার পরিবার, তোমার মণ্ডলী, তোমার সমাজ তাহার শোভা সৌন্দর্য্যে পূর্ণ হইবে। তখন তুমিই হইবে তোমার নূতন সৃষ্টি—অনুভূতির ছাঁচে ঢালাই করা একটী নূতন মানুষ!

হে সাধক! এমন একটী স্বাস্থ্যকর নূতন আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে হইবে যে, নিজের ভিতর সেখানে যাহা কিছু দূষিত ও দুর্গন্ধ, তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে। এই নূতন আবহাওয়ার ভিতর বাস করিলে, শ্বাস প্রশ্বাস নূতন হইবে, চিন্তা নূতন হইবে, এবং কর্ম্ম নূতন হইবে; স্থূল কথা, একটী রূপান্তরিত নূতন মানুষ গড়িয়া উঠিবে। এই নূতন মানুষের ভিতর দিয়া যে ভাব-ধারা উথলিত হইবে, তাহাই হইবে বাহিরে কর্ম্মের প্রাণ। এই ভাবধারার অমৃত স্পর্শে নূতন কর্ম্মনন্দির গজাইয়া উঠিবে। কর্ম্ম দেহ, ভাব প্রাণ—ভাব কর্ম্মের প্রসূতি। কর্ম্ম অনুভূতির বাহ্য অবয়ব—অনুভূতির বাহিরের রূপ মণ্ডলী ও সমাজ।

নববিধানের নূতন অনুভূতি কি? মিলিত জীবন বা Collective life। একত্রে উপাসনা করিলে বা সহস্র সহস্র লোক মিলিত হইয়া কোন বৃহৎ অনুষ্ঠানের আয়োজন করিলে, তাহাকে প্রকৃত মিলিত জীবন বলা যায় না; যদিও বাহ্যতঃ তাহা মিলিত জীবনের লক্ষণ প্রকাশ করে। আদি যুগ হইতে মানব-জীবন ক্রমবিকাশের ধারা বহিয়া যে নূতন ক্রমপূর্ণ জীবনে ফুটিয়া উঠে, তাহাই সাক্ষাৎ মিলিত জীবন বা Collective life। পাঁচটী বিভিন্ন ধাতু রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা যখন একটী ধাতুতে পরিণত হয়, তখন তাহাকে মিশ্র (বা Compound) ধাতু বলে। এই মিশ্র ধাতু একটী সম্পূর্ণ গুণবিশিষ্ট স্বতন্ত্র পদার্থ, একটী রূপান্তরিত ধাতু। যে জীবন প্রাচীন যুগের সত্য, ভাব, গুণ ও কর্ম্ম লইয়া নবযুগের নূতন জীবন সৃষ্টি করে, তাহাই মিলিত জীবন (Collective life); ইহা একটী অঙ্গাঙ্গীভূত নূতন সত্তা, নূতন জীবন (New organism)। প্রাচীন ও নবীনের সমাবেশে ইহা একটী নূতন প্রাণধারা। এই নূতন প্রাণধারার ভিতর সকল ধারা মিলিত হইয়াছে। সকল ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রবাহ যেমন সাগরসঙ্গমে মিলিত হয়, সেইরূপ প্রাচীন যুগের সকল সত্য, ভাব, গুণ ও কর্ম্ম নূতন জীবনের সাগরসঙ্গমে আসিয়া একাকার হয়। প্রকৃতির মধ্যে যে বিধান প্রস্ফুটিত হইয়াছে, মানবপ্রকৃতিতেও সেই বিধান কার্য্য করিতেছে। ইহাই সৃষ্টির সনাতন বিধি।

মিলিত জীবনের (বা Collective life) আর একটী ধারা জীবনসমন্বয়। এক একটী জীবন এক একটী খণ্ড সত্তা, ভাব ও গুণের আধার। শ্রীভগবান্ অখণ্ড ও অব্যয়। সচ্চিদানন্দ শ্রীহরি অখণ্ড ও অব্যয় হইয়া, খণ্ড মানবাত্মায় বিচিত্র ভাব ও রসের সৃষ্টি করিয়াছেন। সকল খণ্ড ভাব, খণ্ড সত্তা, খণ্ড গুণ ও খণ্ড রসের সমাবেশে, এক অখণ্ড সত্তা ও ভাবের অভিব্যক্তিই নববিধানের নূতন অনুভূতি। এই নূতন অনুভূতিকে রূপ দিতে হইলে, এক অখণ্ড মানবাত্মাকে অন্তরে জাগ্রত করিতে হইবে, অবিভক্ত প্রাণধারা আত্মায় সৃষ্টি করিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ যেমন বিরাট বিশ্বরূপ দেখাইয়া অর্জ্জুনকে আশ্চর্য্য, মুগ্ধ ও স্তম্ভিত করিয়াছিলেন, নবযুগের সাধকের ভিতরও সেই বিরাট বিশ্বরূপ সৃষ্টি করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের বিরাট বিশ্বরূপ, আচার্য্য কেশবচন্দ্রের অখণ্ড জীবাত্মা, এবং মহর্ষি ঈশার "I and my Father are one" একই অনুভূতি—একই যোগশাস্ত্রের কথা। এই মহাযোগের অনুভূতি হইতে জগতে নব নব সৃষ্টিধারা রচিত হইতেছে, নব নব বিধানের অভ্যুদয় হইতেছে। যাহা অখণ্ড, তাহাই বিরাট। জীবাত্মায় এই অখণ্ডত্ব আরোপ করো, জীবাত্মাও বিরাটরূপে প্রকটিত হইবে।

সৃষ্টির বিধানই একত্বের বিধান, যোগের বিধান, এক অবিভক্ত যোগের ভিতর দিয়া সৃষ্টি পূর্ণ হইতেছে। প্রাচীন ও নবীন যুগের একত্ব স্বীকার কর, তাহা এক অখণ্ড যুগে পরিণত হইবে। সকল খণ্ড ধর্ম্মবিধানের ক্রমবিকাশ স্বীকার কর, তাহা এক

অখণ্ড ধর্ম্মবিধানের আভাস দান করিবে। মানবাত্মার সকল খণ্ড সত্তা, খণ্ড ভাব, খণ্ড গুণ ও কর্ম্মকে এক ধারাবাহিক ক্রমসূত্রে গ্রথিত কর, তাহা এক অখণ্ড সত্তা ও ভাবে পরিণত হইবে। আত্মার এই অখণ্ড সত্ত্যের আবির্ভাবই অখণ্ড জীবাত্মার পরিচয়। জীবাত্মার এই নূতন জন্মই তাহার বিরাট বিশ্বরূপের সাক্ষাৎ উপলব্ধি।

হে সাধক! তোমার অনুভূতিই তোমার নিকট অমূল্য। এই অনুভূতিযোগেই তুমি আপনি আপনাকে জয় করিতে পারিবে। "যে ব্যক্তি আপনাকে আপনি জয় করিয়াছে, সেই আপনিই আপনার বন্ধু"। (গীতা) তুমি তোমার অনুভূতিকে যখন নিজের অন্তরে রূপদান করিবে, তখনই তুমি শক্তিসম্পন্ন হইবে যে শক্তির নিকট পৃথিবী পরাজয় স্বীকার করিবে। তোমার অনুভূতির অজেয় শক্তিই তোমার সৃজনী শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিবে। নিজেকে এরূপ ভাবে সৃষ্টি করো, যেন তুমিই তোমার সকল অভাবের পূর্ণতা হও। তুমি তোমার উপাসনামন্দির হইবে, তুমিই তোমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবন্ধু হইবে, তুমিই তোমার আত্মারাম হইবে অর্থাৎ আপনাতে আপনি রমণ করিবে, তুমিই তোমার ভক্তিভাজন গুরু হইবে, তখন "নিজ পদধূলি, নিজ মাথে তুলি, লইবে ভকতি করি" এই মহাবাক্য তোমার জীবনে সার্থক হইবে। তুমিই নরহরি হইবে। এই নরহরিরূপ ধারণ করা, আর অনুভূতিকে রূপদান করা একই কথা।

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নদীর বেলায় উৎসব।

যাই নাই আমি উৎসবে এবার,
উৎসব এবার এই নদীর বেলায়,
সেই যে নীরব মূর্ত্তি নীরব "মীরার"
দেখিয়াছি সেই মুখে উৎসব হেথায়!
দেখিয়াছি আমি হেথা নবীন উৎসব,
নবীন সমাধি সেই নবীন মূর্ত্তিতে,
নবীন উৎসবে সেই "মীরা" যে নীরব,
দেখিলাম বসে' তাই সুদূর ভূমিতে!
যোগিনী মীরার মূর্ত্তি নিস্পন্দ নয়ন,
যোগিনীর নব যোগ সমাধি তাঁহার,
পার্শ্বে বসে' তাই আমি করিনু দর্শন,
যোগিনীর যোগভঙ্গ হলোনা এবার!
বিগত উৎসবে সেই এসেছি দেখিয়া
"মীরার" মূরতি সেই উৎসবপ্রাঙ্গণে;
কি দেখিব আজ আর সেই স্থানে গিয়া,
দেখেছি উৎসব আমি এবার শ্মশানে!
উৎসবের দিনে তাই শ্মশানেতে গিয়া
বসিনু এবার সেই নদীর বেলায়,
"সুবর্ণ রেখার" স্রোত যেতেছে চলিয়া
উৎসবসঙ্গীত ধরি ছুটেছে তথায়।
"মীরার" উৎসব, তথা "মীরার" সঙ্গীত,
"মীরার" সে ভক্তিকথা মীরার শ্মশানে—
শুনিলাম বসে' তথা "মীরার" সহিত,
উৎসব এবার তাই হইল এখানে।
প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে সেই সমাধিতে বসি,
সেই কুচবিহারেতে সেই যে যোগিনী,
"নৃপেন্দ্র" সমাধিপার্শ্বে অশ্রুজলে ভাসি,
দেখেছি তথায় সেই নব তপস্বিনী।
সে উৎসব পূর্ণ তাঁর এবার এখানে,
নীরব শ্মশানভূমে নীরব বেলায়,
দেখিলাম তাই আমি বসিয়া শ্মশানে,
"মীরার" উৎসব এই সুবর্ণরেখায়।

নামকুম, পোঃ রাঁচি। — শ্মশান-উৎসবের যাত্রী— গৌরীপ্রসাদ মজুমদার

ত্র্যধিকশততম মাঘোৎসবের বিবরণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১০ই মাঘ, সোমবার—প্রাতে ৭॥টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু নির্ব্বাহ করেন। সন্ধ্যা ৬টার সময় ব্রহ্মমন্দির হইতে নগরকীর্ত্তন বাহির হয়। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে মণ্ডলীর পুরুষ মহিলা অনেকে মন্দিরে সমবেত হন। কীর্ত্তনের দল ব্রহ্মমন্দিরে বসিয়া প্রথমে কীর্ত্তন করেন। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একটী প্রার্থনা করিলে পর, কীর্ত্তনের দল কীর্ত্তন করিতে করিতে মন্দির হইতে বাহির হইয়া, অন্যান্য বৎসরের ন্যায় ঝামাপুকুরের রাস্তা ধরিয়া কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে উপস্থিত হন। তৎপর কীর্ত্তন করিতে করিতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মুখ ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া কিছুকাল কীর্ত্তন করিয়া, সুখিয়া ষ্ট্রীট ধরিয়া পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হন ও স্থানে স্থানে দাঁড়াইয়া জমাট কীর্ত্তন করেন। পরে রামমোহন রায় রোড, রাজা দিনেন্দ্র ষ্ট্রীট, গড়পার রোড হইয়া কীর্ত্তনের দল অপার সার্কুলার রোডে উপস্থিত হন এবং কীর্ত্তন করিতে করিতে কমলকুটীরে উপনীত হইয়া, নবদেবালয়ের সম্মুখস্থ রোয়াকে দাঁড়াইয়া জমাট কীর্ত্তনান্তে, কীর্ত্তনের কার্য্য শেষ করেন। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কীর্ত্তনে নেতৃত্ব করেন। কীর্ত্তনান্তে প্রীতিভোজন হয়।

১১ই মাঘ, মঙ্গলবার—ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৭॥টায় ও সন্ধ্যা ৬৷৷০টায় উপাসনা হয়। প্রাতে ভাই নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

উপাসনা করেন। "আচার্য্যের উপদেশ" প্রথম ভাগ হইতে ১১ই মাঘের নিবেদন পাঠ করিয়া, সরল সুমিষ্ট প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যা ৬৷৷টায় ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ সেন তাঁহার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ও ভাবোচ্ছ্বাস সহকারে উপাসনা করেন।

১২ই মাঘ, বুধবার—নববিধান-ঘোষণার দিন। প্রাতে ৭৷৷টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা ডাক্তার সত্যানন্দ রায় সম্পন্ন করেন। তাঁহার স্বাভাবিক বিধান-নিষ্ঠা, গাম্ভীর্য্য ও মিষ্টতা সহকারে এ বেলার আরাধনা, পাঠ, প্রসঙ্গ ও প্রার্থনাদি সম্পন্ন হয়। সন্ধ্যা ৬৷৷টায় ব্রহ্মমন্দিরে আনন্দসম্মিলন হয়। প্রথমে যুবকগণ একটী সঙ্গীত করেন। সঙ্গীতের পর ভাই গোপালচন্দ্র গুহ "নববিধানকে জয়ী করিব" আচার্য্যদেবের এই প্রার্থনাটী পাঠ করেন। তৎপর ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক "আচার্য্যের উপদেশ" হইতে "নবশিশুর জন্ম" নববিধান-ঘোষণার দিনের উপদেশটী পাঠ করেন। তৎপর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পুণ্যেন্দ্রনাথ মজুমদার তাঁহার সুকণ্ঠে ও সুললিত ভাষায় বিধানবাহক ভক্ত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনে ব্রহ্মলীলা বর্ণনা করিয়া, নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা নববিধানের মহিমা বিবৃত করেন। তৎপর ভক্ত-কন্যা শ্রীমতী মণিকা মহলানবিশ এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুবোধ-চন্দ্র মহলানবিশ তাঁহাদের সুলিখিত সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করিয়া নববিধানের মহিমা ঘোষণা করেন। এই দুইটী প্রবন্ধ পূর্ব্বে তত্ত্বে প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপর শ্রীমতী শোভা সেন ধর্ম্মের বিকাশ বিষয়ে তাঁহার লিখিত সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করিলে, শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্রনাথ রায় স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাবে কেশবচন্দ্রের জন্মদিনে উর্দ্দু ভাষায় নিজরচিত সঙ্গীতটীর বঙ্গানুবাদ বলিয়া তাহা গান করেন। তৎপর মাননীয়া মহারাণী সুচারু দেবী সংক্ষেপে সুমিষ্ট ভাষায় বিধানের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া সকলকে উৎসাহিত করেন। সর্ব্বশেষে ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ আপনার মন্তব্য প্রকাশ করিলে অদ্যকার কার্য্য শেষ হয়।

১৩ই মাঘ, বৃহস্পতিবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৯৷৷টার সময় কমলকুটিরস্থ ভিক্টোরিয়া স্কুলের প্রশস্ত গৃহে আর্য্যনারীসমাজের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা ও তৎপরে প্রীতিভোজন হইয়াছে। ভগিনী মাননীয়া মহারাণী সুচারু দেবী তাঁহার সুমধুর আরাধনা ও প্রার্থনায় শ্রোতৃবর্গকে বিশেষভাবে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। তাঁহার সুমিষ্ট আরাধনাদি গতবারে ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হইয়াছে। আর্য্যনারীসমাজের ভূতপূর্ব্ব সভানেত্রী ও প্রতিনিধি শ্রীমতী মহারাণী সুনীতি দেবীর তিরোধানে, তাঁহার উৎসাহপূর্ণ উপাসনাদি স্মরণ করিয়া, সকলেই তাঁহার অভাব বিশেষ ভাবে অনুভব করিয়াছেন। তিনি ভগ্নীদিগকে সম্বোধন করিয়া শেষ যে উপদেশ দান করিয়াছিলেন, শ্রীমতী মণিকা দেবী তাহা পাঠ করেন। উহা ধর্ম্মতত্ত্বে পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমতী ভক্তিমতি মিত্র ও শ্রীমতী মাধমমোহিনী বসু স্বর্গীয়া শ্রদ্ধেয়া ভগিনীর উদ্দেশে প্রার্থনা করিয়াছেন। শ্রীমতী মণিকা গুপ্ত, শ্রীমতী বাণী চাটার্জ্জী ও শ্রীমতী সুধা সেন সুমিষ্টকণ্ঠে সঙ্গীত করিয়াছেন। শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দদেব ও শ্রীমতী ব্রহ্মনন্দিনীর প্রার্থনাপাঠান্তে শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী তাঁহার স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সকলকে সুখী করিয়াছেন।

ঐ দিন পূর্ব্বাহ্ণ ৮টায়, কেশব একাডেমী বিদ্যালয়ে উৎসব হয়। ডাক্তার শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন। সন্ধ্যা ৬৷৷টায় ব্রহ্মমন্দিরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভা হয়।

১৪ই মাঘ, শুক্রবার—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে, প্রচার-কার্য্যালয়ের উৎসবে, অপরাহ্ণ ৫টায় ব্রহ্মমন্দিরের খোলবাদক গোপীনাথ বাবাজি তাঁহার মধুর কণ্ঠে হরিনামগুণাত্মক সঙ্কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী সুমিষ্ট উপাসনা করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ, অতীতে এখানে যে সকল প্রেরিত প্রচারক নববিধানপ্রচার-ক্ষেত্রের পুণ্য কার্য্যে আত্মজীবন দান করিয়া সেবাকার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনের প্রভাব এখনও এখানে কেমন জীবন্ত অনুভূতির বিষয়, তাহা উল্লেখ করিয়া প্রার্থনা করেন। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক শ্রীমদাচার্য্য-দেবের ভারতাশ্রমের একটী বিশেষ প্রার্থনা পাঠ করেন। উপা-সনান্তে প্রীতিভোজন হয়।

১৫ই মাঘ, শনিবার—সন্ধ্যা ৬৷৷টায় শান্তিকুটীরে "আমাদের সঙ্ঘের" উৎসব হয়। ডাক্তার শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন। উপাসনার পূর্ব্বাপর 'গৌরলীলা' বিষয়ক যাত্রাগান হয়। প্রীতিভোজনে অদ্যকার অনুষ্ঠান শেষ হয়।

১৬ই মাঘ, রবিবার—পূর্ব্বাহ্ণে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ব্রহ্ম-মন্দিরে উপাসনা করেন। শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বসু তাঁহার সুকণ্ঠে সঙ্গীত করিয়া উপাসনার বিশেষ সহায়তা করেন। অপরাহ্ণ ৩টার সময় ব্রহ্মমন্দিরে নববিধানবিশ্বাসিগণের সভা হয়। সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন। তাহার লিখিত উপদেশ বারান্তরে প্রকাশিত হইয়াছে।

১৭ই মাঘ, সোমবার—ব্রহ্মমন্দিরে পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে শ্রীদরবারের উৎসব হয়। সন্ধ্যা ৬৷৷টায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর বার্ষিক সভার কার্য্য হয়। শ্রীদরবারের উৎসব উপলক্ষে পূর্ব্বাহ্ণে ৯টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার প্রথমাংশ নির্ব্বাহ করেন। ভাই অখিলচন্দ্র রায় ও নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ প্রার্থনা করেন। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক পাঠ ও শেষ প্রার্থনা করেন। অপরাহ্ণে শ্রীদরবারের বার্ষিক সভা হয়।

১৮ই মাঘ, মঙ্গলবার—সন্ধ্যা ৬৷৷টায় কমলকুটীরে নবদেবালয়ে শান্তিবাচন হয়। নবদেবালয়ে ও দেবালয়ের সম্মুখস্থ রোয়াকে মহিলাগণের স্থান হয় এবং নবদেবালয়ের সম্মুখস্থ সমাধি-ক্ষেত্রে পুরুষগণের বসিবার স্থান হয়। পূর্ব্বাপর কীর্ত্তন হয়। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কীর্ত্তনের নেতৃত্ব করেন। মধ্যে ভাই

গোপালচন্দ্র গুহ সময়োপযোগী প্রার্থনা করেন, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সেন শ্রীমদাচার্য্যদেবকৃত শান্তিবাচনের প্রার্থনা পাঠ করেন। এইরূপে এবারের উৎসবের কার্য্য শেষ হয়। নববিধান-জননীর কৃপায় এবারকার উৎসব সকলের জীবনে সার্থক হউক।

স্বর্গীয় ভাই শান্ত সাধক।

প্রেরিত ভাই কেদারনাথ যথার্থ শান্তসাধক ছিলেন, তাই শ্রীমৎ আচার্য্যদেব দেখিয়া বুঝিয়া শান্ত সাধক নাম প্রদান করিয়াছিলেন। ভাই কেদারনাথ অতি শৈশবকাল হইতেই এই প্রকৃতিবিশিষ্ট ছিলেন। ছোট বড় সকলের সঙ্গে সুশীল বালকের মত মিষ্ট ব্যবহার করিয়া সকলের মন তুষ্ট করিতেন।

বিদ্যার্জ্জন করিয়া বড় হইয়া ২১ বছর বয়সে যখন বিবাহ করিলেন পরিগ্রাম মল্লারচকে, সেখানে অনেক মেয়েরা ভাই কেদারনাথকে উপহাসাস্পদ করিবার জন্য নানা প্রকার বাক্যাড়ম্বর করিতে লাগিল। তিনি শান্তভাবেই রহিলেন দেখিয়া মেয়েরা নানা রকম কৌতুক আরম্ভ করিতেছিল। কিছুতেই ভাই কেদারনাথকে টলাইতে না পারিয়া অবশেষে বলিতে লাগিল, "বাড়ী বা কোথা, নাম বা কি? থাক বা কোথা, খাও বা কি"? তৎক্ষণাৎ ভাই কেদারনাথ নিজের মন থেকে বলেছিলেন, "বাড়ী আমার হরিনাভী, নাম আমার হরিদাস, খাই আমি হরিতকী, হরিপদে বসবাস।" সত্যই চিরকাল দেখেছি, পিতৃদেব হর্ত্তুকী খুব ভালবেসে খাইতেন। আমাদের কনিষ্ঠ ভাইটীও এ বিষয়ে তাঁর মত হয়েছে। পিতৃদেব স্বল্পাহারী ছিলেন। বেল, বাতাবী লেবু, কালজাম, আনারস ইত্যাদি পেট ও লিভারের উপকারী যে সকল ফল, তাহাই আদর করিয়া খাইতেন। সর্ব্বদা কোন দ্রব্য মুখে দিতেন না।

ভাই কেদারনাথ কিরূপ সহিষ্ণু ও শান্তিপ্রিয় ছিলেন, তাহা মণ্ডলীতে, পরিবারে ও জগতে অনেকেই অবগত আছেন। শরীরসম্বন্ধে ও মনে তাঁর সহিষ্ণুতা বিশেষ ভাবে প্রকাশ পাইত। পৃথিবীতে রোগ শোক ও নানা পরীক্ষার মধ্যে কখনও তাঁকে ব্যাকুল হইতে দেখা যায় নাই। সংসারে অপমানিত হইয়া লোকে বিরক্ত হয়, কিন্তু ভাই কেদারনাথের প্রকৃতি সে ধরণের ছিল না। সবার সহিত কোমলভাবে বাক্যালাপ করিতেন। সহিষ্ণুতার অবতার হইয়াই যেন ভাই কেদারনাথ দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভাই কেদারনাথ দের উত্তরাধিকারী বংশধরগণ তাঁর সকল গুণগ্রাম প্রাপ্ত হউক এবং নববিধানের জগতে তিনি চিরজীবী থাকুন।

ভাই কেদারনাথ দে খাঁটুরা মঙ্গলালয়ে, ৮ই মার্চ্চ (১৮৯৭খৃঃ), ২৫শে ফাল্গুন, রবিবার, শিবরাত্রি তিথিতে, রাত্রি ৯টার সময় স্বর্গারোহণ করেন। সেই রাত্রি আমরা সকলে জাগিয়া ব্রহ্মনাম গান করিতে লাগিলাম। মহাদেবের মত প্রকৃতিটী তাঁর ছিল; তাই মা বলেছিলেন, আহা, যেন মহাদেব মহাশয্যায় শয়ন করিয়া চিরমগ্ন রয়েছেন।

এ বৎসর ভাই কেদারনাথ দের স্বর্গারোহণ দিন স্মরণ উপলক্ষে, কনিষ্ঠা কন্যা Patna G. H. School এর Principal কুমারী বনলতা দেবীর আবাসে, প্রাতে ৭॥টার সময় ভক্তিভাজন ডাক্তার পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনা করেন। কন্যাগণ সঙ্গীত প্রার্থনাদি করিয়াছিলেন। শ্রীআচার্য্যদেবের "দলযন্ত্রে শঙ্খশ্রবণ" ৮ই মার্চ্চের প্রার্থনা হেমলতা পাঠ করেন। ডাক্তার পরেশনাথও মণ্ডলী ও দলের কথা এবং স্বর্গীয় ভাইয়ের শান্ত সাধন উল্লেখ করিয়া প্রার্থনা করেন।

প্রেরিত ভাই কেদারনাথ দের সুন্দর ব্রহ্মজ্ঞানপূর্ণ জীবন-চরিত পাঠ করিলে, তাঁর পবিত্র জীবন বুঝিতে শিখিতে পারিয়া, শিক্ষা ও আনন্দ লাভ হয়। সেই মহৎ জীবনের কিছু কিছু ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকাতে প্রকাশ করা আছে, সকলেই জানেন। আজ বৎসরকার স্মরণীয় পবিত্র দিনে, শ্রদ্ধার সহিত এই শান্ত সহিষ্ণু ভাবের দিক অল্পই বর্ণিত হইল। শ্রদ্ধার সহিত ৫৲ টাকা দান করা হইল।

সেবিকা—হেমলতা।

সংবাদ।

পুরী নববিধানপ্রতিষ্ঠান—গত ৭ই মার্চ্চ, ৩নং ক্রীক রো ভবনে, পুরী সর্ব্বসমন্বয়-নববিধান-প্রতিষ্ঠান কমিটীর কলিকাতাস্থ সভাগণের সভাধিবেশন হয়। উপস্থিত ভাই গোপালচন্দ্র গুহ, ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ, ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক; মহারাণী সুচারু দেবী উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই, কিন্তু সভার কার্য্যে সম্মতি দান করেন। প্রার্থনা করিয়া কার্য্য আরম্ভ হয়। পুরীর স্থানীয় কমিটীর ১৮ই অক্টোবরের অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পঠিত হয় ও তাহার নির্দ্ধারণ সকল গৃহীত হইয়া নির্দ্ধারণ হয় এবং তত্রত্য নবপ্রতিষ্ঠিত নবপর্ণকুটীরনির্ম্মাণের জন্য আয় ব্যয় তালিকাও পঠিত হইয়া স্থির হয়, কুটিরের দরজা জানালা নির্ম্মাণ ও সংস্কারাদির জন্য যে অর্থের প্রয়োজন ও কুটীরনির্ম্মাণের জন্য যে অল্প ঋণ হইয়াছে, তাহার জন্য অর্থসংগ্রহের চেষ্টা হউক। হিসাব দৃষ্টে দেখা গেল, কুটীরনির্ম্মাণাদি কার্য্যে ৪৬৪।৶১০ ব্যয় হইয়াছে এবং এজন্য ৩৯৭৲ টাকা সংগ্রহ হইয়াছে; সুতরাং এখনও ৬৭।৶১০ ঋণ আছে। আয়ব্যয়-বিবরণী অডিট করিয়া প্রকাশ করা হউক। সম্পাদক যে নবপর্ণকুটীর ও নবশ্রীক্ষেত্রস্থ ভূমি রক্ষণাবেক্ষণ জন্য একটী মালী নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহাও কমিটী অনুমোদন করেন।

তীর্থ-যাত্রা—ভাই প্রিয়নাথ সস্ত্রীক তীর্থবাস ও সেবাসাধনের জন্য পুরী নবশ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়াছেন।

বসন্তোৎসব—গত বসন্ত পূর্ণিমা উপলক্ষে, নবদেবালয়ের রোয়াকে, সন্ধ্যা ৫॥টায় সময় বসন্তোৎসবের বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন ও ভাই অক্ষয়কুমার লধ আচার্য্য-দেবের বসন্তোৎসবের উপদেশপাঠে সহায়তা করেন। ভাই অখিলচন্দ্র রায় ভ্রাতা যতীন্দ্রনাথ বসুর সহযোগিতায় সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন করেন। মঙ্গলবাড়ীর ভগ্নীগণ কেহ কেহ যোগদান করেন।

গৌরাঙ্গ-উৎসব—গত ১৩ই মার্চ্চ, সন্ধ্যা ৭টায়, ভারত-বর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে, গৌরাঙ্গ-উৎসবে ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন উপাসনা করেন।

বিলাত-যাত্রা—গত ১০ই মার্চ্চ, স্বর্গীয় রায় বাহাদুর ডাঃ মতিলাল মুখোপাধ্যায়ের মধ্যম পুত্র, কেম্বেল মেডিকেল স্কুলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মেজর এস, এম, মুখার্জ্জি, অসুস্থ শরীরে চিকিৎসা-লাভার্থ বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। এই উপলক্ষে ২০নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীটে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মিঃ এন, এন, মুখার্জ্জির গৃহে, যাত্রার পূর্ব্বক্ষণে পরিবারের প্রায় সকলে সম্মিলিত হইলে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ শুভকামনা করিয়া প্রার্থনা করেন, মাতৃদেবীও সন্তানের মঙ্গল ভিক্ষা করিয়া কাতরে প্রার্থনা করেন। মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছা তাঁহার সন্তানের জীবনে পূর্ণ হোক, তিনি তাঁহার সন্তানকে নিরাময় করুন।

সেবা—খাঁটুরা (গোবরডাঙ্গা) নববিধান ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসবকার্য্য ও নববিধানবিশ্বাসী সাধক স্বর্গীয় ক্ষেত্র-মোহন দত্তের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে উপাসনা করিবার জন্য, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ সস্ত্রীক ২৫শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা হইতে খাঁটুরা যান। ২৪শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার, পূর্ব্বাহ্ণে খাঁটুরা চণ্ডীতলাতে স্বর্গীয়া কুমুদিনী দেবীর ধর্ম্মজীবনের মহা পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হওয়া ঘটনা স্মরণে ব্রহ্মোপাসনা হয়। এ দিন পূর্ব্বাহ্ণে ডাক্তার অনুকূলচন্দ্র মিত্র সস্ত্রীক খাঁটুরা উপস্থিত হন। চণ্ডীতলার উপাসনায় তিনি সঙ্গীত করেন ও বিশেষ প্রার্থনা করেন। অপরাহ্ণে খাঁটুরাপ্রবাসী, উপনিষৎ গীতা প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ, ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী কাজি সাহেবের সঙ্গে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ হয়। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়। এ বেলা সঙ্গীতের কার্য্য শ্রীযুক্ত কুমুদবিহারী রায় নির্ব্বাহ করেন। পরদিন পূর্ব্বাহ্ণে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়, অপরাহ্ণে ৫টার পর মঙ্গলালয়ে শ্রীযুক্ত কুমুদবিহারী রায়ের গৃহে পারিবারিক ভাবে উপাসনা হয়। তৎপর দিন ২৬শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ণে ব্রহ্মমন্দিরে স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন দত্তের সাম্বৎসরিক উপা-সনা হয়। কয়েক দিনের উপাসনাই ভাই গোপালচন্দ্র গুহ সম্পন্ন করেন। শ্রীযুক্ত কাজি সাহেব সস্ত্রীক অধিকাংশ উপা-সনায় যোগদান করেন। ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনায় ও পারিবারিক উপাসনার অপর কয়েকটী মহিলাও যোগদান করেন। এ দিন অপরাহ্ণে প্রায় দুই ঘটিকার সময় স্থানীয় বালিকাবিদ্যালয়ে ছাত্রীদিগকে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ও শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ গুপ্ত উপদেশ দান করেন। অপরাহ্ণে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ সস্ত্রীক কলিকাতায় ফিরেন।

নববিধানট্রাষ্ট—গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী, পূর্ব্বাহ্ণে, উল্টা-ডিঙ্গি ব্রহ্মমন্দিরে, নববিধানট্রষ্টের বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ময়ূরভঞ্জের মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী সভানেত্রীর কার্য্য করেন। তিনি সুমিষ্ট উপাসনা করিলে, সুযোগ্য সেক্রে-টারী ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন রিপোর্ট আদি পাঠ করিয়া বিশেষ প্রার্থনা করেন। কার্য্যসমাপনান্তে জলযোগে সকলকে আপ্যায়িত করা হয়। আমরা এই ট্রষ্টের উত্তরোত্তর উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করি।

সাম্বৎসরিক—গত ১৬ই ফাল্গুন, ৪নং ময়রা ষ্ট্রীটে, স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন দত্তের সাম্বৎসরিকে এবং ২০শে ফাল্গুন ৯নং নিউ-পার্ক ষ্ট্রীটে, স্বর্গীয় বি, এল, চৌধুরীর সাম্বৎসরিক দিনে শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন।

গত ৭ই মার্চ্চ, মঙ্গলবার স্বর্গগত ভক্তিভাজন প্রচারক ভাই রামচন্দ্র সিংহের গৃহে, তাঁহার স্বর্গীয়া সহধর্ম্মিণীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে পুত্রবধূ শ্রীমতী ইন্দু প্রচার ভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করেন।

গত ১লা চৈত্র, ১।এ মন্মথ ভট্টাচার্য্য ষ্ট্রিটে, চট্টগ্রামের স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র দাসের সাম্বৎসরিকে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন, ভগ্নী শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী সেন প্রার্থনা করেন এবং প্রচারভাণ্ডারে ১৲ টাকা দান করেন।

গত ২৩শে মার্চ্চ, কাশীপুরে, ২৯নং হরেকৃষ্ণ শেঠ রোডে, স্বর্গীয় রায় বাহাদুর ডাঃ মতিলাল মুখোপাধ্যায়ের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে সহধর্ম্মিণী প্রচারভাণ্ডারে ১৫৲, অনাথ আশ্রমে ৫৲, অন্ধস্কুলে ৫৲, মূকবধির স্কুলে ৫৲, কুষ্ঠাশ্রমে ৫৲, আতুর আশ্রমে ৫৲ ও বিধবা আশ্রমে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ১লা মার্চ্চ, স্বর্গগত উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়ের সাম্বৎসরিক দিনে, পাটনায়, তাঁহার পৌত্রী ও পৌত্রীজামাতা শ্রীমতী চিত্ততোষিণী ও শ্রীমান্ পূর্ণানন্দ পালের গৃহে, প্রিন্সিপাল দেবেন্দ্রনাথ সেন উপাসনা করেন এবং স্বর্গগত আত্মার প্রা[illegible] হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। নববিধানসমাজের [illegible] সকলেই যোগদান করিয়াছিলেন।

দানপ্রাপ্তি—শ্রদ্ধা, বিনয় ও কৃতজ্ঞতার সহিত দা[illegible] দিগকে প্রণাম করিয়া, নিম্নলিখিত দান-প্রাপ্তি স্বীকার করি-তেছি। ভগবান্ দাতাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

জানুয়ারী, ১৯৩৩—শ্রীযুক্ত মতিরাম আদভানী মাসিকদান ২৫৲, শ্রীমতী সরলা সেন মাসিকদান ২৲, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন মাসিকদান ২৲, শ্রীমতী হেমন্তবালা চাটার্জ্জি মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী মাধবীলতা চাটার্জ্জি মাসিকদান ১৲, শ্রীযুক্ত গগন

বিহারী সেন মাসিকদান ১৲, স্বর্গীয় অমৃতলাল ঘোষের পুণ্য-স্মৃতিতে মাসিকদান ২৲, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এককালীন ১০৲, শ্রীযুক্ত মনোনীতধন দে মাতৃসাম্বৎসরিকে ২৲, শ্রীমতী বিনোদিনী দাস স্বামীর সাম্বৎসরিকে ১৲, ডাঃ উমাপ্রসন্ন ঘোষ মাসিকদান ২৲, মাননীয়া মহারাণী সুচারু দেবী এককালীন ৫০৲, রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় মাসিকদান ২৲, শ্রীমতী মনোরমা মুখার্জি মাসিকদান ২৲, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার মাসিকদান ৫৲, স্বর্গগতা মাননীয়া মহারাণী সুনীতি দেবীর দুই মাসের দান কুচবিহার ষ্টেট হইতে ৩০৲, রায় ব্রাদার্স ১১।৶০, শ্রীমতী ব্রহ্মকুমারী নিয়োগী শ্বশ্রূমাতার সাম্বৎসরিকে ২৲ ও লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল জ্যোতিলাল সেন (I.M.S.) পিতৃসাম্বৎসরিকে ১০৲ টাকা।

পুস্তক-পরিচয়।

১। Oriental Christ by P. C. Mazumdar.

২। True Faith by Minister K. C. Sen.

Navavidhan Publication Committee-র উদ্যমে ও চেষ্টায় সুন্দরভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। দুইখানিই অতি অমূল্য আধ্যাত্মিক গ্রন্থ। ইহা প্রত্যেক গৃহে গৃহে আদৃত হয়, ইহাই প্রার্থনীয়। Publication Committee-র উদ্যম সফল হউক, সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি।

৩। ব্রহ্মসঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন—দ্বাদশ সংস্করণ। এবার উৎসব উপলক্ষে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর চেষ্টায় এই সংস্করণ অতি নূতন ভাবে সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে সঙ্গীতগুলি যেরূপ নূতনভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে উপাসনা, প্রার্থনা ও অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে সকলেরই বিশেষ সাহায্য হইবে। ইহারও বহুল প্রচার প্রার্থনীয়। পুস্তকের আকার বর্দ্ধিত হইলেও, মূল্য পূর্ব্ববৎ ২॥০ টাকাই ধার্য্য হইয়াছে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণে নববিধানের অভিব্যক্তির ক্রম অনুসারে সঙ্গীত সকল সংকলিত ছিল; তাহাতে সংগীতে সাধনের ক্রমবিকাশও নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারিত। এবারে তাহার অনেক উল্টে পাল্টে হইয়াছে। আবার এবার যেমন কতকগুলি উৎকৃষ্ট নূতন সংগীত সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে, তেমনি বহু পুরাতন সাধনোদ্দীপক সঙ্গীত বাদও দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হওয়ার ভয়েই সম্ভব এরূপ করিতে হইয়াছে। তাই আমাদের মনে হয়, সেই সমুদয় পরিত্যক্ত সঙ্গীত এবং আরো বিভিন্ন সাধকের বাছা বাছা সাধনসঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া, আর এক খণ্ড সঙ্গীতপুস্তক বাহির করিতে পারিলে ভাল হয়। এ সম্বন্ধে মিশন আফিস কিম্বা নববিধান পাবলিকেশন কমিটীকে উদ্যোগী হইতে আমরা অনুরোধ করি।

৪। Keshub Chunder Sen And The Cooch Behar Betrothal 1878 by Prosanto Kumar Sen M.A (Cal), M.A.LL.D. (Cantab). The Book Company Ltd. 41-4A College Square, Calcutta, 1933, কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এই পুস্তকখানিতে কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের সহিত শ্রীমতী সুনীতি দেবীর বাগ্‌দান সম্বন্ধীয় অমূল্য বৃত্তান্ত হস্তলিপির ফটো সম্বলিত বহু প্রমাণ প্রয়োগ সহ লিপিবদ্ধ ও প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দেওয়ান প্রশান্তকুমার সেন তাঁহার বিবিধ বৈষয়িক কার্য্যের ব্যস্ততার মধ্যে নিবদ্ধ থাকিয়াও যেরূপ গবেষণা-পূর্ণ, সুললিত সুন্দর ইংরাজীভাষায়, নৈপুণ্যসহকারে পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন, তজ্জন্য সমগ্র বিধানমণ্ডলীর সহিত তাঁহাকে অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা না জানাইয়া থাকিতে পারি না। ভ্রাতা প্রশান্তকুমার বাস্তবিকই কোচবিহার-বিবাহের অপ্রকাশিত তথ্য, যাহা না জানিয়া কত সরল ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিও নানা প্রকার ভ্রমাত্মক সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন এবং যাহার জন্য ব্রাহ্মসমাজে বিবাদানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহা প্রকাশ করিয়া কেবল এ মণ্ডলীর নয়, সমগ্র বিশ্বজনীন ধর্ম্মসমাজেরই পরম উপকার সাধন করিয়াছেন। যথাসময়ে ইহা বাহির হইলে, এ দেশের ও মানবসমাজের আরো যে কত উপকার হইত, বলা যায় না। যাহা হউক, বিধাতার বিধানে যখন যাহা হইবার তাহাই হয়, যাঁহার দ্বারা যাহা করাইবার তিনিই করাইয়া থাকেন। ভ্রাতা প্রশান্তকুমার তাঁহার হস্তের যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়া যে ধন্য হইলেন এবং আমাদিগকেও ধন্য করিলেন, এজন্য অন্তরের সহিত তাঁহার প্রভূত কল্যাণ ও দীর্ঘ জীবন কামনা করি। তিনি সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবী হইয়া, নববিধানের পূর্ণ ইতিহাস এই জীবনে প্রকাশ করিয়া বিধানের গৌরব রক্ষা করুন, এই প্রার্থনা করি।

৫। নৈবেদ্য—শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত এবং কলিকাতা ৪৪নং নিউথিয়েটার রোড হইতে প্রকাশিত, কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতাপূর্ণ সাধনশীল জীবনে, শুভমুহূর্ত্তে যে সকল চিন্তা ও ভাবধারা উদিত হইয়াছে, এবং সাধন-ক্ষেত্রে সময় সময় যাহা নিবেদন করা হইয়াছে, তৎসমুদয় একত্রিত হইয়া, ভগচ্চরণে জীবনের "নৈবেদ্য" রূপে গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ইহা পাঠ করিয়া সকলে আনন্দ পাইবেন এবং জীবনের ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও তত্ত্বানুসন্ধানের পথে কিছু না কিছু আলো লাভ করিবেন, আমরা আশা ও বিশ্বাস করি।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক ১৭ই চৈত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

স্ুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৮ ভাগ।
৭ম সংখ্যা।

১লা বৈশাখ, শুক্রবার, ১৩৪০ সাল, ১৮৫৫ শক, ১০৪ ব্রাহ্মাব্দ।
14th April, 1933.

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে বিশ্বরাজ, কোন্ স্মরণাতীত যুগে প্রাচীন ভারতের ঋষিগণ ধ্বনি করিলেন, "ভূমৈব সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি।" মানবকুল সে ধ্বনি কাণে লইল না। তৎপর তোমার প্রেরিত সন্তান শ্রীবুদ্ধ রাজ্যধনে জলাঞ্জলি দিয়া, আপনার জীবন ও আপনার প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘ দ্বারা ঘোষণা করিলেন, সকল প্রকার বাসনা-নির্ব্বাণে শান্তি ও শাশ্বত আনন্দ। পৃথিবী তাঁহার কথাও কর্ণে লইল না। তৎপর তোমার প্রিয়পুত্র শ্রীঈশা ঘোষণা করিলেন, "অগ্রে স্বর্গরাজ্য ও ধর্ম্ম অন্বেষণ কর, পৃথিবীর আর যাহা কিছু তোমাদের প্রয়োজনীয়, তোমাদিগকে দেওয়া হইবে", "ধর্ম্মের জন্য ক্ষুধিত ও পিপাসু যাহারা, তাহারা ধন্য, কেন না তাহারা পূর্ণ হইবে", "যাহারা সত্যতঃ অন্তরে গরিব, সেই দীনাত্মারা ধন্য, কেন না স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই", "সূচির ছিদ্রমধ্যে উষ্ট্রের প্রবেশ বরং সম্ভব, কিন্তু ধনীর স্বর্গগমন সম্ভব নয়; তবে মনুষ্যের পক্ষে যাহা সম্ভব নয়, ঈশ্বরের কৃপায় তাহা সম্ভব হয়"। তোমার প্রিয়পুত্র আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াও, তাঁহার এ সব স্বর্গীয় বাণীর প্রতি পৃথিবীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিলেন না। হে চির জাগ্রত, চির জীবন্ত দেবতা! তুমি আপনার চক্ষে দেখিতেছ, পৃথিবীর জ্ঞানে, গুণে, বিদ্যা, বুদ্ধিতে, ধন ঐশ্বর্য্যে শ্রেষ্ঠ যে সকল জাতি, শ্রেষ্ঠ যে সকল সম্প্রদায়, তাঁহারা আরও পৃথিবীর ধন ঐশ্বর্য্যের লালসার অগ্নি আপনাদের মধ্যে দাউ দাউ করিয়া প্রজ্বলিত করিয়া, আপনারাও তাহাতে দগ্ধ হইতে চলিয়াছেন, পাড়া প্রতিবাসিগণকেও সেই অগ্নিতে দগ্ধ হইবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। পৃথিবীর রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, গরিব, কাঙ্গাল আজ এই কামনা বাসনার এবং অসার ধনৈশ্বর্য্যের কামনাজনিত হিংসা দ্বেষের বিষম দাবাগ্নিতে দগ্ধ বিদগ্ধ হইয়া মরিতেছে। আজ রাজা প্রজা কাহারও প্রাণে শান্তি নাই, স্বদেশে শান্তি নাই, বিদেশে শান্তি নাই; শান্তিহারা হইয়া মানবকুল আর কতদিন জীবন ধারণ করিবে? তাই স্বদেশের জন্য, বিদেশের জন্য, রাজার জন্য, প্রজার জন্য, সকল মানবকুলের জন্য এই প্রার্থনা করি, তুমি স্বয়ং প্রতি মানবের অন্তরে অবতীর্ণ হইয়া, তোমার স্বর্গরাজ্যের অবতরণের ব্যবস্থা তুমি কর; তোমার পাষাণবিদারণ বজ্রধ্বনিতে সকলের প্রাণ বিকম্পিত করিয়া, তোমার সাধুভক্তদিগের বিঘোষিত বাণী আপনার শ্রীমুখের নূতন বাণীতে ঘোষণা কর। সকলে অসার ছাড়িয়া, হে সারাৎসার তোমাকেই আশ্রয় করুক, অবলম্বন করুক, জীবনের গৌরব বলিয়া গ্রহণ

করুক। তুমি স্বয়ং পৃথিবীতে শান্তির রাজ্য, সম্মিলনের রাজ্য আনয়ন কর, প্রতিষ্ঠিত কর। নিরুপায় হইয়া, হে নিরুপায়ের উপায়, এই নববর্ষারম্ভে তোমার চরণে সকলের জন্য শান্তি প্রার্থনা করিয়া, বার বার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

নববর্ষাগমে।

নববর্ষাগমে মার নবশিশু ব্রহ্মানন্দ সনে মাতৃচরণ বন্দনা করি। যুগে যুগে যুগধর্ম্মবিধান লইয়া যত ভক্তাবতার অবতীর্ণ হইয়াছেন, নব নব বিধান প্রচারপূর্ব্বক মানবসমাজে নব নব জাগরণ, নব নব জীবন সঞ্চার করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে স্মরণ করি, প্রণাম করি, বরণ করি। যাঁহারা জ্ঞানবিজ্ঞানসঞ্চারে, দেশহিতৈষণা-প্রবর্ত্তনে ও পরার্থপর সেবাসাধনায় জগজ্জনের নানা প্রকারে কল্যাণ বিধান করিয়াছেন ও করিতেছেন, সকলকে অভিবাদন করি।

হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী, খৃষ্টান, মুসলমান, শিখ, পার্সী, আর্য্য ও ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের যত প্রেরিত প্রবর্ত্তক, যোগী ঋষি ভক্ত, ফুঙ্গী, মোল্লা, পাদ্রী, প্রচারক, সেবক, সাধক সকলকে প্রণাম করি। রাজা, রাজপ্রতিনিধি, দেশসেবক এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়স্থ সহযোগী, সহকর্ম্মী এবং সহসাধক সকলকেই অবলুণ্ঠিত চিত্তে অভিবাদন করি।

নববিধান সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়বিধান, সর্ব্বজাতীয় বিধান; তাই সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীকেই এই নববিধানান্তর্গত বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি এবং অসাম্প্রদায়িক প্রেমে, যাঁহাকে যাহা দেয়, তাঁহাকে তাহা অর্পণ করি। যাঁহার নিকট যাহা গ্রহণীয়, তাঁহার নিকট হইতে তাহা ঈশ্বরের আলোকে গ্রহণ করি।

অদ্যকার ১লা বৈশাখ দিনে, নববিধানাচার্য্য শ্রীব্রহ্মানন্দ সতী ব্রহ্মনন্দিনী সহযোগে গৃহত্যাগী হইয়া, প্রধানাচার্য্য মহর্ষিদেব কর্ত্তৃক আচার্য্যপদে অভিষেক লাভ করিলেন; এবং তিনিই আবার এই নববর্ষোপলক্ষে, নববিধানের প্রেরিতগণকে বৈরাগ্য, প্রেম, উদারতা, শুদ্ধতার ব্রত ঈশ্বরপ্রেরণায় দান করিলেন। ইহা স্মরণ করিয়া অদ্য আমরাও বিশেষভাবে বিশেষ বিশেষ ব্রতগ্রহণে, নববিধানের মহিমা নিজ নিজ জীবনে সাধনে নিরত হই।

এই পুরাতন বর্ষের বিদায়কালে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধকগণ কেহ বা সন্ন্যাস, কেহ বা রোজা, কেহ বা "লেন্ট" সাধনে আত্মসংযমব্রত গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মোন্নতিকল্পে নিরত হন; প্রকৃতিতেও এ সময়ে বৃক্ষাদির পুরাতন পল্লব নিঃশেষ হইয়া নবপল্লবের উদ্গম হয় এবং বসন্ত সমীরণে বিশ্ব যেন নবজীবনে মুখরিত হয়। নববিধান আমাদিগকে ও বিশ্বকে নিত্য নব নব জীবনে সঞ্জীবিত করিবার জন্যই অবতীর্ণ; সুতরাং পুরাতন বর্ষের সহিত আমরাও পুরাতন জীবনকে বিদায় দিয়া, নববর্ষসমাগমে নববিধানের প্রভাবে সত্যই যেন আমরা, সমগ্র দেশ, জাতি এবং বিশ্ব নববিশ্বমানবসঙ্গে নবজীবনলাভে ধন্য হই এবং তদ্দ্বারা নববিধানকে গৌরবান্বিত ও সপ্রমাণিত করিতে সক্ষম হই, মা আমাদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ করুন। বিধাতার বিধানে এ বৎসর শুভ শুক্রবার দিনেই নববর্ষারম্ভ; তাই ব্রহ্মানন্দন শ্রীঈশার সনে পুরাতন পাপজীবনকে ক্রুশাহত করিয়া, দ্বিজত্বলাভে যথার্থই নববিধানের নবজীবনে পুনরুত্থান করি।

পুণ্য বৈশাখ।

বৎসরের প্রথম মাস বৈশাখ মাস, ভারতের আর্য্যজাতির নিকট বিশেষ পুণ্যমাস। গ্রন্থ পড়িয়া শিখিতে হয় না, সাধু ভক্তের উপদেশ লইয়া জানিতে হয় না, প্রকৃতিই এ বিষয়ে পরম গুরু। সময় চক্রবৎ ঘুরিতেছে, যাইতেছে, আসিতেছে; সময় আপনার বিশিষ্টতার পরিচয় আপনি প্রদর্শন করিয়া, আপনার গুরুত্ব গৌরব ঘোষণা করিতেছে। বাহিরে সময়ের কোন ভাষা নাই, বাঙ্গলা, ইংরেজি, আরবি ইত্যাদি ভাষা সময়ের ভাষা নহে, আপনার প্রকৃতিই সময়ের নীরব ভাষা। শীত আপনার ভাষায় কথা বলে, বসন্ত আপনার ভাষায় কথা বলে, গ্রীষ্ম আপনার ভাষায় কথা বলে, নব বৎসরের প্রথম মাস বৈশাখও আপনার ভাষায় কথা বলিয়া আপনার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দান করে। নব বৎসরের প্রথম মাস বৈশাখ মাস নূতন আকাশ লইয়া, নূতন বাতাস লইয়া, নূতন বেশ লইয়া, সর্ব্বোপরি নূতন সূর্য্যকে

আপনার বল, সম্বল ও ঐশ্বর্য্যরূপে ভূষণ করিয়া, বঙ্গ ভারতে উদীয়মান হইয়া থাকে। শীত ও বসন্তের পরে গ্রীষ্মের প্রারম্ভে, বৈশাখের সূর্য্যকে প্রবলপ্রতাপান্বিত মনে হয়, বৈশাখ হইতে দিনও ক্রমে বাড়িতে থাকে।

বৈশাখের প্রমুক্ত আকাশে মধ্যাহ্ন সূর্য্য খুব প্রখর হয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে মানবের কর্ম্মজীবন নবোদ্যমে পূর্ণ হয়ে উঠে, এবং ধর্ম্মজীবনও তপস্যার তীব্রতায় অগ্নিময় হয়। আমাদের অন্তঃপ্রকৃতি ভিতরে ভিতরে চায়, সর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যময় যিনি তাঁহাকে ধরিতে, সর্ব্বাপেক্ষা বড় যিনি তাঁহাকে পাইতে। মন ছোট কিছু লইয়া যেন কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারে না। বৈশাখের সূর্য্য আপনার প্রবল প্রতাপ পরিচালনা করিয়া, সূর্য্যের সূর্য্য পরম সূর্য্য যিনি, তাঁহার একটু পরিচয় দান করে; বৈশাখের দীর্ঘ ও প্রখর দিন আলস্য, জড়তা ও ক্ষুদ্রতা পরিহার করিয়া, হৃদয় মন আত্মার প্রসারের দিকে মানবের সাধনাকে প্রখর করিয়া তোলে।

আবার বৈশাখের সূর্য্যের প্রখরতায়, অগ্নিময় তেজে পৃথিবীর দুর্গন্ধ নষ্ট হয়। কোন স্থানে কোন দুর্গন্ধময় পদার্থ, কোন দূষিত সামগ্রী পুঞ্জীকৃত হইলে, তাহা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া, সে স্থানকে লোকে নিরাপদ করিয়া থাকে। এমন সকল দূষিত পদার্থ নানা স্থানে, নানা ভাবে, মানুষের জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে, এমন বহুল পরিমাণে পৃথিবীবক্ষে পুঞ্জীকৃত হয়, মানবীয় কোন শক্তি, মানবীয় কোন চেষ্টা, মানবের বুদ্ধি কোন উপায়ে তাহা দূর করিয়া পৃথিবীবক্ষকে আবর্জ্জনামুক্ত করিতে পারে না। বৈশাখের সূর্য্য বিধাতৃশক্তির নিয়োগে আপনার উত্তাপ দ্বারা সে সকল ভস্ম করিয়া, নষ্ট করিয়া, পৃথিবীবক্ষকে সকল প্রকার দূষিত পদার্থ হইতে মুক্ত করে। তাই বৈশাখের সূর্য্য বুঝি ঈশ্বরের পুণ্যস্বরূপের প্রতীক। তাই বুঝিয়া না বুঝিয়া, স্বভাবের নিয়মে, বঙ্গভারতের নরনারীর সরল প্রাণ সহজে বৈশাখ মাসকে পুণ্য মাস বলিয়া গ্রহণ করে, স্বীকার করে, বৈশাখ মাসে দান তপস্যাদি পুণ্য কার্য্য সম্পাদন করে। সত্যই বৈশাখ মাস তাহার স্বাভাবিক নানা আয়োজনের ভিতর দিয়া পুণ্যের পোষাক পরিধান করে, বঙ্গভারতের সরল ধর্ম্মপ্রাণ নরনারীর অন্তরে বিশেষরূপে ঈশ্বরের পুণ্যস্বরূপের স্ফূর্ত্তি দান করে; তাই বঙ্গভারতের নরনারীর নিকট অজানিতকাল হইতে বৈশাখ মাস পুণ্য মাস। আর্য্যজাতির জীবনে বৈশাখ মাস বিশেষ তীর্থমাস বঙ্গভারতের নরনারী এই বৈশাখ মাসে বিশেষ ভাবে ধর্ম্মব্রতাদি গ্রহণ করিয়া, আপনার ইষ্ট দেবতার পূজা বন্দনা, দান ও তপস্যার দ্বারা নিজেদের ধর্ম্মভাবের পরিপুষ্টি সাধন করেন, নিজেরা উচ্চ তৃপ্তি লাভ করেন, অন্যকেও উচ্চ তৃপ্তি দান করেন। পুণ্যমাখা বৈশাখ মাস, সূর্য্যের প্রখর রৌদ্রতপ্ত বৈশাখ মাস, সাধারণ নরনারীর জীবনে ধর্ম্মজীবন এবং উচ্চ আশা ও উৎসাহদানকারী বৈশাখ মাস গীতার এই শ্লোকটী আপনার কার্য্য দ্বারা নীরবে ব্যাখ্যা করে:—"পুণ্যগন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ। জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু॥" শ্রীভগবানের উক্তি:—"আমি পৃথিবীর পুণ্যগন্ধ, আমি চন্দ্র সূর্য্যের তেজ, আমি সকল ভূতের জীবনস্বরূপ এবং আমিই তপস্বিগণের তপস্যা।"

আমাদের নবধর্ম্ম, নববিধান জাতীয় বিধান। আমরা নববিধানের লোক। প্রাচীন হিন্দুর জাতীয় আচরণ ও অনুষ্ঠানে যাহা কিছু স্বর্গীয়, তাহাই আমাদের অতি আদরে গ্রহণীয়। আমরা বঙ্গ ভারতের সকল ভাই ভগ্নীর সহিত একপ্রাণ ও একহৃদয় হইয়া, পুণ্য বৈশাখে পুণ্য ব্রত যথাসম্ভব সাধন করি। বৈশাখের সূর্য্যোত্তাপ আমাদিগকে সূর্য্যের সূর্য্য, পরম সূর্য্য, পর ব্রহ্মের তীব্র উত্তাপ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করুক। বৈশাখের নদীবক্ষঃপ্রবাহিত সুশীতল তরুণ বারিরাশিতে আরামপ্রদ অবগাহিত স্নান আমাদিগকে জীবন্ত ঈশ্বরের নবজীবনপ্রদ, অমৃতময়, পুণ্যময় আবির্ভাবরূপ পুণ্য গঙ্গাতে, পুণ্য সমুদ্রে অবগাহনস্নানের দিব্য আশীর্ব্বাদলাভের জন্য ব্যাকুল করিয়া তুলুক। এ সময় আমাদের সকল প্রকার আধ্যাত্মিক জড়তা ও আলস্য বিদূরিত হউক। জীবনে তপস্যার অগ্নি ধপ্ ধপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠুক। আমরা বাহিরের চন্দ্র সূর্য্যের তেজের মধ্যে আমাদের পরম ইষ্ট দেবতা ঈশ্বরের স্বর্গীয় তেজ প্রত্যক্ষ করি। এই পুণ্য মাসে গূঢ় ভাবে সেই পরম পুণ্যময়ের প্রকাশ, নদ নদী, ফল ফুলে, সকলের পূজা বন্দনায়, দান তপস্যায়, আচার ব্যবহারে দর্শন করি, সম্ভোগ করি। আমাদের নিজ জীবনের তপস্যার ভিতরে পূজা বন্দনা যোগে প্রত্যক্ষ করি, কেমন তিনি আমাদের জীবনে জীবনস্বরূপ এবং সর্ব্বভূতে জীবনস্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন। আমাদের সকল তপস্যায় পরম তাপ, পরম অগ্নি তিনি, ইহা প্রত্যক্ষ

করিয়া, সেই অগ্নিতে, সেই তাপে এখন বিশেষ ভাবে আমরা উত্তপ্ত হই।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

নববিধানের বিশেষত্ব ও নূতনত্ব।

১। নববিধানের ঈশ্বর জীবন্ত সত্য ঈশ্বর। যিনি চির পুরাতন, তিনি নিত্য নূতন। তিনি চিন্ময় নিরাকার হইয়াও, প্রত্যক্ষ ব্যক্তির ন্যায় তাঁহাকে যে দেখিতে চায়, তাহাকেই প্রত্যক্ষ দর্শন দেন; যে তাঁর কথা শুনিতে চায়, তাহার সঙ্গে কথা কন। এই ঈশ্বর ভিন্ন আর অন্য ঈশ্বরের নববিধান পূজা করেন না, আর কাহারও নিকট মাথা হেঁট করেন না; কারণ ইঁহার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ঈশ্বর আর নাই। ইনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অথচ স্নেহময়ী জননীরূপে প্রকট।

২। নববিধানের উপাসনা নিত্য নব নব প্রাণপ্রদ, জীবনপ্রদ। ইহা যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, সেবা, সংসারধর্ম্ম প্রভৃতি সকলের পরাকাষ্ঠালাভের উপায়। ইহা সর্ব্বধর্ম্ম, সর্ব্বশাস্ত্র, সর্ব্বসাধনের মিলন ও তত্ত্বব্যাখ্যানের সন্ধান। ইহা বিশ্বমানবজীবনলাভের অন্নপান বা উপাদান। মাতৃস্তন্যে যেমন দেহপুষ্টির সমুদয় উপাদান নিহিত, নববিধানের উপাসনাও তদ্রূপ সর্ব্বাঙ্গীন ধর্ম্মজীবনপুষ্টির উপাদান।

৩। নববিধানের শাস্ত্রমত জীবন। জীবনের প্রত্যক্ষ, অভিজ্ঞাত ও সাধিত সত্য বিনা নববিধান অন্য শাস্ত্রের আদর করেন না এবং সর্ব্বধর্ম্মের সর্ব্বশাস্ত্রকেই নিষ্ঠার সহিত জীবনে সাধন করেন; কেবল সর্ব্বশাস্ত্র তত্ত্বজ্ঞানলাভে ইঁহার তুষ্টি বা তৃপ্তি হয় না।

৪। নববিধান কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়কে পর বলিয়া মনে করেন না। সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক প্রেমে সকলকে এক মার সন্তান বলিয়া ভালবাসেন ও আদর করেন। যাহার যাহা বিশেষত্ব, তাহা গ্রহণ করেন; যাহার যাহা অভাব বা অপূর্ণতা, তাহা মানবীয় বলিয়া কৃপাপাত্রবোধে তাহার জন্য মার কাছে প্রার্থনা করেন। নববিধান কোন মানুষকে ঘৃণা করেন না। শরীরের রোগে রুগ্ন ব্যক্তির প্রতি যেমন স্নেহব্যবহার কর্ত্তব্য, পাপরোগে রুগ্ন ব্যক্তির প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করেন। নববিধান আরো বিশ্বাস করেন, সমগ্র মানবমণ্ডলী একই পিতামাতা হইতে জন্মলাভ করিয়া, কেবল এক পরিবার নয়, কিন্তু একই দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেমন পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ, তেমনি সকল মানব একটি দেহ, সেই ভাবে পরস্পরের প্রতি ব্যবহার করা নববিধানের অনুজ্ঞা।

৫। সকল বৈশিষ্ট্যের সামঞ্জস্য, বিচিত্রতার একতা, স্বাধীনতায় অধীনতা, সত্যে সত্যে অভেদ ভাব ও সমন্বয়সাধন, ইহাই নববিধানে বিশেষ নূতন।

ভিতর বাহির সমান নয়।

ভিতরে বৈরাগ্যের গৈরিক পরিধান করিবে, বাহিরে গৃহী ব্যক্তি যেমন বেশ ভূষা করেন, তেমনি করিবে। ইহার বিপরীত যে করে, সে প্রবঞ্চক। সবার সহিত সমান ব্যবহারও করিবে না, যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা দিবে। ধার্ম্মিককে সম্মান করিবে, অধার্ম্মিককে কৃপাপাত্র জানিয়া সস্নেহে সংশোধন করিবে।

নববিধানের বসন্তসমীরণ।

মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপ বালুকণাকে পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করিতেছে, কিন্তু মহাসাগরের স্নিগ্ধ সমীরণ এমনই প্রবলবেগে বহিতেছে যে, সে উত্তাপ গায়েও লাগে না, সে সমীরণে শরীর কতই শীতল হইতেছে। নববিধানের বসন্তসমীরণও সংসারের উত্তাপে উত্তপ্ত আত্মার পক্ষে এমনই আরামদায়ক ও শান্তিপ্রদ।

মহাসাগরের উপকূলে।

সংকীর্ণ মনকে যদি উদার ও প্রশস্ত করিতে চাও, তবে মহাসাগরের উপকূলে আসিয়া অনিমেষনয়নে তাকাইয়া দেখ, তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিতেছে পড়িতেছে যেমন, তেমনি সমুদ্র বিশাল বক্ষ বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। উপরে তরঙ্গের পর তরঙ্গ, ভিতরে প্রশান্ত ভাব ও অপ্রশস্ততা। পৃথিবীতে স্বর্গের বাতাস সম্ভোগ করিয়া যদি শান্ত হইতে চাও, মহাসাগরের পবিত্র নির্ম্মল সমীরণ সেবন কর। শরীর মন আত্মা স্নিগ্ধ হইবে।

ধর্ম্মপিতামহ রাজর্ষি রামমোহনের শতবার্ষিক সাম্বৎসরিক।

আমাদিগের ধর্ম্মপিতামহ মহাত্মা রাজর্ষি রামমোহন ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডস্থ ব্রিষ্টল নগরে দেহ রক্ষা করিয়া মহাপ্রয়াণ করেন। বর্ত্তমান ১৯৩৩ অব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর, রাজর্ষির স্বর্গারোহণের শতবার্ষিকী হইবে। এই মহাদিন যথাযোগ্যভাবে সম্পাদনের জন্য মাননীয় কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে একটী সভা সংগঠিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের সহিত দেশমান্য অন্যান্য সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিদিগকে লইয়া এই সভা গঠিত হইয়াছে। আশা করি, এই মহা অনুষ্ঠান সর্ব্বাঙ্গীনরূপে সুসম্পাদন করিয়া, মহাত্মা রাজর্ষির প্রতি শ্রদ্ধাদানে সমগ্র দেশ এবং সমগ্র জাতি যাহাতে ধন্য হয়, উদ্যোগকারী সভ্যমহাশয়গণ এমন আয়োজন ও ব্যবস্থা করিবেন।

সত্যই শ্রীনববিধানাচার্য্য যেমন বলিলেন, "শত সহস্র টাকার ঋণে আমরা তাঁহার নিকটে ঋণী। তিনি আমাদিগের ভক্তি

ভাজন, কৃতজ্ঞতাভাজন। আমরা তাঁহার নিকট একটী বিস্তীর্ণ জমিদারী পাইয়াছি, সেই তালুকের প্রজা আমরা। ভয়ানক পৌত্তলিকতার বন কাটিয়া তিনি একখণ্ড ভূমি আবাদ করিলেন। সেখানে কতকগুলির প্রজার বসতি করিয়া দিলেন। অরবিকারে কণ্টকবনে লোকে মরিতেছিল। এই যে সামান্য ভূমিখণ্ড, ইহা হইতে ব্রহ্মের আরাধনা এই দেশে আবার প্রবল হইল, আবার কয়েকটী লোক এক ব্রহ্মকে পূজা করিতে লাগিল। ভগবান্ তাঁহার পুত্র রামমোহনকে পাঠাইলেন। এই ব্রাহ্মসমাজের তিনি ধর্ম্মপিতামহ। তাঁহার জন্য ভারতে ব্রাহ্মসমাজ আপনার মস্তক উত্তোলন করিয়াছে। তাঁহার স্তব স্তুতিতে, বিদ্যা বুদ্ধিতে, পবিত্র ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইল। এই জন্য তাঁহার নাম কৃতজ্ঞতাফুলে গলায় জড়াইয়া রাখি। সেই ধর্ম্মপিতামহ এত উপকার করিয়া গেলেন, তিনি হাতে হাতে ধর্ম্মধন দিয়া গেলেন।"

বাস্তবিক তিনি কতই বড়লোক বা রাজা ছিলেন, অথবা কিরূপ কার্য্যকুশল ছিলেন, কি প্রকারে তিনি আপনাকে সুবিখ্যাত করিয়াছিলেন, কিরূপে তিনি এদেশের ও পাশ্চাত্য দেশের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন, এ সমুদয় আমাদের বিচার করিবার নয়। এ সমুদয় অপেক্ষা তিনি যে বিধাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বর্ত্তমান নবযুগধর্ম্মবিধানের বীজ বপন করিলেন ও সর্ব্বধর্ম্মশাস্ত্র মন্থন করিয়া একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত করিলেন, এবং সর্ব্বধর্ম্মসম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিদিগের, একত্রে মিলিত হইয়া, একেশ্বরের স্তব স্তুতি বন্দনা আরাধনার জন্য ব্রাহ্মসভা গঠন করিয়া উপাসনাগৃহ স্থাপন করিলেন, ইহাই তাঁহার সর্ব্বোচ্চ কৃতিত্ব এবং এই জন্যই তাঁহার নাম জগতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে চির খোদিত থাকিবে, এবং এই জন্যই তাঁহার সহিত আমাদিগের বিশেষ ব্যক্তিগত ও ধর্ম্মগত সম্বন্ধ। তিনি আমাদিগের ধর্ম্মপিতামহ, ইহাই উপলব্ধি করিয়া যাহাতে আমরা তাঁহার শতবার্ষিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্যকরূপে সম্পাদন করিতে পারি, তজ্জন্য যেন এখন হইতে আমরা বিশেষ প্রস্তুত হই।

এই উপলক্ষে রাজর্ষির প্রতি শ্রদ্ধার্পণার্থ, আমরা উদ্যোগ-কর্ত্তাদিগকে যেমন লিখিয়াছিলাম, তাহার অনেকগুলি প্রস্তাবই তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া সুখী হইলাম। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, মহাত্মা রাজর্ষির প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত লেখা, বক্তৃতা ও পত্রাবলী সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিবেন ও অল্প মূল্যে তাহা প্রচার করিতে চেষ্টা করিবেন। তাঁহার সম্বন্ধে এ দেশের ও বিদেশের মনীষিগণ যিনি যাহা লিখিয়াছেন বা বলিয়াছেন, তাহাও সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত হইবে। বিভিন্ন সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণের দ্বারা ধর্ম্মসংঘ সংগঠন করিয়া, যাহাতে স্থানে স্থানে তাঁহার সম্বন্ধে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃগণ আপন আপন মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা হইবে। এদেশের ও বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের নেতৃগণ এবং বিশেষতঃ বিলাতের ইউনিটেরিয়ান সম্প্রদায়ের বন্ধুগণ যাহাতে রাজর্ষির শতবার্ষিকী সম্পাদন করেন, তাহার জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা হইবে। এতদ্ভিন্ন আরো দুইটী অনুষ্ঠান এই বিশেষ সময়োপযোগী বলিয়া আমরা মনে করি। উদ্যোগকর্ত্তাগণ এ সম্বন্ধে আলোচনা ও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করেন, এই অনুরোধ।

১। মহাত্মা রাজা রামমোহন বিধি করিয়াছিলেন, বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণ, যিনি যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউন না, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত উপাসনাসভাগৃহে একত্রে এক ঈশ্বরের উপাসনা করিবেন। ইহাই বর্ত্তমান সময়ের Parliament of Religions বা বিভিন্ন সাম্প্রদায়িকধর্ম্মমিলনসংঘের মূল ভিত্তি এবং বিধাতার বিধানে ইহা হইতেই ক্রমে নববিধানের ধর্ম্মসমন্বয় উদ্গত বা ক্রমবিকশিত। যাহা হউক, রাজর্ষির শতবার্ষিকী উপলক্ষে যাহাতে এইরূপ একটী "সর্ব্বধর্ম্মমিলনসংঘ" স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার যেন ব্যবস্থা হয়। এই সংঘে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নেতা ও অধ্যক্ষগণ মাসে মাসে মিলিত হইয়া নিজ নিজ শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করিবেন এবং সকল প্রকার বিভিন্নতা-প্রতিপাদক তত্ত্ববিষয় পরিহার করিয়া, পরস্পরের ভাব বিনিময় করিবেন এবং ক্রমে উদার ভাবে পরস্পরের ভাবগ্রহণে ও সাধনে নিরত হইবেন। এবং এইরূপ সংঘের শাখা বিভিন্ন স্থানে সংস্থাপিত হইলে, সমগ্র ভারতে ধর্ম্মবিষয়ক বিবাদ-মীমাংসার এবং ভ্রাতৃত্বপ্রতিষ্ঠার সুযোগ হইতে পারিবে।

২। এইরূপ এই উপলক্ষে বিশেষভাবে ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন দলেরও একটী মিলনসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহাও বাঞ্ছনীয়। সকল দলের নেতৃগণ, প্রচারকগণ ও কর্ম্মিগণ একত্রে মিলিত হইয়া, এখানে পরস্পরের মত, সাধনতত্ত্ব ও কর্ম্মানুষ্ঠানাদি বিষয়ে আলোচনা ও পাঠ প্রসঙ্গাদি দ্বারা পরস্পরের ভাব বিনিময় করিবেন। তাঁহারা বিভিন্নতাপ্রতিপাদক বিষয় লইয়া বিবাদ না করিয়া, শিক্ষার্থীর ভাবে পরস্পরের ভাব গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিবেন, কেহ কাহাকেও কোন বিষয়ে আক্রমণ করিবেন না; কিন্তু প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য ও স্বাধীন মতের সম্মানরক্ষা করিয়া, ভ্রাতৃ প্রেমে পরস্পরের সহিত মিলিবেন। সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের অনুমোদিত "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" মন্ত্র উচ্চারণে বা প্রার্থনা-যোগে সংঘের অধিবেশন আরম্ভ হইতে পারিবে। ক্রমে উপাসনাতত্ত্ব বিষয়ে ভাব-যোগ মিলিলে, মিলিত উপাসনাও হইতে পারিবে। ফলে পরস্পরের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বৈরভাব, এক অন্যের উপর নিজ ধর্ম্মমত চাপাইবার ভাব পরিত্যাগ করিয়া, পরস্পরকে গ্রহণও ভ্রাতৃপ্রেমে মিলনই এই সংঘের একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিবেন, ইহাই যেন ব্যবস্থাপিত হয়।

আমাদিগের ধর্ম্মপিতামহের পবিত্র শতবার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে, এইরূপ দুইটী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সকলে সাম্প্রদায়িক ভিন্নতা অপনোদনে কৃতসংকল্প হইলে, আমরা নিশ্চয়ই আশা করি,

ব্রাহ্মর্ষি যে নব ধর্ম্মবিধানের বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা অচিরেই সফল হইবে।

শ্রীব্রহ্মানন্দদেবের কন্যা মহারাণী সুনীতি দেবী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীমতী মহারাণী সুনীতি দেবী বৈধব্য ও পুত্রশোকে আহত হইয়া সংকল্প করিয়াছিলেন, "স্বজন, আত্মজন এবং নববিধান-মণ্ডলীর সেবায় যেন শেষ কটা দিন কাটাইয়া যাইতে পারি"; ইহারই অনুবর্ত্তী হইয়া, তিনি প্রথম ভক্ত পিতৃদেবের শেষ সাধন-তীর্থ সিমলা পাহাড়স্থ "তারাভিউ" ক্রয় করেন, এবং এই বাড়ীতে যাহাতে একটী আশ্রম হয়, ইহা তাঁহার প্রাণের একটী বিশেষ সাধ হইয়াছিল। বাড়িটী ক্রয় করিয়া এই দীন সেবককে সেখানে আশ্রমস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। নানা প্রতিবন্ধকতা বশতঃ তাহা কার্য্যতঃ পরিণত হয় নাই।

তাহার পর ভ্রাতৃগণ ও ভ্রাতৃপুত্রগণ যখন "কমলকুটীর" বিক্রয় করিতে রাজি হন, মহারাণী ইহার ঋণভার গ্রহণ করিয়া বাড়ীটী ক্রয় করেন এবং ভক্তের চিহ্নিত তীর্থরূপে ইহা রক্ষা করিতে অভিলাষ করেন। শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের তিরোধানের পর কমলকুটীরের যাহা কিছু পরিবর্ত্তন ও উন্নতি, তাহা সুনীতি দেবীরই কৃত। নবদেবালয়ের গৃহটী অসম্পন্ন অবস্থায় রাখিয়া আচার্য্যদেব স্বর্গারোহণ করেন; ইহার বেদী ও বসিবার স্থান তিনিই শ্বেত পাথরের দ্বারা বাঁধাইয়া দেন, এবং যেমন ভাবে প্রেরিত প্রচারক মহাশয়গণ আচার্য্যদেবের সম্মুখ ঘিরিয়া কমলকুটীরস্থ দেবালয়ে বসিতেন, সেই ভাবে আসন চিহ্নিত করিয়া দেন। কমলকুটীরের যে ঘর যেমন ভাবে আচার্য্যদেবের দেহাবস্থানকালে ব্যবহৃত হইত, তাহা প্রস্তরফলক দ্বারা চিহ্নিত করা মহারাণীরই কীর্ত্তি। তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল, এই বাড়ী ব্রহ্মানন্দধাম রূপে চিররক্ষিত হয়; কিন্তু হায়, আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃই তিনি তাহা করিয়া রাখিয়া যাইতে পারিলেন না। তবে মন্দের ভাল, শেষে পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত ভিক্টোরিয়া নারীবিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে ট্রাষ্টী করিয়া তাঁহাদেরই তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ ইহা উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। নবদেবালয়ের সেবাদির ব্যবস্থা অবশ্যই নববিধানপ্রচারক ও আচার্য্যপরিবার দ্বারা নির্ব্বাহ হয়, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা এবং এ দীন সেবককে একবার লিখিয়াছিলেন, "আমরাও দেখিলাম ভাবিয়া, তুমিই এখন দেবালয়সেবার উপযুক্ত সেবক।" ইহার ভার লইয়া সেবায়তের কার্য্য সম্পাদন করি, ইহাই তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা ছিল।

আচার্য্যদেবের পুস্তকাদি বহুলরূপে মুদ্রণ ও প্রচার করিবার জন্য যে 'ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটী' শ্রীমৎ আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়, সে প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহ ও সাহায্য দান করিয়া তিনি কতই কার্য্য করাইয়াছেন। আচার্য্যদেবের অমূল্য গ্রন্থ সকল, যাহা এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই মহারাণী সুনীতি দেবীর অনুগ্রহে ও অর্থসাহায্যে। তিনি যদি অন্য কিছু না করিয়া যাইতেন, কেবল এই অক্ষয় কীর্ত্তির জন্যও তাঁহার নিকট নববিধানমণ্ডলী ও জগৎ চিরঋণী থাকিবে। প্রতি বর্ষে বর্ষে যাহাতে "ব্রাহ্ম পকেট ডায়েরী" প্রকাশিত হয়, তজ্জন্য তাহার সমুদয় ব্যয়ভার তিনি বহন করিতেন। আচার্য্যদেব যে নামে যে জিনিষ বা প্রতিষ্ঠানটী রাখিয়া গিয়াছেন, ঠিক সেই নামে যাহাতে তাহা রক্ষিত হয়, ইহাই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ও নিষ্ঠা ছিল। তিনি কোনরূপ পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী ছিলেন না।

কলিকাতায় যেমন, কোচবিহারেও নববিধানের অধিনেত্রী-রূপে তিনি অনেক কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। কোচবিহারের নববিধানমন্দির, কেশবাশ্রম, নববিধানপল্লীর বাড়ীগুলি তাঁহার প্রাণের জিনিষ ছিল। তিনি বলিতেন, "এসব আমার নয়, আমার মহারাজার স্বর্গীয় প্রতিষ্ঠান; ইহার কোনরূপ অপ-ব্যবহার হইলে, কিম্বা ইহার প্রতি কেহ কোনরূপ শ্রদ্ধাহীন হইলে, আমার অত্যন্ত মর্ম্মবেদনা হয়। এ সমুদয় মহারাজার কীর্ত্তি বলে চির রক্ষিত হয়, ইহাই আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা।"

তিনি একবার আমাকে লিখিয়াছিলেন, "কুচবিহাররাজ্য ভক্তের প্রিয় এবং মনোনীত স্থান, ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে। জানিনা, কোন পুণ্য ফলে এ রাজ্য ভক্ত এবং ভগবানের স্মৃতির ও আশীর্ব্বাদে পৃথিবীতে চিহ্নিত হইয়া রহিল। কোচবিহার আমাদের সকলের প্রণম্য।"

আর একবার আমাকে সেই বিলাত হইতেই লেখেন, "জানি না, কোচবিহারের উৎসবের জন্য এ বৎসর কে যাইতে পারিবেন। পৃথিবী হইতে যাইবার আগে কি নববিধান-পতাকা আবার কুচবিহারের আকাশে শোভাময় হইয়া উড়িবে না? এ দৃশ্যটি কি দেখিব না?"

কুচবিহারে এতদিনে একটিও স্থানীয় লোক নববিধানে বিশ্বাসী হইল না বা দীক্ষা গ্রহণ করিল না, ইহাতে কতই তিনি দুঃখ প্রকাশ করিতেন; তথাপি এখানে একজন প্রচারক নিয়োজিত রূপে থাকেন ও কার্য্য করেন, এজন্য শ্রীদরবারের সভ্যদিগকে বারবার অনুরোধ করিতে এ দীন সেবককে বলিয়াছিলেন। গত বৎসর স্থানীয় প্রচারককে ষ্টেট হইতে অবসর দিতে চাহিলে, তিনি নিজ হইতে তাঁহার ভরণ পোষণের কিয়দংশ ভার বহন করিতে কৃতসংকল্প হন। এ সকল মহা-রাজার কীর্ত্তি বলিয়া অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষিত হয় এবং তাহার এক চুলও এদিক ওদিক না হয়, ইহাই তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল।

শ্রীমৎ মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের ইচ্ছা ও নির্দ্দেশ অনুসারে,

তিনি শৈশবে যেখানে অক্ষরপরিচয় ও শিক্ষা লাভ করেন, সেই উদ্যানে তাঁহার সমাধি প্রতিষ্ঠিত করা হয়। শ্রীরাজরাজেন্দ্র-নারায়ণেরও নির্দ্দেশ অনুসারে পিতৃসমাধিপার্শ্বে তাঁহারও সমাধি প্রতিষ্ঠিত হয়। মহারাজা শ্রীজিতেন্দ্রনারায়ণ স্বয়ং ব্রহ্মসংহিতার প্রার্থনা আবৃত্তি করিয়া, অনুজ হিতেন্দ্রনারায়ণের ভস্মস্থাপন তাঁহারই অনতিদূরে করেন। কিন্তু শ্রীমান্ জিতেন্দ্র-নারায়ণের পরলোকগমনের পর, সকল সমাধিই সে উদ্যান হইতে উঠাইয়া কেশবাশ্রমে রক্ষিত হয়। আবার মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণের চিতাভস্ম বিলাত হইতে আনীত হইয়াও, তাহা রক্ষিত না হইয়া বেনারসে গঙ্গাবক্ষে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। মহারাণী সুনীতি দেবীর একনিষ্ঠ ধর্ম্মপ্রাণে এ সকল ঘটনা বড়ই আঘাত দিয়াছিল; তথাপি তিনি নির্ব্বাক্ হইয়া সকলই সহ্য করেন এবং নির্জ্জনে ভগবচ্চরণে কতই অশ্রু বিসর্জ্জন করেন। পরিবারে বা মণ্ডলীতে কাহারও কোন নিষ্ঠার অভাব দেখিলে তিনি বড়ই মর্ম্মবেদনা অনুভব করিতেন। আবার তাঁহার লাজুক স্বভাববশতঃ সকল সময় সকলকার অশিষ্ট কার্য্যেরও প্রতিবাদ করিতে পারিতেন না। তাঁহার এই লাজুকতা, অকাতর মাতৃস্নেহ ও ভাল মানুষীর সুযোগ লইয়া, পুত্রকন্যাগণও তাঁহার ইচ্ছাবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া তাঁহার প্রাণে বিষম শেল বিদ্ধ করিলেও, তিনি বড় কাহাকেও কিছু বলিতে পারিতেন না। এই কারণে তাঁহাদের কাহারও কাহারও ঋণভারও যথেষ্ট তাঁহাকে বহন করিতে হইয়াছিল।

শোকে তাপে ও নানা প্রকার মানসিক কষ্টে বিধ্বস্ত হইয়া, মহারাণী সুনীতি দেবী, স্বামী ও পুত্র সব যেখানে দেহরক্ষা করিয়াছেন, সেইখানে গিয়াই নিজেও শেষে দেহ রক্ষা করিবেন, এই বাসনা করিয়া, নিতান্ত জরাজীর্ণ দেহে গত ১৯২৯ সনে বিলাত যাত্রা করেন এবং একাদিক্রমে প্রায় তিন বৎসর কাল সেখানে অবস্থান করেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে এখানে উৎসবাদি সময়ে বিশেষ ভাবে তাঁহার অভাব মণ্ডলীস্থ সকলেই কতই অনুভব করিতেছিলেন; তিনিও সেখানে একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারেন নাই, মণ্ডলীর কার্য্যাদির ভাবনা তাঁহাকে সেখানেও স্থির থাকিতে দেয় নাই। এখানকার বিষয় যখন যাহা মনে হইত, তখনই তাহা লিপিবদ্ধ করিতে ব্যস্ত হইতেন। এই সময় একটি বিষয় মনে পড়াতে কেমন ব্যস্ত হইয়া আমাদিগকে, ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩১, যে পত্র লেখেন, তাহার কিয়দংশ উল্লেখ করিলেই তাঁহার এখনকার মনের ভাব বেশ বুঝা যাইবে। পত্রাংশ এই :—

"শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা প্রিয়বাবু, গতরাত্রে অনিদ্রিত ভাবে যখন সময় কাটাইতে ছিলাম, তখন 'অতীতরাজ্য' সুখের রাজ্য অতি নিকটে বোধ হইল; সে রাজ্যে বেড়াইতে আনন্দ হইল বর্ত্তমান আর ভাবিতে পারিলাম না, কিন্তু সম্মুখে ভবিষ্যৎ দেখিয়া ভয় হইল, কিছু যে রাখিয়া গেলাম না, ভাবিয়া কষ্টও হইল। ভয় হইল যে, হঠাৎ যদি মৃত্যু লইয়া যায়, অসমাপ্ত কাজগুলির কি হইবে? সেই জন্য তোমাকে দুই চারিটী কথা আজই লিখিব স্থির করিলাম। যদি আজ না লিখিবার সুবিধা হইত, বড় একটা অভাব থাকিত, কারণ সময় যে কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। তুমি এই পত্র পাইয়া যত শীঘ্র পার কাজ আরম্ভ করিও। * * *

"হেমন্ত ও তোমার মেয়েদের আমার আশীর্ব্বাদ দিও। সকলে আমরা যেন যথার্থ আর্য্যনারী নামের উপযুক্ত হই। তোমাদের বার বার প্রণাম করিয়া আমি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আমাকে যে তোমাদের সঙ্গে ভক্তের কাজ করিবার জন্য ডাকিতেছ, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। যদি কিছু মাত্র ভক্ত-ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারি, স্বর্গে যাব নিশ্চয়। যদি বাঁচিয়া থাকি, আর কয়মাস পরে দেশে ফিরিবার কথা; কিন্তু দেহ এত ভগ্না-বস্থায় আসিয়াছে, কিছু যে বেশী করিতে পারিব, মনে হয় না।"

পরে একটি স্বপ্নের কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন, "সেদিন রাত্রে বড় সুন্দর স্বপ্ন দেখিলাম। আমার প্রাণাধিক রাজরাজেন্দ্র এবং জিতেন্দ্র বাবা সংকীর্ত্তনে যোগ দিয়াছেন, কি সুন্দর মূর্ত্তি! আর ত্রৈলোক্যবাবু, কাকাবাবু প্রভৃতি সকলে কি গানই করিতেছেন! দূরে পর্ব্বতে একটী সহর, কিন্তু অস্পষ্ট; হঠাৎ রাজিবাবা একটা কল হাতে টিপিয়া দিলেন, সমস্ত পাহাড় উজ্জ্বল আলোয় এবং বাড়ীগুলির জানালায় আলোয় এক আলোময় রাজ্য হইল, কি মনোহর দৃশ্য! এ দুঃখিনী মাকে কি রাজিবাবা সে আলোর রাজ্যে লইয়া যাইবেন? কবে যাইব? সে যে উচ্চ রাজ্য পর্ব্বতে। সভাই সে আনন্দরাজ্যে কেবল কীর্ত্তন মত্ততা সুখ।" ক্রমশঃ

দীন সেবক—প্রিয়নাথ

—•—

জননী মঙ্গলা দেবী ও ভ্রাতা বিনয়েন্দ্রনাথ।

ক্রমান্বয়ে দেবী মঙ্গলা ও ভ্রাতা বিনয়েন্দ্রনাথের পবিত্র স্বর্গা-রোহণের দিন আসিয়া পড়িল। জননী মঙ্গলা ১০ই এবং ভ্রাতা বিনয়েন্দ্রনাথ ১২ই এপ্রিল নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া অবিনশ্বর ধামে চলিয়া গিয়াছেন। দেবী মঙ্গলার বাল্যজীবনের ইতিহাস বর্ত্তমান সময়ের নরনারীদিগের অধিতব্য বিষয়। তিনি যে সময়ে বিধাতার বিধানে ব্রাহ্মসমাজের তরঙ্গপূর্ণ অবস্থার ভিতর আসিয়া পড়িয়াছিলেন, বর্ত্তমান যুগে সে অবস্থার অভিজ্ঞতা কয়জন অনুভব করিতে পারেন? সে সময়ে কত নির্য্যাতন, নিপীড়ন ও লোকনিন্দার ভিতর দিয়া হিন্দু নরনারীকে ব্রাহ্ম-সমাজে আসিতে হইয়াছিল। সে পরীক্ষার ভিতরে ব্রাহ্মসমাজে নবাগত নরনারীদিগের অটল ও অবিচলিত বিশ্বাসের মহা পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। দেবী মঙ্গলা হালিসহরের সন্নিকটবর্ত্তী

বৈদ্যপ্রধান কাঁচড়াপাড়া গ্রামে বিশিষ্ট বৈদ্য বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা স্বর্গগত সারদাপ্রসাদ রায় মহাশয় একজন গণ্যমান্য মনীষা-সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁহার জাতীয় বিধানে ও তাঁহার বিশ্বাসানুযায়ী, ত্রিবেণী-নিবাসী, বিশিষ্ট বৈদ্যবংশসম্ভূত, শিক্ষিত ও চরিত্রবান্ যুবক মধুসূদন সেন মহাশয়ের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। বিধাতার বিচিত্র বিধান কে বুঝিতে পারে? তাঁহার দুর্ব্বোধ্য গুপ্ত রহস্য ধর্ম্ম-জগতে চিরদিনই চলিয়া আসিতেছে। যুবক মধুসূদন কলিকাতস্থ হেয়ার স্কুলে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়া ও তৎকালীন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, কলিকাতায় আফিস সক্রান্ত কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। এই সময়ে আমাদিগের পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব ভক্ত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। যুবক মধুসূদন ভক্ত ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে পারিবারিক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ থাকাতে, ব্রহ্মানন্দের বাটীর নিকটবর্ত্তী একটী বাটীতে বাস করিতেন ও তাঁহার সঙ্গে উপাসনা ও প্রকাশ্য সভা সমিতিতে মিলিত হইতেন। ভক্ত হিন্দু পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার ভিতরে ধর্ম্মের আভাস ও ধর্ম্মপ্রবণতা স্বাভাবিক ভাবে বর্ত্তমান ছিল। বলিতে গেলে এই সহবাস যেন মণি কাঞ্চনের যোগ হইয়া গেল। দেবী মঙ্গলা এই মহা অনুকূল স্রোতের মধ্যে পড়িয়া গেলেন। একদিকে ভক্ত ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে মহাযোগ, অপরদিকে ধর্ম্মের নবোন্মেষসম্পন্ন স্বামীর জীবনের মহাকর্ষণ। তিনি যে সময়ে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া পড়িলেন, সে সময়ে তাঁহার ভক্তিমান্ হিন্দু পিতা বর্ত্তমান এবং সেই সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রায় বাহাদুর ডাক্তার তারাপ্রসন্ন রায় মহাশয় কলিকাতাস্থ মেডিকেল কলেজে রাসায়নিক বিভাগে রাসায়নিক পরীক্ষকরূপে ব্রতী। দেবী মঙ্গলা ও ভক্ত মধুসূদনের সম্মুখে মহা পরীক্ষা। একদিকে হিন্দু পিতা ও হিন্দু ভ্রাতা এবং অপরদিকে প্রকাণ্ড বৈদ্য সমাজের বহু আত্মীয়। জীবনে মহা অগ্নি পরীক্ষা। অবশ্য একদিকে দেবী মঙ্গলা ও ভক্ত মধুসূদন জাতীয় সহানুভূতি হারাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের অটল বিশ্বাস, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও চরিত্রের উচ্চতা তাঁহাদের সম্বন্ধে সকলের প্রেম ভালবাসা চিরদিন অটল রাখিয়াছিল। নারীশিক্ষা-সম্বন্ধে পুরাতন বঙ্গদেশে কিরূপ ভাব পোষিত হইয়াছিল, তাহা এখনও প্রাচীনদিগের ভিতরে সে ভাব জাগ্রত। আমরাই দেখিয়াছি, তৎকালীন কোন কোন পিতামাতা লোকসাধারণের অগোচরে গৃহের বালিকাদিগকে কিছু কিছু পড়িতে লিখিতে শিখাইতেন। বিদ্যালয়ে বালিকা-প্রেরণ একটা মহাসামাজিক বিপ্লব। দেবী মঙ্গলা ও ভক্ত মধুসূদন বঙ্গের সেই ভীষণ দিনে বীরের ন্যায় তাঁহাদের প্রথমা কন্যা দেবী সুমতিকে ব্রহ্মানন্দপ্রতিষ্ঠিত "নেটীভ লেডিজ নর্ম্মাল" বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া ছিলেন। এই বিদ্যালয় পরে "ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউশন" নামে অভিহিত হইয়াছিল। ১৮৭৮ সনে দেবী সুমতির সঙ্গে আমার বিবাহ হওয়ার পরও তাঁহাকে ঐ বিদ্যালয়ে পাঠাইতে থাকেন। ব্রহ্মানন্দ যখন শরীরে বর্ত্তমান, তখন এই বিদ্যালয় হইতেই দেবী সুমতি সেই বিদ্যালয়নির্দ্ধারিত জুনিয়ার স্কলারশিপ্ উত্তীর্ণ হয়েন। সেই সময়ের ইতিহাসে বীরত্বপূর্ণ শান্ত ঋষি স্বামী ও ঋষিপত্নীর সাহসিকতা ও নির্ভীকতা স্বর্ণাক্ষরে লিখিতব্য।

এই স্থানে ইঁহাদের জীবনের আর একটী বিশেষ কাহিনী না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। বর্ত্তমান যুগে ব্রাহ্মসমাজ ধনমানের ভিতরেও যাহা করিয়া উঠিতে পারেন না, দেবী মঙ্গলা এবং ভক্ত মধুসূদন তাঁহাদের সামান্য আয়ের ভিতর তাহা করিয়া গিয়াছেন। কেবল তাঁহাদের পুত্রকন্যাদিগকে অবস্থোচিত ভাবে লালন পালন করিয়াই কর্ত্তব্যপালন শেষ করিতে পারেন নাই, তাহাদিগকে উচ্চ শিক্ষা দান করা তাঁহাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। বিধাতার কৃপায় সে ব্রত পালন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

তাঁহাদের এই পরিবারে তাঁহাদের মুখোজ্জ্বল করিবার জন্য ঋষিকল্প ভ্রাতা বিনয়েন্দ্রনাথ তাঁহাদের প্রথম পুত্র হইয়া আসিয়াছিলেন। বালক বিনয়েন্দ্রনাথ পিতামাতার উচ্চ আদর্শ টুকু খুব ধরিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার শৈশব জীবনেই পিতামাতার সঙ্গে ব্রহ্মমন্দিরে গিয়া সাপ্তাহিক উপাসনা পিতার পার্শ্বে বসিয়া নীরবে শ্রবণ করিতেন। এই শৈশব জীবনেই তাঁহার ভিতরে ধর্ম্মভাবের অঙ্কুর উন্মেষিত হইয়াছিল। যখন তিনি শ্রীমদাচার্য্যদেব প্রতিষ্ঠিত কলিকাতাস্থ আলবার্ট স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন, তখনই তাঁহার শ্রেণীর সমপাঠীদিগকে লইয়া কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে গোপনে উপাসনা করিতেন। যখন তিনি কলেজের ছাত্র, তখনও সেইরূপ ভাবে সমপাঠীদিগকে লইয়া উপাসনা ও বক্তৃতাদি করিতেন। তাহার পর যখন কলেজের অধ্যাপক, তখন প্রকাশ্য ভাবে মন্দিরে উপাসনা ও প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতাদি করিয়া ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ বিশেষ কার্য্যে অবতরণ করিয়াছিলেন। যুবক-জীবন হইতেই তাঁহার ভিতরে বক্তৃতা-শক্তি বিশেষভাবে উন্মেষিত হইয়াছিল। অধ্যাপকজীবনে তিনি, ভ্রাতা মোহিতচন্দ্র ও শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতা বরদাপ্রসাদ ঘোষ এবং আরো কয়েকটী যুবক-ভক্তিভাজন প্রচারক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সহিত তাঁহার "শান্তিকুটীরে" সর্ব্বদাই মিলিত হইতেন। তাঁহাদের এই উৎসাহের যুগে শ্রীমদাচার্য্যদেব শরীরে বর্ত্তমান ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার মহাভাব এই যুবকদলের ভিতর একটা যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। ভক্ত প্রতাপচন্দ্রের মহাপ্রস্থানের অব্যবহিত পরেই পাশ্চাত্য ইউরোপের জেনিভানগরে সমগ্র পৃথিবীর সার্ব্বজনিক ধর্ম্মভাবের মহামিলনের কেন্দ্ররূপে এক মহতী ধর্ম্মসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উৎসাহী বিনয়েন্দ্রনাথ সেই মহা সভায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিরূপে আহূত হইয়াছিলেন।

তিনি সেই সভায় যে উৎসাহের সহিত দাঁড়াইয়াছিলেন, মনে হয়, সে উৎসাহের চিত্র এখনও আমার সমক্ষে নূতনের মত বর্ত্তমান। তাঁহার জেনিভা যাত্রার সময় আমরা বাঁকিপুরে অবস্থান করিতে ছিলাম। তিনি যে ট্রেণে বম্বে যাইতেছিলেন, আমি ও আমার সহধর্ম্মিণী সুমতি দেবী সেই ট্রেণে তাঁহার সঙ্গে দানাপুর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলাম। তাঁহার সেই উজ্জ্বল মুখ, তাঁহার সেই উৎসাহপূর্ণ আলাপ ও তাঁহার সেই নবোদ্যম এখনও আমাদের মনে জাগরূক। তাহার পর উৎসাহী বিনয়েন্দ্রনাথ ইংলণ্ড ও আমেরিকার আহ্বানে সেই সকল স্থানে মহা উৎসাহের সহিত নববিধান প্রচার করিলেন। পাশ্চাত্য খৃষ্টবাদী উদার ভক্ত সাণ্ডারল্যাণ্ড তাঁহাকে ঐ সকল স্থানে অনেক বৃহত্তী সভায় বক্তৃতার জন্য আহ্বান করেন। আমেরিকার কোন ভক্তিমতী মহিলা তাঁহার ফটোও তুলিয়া লইয়াছিলেন। আজ সেই উৎসাহী বিনয়েন্দ্রনাথ আর শরীরে নাই! তাঁহার সেই প্রতিভাসম্পন্ন মহজ্জীবন, তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ ও নববিধানের জন্য তাঁহার আত্মদান বর্ত্তমান ধর্ম্মপিপাসু যুবকদিগের সম্মুখে এক জীবনগ্রন্থ রূপে বিকশিত হইতে থাকুক।

পোঃ নামকুম, রাঁচি। শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

—০—

পুণ্যাশ্রমের অধিবেশন।

গত ২৭শে জানুয়ারী, বালিগঞ্জ জগবন্ধু বিদ্যালয়ে পুণ্যাশ্রমের একটী অধিবেশন হয়। নানারূপ অসুবিধা নিবন্ধন সেদিন আশানুরূপ অনেকেই উপস্থিত হইতে পারেন নাই। নিম্নলিখিত কয়জন উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমতী শকুন্তলা সেন, হেমন্তবালা চাটার্জ্জি, সুধা সেন, মণিকা গুপ্ত, উমা চাটার্জ্জি, প্রতিমা বানার্জ্জি, দেবী বানার্জ্জি, স্বর্ণলতা সেন, বিভা বসু, মিসেস সেন, মিসেস সরকার, মিসেস মজুমদার, মিসেস খগেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীমতী অনিলা রায়, কমলা সেন, পুণ্যপ্রভা বোস, সুধা দাস, সরলা দাস এবং পুণ্যাশ্রমের কয়েকটী মেয়ে। শ্রীমতী শকুন্তলা সেন প্রার্থনা করিয়া আশ্রমের মঙ্গল কামনা করেন। সুধা সেন প্রভৃতি সংগীত করেন, পুণ্যপ্রভা বসু আশ্রমের বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করেন। তৎপরে কমলা সেন নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি পাঠ করেন। তারপর সভাভঙ্গ হয়। আজ আশা ও বিশ্বাস লইয়া এই আশ্রমের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি ও পৃষ্ঠপোষকগণ সকলের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে উপস্থিত। আশ্রমের নিজস্ব গৃহ না থাকিলে আশ্রমের স্থায়িত্ব সুদৃঢ় হয় না। অন্ততঃ ৩০টী অনাথার বাসোপযোগী একটী গৃহের জন্য তাঁরা আপনাদের দ্বারে উপস্থিত। স্কুলের কার্য্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য, নানা প্রকার শিল্প ও রোগীর সেবাকার্য্য শিক্ষার জন্য মাসিক আরও একশত টাকা সাহায্যবৃদ্ধির প্রয়োজন। ভগবানের প্রেরণায় যিনি যাহা দিবেন, তাহাই তাঁহারা কৃতজ্ঞহৃদয়ে গ্রহণ করিবেন। যিনি যাহা দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা ৬।৭।১নং একডালিয়া রোড, বালিগঞ্জ ঠিকানায়, সম্পাদিকা, পুণ্যাশ্রম—এই নামে পাঠাইলেই, এই অনাথা দুঃখিনী মহিলাদের নীরব কৃতজ্ঞতা ভরা, ভগবানের চরণে তাঁদের জন্য প্রার্থনা উত্থিত হইবে। সম্পাদিকা প্রাপ্তি-স্বীকারপূর্ব্বক পত্র লিখিবেন ও বার্ষিক রিপোর্ট তাঁদের নিকট পাঠাইবেন।

নিবেদিকা—সরলা দাস।

পুণ্যাশ্রমের জন্য নিবেদন।

সুখ দুঃখ হাসি কান্না আশা নিরাশা দিয়ে ঘেরা এই মানবজীবন পরম বিচিত্র। যুগে যুগে ভগবান্ মানবজীবনে তাঁর কত লীলা দেখিয়েছেন। আমাদের এই দুর্ভাগা দেশের বুকেই ভগবানের প্রেরিত কত মহাপুরুষ কতবার এসে দেশকে ধন্য করেছেন, মহত্ত্বের মধ্য দিয়ে দেশবাসীকে, জগ-দ্বাসীকে ধর্ম্মের পথ, সত্যের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সংসারের দুঃখ শোক দারিদ্র্য ও পাপ মলিনতা অত্যাচার সে পথ মাঝে মাঝে কত অন্ধকারে ঢেকে দেয়, সে আদর্শ আবিল-তায় ম্লান করে তোলে, প্রাণ তাই মোহে অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন ও অবসন্ন হয়ে পড়ে। তখন দুঃখীর ক্রন্দন শুনতে পাওয়া যায় না, ব্যথিতের ব্যথা প্রাণে অনুভব করা যায় না। তবু ভগবান্ তাঁর সন্তানদের ভুলে থাকেন না, কতভাবে কতবার এসে কত জনের হৃদয়দ্বারে আঘাত করেন, প্রাণের তারে ঝঙ্কার দেন। তাই আজ দেশে দেশে কতজন আর্ত্তের সেবায়, দুঃখীর দুঃখ দূর করিবার চেষ্টায় প্রাণমন ধন নিয়োজিত করে নিজেরা ধন্য হচ্ছেন। প্রায় ৪ বৎসর আগে আমাদের পূজনীয়া মা ভগবানের প্রেরণা প্রাণে অনুভব করে, শত বাধা-বিঘ্ন অগ্রাহ্য করে, কয়েকটি দুঃখিনী বোনের দুঃখের বোঝা একটু খানি লাঘব করবার জন্য এই পুণ্যাশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অনাথা, স্বামিহীনা, স্বামিপরিত্যক্তা অভাগিনীদের দুঃখে প্রাণ আকুল হয়ে, তাদের কয়েকটীরও চোখের জল মুছিয়ে দেবার জন্য, প্রাণপণ যত্নে ও সাধ্যাতীত ব্যয় ও পরিশ্রমে, প্রায় ৪বৎসর এই আশ্রমটীকে রক্ষা করে এসেছেন। কিন্তু এই চেষ্টা সফল করে তোলা কত সহজ হয়, যদি সকলের সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভ করা যায়। যথেষ্ট অর্থ ও সাহায্যের অভাবে আশানুরূপ ভাবে এই আশ্রমটীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয় নি। আজ আপনাদের কাছে সেই সহানুভূতি, সহযোগিতা ও উপদেশ প্রার্থনা করতে এসেছি।

এই কলিকাতা সহরে এই রকম আশ্রম ও প্রতিষ্ঠান আরো কয়েকটা আছে ও সুযোগ্য তত্ত্বাবধানের ফলে বেশ সুপরিচালিত হচ্ছে, জানতে পেরেছি। কিন্তু এই রকম এক হাজার আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেও, আমাদের বাঙ্গালা দেশের লক্ষ লক্ষ অভাগিনী নিরক্ষরা বোনেদের হাহাকার থামান যায় না, তাদের তিল তিল

করে মৃত্যুগ্রাসে পড়ার হাত থেকে বাঁচান যায় না। দুঃখতাপে প্রপীড়িতা, অধীনতাশৃঙ্খলে জর্জ্জরিতা এই ভারতের মধ্যে বুঝি সবচেয়ে দুঃখী এই বাংলাদেশের অনাথা বিধবারা। তাদের মধ্যে অধিকাংশের ক্ষুধার অন্ন নেই, সুখ নেই, আশা নেই, ভালবাসার প্রিয়জন নেই, কোনও মঙ্গল কাজে যোগদানের অধিকার নেই, আছে শুধু আত্মীয় স্বজনের গঞ্জনা লাঞ্ছনা, আর ঐ সর্ব্বসুখে বঞ্চিত জীবনপথের সামনে দীর্ঘ দিন, দীর্ঘ রাত্রি। তাদের মধ্যে কয়েকটীকে কিছুদিন আশ্রয় দিয়ে, কিছু লেখাপড়া ও কাজকর্ম্ম শেখবার সুযোগ দিয়ে যদি স্বাবলম্বী করে দেওয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যেই এই প্রচেষ্টা। এখন এখানে দশবারজন দুঃখিনী নারী রয়েছে, তারা স্থানীয় বালিকা-বিদ্যালয়ে হাফ ফ্রীতে পড়িবার সুবিধা পেয়েছে। কিন্তু তাদের আরও কোনও কার্য্যকরী ও Practical শিক্ষা দেওয়া দরকার, যাতে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা লাভ করার জন্য অনেক দিন অপেক্ষা না করিয়া, অল্প কয়েক বৎসর মধ্যেই স্বাবলম্বী হতে পারে। স্থান ও অর্থের অভাবে অনেক আবেদনকারীকে নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে। এই অধিবেশনে এই আশ্রমের জন্য একটী কমিটী গঠন করিবার প্রস্তাব করিতেছি। অন্ততঃ ২০ জনকে নিয়ে একটি জেনেরেল কমিটী ও তার মধ্য থেকে ৮জনকে নিয়ে একটী Executive কমিটী গঠন করিবার প্রস্তাব করিতেছি। মাসে অন্ততঃ একবার করে কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশন হইবে, তাতে আশ্রম-পরিচালনার সকল রকম ব্যবস্থা ঠিক করা হবে, আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হবে।

ভগবানের করুণা লাভ করে ও আপনাদের মত অভিজ্ঞ কর্ম্মিষ্ঠা নারীদের সাহায্য লাভ করে, যদি এই আশ্রমটী সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, এই ভারতের উদ্বেলিত অশ্রুসাগরের কয়েক বিন্দুও যদি মুছে দিতে পারা যায়, নিজেদের ধন্য মনে করব।

কমলা সেন।

ভগ্নি-সমিতি।

ত্রয়োবিংশ ও চতুর্বিংশ বর্ষের কার্য্যবিবরণী।

(ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১—জানুয়ারী, ১৯৩৩)

গত ২০শে মার্চ্চ, সোমবার, সন্ধ্যা ৬॥০টার সময়, ২৮নং নিউরোড, আলিপুর, ভবনে ভগ্নিসমিতির বার্ষিক অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়াছে। মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী অনুগ্রহপূর্ব্বক সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেকগুলি ভগিনী সমবেত হইয়াছিলেন। মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী সুমিষ্ট প্রার্থনা করিলে, সম্পাদিকা শ্রীমতী কিরণময়ী সেন বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। পরে মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী ও শ্রীমতী সরলা দেবী সমিতি সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দান করিলে, সভার কার্য্য শেষ হয়। কার্য্যবিবরণী হইতে নিম্নলিখিত অংশ ও আয় ব্যয় বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল:—

গত দুই বৎসর, ভক্তিভাজন স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ৮৪নং অপার সার্কুলার রোডস্থ "শান্তিকুটীর" ভবনে ও শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেনের বাটীতে, সর্ব্বসমেত ৬টী অধিবেশন হইয়াছে। ১৯৩১ সনের ৬ই এপ্রিল, শান্তিকুটীরে, সমিতির বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী, অনুগ্রহপূর্ব্বক সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সুমিষ্ট উপাসনায় ও গৃহকর্ত্রী স্বর্গীয়া শ্রদ্ধেয়া সৌদামিনী দেবীর শেষ আদর অভ্যর্থনায় সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন।

গত বৎসর সমিতির কোন বার্ষিক অধিবেশন করা হয় নাই। সমিতির নিয়মানুসারে এক্ষণে প্রতিমাসে মাসিক অধিবেশন করা হয় না, গাড়ী ভাড়ার অধিক ব্যয়ের জন্য ইহা বন্ধ থাকে, কার্য্য অনুসারে মাসিক অধিবেশন হয়। এক্ষণে রবিবারে অসুবিধার জন্য মাসের যে কোন শনিবারে হয়।

উপস্থিত সভ্যসংখ্যা ১২০ জন। গত দুই বৎসরের মধ্যে সমিতির কতকজন নাম কাটাইয়া দিয়াছেন, সেজন্য সভ্যসংখ্যা ও আয় কমিয়া গিয়াছে। ২।৪ জন নূতন সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

যাঁহারা মাসিক ও অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে এককালীন দান করিয়াছেন এবং এই ক্ষুদ্র সমিতিতে যোগদান ও সহানুভূতি দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

১৯৩১ সনের ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯৩২ সনের জানুয়ারী পর্য্যন্ত এক বৎসরের আয় ব্যয়:—

আয়—পূর্ব্ববৎসরের হস্তে স্থিতি (সাধারণ ফণ্ড) ১১১৯৶০, মাসিকদান ৭১৩।।০, এককালীন দান ৩১৲, পূজার বস্ত্রের সংগৃহীত দান ৩৫৲, মোট ১৮৯৮।।৶০।

ব্যয়—ছাত্রগণের মাসিক দান ৭৬৲, ছাত্রীগণের মাসিক দান ৭২৲, দুঃস্থ পরিবারের মাসিক সাহায্য ৪২৫৲, এককালীন দান ১০।।০, পূজার বস্ত্র ৩৫৲, নৈশ বিদ্যালয় ৩৬৲, পুণ্যাশ্রম ২৪৲, গাড়ীভাড়া ২৪।।০, দরোয়ানের বেতন ৩৬৲, রিপোর্ট ও কার্ড ছাপান ১৮৲, ডাক ও দরোয়ানের বাস খরচ ১৭৶০, ফুল, চাদর ও বক্‌শিস্ ৪৲, খাতা ২৲, মোট ৭৮০৶০।

হস্তে স্থিতি:—পোষ্ট আফিস ক্যাশ সার্টিফিকেট ১০০০৲, নগদ ১১৮।।৶০, মোট ১১১৮।।৶০।

১৯৩১ সনের ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯৩২ সনের জানুয়ারী পর্য্যন্ত এককালীন দাতাগণের নাম।

শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেন (পিতার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে) ১০৲, শ্রীযতীন্দ্রমোহন বীর (পিতার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে) ১০৲, শ্রীমতী সরোজকামিনী মিত্র ১৲, শ্রীমতী চারুবালা ব্যানার্জ্জির প্রেরিত (রেঙ্গুনের ভগিনীগণ) ৪৲, স্বর্গীয়া গোলাপসুন্দরী দেবীর পুত্র

১৲, স্বর্গগতা সরলা থাস্তগিরের সাম্বৎসরিকে (নববিধান ট্রাষ্ট ফণ্ড হইতে) ৫৲। মোট ৩১৲ টাকা।

১৯৩২ সনের ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯৩৩ সনের জানুয়ারী পর্য্যন্ত এক বৎসরের আয় ব্যয় :—

আয় :—পূর্ব্ববৎসরের হস্তে স্থিতি (সাধারণ ফণ্ড) ১১১৮।৶০, মাসিকদান ৭৪৫।০, এককালীন দান ৩৮৲, পূজার বস্ত্রের সংগৃহীত দান ৩৯৲টাকা। মোট ১৯৩৬৶০।

ব্যয় :—ছাত্রগণের মাসিকদান ৭৮৲, ছাত্রীগণের মাসিকদান ৭০৲, দুঃস্থ পরিবারের মাসিক সাহায্য ৪২৯৲, এককালীন দান ২১৲, পূজার বস্ত্র ৩৮॥০, নৈশ বিদ্যালয় ৩৬৲, পুণ্যাশ্রম ২৪৲, নিমতা বিধবা আশ্রম ৪৲, গাড়ীভাড়া ১৯৲, দরোয়ানের বেতন ৩৬৲, ও দরোয়ানের বাস খরচ ৮৬৶০। মোট ৭৬৪।৶০।

হস্তে স্থিতি—পোষ্ট আফিস ক্যাস সার্টিফিকেট—১০০০৲, নগদ ১৭২।৶০, মোট ১১৭২।৶০।

১৯৩২ সনের ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯৩৩ সনের জানুয়ারী পর্য্যন্ত এককালীন দাতাগণের নাম :—

শ্রীআশীষকুমার ও ভ্রাতাভগিনীগণ (পিতা স্বর্গগত মনোগতধন দের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে) ৫৲, শ্রীসুবিমল রায় ও ভ্রাতাভগিনীগণ (মাতা স্বর্গগতা স্নেহলতা রায়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে) ৫৲, স্বর্গগতা সৌদামিনী দেবীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে শ্রাদ্ধ কমিটী হইতে ১০৲, শ্রীসত্যানন্দ রায় (পত্নীর শ্রাদ্ধে) ৫৲, শ্রীবিনয়কুমার দাস (ঠাকুরমাতার শ্রাদ্ধে) ৫৲, শ্রীমতী প্রমদা দেবী ৩৲, নববিধান ট্রাষ্ট ফণ্ড হইতে স্বর্গগতা সরলা থাস্তগিরের সাম্বৎসরিকে ৫৲। মোট ৩৮৲ টাকা। শ্রীকিরণময়ী সেন।

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ১৬ই মার্চ্চ, রাঁচিতে, নামকুমস্থ ডাঃ বিধানপ্রসাদ মজুমদারের গৃহে, তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ অজিতপ্রসাদ মজুমদারের নবম বার্ষিক শুভ জন্মদিনে, পিতামহ শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদার উপাসনা করেন, পিতামহী শ্রীমতী সুমতি দেবী প্রার্থনা করেন। ভগবান্ তাঁহার পুত্রকে শুভাশীষ দান করুন।

নামকরণ—গত ১৯শে মার্চ্চ, রবিবার, শান্তিপুরের শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ প্রামাণিকের প্রথম শিশুকন্যার শুভনামকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। কালনার শ্রীযুক্ত মথুরামোহন গঙ্গোপাধ্যায় উপাসনা করেন ও শিশুকে "বাণী" নাম প্রদান করেন। এই উপলক্ষে নববিধান প্রচারভাণ্ডারে ২৲, প্রচারক শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন দাসের জন্য ৩৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ২৲, কালনা ব্রাহ্মসমাজ ২৲, শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজে ২৲টাকা দান করা হইয়াছে। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

পারলৌকিক—আমরা গভীর দুঃখের নিম্নলিখিত দুইটী পরলোকগমন-সংবাদ প্রকাশ করিতেছি :—

গত ১২ই মার্চ্চ, ২৪।৩ বাহির মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে, শ্রীমান্ সন্তোষকুমার দত্তের প্রথম সন্তান শিশু পুত্রটী পিতামাতার বক্ষঃ শূন্য করিয়া স্বর্গস্থ পরম জনক জননীর ক্রোড়ে চলিয়া গিয়াছে। গত ১৯শে মার্চ্চ, এতদুপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস উপাসনা করেন। পরম জননী শিশুর আত্মাকে আপন ক্রোড়ে মঙ্গলে কল্যাণে রক্ষা করুন এবং পিতামাতার শোকার্ত্ত প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

গত ৫ই এপ্রিল, প্রাতে ৬॥টার সময়, আসানসোলে, ব্রাহ্মসমাজের গৃহস্থ সাধক শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হঠাৎ সন্ন্যাসরোগে স্বর্গারোহণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৫ বৎসর হইয়াছিল। ৮ই এপ্রিল প্রাতে ৮ ঘটিকার সময়, আসানসোলে তাঁহার ৪র্থ জামাতা রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহের গৃহে, তাঁহার তিন কন্যা (শ্রীমতী চারুবালা মজুমদার, প্রতিভা মৈত্র ও সুষমা সিংহ) তাঁহার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। মধ্যম জামাতা ডাঃ প্রসন্নকুমার মজুমদার উপাসনা করেন। ভগবান্ পরলোকগত আত্মাকে নিত্য শান্তিধামে রক্ষা করুন এবং সকল শোকার্ত্ত প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

মুঙ্গের ভক্তিতীর্থ—ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অনুকুলচন্দ্র মিত্র লিখিয়াছেন :—গত ডিসেম্বর মাসে মুঙ্গের ভক্তিতীর্থমন্দিরের একষষ্টিতম প্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক উৎসব অতি জমাটভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই অখিলচন্দ্র রায়, ভ্রাতা স্বপ্রকাশচন্দ্র দাস ও ডাঃ অনুকূলচন্দ্র মিত্র এবং ভাগলপুর হতে সমাগত মহিলাগণের মধ্যে কেহ কেহ উপাসনাদি করিয়াছিলেন। এই তীর্থভূমির পূর্ব্বাংশে যে স্থানটীতে "প্রমথলাল যাত্রিনিবাস" নির্ম্মাণের জন্য নক্সা স্থানীয় মিউনিসিপালিটী মঞ্জুর করা সত্ত্বেও কালেক্টর সাহেব ঐ স্থানটী দখল করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহা প্রকারান্তরে স্থগিত হইয়াছে। উক্ত কালেক্টর সাহেবেই খাসমহলের বিধানানুসারে মুঙ্গের ব্রহ্মমন্দিরের সমস্ত ভূমিখণ্ড পুনরায় পূর্ব্ববৎ বার্ষিক ৬৲ খাজনায় ৩০ বৎসরের জন্য জমা ধার্য্যে মাননীয় সম্পাদক মিঃ প্রশান্তকুমার সেনের নামেই কবুলতি রেজিষ্টারী করাইয়া লইয়াছেন। ঐ স্থানেই যাত্রিনিবাসনির্ম্মাণের জন্য পুনরায় খাস মহলের কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া যাহাতে যাত্রিনিবাসটী নির্ম্মিত হয়, তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক। মা নববিধানজননী তাঁর নবভক্তের প্রাণের মুঙ্গেরকে সোণার মুঙ্গেরে পরিণত করুন, এই প্রার্থনা।

তীর্থবাস ও সেবা—ভাই প্রিয়নাথ সস্ত্রীক তীর্থবাস ও সেবা-সাধন জন্য পুরী নবশ্রীক্ষেত্রস্থ নবপর্ণকুটীরে অবস্থান করিয়া, নিত্য উপাসনা ও ধর্ম্মানুসন্ধিৎসু যুবাদিগের সহিত প্রসঙ্গাদি করিতেছেন। এখানে প্রতি রবিবার দুই বেলা সামাজিক

উপাসনাও হইতেছে। হাসপাতালে রোগীর নিকটও প্রার্থনা করা হয়। গত ৩০শে মার্চ্চ, বিশ্রামকুটীরে সায়ংকালে বিশেষ উপাসনা হয়। সেখানে রেঙ্গুনের মিসেস পি, সি, সেন অবস্থান করিতেছেন।

সাম্বৎসরিক—গত ১১ই মার্চ্চ, ৫১।১নং রাজা দিনেন্দ্র ষ্ট্রীটে, স্বর্গীয় নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের সাম্বৎসরিকে এবং ১৮ই মার্চ্চ, ১৭নং রামমোহন দত্ত রোডে, স্বর্গীয় কাপ্তান কল্যাণকুমার মুখার্জ্জির সাম্বৎসরিক দিনে, তাঁহার পত্নী শ্রীমতী বিভাদেবীর গৃহে ডাঃ ··নন্দ রায় উপাসনা করেন।

গত ৫ই এপ্রিল, ৩৭নং বদ্রিদাস টেম্পল ষ্ট্রীটে, স্বর্গীয় হরগোপাল সরকারের সাম্বৎসরিকে, তদীয় পুত্র অধ্যাপক প্রিয়ব্রত সরকারের গৃহে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

গত ১০ই এপ্রিল, ৭৬নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে, শ্রীযুক্ত স্বপ্রকাশচন্দ্র দাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র বালক "ধ্রুবের" সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। পিতা বিশেষ প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে ২৲ প্রচারভাণ্ডারে দান করা হইয়াছে।

দানপ্রাপ্তি—শ্রদ্ধা, বিনয় ও কৃতজ্ঞতার সহিত দাতাদিগকে প্রণাম করিয়া, নিম্নলিখিত দান-প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। ভগবান্ দাতাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এককালীন ১০৲, শ্রীযুক্ত মতিরাম সখীরাম আদভানী মাসিকদান ২৫৲, শ্রীমতী সরলা সেন মাসিকদান ২৲, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন মাসিকদান ২৲, শ্রীমতী হেমন্তবালা চাটার্জ্জি মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী মাধবীলতা চাটার্জ্জি মাসিকদান ১৲, শ্রীযুক্ত গগনবিহারী সেন মাসিকদান ১৲, স্বর্গীয় অমৃতলাল ঘোষের পুণ্যস্মৃতিতে মাসিকদান ২৲, শ্রীমতী সুমতি মজুমদার মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন মাসিকদান তিন মাসের ৩৲, শ্রীমতী সরলা দাস মাসিকদান তিনমাসের ৩৲, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মাসিকদান দুইমাসের ৪৲, শ্রীমতী পুণ্যদায়িনী চক্রবর্ত্তী পিতৃসাম্বৎসরিকে ১৲, শ্রীমতী আনন্দদায়িনী চট্টোপাধ্যায় পিতৃসাম্বৎসরিকে ১৲, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু পিতৃসাম্বৎসরিকে ৪৲, শ্রীমতী কুসুমকুমারী ঘোষ পিতৃসাম্বৎসরিকে ২৲, শ্রীমতী প্রিয়বালা ঘোষ মাসিকদান ছয়মাসের ৬৲, ডাঃ সচ্চিদানন্দ হোসেন পাল মাতৃসাম্বৎসরিকে ৩৲, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় মাসিকদান ২৲, লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল জ্যোতিলাল সেন (আই, এম্, এস,) মাসিক দান চারিমাসের ৮৲, মিসেস কমললোচন দাস স্বামীর আদ্যশ্রাদ্ধে ১০৲, শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী সেন স্বামীর সাম্বৎসরিকে ১৲, শ্রীমতী চারুবালা বানার্জি মাসিকদান চারিমাসের ৪৲, স্বর্গীয়া সাবিত্রী দেবীর আদ্যশ্রাদ্ধে পুত্রকন্যাগণ ৫৲, স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র দত্তের সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া কুমারী দেবীর আদ্যশ্রাদ্ধে ১০৲, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার মাসিকদান ৫৲, শ্রীমতী সুষমা বাগচি মাতৃ- [illegible] ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

দেবী

পুস্তক-পরিচয়।

১। সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়—পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত প্রণীত এবং কুমিল্লা, "সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় আশ্রম" হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

গ্রন্থকার ভূমিকাতে লিখিয়াছেন, "অসাম্প্রদায়িক উপাসনা দ্বারা প্রকৃত একতার দ্বার উন্মুক্ত হইবে। সম্মিলিত ব্রহ্মোপাসনা বা 'সালাতে'ই প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব, প্রকৃত ভ্রাতৃত্বের বিকাশেই একত্ব। এই আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া যে 'সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় আশ্রম' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহারই কার্য্যের সাহায্যার্থ এই গ্রন্থ রচিত।" বর্ত্তমান সমন্বয়ের যুগে যাঁহারা সর্ব্বধর্ম্মের সারতত্ত্ব জানিতে সমুৎসুক, আমরা তাঁহাদিগকে এই গ্রন্থখানি পাঠ করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করি। অধ্যাপক দত্ত মহাশয় এই অশীতিপর বৃদ্ধ বয়সেও, যেরূপ কঠোর পরিশ্রম সহকারে, নববিধানের আলোকে বেদ কোরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্রের সারমর্ম্ম অভিজ্ঞতা সহকারে আয়ত্ত করিয়া, তৎসঙ্কলনে ব্যাপৃত আছেন, তাঁহার এই চেষ্টা সার্থক হউক, এবং ধর্ম্মে ধর্ম্মে প্রকৃত মিলন ও একত্ব প্রতিষ্ঠিত হউক।

২। জীবনস্মৃতি—শ্রীমতী সুদক্ষিণা সেন (মিসেস, এ, সি, সেন) বিরচিত, আর্টপ্রেসে মুদ্রিত, ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর, মূল্য একটাকা মাত্র। ৫৭নং ল্যান্সডাউন্ রোড, কলিকাতা—এই ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

গ্রন্থকর্ত্রী ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের দেশ কুসংস্কারের কুজ্ঝটিকায় কিরূপ আচ্ছন্ন ছিল, সেই ঘোর কুজ্ঝটিকাজাল ভেদ করিয়া কিরূপে ব্রাহ্মসমাজের আলোকে আসিলাম এবং সেই সময়কার ব্রাহ্মদের অবস্থাই বা কিরূপ ছিল, তাহাই বলিবার জন্য আমার এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে"। তিনি যাহা বলিতে চাহিয়াছেন, তাহা সুন্দররূপেই বলিয়াছেন। তাঁহার ভাষা সরল, সুন্দর, স্পষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী। বর্ণনাবৈচিত্র্যের মধুরতায় মনোরম। তিনি কেশবচন্দ্রপ্রতিষ্ঠিত "ভারত আশ্রমে" থাকিয়া কিরূপে শিক্ষা দীক্ষা লাভ করেন, তাহারও সংক্ষিপ্ত সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন। পুস্তকখানির প্রথমেই "ভারত আশ্রমের" ১৮৭৪সনের একখানি ছবি (কেশবচন্দ্র ও আশ্রমবাসিনীগণ) দেওয়াতে পুস্তকের গৌরব যথোচিত বর্দ্ধিত হইয়াছে। জীবনস্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে, লেখিকার বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও বার্দ্ধক্যের বিভিন্ন স্তরে, তাঁহার সুন্দর জীবনের মনোরম ছবিও ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমরা এই পুস্তকখানি সকলকেই পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" [illegible] দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

৬৮ ভাগ। ৮ম সংখ্যা। ১৬ই বৈশাখ, শনিবার, ১৩৪০ সাল, ১৮৫৫ শক, ১০৩ ব্রাহ্মাব্দ। 29th April, 1933. অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

মা, কালের প্রবাহে ভাসাতে ভাসাতে কোথায় আনিলে, হায়! বৎসরের পর বৎসর জীবনের দিন চলিয়া গেল। আবার একটা নূতন বৎসর আনিয়া উপস্থিত করিলে। জীবনের পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিলে কত সৌভাগ্যবান্ আপনাদিগকে মনে হয়। কোথায় জন্ম দিলে, কোন্ সঙ্গে বাল্য শিক্ষা দিলে, আবার তোমারই অনির্ব্বচনীয় কৃপায় ও আশ্চর্য্য কৌশলে যৌবনে নবযুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক নবভক্তের প্রভাবাধীনে শুধু আনিলে তাহা নয়, তাঁহার দ্বারা শিক্ষিত দীক্ষিত করিয়া, তাঁহার অনুগত নববিধান-ছাত্র-সংঘে গাঁথিয়া শিক্ষার্থিব্রত দান করিলে; প্রেরিতদলের এবং সাধক সাধিকা ও ভক্তপরিবারের সহিত নিগূঢ় অধ্যাত্ম সম্বন্ধেও সংবদ্ধ করিলে। শেষে নববিধান-সেবকদলের পদপ্রান্তে স্থান দিয়া, তোমার সর্ব্বসমন্বয় যুগধর্ম্মবিধান নববিধানের সেবায় নিয়োগদানে ধন্য করিলে। তোমার কৃপায় যে অসম্ভব সম্ভব হয়, নারকী স্বর্গের নিয়োগ পায়, তাহারই জীবন্ত নিদর্শন দেখাইবে বলিয়া কি এত করিলে? কিন্তু যেমন সৌভাগ্য দিয়াছ, তাহার সঙ্গে সঙ্গে মহান্ উচ্চদায়িত্বও কত দিয়াছ; এ দায়িত্ব-বহনের এক তিলও যে শক্তি নাই, ইহা অনুভব করিয়া বড়ই বিপন্ন হইতেছি। দিনের পর দিন যত যাইতেছে, ততই ভয় ও ভাবনা হইতেছে, "যা করতে এলাম ভবে, তার কি হল?" জেলে মালা মূর্খকে দিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে কতই অলৌকিক লীলা দেখাইয়াছ; বর্ত্তমান যুগেও সেইরূপ মূর্খ অধম পাপী নীচ চণ্ডালসম এমন লোককে তোমার বিধানের রথ টানিতে আনিলে! তুমি তো এবার মাতৃস্নেহে উচ্ছ্বসিত হইয়া সন্তানবৎসলা হইয়াছ; দুর্ব্বল রোগা ছেলের প্রতি তোমার যে অতুল স্নেহ। সেই স্নেহগুণে যদি দিয়াছ তব নব রথ টানিতে তোমার মহারথী দলের সঙ্গে, তবে দেখো যেন তোমার বলে, তোমার ভক্তবলে বলীয়ান্ হয়ে জীবনের মহৎ ব্রত পূর্ণভাবে সমাধান করে ধন্য হইতে পারি; যেন অক্ষম অকর্ম্মণ্য বলিয়া পরিত্যক্ত না হই। কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

নববিধানাচার্য্যের অভিযোগ।

আমরা নববিধানবাদী, নববিধানবিশ্বাসী, নববিধান-সাধক, নববিধান-সেবক সকলেই নববিধান-সম্বন্ধে যাহাতে ঐক্যমত, ঐক্যভাব, ঐক্যজীবন হইতে পারি,

ইহাই আমাদের প্রত্যেকের যে সরল প্রাণগত আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা, ইহা নিঃসন্দেহ। নববিধান একতার বিধান; নববিধানের মত এবং বিশ্বাস সম্বন্ধে যদি আমাদের ভিন্নতা থাকে, তবে কেমন করিয়া আমরা এ বিধানের লোক হইব? তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই নববিধানের পরিত্যক্ত হইব, বা যে মহদুদ্দেশ্য সম্পাদন করিতে নব-বিধান প্রেরিত, তাহা ব্যর্থ করিব।

তাই নববিধানাচার্য্য যাহা আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, তদ্বিষয়ে ঈশ্বরালোকে আলোচনা করিয়া, তাহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করা উচিত মনে করি। তিনি বলিলেন, "হে নববিধানের রাজা, আমার যদি বিচার হয়, আমি বলিতে পারিব না, এ সমুদয় আমারই। দশজন কারিকরে এই নববিধান গড়িয়াছে। খুব ভক্তি, কম ভক্তি, খুব জ্ঞান, কম জ্ঞান, খুব উপাসনা, কম উপাসনা, নিয়মিত উপাসনা, অনিয়মিত উপাসনা, হরিদর্শন, অস্পষ্ট দর্শন পরের মুখে শুনে দর্শন, এই সমুদয় একটি দড়ি দিয়া বাঁধিলে যা হয়, তাই নববিধান হয়েছে। দশ পনর জন কারিকরে মিলে গড়ছে। ক্রমাগত যার মনে যে ছাঁচ আছে, সেই রকম সে করছে। দয়াময়, কি হইল? আমার জিনিষ বলে আমি স্বীকার করিতে পারিতেছি না। যদি পূর্ণ আদর্শটা পৃথিবীতে দিয়ে যেতে পারিতাম, তবুও অনেকটা সুখী হইতাম; তা না হয়ে আমি একটা ছবি আঁকিলাম.* * গোড়ার নক্সা যে আমার, তাতে কেন অন্য রং মিশাই লেন? আমার আদর্শ বদলে দিলেন কেন? গরিবের আদর্শটা পৃথিবীতে রইল না যে, গোড়াটা ঠিক থাকা চাই যে।"

"প্রেমস্বরূপ, পাঁচ কাজের ভিতর গোলমাল করে আমি চলতেভবে আসি নাই, কাপড়ে রিপু করিতে তালি দিতে আমি আসি নাই। আমি যে একখানা নূতন কাপড়ের আগা গোড়া করিতে আসিয়াছি। তবে কেন পাঁচজনে আমার কাজের সঙ্গে গোলমাল করিলেন? পাঁচরকম মত মিলাইলেম? পরমেশ্বর, পবিত্রাত্মা-সম্ভূত একভাবজাত সুজাত সুকুমার নববিধানকে এনে দাও। তোমার সত্য বজায় থাকিবে। পৃথিবী জানিবে, যথার্থ বিধান কি।"

এই যে অভিযোগ বা আক্ষেপোক্তি নববিধানাচার্য্য তাঁর ঈশ্বরসন্নিধানে করিয়াছেন, ইহা কি তৎসাময়িক কোন অবস্থা দর্শনে করিয়াছেন? না, এখনও ইহার কিছু কারণ আছে? এই অভিযোগের কারণ কি? এবং এখনও আমাদের সম্বন্ধে এ অভিযোগের কারণ আছে কি না, আমাদিগের চিন্তা করা উচিত।

নববিধান পবিত্রাত্মার বিধান, ইহা আমরা সকলেই বিশ্বাস করি; সুতরাং "পবিত্রাত্মাজাত" এবং "একভাব-জাত, সুজাত, সুকুমার নববিধানই" যে যথার্থ নববিধান, তাহা আমরা কেহই অস্বীকার করিতে পারি না; এবং সেই "নববিধানই" যে আমাদের সবার নববিধান হওয়া উচিত, সে বিষয়ে কি কোন সন্দেহ আছে?

কিন্তু আমরা যদি মানবীয় ইচ্ছা রুচি এই নববিধানে চালাই, বা এক এক জনে এক এক রকম নববিধান গড়ি, কিম্বা আচার্য্য যেমন আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "খুব ভক্তি, কম ভক্তি, খুব জ্ঞান, কম জ্ঞান, খুব উপাসনা, কম উপাসনা, নিয়মিত উপাসনা, অনিয়মিত উপাসনা, হরিদর্শন, অস্পষ্ট দর্শন, পরের মুখে শুনে দর্শন, এই সমুদয় দড়ি দিয়া বাঁধিলে যা হয়" তাকেই আমরা নব-বিধান বলিয়া অভিহিত করি, কিম্বা "ক্রমাগত যার মনে যে ছাঁচ আছে, সেই রকম" করি ও তাহাকেই নব-বিধান বলিয়া প্রচার করি, তাহা কি ঠিক?

এই জন্যই আচার্য্য যেন ভীত হইয়া বলিলেন; "দয়াময় কি হইল? আমার জিনিষ বলে আমি স্বীকার করিতে পারিতেছি না। যদি পূর্ণ আদর্শটা পৃথিবীতে দিয়ে যেতে পারিতাম, তবুও সুখী হতাম। আমার আদর্শটা বদলে দিলেন কেন? গরিবের আদর্শটা পৃথি-বীতে রইল না যে?"

এইটীই আমাদের বিশেষ চিন্তা ও ভাবনার বিষয় কি নয়? পবিত্রাত্মার প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া যিনি নব-বিধানের ছবি আঁকিলেন, তাঁহার আদর্শ যদি আমরা মানবীয় জ্ঞান বুদ্ধি আনিয়া বদলাইয়া দিতে চাই, তাহা অপেক্ষা ভয়ঙ্কর অপরাধ আর আমাদের কি হইতে পারে? এবং এইরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ যদি আচার্য্যদেব তাঁহার সহযোগীদের মধ্যে দেখিয়া থাকেন, আর যাঁহারা তাঁহার সঙ্গলাভের বা তাঁহার মনোভাব অধ্যয়ন করিতে সুযোগ ও শিক্ষা পান নাই, তাঁহারা যে এ ভ্রান্তিতে পড়িতে পারেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বাস্তবিক বর্ত্তমান সময়ে আমাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন, যাঁহারা নববিধান মানেন সত্য, কিন্তু নববিধান সম্বন্ধে আচার্য্যদেবের যে স্থান, তা স্বীকার করিতে চান

না। তাই এ সম্বন্ধেও আমাদের স্থির মত হওয়া প্রয়োজন।

বিধান মানিতে হইলেই বিধানাচার্য্যকে বা বিধান-বাহক একজনকে মানিতে হইবে। পবিত্রাত্মা যে আদেশ করেন, তাহা ব্যক্তিবিশেষকে যুগে যুগে বাহকরূপে ব্যবহার করিয়া করেন; তাই আচার্য্যদেব অন্যত্র বলিলেন, "আমি বুঝছি, একটা মাঝে খুঁটী চাই। কোথা থেকে আসবে আদেশ মা? এ সব গোপনের কথা বটে। কিন্তু তুমি একজনকে দাঁড় করিয়েছ।"

এইটিই নিগূঢ় কথা, এবং এই জন্যই নববিধান সম্বন্ধে তিনি দাবী করিয়া বলিলেন, "আমার আদর্শ বদলে দিলেন কেন? গোড়াটা ঠিক থাকা চাই যে। গোড়ার নক্সটা যে আমার।" অর্থাৎ সে নক্সা তিনি ঈশ্বরাদেশে আঁকিয়াছেন। এইটি আমাদের মানিতেই হইবে এবং ঈশ্বরাদেশে নববিধানবাহক যে নববিধান প্রচার করিলেন, তাহাই নববিধানের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

আবার কেবল তিনি বলিয়াছেন বলিয়াও যেন আমরা গ্রহণ না করি; কেননা তিনিই বলিয়াছেন, তাঁহার কথা প্রত্যক্ষ পবিত্রাত্মার আলোকে মিলাইয়া লইতে হইবে। সুতরাং নববিধানাচার্য্যের আদর্শ আমরা ঈশ্বরালোকে মিলাইয়া লইলে তৎসম্বন্ধে আর ভ্রান্তি হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। তাহা না করিয়া যদি আমরাও তাহাতে আমাদের বিচার-বুদ্ধির মত চালাই, ভুল হইবে। নববিধান সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া তিনি যে বলিলেন, "আমি পাঁচ-কাজে গোলমাল করিতে আসি নাই, কাপড়ে রিপু করিতে তালি দিতে আসি নাই। আমি যে একখানি নূতন কাপড়ের আগা গোড়া করিতে আসিয়াছি।"

এইটীও আমাদের বিশেষ চিন্তার ও শিক্ষার বিষয়। অনেকে যে মনে করেন, পাঁচফুলের সাজি যেমন, পাঁচ জায়গা থেকে পাঁচটা সত্য সংকলন করিয়া এই নববিধানও তেমনি হইয়াছে। ইহা কখনই সত্য নহে। কাপড়ে রিপু করা বা তালি দেওয়া যেমন, নববিধান তাহাও নয়। ইহা একখানি আগাগোড়া নূতন বস্ত্র, আমাদের পরিধানের জন্য—আমাদের জীবনের নগ্নতা দূর করিবার জন্য—পবিত্রাত্মা স্বয়ং বয়ন করিয়া পাঠাইয়াছেন। ইহা সর্ব্বাবয়বপূর্ণ একটি নূতন ধর্ম্মবিধান; সর্ব্বধর্ম্মের সত্য, সর্ব্বধর্ম্মের সাধন ইহাতে নিহিত আছে সত্য, কিন্তু সকলই নবজীবনীশক্তিসম্পন্ন নূতন। ইহা পাঁচটা ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে সংকলিত শাস্ত্র নয়। তাই এক জায়গায় বলিলেন, "যাবতীয় নূতন একত্র করিলে কি হয়? নূতন বিধান। ইহার আগাগোড়া সব নূতন।"

আচার্য্যদেব অন্যত্র বলিলেন, "ছেঁড়া ছেঁড়া শাস্ত্র বিক্রেতাগণ খাটী বলিয়া বিক্রয় করিতেছেন, আমি ছুড়িয়া ছুড়িয়া ফেলি, আবার সকলে আনিয়া রাখিতেছে। কৃত্রিম জিনিষ, মিশাল জিনিষ এখানে থাকিবে না। ষোল আনা পুণ্য, ষোল আনা শাস্ত্র, ষোল আনা ভক্তি, ষোল আনা পবিত্রতা ঠিক থাকিবে।"

সত্যই পুরাতন ছেঁড়া ছেঁড়া শাস্ত্রের দোহাই বা ভেজাল মিশাল ধর্ম্ম নববিধানের ধর্ম্ম নয়। এ বিধান আসল খাটী সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণ বিধান স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ। ইহা বর্ত্তমান যুগের মানবকুলের পরিত্রাণের জন্য আসিয়াছে। ইহাতে মানুষের হস্ত কিছুই নাই। সুতরাং মানুষ যে যাহা খুসি নববিধানের নাম দিয়া চালাইবে, তাহা হইবে না। তাই একস্থানে আরো বলিলেন, "স্বর্গের খাঁটী অমৃত তুমি তৈয়ার করে পাঠাবে, আমরা কেবল বিক্রয় করিব।" কি সুন্দর কথা! সত্যই নববিধান স্বর্গের অমৃত স্বয়ং মা প্রস্তুত করিয়াছেন, আমরা ইহা যেন প্রস্তুত করিতে না চাই। আমরা কেবল বিক্রয় করিবার, প্রচার করিবার অধিকারী। অতএব আমরা যেন এ সম্বন্ধে প্রবঞ্চনা আর না করি। কিন্তু যথার্থ পবিত্রাত্মাজাত নববিধানপ্রবর্ত্তকের জীবনে যাহা মূর্ত্তিমান হইয়াছে, তাহা যে আগাগোড়া একখানি নূতন বস্ত্র, তাহাই আমরাও পরিধান করিব এবং সেই নববিধান মাতৃহস্ত-প্রস্তুত অমৃত জানিয়া তাহাই পান করিব ও দান বিক্রয় করিব, অর্থাৎ স্বয়ং পবিত্রাত্মাজাত এবং নববিধানাচার্য্যজীবনে সাধিত যে নববিধান, তাহাই আমাদের অন্নবস্ত্র করিয়া, তাহাই সকলকে বিলাইব। তাহাতে আপন আপন মত ইচ্ছা রুচি চালাইব না, অথচ পবিত্রাত্মা দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত হইয়া প্রচার করিব, তাহা হইলেই নববিধানাচার্য্যের সকল আক্ষেপ দূর হইবে। আমরা যেন আপন আপন মন গড়া এক এক নববিধান খাড়া করিয়া তাহা চালাইতে প্রয়াসী না হই, বা আচার্য্যপ্রবর্ত্তিত নববিধানে কলম চালাইয়া তাহা বিকৃত না করি, ঈশ্বর আমাদিগকে এরূপ ধৃষ্টতা হইতে রক্ষা করুন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

ধর্ম্মের মোহ।

বিষয়ের মোহে ত জগৎ সুদ্ধ লোক জড়িত, জর্জ্জরিত। তাহাতেও বিষয়ের সম্বন্ধে মানুষের যথেষ্ট উন্নতিলাভ হইয়া থাকে। কিন্তু ধর্ম্মের মোহ যে ভয়ানক। এই ধর্ম্মের মোহ-জালে পড়িয়াই লোকে আসল ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে; শুধু তাহা নয়, আত্মবিভ্রমবশতঃ সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মোন্নতির পথও রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। জ্ঞানবিচার, শাস্ত্রজ্ঞান, জড়পূজা, কুসংস্কার ও অহংকার এই ধর্ম্ম-মোহের প্রধান লক্ষণ ও উপাদান। প্রায় সর্ব্বসম্প্রদায়ের লোককেই এই ধর্ম্মের মোহ আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে; ব্রাহ্ম, এমন কি নববিধানবাদীদিগকেও ইহা গ্রাস করিতে মুখ ব্যাদান করিতেছে। বিদ্যা বুদ্ধি, সাধন-সিদ্ধি ও উপাসনা-শক্তির অহং হইতেই ধর্ম্মের মোহ উৎপন্ন হবার আশঙ্কা। তাই এ সম্বন্ধে আমাদের সর্ব্বদাই সতর্ক ও খুব সাবধান হওয়া উচিত। জীবন্ত ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ দর্শন এবং তাঁহার প্রেরণা ভিন্ন ধর্ম্ম-সম্বন্ধে কিছু করিতে চাহিলেই, মোহ আসিবার সম্ভাবনা। মোহ একবার প্রবেশ করিলে আর রক্ষা নাই।

অভাবের বোধই উন্নতির সোপান।

আমি মহা পাপী, আমি চির শিষ্য, আমি দীন সেবক, আমি রুগ্ন শিশু, এই আত্মজ্ঞান, এই আত্মবোধ সর্ব্বদা জাগ্রত রাখিয়া ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিলে, তিনি মা হইয়া স্বয়ং আমাদিগকে ধর্ম্মসম্বন্ধে যাহা কিছু প্রয়োজন দান করেন, প্রতিদিন ধর্ম্মজীবনে নব নব শক্তি সঞ্চার করেন এবং নব নব উন্নতি বিধান করেন। নববিধানাচার্য্যের জীবনে ইহা প্রমাণিত। তাঁহার অনুগামী হইয়া দীনাত্মা হইলে, আমরাও ইহার সাক্ষ্যদান করিতে পারি। অভাব-বোধই সর্ব্বপ্রকার উন্নতির সোপান। সর্ব্ব বিষয়ে আপনাকে নিতান্ত অভাবগ্রস্ত জানিয়া, ব্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা-শীল হওয়াই নববিধানের শিক্ষা ও সাধন। নববিধানে তাই "গুরু", "স্বামী", "শিক্ষক", "মহাপুরুষ" ইত্যাদি আখ্যায় কেহ আখ্যায়িত হন নাই।

বিশ্বাস।

নিশ্বাস বন্ধ হইলেই দেহের মৃত্যু হয়। বিশ্বাস চলিয়া গেলেই ধর্ম্মজীবনেরও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। যতক্ষণ নিশ্বাস, ততক্ষণ আশ। যতক্ষণ মনে বিশ্বাস থাকে, ততক্ষণ ধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও নব জীবনলাভের আশা থাকে। এই জন্য ঈশা বলিলেন, "এক সর্ষপকণার ন্যায়ও যদি বিশ্বাস থাকে, তুমি পর্ব্বতকে বলিবে স্থানান্তরিত হও, তখনই পর্ব্বত (পর্য্যন্ত হুকু শুনিয়া) স্থানান্তরিত হইবে এবং কিছুই তোমার পক্ষে অসম্ভব থাকিবে না।" কিন্তু বিশ্বাস গেলেই সব গেল, ধর্ম্মজীবনের মৃত্যু হইল। আবার বিশ্বাস কষ্টসাধ্য সাধনসাপেক্ষও নয়। নিশ্বাসের ন্যায় বিশ্বাসও সহজ ও স্বাভাবিক। নিশ্বাসক্রিয়া মুক্তবায়ু-সেবনে যেমন আরো সহজ ও শক্তিশালী হয়, তেমনি অনন্ত ঈশ্বরের উপাসনা ও ভক্তসঙ্গসহবাসরূপ স্বর্গের মুক্ত সমীরণ সেবনেও বিশ্বাস সহজে বৃদ্ধি পায়। শ্বাসকষ্ট রোগ যার, মহাসাগরের মুক্তবায়ু-সেবন ঔষধ তাহার। ক্ষীণ বিশ্বাস যার, জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসনা অমোঘ ঔষধ তাহার।

"ধর্ম্ম-সাধন"।

(আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের সঙ্গতের আলোচনা)

৪৬—৪৭সংখ্যা—২২শে—২৯শে চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৭৯৪।

(গিরিধির ডাঃ ডি, রায় হইতে প্রাপ্ত)

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রশ্ন—হৃদয় অসাড়, পাপ আছে জানিতেছি, তথাপি কষ্ট অনুভব হয় না, এ রোগ প্রতিকারের উপায় কি?

উত্তর—(১) প্রার্থনার সময় এই অসাড় ভাব দূর করিবার জন্য সরল ভাবে ঈশ্বরের সাহায্য চাওয়া। ইহাতে আপনার যত অকিঞ্চন ভাব হইবে, ততই ঈশ্বরের উপর নির্ভর বাড়িতে থাকিবে, এবং পবিত্রতার জন্য অনুরাগ হইবে। (২) যে পাপ বহুদিনের পোষিত হইয়া হৃদয়কে অচেতন করিয়া রাখিয়াছে, তাহা হইতে কতদূর পর্য্যন্ত গুরুতর বিপদ্ ও অমঙ্গল ঘটিতে পারে, সর্ব্বতোভাবে এই চিন্তা করা। ইহাতে চৈতন্যোদয় হইবার অনেক সম্ভাবনা।

প্র—স্ত্রীলোক সম্বন্ধে ভাল ভাব কিসে হয়?

উ—(১) উপাসনা দ্বারা পুরাতন মন্দভাব সকল ফিরাইয়া স্ত্রীলোক সম্বন্ধে পবিত্র ভাব অর্জ্জন করা। (২) পবিত্র স্ত্রীলোকের সংসর্গে মনের ভাব ভাল করা।

প্র—যে রিপুটী অধিক প্রবল, কি প্রকার বিশেষ চেষ্টায় তাহাকে খর্ব্ব করা যাইতে পারে?

উ—রিপু সকল মনের এক একটী অংশ নয়, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা মাত্র। হৃদয়ের মূল এবং মনের সাধারণ ভাব পবিত্র না হইলে প্রকৃত পক্ষে তাহাদিগকে জয় করা যায় না। যিনি আর সকল পাপ পুষিয়া রাখিয়া কেবল কামরিপুকে দমন করিতে চান, তাঁহার চেষ্টা কখন সফল হয় না। রিপু সকল পরস্পরের সহকারী, মনের মধ্যে একটীর বাসস্থান থাকিলে তাহার কুটুম্ব-গণের আর আসিবার ভাবনা থাকে না। যাহার লোভ কি ক্রোধ আছে, তদ্দ্বারা তাহার কামপ্রবৃত্তিও বৃদ্ধি হইবে।

পাপকে ছোট বড় জ্ঞান না করিয়া, সকল পাপের বিরুদ্ধে দৃঢ়রূপে সংগ্রামপূর্ব্বক জয়লাভ করা কর্ত্তব্য।

প্র—যাহার মনে অনেকদিন হইতে কুপ্রবৃত্তি এমন প্রবল যে, তাহার চেষ্টা করিলেও বিফল হয়, তাহার পক্ষে দুর্দ্দম রিপু সকলকে জয় করিবার নিশ্চয় উপায় কি?

উ—"Passion should be conquered by passion." প্রবৃত্তির দ্বারাই প্রবৃত্তির জয় সাধন করিতে হইবে। যাঁহার যত কেন প্রবল রিপু হউক না, তিনি যদি ঈশ্বরের জন্য প্রবল অনুরাগী হন, কোন সাধু ভাবে বা সাধু কার্য্যে সম্পূর্ণ ব্যাপৃত ও উন্মত্ত হইতে পারেন, তবে অতি সহজে পাপের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন।

প্র—কামরিপু-দমনের ভাব ও অভাব পক্ষে কি কি উপায় আছে?

উ—ভাব পক্ষে উপরে যেরূপ বলা হইয়াছে, অর্থাৎ পবিত্র স্ত্রীলোকদিগের সংসর্গে মনের কুভাব পরিবর্ত্তন করা। অভাব পক্ষে অসৎ গ্রন্থ পাঠ, অসৎ আলাপ ও সংসর্গ হইতে দূরে থাকা।

প্র—পাপ ছাড়িলেও মন্দ কল্পনা আসিয়া মনকে কেন কলুষিত করে?

উ—কুকল্পনা সকল আমাদিগের মনের সাধারণ ও প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করিয়া দেয়। যখন আমরা ভাল হইয়া গিয়াছি বলিয়া অহংকার করি, তখনি পুনরায় পাপে পতিত হই। মনের মন্দ কল্পনা সকল আমাদিগকে সাবধান করিয়া দেয় যে, "অহংকার করিও না, দেখ, এখনও তুমি নরকে বাস করিতেছ"।

শ্রদ্ধাস্পদ বাবু রামতনু লাহিড়ী এই দিবস সঙ্গতে উপস্থিত থাকিয়া আপনার যে কয়েকটী সম্ভাব ও বহুদর্শনের কথা বলেন, তাহা পরে লেখা যাইতেছে।

"আমার মনে অনেক সময় অনেক রিপু প্রবল হয়, লজ্জার কথা বলিয়া রাখিলাম, মরিলে কম শান্তি পাব। পাপের উদ্রেক হইলে আমি ছুটিয়া বাটী হইতে পলাইয়া কোন বন্ধুর মুখ দেখিতে যাই। পাপ-নিবারণের এমন উপায় আর আমিত দেখিতে পাই না।"

পরে তিনি শিক্ষিতদলদিগের হইতে কি কি বিষয়ে নীতি-শিক্ষা লাভ করা যায়, তদ্বিষয়ে অনেক করিয়া বলিলেন। "পূর্ব্বের শিক্ষিত দল উপকার করাই ধর্ম্ম জানিতেন এবং সর্ব্বপ্রকার ভ্রম, কুসংস্কার ও মিথ্যার বিনাশ করিতে সচেষ্ট থাকিতেন। আমি যত জন জানি, তাঁহাদিগের মধ্যে নাস্তিক ছিলেন এমন কেহ বোধ হয় না; কুসংস্কারের ধর্ম্ম মানিতেন না বলিয়া লোকে তাঁহাদিগকে নাস্তিক বলিত। তবে এই বলা যায় যে, তাঁহারা নীতির জন্য যত মনোযোগী ছিলেন, ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের জন্য তত নয়। তাঁহাদিগের প্রতিজ্ঞা ছিল, যে কোন উপায়ে সত্য প্রতিপালন করিব; যাহারা ধূর্ত্ত কপট, তাহাদিগের মুখও দেখিব না। অঙ্গীকার করিয়া তাহা প্রতিপালন না করিলে কি হয়? এ কথা যে জিজ্ঞাসা করিতে পারে, সে অস্বাভাবিক জন্তু। ভদ্রলোক আপনার গৌরবের হানিকর কোন কার্য্য করিতে পারেন না। আমি যা বলিতেছি, মনে থাকিলে আমার উপকার হয়। আমাদের বাঙ্গালিদের প্রধান দোষ ভীরুতা, জীবনের যে প্রণালী কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইবে, তাহাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক জীবন সমর্পণ করা চাই। থিয়োডোর পার্কারের কি সাহস! সহস্র বিপক্ষের সম্মুখে সত্যসমর্থনার্থ নির্ভয়ে বলিলেন, 'I am Theodore Parker' 'আমি লোকভয়ে ভীত হইবার লোক নহি'। তিনি নীতির সহিত ধর্ম্মের যোগ হওয়া আবশ্যক বলিলেন। 'কেবল নীতিতে একটী বন্ধন হয়, কিন্তু তৎসঙ্গে ধর্ম্ম থাকিলে দুইটী বন্ধন রহিল।' যিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, তাঁহার উপর বিশ্বাস অধিক হইবেই হইবে। কিন্তু ধর্ম্ম নীতি-শূন্য হইলে, কুনীতি জীবনে থাকিলে ধর্ম্ম বলা মিছা।"

প্রাপ্ত।

(পারস্য পুস্তক সেকেন্দার নামা হইতে অনুবাদিত)

হে ঈশ্বর! বিশ্বরাজ্যের রাজত্ব তোমার। আমাদের দ্বারা দাসত্ব হয়, কর্ত্তৃত্ব তোমার।

দ্যুলোক ভূলোকের আশ্রয় তুমি, সমুদায় পদার্থই নশ্বর, তুমি মাত্র চির সত্য।

অন্তরীক্ষে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সমুদায় তুমিই সৃষ্টি করিয়াছ, তুমিই একমাত্র সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা।

তুমি উচ্চ জ্ঞানের শিক্ষাদাতা, ভূফলকে জ্ঞান-লেখনী চালনা করিয়াছ।

যখন ঈশ্বরত্বের বিষয় প্রকৃত বিচার হয়, বুদ্ধিই সর্ব্বাগ্রে তোমার প্রতি সাক্ষ্যদান করে।

বুদ্ধিকে তুমিই দর্শনের আলোক দান কর। ধর্ম্মপথের দীপ তুমিই প্রজ্বলিত কর।

তুমি নভোমণ্ডলকে উন্নত করিয়াছ এবং পৃথিবীকে তাহার নিম্নে স্থাপন করিয়াছ।

তুমি একবিন্দু জলেতে সূর্য্যতুল্য সমুজ্জ্বল মুক্তাফল সকল সৃজন কর।

তুমি মণি মাণিক্যের প্রকাশক এবং তাহার জ্যোতির কারণ।

তুমি পাষাণগর্ভে মণির সৃষ্টি করিলে, মণির উপর মনোহর বর্ণের যোজনা করিলে।

তোমার আজ্ঞা না হইলে বায়ু প্রবাহিত হয় না, ভূমি শস্য প্রদান করে না।

তুমিই এরূপ সৌন্দর্য্যে জগৎকে শোভিত করিয়াছ, তুমি কাহার সাহায্য আকাঙ্ক্ষা কর না।

আকাশকে তুমি এরূপ প্রসারিত ও সুচিত্রিত করিয়াছ যে, তাহা চিন্তা করিতে যাইয়া বুদ্ধি পরাস্ত হয়।

জ্যোতির্বিদেরা তাহার তত্ত্ব বহু অনুসন্ধান করিয়াছে, কিন্তু কেহই জানিতে পারে নাই যে, কি প্রকারে তুমি দ্যুলোক ও ভূলোকের রচনা করিলে।

আমাদের দ্বারা দর্শন ব্যতীত আর কি হইতে পারে? শয়ন ভোজন আমাদিগের অন্য দুই কার্য্য।

সমুদায় তোমার মহিমাতে হয়, ইহা স্বীকার করিয়া জিহ্বা সতেজ হউক, তোমার কার্য্যে দোষারোপ না করুক।

এতদপেক্ষা যাহা কিছু গণনা, তাহা আমাদিগের ভ্রান্তি, যে হেতু তোমার তত্ত্ব চিন্তার অগোচর।

তুমি যে নানা বিচিত্র রচনা করিয়াছ, তাহার কিছুতেই তোমার কামনা নাই, তুমি নিষ্কাম ঈশ্বর।

দুই কার্য্যই শ্রেষ্ঠ, তোমার প্রভুত্ব এবং আমাদের দাসত্ব।

আকাশ ও ভূমি, নক্ষত্র ও নভোমণ্ডল তুমি এরূপে সৃষ্টি করিয়াছ যে, চিন্তা যত কেন উচ্চ হউক না, কিছুতে তোমার কৌশলজাল অতিক্রম করিতে পারে না।

কিছুই ছিল না, তুমি ছিলে, কিছুই থাকিবে না, তুমিই থাকিবে।

তুমি সৃষ্টির পূর্ব্বে বিশ্রাম করিতেছিলে এমত নহে, সৃষ্টি হওয়াতেও তোমার কষ্ট হয় নাই।

জগতের অস্তিত্ব অনস্তিত্ব তোমার নিকটে সমান।

জ্ঞানের আলোক তোমার নিকটে পরাস্ত হয়, যে হেতু তুমি দুর্গম প্রদেশে বাস কর।

তুমি বিক্ষিপ্ত নও যে সংযুক্ত হইবে; প্রবর্দ্ধিত নও যে ন্যূন হইবে।

তোমার পথে কল্পনার চক্ষু অন্ধ; তোমার মন্দির অটল।

যাহাকে তুমি উন্নত কর, তাহাকে কেহ নত করিতে পারে না; যাহাকে তুমি নত কর, কাহারো বলে সে উন্নত হইতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীব্রহ্মানন্দদেবের কন্যা মহারাণী সুনীতি দেবী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নববিধানের পঞ্চাশৎবার্ষিক অর্থাৎ জুবিলী উৎসব সময়ে মহারাণী সুনীতি দেবী বিলাতে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময়ে এদেশে আসিয়া উৎসবে যোগদান করিবেন, ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু চিকিৎসকগণ আসিতে দেন নাই বলিয়া বিশেষ দুঃখিত হন।

এই উৎসবের পরে আমাদিগকে একখানি পত্রে লেখেন,—

"পরম শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা, তোমার দ্বিতীয় পত্রখানি আজ পাইলাম, বড় ভাল লাগিল। ৬ই মার্চ্চের (কোচবিহার বাগ্‌দানের দিন) সব যেন চলিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ আমোদ ও আহ্লাদ করিবার প্রিয়জনগুলি যেন লুকাইয়াছেন। কিন্তু ৬ই মার্চ্চ পৃথিবীর বুকে খোদিত, নববিধান-ইতিহাসের ৬ই মার্চ্চ বিশেষ পরিচ্ছেদ। এমন দিনটী এখন কেন এমনভাবে কাটাইতেছি, বুঝিতে পারিতেছি না। বৎসরের পর বৎসর ঘুরিতেছে, কিন্তু সে দিনের সে ছবিখানি বহুদূরে অতীতের অঙ্কেই জ্বলিতেছে দেখিতে পাই। ভবিষ্যতে আবার অমৃতধামে এই দিনে আনন্দ সম্ভোগ করিব, বিশ্বাস করি। * * *

"তোমাদের জীবন ধন্য, নববিধানের জুবিলী উৎসব, এই উৎসবে সদেহে যোগদান করিয়াছ। ধর্ম্মতত্ত্বের বিবরণগুলি সুন্দর হৃদয়গ্রাহী। * * ধর্ম্মতত্ত্বের তত্ত্বগুলি গভীর এবং আশাপ্রদ হইয়া যেন গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধি করে। * * তোমার প্রথম চিঠি এবং তৎসঙ্গে শ্রীআচার্য্যদেবের উক্তি পাইয়াছি। ভিক্টরবাবার কাগজখানি পড়িয়া বড় ভাল লাগিল। আমি সেখানি ধ্রুবেন্দ্রের শিক্ষককে পাঠাইয়া দিয়াছি, বড় ভাল লোক।

"আমার শরীর বড় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। * * দেশে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি; কিন্তু ডাক্তার এখনও যাইতে নিষেধ করিতেছে। * * *

"এখানে সমুদ্রধারে আছি। অনন্তের পূজা সাগরই জানে, আকাশই পারে। অসীম সম্মুখে, এখানে ছোট মন লইয়া কি কেহ অনন্তের উপাসনা করিতে পারে? আচার্য্যদেব যে অনন্তের পূজার অধিকার আমাদের দিয়াছেন, ইহার অপেক্ষা সৌভাগ্য আর কি আছে?

"জানিনা, কুচবিহারের উৎসবের জন্য এ বৎসর কে যাইতে পারিবেন? পৃথিবী হইতে যাইবার আগে কি নববিধান-পতাকা আবার কুচবিহার আকাশে শোভাময় হইয়া উড়িবেনা, এ দৃশ্যটি কি দেখিব না?"

বাস্তবিক আমরাও জিজ্ঞাসা করি, নববিধানে প্রেরিতা ভক্ত ব্রহ্মানন্দ-কন্যার এ সাধ কি কোচবিহারে পূর্ণ হইবে না?

ইহার পর প্রায় এক বৎসর অতীত হইলে, মহারাণী দেবী এদেশে পুনরাগমন করেন। এবং আগমনের পর মাত্র একবার মাঘোৎসবে যোগদান করেন। এই উৎসবে তাঁহার আগমনে যেন মণ্ডলীতে এক নবজাগরণ আসিল। কয়েক বৎসর উৎসব সময়ে তিনি না থাকাতে বড়ই যেন খালি খালি বোধ হইতেছিল। যাহা হউক, এবারকার উৎসব সময়ে তাঁহার উৎসাহপ্রভাবে কয়েকটী অনুষ্ঠান অতি সুন্দররূপে সুসম্পন্ন হয়। "নিশানবরণ" কমলকুটীরের অন্তঃপুরে যেমন হইত, এবার তেমনি হইল; আর্য্যনারীসমাজের উৎসব বহিঃপ্রাঙ্গণের মুক্ত ভূমিতে তাঁবু খাটাইয়া হইল। এখানেই তিনি আর্য্যনারী ভগ্নীদিগকে অন্তরের শেষ নিবেদন জানাইয়া বলিয়াছিলেন, নারীর সতীত্বের প্রভাবে ও ভক্তির প্রভাবে মৃত্যুর উপরও কেমন জয়লাভ হয়।

ইহা সুন্দর গল্পচ্ছলে তিনি বিবৃত করেন। এবারকার মঙ্গল-পাড়ার উৎসবেও তিনি উপাসনা করেন এবং পাড়ার গরিব প্রচারকপরিবারবর্গের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া সকলকে আপ্যায়িত করেন।

এবার নববিধান-ঘোষণার দিনে, অনেকদিন পরে দুইটী ভাই প্রচারকব্রত গ্রহণ করাতে, মহারাণীর আনন্দের আর সীমা ছিল না। এই উপলক্ষে আনন্দমিলন কমলকুটীরেই হয়, তাঁহার বড় সাধ হইয়াছিল; কিন্তু নারীবিদ্যালয়ভূমিতে নরনারীর মিলন বিধিসঙ্গত হইবে না বলিয়া, বাধা পাইয়া ব্রহ্মমন্দিরেই এই অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন। কমলকুটীর নারীবিদ্যালয়ে পরিণত হওয়াতে, এখানে পূর্ব্ববৎ পারিবারিক উৎসবানুষ্ঠান সকল সম্পন্ন হওয়া যে সম্ভবপর হইবে না, ইহা তিনি পূর্ব্বে ধারণা করিতে পারেন নাই। তাই উৎসবের পরে এবার এই বাড়ীর কোন্ ঘর আচার্য্যদেবের দেহাবস্থানকালে কোন্ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত, ইহা প্রস্তরফলকে অঙ্কিত করিয়া চিহ্নিত করিয়াছিলেন। এই বৎসর কমলকুটীরের সান্নিধ্যে ভ্রাতা সরলচন্দ্রের শ্রীকুটিরে অবস্থান করিয়া উৎসবে যোগদান করেন। উৎসবের পর কয়েকদিনের জন্য কোচবিহারে যান। সেখানে গিয়া সকলকে উৎসবানন্দ দান করেন।

সেখানকার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষেও যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু হইয়া উঠে নাই। তাই এই দীন সেবককে বিশেষভাবে আহ্বান করিয়া সেখানকার উৎসব-সম্পাদনে উৎসাহী করেন এবং এই উৎসবের উপলক্ষে পবিত্রাত্মার লীলাকাহিনী শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হন। শ্রীমন্মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক দিন সম্পাদনের জন্যও এ দীন সেবককে অনুরোধ করেন। এই উপলক্ষেও তাঁর এবার কোচবিহার যাইবার বিশেষ ইচ্ছা হয়, কিন্তু হঠাৎ একটি পরদার ডাণ্ডি মাথায় পড়িয়া বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হন। এবং এখন হইতেই তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে।

এই ঘটনার অল্পদিন পূর্ব্বেই (৩১শে মে, ১৯৩২) আমাদিগকে তিনি প্রাণের আবেগে আক্ষেপ করিয়া এক পত্র লিখেছিলেন, পত্রখানি এই :—"পরম শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা, অনেক কাজ বাকি রহিল, যাইবার দিনও কাছে আসিল, 'কি করিব, কি করিব' এই কেবল মনে হইতেছে। তুমি সমুদ্রের তীরে বসিয়া অনন্তের কোলে ঝাঁপ দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছ, সন্দেহ নাই। কাজও করিতেছ, কিন্তু এখানে যে অনেক কাজ। কাহারও সঙ্গে কাহারও মিল নাই। স্নেহের অভাব, বিশ্বাসের অভাব দিন দিন বাড়িতেছে।" তাহার পর আচার্য্যদেব ও মাতৃদেবীর কতকগুলি জিনিষের বিষয় জানিতে চাহিয়া, তাহার বিবরণ ধর্ম্মতত্ত্বে লিখিতে অনুরোধ করেন ও শেষে বলেন, "যদি কিছু মনে না কর, একটি কথা বলি, আমাদের মহাতীর্থ দেবালয় ও কমলকুটির। আচার্য্যদেবের গৃহ দুইটির সেবা করিলে আমাদের মুক্তি ও মোক্ষলাভ।"

শ্রীমতী সাবিত্রী দেবীর পীড়া এই সময়ে বৃদ্ধি হয়। মহারাণী নিজের কাছে রাখিয়া তাঁহাকে কত স্নেহে সেবা করেন, তাঁহার স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য পুরীতেও পাঠাইতে চান, এবং আমাদিগকে বাড়ী দেখিতে বলেন; কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুধা দেবী তাঁহাকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া, অক্লান্ত সেবা-সহকারে যথেষ্ট সুস্থ করিয়া তুলিলেন। এ সময় মহারাণী ক্যামাক্ ষ্ট্রীটের ভাড়াবাড়ী ছাড়িয়া "উডল্যাণ্ড" প্রাসাদে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। ভগ্নী সাবিত্রী দেবী সুস্থ হইয়া, একদিন সন্ধ্যায় বায়ুসেবনে বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইতে আকস্মিক ভাবে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া দেহমুক্ত হন। কোলের পিঠের দুই বোন যেন অভিন্নহৃদয় ছিলেন, আবার এক কোচবিহার-রাজপরিবারে বিবাহিত হইয়া দুইটিতে আরো অবিচ্ছিন্ন বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাই বিনর আকস্মিক দেহপাত দিদির বক্ষে যেন বিনা মেঘে বজ্রের ন্যায় আঘাত করিল। ভগ্নীর বক্ষের উপর পড়িয়া তিনি কতই ক্রন্দন করিলেন। প্রাণের ভগ্নী বিনর শ্রাদ্ধবাসরে নবদেবালয়ে আসিয়া আর মুখে প্রার্থনা বাহির হইল না, অবিরল অশ্রুধারায় গভীর শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিলেন। উপাসনান্তে এ দীন সেবকের হাত ধরিয়া কেবল কাঁদিতে লাগিলেন। দেখিলাম, যেন আধখানি হইয়া গিয়াছেন। বলিলাম, "এ শোক-শেলে আপনার জন্যই আমাদের বেশী ভয়।" কার্য্যতঃ তাই হইল। কই বেশী দিন এ শোক-শেল বহন করিতে পারিলেন?

ইহার কয়দিন পরেই রাঁচিতে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ডাক্তারের আদেশ লইয়া গমন করেন। কিন্তু হায়! সেখানে মাত্র দুই সপ্তাহ থাকিতে না থাকিতেই, ৯ই নবেম্বর ১৯৩২, বুধবার রাত্রি ৩॥টার সময়, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া, মহারাণী সুনীতি দেবী রোগ শোক জরা বার্দ্ধক্য ভগ্ন জীর্ণ সুন্দর তনুখানি ত্যাগ করিয়া, অমরধামে গিয়া ভক্ত পিতামাতা এবং রাজর্ষি স্বামিদেব, পুত্রত্রয় ও কন্যা সঙ্গে হাসিতে হাসিতে মিলিত হইলেন। পরদিন এই ভীষণ শোকসংবাদ বিশ্বময় ঘোষিত হইয়া, সম্রাট্ হইতে দীন পর্ণ-কুটীরবাসী পর্য্যন্ত সকলে কতই না হাহাকার করেন। রাঁচিবাসী সর্ব্বশ্রেণীর বহু নরনারী সঙ্গে ভ্রাতা নির্ম্মলচন্দ্র এবং আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবগণ যেমন করিয়া তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করেন, সে পবিত্র দেহ বহন করিয়া লইয়া গিয়া প্রার্থনা-যোগে প্রাচীন সুবর্ণরেখার উপকূলে অগ্নিসংকার করেন, তাহার বিশদ বিবরণ ইতিপূর্ব্বেই ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হইয়াছে। এবং সেখান হইতে তাঁহার দেহাবশিষ্ট পবিত্র ভস্ম আনীত হইয়া, যে স্থানকে তিনি "মহাতীর্থ এবং মোক্ষধাম" বলিয়া আমাদিগকে লিখিয়াছেন বিধাতার আশ্চর্য্য বিধানে সেইখানেই, ভক্ত পিতামাতার সমাধিপার্শ্বে তাঁহারও সমাধি প্রতিষ্ঠিত হইয়া সুন্দর ভাবে রক্ষিত হইয়াছে। সময়ে হয় তো বিধাতার মঙ্গল বিধানে স্বামী পুত্রের সমাধিপার্শ্বে কোচবিহারেও ভস্মাংশ রক্ষিত হইতে পারে।

মহারাণী দেবী সুনীতির জীবনের ইতিহাস আমরা যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিলাম, লিপিবদ্ধ করিয়া ধন্য হইলাম। এই অপূর্ব্ব জীবনে বিধাতার অপূর্ব্বলীলা-কাহিনী অধ্যয়ন করিয়া কত আত্মাই ভবিষ্যতে ধন্য হইবেন। সত্যই নববিধানে তাঁহার স্থান বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট। তিনি নববিধানপ্রবর্ত্তক নবভক্তের ঔরসে এবং সতীমাতার গর্ভে, তাঁহাদিগের বৈরাগ্য-প্রণোদিত দারিদ্র্য অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়া, দারিদ্র্যে প্রতিপালিত হইয়াও, তিনি বিধাতার অলৌকিক বিধানে স্বাধীন রাজ্যের রাজমহিষী হইলেন, ইংলণ্ডেশ্বরীর সখ্য-লাভে কতই সম্মানিত হইলেন, পার্থিব ঐশ্বর্য্যের কতই উচ্চ অবস্থায় অবস্থাপিত হইলেন, স্বাধীন রাজদ্বয়ের রাজমাতারূপে রাজ্যে পূজিত হইলেন। আবার অন্যদিকে তাঁহার বিবাহের আন্দোলন-ফলেই ব্রাহ্মসমাজ নববিধানে সমুন্নত হইল। শুধু তাহাই নয়, তাহার ফলে আর কিছু হউক না হউক, "সুনীতির সঙ্গে সুনীতি আলোক এবং পরিত্রাণ কুচবিহারে প্রবেশ করিল," এবং সমগ্র জগতের পরিত্রাণপ্রদ সর্ব্বসমন্বয়কারী নবযুগধর্ম্মবিধান অভিব্যক্ত হইল। ইহা সামান্য ব্যাপার নহে। তিনি এই বিধানে এক বিশেষ যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়া, সুখ সৌভাগ্য ঐশ্বর্য্য যেমন, তেমনি বৈধব্য শোক তাপ রোগ দুঃখাদি কতই ক্লেশ বহন করিয়াও, তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিধান-ঘোষণায়, বিধান-সেবায় ব্রতধারিণী হইয়া জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন করিলেন। ভক্ত পিতা যেমন চাহিয়াছিলেন, "আমি রাণী চাই না, আমি চাই ঈশ্বরের দাসী", তাহাই ত জীবনে সংসাধন করিয়া, রাজ্য দেশ স্বজনগণ হইতে দূরে সুবর্ণরেখার কূলে জীবনলীলা শেষ করিলেন। এই জীবনচিত্র সেই মহাচিত্রকরেরই স্বহস্ত-অঙ্কিত চিত্র ভিন্ন আমরা আর কি বলিব? উপসংহারে সভক্তিচিত্তে বলি :—

নমি ব্রহ্মানন্দদেবকন্যা দেবী সুনীতি,
শ্রীনৃপেন্দ্রমহারাণী, রাজাজিৎরাজমাতা সতী,
নববিধান-প্রেরিতা, সংঘভগ্নী, সেবিকাব্রতী,
সঞ্চারিলেন কোচবিহারে "আলোক, ত্রাণ, সুনীতি।"

দীন সেবক—প্রিয়নাথ মল্লিক।

দেবী সৌদামিনী মজুমদার।

(১)

প্রেরিত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সহধর্ম্মিণী সৌদামিনী দেবী একবার পাটনায় শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে কিছুদিনের জন্য আসিয়াছিলেন। পাটনা থেকে ফিরে গিয়ে আমাকে যে চিঠিখানি লেখেন, হঠাৎ সে চিঠিখানি পেলাম। এই সময়ে সেখানি আমরা পাঠ করে কত পুরাতন স্মৃতি মনে জাগিয়ে তুললাম। শান্তিকুটীরের সেই পূর্ব্বেকার স্বর্গীয় দৃশ্য প্রাণে যখন ভাবি, তখন যেন ভাই প্রতাপচন্দ্রের সেই অমরতত্ত্ব উপদেশগুলি স্বর্গে উপনীত করে! আজ তাঁরা দুজনেই সেখানে অনন্ত শান্তি সম্ভোগ করছেন।

মাসীমার স্বহস্ত-লিখিত সেই চিঠিখানির অংশবিশেষ ধর্ম্মতত্ত্বে প্রদান করিতেছি। আশা করি, পাঠক পাঠিকা সকলে সুখী হবেন।

শান্তিকুটীর,
২০শে আগষ্ট,

স্নেহের হেমলতা,

তোমার চিঠি পেয়ে উত্তর দিতে দেরি হয়ে গেল। যা লিখেছ, সবই ঠিক, নিরাপদে এসে পৌঁছেছিলাম বটে। কোথায় এলাম, কার কাছে এলাম, কেউ তো আমার জন্য অপেক্ষা করে বসে ছিলেন না। শূন্য প্রাণে, শূন্য বাড়ীতে প্রবেশ হল। যিনি অনন্ত পূর্ণ, তিনি তাঁর সন্তান আত্মা বক্ষে নিয়ে ঘর ভরপুর করে ছিলেন। এই তো আমার শান্তির আলয়, এখানে সমাধি, এখানে আমার পূজা; চিরস্মরণ্য দেব স্বামীর অক্ষয় চরিত্র সাধন করেই পড়ে থাকা শ্রেয়, যেন তাই পারি, শান্তিকুটীরেই শেষ নিশ্বাস রেখে চলে যাই।

মা! হেম, তোমাদের জন্য মন কেমন করেছিল, মনে হচ্ছিল, সুযোগ পেয়ে তোমাদের সঙ্গে আরো বেশী থাকা হলো না। তোমরা কত আদর, যত্ন, সেবা আমাকে করিলে; আরও পাবার সাধ রয়ে গেল, এটা কি ভাল নয়?

বনলতার শরীর ভাল দেখে আসিনি। যতদিন ভগবান্ দেহে রেখেছেন, তাঁর আশীর্ব্বাদ মনে করে, দেহটা রক্ষা করে চলো। তাঁরই নিকট হইতে সংসারে জীব-প্রবাহের, বিশেষ মানবের সাধ্যমত সেবাব্রত গ্রহণ কর, উদ্‌যাপন কর, মুক্তি সংঙ্গে হইবে। শরীর যাতে রুগ্ন হইয়া না পড়ে, তা করিবে।

আর আমি বিদায় হই। মঙ্গলময় সকল প্রকারে তোমাদের কুশল বিধান করুন।

তোমাদের একান্ত শুভপ্রার্থিনী
মাসীমা

সেবিকা হেমলতা চন্দ্র।

(২)

সেই মহা স্মরণীয় দিন সম্মুখে উপস্থিত, যে গভীর রজনীতে সেই দেবী আত্মা নিঃশব্দে ও নীরবে লোকচক্ষুর অগোচরে সেই অনন্তধামে চলিয়া গেলেন। ক্রুশ প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। দেবী সৌদামিনী ক্রুশযোগে যোগী ভক্ত প্রতাপচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী হইয়া আসিয়াছিলেন। সেই যে দেবী সৌদামিনী যোগী প্রতাপের পার্শ্বে যোগরতা হইয়া ভগবৎ-প্রেমে ডুবিয়া যাইতেন, তিনি সেই প্রেমেই যোগী প্রতাপের নীরব প্রকোষ্ঠে ক্রমে যোগিনীর মত আত্মদান করিলেন।

ব্রহ্মানন্দ-পথের পথিক প্রতাপচন্দ্র ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণীর ভিতরে যে ক্রুশ-প্রেম ঢালিয়া দিয়াছিলেন, সেই প্রেমের পূর্ণ বিকাশ ২৯শে এপ্রিল রজনীতে। দেবী সৌদামিনীর ভিতর দিয়া আমাদিগের নিকট মহাপ্রস্তুতির শিক্ষা আসিয়াছে। এই শিক্ষাই নববিধানের পূর্ণ শিক্ষা। এই নববিধান ভক্ত ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়াছিল। সম্মুখে কত পর্ব্বতসম বিঘ্ন বাধা, অত্যাচারীর কত অত্যাচার এবং বিদ্রূপকারীর কত ; বিদ্রূপ কিন্তু সেই ঈশাপথের মহা পথিক সমস্ত ক্রুশভার বহন করিয়া, নববিধানের পথে চলিয়া ছিলেন। ভক্ত প্রতাপও পারিপার্শ্বিকের মত সেই নেতার সঙ্গে চলিয়াছিলেন। নববিধানের এই নূতন বায়ুর মধ্যে ব্রহ্মানন্দসঙ্গিনী "দেবী জগন্মোহিনী" এবং ভক্ত প্রতাপসঙ্গিনী "দেবী সৌদামিনী" বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। তাই আজ বলিতে আসিলাম যে, নববিধানে বর্দ্ধিতা দেবী সৌদামিনী তাঁহার জীবনপ্রসূত ফল "মহাপ্রস্তুতি" আমাদের সমক্ষে রাখিয়া গেলেন। অসংখ্য অসংখ্য কণ্টকে বিদ্ধ গোলাপতরু ; কিন্তু ভিতর হইতে মহাসৌন্দর্য্য ও সুরভিপূর্ণ গোলাপ পুষ্প বিনির্গত হইতেছে। সংগ্রহকারী পুষ্প সংগ্রহ করেন।

দেবী সৌদামিনী তাঁহার পারিবারিক জীবনে "জননী" আখ্যা ধারণ করিতে পারেন নাই ; কিন্তু তিনি বর্ত্তমান নববিধানমণ্ডলীর ভিতরে মহা জননীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্নেহ, প্রেম ও ভালবাসা মণ্ডলীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছিল। তিনি তাঁহার স্বর্গীয় জননীভাব এবং তাঁহার নববিধানধর্ম্মে মহাদীক্ষা ও মহা প্রস্তুতি তাঁহার নীরব জীবনে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে তাঁহার মস্তকের প্রত্যেক কেশটী পর্য্যন্ত নববিধানের জন্য রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা বিশ্বাসী মাত্রেই স্বীকার করিবেন। তিনি তাঁহার মহা প্রস্থানের পূর্ব্বেই তাঁহার প্রত্যেক কপর্দ্দকটী পর্য্যন্ত নববিধানের নামে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। শান্তিকুটীরে তিনি এই শান্তিই লাভ করিয়াছিলেন।

উপসংহারে বক্তব্য যে, দেবী সৌদামিনীর জীবনগ্রন্থ আমাদের নিকট এক পঠনীয় ও অনুকরণীয় বস্তু। বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। নববিধান জয়যুক্ত হউক।

পোঃ নামকুম, রাঁচি। শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

—•—

শোণিত ও অশ্রুপাত।

ভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনে অশ্রুতত্ত্বের বিষয় পাঠ করিয়াছি ; **বর্ত্তমান বিধানে অমরাগড়ীর ন্যায় একটী ক্ষুদ্র পল্লিতে, ক্ষুদ্র মণ্ডলীতে প্রথম হইতে এখনও যে অশ্রু ও শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহারই বিষয় আজ বিধানমণ্ডলীর চরণে নিবেদন করিতেছি। নববিধানের নবভক্ত বলিলেন, "মা! আমি জন্মসন্ন্যাসী, আমার জীবনটা সুখ ও দুঃখের ভিতর দিয়াই গঠিত"। নবভক্তের প্রাণ হইতে এই যে অভ্রান্ত বেদবাণী উঠিল,** ইহা আমার মত চির দুঃখীকেও কতই আশান্বিত করিতেছে। কুল, মান ছাড়িয়া যে অভিনব মণ্ডলীতে যোগ দিলাম, সেই মণ্ডলীর ভাই ভগিনীদিগকে আমরা যথার্থ দেব ভাবে কৈ গ্রহণ করিলাম? স্বর্গীয় দেবদেবীরূপে আমরা পরস্পরকে লইতে না পারায়, তাহার বিপরীত মলিনভাব আনিয়া, আমরা ভগিনীদ্রোহী ও ভ্রাতৃদ্রোহী হইয়া অনেক পাপ করিয়াছি এবং এখনও করিতেছি। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত যে কতদিনে হইবে, তাহা বলিতে পারি না ; সেই জন্যই আমরা এতটা নীচগামী হইয়া পরস্পরকে অস্বীকার করিতেছি। এই জন্যই অকিঞ্চন ভক্ত ফকির দাস নিতান্ত ব্যথিতপ্রাণে প্রার্থনা করিলেন, "মা! তুমি আমাকে প্রথম হইতে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে রেখেছ, আমার জীবনটা আগাগোড়া এই ভীষণ অগ্নিকুণ্ডের মধ্যেই আছে" ; তাই তাঁর শোণিতপাত ও অশ্রুপাত জীবনের চিরসঙ্গী হইয়াছিল। বিশেষভাবে এদেশের নরনারীদের সেবায় ভক্ত ফকিরদাসকে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়েছে। দেশের শিক্ষা, ধর্ম্ম, চরিত্রগঠনের জন্য নীতিসভা, মাদকনিবারিণী সভা, সুনীতিসঞ্চারিণী ও বন্ধুসম্মিলনীসভা স্থাপন করিলেন। এ দেশের নরনারীর ধর্ম্মসাধনের জন্য বুকের রক্ত ও চক্ষের জল দিয়া ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিলেন এবং সজনে নির্জ্জনে এ দেশের জন্য কতই কাঁদিলেন ; কিন্তু এ দেশবাসীরাই তাঁর জীবনসংহারের চেষ্টা করিয়াছে, তাঁর বাসগৃহে আগুন দিয়াছে, তাঁকে পুত্র, কন্যা, পরিবার এবং দলসহ প্রাচীরবেষ্টিত গৃহে আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য করিয়াছে। তাঁর দলকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে বিবিধ রকমে চেষ্টা করিয়াছে, তাঁদের প্রাণের বিদ্যালয়টীকে আগুনে পোড়াইয়া দিয়াছে, তাঁদের হৃদয়ের শোণিতে গঠিত ব্রহ্মমন্দিরকে ধূলিসাৎ করিবার জন্য প্রকাশ্য আদালতে মোকদ্দমা করিয়াছে ; কিন্তু অকিঞ্চন ভক্তের কাতর প্রার্থনায় এবং দলের দুর্জ্জয় বিশ্বাসের বলে ও প্রমত্ত হরিনামসংকীর্ত্তনের ধ্বনিতে শত্রুদিগের সকল চেষ্টা বিফল হইয়াছে। তাঁদের বিদ্যালয়টী এখন রাজ-অট্টালিকায় পরিণত, ব্রহ্মমন্দিরের গগনভেদী চূড়ায় নববিধানের বিজয়নিশান উড়িতেছে এবং সম্মুখে "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্" ও পুষ্পমালা মধ্যে "মা" এই মহানাম অঙ্কিত হইয়া দর্শক ও পথিকদিগকে কতই আশান্বিত করিতেছে। ভক্ত ফকিরদাস তাই তাঁর দলকে শিখাইয়া গেলেন, "সহ্য কর, ভালবাস এবং পদাঘাতকারীর পদ চুম্বন কর"। ভক্ত ফকির দাসকে সদলে চূর্ণ বিচূর্ণ করিবার জন্য এ দেশের যে তিন জন ধনশালী ব্যক্তি বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তাঁদেরই মধ্যে সেই সময় এক জন এক দিবস তাঁর সহিত দেখা করিতে আসায়, ফকির দাস তাঁর প্রতি যথোচিত সম্মান ও ভক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া, প্রাণ খুলে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। ভক্তের এই সুমধুর ব্যবহারে সেই ধনী ব্যক্তি বলিয়া ফেলিলেন, "বাবা ফকির! যখন তোমার সহিত দেখা হয়, তখন তোমার ভক্তি ও ভালবাসায় আমাদের প্রাণ গলিয়া যায়, আমাদের যে সংকল্প তোমাকে ও

তোমার দলকে চূর্ণ বিচূর্ণ করা, সে সংকল্প আর থাকে না, আমরা তোমাকে দেখিলেই সব ভুলে যাই। যাহা হউক, বাবা, তোমার চেহারায় ও কথায় এবং ব্যবহারে একটী মোহিনী শক্তি আছে, যে শক্তির কাছে আমরা হারিয়া যাই"। ঐ ধনী ব্যক্তিই কিছুদিন পরে ফকির দাসের বাস্তভিটা খরিদ ও বিদ্যালয়ের জন্ত ২.৩দফায় ৩০০৲ বা ৪০০৲ টাকা দীর্ঘকালের জন্ত বিনা সুদে ধার দিয়া ছিলেন। ফকির দাস ও তাঁর দলের নির্য্যাতনকারী একব্যক্তি তাঁর স্বর্গগমনের পর প্রেরিত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ের কাছে কাঁদিয়া বলিলেন, "ভক্ত ভাই ফকির চলে গেলেন, আর আমরা পাপী পাষণ্ড এখনও পড়ে রইলাম।" এদেশে আমরা দীর্ঘকাল নানা ঘটনা ও অবস্থার ভিতরে কেবল বিধান-জননীর ও তাঁর ভক্তদিগের অশ্রু ও শোণিতপাতের অমোঘ-শক্তি দেখিয়া ধন্ত ও কৃতার্থ হইতেছি। ইতি।

প্রণত—শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

নমস্কারসপ্তক।

৫০ বৎসরের অধিক হইয়াছে, নিম্ন প্রদত্ত নমস্কারসপ্তক রচিত হইয়াছিল। ১৮৮০খৃষ্টাব্দে নববিধান বিঘোষিত হইলে, গৃহস্থ-প্রচারক স্বর্গগত কালীকুমার বসু মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া, আমরা কতিপয় বন্ধু নববিধানের নিশান এবং খোল করতাল ও একতারা লইয়া নসীরাবাদ সহরবাসী অনেক বন্ধুর গৃহে ও শম্ভুগঞ্জ, হরিবোলা, কেওটখালী প্রভৃতি গ্রামে, "শুন হে নূতন বিধি আনন্দের সমাচার" এই বিধানসঙ্গীত উৎসাহসহকারে গাইয়াছিলাম। তৎকালে আমাদের প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্নে সমবেত উপাসনা হইত। উপাসনান্তে (১) সাধু মহাজনদিগের চরিত্রে ও জীবনে এবং পশুপক্ষী বৃক্ষলতা প্রভৃতি সর্ব্বভূতে, (২) বেদ, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে, (৩) নারীজাতিতে, (৪) শিশুদিগের মধ্যে, (৫) শত্রু, মিত্র সকলেতে, (৬) নববিধানে, (৭) জীবন্ত ঈশ্বরকে বর্ত্তমান জানিয়া উপাসকগণ সম্মিলিত ভাবে প্রণাম করিতেন। এই প্রণাম শ্লোকাকারে রচিত হইয়া তৎকালে শ্রীশ্রীহরিভক্তিতরঙ্গিণী নাম্নী ত্রৈমাসিক পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। কুচবিহারে এবং ঢাকাতে কোন কোন বন্ধু উহা দৈনিক সমবেত উপাসনাতে ব্যবহার জন্ত আমাকে অনুরোধ করা সত্বেও, আমি তাহা ব্যবহার করি নাই। কেন না, সর্ব্বসাধারণের জন্ত যে উপাসনা-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত হইয়াছে, তাহা ঠিক সেইরূপই থাকা বিধেয়। তবে যাঁহারা চরিত্রে এবং জীবনে বিশেষভাবে নবধর্ম্ম সাধন করিবেন, তাঁহাদের জন্তই এই নমস্কারসপ্তক। সুতরাং ইহা ব্যক্তিগত স্বাধীন ইচ্ছার উপরে থাকে, ইহাই একান্ত বাসনা। এ জন্ত ইহা ইতিপূর্ব্বে ধর্ম্মতত্ত্বে দেওয়া হয় নাই। এই ভাবে থাকিলে হয় ত শ্লোক কয়টি বিলোপ হইয়া যাইতে পারে, এ আশঙ্কা আছে। তাহা ছাড়া, ইহা প্রকাশ করিলে যদি কাহারও উপকার হয়, তাহাও মনে হইতেছে। এ জন্ত শ্লোক কয়টী সামান্ত পরিবর্ত্তন করিয়া এবং ধর্ম্মপিতামহ রাজা রামমোহন, ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং নববিধানের প্রেরিতগণের মধ্যে কয়েকটী নাম দিয়া কিঞ্চিৎ পরিবর্দ্ধন করিয়া, ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশ জন্ত প্রেরণ করিতেছি।

নমস্কারসপ্তকম্।

নমস্তুভ্যং মহর্ষীশা দাসামুক্তেঃ সুসাক্ষিণে।
পিতৃপ্রাণতদেকাত্মন্ জনস্যার জনাশ্রনে॥
নমোনমোহস্তু কৃষ্ণায় যোগাচার্য্যায় ধীমতে।
সত্যধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাত্রে হরিদ্বেষিবিমর্দ্দিনে॥
নমোহস্তু গৌরচন্দ্রায় ভক্তিপথপ্রদর্শিনে।
প্রেমোন্মত্তায় ভক্তায় প্রেমিকায় নমোনমঃ॥
নমস্তেকেশবাদায় মহম্মদায় হজরতে।
নারদায় মোসেসায় যুধিষ্ঠিরায় বৈ নমঃ॥
নমো দেবেন্দ্রনাথায় শ্রীরামমোহনায় চ।
কেশবায় প্রতাপায় চাগোরায় নমোহস্তু তে॥
ইহামুত্রনিবাসিভ্যো ভক্তেভ্যোহস্তু নমোনমঃ।
বিধানবাদিনে তুভ্যং বিধাতুর্বিধিধারিণে॥ ১॥
নমঃ পুরাণগীতাভ্যাং বাইবেলায় ছন্দসে।
শ্রুতয়ে স্মৃতয়ে চৈব কোরাণায় নমোনমঃ॥
জেন্দাভেস্তে নমস্তুভ্যং নমো ললিতবিস্তর।
হরেমুর্খসমুত্থায় সত্যশাস্ত্রায় তে নমঃ॥ ২॥
নমোহস্তু গুরবে নৃণাং ধৈর্য্যশিক্ষাপ্রদায়িকে।
ললনে পতিগেহশ্রী মাতৃস্নেহস্বরূপিণি॥
নমস্তুভ্যং পতিপ্রাণে মানবকুলভূষণে।
স্নেহবত্যৈ মহাসত্যৈ পত্যেকাত্মবিধারিণি॥ ৩॥
নমোহস্তু তে পবিত্রাত্মন্ শিশবে দেবমূর্ত্তয়ে।
পুণ্যালয় সহাস্যাস্য নেত্রাঞ্জনায় তে নমঃ॥
ক্ষমাশীল নমস্তুভ্যং বিনয়াবনতায় তে।
অহঙ্কারবিহীনায় প্রশান্তচেতসে নমঃ॥ ৪॥
বিরোধিনো নমোবোহহং ব্রহ্মযন্ত্রস্বরূপকাঃ।
পীড়য়া সত্যসন্ধ্যয়া মুক্তিপথাবধারিণঃ॥ ৫॥
বিধাতুর্বিধয়ে তুভ্যং ভক্ত্যা প্রীত্যা নমোনমঃ।
ত্বৎপ্রসাদান্মমাজস্য জীবন্মুক্তির্ভবিষ্যতি॥ ৬॥
নমোহস্তু হরয়ে নিত্যং পাষণ্ডদলনায় তে।
বিধানং কুর্ব্বতে তুভ্যং ভক্তিমুক্তিপ্রদায়িনে॥ ৭॥

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন।

সংবাদ।

জাতকর্ম্ম—বিগত ২৭শে চৈত্র, ১০ই এপ্রিল, সোমবার, নালমনিরহাটে, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী শ্রীমতী সরোজিনী দেবী, তদীয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর গৃহে, ঈশ্বরকৃপায় নিরাপদে একটী পুত্র প্রসব করিয়াছেন। গত ১৭ই এপ্রিল, সোমবার, শিশুর মাতামহ শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী যথা-রীতি শিশুর জাতকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন। শিশুটী তাহার পিতামাতার ৪র্থ সন্তান।

গত ১০ই বৈশাখ, রবিবার প্রাতে, হাওড়া-বাঁ্যাটরা-নিবাসী স্বর্গীয় ডাঃ শরৎকুমার দাসের পৌত্র, শ্রীমান্ প্রশান্তকুমার দাসের নবজাত শিশুপুত্রের শুভজাতকর্ম্মে ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন।

ভগবান্ নবজাত শিশুদিগকে ও তাহার পিতামাতাকে আশী-র্ব্বাদ করুন।

নামকরণ—গত ১৩ই এপ্রিল, বাঁটরা ব্রাহ্মসমাজের উৎসবোপলক্ষে প্রাতঃকালীন উপাসনায়, শ্রীমান্ প্রভাতকুমার দাসের পুত্রের নামকরণ হয়। শিশুর নাম "প্রণতিকুমার" দেওয়া হয়।

গত ১৯শে এপ্রিল, রাত্রে, ২৩নং বাদুরবাগান রো ভবনে, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দত্তের কন্যা ও শিশুপুত্রের নামকরণ অনুষ্ঠানে ভাই [illegible]ক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন এবং কন্যাকে "নমিতা" ও শিশুপুত্রকে "রণজিৎকুমার" নাম প্রদান করেন।

ভগবান্ শিশুদিগকে ও তাহাদের পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

নববর্ষ—নববর্ষাগমে গত ১৪ই এপ্রিল, প্রাতে, নবদেবা-লয়ে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ও শ্রীমতী মাখমবালা বসু বিশেষ প্রার্থনা করেন এবং আচার্য্যদেবপুত্র শ্রীযুক্ত ভ্রাতা নির্ম্মলচন্দ্র আচার্য্য-দেবের প্রার্থনা এবং ভ্রাতা সরলচন্দ্র "মাতৃদেবীর" প্রার্থনা আবৃত্তি করেন। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। "মানবজীবন সময়ের সমষ্টি ঈশ্বরের কৃপায় সুখ দুঃখ, সম্পদ্ বিপদ্, জীবন মরণের ভিতর দিয়া, সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়া মানবাত্মা অনন্ত জীবনপথে অগ্রসর হয়," এইভাবে উপদেশ প্রদত্ত হয়।

নূতন খাতা—গত ১৪ই এপ্রিল, ১লা বৈশাখ, পূর্ব্বাহ্নে, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র নন্দীর দোকানে "হালখাতা" উপলক্ষে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

উৎসব—গত ১৩ই এপ্রিল, চৈত্রসংক্রান্তির দিনে, হাওড়া বাঁ্যাটরায়, ভ্রাতা বসন্তকুমার দাসের গৃহে, বাঁ্যাটরা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হয়। প্রাতে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক এবং সন্ধ্যায় ডাঃ কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন। ভ্রাতা বসন্তকুমার ও তাঁহার পুত্রগণ বহুজন নিমন্ত্রণ করিয়া দুই বেলাই প্রীতিভোজন করান।

সেবা—গত ১১ই এপ্রিল, পুরী থেকে কটকে আসিয়া, ভাই প্রিয়নাথ মস্তকঘূর্ণন-রোগে আক্রান্ত হন। অসুস্থতা সত্বেও ভ্রাতা রামকৃষ্ণ রাওর পরিবারবর্গসহ সন্ধ্যায় উপাসনা করিয়া, পরদিন শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে আসেন। ১৩ই সন্ধ্যায় বর্ষবিদায় উপলক্ষে ও ১৪ই সন্ধ্যায় নববর্ষাগম উপলক্ষে এখানে উপাসনা হয়। স্থানীয় বন্ধুগণ যোগ দেন।

ডাঃ প্রসন্নকুমার মজুমদার ১৭ই ফেব্রুয়ারী রেঙ্গুনে পৌছেন। তিনি ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ৫ই, ১৯শে ও ২৬শে মার্চ্চ, চারি রবিবার সন্ধ্যাকালে স্থানীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করেন। ক্রমান্বয়ে উপদেশের বিষয় ছিল,—সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়, ধর্ম্ম ও অস্পৃশ্যতা, পাপ ও পুণ্য কর্ম্মের ফল এবং সত্যই মানুষের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার ও সুদৃঢ় আশ্রয়। ১১ই মার্চ্চ, সন্ধ্যায়, ব্যারিষ্টার ইন্দুভূষণ সেনের স্বর্গা-রোহণ উপলক্ষে তাঁহার ভাগিনেয়ী-জামাতা ব্যারিষ্টার রাজেন্দ্র-কুমার রায়ের রেঙ্গুনস্থ বাসায় এবং ১৯শে মার্চ্চ প্রাতে স্বর্গীয় কাশীচন্দ্র ঘোষালের জ্যেষ্ঠ জামাতা প্রফেসার বিজয়কুমার বসাকের গৃহে, তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার জন্মদিন উপলক্ষে উপাসনা করেন। ইহা ভিন্ন ডাঃ মজুমদার রেঙ্গুনের প্রত্যেক ব্রাহ্মের বাসায় যাইয়া সকলের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করেন। ২রা এপ্রিল তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন।

ভিক্ষা চাই—ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক লিখিয়াছেনঃ—পুরী নবপর্ণকুটীরনির্ম্মাণ হেতু প্রায় ৭০৲ ঋণ হইয়াছে। বি, এন, রেলের কর্ত্তৃপক্ষগণ যদিও অল্প মূল্যে পুরাতন স্লিপার কাঠ দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, তাহা আনাইবার সুযোগ হয় নাই। তাই কুটীরের দরজা জানালা সব এখনও প্রস্তুত হয় নাই। উপরে সিলিংও করিতে হইবে। বার্ষিক সংস্কারকার্য্যেও প্রায় শতাধিক টাকা ব্যয় হইবে। এই সকলের জন্য অর্থ ভিক্ষা চাই, এবং ধর্ম্মপ্রাণ দাতৃগণের অনুগ্রহ ভিক্ষা করি। যিনি যাহা দয়ার্দ্রচিত্তে দান করিবেন, পুরী নবপর্ণকুটীরে সেবকের নামে, কিম্বা ডাঃ বি, সি, ঘোষ—৩নং ক্রীক রো, কলিকাতা এই ঠিকানায়, কিম্বা ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে, প্রচারকার্য্যালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইলে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।

কোচবিহারে মহোৎসব—বিধান-জননীর অনির্ব্বচনীয় লীলায়, এবার কোচবিহারের নববিধানমন্দিরপ্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, গত ১৬ই এপ্রিল হইতে ২১শে এপ্রিল পর্য্যন্ত মহোৎ-সব হইয়াছে। ষ্টেটের অর্থসাহায্য-সংকোচ হেতু পাথেয়-প্রার্থী না হইয়া, ভাই প্রিয়নাথ তীর্থযাত্রীর ভাবে, শারীরিক বার্দ্ধক্য এবং স্নায়ুদৌর্ব্বল্য সত্বেও আসিয়া, উৎসব-সম্পাদন-কার্য্যে ব্যবহৃত হন।° ১৬ই এপ্রিল, সন্ধ্যায় আরতি-যোগে উৎসবের দ্বার উদ্ঘা-টিত হয়, রবিবার বলিয়া সংক্ষেপে উপাসনাও হয়। ১৭ই প্রাতে শ্রীমন্মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের স্বর্গারোহণ বার স্মরণে কেশবা-

শ্রমস্থ সমাধিমণ্ডপে পরলোকতীর্থ সাধন হয়। অদ্য শ্রীঈশার পুনরুত্থানের দিন; এই দিন শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণের সহিত মহারাণী সুনীতি দেবীর পুনরুত্থানে পুনর্মিলন উপলব্ধ হয়। সন্ধ্যায় সর্ব্ব-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সম্মিলনের উৎসব হয়। রাজমন্ত্রী শ্রীযুক্ত জে, এম্, সেন গুপ্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ভাই প্রিয়নাথ প্রার্থনা ও আচার্য্যদেবের বিধানঘোষণাবাণী পাঠ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল কবিরত্ন হিন্দুধর্ম্মবিষয়ে, মিঃ পল খ্রীষ্টধর্ম্ম বিষয়ে ও শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। কুমারী কোহিনুর রায় মধুর সঙ্গীত করেন। ১৮ই সমস্তদিনব্যাপী উৎসব হয়। প্রাতে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন, অপরাহ্নে পাঠ, প্রসঙ্গ ও কীর্ত্তনাদির পর ভাই প্রিয়নাথ বেদীর কার্য্য করেন। এ বেলার উপাসনায় ভ্রাতৃগণের সহিত ভগ্নীগণও পর্দ্দার অন্তরাল হইতে কয়েকটী মিষ্ট সঙ্গীত করিয়া উৎসবানন্দ বর্দ্ধন করেন। ১৯শে কেশবাশ্রমে আর্য্যনারীসমাজের উৎসব হয়, ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন, ভগ্নীগণ ও কন্যাগণ অনেকেই মধুর সঙ্গীত করেন এবং পরে পাঠ প্রসঙ্গাদির পর প্রীতিভোজন হয়। এই দিনেই ভ্রাতৃমণ্ডলীর কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধু ও যুবা কর্ম্মিগণ প্রীতিভোজনে নিমন্ত্রিত হইয়া স্বতন্ত্রভাবে প্রীতিভোজন করেন। অপরাহ্নে শিশু-সম্মিলন হয়, ভাই প্রিয়নাথ প্রার্থনা করিয়া শিশুকেশবের গল্প বলিলে, শিশুগণও কিছু কিছু আবৃত্তি করেন। ভগ্নীগণ সঙ্গীত করিয়া শিশুদিগকে উৎসাহিত করেন। ২০শে প্রাতে কেশবাশ্রমে উপাসনা হয়, ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন ও ভ্রাতা কেদারনাথ বিশেষ প্রার্থনা করেন। এই দিন সন্ধ্যা ৬৷৷টায় বিশ্বাসী ও সহানুভূতি-কারীদিগের সভাধিবেশন কেশবাশ্রমে হয়। মাননীয় রেভেনিউ অফিসার ও ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ দত্ত মণ্ডলীর সভ্যদিগের সহিত আমন্ত্রিত হইয়া শুভাগমন করেন এবং নূতন কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য হইতে স্বীকৃত হন। এ দিনকার কার্য্যবিবরণী পরে প্রকাশ করা হইবে। ভাই প্রিয়নাথ প্রার্থনা করিলে কয়েকটী নির্দ্ধারণ হয়, একটী কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হয়, ভ্রাতা মনোরথধন দে (এম্ এ) সম্পাদক ও ভ্রাতা কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। সন্ধ্যায় যুবকগণ কেশবাশ্রমের উদ্যানে একটী ধর্ম্মাভিনয় করেন। ২১শে এপ্রিল শ্রীযুক্ত মনোরথধন দের গৃহে পারিবারিক উপাসনার উৎসব হয়, ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন, ভ্রাতা মনোরথধন দে ভক্তি-উচ্ছ্বসিতভাবে সঙ্গীত করেন। সন্ধ্যায় কেশবাশ্রমে শান্তিবাচন হয়। ভ্রাতৃগণ ও ভগ্নীগণ মধুর সঙ্গীত করেন। ২২শে প্রাতে ভ্রাতা কেদার-নাথের গৃহে উপাসনা করিয়া ভাই প্রিয়নাথ সন্ধ্যার মেলে পুনর্যাত্রা করেন।

পারলৌকিক—আমরা গভীর দুঃখের সহিত নিম্নলিখিত দুইটী পরলোকগমন-সংবাদ প্রকাশ করিতেছি :—

বিগত ২৭শে মার্চ্চ, নববিধানে দৃঢ়নিষ্ঠ বৃদ্ধ বন্ধু রুক্মিণীকান্ত চন্দ, নিজবাড়ী মত্তগ্রামে দেহরক্ষা করিয়া বিশ্বজননীর ক্রোড়স্থ হইয়াছেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ময়মনসিংহে যে চারিজন যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম ও জ্ঞানের শিক্ষার্থী হইয়াছিলেন, রুক্মিণীবাবু তন্মধ্যে যোগশিক্ষার্থী হইয়াছিলেন। তিনি স্বর্গীয় বিহারীকান্ত চন্দের কনিষ্ঠ এবং স্বর্গীয় রমণীকান্ত চন্দের অগ্রজ। তিনি বরাবর ঢাকায় ভাদ্রোৎসবে যোগদান করিতেন। সকল প্রচারকের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি এবং অটল শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার বয়স ন্যূনাধিক অশীতি বৎসর হইয়াছিল। গ্রামে বাস করিয়া কবিরাজি করিতেন।

গত ১০ই এপ্রিল, কলিকাতায়, রাধানগর-রামমোহনস্মৃতি-ভবনের উদ্যোক্তা ও কতিপয় অসহায় বালকবালিকাদের প্রতি-পালক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ পাল দীর্ঘকাল রোগযাতনা ভোগ করিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। গত ২৩শে এপ্রিল, তাঁহার পবিত্র শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে নববিধান প্রচারভাণ্ডারে ১০৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

পরলোকগত অমর আত্মা সকল মাতৃক্রোড়ে শান্তিলাভ করুন এবং শোকার্ত্তপ্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বর্ষিত হউক।

সাম্বৎসরিক—বিগত ২৬শে চৈত্র, অমরাগড়ীতে, স্বর্গীয় যশোদাকুমার রায়ের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, তাঁর সমাধি-মন্দিরে, ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন। ২৭শে চৈত্র, প্রাতে, জয়পুর ফকিরদাস হাইস্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রগণ মিলিত হইয়া যশোদাবাবুর স্মৃতিসভায় তাঁর স্বদেশানুরাগাদি বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেন।

গত ১১ই এপ্রিল, শ্রীযুক্ত কুমুদবিহারী সেনের পুত্রের ও ১৮ই এপ্রিল তাঁহার কন্যার স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে কলুটোলায় ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

গত ৩০শে চৈত্র, প্রাতে, ৭নং ময়ূরভঞ্জ রোড, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র-মোহন বীরের গৃহে, স্বর্গীয় বিনয়মোহন সেহানবিশের সাম্বৎসরিকে এবং সন্ধ্যায় ১৭নং পটারিরোডে, কুচবিহারের দেওয়ান স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ সেনের সাম্বৎসরিকে ডাঃ সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন। শ্রীমতী সুমতি সেহানবিশ স্বামীর সাম্বৎসরিকে প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

আলিপুরে, ২৮নং নিউরোডে, ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেনের গৃহে, ১০ই এপ্রিল, তাঁহাদের জননী স্বর্গীয়া মঙ্গলা দেবীর ও ১২ই এপ্রিল, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের সাম্বৎসরিকে অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ সেন উপাসনা করেন। ১২ই এপ্রিল, ইউনিভার্সিটি-ইনষ্টিটিউট হলে স্মৃতিসভাও হইয়াছিল। উক্ত দুই দিবস রাঁচিতে শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদারের গৃহেও উপাসনা হয়।

বিগত ৬ই বৈশাখ, প্রাতে ও রাত্রিতে, ডাঃ অনুকূলচন্দ্র মিত্রের বাসভবনে, তাঁর শ্বশ্রূমাতার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ভাই অখিলচন্দ্র রায় করেন। অনুকূলবাবু প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priya-nath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

স্থবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৮ ভাগ। ৯ম সংখ্যা। ১লা জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ১৩৪০ সাল, ১৮৫৫ শক, ১০৪ ব্রাহ্মাব্দ। 15th May, 1933. অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে ধর্ম্মের পরম প্রস্রবণ! তুমি স্বয়ং ধর্ম্মরাজ, তুমি স্বয়ং ধর্ম্ম এবং তুমিই ধর্ম্মের পরম আবহ। স্থান ও কালের প্রয়োজন বুঝিয়া, তুমি জগতে বিশেষ বিশেষ সময়ে, বিশেষ বিশেষ স্থানে, তোমার মনোনীত সাধু পুত্র যোগে ধর্ম্মের বিশেষ বিশেষ দিক প্রকাশিত কর। তুমি যখন যে ধর্ম্মবিধি প্রকাশিত করিয়াছ, প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ, তাহাতেই জগতের কল্যাণ হইয়াছে। তুমি যে বিধি কর বিধি, সেই হয় মঙ্গল বিধি। অতীতে ও বর্ত্তমানে তোমা হইতে যত বিধি সমাগত হইয়াছে, তোমার মঙ্গল হস্তের দান বলিয়া, তাহা পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ নববিধানে আমাদের কাজ। আমরা কিছু দিন পূর্ব্বে তোমার প্রেরিত ভক্তাবতার শ্রীচৈতন্যকে গ্রহণ করিতে যাইয়া, তোমার প্রেরিত ভক্তির বিধান যথাসম্ভব আলোচনা ও গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। তৎপর তোমার প্রেরিত সুপুত্র শ্রীঈশার জীবনও আলোচনা ও গ্রহণ করিতে যাইয়া, খ্রীষ্ট বিধান বা পুত্রত্বের বিধান গ্রহণ করিতে আমরা চেষ্টা করিয়াছি। বৈশাখের পূর্ণিমায় তুমি আমাদের নিকট তোমার প্রেরিত জীবন্ত বৈরাগ্যের অবতার, নির্ব্বাণশান্তির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীবুদ্ধকে লইয়া উপস্থিত হইয়াছ। আমরা তাঁহাকে তোমারই মনোনীত প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়া এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-বিধানকেও তোমার অভিপ্রেত ধর্ম্মবিধান বলিয়া গ্রহণ করি। তোমার প্রেরিত অন্যান্য মহাজনগণ তোমাকে বিশেষ বিশেষ নামে, বিশেষ বিশেষ স্বরূপে ব্যক্ত করিলেন; তোমার প্রেরিত শ্রীবুদ্ধ তোমাকে কোন্ নামে, কোন্ ভাবে ব্যক্ত করিলেন? পৃথিবী বলে, তিনি তোমার নাম পর্য্যন্ত করেন নাই; তাই অনেকে তাঁহাকে নাস্তিক বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। পৃথিবী বলে, তিনি তো কোন ভাবে তোমার পূজা প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান নাই। হে শ্রীবুদ্ধের পরম প্রেরয়িতা! তুমি শ্রীবুদ্ধের জীবনের সত্যধর্ম্মকে আমাদের নিকট ব্যক্ত কর। অন্যের নিকট কোন ধর্ম্মের ব্যাখ্যা শুনিয়া পূর্ণ তৃপ্তি লাভ হয় না। তোমার বাণীতে যখন মহাপুরুষদিগের জীবন ও তাঁহাদের জীবনের ধর্ম্ম বর্ণিত হয়, ব্যাখ্যাত হয়, তখনই সে ধর্ম্ম আমরা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারি, গ্রহণ করিতে পারি। শ্রীবুদ্ধ তোমাকে বিশেষ কোন নামে ব্যক্ত করেন নাই সত্য; কিন্তু তিনি কি তোমাকে ধর্ম্ম নাম প্রদান করেন নাই? মুসলমান ধর্ম্মে আল্লাকে স্মরণ ও গ্রহণ, প্রেরিত পুরুষ মহম্মদকে স্মরণ ও গ্রহণ এবং ধর্ম্মশাস্ত্র কোরাণকে স্মরণ ও গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। আর বৌদ্ধ ধর্ম্মের

ত্রিমন্ত্র শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং
এমিস্থ সমাধিমণ্ডপে ওয়া, আর অনাম
পুনরুত্থানের দিন ; এ
র্ম্মাদহ তো ণ লওয়া কি
সুনীতি দেবীর পুনরুত্থা
ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সম্মিলভুবনকে বা ককে ধারণ
কমি, এম, সেন গুপ্ত মহাশভুবনের ড় প্রত্যেকে
তোম প্রিয়নাথ প্রার্থনা ও অ তুমিই ধর্ম্ম,
মা কার্য্য আরম্ভ করেন। কি অন্য
বিষয়ে, মিঃ পল খ্রীষ্টধর্ম্ম রে ? তোমার
শ্রী সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় সম্বন্ধে মহাপ্রভাবশালী ধর্ম্ম
খুব সুন্দর করেন
জীবনে ? তিনি বাহিরে তোমার পূজার কোন আয়োজন প্রবর্ত্তনা করিলেন না, কোন পূজা বাহ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত করিলেন না ; কিন্তু তিনি মহাত্যাগের মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে, মহাতপস্যার উত্তাপে উত্তপ্ত হইতে হইতে, ধ্যানের পর ধ্যান ধারণায় তোমাকে ধারণা করিতে করিতে, তোমার অন্তর্ম্মুখীন মহাপূজা, সত্য পূজা কি প্রতিষ্ঠিত করিলেন না ? বাহ্যপূজার বিকৃতিতে বুঝি পৃথিবী ভারাক্রান্ত ও বিকল হইয়া পড়িয়াছিল, তাই বুঝি শ্রেষ্ঠত্যাগের ভিতর দিয়া বুদ্ধজীবনে তোমার অন্তর্ম্মুখীন গূঢ় সত্য পূজা প্রতিষ্ঠিত হইল। আমরা কি জানি, কি বুঝি। তুমি নিজ কৃপাগুণে শ্রীবুদ্ধের জীবনের ধর্ম্ম আমাদিগকে বুঝাইয়া এবং গ্রহণ করিতে দিয়া ধন্য কর, তব চরণে এই বিনীত প্রার্থনা।

শান্তিঃ ! শান্তিঃ ! শান্তিঃ !

সত্য সূর্য্যের আকর্ষণ।

প্রায় ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে, কপিলাবস্তু নগরে, শ্রীবুদ্ধ রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শুদ্ধদন রাজার একমাত্র পুত্র। কত সুখৈশ্বর্য্যের মধ্যে তিনি বাল্যে ও যৌবনে প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। বাহিরে তিনি যথেষ্ট আমোদ প্রমোদ, সুখ ঐশ্বর্য্য, ভোগ বিলাসিতার মধ্যে প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াও, কৈশোর ও যৌবনের আরম্ভে, সাধারণ লোকের জীবন যেমন বহিস্মুখীন হয়, মনের গতি প্রবৃত্তি যেমন বাহিরের আহার পরিচ্ছদ, আমোদ আহ্লাদ ও ভোগ বিলাসিতার বিবিধ সামগ্রীর প্রতি উন্মুখীন ও আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, তাহা না হইয়া শ্রীবুদ্ধের জীবন অন্তর্ম্মুখীন হইয়া পড়িল। বাহিরে এত আকর্ষণ, সে দিকে তাঁহার মন আকৃষ্ট হয় না ; কিন্তু অন্তরে কি যেন নিগূঢ় আকর্ষণ, কি যেন টান, সেই দিকে তাঁহার মনের গতি, সেই দিকে তাঁহার চিন্তা, সেই দিকে তাঁহার ধ্যান, ধারণা। তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা, ধ্যান চিন্তনে কাটাইয়া দিতে লাগিলেন।

এই অন্তর্ম্মুখীন আকর্ষণ কি ? সত্যের আকর্ষণ। যাহা কিছু ক্ষণিক, যাহা কিছু অসার, যাহা কিছু অনিত্য ও অনাত্ম, তাহাতে বিমুখতা, তাহার প্রতি উদাসীনতা ; যাহা কিছু নিত্য, সত্য ও অধ্যাত্ম, তাহার প্রতি টান, তাহার প্রতি গূঢ় আকর্ষণ। ভিতরে এক অজানিত দুর্দ্দমনীয় শক্তি তাঁহার চিত্তকে এমন করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল যে, তাঁহার চিত্তকে ধন ঐশ্বর্য্য ও ভোগবিলাসিতার দিকে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার পিতামাতার শত চেষ্টা, বিবিধ বিপুল আয়োজন ব্যর্থ হইয়া গেল। অবশেষে তিনি রাজ্য, সংসার, ধন, ঐশ্বর্য্য প্রিয়তম এক মাত্র শিশু পুত্র, প্রিয়তমা পতিপ্রাণা পত্নীর আকর্ষণও ছিন্ন করিয়া, অন্তরের সেই অজানিত, অব্যক্ত গূঢ় শক্তির আকর্ষণে, রাজপুরী হইতে বহির্গত হইতে বাধ্য হইলেন। তিনি দীর্ঘ ছয়টী বৎসর বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট অনুসন্ধান করিলেন, যাহা শিখিবার শিক্ষা করিলেন, পাঠ প্রসঙ্গ যাহা করিবার করিলেন, যাহা কিছু জানিবার জানিলেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রাণের তৃপ্তি হইল না। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার প্রাণ যে গূঢ় সত্যের টানে আকৃষ্ট হইয়া সেই সত্যের পূর্ণ আলোক লাভের জন্য বাহির হইয়াছে, পুরাতন কোন বিধি ব্যবস্থার ভিতরে, পুরাতন কোন শিক্ষার ভিতরে, মানুষ গুরুর কোন পরিচালনার ভিতরে সে পূর্ণালোক প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। সে যে নূতন পথ, সে যে এক নূতন পথে নূতন সিদ্ধি, শাশ্বত শান্তির নূতন সুসমাচারলাভ; পুরাতন পথে, পুরাতন শিক্ষায় তাহা মিলিবে কেন ? তিনি নূতন পথে নূতন আলোক লাভ করিবার জন্য বিধাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত। তাঁহার জীবনের মর্ম্মস্থানে সে পথের সকল আয়োজন নিগূঢ় ভাবে বর্ত্তমান, যথাবিধি প্রচেষ্টায় যথাসময়ে কেবল তাহার পরিস্ফুরণ প্রয়োজন। তাই তিনি অবশেষে আপনার প্রকৃতির প্রেরণায়, বাহিরের কোন মানুষ গুরুর শিক্ষা সহায়তা ও প্রাচীন কোন ধর্ম্মগ্রন্থানুমোদিত ব্যবস্থাদির অনুসরণ না করিয়া, আপনার ভাবে সাধনপথে অগ্রসর হইলেন। ভিতরে কি এক অপ্রতিহত সত্যের দুর্জ্জয় আকর্ষণ। যে অজানিত অব্যক্ত সত্যের

দুর্জ্জয় আকর্ষণে রাজ্য, ধন, স্ত্রী পুত্র পরিবার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, সেই সত্যের গূঢ় আকর্ষণে বাহিরের কোন মানুষ গুরুর শিক্ষা দীক্ষা ও প্রাচীন বিধি ব্যবস্থার সকল প্রকার আকর্ষণকেও অতিক্রম করিয়া, মুক্ত ভাবে মুক্ত পথে শাশ্বত শান্তির মুক্তালোক লাভের জন্য অগ্রসর হইলেন। অন্তরের চিদাকাশে পূর্ণ জ্ঞানচন্দ্রের পূর্ণালোক-লাভের সহায় কেবল বাহিরের মুক্তাকাশ ও মুক্তাকাশের পূর্ণচন্দ্রের মুক্তালোক রহিল। তিনি সিদ্ধিলাভের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আসন পরিগ্রহণ করিলেন, সিদ্ধিলাভের জন্য একনিষ্ঠ হইয়া সকল প্রকার স্থূল আহার পরিত্যাগ করিলেন, সামান্য তিল ও জল সম্বল রহিল। এরূপ কৃচ্ছ্র সাধনে শরীর কঙ্কালসার হইল, শারীরিক বল শক্তি একেবারে হারাইলেন। তাঁহার শরীর ও মনোরাজ্যে এক অস্বাভাবিকতা উপস্থিত হইল। এ অবস্থায় তাঁহার অন্তরস্থ প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইঙ্গিত করিলেন, সিদ্ধি স্বাভাবিক পথে, অতি আহারেও নয়, নিতান্ত অনাহারেও নয়, মধ্য পথ অবলম্বন কর। তিনি অবশেষে অন্তরের প্রেরণায় স্নান আহার অবলম্বন করিলেন, ক্রমে শরীর মন প্রকৃতিস্থ হইল। সেই শরীর মন লইয়া যখন একাগ্রভাবে সিদ্ধিলাভের পথে আসন গ্রহণ করিলেন, তখন শরীর মনের স্বাভাবিকতার মধ্যে তাঁহার আত্মিক প্রকৃতি স্বাভাবিকভাবে উচ্চ হইতে উচ্চতর বল লাভ করিল। একদিকে আত্মিক প্রকৃতির উচ্চ হইতে উচ্চতর, উচ্চতম স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে, অপর দিকে বাহ্যাকাশে শুক্লপক্ষের পূর্ণচন্দ্রের পূর্ণালোকের সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহার চিদাকাশ অনন্ত সত্য সূর্য্যের সুধাময়, শান্তিময়, আনন্দময় দিব্য কিরণের দিব্যচ্ছটায় পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি অভূতপূর্ব্ব বিমলানন্দে নিমগ্ন হইয়া আত্মহারা হইয়া গেলেন। কথিত আছে, সাতদিন সাতরাত্রি তিনি এক অখণ্ড অচ্ছেদ্য আনন্দ-স্রোতে ভাসমান রহিলেন। এ আনন্দ বাহিরের স্বাভাবিক ত্যাগে, সর্ব্ববিধ কামনার বিনাশে, জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার পূর্ণযোগের শ্রেষ্ঠফল ভিন্ন কিছুই নহে। জীবাত্মারূপী খণ্ড চৈতন্যের সঙ্গে পরমাত্মারূপী পূর্ণ চৈতন্যের উচ্চ মিলনে যে আনন্দ, এ সেই আনন্দ, সেই শান্তি। জীবাত্মারূপী জ্ঞানখণ্ডের মধ্যে পরমাত্মারূপী অনন্ত জ্ঞানের পূর্ণ প্রকাশ এখানে বিশিষ্ট ব্যাপার। শ্রীবুদ্ধ এই অনন্ত জ্ঞানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, বোধিসত্ব বা শ্রীবুদ্ধ নাম প্রাপ্ত হইলেন। নবদ্বীপের নিমাই পণ্ডিতও পরমাত্মারূপী শ্রীকৃষ্ণের মুক্ত চেতনা লাভ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীবুদ্ধের নামবিহীন ঈশ্বরের সাধনা চর্চ্চা করিয়া কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন, শ্রীবুদ্ধ নাস্তিক ছিলেন; কেহ কেহ বলেন, ঈশ্বরালোকের পথে নহে, কিন্তু সম্পূর্ণ বুদ্ধির পথে চলিয়া মানবজীবনের একটা শান্তির পথ তিনি আবিষ্কার করিলেন, তাই তিনি শ্রীবুদ্ধ নাম গ্রহণ করিলেন। সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুমোদিত, স্বদেশের বিদেশের সকল মহাপুরুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনার সত্য সংবাদ—সেই এক অনন্ত ভূমা সত্যস্বরূপ পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মধুময় অমৃতময় অচ্ছেদ্য মিলন এবং সেই অনন্ত পরমাত্মাতে ক্রমাগত উর্দ্ধগতিলাভ। ইহাতেই শাশ্বত শান্তি ও শাশ্বত আনন্দ। শ্রীবুদ্ধের জীবনেও তাহাই। বিশিষ্টতায় যেমন প্রত্যেক মহাপুরুষই বিশেষ এবং এক অন্য হইতে ভিন্ন, তেমনই জীবনের বিশিষ্টতায়, স্বর্গের নিয়োগের বিশিষ্টতায় শ্রীবুদ্ধ মহাপুরুষদিগের মধ্যে বিশেষ ব্যক্তি এবং অন্যান্য মহাপুরুষ হইতে স্বতন্ত্র। অন্যান্য সাধু ভক্ত মহাজনগণ তাঁহাদের জীবনে প্রকাশিত পরম দেবতার বিশিষ্ট প্রকাশকে বিশেষ বিশেষ নামে অভিহিত করিলেন; শ্রীবুদ্ধও আপনার জীবনে স্বর্গের নিয়োগপত্রানুসারে এবং সেই সময়ে জগতের প্রয়োজনানুসারে, আপনার জীবনে প্রকাশিত অনন্ত চৈতন্য, অনন্ত জ্ঞানরূপী পরমাত্মাকে অনাম অধামরূপেই উপলব্ধি করিয়া, অনাম অধামরূপেই তাঁহাকে রাখিয়াছিলেন। অনন্তস্বরূপের অনন্ত ঐশ্বর্য্যময় প্রকাশে আকৃষ্ট হইয়া, অভিভূত হইয়া, ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর "আস্ফানক" নামক ধ্যানে তিনি নিমগ্ন হইলেন। এ প্রকাশকে কোন নামে অভিহিত করিবার তাঁহার অবসর ও অধিকার কোথায়? ইহাই তাঁহার জীবনে অনন্তের বিশিষ্ট লীলা। শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনে লীলাময় ঈশ্বর কত বিচিত্ররূপেই প্রকাশিত হইয়াছেন। তিনি কি তাঁহার জীবনে ঈশ্বরের সকল প্রকাশের স্বরূপাত্মক নাম দিতে পারিয়াছেন? তিনি তো বলিলেন, আমার জীবনের প্রকাশিত ঈশ্বরকে পিতা বলিলাম, মাতা বলিলাম, শ্রীহরি বলিলাম, তাহাতেও সব বলা হইল না, তিনি একটা অবস্থা ইত্যাদি। শ্রীবুদ্ধ তাঁহার অন্তরের প্রকাশিত দেবতাকে অন্য কোন স্বরূপাত্মক নাম দিলেন না, নাম দিলেন ধর্ম্ম।

যাঁহা দ্বারা ত্রিলোকের সকল ধৃত হইয়া আছে, এবং যাঁহাকে ধারণ করিয়া জীব পরম গতি, পরম শান্তি প্রাপ্ত হয় তাঁহারই নাম ধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, "এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ",—ধর্ম্মই একমাত্র সুহৃদ, যিনি মৃত্যুর পরও জীবের অনুগমন করেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে ঈশ্বরের স্থানে ধর্ম্ম নাম প্রদত্ত হইয়াছে। তাই বৌদ্ধ ধর্ম্মে অবলম্বিত মূল ত্রিমন্ত্র—"ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি"।

ধর্ম্মজগতে একই সত্য সূর্য্যের বিচিত্র প্রকাশ এবং একই সত্য সূর্য্যের বিচিত্র আকর্ষণে মহাজন, ক্ষুদ্রজন সকলেরই ঊর্দ্ধগতি-লাভ।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

প্রার্থনা।

"প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর। প্রার্থনা কর, যাহা কিছু পাইবার সকলই পাইবে।" বর্ত্তমান নবযুগধর্ম্মবিধান নববিধানে ইহাই প্রথম ব্রহ্মবাণী, এই বাণীর অনুসরণেই নববিধানের মূর্ত্তিমান জীবন গঠিত। সুতরাং নববিধানের নবজীবন লাভ করিতে হইলে, নববিধানপ্রবর্ত্তকের অনুগমনে এই বাণীর অনুসরণ করিতে হইবে। বাস্তবিক প্রার্থনা নববিধানের প্রধান এবং সর্ব্বোচ্চ সাধন। তাই প্রার্থনা করার দায়িত্ব অতি গুরুতর। মুখের কথা, ভাব-ভক্তিবিহীন যাহা তাহা বলা, বা ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া বক্তৃতা করা প্রার্থনা নয়। ক্ষুধিত শিশুর ক্রন্দন যেমন, ক্ষুধিত তৃষিত আত্মার প্রাণের উচ্ছ্বাসপূর্ণ উক্তিই তেমনি প্রার্থনা। যথার্থ ক্ষুধা অনুভব করিয়া, শিশু যখনই ক্রন্দন করে, মা তখনই তাহাকে স্তন্য দান করিয়া তৃপ্ত করেন; ঠিক সেই ভাবে যথার্থ আত্মার অভাব অনুভব করিয়া, প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম মার কাছে আত্মনিবেদন করাই প্রার্থনা। সেই ভাবে প্রার্থনা করিলেই হাতে হাতে তাহার ফল লাভ হয়। ভাবের স্রোতে বা ভাষার স্রোতে ভাসিয়া গেলে প্রার্থনা করা হয় না। প্রার্থনা সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। তাই আচার্য্য বলিলেন, "বিমল রাখিবে প্রার্থনা।"

তৃণের শোভা।

উর্ব্বর ভূমিতে যে তৃণ অবাধে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে, অনুর্ব্বর বালুকাময় ক্ষেত্রে সে তৃণকেও অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া, অনেক জল সিঞ্চন করিয়া রোপণ করিতে হয়। কিন্তু যখন রোপিত হয়, পুষ্পতরুর ন্যায় কতই তাহার শোভা। ভক্তজীবনের উর্ব্বর ভূমি যেমন বহু সদ্‌গুণে পূর্ণ, তেমনি তৃণসমান দীনতাও তাহাতে পরিপূর্ণ; কিন্তু জ্ঞানাভিমান ও অহংভাবাপন্ন শুষ্ক বালুকাময় জীবনে অনেক সাধ্য সাধনা না করিলে, ভগবানের কৃপাবারিসিঞ্চন বা ক্রন্দনের অশ্রুবর্ষণ না হইলে, সে দীনতা অর্জ্জন বা রোপণ করা যায় না। রোপিত হইলে সে দীনতাতেই জীবনের উদ্যান অধিকতর শোভাসমন্বিত হয়। তৃণের ন্যায় দীনতা-সাধনই তাই আমাদের জীবন-উদ্যান-রচনার প্রধান উপাদান।

নিজ বাসভূমে প্রবাসীর মত।

আমার বাড়ীর চাবিটী অন্যকে দিয়াছিলাম। নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া, শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, দ্বার রুদ্ধ। নিজের ঘরে নিজেই প্রবেশ করিতে পাইলাম না, পরের মত বাহিরে বসিয়া রহিলাম। দুর্ব্বিপাকবশতঃ দ্বারদেশে বসিয়াই বৃষ্টি ও ঝঞ্ঝাবাতে কষ্ট পাইতে হইল। গুরুবাদী বা মধ্যবর্ত্তিতাবাদী—পরের হাতে ধর্ম্ম যার—তাহারও অবস্থা এইরূপ। আমার মার ঘরে প্রবেশের চাবি আমার নিজ হস্তে রাখিলে, আর আমাকে কখনই এ কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। দ্বারে আঘাত করিলেই বা চাবি খুলিলেই ঘরে প্রবেশ করিতে পারি ও বাহিরের সকল ঝঞ্ঝাবাত হইতে রক্ষা পাইতে পারি।

প্রেম ও শাসন।

উদ্যানে কতকগুলি গাছ আছে, তাহাতে জল সিঞ্চন করিতে হয়। আবার কতকগুলি গাছ আছে, তাহাতে জলসিঞ্চন করিলে পচিয়া মরিয়া যায়; তাহার তলায় জল না দিয়া ছাই দিতে হয়, তাহাতেই তাহার পুষ্টি হয়, বৃদ্ধি হয়। বিধাতার বিধানে ইহা কি সুন্দর শিক্ষাপ্রদ। এইরূপে প্রেম ও শাসন দ্বারাই তিনি, যাহার যেমন প্রয়োজন, তাহাই বিধান করিয়া মানবজীবনকে পুষ্টি দান করিয়া থাকেন। যাহার শাসন প্রয়োজন, তাহাকে কেবল প্রেমদান করিলে তাহাতে তাহার অনিষ্ট হইয়া থাকে।

রামপ্রসাদী।

মা হ'য়েই পড়েছিস্ ধরা। (ও মা)
(তুই) আপন প্রেমে আপনি পাগল,
(ঐ) প্রেম তোর করেছে সারা।
ছিলি যখন বেদের ব্রহ্ম, অগম্য তুই পরাৎপরা,
(ঐ) ছুর্জ্জের অজ্ঞের বলে জানুতো তোরে সারাধরা।
পুরাণে লীলাময় হরি, হলি যখন সারাৎসারা,
(ঐ) পুরুষকার তপে জপে কে ক'জন পেলে তোর ধরা।

নববিধানেতে তুই মা, হ'লেও সেই নিরাকারা,
(স্নেহে) অন্তঃপুরের বের হয়ে মা, হয়েছিস্ যে ছেলে ধরা।
(পাপ) রোগের খালে থাক্‌লে ছেলে, দূরে দূরে যায় ছাড়া,
(ও রে) মার প্রাণ ত থাক্‌তে নারে, পলেক কোলের
ছেলে ছাড়া।

ধরবি যখন ধর মা তখন, দিলাম চিরতরে ধরা,
নবশিশু সঙ্গে রাখিস্ অঙ্কে, করিস্‌নে মা কোলছাড়া।

—দীন সেবক

"ধর্ম্ম-সাধন"।

(আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের সঙ্গতের আলোচনা)

৪৯ সংখ্যা—৬ই শ্রাবণ, রবিবার, ১৭৯৫।

(গিরিধির ডাঃ জি, রায় হইতে প্রাপ্ত)

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রশ্ন—সকল ধর্ম্মসাধনের মূল কথা কি?

উত্তর—সরল ভাবে প্রতিজ্ঞা করা, আমি চেষ্টা করিব।

প্র—চেষ্টা করিব, কে বলিতে পারে?

উ—যে ইচ্ছা করে, সেই পারে। কিন্তু যথার্থ প্রাণগত সরল ইচ্ছা না হইলে, 'চেষ্টা করিব' বলিয়া প্রতিজ্ঞা আসিতে পারে না। আমরা অনেক সময় যাহা ইচ্ছা করি মনে করি, বাস্তবিক তাহা ইচ্ছা করি না, আমাদের হৃদয়ের গূঢ় প্রার্থনা অন্যদিকে ধাবমান হয়; সুতরাং ইচ্ছা ও চেষ্টা সেই দিকেই ধাবিত হইয়া থাকে। আমি ভাল হইব, যথার্থ এই ইচ্ছা হইলেই ভাল হওয়া যায়।

প্র—আমি চেষ্টা করিব, কিন্তু তাহা সাধ্যানুসারে করিব, বলা যায় কি না?

উ—আমাদিগের যাহা সাধ্য, তাহা করিলেই যথেষ্ট; তাহার অতিরিক্ত আর কিছু করিতে আমরা দায়ী নহি, ঈশ্বরও তাহা আমাদিগের নিকট চাহেন না। কিন্তু কতদূর আমাদিগের সাধ্য, আমরা পূর্ব্ব হইতে তাহার সিদ্ধান্ত করিতে পারি না। যাহা কর্ত্তব্য বুঝিব, সরল ভাবে তাহার অনুসরণ করিয়া যতদূর যাইতে পারি, ততদূর আমাদিগের সাধ্য। সাধন না করিলে কতদূর আমাদিগের সাধ্য বা অসাধ্য, বুঝিতে পারা যায় না।

প্র—কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিলে চরিত্রগত দোষ সংশোধন হইতে পারে?

উ—আমাদিগের চরিত্রগত দোষ সকল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, (১) জঘন্য, (২) সামান্য। সাধনের সুবিধার জন্য এই দুই শ্রেণীর প্রধান পাপগুলি প্রথমে গ্রহণ করা যাইতেছে।

(১) জঘন্য পাপ ৫টী—কাম, ক্রোধ, মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা, নিষ্ঠুরতা এবং উপাসনাহীনতা।

(২) সামান্য পাপ ৫টী—অহঙ্কার, স্বার্থপরতা, পরনিন্দা, আলস্য ও অকৃতজ্ঞতা।

আমরা প্রতিদিন এই সকল দোষে কতবার দোষী হই, তাহা জানিবার জন্য প্রত্যেকের নিকট এক একখানি ক্ষুদ্র স্মরণ-পুস্তক রাখা আবশ্যক। ঐ পুস্তকে প্রত্যেক দোষের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চিহ্ন ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং প্রতিদিন যে দোষে যতবার দোষী হওয়া যায়, তাহা চিহ্ন করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। ইহা অন্যকে দেখাইবার প্রয়োজন নাই, প্রত্যেকে আত্মপরীক্ষার জন্য আপনার নিকটেই রাখিবেন এবং দিন দিন কোন পাপ কত হইতেছে, ইহার দ্বারা নিরূপণ করিবেন। প্রথমতঃ দৈনিক স্মরণ-পুস্তকে প্রথম শ্রেণীর পাপের দাগ দিয়া কিছু দিন সাধন করা ভাল। তাহাতে জঘন্য পাপ কত কম হয়, বুঝা যাইবে।

প্র—কোন দোষ কার্য্যে অনুষ্ঠিত না হইলেও কি পাপের মধ্যে গণ্য হইবে?

উ—দোষের কার্য্য হইলে তো পাপ বলিয়া গণ্য করিতে হইবেই; কিন্তু যেখানে কার্য্যের সুবিধা হয় নাই, কিন্তু মনে মনে তজ্জন্য সম্পূর্ণ ইচ্ছা জন্মিয়াছে, সেখানে তাহাকেও পাপ বলিয়া ধরিতে হইবে। মনেতেই পাপ। দশদিন বনে বসিয়া চিন্তা করিয়া এত পাপ করা যায় যে, দশ বৎসর সহরে থাকিয়াও তত হয় না।

প্র—মনেতে পাপের যে কোন প্রকার চিন্তা আসুক, তাহাকেই কি পাপ বলিয়া ধরিতে হইবে?

উ—অনেকে এই কথা লইয়া বড় গোল করেন; কিন্তু দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা সহজে মীমাংসা করা যাইতে পারে। (১) একটা পাখী ঘরের এক জানালা দিয়া আসিয়া আর এক জানালা দিয়া উড়িয়া গেল। (২) ঘরের মেজের উপর দিয়া একটা ছুঁচা চলিয়া গেল। প্রথমটী এলো গেলো, কিছুমাত্র তাহার চিহ্ন রহিল না। দ্বিতীয়টী ময়লাপূর্ণ নর্দ্দমা হইতে আসিয়া চলিয়া গেল বটে, কিন্তু একটা কাল দাগ রাখিয়া গেল, আধঘণ্টা দুর্গন্ধ রহিল। পাপচিন্তাও এইরূপ দুই প্রকারে হইয়া থাকে।

প্রথমটী স্মরণমাত্র, তাহাতে পাপ নাই। পূর্ব্বে মদ খাইতাম, এখন ছাড়িয়াছি; কিন্তু পাঁচজনকে মদ খাইতে দেখিয়া আপনার পূর্ব্ব অভ্যাস স্মরণ হইল, তাহাতে পাপ হইল না। সেই পাপের প্রতি বরং যত আন্তরিক ভয় ও ঘৃণার উদয় হয়, ততই আপনার চরিত্রের সাধুতা প্রতিপন্ন হয়।

দ্বিতীয়টী বাসনাভূমি। পাপ চিন্তা মনে আসিবামাত্র ইচ্ছা হয়, আর একটু থাক। অনেকে মদ খাইতেছে দেখিলাম, আর একটু দেখি, ক্রমে ইচ্ছা হইবে একটু খাই, পরে মাতালের ন্যায় অচেতন হইয়া পড়ি। পাপ আসিবামাত্র অমনি অমনি চলিয়া যাওয়া কম লোকের ঘটে। অধিকাংশ স্থলে ইচ্ছা হয়,

প্রিয় পাপকে আসন পাতিয়া বসাই, তাকে শীঘ্র বিদায় হইতে না দি। যে ব্যক্তি আধ মিনিট বা ৫ সেকেণ্ড মন্দ ইচ্ছাকে মনে থাকিতে দেয়, তাহাকে চিরজীবন তাহার কুফল ভোগ করিতে হয়।

প্র—যদি স্বপ্নে কোন পাপ করা যায়, তাহাও ধর্ত্তব্য কি না?

উ—স্বপ্ন জাগ্রৎ অবস্থার বাঞ্জক। স্বপ্নেতে এমত কিছু হয় না, যা জাগ্রৎ অবস্থায় না হয়। স্বপ্নের কার্য্যটী পাপ নয় বটে, তাহা মিথ্যা; কিন্তু তাহা পাঠ ও আলোচনা করিয়া অনেক শিক্ষা করা যায়। স্বপ্নে যদি কোন পাপ কার্য্য করি, জাগ্রৎ অবস্থায় যে সে পাপ করিতে পারি, তাহা অসম্ভব বোধ হয় না। অতএব স্বপ্ন দ্বারাও আপনার অবস্থা বুঝিয়া সাবধান হওয়া যায়।

প্র—পাপ সকলের পরস্পরের সঙ্গে কিরূপ সম্বন্ধ?

উ—পাপ সকল পরস্পর পরস্পরের সহায়তা করিয়া থাকে এবং পাপের পরিবার যাহাতে বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়া থাকে। কাহারো একটী নবকুমার হইলে চারিদিক হইতে ঢাকী, ঢুলী আসিয়া নাচ বাদ্য করিতে থাকে; একটী নূতন পাপ জন্মিলে তেমনি সকল পাপ ঢাক ঢোল লইয়া আনন্দোৎসব করিতে থাকে।

প্র—চরিত্র-সংশোধন ও উপাসনা এ দুয়ের মধ্যে কঠিন কোন্‌টী?

উ—সাধারণতঃ ধরিলে উপাসনা করা সহজ, কেননা তাহাতে আপনার নিকট আপনি দায়ী, অন্যের সঙ্গে গোল বাধে না। তাহাতে কোন ক্রটি হইলে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা নাই। চরিত্র-সম্বন্ধে অন্যের সহিত সম্বন্ধ, তাহাতে ক্রটি হইলে ধরা পড়িতে হয় এবং নিজের চরিত্রের দোষে সহস্র লোকের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। ব্রাহ্মের চরিত্র-সংশোধন না হইলে ধর্ম্ম মিথ্যা, সমাজ মিথ্যা, সব মিথ্যা।

প্র—ষড়রিপুর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান কোন্‌টী?

উ—কাম ও ক্রোধ এই রিপু দুইটী সর্ব্বাপেক্ষা জঘন্য। ইহাদের সহিত শরীরের অতি গূঢ় সম্বন্ধ আছে। এইজন্য বাহিরের কার্য্যে ইহারা প্রকাশিত হয় এবং যাহার শরীরে ইহারা বাস করে, প্রায় শরীরের পতন না হইলে তাহাকে ত্যাগ করে না; এইজন্য এই দুইটীর প্রতি দৃষ্টি থাকা আবশ্যক এবং যাহাতে ইহারা দমন থাকে, সর্ব্বতোভাবে তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

প্র—ইন্দ্রিয় সকল যৌবনে প্রবল হয়, বয়োবৃদ্ধি হইলে কি নিস্তেজ হয় না?

উ—ইন্দ্রিয়-প্রাবল্য প্রথম যৌবনেই থাকে, পূর্ব্বে অনেকের ধারণা ছিল; কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে, যৌবনকালের ফল বহু বৎসর বয়সেও ভোগ করিতে হয়। যৌবনে ইন্দ্রিয় দমন না করিলে, বৃদ্ধকালেও তাহার দাসত্ব করিতে হইবে। রিপুদিগকে রাখিয়া দিলে চিরকাল (তাহার ফলভোগ করিতে হয়)। আমরা দেখিতেছি, এ সম্বন্ধে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অবিশ্বাসও আছে। যতদিন এইরূপ অবিশ্বাস থাকিবে, ততদিন পরস্পরেরই অপকার। আমাদিগের মধ্যে ৫০টী মানুষ কেহই খুন করিতে পারে না, ইহা যেমন সাহস করিয়া বলা যায়, কেউ রিপুসেবা করিতে পারে না, একথা ত তেমন বলা যায় না। আমরা পরস্পরের হাতে টাকা কড়ি গচ্ছিত রাখিতে যেমন পারি, কাহারো নিকট আপনার ভগিনী ভার্য্যাকে সেইরূপ গচ্ছিত রাখিয়া যথা ইচ্ছা নিশ্চিন্তভাবে কি যাইতে পারি? যে দিন এরূপ হইবে, সে দিন পৃথিবী স্বর্গ হইবে।

প্র—আমরা আত্মশাসনের জন্য কি উপায় অবলম্বন করিতে পারি?

উ—আত্মশাসনের জন্য উপায়:—সাধুসঙ্গ প্রভৃতি যে সকল উপায় আছে, তাহাতো ধরিতে হইবে। পূর্ব্বে আত্ম-পরীক্ষার জন্য স্মরণপুস্তক ও পাপ চিহ্ন করিবার যে কথা হইয়াছে, তাহাই এখনকার বিশেষ কথা। যে পাপ প্রবৃত্তি অধিক প্রবল হইবে, তৎশাসনের জন্য একটা কোন প্রকার দণ্ড স্বীকার করিলে অনেক উপকার হয়। যেমন একটা ক্রোধের কার্য্য করিয়া তৎপরে ঠিক আহারের সময়ে আহার না করা অথবা কোনরূপ সুবিধা পরিত্যাগ করা। এ সকল এইরূপ বাহ্যিক প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু যিনি আপনার প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি বুঝিয়া এই প্রকার উপায় গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহার বিস্তর উপকার হইতে পারে।

প্র—স্মরণপুস্তকে পাপের দাগ দিলেই কি উপকার হইবে? মনে রাখিলেই তো হয়?

উ—প্রত্যেকের ২।১টা পাপ খুব প্রবল, তাহারই প্রতি তার দৃষ্টি থাকে, অন্য পাপ সামান্য জ্ঞানে অগ্রাহ্য করা হয়। যার কাম, ক্রোধ বেশী, মিথ্যা কথাকে দোষ বলিয়া তত দেখে না। কেবল চিন্তায় আত্মপরীক্ষা করিতে গেলে আপাততঃ ২।৪ সপ্তাহ চলিতে পারে, কিন্তু পরে ঠিক থাকিবে না। দাগ দিবার নিয়ম করিলে বিশেষরূপে আত্মপরীক্ষা হয় এবং সকল পাপ ধরা পড়ে। কিন্তু দাগ দেওয়ার আসল অর্থ কাগজে দেওয়া নয়, মনে দেওয়া। ইহার মধ্যে আর একটী সূক্ষ্ম কথা মনে রাখা উচিত। কাগজ, কলম, কালী এই তিন পৃথিবীর জিনিষ লইয়া যে দাগ দিলাম, তাহা পার্থিব, তাহার কোন বিশেষ ক্ষমতা নাই। কিন্তু সেইটীকে যদি প্রতিজনের প্রতি ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে তাহার স্বর্গীয় ভাব হইল, তদ্দ্বারা নিশ্চয়ই বাঁচিয়া যাইব। ঈশ্বর হাতে যদি একটা ঘাস দেন, তাহা ধরিয়াই রক্ষা পাইতে পারি; ঈশ্বরকে, ছাড়িয়া দিলে ঘাস ঘাসই থাকে, তাহা পরিত্রাণের উপায় হইতে পারে না। (ক্রমশঃ)

সাধু হীরানন্দ।

যাঁহারা সত্যের সন্ধানে যাত্রা করেন, যাঁহারা বহুশতাব্দীর সঞ্চিত কুসংস্কার-কুজ্ঝটিকাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত করেন, যাঁহারা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও দীন দুঃখীর ও শোকার্ত্তের করুণ ক্রন্দনে ব্যথিত হইয়া মুক্তির বাণী শুনাইবার জন্য পথের কাঙ্গাল হন, তাঁহাদের শক্তি অদম্য, গতি দুর্দ্দমনীয়, প্রভাব অজেয়, প্রেম অসীম। বিশ্বের কোনও শক্তিই সেই স্রোতকে প্রতিরোধ করিতে পারে না। যেদিন বিশ্বের কল্যাণে যুগাবতার রাজা রামমোহন রায় 'শান্তং শিবং অদ্বৈতং' এই বাণী প্রচার করিলেন, ভারতের বুকে একটী নবযুগের বিরাট প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল। তাঁহারি বিজয়পতাকা লইয়া, তাঁহারি মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, তাঁহারি প্রেরণায় উদ্বোধিত হইয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন সেই প্রবাহকে বেগবান্ করিয়া গিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্ঞান ও বৈরাগ্য এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সাধনা ও প্রচার এই সনাতন পন্থাকে চির প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছে।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং মোহময়ী বক্তৃতার দ্বারা এই মুক্তির বাণী, এই আনন্দের বাণী হাজার হাজার নরনারীকে মুগ্ধ করিয়া, মঙ্গলময়ের মঙ্গলবিধান দেশবিদেশে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। আনন্দময়ের আনন্দনিকেতন, ভক্তের প্রেমনিকেতন, শোকার্ত্তের শান্তিনিকেতন চিরপবিত্রময় ব্রহ্মমন্দির বহুস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, ভবিষ্যতের উৎসাহ ও আশার সম্পদ্ রাখিয়া গিয়াছেন। সুদূর সিন্ধুপ্রদেশে হাইদ্রাবাদে এই প্রকার একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। জনকোলাহলের অতিদূরে শান্তিময় নির্জ্জন স্থানে, পত্রপুষ্পে শোভিত কাননের মধ্যে, প্রকৃতির মনোরম সৌন্দর্য্যের লীলানিকেতনের মাঝে, বহুশাখাপ্রশাখাবিসারিত অশ্বত্থবৃক্ষের নিম্নে শীতল ছায়ার কোমল ক্রোড়ে আনন্দময়ের আনন্দনিকেতন স্থাপিত হইয়াছিল। প্রতি সন্ধ্যায় যে মন্দির মুখরিত করিয়া ভক্তের প্রাণস্পর্শী করুণ প্রার্থনা চতুর্দ্দিকের ধার্ম্মিক, শোকক্লিষ্ট জনগণের প্রাণে শীতলধারা ঢালিয়া, তাহারি বক্ষে আশ্রয় লইবার জন্য আহ্বান করিত। এই প্রেমের আহ্বান কোনও এক সরলমতি ধর্ম্মপ্রাণ বালককে বিভোর করিয়াছিল। এই বালক ভবিষ্যতে সিন্ধুদেশে সর্ব্বজনপূজ্য হইয়াছিলেন এবং মহৎ জীবনের সমস্ত কার্য্যকলাপ তাঁহার জীবনে পরিলক্ষিত হওয়ায়, তাঁহার দেশবাসী ভক্তিভরে তাঁহার নামের পূর্ব্বে "সাধু" শব্দটী যোজনা করিয়া, "সাধু হীরানন্দ" নামে তাঁহাকে আখ্যাত করিয়াছেন। যাঁহার অন্তর সাধু, তিনিই প্রকৃত সাধু। অন্তরে অসাধু, অথচ বাহ্যিক অনুষ্ঠানের বৃথা আড়ম্বরে, গৈরিকবসনে ভূষিত, জটাজুটশিরে, কমণ্ডলুহস্তে শোভিত সাধুকে কখনই সাধুনামের মর্য্যাদা দেওয়া যাইতে পারে না। যাঁহার অন্তরে বাহিরে পবিত্রতা, যাঁহার অন্তরে বাহিরে নির্ম্মলতা, যাঁহার অন্তরে বাহিরে স্বচ্ছতা, যাহার অন্তর বাহির বৈরাগ্যের গৈরিকরাগে রঞ্জিত, তাঁহার হয় ত সাধুবেশের কোনই প্রয়োজন হয় না। তাঁহার হৃদয়ের দান, তাঁহার উন্নত প্রাণই তাঁহাকে বিশ্বজগতে সাধু নামে প্রচার করে, তাঁহার মহান্ কার্য্যকলাপই সাধুত্বের পূর্ণ সার্থকতা আনয়ন করে। হীরানন্দের উদার হৃদয়, হীরানন্দের দীন দুঃখীর অক্লান্ত সেবা, হীরানন্দের অটুট ভগবদ্ভক্তি, হীরানন্দের উৎসর্গিত জীবন দেখিয়াই তাঁহার স্বদেশবাসী ভক্তিভরে "সাধু হীরানন্দ" নামেই তাঁহাকে পূজা করিয়া সাধু শব্দের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে। তিনি মাত্র ত্রিশ বৎসর ইহজগতে বিদ্যমান ছিলেন; এই অল্প সময়ের মধ্যে, সিন্ধুদেশের যতপ্রকার সৎ কর্ম্ম, সৎ অনুষ্ঠান ও সৎ অভিযান আজকাল সিন্ধুদেশে প্রতিষ্ঠিত, এই সমস্তেরই প্রবর্ত্তক ছিলেন সাধু হীরানন্দ।

সাধু হীরানন্দের সহিত বাঙ্গলার নিবিড় সম্বন্ধ ছিল। বাঙ্গলার কোমল ক্রোড়ে তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা, বাঙ্গালীর প্রেমে ও স্নেহে তিনি লালিতপালিত, বাঙ্গালীর ভাব ও ভাষায় তিনি অনুপ্রাণিত, বাঙ্গালীর যত্ন ও সেবার মাঝে তাঁহার চিরনিদ্রা। বাঙ্গালী তাঁহার চিরবন্ধু ছিল, বাঙ্গলা তাঁহার প্রাণপ্রিয় ছিল। বাঙ্গালীও প্রতিবৎসর তাঁহার মহানিদ্রার তিথিতে, তাঁহার পবিত্র স্মৃতির চরণতলে পূজার অর্ঘ্য ঢালিয়া দিয়া নিজেকে চিরধন্য মনে করে।

সাধু হীরানন্দ ২৩শে মার্চ্চ, ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে, হাইদ্রাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। শিশুর আনন্দময় সুন্দর মুখমণ্ডল দেখিয়া জননী আদর করিয়া তাঁহার নাম রাখিলেন—হীরানন্দ—সমস্ত আনন্দের হীরকখনি।

হীরানন্দের পিতা দেওয়ান সৌকিরাম নন্দীরাম হাইদ্রাবাদে একজন অতি ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। ধর্ম্ম ও কর্ম্ম তাঁহার জীবনের আদর্শ ছিল। কর্ত্তব্যসাধনে তিনি কখনও পরাঙ্মুখ ছিলেন না। সত্য এবং সততার পথ হইতে তিনি কখনও বিচলিত হন নাই। একাধারে তিনি যেমন বিচক্ষণ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন, সিন্ধুদেশের ক্ষত্রিয় আমিলজাতির প্রতিষ্ঠাবান্ সমাজপতি ছিলেন, পারস্যভাষার একজন অদ্বিতীয় কবি ছিলেন, তেমনি তিনি স্নেহময় পিতা, প্রেমময় স্বামী এবং মধুময় সখা ছিলেন। তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা, চরিত্রের মাধুর্য্য ও চরিত্রের সৌন্দর্য্য ফুটন্ত গোলাপের ন্যায় চতুর্দ্দিক আলোকিত ও আমোদিত করিয়া রাখিয়াছিল। পুত্রগণ পিতৃহৃদয়ের সমস্ত সম্পদ্‌ই উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন।

হীরানন্দের জননী লক্ষ্মীস্বরূপিণী ছিলেন। আদর্শ গৃহিণীর সেবা ও সৌজন্য, দয়া ও দাক্ষিণ্য, মায়া ও মমতায় সৌকিরাম নন্দীরামের সংসার নন্দনকাননে পরিণত হইয়াছিল। যদিও তিনি নিরক্ষরা ছিলেন, তবুও তিনি জানিতেন, ভাষাহীন মহান্ আদর্শের ছবি যদি সন্তানদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া যে শিক্ষা দেওয়া যায়, সেই শিক্ষা পুঁথিগত হইলেও কখনও পাওয়া যায়

নাম সেই আদর্শ, সেই শিক্ষা তিনি সন্তানদের দিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহারি শিক্ষার গুণে আজ তাঁহার সন্তানগণ দেশপূজ্য। হীরানন্দের করুণাময়ী জননীর হৃদয় যেমন দীন দুঃখীর করুণ ক্রন্দনে নিত্য আলোড়িত হইত, তেমনি শোকদুঃখের প্রবল ঝটিকায় তাঁহার হৃদয় প্রশান্ত মহাসাগরের ন্যায় ধীর, স্থির, অটল এবং ভগবদ্ নির্ভরতায় পরিপূর্ণ থাকিত। তাঁহার পরিবারবর্গ নানকপন্থী ছিলেন। সদ্গুরুর শ্রীচরণে তাঁহার সমস্ত দুঃখের ও বেদনার নিবেদন ঢালিয়া দিয়া, মেঘমুক্ত শারদ উষার ন্যায় তাঁহার হৃদয় স্বচ্ছ, নির্ম্মল আকাশের ন্যায় আনন্দের হাস্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। আনন্দের পরশমণি, শোকার্ত্তের একমাত্র অবলম্বন, নানকপন্থীর অমূল্য সম্পদ, সদগুরুর শ্রীমুখবাণী, গুরুগ্রন্থের সারাৎসার 'জপজী' ও 'সুখমণির' অমৃতময় শ্লোকগুলি তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল এবং সেইগুলি তাঁহার সরলমতি সন্তানদের আয়ত্ত করাইয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহারা ভবিষ্যতে সুখ দুঃখে এই শ্লোকগুলির মর্ম্মার্থ হৃদয়ে অনুভব করিয়া আনন্দ পান। জননীর কোমলতা, সেবাপরায়ণতা এবং ভগবদ্‌নির্ভরতা সাধু হীরানন্দ উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়া, হাজার হাজার দীন দুঃখীকে আপন করিয়া লইয়াছিলেন, হাজার হাজার রোগ-শোক-ক্লিষ্ট আতুরকে দিবারাত্রি অক্লান্ত সেবা ও শুশ্রূষায় নিরাময় করিয়াছিলেন, হাজার হাজার কুষ্ঠরোগীর গলিত কুষ্ঠ ধোয়াইয়া দিয়া অসহ্য যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তিদান করিয়াছিলেন। ধন্য জননীর ধন্য সন্তান।

সৌকীরাম নন্দীরামের চারিটী পুত্র—চারিটি ফুলের ন্যায় একই বৃন্তে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। নভলরায় জ্যেষ্ঠ, তারাচাঁদ মধ্যম, হীরানন্দ তৃতীয় এবং মতিরাম কনিষ্ঠ। তাঁহাদের ভায়ে ভায়ে খুব মিল, সম্প্রীতি ও সদ্ভাব চিরদিন ছিল। হিন্দু পরিবারে জ্যেষ্ঠের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পারিবারিক গৌরব ও প্রতিষ্ঠার বৃদ্ধি করা, পারিবারিক সুখ ও স্বচ্ছন্দতার বিস্তার করা, সংসারকে সুশৃঙ্খলায় ও সুনিয়ন্ত্রণে আবদ্ধ করা, অনুজদের সংশিক্ষা ও সৎকর্ম্মে নিয়োজিত করা এবং সংসারের সমস্ত রোগ, শোক, দুঃখ, অভাব এবং অভিযোগের প্রবল ঝঞ্ঝা বনস্পতির ন্যায় অচল ও অটলভাবে শিরে বহন করা, হীরানন্দের অগ্রজ-শ্রেষ্ঠ এই সমস্ত সদগুণেই সুশোভিত ছিলেন। ধর্ম্মপিপাসু নভলরায় কর্ম্মজীবনে প্রবিষ্ট হইয়া, ধর্ম্মের মহান্ আদর্শের জন্য উন্মত্ত হইলেন। গুরু নানকের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মপথ তাঁহার মনঃপূত হইল না, পারিবারিক ধর্ম্মবিশ্বাসে তিনি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারিলেন না। আরও কিছু উদার, আরও কিছু সুস্পষ্ট পথের জন্য তিনি পাগল হইলেন। যাঁহারা পথের পাগল, বিধাতা তাঁহাদিগকে পথ দেখাইয়া দেন। নভলরায়ের সেই সৌভাগ্য হইয়াছিল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মানুরাগের অলৌকিক আখ্যায়িকা শুনিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন, যিনি অমিততেজে ওজস্বিনী বক্তৃতায় মুগ্ধ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার পন্থা, মহান্ আদর্শ ও আনন্দের বাণী দেশ বিদেশে প্রচার করিয়া, সহস্র সহস্র ধর্ম্মপিপাসু ও শোকসন্তপ্ত নরনারীর প্রাণে শান্তিবারি সিঞ্চন করিয়া নবজীবন দান করিতেছেন। পথের পাগল পথ খুঁজিয়া পাইলেন। নভলরায় সুদূর সিন্ধুদেশ হইতে কলিকাতায় ছুটিয়া আসিয়া, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের শ্রীচরণে আপনাকে উৎসর্গ করিয়া, চরম তৃপ্তি, শীতল সান্ত্বনা ও আনন্দময় জীবন লাভ করিয়া, তিনি সিন্ধুদেশে ফিরিয়া গেলেন। প্রত্যাবর্ত্তনের পর তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের আচার ও অনুষ্ঠান, ধ্যান ও ধারণা, উদার ও উজ্জ্বল পথ অনুসরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা তারাচাঁদ পরিশেষে তাঁহারি পথের পথিক হইলেন। যে ধর্ম্মের লক্ষ্য সাম্য ও সামঞ্জস্য, যে ধর্ম্মের পথ উদার ও উন্মুক্ত, যে ধর্ম্মের মন্ত্র একমেবাদ্বিতীয়ম্, সেই ধর্ম্মের ধর্ম্মাত্মার নিকট ব্রাহ্মণ কি শূদ্রের, ধনী কি নির্ধনের, পাপী কি পুণ্যাত্মার কোনও ভেদাভেদ নাই। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া একই ঈশ্বর বিরাজ করিতেছেন এবং সেই একই ঈশ্বরের সন্তানসন্ততিগণ বিশ্ব ছড়াইয়া রহিয়াছে। বিশ্বরূপী বিধাতাকে নিজ কল্পনাবলে মূর্ত্তিদান করা অসম্ভব এই ভাবিয়া, তাঁহারা পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দেন নাই, অথবা কোনও বিশিষ্ট সমাজ যে ঈশ্বরের অতি প্রিয়, সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানের কাণ্ডারী এবং সমস্ত ঐশ্বরিক ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডারী, এই সংকীর্ণতা তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন নাই। বাঙ্গালাদেশে ব্রাহ্মণদের ন্যায় সিন্ধুদেশে বাওয়াগণের প্রাধান্য দুর্দ্দমনীয় ছিল। চরিত্র-নির্ব্বিশেষে বাওয়াদের চরণ পূজা করিলে স্বর্গলোক পাওয়া যায়, এই অন্ধ বিশ্বাসের প্রশ্রয় দিতে নভলরায় ও তাঁহার ভ্রাতা কোনও মতেই প্রস্তুত হন নাই। সামাজিক সংকীর্ণতার কঠিন নিগড় ভাঙ্গিতে তাঁহারা দৃঢ়পণ করিলেন। পুণ্যবান্ পিতার প্রতি তাঁহাদের অটল শ্রদ্ধা ও অটুট ভক্তি চিরদিনই ছিল। স্নেহপ্রবণ পিতাও পুত্রগতপ্রাণ ছিলেন। প্রাচীন পিতা পুত্রদ্বয়ের এই নবীন ধর্ম্মবিশ্বাসের অন্তরায় হন নাই। নিজের সমাজের উপর তাঁহার অখণ্ড আধিপত্য ছিল, সেইজন্য তাঁহার নবধর্ম্মাবলম্বী পুত্রদ্বয়কে সামাজিক নির্য্যাতন ও নিষ্পেষণ ভোগ করিতে কিংবা সমাজ হইতে বিতাড়িত হইতে হয় নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম প্রবর্ত্তকের ন্যায় সিন্ধুদেশের প্রথম ভক্তের নিগৃহীত ও নিপীড়িত জীবন ভোগ করিবার সৌভাগ্য হয় নাই।

ক্রীড়াকৌতুক ও হাস্য কোলাহলে গৃহখানি মুখরিত করিয়া হীরানন্দের বাল্যজীবন কাটিয়া ছিল। দশ বৎসর বয়সে তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্র্যাক্‌টিসিং ক্লাসে ভর্ত্তি হইলেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার বিদ্যালিপ্সা ও চরিত্রসংগঠনের প্রবল ইচ্ছা বলবতী হইল। হীরানন্দ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুগত ছিলেন। নভলরায়ের নবীন চিন্তার ধারা সুকুমার বালকের হৃদয় প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল। অগ্রজের সহিত প্রতি সন্ধ্যায় ব্রাহ্মমন্দিরে যাতায়াতের ফলে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার ও উন্মুক্তবাণী তাঁহার হৃদয়মর্ম্মে প্রতিফলিত হইয়াছিল।

প্র্যাক্‌টিসিং স্কুলের দুই বৎসরের পাঠ সমাপন করিয়া, পরীক্ষায়

অতি সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হওয়ার পর, পুরস্কারস্বরূপ বিনা বেতনে তিনি ট্রেণিং স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। পর বৎসর হীরানন্দ অতি বিচক্ষণ এবং যশস্বী প্রধান শিক্ষক কেশবরায় বাপুজির তত্ত্বাবধানে হাইদ্রাবাদে গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলে চতুর্থশ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেন। কেশবরায়ের শ্যালক পুরুষোত্তম তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। পুরুষোত্তম হীরানন্দের ন্যায় অতি মহৎ ছিলেন, সেইজন্য উভয়েই উভয়ের চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া, অচ্ছেদ্য বন্ধুত্বের ডোরে বদ্ধ হইয়া, পরোপকার ও সেবাব্রতে ব্রতী হইলেন।

হীরানন্দের পিতা সৌকীরাম নন্দীরাম বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না; কিন্তু হীরানন্দের পিতামহ দেওয়ান নন্দীরাম সেকালের লোক, পুরাতনের জীর্ণ সংস্কার ও আচার পদ্ধতি লইয়াই জীবনসন্ধ্যা অতি আনন্দেই কাটাইতেন। তাঁহার ক্রীড়াকৌতুক ও হাস্যরসের সঙ্গী অতি আদরের পৌত্র হীরানন্দের পার্শ্বে একটী মধুময়ী সঙ্গিনী না দেখিয়া, তিনি জীবনের পরপারে যাত্রা করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। গৃহের স্ত্রীলোকদেরও এ বিষয়ের অনুরোধ তাঁহাকে আরও উৎসাহিত করিয়াছিল। উপরন্তু হীরানন্দের একটী ভগ্নিও বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিয়াছিল। বাঙ্গলাদেশের ন্যায় সিন্ধুদেশেও কন্যার বিবাহ অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। সেইজন্য হীরানন্দের বিবাহের যৌতুকাদি হীরানন্দের ভগ্নির বিবাহে ব্যয়িত হইল। বিনা ব্যয়ে তাঁহার পৌত্রীর বিবাহ হইয়া গেল, অথচ তাঁহার আশাও পূর্ণ হইল। দ্বাদশবর্ষীয় হীরানন্দের পার্শ্বে বালিকা বধূটিকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅমরেশচন্দ্র সিংহ (এ্যাডভোকেট, পাটনা)।

স্নেহময়ী মাতৃদেবীর চরণে ভক্তি-অর্ঘ্য।

আজ কতদিন কেটে গেল, আমাদের স্নেহময়ী জননী আমাদের ছেড়ে এ পৃথিবী থেকে স্বর্গধামে স্বর্গের জননীর কোলে চলে গেছেন। কতদিন হয়ে গেল, সুধামাখা মা নাম বলে মাকে ডাকি নাই। মা আমাদের যে কত ভাল ছিলেন, তাঁর গুণের কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, কথায় বলে শেষ করা যায় না। মার কি অফুরন্ত অমিয়মাখা স্নেহ ভালবাসা আদর যত্ন পেয়েছিলাম, এ জীবনে তাহা কখনও ভুলিবার নহে। মা আমাদের সংসারের শত অভাব অনাটনের মধ্যেও, কেমন আদর যত্নের সহিত সুন্দর ভাবে ছেলেমেয়েদের ভাল করে মানুষ করেছিলেন। কোনও দিন কোনও কষ্ট, কোনও অভাব বুঝিতে দেন নাই। চিরদিন স্নেহের অঞ্চলে ঢাকিয়া নিরাপদে রক্ষা করিয়াছেন। কত সুন্দর ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া ও নানাপ্রকার নীতি ভক্তির উপদেশদানে সন্তানদের ক্ষুদ্র জীবনগুলি পবিত্র ফুলের মত ফুটিয়ে তুলিতে প্রাণপণ চেষ্টা যত্ন করিয়াছেন। আমাদের স্নেহময়ী মার জীবনখানি কত পবিত্র সুন্দর সুকোমল ছিল, তাহা অনেকেই জানেন। নববিধানাচার্য্য ভক্তশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মানন্দের খুব নিকট সম্পর্কের ভগিনী ছিলেন আমাদের মা। আমাদের মাকে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন ও আপন সহোদরা ভগিনীর ন্যায় স্নেহ করিতেন। মাও তাঁকে শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত পরম সমাদরে কেশবদাদা বলিয়া ডাকিতেন। শুনিতে আমাদের বড় ভাল লাগিত। মার মুখে তাঁর বড় আদরের পরম শ্রদ্ধাস্পদ কেশবদাদার গল্প শুনিতে ছোটবেলা থেকে আমাদের বড় আনন্দ হইত। আমাদের বাবা মা চিরদিন তাঁর উচ্চ পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অতিশয় ভক্তিপরায়ণ ও নিষ্ঠাবান্ ছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে আমাদের জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ আমাদের মাতামহ ও মাতুলগণের একান্ত অনুরোধে পড়িয়া, সুপাত্র পাওয়াতে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও হিন্দুমতে দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই জন্য বাবা মা বিশেষ দুঃখিত হইয়াছিলেন এবং মা কিছুদিন তাঁহাদের কাছে মনের দুঃখে ও লজ্জায় যাইতে পারেন নাই। কিন্তু মা বলেছিলেন, কিছুদিন পরে মার আদরের পরম স্নেহময় কেশবদাদা একখানি সুন্দর সাড়ী কিনে একথালা নানারকম সুন্দর খাবার দিয়া তত্ত্ব পাঠাইয়াছিলেন। মার এই কথা বলিতে বলিতে চক্ষে জল আসিত। কি আশ্চর্য্য ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, কি অপূর্ব্ব স্নেহ ভালবাসা, সেই গৌর নিতাইয়ের ছোট ভাই দেখিয়ে গেছেন! এ প্রাণ থাকিতে তা কি ভুলিতে পারা যায়? সেই প্রেমের আদর্শ, স্নেহের অবতার ভক্তের জয় হইল। তাঁর নূতন ধর্ম্মের জয় প্রতিষ্ঠিত হইল, এই ভক্তের ভক্ত দীন পরিবারের মধ্যে। পরে তাঁদের সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠানাদি পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের নবসংহিতামতে সুসম্পন্ন হইয়াছে। আর যাঁহাদের তখন হিন্দুমতে বিবাহ হইয়াছিল, তাঁহারাও অচিরে চিরপ্রিয় পবিত্র স্বর্গীয় ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। সেই বাল্যকাল হইতে যে অপূর্ব্ব পিতৃস্নেহের দৃষ্টান্তে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা সাদরে তাঁহার শৈশবসঙ্গিনী সহপাঠিনী আমাদের দিদিকে নিজেদের গাড়ী করিয়া প্রতিদিন স্কুলে নিয়ে যেতেন, পরে রাজরাণী মহারাণী হয়েও সেই বাল্যসঙ্গিনীকে আপন বোনের মত সারাজীবন শেষদিন পর্য্যন্ত স্নেহ করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাও কখনও ভুলিবার নহে।

মার অপূর্ব্ব ভগবদ্ভক্তি, অটল ধর্ম্মবিশ্বাস এবং অসীম ধৈর্য্য সহিষ্ণুতার কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই সংসার-সংগ্রামে কত ভীষণ ঝড় তুফান বিপদ্ পরীক্ষা মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, তাহা কি অসীম ধৈর্য্য বিশ্বাসের সহিত মাথা পাতিয়া বহন করিয়াছেন! কত বড় বড় বজ্রাঘাত আসিয়া বক্ষকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া দিয়াছে, তিনি অপূর্ব্ব ভক্তি বিশ্বাসের সহিত সেই সব প্রাণ প্রিয়জনের বিরহ-শোক-বজ্রপাত বুক পাতিয়া সহ্য

করিয়া গিয়াছেন। তাই বলি, মা, আজ তুমি সেই অমৃতময় অক্ষয় স্বর্গধাম থেকে তোমার এই অধম অযোগ্য অনুপযুক্ত সন্তানের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া, তোমার সেই স্বর্গীয় অসীম ভগবৎপ্রেম ও ধৈর্য্য বিশ্বাসের এককণা দান করিয়া আশীর্ব্বাদ কর, যেন বিশ্বাসের বলে এই দুঃখময় জীবন-সংগ্রামে উত্তীর্ণ হয়ে ভবসিন্ধুপারে চলে যেতে পারি।

শ্রীসরলা দাস।

চয়ন।

(স্বর্গগত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের "Heart Beats" হইতে গিরিদির শ্রীযুক্ত ডি, এন, মুখার্জি কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

Prophets—তোমার এবং মহাপুরুষদের মধ্যে প্রভেদ কি? এ কথা সত্য নয় যে, ভগবান্ তোমার যত নিকটে, তিনি তাহা অপেক্ষা মহাপুরুষদের অধিক নিকটে ছিলেন। তাঁহার করুণা সকলের প্রতি সমান। তোমার এবং তাঁহাদের মধ্যে প্রভেদ এই যে, তুমি তাঁর করুণায় বিশ্বাস করিতে পার না, কিন্তু তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন। পিতা তোমার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন; কিন্তু তাঁহার সঙ্গলাভের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা না করিলে, তাঁর সান্নিধ্য তুমি অনুভব করিতে পারিবে না। অবিশ্বাস পাপের নিত্য সঙ্গী।

Matter and Spirit—জড় ও চেতন। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি যে ভগবান্ এক হস্তে জড়রাজ্যের শোভা সৌন্দর্য্য বিধান করিতেছেন, আর এক হস্তে যাঁহারা নরবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া দেবত্ব লাভ করেন, তাঁহাদিগকে অপূর্ব্ব গৌরবে বিমণ্ডিত করিতেছেন। তাঁহাদেরই মুখের জ্যোতিঃ বাহ্য প্রকৃতিকে এবং আধ্যাত্মিক জগৎকে সমুজ্জ্বল করিতেছে।

Love.—সহজ ভাবে এবং সত্যরূপে পরমেশ্বরকে ও মানুষকে ভালবাসিবে; নারীকে ভালবাসিবে, কিন্তু কামনা করিবে না; ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে ভালবাসিবে, কিন্তু তাঁহাদের নিকটে কোন প্রত্যাশা করিবে না; জীবনকে ভালবাসিবে, কিন্তু সুখ শান্তিকে মনে স্থান দিবে না। এক কথায় স্বার্থ ও লালসাকে হৃদয় হইতে উন্মূলিত করিয়া, জগতে যাহা কিছু ভাল দেখিবে, সমুদয়কে ভালবাসিবে; এবং তোমার নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক প্রেম দিয়া ভগবান্ ও মানুষের সেবা করিবে। তখন তুমি স্বর্গ ও পৃথিবীকে জয় করিবে। নিজের স্বার্থসিদ্ধির উপায় বলিয়া নয়, কিন্তু ভগবানের নামে সংসারের সকল বস্তু ও সকল ব্যক্তিকে ভালবাসিবে।

God is Life.—পরমেশ্বরকে যখন আমার জীবন বলিয়া অনুভব করি, তখন নিজের প্রতি একটা সম্ভ্রমের উদয় হয়। তখন আমার এই শরীর ও আত্মার প্রতি সমাদর না করিয়া থাকিতে পারি না। আমার জীবন আমার নহে, আমার মধ্যে দৈব শক্তি। আমার জীবনকে কলঙ্কিত করা দূরে থাক, আমার জীবনকে আমি তুচ্ছ করিতে পারি না, বা হীনদৃষ্টিতে দেখিতে পারি না। ধন্য তুমি, হে পরমেশ্বর, যে তুমি আমাকে জীবন দান করিয়াছ।

নববিধানের লোক কে?

নববিধান সর্ব্বগ্রাসী উদার ধর্ম্ম, সুতরাং কাহাকেও ছাড়িতে পারেন না। এজন্য আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বলিলেন, "কোথায় ইহুদী বিধান, কোথায় বৌদ্ধ বিধান, কোথায় গৌরাঙ্গ বিধান, কোথায় মুসলমান বিধান, কোথায় শিখ বিধান, সমুদয়ের সঙ্গে ইনি সম্বন্ধ। নববিধান কিছুই ভাঙ্গিতে আসেন নাই। ইনি সমুদয় ধর্ম্মবিধান পূর্ণ করিতে আসিয়াছেন। ইঁহার নিকটে কোন ধর্ম্মাবলম্বী এবং কোন জাতি অপদস্থ বা উপেক্ষিত হইবে না। যাঁহার যে অভাব, তাহা ইনি পূর্ণ করিবেন। ইঁহাতে সমস্ত ধর্ম্ম ও নীতি একীভূত। এই নববিধান টানিতে গেলে জড়রাজ্য, মনোরাজ্য, ধর্ম্মরাজ্য সমস্ত সঙ্গে সঙ্গে আকৃষ্ট হয়। বস্তুবিজ্ঞান, প্রকৃতিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাজ্যবিজ্ঞান, ধর্ম্মবিজ্ঞান, সকল প্রকার বিজ্ঞান নববিধানের অন্তর্গত। ইনি যোগ, ভক্তি, জ্ঞান, সেবা, ফকিরী, বৈরাগ্য প্রভৃতি ধর্ম্মের সমুদয় অঙ্গকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করেন। নববিধান সজন, নির্জ্জন, পারিবারিক, সামাজিক সকল প্রকার সাধন ভজনের প্রতি অনুরাগী। ইনি ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ, সাধু, অসাধু, অসভ্য, সুসভ্য, সকলকেই আপনার আশ্রয় দেন। ইনি ঈশ্বরের কোন সন্তানকে অবজ্ঞা করেন না। ইনি ঈশ্বর, পরলোক, বিবেক প্রভৃতি ধর্ম্মবিজ্ঞানের যত গূঢ় সত্য আছে, সমুদয় স্বীকার করেন। নববিধান বিজ্ঞানের ধর্ম্ম, ইহার মধ্যে কোন প্রকার ভ্রম, কুসংস্কার অথবা বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ কোন মত স্থান পাইতে পারে না।......" ইত্যাদি। প্রেমদাস গাইলেন, "রচিলেন ভগবান্, উদার নববিধান, যাতে হবে জগতের পরিত্রাণ।" ঢাকাতে আচার্য্য বঙ্গচন্দ্রের প্রার্থনা এইরূপে গ্রথিত হইল, যথা:—"নূতন বিধানে কারো সঙ্গে ছাড়া ছাড়ি নাই, ছোট বড়, নারী নর, সকলে ভগিনী ভাই। পবিত্রাত্মা গুণনিধি, করেছেন এই নববিধি, সবার দিবে শুদ্ধ প্রীতি, বাছা বাছি কিছু নাই।..........পবিত্রাত্মা হরির গুণে, যে দেশেই যে বিধানে, পাইয়াছে পরিত্রাণ, যত পাপী দুঃখী ভাই; তাহাদের সঙ্গে মিলে, গাই হরিনাম প্রেমে গলে, পতিত মানবের দুঃখে অশ্রুজলে ভেসে যাই।"

দেবনন্দন ঈশা মানবজাতির সহিত এক হইয়া তাহাদের পাপভার গ্রহণ করিলেন এবং তাহার প্রায়শ্চিত্ত জন্য আত্মোৎসর্গ করিলেন। অথচ তিনি বলিলেন, "যাহারা আমার পিতার ইচ্ছা

পালন করে, তাহারাই আমার পিতামাতা, ভ্রাতা।" আর ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "অভিন্নহৃদয় পরিবার।" "গরুরা যেমন আপনার গোয়ালের গরু চিনিতে পারে, তেমনি আপনার লোক চেনা যায়।" সুতরাং বিশ্বাসীরা চিরকাল আপনাদের অন্তরঙ্গদিগকে চিনিয়া থাকেন। অতএব নববিধানের লোক কে? এ প্রশ্নের সদুত্তর আপন আপন অন্তরে তাঁহারা প্রাপ্ত হন। প্রবাদ আছে যে, "রাম না জন্মিতেই রামায়ণ রচনা হয়," তদ্রূপ নববিধান ঘোষণার অনেক বৎসর পূর্ব্বে. নববিধানের লোক কে হইবে, তাহা কলিকাতা মহানগরীর রাজপথে গীত হয়। যথা:—"জীবনের মহাযোগ কর রে সাধন, বিশ্বাসনয়নে ব্রহ্ম কর দরশন; জীবে দয়া, নামে ভক্তি কর এই সার, ওরে মন আমার, সে শ্রীপদে ভক্ত হয়ে থাক অনিবার। পিতার মধুরবাণী, শুনি শ্রবণে, সেব আনন্দে তাঁহারে সবে কায় মন প্রাণে।" এই ত নববিধানের লোকের সংজ্ঞা। এই সংজ্ঞানুসারে মহাত্মা গাঁধি যে নববিধানের লোক, এ কথা কে অস্বীকার করিতে সাহসী হইতে পারে? মহাত্মাজি নববিধানের নাম করেন না, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত প্রকাশ্যে কোন কথা বলেন নাই; অথচ তিনি সর্ব্বসাক্ষী ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন, তাঁহার আদেশ শুনিয়া কার্য্য করিতে যত্ন করেন, হরিজনদিগের অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য আপনার প্রাণ দিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। এই মহাত্মার ন্যায় এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা ও পৃথিবীর অন্যত্র আরও যে কত কত মহাত্মা আছেন, তাহা, পাঠক, তুমি আমি জানি না। আমরা জানিনা বলিয়া কি পৃথিবী ঈশ্বরবিশ্বাসিশূন্য হইয়াছে? না, তাহা কখনই নহে; ঈশ্বর বলিতেছেন, "বিশ্বাসী বিহনে ভবে, কে আছে আমার? বিশ্বাসী রেখেছে নাম জগতে আমার।" "আমরা নববিধানের গোঁড়া হইব" সত্য, অথচ নববিধানের লোক আমাদের অজ্ঞাতসারে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায় মধ্যে থাকিতে পারে ও আছে, ইহাও স্বীকার করিব। নববিধানের শাস্ত্র বলেন, "ঈশ্বর ব্যক্তি বিশেষের মুখাপেক্ষা করেন না; কিন্তু জাতি মাত্রেরই মধ্যে যে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে ভয় করে এবং ধর্ম্মকার্য্য করে, তিনি তাহাকে গ্রহণ করেন।" নববিধানের লোকের একটী বিশেষত্ব এই যে, তিনি নিত্য প্রার্থনাশীল। এই প্রার্থনা প্রেমদাস এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, যথা:—"দেহি নাথ, অনাসক্তি, নব ভাব নব ভক্তি, জপ তপ নিষ্ঠা ভক্তি, জীবে দয়া নামে রতি, ধর্ম্মজীবনের অন্নপান; সুখে দুঃখে করি যেন তব জয় গান। দেহি দেব শুদ্ধ বুদ্ধি, বিবেক, সন্তোষ, শুদ্ধি, নিত্য শান্তি দাস্যমুক্তি, পরমার্থ পরাগতি, শম, দম, নির্বৃতি নির্ব্বাণ; ভক্তি ভরে, বারে বারে, করি ও পদে প্রণাম।" নববিধান কাহারও এবং কোন দেশ বা জাতির একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। যিনি ঈশ্বরের আজ্ঞা শ্রবণ করেন এবং পালন করেন, তিনিই নববিধানের লোক। অতএব নববিধান সম্বন্ধে "যদি কেহ কথা বলে, তবে সে ঈশ্বরবাণীপূর্ণ প্রবক্তার ন্যায় কথা বলুক।"

আলেয়া—যৎ।

(দেব-উক্তি)

"বিশ্বাসী বিহনে ভবে কে আছে আমার।
বিশ্বাসী রেখেছে নাম জগতে আমার।
পেলে আমাতে বিশ্বাসী, আমি তার হৃদয়ে বসি, (করি) জগতের উদ্ধার তরে, বিধান বিস্তার।
আমি রে তার অন্নজল, আমি প্রেম পুণ্য বল; আমা ভিন্ন দেখে সব শূন্য অন্ধকার।
বিশ্বাসী তনয় যখন, করে আমার বিধি পূরণ, রক্তপাত করে আহা, পৃথিবী তাহার।
বিশ্বাসীরে বলিহারি, আমার সর্ব্বস্বের অধিকারী, সংসারে কি স্বর্গরাজ্যে পূর্ণ অধিকার। (তার)
আমার খেয়ে আমার পরে, থেকে আমার বুকের ভিতরে, অবিশ্বাস করে আমায় পাষণ্ড সংসার।"

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন।

—০—

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ২৫শে এপ্রিল, অপরাহ্ণ ৫টার সময়, ময়ূরভঞ্জ-রাজপ্রাসাদে রাজাবাগে নন্দগাঁ মহারাজা ও মহারাণী জয়ন্তি দেবীর একটি রাজকুমার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে মহারাণী সুচারু দেবীর সহযোগে ভাই প্রিয়নাথ শিশুর জন্য মাতার প্রকোষ্ঠে বিশেষ প্রার্থনা করেন। ভগবান্ শিশুকেও পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

নামকরণ ও বিদ্যারম্ভ—স্বর্গীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর পৌত্র শ্রীমান্ অমরনাথ ভট্টাচার্য্যের প্রথম সন্তানের (কন্যা) নামকরণ ও বিদ্যারম্ভ অনুষ্ঠান শিশুর চারি বৎসর বয়সে, গত ২৯শে এপ্রিল, শনিবার, ২৬নং বিডন ষ্ট্রীটস্থ বাটীতে সম্পন্ন হইয়াছে। কন্যার নাম "অপর্ণা" রাখা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে নববিধান প্রচারভাণ্ডারে ৫৲ টাকা দান করা হইয়াছে। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

শুভবিবাহ—গত ১৮ই বৈশাখ, ১লা মে, সোমবার, শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায়ের তৃতীয় পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ সুধাংশুনাথের সহিত, শ্রীযুক্ত প্রভাতরঞ্জন ঘোষের দ্বিতীয়া কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী মায়ার শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত মিলনানন্দ রায় ভ্রাতার শুভবিবাহে প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ১১ই মে, ২৩নং বাদুড়বাগান রো ভবনে, স্বর্গগত প্রেরিত ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়ের পৌত্রী, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের কনিষ্ঠা

কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী লতিকার সহিত, গিরিধি-প্রবাসী শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ সুধাংশুকুমারের শুভবিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই অক্ষয়কুমার লধ আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করেন।

ভগবান্ নবদম্পতিযুগলকে স্বর্গের শুভাশীষ দান করুন।

সেবা—কোচবিহারে উৎসব-সাধনান্তে কলিকাতা আসিয়া, গত ২৩শে এপ্রিল, প্রাতে মঙ্গলপাড়াস্থ ভগ্নিদিগকে লইয়া ভাই প্রিয়নাথ নবদেবালয়ে প্রাতঃকালীন উপাসনা করেন। এইদিন সন্ধ্যায় ব্রহ্মানন্দাশ্রমে সায়ং সামাজিক উপাসনা হয়। ২৬শে শ্রীমতী সৌদামিনী দেবীর সাম্বৎসরিক দিন স্মরণে এবং ২৭শে শ্রদ্ধেয় ভাই অমৃতলাল বসুর সাম্বৎসরিক দিন স্মরণে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমেই বিশেষ উপাসনা হয় এবং ২৮শে প্রাতে কটকে ভ্রাতা রামকৃষ্ণ রাওয়ের বাড়ীতে পারিবারিক উপাসনা করেন। সে স্থান হইতে পুরীতে গিয়া ভাই প্রিয়নাথ সস্ত্রীক নবশ্রীক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছেন।

পরলোকগমন—আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, গত ৪ঠা মে, প্রত্যূষে, ভাগলপুরে, ভক্ত হরিসুন্দর বসুর সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী মনোমোহিনী বসু ৭৫ বৎসর বয়সে, জরাজীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া, স্বর্গধামে অমর জননীর নিত্য শান্তিক্রোড়ে স্থান লাভ করিয়াছেন। বিধানজননী তাঁহার আত্মাকে স্বর্গধামে দেবদেবীদলে স্থান দান করুন এবং শোকার্ত্ত পুত্র, কন্যা, আত্মীয় স্বজনগণের প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

গুড্‌ফ্রাইডে—গত ১৪ই এপ্রিল, প্রাতে, শান্তিকুটীরে, ৮৪নং অপার সার্কুলার রোডে, গুড্‌ফ্রাইডে উপলক্ষে, ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ উপাসনা করেন। এই দিনে রাঁচি নামকুমে শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদারের গৃহেও, নববর্ষ ও শ্রীঈশার মহাক্রুশ উপলক্ষে উপাসনাদি হইয়াছিল।

সাম্বৎসরিক—গত ২৬শে এপ্রিল, ৮৪নং অপারসার্কুলার রোডে, শান্তিকুটীরে, স্বর্গগত প্রেরিত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া সৌদামিনী দেবীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে প্রাতে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন উপাসনা করেন ও ভাই গোপালচন্দ্র গুহ বিশেষ প্রার্থনা করেন; সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দের নেতৃত্বে জমাট কীর্ত্তন হয়।

গত ২৭শে এপ্রিল, ৫।১।১ রাজা দিনেন্দ্র ষ্ট্রীটে, স্বর্গগত ভাই অমৃতলাল বসুর সাম্বৎসরিকে ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন।

গত ২৭শে এপ্রিল, ১৫।১বি প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে, ডাঃ শৈলেন্দ্রভূষণ দত্তের গৃহে, তাঁহাদের পিতৃদেব স্বর্গীয় রায় বাহাদুর ডাঃ নবীনচন্দ্র দত্তের সাম্বৎসরিকে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন; শৈলেন্দ্রবাবু এবং শ্রীমতী কুমুদিনী দাস বিশেষ প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ৪৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ৩০শে এপ্রিল, ৬।২ একডালিয়া রোডে, সাধু অঘোরনাথের সহধর্ম্মিণীর সাম্বৎসরিক দিনে, পুত্রদের গৃহে, শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে পুত্র শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ গুপ্ত প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ৫ই মে, ৮৩।১ অপার সার্কুলার রোডে, স্বর্গগত ভাই রামচন্দ্র সিংহের কনিষ্ঠ সহোদর স্বর্গীয় লক্ষ্মণচন্দ্র সিংহের জামাতা, স্বর্গীয় কিশোরীমোহন দাস বড়ুয়ার সাম্বৎসরিক দিনে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

উৎসব—হাজারিবাগ নববিধান ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে, গত ১৩ই এপ্রিল, সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত ব্রজকুমার নিয়োগী উৎসবের উদ্বোধনসূচক উপাসনা করেন। ১৪ই এপ্রিল, "গুড্‌ফ্রাইডের" দিন প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষ সুন্দর উপাসনা করেন এবং শ্রীঈশার জীবনের গূঢ়তত্ত্ব উপদেশে বিবৃত করেন। সন্ধ্যায় কেশবমেমোরিয়েল হলে, সঙ্গীতান্তে শ্রীযুক্ত ব্রজকুমার নিয়োগী প্রার্থনা করিলে, অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষ এদেশের ওদেশের দার্শনিক তত্ত্বের ভিতর দিয়া, শ্রীঈশার সঙ্গে আমাদের জীবনের যোগ কত নিগূঢ়, তাহা তাঁহার ভূয়োদর্শনপূর্ণ পাণ্ডিত্যের সহিত ব্যক্ত করেন। ১৫ই এপ্রিল, শনিবার, প্রাতে, ব্রহ্মমন্দিরে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। শ্রীভগবান্ তাঁহার শ্রীঈশা প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত দিনে দুপুরে ডাকাতির মত, আমাদের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া, দীনাত্মা করিয়া যে আমাদিগকে তাঁহার আপনার এবং ভক্তদের আপনার করে নিচ্ছেন, এই ভাব নিবেদনে ব্যক্ত হয়। সন্ধ্যায় অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষের গৃহে পারিবারিক উৎসব হয়। ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। উপাসনান্তে প্রীতিভোজনে সকলে পরিতৃপ্ত হন। ১৬ই এপ্রিল, রবিবার, সমস্তদিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে উপাসনার পূর্ব্বে, মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে, নালুদার পবিত্র সমাধি-প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। "চল চল ভাই মার কাছে যাই" এই সঙ্গীতান্তে ভাই অক্ষয়কুমার লধ প্রার্থনা করিয়া সমাধির আবরণ উন্মোচন করেন। তিনি প্রার্থনায় বলেন, "নিত্যোৎসবময় নালুদার জীবনের সঙ্গে হাজারিবাগ নববিধানমণ্ডলীর বিশেষ যোগ, তাহার প্রমাণস্বরূপ এখানে এই পুণ্য সমাধি-প্রতিষ্ঠা। সাধুর এই পুণ্যস্মৃতি-যোগে হাজারিবাগ মণ্ডলীর নিকট পরমতীর্থ। নববিধানের এই সুন্দর সাধুজীবনের অমরস্মৃতির আকর্ষণে একদিন হাজারিবাগের আপামর আকৃষ্ট হইবে, এই জন্যই বিধাতার এই অপূর্ব্ব কৌশল। সশরীরে নালুদা কতবার সকলকে ডেকে নিয়ে এসে এখানে উৎসব করেছেন, এখন অশরীরী ভাবে স্বর্গ মর্ত্ত্য নিয়ে এখানে উৎসব করছেন। আমরা তাঁহারই সঙ্গে, সকল ভক্তদের সঙ্গে মিলে উৎসব করি; তা হলেই আমাদের উৎসব করা সার্থক হবে।" নালুদার আত্মার সঙ্গে এইরূপ ভাবযোগে যুক্ত হইয়া ভাই অক্ষয়কুমার লধ এই বেলার উপাসনার কার্য্য করেন। মধ্যাহ্নে "চঞ্চলাকুটীরে" পরমতৃপ্তির সহিত প্রীতিভোজন হয়। সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত ব্রজকুমার নিয়োগী উপাসনা করেন। তিনি উপদেশে, ব্রহ্মমন্দিরের প্রতি "মণ্ডলীর কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব" বিষয়ে প্রাণের আকুল আবেদন জ্ঞাপন করেন। ভাগলপুরের শ্রীমতী হৈমবতী চট্টোপাধ্যায় উপাসনাদিতে ভাবোপযোগী সুমিষ্ট সঙ্গীত করিয়া, এবার উৎসবের সফলতা দান করিয়াছেন।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

ভাগ।
১১শ সংখ্যা।

১লা আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৩৪০ সাল, ১৮৫৫ শক, ১০৪ ব্রাহ্মাব্দ।
15th June, 1933.

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

জগতের হিতের জন্য, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও সদ্গতির জন্য, হে চিরকর্ম্মঠ দেবতা! তুমি যেমন চির ব্যস্ত, তেমনি আমরাও আমাদের পার্থিব ও অপার্থিব কোন বিষয়ে উদাসীন, অলস ও কর্ম্মবিহীন হইয়া থাকি, ইহা তুমি ইচ্ছা করনা। "এক দণ্ড দেয় না বসিতে, নাকে দ'ড়ি দিয়ে টানে মারে পিঠেতে।" এই বাক্য যে তোমার নবধর্ম্মবিধানে নববেদের বিশেষ অঙ্গ। তুমি আমাদিগকে সকল প্রকার উচ্চ কর্ত্তব্যে নিত্য কর্ম্মঠ করিয়া রাখিতে চাও। তোমার নববিধানের ধর্ম্ম পার্থিব ও অপার্থিব সকল প্রকার অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মকে আপনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছে। এখন আর তো "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা", এই বাক্যকে আমরা বেদবাক্য, শাস্ত্রবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। তোমার স্মরণ, মনন, পূজা, বন্দনা, ধ্যান, ধারণা যোগে আমাদিগের আত্মিক কল্যাণ-সাধন যেমন আমাদের পক্ষে নিত্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তেমনই যতদিন পৃথিবীতে আছি, জনসমাজে আছি, লোকমণ্ডলীর মধ্যে বাস করিতেছি, ততদিন তো আমাদের শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক, জাগতিক সকল প্রকার কর্ত্তব্যের জন্যও তুমি আমাদিগকে দায়ী করিতেছ। নিত্য উপাসনা বন্দনারূপ আধ্যাত্মিক ব্যাপারও তুমি আমাদিগকে স্বার্থপর হইয়া সুধু নিজের পরিত্রাণের জন্য সম্পাদন করিতে দেও না। আমি যতই ক্ষুদ্র হই না কেন, তোমার উপাসনা বন্দনা যেমন আমার নিজের কল্যাণের জন্য, তেমনই তাহা জগতের কল্যাণের জন্য, ইহা তোমারই ইঙ্গিত, তোমারই শিক্ষা। আমাদের পার্থিব কার্য্যগুলি, পার্থিব কর্ত্তব্যগুলি যদি নিজের ব্যক্তি-গত ও পরিবারগত ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সম্পন্ন হইতে গিয়া পরার্থকে আঘাত করে, তবে তো আমার মধ্যেই স্ববিরোধিতা উপস্থিত হইল। স্বার্থ ও পরার্থ, পরার্থ ও স্বার্থ যদি মিলিয়া মিশিয়া সকল বিষয়ে এক হইয়া যায়, তবেই দেখি, জীবনের উচ্চ তৃপ্তি ও শ্রেষ্ঠ সদ্গতি। তাই কাতরপ্রাণে তব চরণে প্রার্থনা, আমরা যেমন আধ্যাত্মিক ব্যাপারে স্বার্থপর হইব না, তেমনি পার্থিব ব্যাপারেও যাহাতে সকল কার্য্যব্যস্ততার মধ্যে, আমাদের নিজের ব্যক্তিগত, কি পরিবারগত সীমাবদ্ধ স্বার্থসিদ্ধির কোন কার্য্য দ্বারা পরার্থকে কোনরূপে আঘাত না করি; বরং আমাদের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল স্বার্থসিদ্ধিই যেন গূঢ় ভাবে পরার্থসাধনে, পরার্থহিতে পরিণত হয়, এবং সকল পরসেবা পরার্থসাধনও যেন আমাদের ব্যক্তিগত ও পরিবারগত মঙ্গল-সাধনেই পরিণত হইতেছে দেখিয়া

জীবনে শান্তি ও আনন্দ। তুমি এ বিষয়ে আমাদের সহায় হও।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

ধর্ম্মপিতামহ রাজা রামমোহন রায়ের স্বর্গারোহণের শতবার্ষিকী।

মহাত্মা রামমোহন যেমন জাতিবর্ণ ও ধর্ম্মসম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে মিলিত ভাবে ব্রহ্মোপাসনা সম্পন্ন করিবার জন্য সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গেলেন, তিনি যেমন এ দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে নব যুগের নব শিক্ষা-বিস্তারের পথ খুলিয়া দিলেন, দেশের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণসাধনে আত্মজীবন নিয়োগ করিলেন, তিনি যেমন ধর্ম্মনীতিক্ষেত্রে, রাজনীতিক্ষেত্রে, শিক্ষাক্ষেত্রে দেশের এবং দেশের সর্ব্বপ্রকার উচ্চ সংস্কারব্যাপারে আপনার স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন চেষ্টা, স্বাধীন কার্য্য দ্বারা জীবনের মহান্ আদর্শ সকলের জন্য রাখিয়া গেলেন, তেমনি আজ জাতি, বর্ণ, ধর্ম্মসম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে দেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোক মিলিত হইয়া, তাঁহার স্বর্গারোহণের শতবার্ষিক উৎসব যথোপযুক্তরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইবেন, আপনার দেশের মহাপুরুষের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান ও শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিবেন, ইহা অতি স্বাভাবিক ও প্রকৃত সভ্যতারই লক্ষণ। আমরা যদি এই মহাপুরুষের মহজ্জীবনের সর্ব্বপ্রকার মহৎ কার্য্যের গুরুত্ব প্রাণে ধারণ করিয়া উদ্বুদ্ধ না হই, তাহা হইলে আমরা প্রাণের ঐকান্তিক আগ্রহ, হৃদয়ের উচ্চ ভক্তি, অনুরাগ ও শ্রদ্ধা সেই মহাপুরুষের চরণে অর্পণ করিয়া, কি প্রকারে এই শতবার্ষিকীরূপ মহৎ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিতে পারিব?

তাঁহার জীবনের সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বোত্তম কার্য্য এবং জীবনব্যাপী প্রচেষ্টা ও সাধনার শেষ ফল সার্ব্বভৌমিক ভিত্তিতে এক অদ্বিতীয় নিরাকার পরব্রহ্মের পূজা-প্রতিষ্ঠা এবং সেই সার্ব্বভৌমিক ভিত্তির উপর ব্রাহ্ম-সমাজ বা নব ধর্ম্মসমাজের প্রতিষ্ঠা। আমরা দেখিতে পাই, তিনি নবযুগের মহাসম্মেলন-সংগঠন-ভাব-মূলক মহাধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিয়া, যে নবসমন্বয়ধর্ম্মের বীজ বপন করিয়া গেলেন, পরবর্ত্তী সময়ে সে ধর্ম্মবীজ ক্রমে কি মহা-ধর্ম্মবৃক্ষে পরিণত হইয়াছে এবং এখনও সে ধর্ম্মবৃক্ষ কেমন অনন্তবর্দ্ধনশীলতার সাক্ষ্য দান করিয়া ধীরে ধীরে আপনার নিয়তিনির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহা আমাদের এখন প্রতি জীবনেই দিব্য উপলব্ধির ব্যাপার এবং আমরা এখন প্রতি জীবনে তাহার দিব্য সাক্ষ্যও লাভ করিতেছি।

এই মহামানবের জীবন একটা পূর্ণতার দিক্, একটা পূর্ণতার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া গেলেন। শরীর, মন, হৃদয় ও আত্মা লইয়া মানবজীবন। অনেক সাধু মহাপুরুষ শরীর ও সংসারকে উপেক্ষা করিয়া, হৃদয়, মন ও আত্মার উন্নতির চেষ্টা করিয়াছেন। রামমোহন রায় শরীর, মন, আত্মার কোনটাকেই উপেক্ষা করেন নাই; ইহকাল ও পরকাল এই উভয় লোক লইয়া জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন কর্ত্তব্যের উচ্চ আদর্শ তিনি জীবনে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। শরীরের সম্পর্কে বলিতে গেলে, শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি তাঁহার পূর্ণ দৃষ্টি ছিল; তাঁহার মত বলিষ্ঠ দেহ সেই সময়ে বঙ্গভারতে কয়জনের ছিল? তিনি জানিতেন, দেহে প্রভূত বল না থাকিলে, পৃথিবীর উচ্চ কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইতে পারেনা। তিনি অতি বড় মনীষী ব্যক্তি ছিলেন; পৃথিবীর প্রচলিত প্রধান প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি কৃতিত্বের সহিত পাঠ ও আলোচনা করিয়া, তাহা হইতে প্রকৃত সত্য নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। তুলনা-মূলক ধর্ম্মশাস্ত্রের চর্চ্চা ও আলোচনার প্রবর্ত্তন তাঁহার জীবনের একটী প্রধান কীর্ত্তি। তাঁহার হৃদয় কত প্রশস্ত ছিল, কোমল ছিল, সহানুভূতিতে পূর্ণ ছিল, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ আমরা পাই, সতীদাহনিবারণকার্য্যে, দেশের মঙ্গলসূচক নানা-বিধ সদনুষ্ঠানে, সংস্কারকার্য্যে ও নবপ্রণালীতে ভারতে শিক্ষা-বিস্তারে, বিশ্বব্যাপী সকল জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনে স্বাভাবিক স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা-দর্শনে।

তাঁহার আত্মা সত্যধর্ম্মের অন্বেষণ, সত্যধর্ম্মের নির্দ্ধারণ ও সত্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে কি ব্যাকুলই ছিল, কি চেষ্টা-শীলই ছিল! ষোড়শবর্ষ বয়সে ধর্ম্মের অন্বেষণে বাহির হওয়া, দেশপর্য্যটন, পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার ধর্ম্মশাস্ত্র-গুলি পাঠ, আলোচনা, সাধনা ও ধর্ম্মের উচ্চ সিদ্ধান্তে সিদ্ধিলাভ তাঁহার আত্মার বিশালতার সাক্ষ্য দান করে। পার্থিব ও অপার্থিব সকল ব্যাপারে, মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য স্বাধীন ভাবে, মুক্ত জীবনে কিরূপে সম্পন্ন করিতে হয়, তিনি তাহা জীবনে আচরণে দেখাইয়া গিয়াছেন এবং

নবযুগপ্রবর্ত্তনার আদি ব্যক্তিরূপে তিনি তাঁহার বিশিষ্ট আদর্শ হইয়া রহিয়াছেন। সংক্ষেপে এইভাবে তাঁহার জীবনের পূর্ণতার আদর্শের দিক্ আমরা আলোচনা করিলাম। ধর্ম্মপিতামহ রামমোহন রায় সম্পর্কে ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া, আমরা আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধ শেষ করি।

"তাঁহাকে স্মরণ হইলে অন্তঃকরণে আর কোন বিষয় স্থান পায় না। অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতা-রসে আর্দ্র হয়, ভক্তি শ্রদ্ধাতে পূর্ণ হয়, শরীর রোমাঞ্চিত ও প্রেমাশ্রু বিনির্গত হয়। সেই পরমেশ্বর-পরায়ণ অসাধারণ আশ্চর্য্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই প্রথমে এ দেশে অজ্ঞান-বন ছেদন ও জ্ঞানাঙ্কুর-রোপণের পথ প্রদর্শন করেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল অন্বেষণ করিলে, তিনিই এই ব্রাহ্মসমাজরূপ সুরম্য বৃক্ষের মূল বীজ রূপে দৃষ্ট হয়েন। * * যাহাতে ভারতবর্ষের বিষম দুরবস্থা দূরীকৃত হয়, বিশেষতঃ কাল্পনিক ধর্ম্ম সকল নিরাকৃত হইয়া সৃষ্টি-স্থিতি-ভঙ্গ-কারণ একমাত্র অদ্বিতীয় নিরবয়ব পরাৎপর পরমেশ্বরের উপাসনা প্রচলিত হয়, তাহাই তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ও সমস্ত কার্য্যের উদ্দেশ্য ছিল। জননী জন্মভূমির দুঃখ-মোচনার্থ যেরূপ যত্ন করা কর্ত্তব্য, তাহা তিনিই জানিতেন এবং তিনিই করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার যত্ন ও চেষ্টা কি কেবল এই ক্ষুদ্র বঙ্গদেশের উপকার মাত্রে পর্য্যাপ্ত ছিল? তাঁহার স্বভাব যেমন উদার ও অভিপ্রায় যেমন মহৎ, তাঁহার কার্য্যও সেই প্রকার অসাধারণ। বেগবান্ সিন্ধুনদ, তুষারমণ্ডিত হিমালয় এবং আবা ও আসামের বনাকীর্ণ পর্ব্বতও তাঁহার জন্মভূমির সীমা ছিল না। তাঁহার জন্মভূমি পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ এই চতুর্ম্মহাসাগর দ্বারা আবদ্ধ ছিল। তিনি সমুদয় ভূমণ্ডলকে স্বকীয় দেশ, ভারতবর্ষকে গৃহস্বরূপ জ্ঞান করিতেন। * * * তাঁহাকে স্মরণ করিলে আমাদের নির্ব্বীর্য্যমনেও বীর্য্য সঞ্চার হয়, আশানিল প্রবল হয়, সাহস অতি বর্দ্ধিত হয়, উৎসাহানল প্রজ্বলিত হয়, শরীরের শোণিত দ্রুতবেগে সঞ্চলন করে এবং মনের ভাব ও রসনার শব্দ সকল চতুর্গুণ তেজ ধারণ করে। তিনি এই ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ না করিলে, কোথায় বা ব্রাহ্মসমাজ, কোথায় বা তত্ত্ববোধিনী, কোথায় বা ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা, কোথায় বা ব্রাহ্ম, কোথায় বা ব্রাহ্মধর্ম্ম থাকিত? * * * তিনি আমাদিগের হিতের নিমিত্ত, হৃদয়কপাট উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক দয়া-স্রোত প্রবল করিয়া, যে অপার উপকার করিয়াছেন, যে মহাধন প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহা কিরূপে পরিশোধ করিব? তিনি আমাদিগকে রজত দেন নাই, স্বর্ণ দেন নাই এবং হীরক বা মুক্তাফলও প্রদান করেন নাই বটে; কিন্তু তদপেক্ষা সহস্রগুণ, কোটিগুণ, অনন্তগুণ উৎকৃষ্ট অপূর্ব্ব রত্ন প্রদান করিয়া গিয়াছেন। সে রত্নের মূল্য নাই, জগতে তাহার উপমা নাই। যিনি আমাদের কল্যাণার্থ চির জীবন সমর্পণ করিয়া ছিলেন, তাঁহার ঋণ কিরূপে পরিশোধ করিব? তাঁহার উদ্দেশ্য কার্য্য অবলম্বন ও সম্পাদন করা ব্যতিরেকে এ ঋণ পরিশোধের আর উপায়ান্তর নাই।"

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বিচার ও ভালবাসা।

আমরা অন্যকে বিচার করি, আপনাকে করি না। আপনাকে কতই ক্ষমা করি। আপনার শত দোষ সত্ত্বেও কই তাহার বিচার করি? কিন্তু অন্যের একটু ক্ষুদ্র দোষ দেখিলেই, তাহার কতই বিচার করি! সাধুভক্তগণের স্বভাব ইহার ঠিক বিপরীত। তাঁহারা আপনার দোষের জন্য আপনাকে "সবসে বুরে' সর্ব্বাপেক্ষা মন্দ মনে করেন ও অন্যের দোষ ত্রুটী দেখিলে কৃপাপাত্র ভাবিয়া, মানবীয় দুর্ব্বলতাবশতঃ দোষ করিয়াছে, এই বলিয়া ক্ষমা করেন এবং ভালবাসিয়া তাহার জন্য প্রার্থনা করেন। আত্মবৎ অন্যকে মনে করিলে, আর বিচার আসে না, ভালবাসাই আসে।

বিচারের উপকারিতা।

কেহ যখন আমার বিচার করেন, তখন তিনি চান, আমি কেন দেবতার ন্যায় হইলাম না; সুতরাং আমার জীবনের উৎকর্ষ-বৃদ্ধির জন্যই বিচার করিতেছেন, ইহা ভাবিলে আমাদের উপকারই হয়। যিনি বিচার করিতেছেন, তিনি আমাকে ভালবাসিয়াই বিচার করিতেছেন, আমাকে আরো শুদ্ধ, আরো খাঁটী করিবার জন্যই তাহা করিতেছেন, ইহা ভাবিলে তাঁহার উপর বিরক্ত না হইয়া, কৃতজ্ঞ হইতে কি পারি না? কোন ব্যক্তি এক সাধুর সর্ব্বদাই বিচার বা নিন্দা করিত; তাহার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া সাধু কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন, "কে আমাকে তেমন করিয়া ধৌত করিবে?"

নববিধান হ'বে কবে ?

স্বার্থপর পৃথিবী চায়, আমি সুখে থাকি, আর সকলে দুঃখে থাকুক। ধার্ম্মিক চান, আমি সুখে থাকি, ভাইও সুখে থাকুন; আমি যদি দুঃখে থাকি, ভাইও দুঃখে থাকুন। কিন্তু নববিধান চান, আমি দুঃখী হই, তাহাতে ক্ষতি নাই; ভাই যেন সুখে থাকেন। এ বিধান কবে আসিবে জগতে ?

বিধানরাজ্য।

ভারতে ব্যবসায় করিতে আসিয়া ইংরাজ বণিকগণ এ দেশের রাজ্য লাভ করিলেন। বণিকের রাজ্যশাসন পাছে ব্যবসাদারী ব্যাপার হয়, তাই ইংলণ্ডেশ্বরী ভারতেশ্বরী হইয়া ইহার রাজ্য শাসন ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন এবং ইহার সুশাসনের ব্যবস্থা করিলেন। ধর্ম্মের নামেও ব্যবসাদারী যেন প্রত্যেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়েই প্রবল হইতেছে; ইহা দেখিয়াই স্বয়ং বিশ্বেশ্বরী পৃথিবীর ধর্ম্মরাজ্যের সুশাসন ও সুপরিচালনার ভার স্বহস্তে লইয়া, এই নববিধানের বিধি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ রাজ-রাজেশ্বরীর শাসনাধীনে এই বিধানরাজ্য পরিচালিত। এখানে কোন প্রকার মানবীয় ব্যবসাদারী প্রশ্রয় পাইবে না।

খাঁটী ও ভেজাল ধর্ম্ম।

খাঁটী জিনিষের দাম চড়া বলিয়া, ঠিক তাহার নকল করিয়া ভেজাল মিশাল জিনিষ বাজারে খাঁটী বলিয়া বিক্রয় হয় এবং দলে দলে লোক তাহা ক্রয় করে। সে সকল জিনিষের ক্রেতা-দের নানা প্রকারে অপকার হইলেও, সস্তায় পায় বলিয়া, কত জনেই তাহা ক্রয় করে এবং তাহাতেই তুষ্ট হইয়া থাকে। সত্য সত্যই তেমনি নববিধান যেমন আবির্ভূত হইল, অমনি ইহারই অনুরূপ করিয়া কতই সস্তার ধর্ম্ম বাজারে চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে। তাই নববিধানাচার্য্য সাবধান করিয়া দিয়া বলিলেন, 'বাজারে সকলেই ঝুটো জরি, ছেঁড়া ছেঁড়া শাস্ত্র, জলো দুধ, পচা দুধ বিক্রয় কচ্ছেন। আমি ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া ফেলি, আবার সকলে আনিয়া রাখিতেছেন। এখানে কেবল খাঁটী জিনিষ বিক্রয় হইবে। কৃত্রিম জিনিষ এখানে বিক্রয় হবে না। কোন ধর্ম্মভাব লাট হবে না।"

সাধু হীরানন্দ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সিন্ধুদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার শ্রীনবলরায় ও হীরানন্দের উদ্যমেই প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। তাঁহাদের স্বর্গীয় পিতার স্মৃতি কোনও লোকহিতকর কার্য্যে সংযোজিত করিয়া অমর করিবার আশায় বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত করিতে ইচ্ছুক হইলেন; কিন্তু তাহা অতি ব্যয়সাধ্য, সেইজন্য প্রথমে সেই উৎসাহ হইতে বিরত হইয়াছিলেন। পরিশেষে তাঁহার স্বর্গীয় পিতার প্রিয়তম বন্ধুর পুত্র দেওয়ান চণ্ডুমল, স্বীয় পিতার নাম সেই বিদ্যালয়ে সংশ্লিষ্ট থাকিলে তিনি অর্দ্ধেক ব্যয় বহন করিবেন, ইহাই জানাইলেন। উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্রের সৌজন্যে ও দানে, ৩রা ডিসেম্বর, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে, স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর তত্ত্বাবধানে, হাইদ্রাবাদে "সৌকিরাম ও চণ্ডুমল বালিকাবিদ্যালয়" প্রথম স্থাপিত হয়।

দেশে যাহাতে উচ্চশিক্ষার প্রচার ও প্রভাব বিস্তারিত হয়, ইহাই আলোচনা করিয়া সাধু হীরানন্দ ও নগেন্দ্রবাবু 'সিন্ধুসুধার' ও 'সিন্ধুটাইম্‌স্‌' নির্ভীকভাবে লিখিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের লেখার ফলে ও সিন্ধুসভার আন্দোলনে, ১৭ই জানুয়ারী, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে, স্বদেশ-প্রেমিক ও দানবীর শ্রীদয়ারাম জেঠমলের অর্থে সিন্ধুকলেজ স্থাপিত হয় এবং শ্রীদয়ারামের মৃত্যুর পর সেই মহাপুরুষের নাম এই কলেজে সংশ্লিষ্ট হইয়া ইহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিল।

ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, তৃষ্ণার্ত্তকে জলদান এবং পীড়িতকে অক্লান্ত সেবা ও শুশ্রূষা করা যাঁহার জীবনের লক্ষ্য, তাঁহার পক্ষে গৃহের এককোণে বসিয়া সংবাদপত্রের পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্বগ্রহণ অসম্ভব। কল্যাণময়ী কামনা কার্য্যে পরিণত করাই প্রকৃত কর্ম্মযোগীর মুখ্য উদ্দেশ্য। জীবনে যে ব্রত সাধু হীরানন্দ গ্রহণ করিয়াছেন, সে ব্রত পূর্ণ হইতেছে না দেখিয়া, তিনি "সিন্ধুসুধার" ও "সিন্ধুটাইমসের" সম্পাদকের পদ ত্যাগ করিয়া, চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য সংকল্প করিলেন।

অযত্নে, অচিকিৎসায় ও অপথ্যে স্ত্রীলোকদের দুঃখ, কষ্ট ও যন্ত্রণা দেখিয়া, শ্রীনবলরায় হাইদ্রাবাদে স্ত্রীলোকদের জন্য একটী হাসপাতাল নির্ম্মাণ করিবেন, ইহা সংকল্প করিলেন। সৌভাগ্য-ক্রমে সেই সময়ে ন্যাশনাল এসোসিয়েসনের পক্ষ হইতে লেডি ডাফরিণ ভারতের গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, প্রদেশে প্রদেশে স্ত্রীলোকদের হাসপাতাল স্থাপিত করিবার আশায়, ভারতবাসীর নিকট আর্থিক সাহায্য ও সহানুভূতির জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শ্রীনবলরায়ের আশা পূর্ণ হইল এবং জনসাধারণের মুক্তদানে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া, স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর তত্ত্বাবধানে স্ত্রীলোকদের হাসপাতাল স্থাপিত হইয়াছিল। সুশৃঙ্খল ও সুনিয়মে পরিচালনার ভার সাধু হীরানন্দের উপর ছিল এবং তিনি বিনা বেতনে কার্য্যাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিস্ এলবি ইহার প্রথম লেডি ডাক্তার হইয়া আসেন। তিনি অতি নিপুণা, বিচক্ষণা ও দয়াবতী লেডি ডাক্তার বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। সাধু হীরানন্দের অনুরোধে তিনি স্থানীয় দাইদিগকে ধাত্রীর কার্য্যে উত্তমরূপে শিক্ষা দিবার জন্য একটি ক্লাস খুলিলেন।

দীন দরিদ্রের সেবা ও দেশহিতকর কার্য্যে এতটা তিনি জড়িত ছিলেন যে, রাজনীতির চর্চ্চা, আন্দোলন ও তর্কবিতর্কে

যোগ দিবার তাঁহার অবকাশ ছিল না; কিন্তু মহামতি মিষ্টার এ, ও, হিউমের বিশেষ অনুরোধে তিনি সিন্ধুদেশে কংগ্রেসের প্রচার ও প্রভাব বিস্তারের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশনে সিন্ধুদেশের প্রতিনিধিরূপে কলিকাতা ও বোম্বাই কংগ্রেসে যোগ দিয়াছিলেন।

বাঙ্গালাদেশের ন্যায় সিন্ধুদেশেও কন্যার বিবাহ ও সামাজিক অনুষ্ঠানের উৎসব অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। কন্যার পিতা ও গৃহস্বামীকে দারিদ্রের করাল কবল হইতে রক্ষা করিতে হইলে সমাজসংস্কারের একান্ত প্রয়োজন, ইহাই চিন্তা করিয়া, সাধু হীরানন্দ এবং কতিপয় দয়ালু সমাজপতি এই সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে বিপুল আন্দোলন করিতে লাগিলেন। গভর্ণমেণ্টের সহায়তা ও সহানুভূতি পাইয়াও তাঁহারা কৃতকার্য্য করিতে পারেন নাই। কতকগুলি লোভী, স্বার্থপর ও ঈর্ষাপরায়ণ বৃদ্ধ সমাজপতির বিরুদ্ধতায় তাঁহার এই উদার অনুষ্ঠান সাফল্য-মণ্ডিত হইতে পারে নাই। শ্রীনভলরায় ও সাধু হীরানন্দ ইহাতে নিরাশ হইলেন না। একমাত্র তরুণদের নবীন অভিযানে, অন্ধকারময় কুসংস্কারপূর্ণ বৃদ্ধের সমাজকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া উষার অরুণ আলোতে উদ্ভাসিত করিতে সক্ষম হইবেন, সেই আশায় শ্রীনভলরায় ও সাধু হীরানন্দ স্কুল ও কলেজে জীবনের উচ্চ আদর্শের বিষয় বক্তৃতা দিয়া ছাত্রদের সহায়তা ও সহানুভূতির প্রত্যাশী হইলেন। গভর্ণমেণ্টের পরিচালিত স্কুলে এই প্রকার বক্তৃতা দিবার অনুমতি না পাওয়ায়, তাঁহারা নিজ ব্যয়ে "ইউনিয়ন একাডেমি" নামে একটি আদর্শ স্কুল ২৮শে অক্টোবর, ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত করিলেন। স্বার্থত্যাগী কর্ম্মীর সদনুষ্ঠান যে বিধাতার করুণায় পরিপুষ্ট হইয়া সাফল্যমণ্ডিত হইবে, ইহা ধ্রুবনিশ্চয়। বৃথা বাক্যব্যয়ে কালক্ষেপ করা কিংবা হৃদয়গ্রাহী উপদেশ দিয়া ক্ষান্ত হওয়া তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল না। তিনি ছিলেন প্রকৃত কর্ম্মযোগী, কর্ম্মজীবনের দ্বারা নিজের উচ্চ আদর্শ প্রচার করিতেন। দেশের আশা ও ভরসা তরুণদলকে সুশিক্ষা ও সুচরিত্রে সুশোভিত করিয়া, দেশমাতৃকার পূজার নিয়োজিত করা বিপুল কষ্টসাধ্য ও বহুবাধাবিঘ্নপূর্ণ, ইহা জানিয়াও তিনি নিরাশ হইলেন না। ইউনিয়ান একাডেমির সমস্ত ভার তিনি নিজস্কন্ধে লইলেন। বিধাতার পুণ্যপ্রতিষ্ঠা ভক্তের হৃদয়ের দানে পরিপুষ্ট হইয়া মনোরম হয়। বিধাতার আশীর্ব্বাদই ইউনিয়ান একাডেমির ভিত্তি, প্রকৃত ভক্তের সমাবেশে তাহা পূর্ণ হইবেই। সাধু হীরানন্দের একই ভাবের ভাবুক, একই পথের পথিক, ত্যাগী ও চরিত্রবান প্রিয়সখা তাঁহাকে এই মহৎ কার্য্যে সাহায্য করিতে আসিলেন। সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী আকুমার ব্রহ্মচারী শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি ভবিষ্যতে শ্রীব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় নামে সর্ব্বজনবিদিত ও সর্ব্বজনপূজ্য ছিলেন, তিনি সংস্কৃত শিক্ষক হইয়া আসেন। মদীয় পূজ্যপাদ সাধু টি, এল, ভাস্বানি তাঁহারি ছাত্র। আমি তাঁহার নিকট শুনিয়াছি যে, শ্রীব্রহ্মবান্ধব যে শুধু সংস্কৃতেই অগাধ পণ্ডিত ছিলেন, তাহা নহে; তিনি ইংরাজি সাহিত্যে, গণিত এবং বিজ্ঞানশাস্ত্রেও অসাধারণ ছিলেন। তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যেও অসাধারণ বিশেষত্ব ছিল। জ্যামিতি ও বীজগণিত অনেক ছাত্রের নিকট বোধগম্য হইত না, সেইজন্য অনেক ছাত্র জ্যামিতি ও বীজগণিত পাঠে অবহেলা করিত। তাহাই দেখিয়া শ্রীব্রহ্মবান্ধব গণিত-শিক্ষারও ভার নিজ স্কন্ধে লইয়াছিলেন এবং গল্পচ্ছলে ও নানাবিধ সহজ উদাহরণ দ্বারা এমন জটিল অবোধগম্য শিক্ষা ছাত্রদের বোধগম্য করিয়া দিতেন, যাহাতে ছাত্রদের জ্যামিতি ও বীজগণিতপাঠে আশ্চর্য্য উৎসাহ দেখা দিয়াছিল।

শ্রীব্রহ্মবান্ধবের সহিত শ্রীকেশবচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীনন্দলাল সেন (ভুলুবাবু) এবং সিন্ধুদেশবাসী গভর্ণমেণ্টের উচ্চপদাভিষিক্ত পৃথ্বীদাস অর্থ ও সম্মানের প্রলোভনের মোহে মোহিত না হইয়া, নিজ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হীরানন্দের সহকর্ম্মী হইয়াছিলেন। বিষ্ণুর শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মের ন্যায় এই চারিটি বিরাট শক্তি ইউনিয়ান একাডেমির সম্মান, সমৃদ্ধি ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়া সিন্ধুদেশের গৌরবভাজন হইয়াছেন।

বিধাতার নিজ হাতে গড়া ধর্ম্ম—সত্য, সুন্দর ও শাশ্বত; কিন্তু মানুষের নিজ হাতে গড়া সমাজ অবিনশ্বর হইতে পারে না। যুগে যুগে তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কালোপযোগী প্রচণ্ড প্রবাহে অতীতের জীর্ণ অনুষ্ঠান ভাসিয়া গিয়া নূতনের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। সাধু হীরানন্দ দেখিলেন যে, পরাধীন ভারতবাসীর পক্ষে প্রাণহীন, নির্জ্জীব সমাজের অনুষ্ঠান কখনই আশাপ্রদ নহে। অতীতের পরিবর্ত্তন, নূতনের প্রবর্ত্তন সাধু হীরানন্দের উদ্দেশ্য ছিল। প্রচলিত আচার অনুষ্ঠান স্বদেশবাসীর স্বাধীনতা-লাভের মঙ্গলদায়ক নহে। মাতৃজাতিকে গৃহের দাসী না করিয়া, গৃহলক্ষ্মী বীরপ্রসবিনী করিতে হইবে। যেখানে ঘরে বাহিরে অন্ধকার, ও যেখানে পরাধীনতার কারাগার, সেখানে স্বাধীনতার অরুণ আলোক কি প্রকারে উদ্ভাসিত হইবে? দেশের দুঃখ দারিদ্র্যের কথা, দেশের পরাধীনতার কাহিনী শুনিয়া শুধু পুরুষেরাই স্বাধীনতার সমরের জন্য প্রস্তুত হইলে হইবে না, নারীদেরও সে অধিকারলাভে উদ্বোধিত করা নিতান্ত প্রয়োজন, এই ভাবিয়া সাধু হীরানন্দ শুধু নারীশিক্ষা-বিস্তারের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন নাই, দেশের সংবাদ যাহাতে তাঁহাদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে, সেই আশায় দেশীয় ভাষায় লিখিত "সরস্বতী" এবং "সুধার পত্রিকা" নামক দুইখানি মাসিক পত্রিকার প্রবর্ত্তন এবং বহুল প্রচারের জন্য উদ্যোগী হইলেন। সাধু হীরানন্দ আশাতীত ফল পাইলেন, বহু গৃহে এই দুখানি পত্রিকা সমাদৃত হইল। পত্রিকার উপদেশানুযায়ী সদনুষ্ঠানের আশাপ্রদ সংবাদ পাইয়াছিলেন। নারীর নারীত্ব ফুটাইয়া তুলিয়া, দেশমাতৃকার এবং জগন্মাতার সেবার জন্য নিদ্রিত সিন্ধুদেশে নারীজাগরণের ক্ষীণ শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে পঁহুছাইয়া তাঁহাকে উৎফুল্ল করিয়াছিল। সেই ক্ষীণশব্দই আজ আশার দুন্দুভি বাজাইয়া স্বাধীনতার অরুণ

আলোকের আবাহন গাহিতেছে।

বিধাতার আহ্বান সাধু হীরানন্দকে কখনও নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করিতে দেয় নাই। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে আগষ্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে প্রচণ্ডবেগে বিসূচিকা যখন হাইদ্রাবাদকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইল, তখন সাধু হীরানন্দ কতকগুলি স্বার্থত্যাগী সেবা-পরায়ণ যুবককে লইয়া, যমের করাল কবল হইতে অসংখ্য রোগীকে বাঁচাইতে পারিয়াছিলেন। দিবারাত্রি অক্লান্ত সেবায় ও শুশ্রূষায় মুমূর্ষের শীর্ণ বিবর্ণ অধরেও জীবনের ক্ষীণ রেখায় হাসিটি ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। বিধাতার আশীর্ব্বাদ, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণ যুবকদলকে অবলম্বন করিয়া, তিনি এই প্রচণ্ড মহামারীর নিদারুণ ধ্বংসের অভিযানকে প্রতিরোধ করিতে পারিয়াছিলেন। এই সেবাপরায়ণতার মহান্ আদর্শ তুলিয়া ধরিয়া, যুবকদিগকে দেশের ও দশের সেবায় উদ্বোধিত করিয়াছিলেন। সেই আদর্শে আদর্শিত জীবন লক্ষ্য করিয়া, অসংখ্য যুবক আজ যে কোনও মহৎ ও পবিত্র কার্য্যে সহাস্য-বদনে জীবন উৎসর্গ করিতেছে।

দেশবিদেশে ভ্রমণের অভিজ্ঞতালাভে এবং বিদেশীর সহিত হৃদয়ের আদান প্রদানে শিক্ষা ও প্রচারের উপকারিতা ভাবিয়া, তিনি তাঁহার একটি অন্তরঙ্গ বন্ধুর সহিত দেশভ্রমণে বাহির হইলেন। পথের নেশা তাঁহাকে পাগল করিয়াছে, সুদূর পথের মোহন ছবি তাঁহাকে ঘরছাড়া করিয়াছে। পথের দুই-ধারে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু প্রস্ফুটিত জীবনের আদর্শ খুঁজিয়া পাইলেন, তাহাই তিনি মধুকরের ন্যায় সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে দেশবিদেশে ঘুরিতে ঘুরিতে অনেক সাধু এবং পণ্ডিতের সহিত আলাপ পরিচয়ে তৃপ্তি লাভ করিয়া, অতুল আনন্দ পাইয়া, পরিশেষে বাঁকীপুরে আসিয়া প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীগুরুপ্রসাদ সেনের আতিথ্য গ্রহণ করেন। দুই জন উন্নত-মনা ব্রাহ্মমহিলার তত্ত্বাবধানে একটি বালিকাবিদ্যালয়ের সুশৃঙ্খলা-পূর্ণ পরিচালনার কার্য্যকলাপ দেখিয়া, তিনি এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহার দুইটি কন্যাকে এই দুইটি উন্নতমনা মহিলার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া সৎশিক্ষায় শিক্ষিত করাইবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসের প্রথমেই তাঁহার দুইটী কন্যাকে সিন্ধুদেশ হইতে বাঁকিপুরে আনিবার পথে লাহোরে কন্যাদুটী অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার প্রিয়বন্ধু শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রমথলাল সেন মহাশয়ের এবং নিজের অক্লান্ত সেবা ও শুশ্রূষার গুণে কন্যাদুটী শীঘ্র সুস্থ হইয়া সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিলেন। ইহার কয়েক দিন পরে, ২০শে জুন, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে, সামান্য অসুস্থতা সত্ত্বেও, তিনি তাঁহার কন্যাদুটীকে লইয়া বাঁকিপুরে আসিয়া ভক্ত প্রকাশচন্দ্র রায় মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। তাঁহার কন্যাদুটীকে তাঁহারি আশ্রয়ে রাখিয়া শীঘ্র তিনি হাইদ্রাবাদে ফিরিবেন, ইহাই মনস্থ করিলেন। বিধাতার ইচ্ছা মানুষের চিন্তার অগম্য। বাঁকীপুরে তাঁহার রোগবৃদ্ধি হইল—দিবারাত্রি দীন দুঃখী ও রোগীর সেবায় এবং ভগবৎ-করুণার প্রচারকার্য্যে অদম্য পরিশ্রমে তিনি এতটা শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়ায়, যেন বিশ্বজননী তাঁহার পরিশ্রান্ত সন্তানকে আপন ক্রোড়ে ফিরাইয়া লইয়া চির বিশ্রাম দিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। দিন দিন রোগবৃদ্ধি হইতে লাগিল। বাঁকীপুরের প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার শ্রীপরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার রায় বাহাদুর সূর্য্যনারায়ণ সিংহ, ভক্ত প্রকাশ-চন্দ্র রায়ের পরিবারবর্গের এবং বন্ধুবান্ধবদের ঐকান্তিক সেবা ও শুশ্রূষা উপেক্ষা করিয়া, কঠিন টাইফয়েড রোগের অসহ্য যন্ত্রণা ও অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া, জীর্ণ ও পরিশ্রান্ত হীরানন্দ ১৪ই জুলাই, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে, বেলা ১১টায় বিশ্বজননীর কোমল ক্রোড়ে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন।

সিন্ধুদেশের ধ্রুবতারা, স্বদেশের চিরভক্ত, দীনদুঃখীর নিত্য-সঙ্গী, ব্রাহ্মধর্ম্মের অক্লান্ত প্রচারক, কংগ্রেসের দীন সেবক, ভগবানের প্রিয়ভক্ত, ভারতমাতার আশার মঞ্জরী মুকুলেই ঝরিয়া পড়িল। নিজের জীবনের মধ্য দিয়া যে বৈভব তিনি দেশবাসীকে দিয়া গিয়াছেন, সেই অমূল্য সম্পদ, দীন দুঃখীর সেবাপরায়ণতা, দেশমাতৃকার পূজাবেদীতে জীবন উৎসর্গ করিবার অমিত উৎসাহ পাইয়া, তাঁহার দেশবাসী আজ আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেছেন এবং কৃতজ্ঞতায় আনম্র নতশিরে প্রণাম করিয়া ভক্তির পুষ্পাঞ্জলিতে তাঁহার স্মৃতিমন্দির পরিপূর্ণ করিতেছেন।

শ্রীঅমরেশচন্দ্র সিংহ (এ্যাড্‌ভোকেট, পাটনা)।

সমবেত ব্রহ্মোপাসনা।

আর্য্য ঋষিরা চিরদিন একাকী সাধন ভজন করিয়াছেন। নৈমিষারণ্যে দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞে শনক সনাতনাদি ঋষিগণ একত্র মিলিয়া হরিকথা-শ্রবণে বিমলানন্দ লাভ করিলেও, তাঁহাদের ব্যক্তিগত অর্চ্চনা বন্দনাদি একাকীই ছিল। মানবজাতির ধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, সমবেতভাবে ঈশ্বরোপাসনা প্রথমে হজরত মুসা প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁহার নিজের বক্তৃতা করিবার শক্তি ছিল না; কিন্তু তিনি ঈশ্বরা-দেশে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা এয়েরণকে য়িহুদীদিগের প্রথম আচার্য্য নিযুক্ত করেন। এয়েরণ ৪০ বৎসর কাল আচার্য্যের কার্য্য করিয়া য়িহুদীদিগকে সমবেত উপাসনা শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই সমবেত উপাসনা য়িহুদীরাজ দায়ুদের সময় অত্যন্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। দায়ুদ স্বয়ং সঙ্গীত রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার স্বরচিত ঈশ্বরের করুণা এবং মহিমা-সূচক সঙ্গীত (যাহা অদ্যাপি সভ্যাসভ্য বিবিধ জাতির মধ্যে প্রবর্ত্তিত) তিনি সর্ব্বসাধারণের সহিত মিলিত হইয়া কীর্ত্তন করিতেন এবং প্রেমে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতেন। দায়ুদের পুত্র সলিমানের রাজত্ব-কালে জেরুজালম নগরে সমবেত উপাসনা জন্য মন্দির নির্ম্মিত

হয়। এই মন্দিরে য়িহুদী উপাসকগণ দৈনিক উপাসনার জন্ত মিলিত হইতেন কি না, বলিতে পারা যায় না। তবে মক্কা নগরস্থ কাবামন্দিরে উপাসকগণ যে দৈনিক উপাসনাতে মিলিত হইতেন এবং এখনও হন, তাহার প্রমাণ করিতে যত্ন করা নিষ্প্রয়োজন। কথিত আছে, এই কাবামন্দির মহাপুরুষ এব্রাহিম কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এখানে অতি প্রাচীন কাল হইতে সমবেত উপাসনা হইয়া আসিতেছে। এব্রাহিম একজন য়িহুদীবংশীয় পরাক্রমশালী ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তৎপ্রতিষ্ঠিত কাবামন্দিরে কালক্রমে অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। হজরত মহম্মদ মক্কাজয়ের পর ঐ মন্দিরে পুনরায় এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সমবেত উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মহম্মদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সমবেত উপাসনা এক্ষণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশপ্রদেশবাসী ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে প্রবর্ত্তিত দেখা যায়। জুম্মা (শুক্র)বারের সমবেত উপাসনা একটী মহাব্যাপার।

ব্রাহ্মসমাজ এই সমবেত উপাসনার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যাঁহারা এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারা একপ্রাণ একহৃদয় হইয়া সমস্বরে মিলিতভাবে পরমেশ্বরের অর্চনা বন্দনা করিবেন, ভূমিসাৎ হইয়া বিনীত ভাবে নমস্কার করিবেন, এই জন্যই ব্রাহ্মসমাজ এবং পবিত্র ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ধর্ম্মপিতামহ রাজর্ষি রামমোহন সমবেত ব্রহ্মোপাসনার উপযোগিতা জীবনের প্রথম হইতেই অতি গভীরভাবে পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। এই জন্য তিনি খৃষ্টীয় গির্জ্জাতে গিয়া একেশ্বরবাদীদের সঙ্গে মিলিত ভাবে উপাসনাতে যোগদান করিতেন। এই খৃষ্টীয় ভজনালয়ে গমনের পথেই ব্রহ্মোপাসনার জন্য ব্রহ্মবাদীদের স্বতন্ত্র মন্দিরের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এবং সেই প্রস্তাবই কার্য্যে পরিণত হইয়া, কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-মন্দির জোড়াসাঁকোতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাজর্ষি রামমোহন মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া আচার্য্যের পদে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে নিয়োগ করেন এবং অল্পকাল মধ্যেই ইংলণ্ডে চলিয়া যান। সামাজিক সমবেত উপাসনা তৎকালে কি আকারের ছিল, তাহা এখানে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-প্রণালী পূজ্যপাদ প্রধান আচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের যোগবল এবং ব্রহ্মানন্দসম্ভোগের ফল, তাহা বলিলে অধিক কিছু বলা হয় না। মহর্ষি স্বীয় প্রাণে অনন্তের জন্য অদম্য স্পৃহা লইয়া, আশা ও বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে হিমালয়ে চলিয়া যান। এবং তথায় আর্য্যঋষিদের ন্যায় একাকী নির্জ্জনে বসিয়া ব্রহ্মধ্যান করিতে করিতে, ব্রহ্মকৃপাগুণে মনে প্রাণে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হন। কিন্তু ঋষিদিগের ন্যায় হিমালয়বাসী হইয়া তিনি অবিরাম ব্রহ্মানন্দরসপানে মজিয়া থাকিবেন, ইহা তাঁহার জীবনের নিয়তি ছিল না। ব্রাহ্মসমাজের সমবেত উপাসনাতে তাঁহার যে বিশেষ কার্য্য ছিল, তাহা তিনি স্বয়ং স্বীয় অন্তরে পরিগ্রহ করিতে না পারিলেও, দেবালোকে (Inspiration) তিনি তাহা পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হইলেন। একদা তিনি পাহাড়ের নিম্নস্থ ক্রতগামী জলস্রোতের নিকট বসিয়া ঝরণার স্রোত নিরীক্ষণ করিতে করিতে ঈশ্বরাদেশ প্রাপ্ত হইলেন—"এই স্রোত যেমন নিম্নগামী এবং নিম্নগামী হওয়াতেই ইহা পৃথিবীর অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া সাগরজলে মিলিত হইতেছে, তদ্রূপ তোমাকেও বঙ্গদেশে গিয়া তাহার কল্যাণ সাধন করিতে হইবে।" এইরূপে মহর্ষি প্রত্যাদিষ্ট হইয়া কলিকাতায় আসিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন

চয়ন।

(স্বর্গগত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের "Heart Beats" হইতে গিরিধির শ্রীযুক্ত ডি, এন্, মুখার্জি কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

Prayer—হে অনির্ব্বচনীয়, আমি তোমার নিকট অসীমতা প্রার্থনা করিতেছি। তুমি আমার বুদ্ধি হও, তুমি আমার প্রেম হও, দিন দিন তুমি আমার মধ্যে বর্দ্ধিত হও এবং আমাকে অধিকার কর। তুমি বিবেকরূপে আমার জীবনের বন্ধনরজ্জু হইয়া আমাকে তোমার পথে রক্ষা কর। গত কল্য যেখানে ছিলাম, যেন আজ সেখান হইতে আরও কিছু দূর তোমার দিকে অগ্রসর হইতে পারি।

Communion—যখন তোমার সহিত যোগে যুক্ত হই, সেই পরম মুহূর্ত্তে আমি রাজাধিরাজ। সেই মুহূর্ত্তের কি গভীর শান্তি, কি অপূর্ব্ব মহিমা! সর্ব্বত্র তুমি, সকল বস্তুতে তুমি, বাহিরে তুমি, অন্তরে তুমি! তোমার আবির্ভাবে ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত; কিন্তু তোমার পরিপূর্ণ মহিমা আমার আত্মাতে। আমার সমুদয় হৃদয় মন তোমার পূজা ও বন্দনা করে, তোমার চরণে আত্মদান করে, তোমাকে সত্যরূপে দর্শন করে।

যোগের কি মত্ততা! কি বিহ্বলতা! ইহাতে চেষ্টা নাই, কষ্ট নাই, পরিশ্রম নাই। ইহা সহজ। ইহা কেবল সহজে তাঁর মধ্যে নিমগ্ন হওয়া। ইহাতে পরিপূর্ণ আত্মবিস্মৃতি, ইহাতে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ।

Test of the Ideal—আদর্শের পরীক্ষা—তুমি যাহাকে সত্য বলিতেছ, তাহা যদি বাস্তবিকই সত্য হয়, তবে প্রতিদিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারের মধ্যেও তাহা তোমার জীবনের ভিত্তি হইবে। যদি জীবনের ঘটনার সহিত তোমার আদর্শের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, জানিও যে, তোমার আদর্শ কল্পনা মাত্র। এই মিথ্যা আদর্শকে পরিহার করিয়া, সত্য আদর্শের সন্ধানে অগ্রসর হও।

Sanctity—পাপ আবার কি? পাপ সামগ্রীটা স্বপ্নমাত্র —এই কুসংস্কারকে মন হইতে দূর করিয়া দাও। আবার ভগবানের ন্যায়বিচারের সহিত যে প্রেম ও ক্ষমার সামঞ্জস্য অসম্ভব, এই কুসংস্কার আরও ভয়ানক; এই কুসংস্কারকেও মন হইতে উন্মূলিত কর। তাঁহার প্রেম ও ক্ষমা যেমন সত্য, পাপের শাস্তি তেমনি অবশ্যম্ভাবী। অনন্ত ন্যায় ও অনন্ত প্রেমের গূঢ়-তত্ত্ব আমাদের বুদ্ধির অতীত। কাহার প্রতি কিরূপ শাস্তি বিধান করিবেন এবং কখন কি পরিমাণে সেই শাস্তি দিবেন, তাহা তিনি জানেন। তিনি জানেন, কাহার মাথায় অক্ষয় পুণ্য মুকুট স্থাপন করিবেন। তোমার সম্বন্ধে এই বিধি যে, জ্ঞাতসারে পাপ ও মলিনতার পথে পদার্পণ করিও না।

Asceticism—অনশন, ছিন্নবস্ত্র এবং কৃচ্ছ্রসাধন প্রকৃত বৈরাগ্য নহে। ভগবান্ জীবনে যে রোগ শোক, দুঃখ দারিদ্র্য বিধান করেন এবং লোকের নিকট হইতে সেবার পরিবর্ত্তে যে তাচ্ছিল্য ও অকৃতজ্ঞতা প্রাপ্ত হও, তাহা প্রসন্নমনে বহন করাই প্রকৃত বৈরাগ্য। ঘৃণা, বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসাকে মন হইতে দূর করিয়া দাও। সকল প্রকার সাংসারিক সুবিধার লোভ পরিত্যাগ করিয়া, মানুষকে ভালবাস ও মানুষের সেবা কর— ইহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈরাগ্য আর কিছুই নাই।

—০—

সার্ব্বভৌমিক নবদেবালয়।

(৫ই মাঘ, মাঘোৎসবে, উদ্বোধনের দিনে, সন্ধ্যা ৬টায়, ভবানীপুর ব্রাহ্মসম্মিলনসমাজে নিবেদনের মর্ম্ম)

ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে বিশ্বজননী সবাইকে ডাকেন, সবাইকে স্পর্শ করেন। এই স্পর্শে সবাই পাপ তাপ, শোক দুঃখ, অপমান নির্য্যাতন ঝাড়িয়া ফেলিয়া, শক্তিশালী হইয়া উঠে। মায়ের মধ্য দিয়া, মায়ের চক্ষু পাইয়া সবাইকে না দেখিলে যে দেখা হবে না, মা স্বয়ং চিনাইয়া না দিলে যে আমরা চিনিতে পারিব না। নিজের খালী চক্ষে এত দিন মায়ের পুত্র কন্যাদিগকে দেখিতে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পাই নাই, অথবা ভুল দেখিয়াছি। লোকেরা মাকে চিনেনা বলিয়া, ভাইবোনকেও চিনিতে পারে না; তাই উচ্চ নীচ, স্পৃশ্য অস্পৃশ্যের সৃষ্টি করিয়া, ঘৃণা অহং-কারের সৃষ্টি করিয়া, মায়ের বিস্তৃত প্রাঙ্গণকে বেড়া দিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে। আজ ব্রহ্মোৎসবের শঙ্খ বাজাইয়া ইহপরলোকের সবাইকে আহ্বান করিতেছি। এস স্বর্গের দেবতারা সাধুরা, তোমরাই ত সবাই ব্রহ্মের উপাসক উপাসিকা, আমাদের বড় ভাই বোন। তোমরা না আসিলে, কে আমাদিগকে স্বর্গের পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে? সাক্ষাৎ ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করিলে প্রত্যেক মানব বুঝিতে পারে, সে বিশ্বব্রহ্মের পুত্র কন্যা। যে আপনাকে ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া বুঝিতে পারে, কে তাহাকে খাট করিবে? কে তাহাকে অস্পৃশ্য করিবে? কে তাহাকে তাহার জন্মগত অধিকার স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিবে? আজ উৎসব-মন্দিরে ঈশ্বর সবাইকে ডাকিয়া বলিতে-ছেন—ওরে আমার পুত্র কন্যা, কে কোথায় আছ, এস, আমার প্রিয় কার্য্য সাধন কর। যাহারা আমার নাম শুনিয়াছ, আমার স্পর্শ অনুভব করিয়াছ, যাও তারা আমার অজ্ঞান সন্তানদের মধ্যে, শুনাও আমার নাম সবাইকে। যাহারা উঠিতে পারে না, সামান্য একটু সাহায্যের প্রার্থী, প্রসারণ কর সাহায্যের হস্ত তাহাদের জন্য। যার যতটুকু শক্তি আছে, সে ততটুকু কর। যার অর্থ আছে, সে অর্থ দাও; যার সময় আছে, সে সময় দাও; যার অর্থ ও সময় নাই, সে শুধু আপনার সদিচ্ছা ও সচ্চিন্তাদ্বারা অসমর্থকে উত্তোলন করিতে সাহায্য কর।

পৃথিবীর ক্ষুদ্র মন্দিরে সসীম দেবতা স্থাপন করিয়া, তথাকথিত উচ্চ বর্ণের লোকেরা হরিজন বা তথাকথিত অস্পৃশ্যদিগকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিতেছেনা। তোমরা যাইয়া তাহা-দিগকে বল, এস ভাই, এস বোন, বিশ্বজননী তোমাদের জন্য বিশাল মন্দিরে, অসীম অনন্ত যিনি, তিনি আপনি আসিয়া বসিয়া-ছেন, সবার পূজা গ্রহণ করিতে এবং সবাইকে স্পর্শ করিতে। এ মন্দিরে সকলের প্রবেশের ও পূজা করিবার সমান অধিকার। এখানে মা স্বয়ং নরনারীনির্ব্বিশেষে সকলের নিজ হস্তের পূজা গ্রহণ করিতেছেন, স্বহস্তে পাপের ময়লা ঝাড়িয়া পুণ্যের বসন পরাইয়া কোলে তুলিয়া লইতেছেন। তথাকথিত ছোট জাতি বা অস্পৃ-শ্যের স্পর্শে পার্থিব ক্ষুদ্র মন্দিরের সসীম দেবতা অশুচি হইয়া যায়; কিন্তু এখানে মাকে স্পর্শ করিলে মা অশুচি হন না, বরং মায়ের স্পর্শে অশুচি শুচি হয়, অস্পৃশ্য সাধু ও দেবতা হইয়া যায়। দেব-পূজা করিয়া, দেবতাকে স্পর্শ করিয়া যদি অশুচি শুচি না হয়, পাপীর পাপক্ষয় হইয়া পুণ্যবান্ না হয়, অস্পৃশ্য ব্রাহ্মণ ও দেবতা না হয়, তবে সে দেবতার পূজা করিয়া কি লাভ? যুগ যুগ ধরিয়া শূদ্রেরা, অস্পৃশ্যেরা পুরোহিত বা মধ্য-বর্ত্তীর সাহায্যে দেবপূজা করিয়া আসিয়াছে; কিন্তু কাহারও অস্পৃশ্যতা, শূদ্রতা বা অশুচিতা দূর হইল না। যে যেখানে ছিল, ঠিক সে সেইখানেই পড়িয়া আছে, এক চুল প্রমাণও কেহ অগ্রসর হয় নাই। একজন ক্ষুধিত তৃষিত হইলে, অন্য জন আহার পান করিলে যেমন ক্ষুধিত তৃষিতের ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ হয় না, তেমনি ধর্ম্মের জন্য একজন ব্যাকুল হইলে, অন্য জন তাহার হইয়া দেবতার পূজা করিলে, ব্যাকুল আত্মার তাহাতে তৃপ্তি হয় না, ধর্ম্মলাভও হয় না। যুগে যুগে মা তাঁহার ধার্ম্মিক বীর সন্তান-দিগকে পাঠাইয়া, স্বাধীন ও সাক্ষাৎ ভাবে মায়ের পূজা করিবার বিধি প্রদান করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র নিরাকার একেশ্বরবাদের পতাকা-তলে যে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের বা নববিধানের কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাতে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সকল সত্যের, সকল ধার্ম্মিক লোকের, সকল জাতির স্থান রহিয়াছে। মহাত্মা গান্ধীজ

এই নববিধান বা সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের বিধানের অন্তর্গত হইয়া আপন মনে ঐকান্তিক যত্নের সহিত, ভগবৎ-নির্দ্দিষ্ট কাজ করিয়া যাইতেছেন।

মুষ্টিমেয় উচ্চবর্ণের লোক যদি লক্ষ লক্ষ হরিজনদিগকে সীমাবদ্ধ দেবতার ক্ষুদ্র মন্দিরে প্রবেশ করিতে বা দেবতাকে ছুঁইতে না দেয়, না দিক; তাহাতে ক্ষতি নাই। হে ধর্ম্মের জন্য ক্ষুধিত তৃষিত ভাই বোন, যেওনা তোমরা সে মন্দিরে। সে মন্দির পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া, সবাই মিলে নিরাকারা বিশ্বজননীর পূজার মন্দির নির্ম্মাণ কর। সে মন্দিরে অশরীরী অনন্ত জগন্নাথকে ও জগজ্জননীকে প্রতিষ্ঠিত কর। সবাই মিলে সাক্ষাৎভাবে তাঁর পূজা করিতে, তাঁকে দেখিতে চেষ্টা কর। "যেই খানে ভক্তবৃন্দ, সেইখানে ভগবান্।" বিশাল অনন্ত দেবতা তীর্থস্থান, মন্দির, গির্জ্জা বা কোন স্থান কালে আবদ্ধ হইতে পারেন না। তিনি প্রত্যেক মানবের হৃদয়মন্দিরে নিত্য বিরাজিত রহিয়াছেন। উপাসক উপাসিকা যেখানেই তাঁর পূজা করিতে বসিবে, সেখানেই তিনি ভক্তবৃন্দ লইয়া পূজারীর পূজা গ্রহণ করিতে উপস্থিত হইবেন।

পাপী তাপী অস্পৃশ্য সবাই স্বর্গীয় মায়ের সন্তান। সন্তানের স্পর্শে মা অপবিত্রা হইতে পারেন না, মায়ের স্পর্শে সন্তানের অপবিত্রতা, পাপ, তাপ, ব্যাধি সব দূর হইয়া যায়। স্পর্শকারী সন্তান সাধু ও দেবতা হইয়া উঠে। এই মন্দিরের বিদ্যুদালোকের বাল্‌বের অভ্যন্তরস্থ কৃষ্ণবর্ণ লৌহ তার বিদ্যুতের কারেন্টের স্পর্শে যেমন উজ্জ্বল লাল বর্ণ হইয়া উঠিয়াছে ও মন্দিরের অন্ধকার দূর করিয়া আমাদিগকে উজ্জ্বল আলো প্রদান করিতেছে, মলিন অঙ্গার যেমন আগুনের স্পর্শে মলিনত্ব পরিত্যাগ করিয়া টক্ টকে্ লাল উজ্জ্বল হইয়া উঠে এবং আলো ও উত্তাপ প্রদান করে, তেমনি প্রতি মানবাত্মা বাল্‌বের অভ্যন্তরস্থ কৃষ্ণবর্ণ লৌহ তার কিম্বা মলিন অঙ্গার সদৃশ, স্বয়ং ভগবান্ ইলেকট্রিককারেন্ট বা অগ্নিসদৃশ, তাঁর স্পর্শে মানবাত্মা পাপ-তাপ-মুক্ত হইয়া সুন্দর উজ্জ্বল পুণ্যবান্ হইয়া উঠিবে ও পৃথিবীতে পুণ্যের আলো ও উত্তাপ প্রদান করিয়া অন্ধকারময় হিমশীতল বহু মানবাত্মাকে আলো ও উত্তাপ প্রদান করিবে। তার বা অঙ্গার কারেণ্ট বা আগুনের স্পর্শ হারাইলে, তৎক্ষণাৎ যেমন মলিন হইয়া যায়, তেমনি মানুষ ভগবানের স্পর্শ হারাইলে পাপ তাপ আসিয়া তাহাকে মলিন করে। এজন্য উপাসনা, নামজপ, সৎকর্ম্ম, সেবা ও প্রার্থনা-যোগে সর্ব্বদা ভগবানের সঙ্গে যুক্ত থাকিতে চেষ্টা করা প্রতি মানবের কর্ত্তব্য। সাক্ষাৎ ভাবে ভগবৎ-পূজা দ্বারা আমাদের সঙ্গে তাঁর যোগ হয় ও তাঁর স্পর্শে আমরা মুক্তি লাভ করি।

ব্রহ্মবাদী ও ব্রহ্মপূজারীর পক্ষে সুবিস্তীর্ণ বিশ্বই ব্রহ্মমন্দির, নির্ম্মল পবিত্র চিত্ত তীর্থস্থান, সত্যই অবিনশ্বর ও অপরিবর্ত্তনী ধর্ম্মশাস্ত্র, ঈশ্বরবিশ্বাস ধর্ম্মের মূল, ভগবৎপ্রীতি ও জীবপ্রীতিই পরম সাধনা, স্বার্থনাশই বৈরাগ্য।

"সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্॥
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্॥
স্বার্থনাশস্ত বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥"

(ধর্ম্মতত্ত্ব)

আমরা সকল জাতির ও সকল ধর্ম্মের লোকেরা এই সার্ব্বভৌমিক নবদেবালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া, এক অদ্বিতীয়, নিরাকার, সর্ব্বজাতির উপাস্য, পিতামাতা প্রভু প্রতিপালক পরমেশ্বরের অর্চ্চনা করি। তাঁর নিকট সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহার জন্য প্রার্থনা করি। তাঁহাকে একমাত্র দয়ালু দাতা ও পরিত্রাতা জানিয়া, সবাই প্রাণে প্রাণে মিলিত হইয়া প্রণাম করি।

শ্রীপ্রসন্নকুমার মজুমদার।

—•—

নূতন গান।

(১)

(ব্রহ্মস্বরূপসাধনে বিধানের ক্রমবিকাশ)

বাউল—সুর

[সত্য] (মুই) শব হলেই সে শিব যে হই,
এ যে নাচিস্ নিজে আদ্যাশক্তি হৃদে তুই,
তাই বাঁচি মুই।
[জ্ঞান] দে সক্রেটিসের আত্মজ্ঞান,
বুঝি মুই কিছুই নই;
[অনন্ত] শ্রীবুদ্ধের নির্ব্বাণ দেনা,
একবারে মুই নির্ব্বাণ হই।
[প্রেম] (কর্) ঈশা-ক্রশাহত, দু'হাত প্রসারি,
(পাপ) ধরা বুকে লই;
[অদ্বৈত] (হেরি) দিগন্ত তাকাই, নাই
মোহম্মদের আল্লা বই।
[শুদ্ধ] (কর্) প্রেমপুণ্যানলে গোরা,
দু'বাহু তুলি নাচি মুই;
[আনন্দ] (হই) ব্রহ্মানন্দে লীন, যোগে দেখি শুনি,
মু নাই, এক তুই।
(যোগে দেখি শুনি এক তুই মুই)

গরিব।

(২)

(ব্রহ্মানন্দ-সন্নিধানে রচিত ও গীত)

রাজরাজেশ্বর হে, রাজ হৃদয়মাঝে;
দিবারাতি আমি উৎসবে মাতি,
মাতি তোমারি কাজে॥

দাও হৃদে নব নবীন আশা,
নবীন বল, নবীন পিয়াসা,
নব নব শক্তি, পুণ্য প্রেম ভক্তি,
(যেন) হৃদে মধুর বাজে॥
নূতন বসনে সাজাও আমারে,
নূতন ভাবে, নূতন আকারে—
যেন হেরি পুরাতন, জীর্ণ প্রাণ মন,
নাহি মরি (আর) লাজে॥

শ্রীবিপিনচন্দ্র দত্ত।

—০—

প্রেরিত ভাই অমৃতলাল বসু।

(অমরাগড়ীর মণ্ডলীর সহিত যোগ)

নববিধান-প্রেরিতমণ্ডলীর মধ্যে ভক্ত অমৃতলালের সহিত দুঃখী অমরাগড়ীর মণ্ডলীর যোগাযোগের বিষয় ইতিপূর্ব্বে ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকাতেই প্রকাশ করিয়াছি। আজ তাঁর উৎসাহপূর্ণ কয়েকখানি পত্রাংশ উদ্ধৃত করিয়া, তাঁর উপদেশে এখানে কিরূপ সুফল হইয়াছে, তাহারই সাক্ষ্যদান করিতেছি। বাং ১২৯২ সালের ফাল্গুন মাসে, অমরাগড়ী নববিধান ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের ভিত্তিস্থাপনের বিষয় স্থির হইলে, ভক্ত অমৃতলাল ফকিরদাসকে লিখিয়াছিলেন :—যদি সংকীর্ত্তন করিয়া সদলে তথায় যাওয়া হয়, সে ভাল; নতুবা বৈকালে নগরসংকীর্ত্তনের যে সময় খুব লোক হইবে, সেই সমস্ত দল গিয়া অনুষ্ঠান করা ভাল। * * * যখন (শ্রী) দরবার এক হইবে, সকলের আশীর্ব্বাদ লওয়া চাই। তুমিই এখন সকল কার্য্য ভগবান্ এবং ভক্তগণের মুখপানে চাহিয়া করিয়া যাও, সব জয় হইবে। আমি ভগবানের নিকট হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা করি, তিনি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁর কার্য্য করাইয়া লউন, যেন তুমি তাঁর বিধানের বলে প্রেরিতদিগের অপেক্ষা দশগুণ অধিক উৎসাহের সহিত বঙ্গের হিত সাধন করিয়া কৃতার্থ হও; দুঃখী অজ্ঞান ভাই ভগিনীদিগকে দয়াময় হরিনামে মাতাইয়া বিধান-বিশ্বাসী করিয়া সুখী করিতে পার। মা, আমার মা! তোমার সহায় হউন।" এই পত্র পাবার পর মহা উৎসাহের সহিত বাং ১২৯২ সালের ৬ই ফাল্গুন অপরাহ্নে যখন অমরাগড়ী ব্রহ্মমন্দিরে ভিত্তিস্থাপনা হইতেছে, ঠিক সেই সময়েই ভক্ত ফকির দাসের ও তাঁর সহকারী ভ্রাতাদিগের সাধের বিদ্যালয়ের খড়ুয়া বাঙ্গালা গৃহখানি সংসারের হীনবুদ্ধি ব্যক্তিগণ চক্রান্ত করিয়া পোড়াইয়া দিল। এই নিদারুণ সংবাদ পাইয়াই প্রেরিত ভক্ত ব্যথিত হইয়া গাজীপুর সহর হইতে লিখিলেন—"ভাই ফকিরচাঁদ, 'মা তোর রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ী অবাক্ হয়েছি, হাসিব না কাঁদিব তাই বসে ভাবতেছি।' বিদ্যামন্দির পুড়িয়া গিয়াছে, হাসিব, না কাঁদিব? মা দেখিলেন, আমার ঘর পাকা হইতেছে; কিন্তু আমার জ্ঞানের ঘর কি কুঁড়ে থাকবে? তাই বুঝি, মা এমন করিয়াছেন। মা আছে যার, ভয় কি তার? * * মায়ের কাছে প্রতিদিন আবদার করিতে হইবে, মা, বিদ্যামন্দির পাকা করিয়া দাও। শত্রুগণ বাঁচিয়া থুব নির্য্যাতন করিলেই তোমাদের কল্যাণ হইবে। * * সব ভাই মিলে নন্দবাবুকে লয়ে একবার স্কুলের জন্য ভিক্ষা আরম্ভ কর। সকল লোকের পায়ে ধরে ছেলের মত কাঁদিবে। দেখ, মা লজ্জা নিবারণ করেন কিনা? স্কুল ঘর পাকা করিতে কত টাকা লাগিবে? আমার শরীর খাটিবার মত থাকিলে, একবার তোমাদের সহিত লাগিতাম। তোমাদের চেষ্টায় বাদ সাধিয়া পাষণ্ডেরা কৃতকার্য্য হইবে? মাকে বলিয়া দিব। মা যদি না শুনেন, কাঁদিও। একবার বলতো ভাই, কুঁড়ে এবার পাকা ঘর হইবে। ভয় নাই, সত্যের জয়, ধর্ম্মের জয়, বিধানের জয় হইবেই; প্রাণপণে লাগিয়া থাক।" এই উৎসাহপূর্ণ উপদেশবাণীতে ভক্ত ফকিরদাস ও তাঁর সহকারী বন্ধুগণ দ্বিগুণ উৎসাহে প্রভুর কার্য্যে প্রাণ ঢালিয়া দিয়া, স্কুল গৃহখানি এক বৎসর মধ্যে নির্ম্মাণ করাইয়া, মহাসমারোহের সহিত প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই, ভক্ত ফকিরদাস নশ্বর দেহ ত্যাগ করায়, প্রেরিতদেব এ সেবককে লিখেছিলেন—"পুত্র-শোকের কি তীব্র যাতনা, তা ফকিরের দেহত্যাগে ভোগ করিলাম; মন আমার কিছুতেই স্থির হচ্ছে না, ফকির-বিরহে বড়ই ব্যাকুল হয়েছে"। ফকির দাসের পরলোকের পর হইতে এই অনাথমণ্ডলীর প্রতি তাঁর আকর্ষণ আরও বাড়িয়াছিল। ইং ১৯০২। ১লা আগষ্ট, ভক্ত ফকির দাসের সমাধিপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে প্রেরিত ভাই অমৃতলাল পুত্র-শোকাতুর পিতার ন্যায় সমাধিপার্শ্বে দাঁড়ায়মান হইয়া কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা করিলেন, "আমার ফকিরের ভস্ম ইহাতে স্থাপিত হইয়াছে, সেই দেবাত্মার দেহভস্ম ইহাতে যে চিরকাল থাকিবেনা, কালে ইহাও ধ্বংস হইবে; কিন্তু তাঁর আত্মার সমাধি আশু, অখিল প্রভৃতির অন্তরে হউক। ইঁহারা ফকিরের পবিত্র চরিত্রে চরিত্রবান্ না হইলে কিছুই হইবেনা; মা, তুমি ফকিরকে ইঁহাদের বুকের ভিতর সমাধিস্থ কর"। প্রেরিতদেবের সেই সুগভীর কাতরতাপূর্ণ প্রার্থনা কেবল সে সময়ে আমাদের প্রাণকে বিগলিত করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই; সে প্রার্থনা এ সেবকদিগের জীবনের চিরসম্বল হইয়া, প্রাণের ভিতর ভক্ত ফকিরের পবিত্র চরিত্রের ও ভক্তিময় জীবনের প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তাই মাঝে মাঝে ভগবান্ ও ভক্তসম্বন্ধে যে অপরাধ হয়, তাহার জন্য প্রাণে কতই না বেদনা অনুভব করি। আবার সেই মহর্ষি ঈশার কথা মনে পড়ে, "অবিশ্রান্ত প্রার্থনা কর, স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইবে"। ভক্ত অমৃতলাল এ অধমদিগকে সঙ্গে লয়ে গাহিয়াছিলেন, "তোরা আয়রে পুরবাসিগণ, আনন্দেতে করি সংকীর্ত্তন। তোদের ব্রহ্মধামে লয়ে যেতে এসেছেন পতিতপাবন; ঐ দেখ সম্মুখে দাঁড়ায়ে

আছেন পূর্ণ ব্রহ্মসনাতন"। ঐ যে সম্মুখে দাঁড়াইয়া ব্রহ্ম স্বয়ং মা হয়ে বলছেন, "বাছা! ভয় নাই, ভয় নাই," তাতো আমরা দেখিনা, তাতো আমরা শুনিনা, জানিনা। ফকির গান গাহিলেন, "জয়, জয় জগতজননী বলে, যোগবলে চল প্রেমধাম"। ঐ ভক্তের মধুর আহ্বান, সেই কোমল করের স্পর্শ যখন অনুভব করি, তখন আমার প্রাণ উৎফুল্ল হয়ে যায়; বলি, ভাই ভগিনীগণ, "সাধুসঙ্গ বিনা এসংসারে শান্তি কোথায়!" অসার সংসারের সুখ ও ভোগ-বিলাসে আর যেন আমরা ভুলে না থাকি। প্রাণাধিক ব্রহ্মানন্দের মাকে মা বলে ডেকে ডেকে, এস, আমরা সকলে প্রেমধামে যাত্রা করি।

অমরাগড়ী। শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়

সংবাদ।

পরলোকগমন—আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গত ১৪ই জুন (৩১শে জ্যৈষ্ঠ), বুধবার, রাত্রি ৯॥টার সময়, কাশীপুরের রায় বাহাদুর ডাঃ মতিলাল মুখোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী প্রায় অশীতিবর্ষ বয়সে, শোকতাপজরাজীর্ণ দেহ রক্ষা করিয়া অমরধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। ঠিক এক মাস পূর্ব্বে (গত ১৫ই মে), তাঁহার মধ্যম পুত্র মেজর সত্যেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি হঠাৎ পরলোকগমন করেন। সেই দারুণ শোকের আঘাতে তাঁর শরীর মন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। বিধানজননী তাই তাঁর প্রিয়তমা কন্যাকে ইহলোকে আর অধিকদিন দুঃখভার বহন করিতে দিলেন না। অমরলোকে তুলিয়া লইয়া পুত্র ও পতির সঙ্গে পুনর্মিলিত করিয়া দিলেন। ভগবান্ তাঁহার আত্মাকে অনন্ত শান্তিপূর্ণ প্রেমবক্ষে স্থানদান করুন এবং পৃথিবীস্থ শোকার্ত্ত পরিবারে ও আত্মীয় স্বজনগণের প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

জন্মদিন—গত ১২ই জুন, ৯নং ষ্টার লেনে, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ বাসুদেব সিংহের শুভ জন্মদিন উপলক্ষে, শিশুর মাতামহী শ্রীমতী হেমন্তকুমারী মল্লিক উপাসনা করেন। পরম জননী শিশুকে আশীর্ব্বাদ করুন।

শুভবিবাহ—গত ১০ই জুন, ডি, এল, রায় ষ্ট্রীটে, শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেনের বাটীতে, বাগনান-নিবাসী ভ্রাতা যতীন্দ্রনাথ বসুর মধ্যমা কন্যা কল্যাণীয়া কুমারী সুলতিকার সহিত, রাজসাহী-নিবাসী কল্যাণীয় শ্রীমান্ মুনীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর শুভ পরিণয়ানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমতী অবন্তী দেবী উপাসনা করেন। পর দিন প্রাতে বরকন্যাকে আশীর্ব্বাদসূচক উপাসনা ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক করেন। নবদম্পতীকে ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন।

উৎসব—গত ১০ই জুন হইতে ১২ই পর্য্যন্ত বাগনান ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়াছে। এই উপলক্ষে শনিবার সন্ধ্যায় উৎসবের উদ্বোধনসূচক উপাসনা ভ্রাতা রসিকলাল রায় সম্পন্ন করেন। রবিবার প্রাতে শ্রীযুক্ত অর্পণা চট্টোপাধ্যায় এবং সন্ধ্যায় ভাই প্রিয়নাথ বেদীর কার্য্য করেন। মধ্যাহ্নে প্রীতিভোজন ও অপরাহ্নে পাঠ ও সংকীর্ত্তন হয়। কলিকাতার ভক্তিমান্ গায়ক মাণিকবাবু সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন করেন। তমোলুক, বাণীবন, দেউলটী প্রভৃতি স্থান হইতেও স্থানীয় বন্ধুবান্ধবগণ যোগদান করিয়া উৎসবানন্দ বর্দ্ধন করেন। ১২ই জুন, প্রাতে ভাই প্রিয়নাথই উৎসবের শান্তিবাচনের উপাসনা করেন।

টাঙ্গাইল নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ত্রিংশত্তম সাম্বৎসরিক উৎসবোপলক্ষে, বহু দিনের পর টাঙ্গাইলের নববিধানপরিবারের, দূরের ও নিকটের, বিধানজননীর প্রিয় পুত্র কন্যাগণ সমবেত হইয়াছিলেন। ফরিদপুর হইতে শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বসু, দিনাজপুর চুড়ামণ এষ্টেট হইতে শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বসু, হাজারিবাগ হইতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খড়্গসিংহ ঘোষ সপরিবারে, কলিকাতা হইতে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ যোগদান করিয়াছিলেন। ২৩শে মে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে উদ্বোধনসূচক উপাসনা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খড়্গসিংহ ঘোষ করেন। ২৪শে মে বুধবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীযুক্ত প্রেমাদিত্য ঘোষের বাসায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খড়্গসিংহ ঘোষ উপাসনার কার্য্য করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ বিশেষ প্রার্থনা করেন। শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বসু সঙ্গীত করেন। সন্ধ্যায় স্থানীয় টাউনহলে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খড়্গসিংহ ঘোষ "ধর্ম্মের স্বরূপ ও অরূপ বিষয়ে" বাঙ্গালায় বক্তৃতা দান করেন। তিনি বলেন, সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মই ধর্ম্মের স্বরূপ এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক ধর্ম্ম তাঁহারই নানারূপ এবং ঐ সকলের সমন্বয়ে বিধানের আবির্ভাবে আমরা ধর্ম্মের আজ বিশেষ পরিচয় পাইতেছি। ২৫শে মে, বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্নে ব্রহ্মমন্দিরে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত অবতরণের আশীর্ব্বাদ প্রতি জীবনে লাভ করিয়া, সেই আশীর্ব্বাদের সাক্ষ্য চতুর্দ্দিকে ভাই ভগ্নিদিগের মধ্যে প্রচার করা আমাদের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য, এই ভাবে এ বেলায় আত্মনিবেদন করা হয়।

সন্ধ্যার পর মহিলাদিগের উৎসব ব্রহ্মমন্দিরে সম্পন্ন হয়। শ্রীমতী কমলা ঘোষ মধুরকণ্ঠে সুমিষ্ট সঙ্গীত করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন। ২৬শে মে, পূর্ব্বাহ্নে ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুকুমার বসুর বাসায় অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষ উপাসনা করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে কীর্ত্তনাদি হয়। ভাই গোপালচন্দ্র একটী প্রার্থনা করেন। ২৭শে মে, পূর্ব্বাহ্নে ব্রহ্মমন্দিরে স্বর্গগত ভক্তিভাজন প্রেরিত-প্রবর ভাই প্রতাপচন্দ্রের স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বসু "আশীষ" হইতে এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খড়্গসিংহ ঘোষ Silent Pastor হইতে প্রতাপচন্দ্রের লেখা পাঠ করেন। সন্ধ্যায় স্থানীয় টাউন

[illegible] "Faith at the Cross Road" বিষয়ে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খড়্গসিংহ ঘোষ ইংরাজিতে বক্তৃতা [illegible] করেন। সাব্ ডিভিসনাল অফিসার Mr. F. O. Bell. I.C.S, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বক্তৃতায় বর্ত্তমান যুগে নানা আদর্শের সঙ্গে [illegible] ধর্ম্মের সঙ্ঘাতের বিশেষ উল্লেখ করা হয়। Economic, Nationalism, Humanism, Creative revolutionalism প্রভৃতির আলোচনা করিয়া, তিনি Theism সমর্থন করিয়া [illegible] বক্তৃতা শেষ করেন। ২৮শে মে রবিবার: দিনব্যাপী উৎসব। পূর্ব্বাহ্নে ব্রহ্মমন্দিরে কীর্ত্তনের পর উপাসনা হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। [illegible] দরিদ্রনারায়ণদিগের [illegible] পর প্রীতিভোজন হয়। সন্ধ্যায় কীর্ত্তনান্তে উপাসনা হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খড়্গসিংহ ঘোষ উপাসনা করেন। "অতীতের ভারতে অখণ্ড ব্রহ্মের পূজা-প্রতিষ্ঠা, খৃষ্টধর্ম্মে অখণ্ড মানবত্বের প্রতিষ্ঠা এবং বর্ত্তমান যুগে অখণ্ড ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা তাঁহার উপদেশের বিষয় ছিল। ২৯শে মে, সোমবার অপরাহ্ণে ব্রহ্মমন্দিরে বালকবালিকাগণ সঙ্গীত ও আবৃত্তি ইত্যাদি কার্য্য সম্পন্ন করেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খড়্গসিংহ ঘোষ উপস্থিত বালকবালিকাদিগকে লক্ষ্য করিয়া উপদেশ দেন। সন্ধ্যায় শান্তিবাচনের উপাসনা ভাই গোপালচন্দ্র গুহ সম্পন্ন করেন।

বিশেষ উপাসনা—গত ৫ই জুন, পুরীর সাগরোপকূলে, মিসেস পি, সি, সেন এবং আরো কতিপয় ভাই ভগ্নী সঙ্গে ভাই প্রিয়নাথ বিশেষ উপাসনা করেন। গত ৭ই জুন, পুরীর পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ আই, এন্, দে মহাশয়ের নিমন্ত্রণে, স্থানীয় অনেকগুলি পদস্থ ব্যক্তি ও মহিলা তাঁহার ভবনে সমবেত হন। এখানে ভাই প্রিয়নাথ বিশেষ উপাসনা করেন। শ্রীমান্ অধ্যাপক পুণ্যেন্দ্রনাথ মজুমদার আচার্য্যদেবের ইংরাজী প্রার্থনা আবৃত্তি করেন এবং বর্দ্ধমান কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক ভ্রাতা শ্রীযুক্ত করুণাকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ মৈত্র সঙ্গীত করেন।

সাম্বৎসরিক—গত ২৯শে মে, কলুটোলাস্থ কৃষ্ণভবনে, শ্রীকেশবানুজ কৃষ্ণবিহারী সেনের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা ভাই প্রিয়নাথ দ্বারা সম্পন্ন হয়। কন্যা কুমারী বেলা মধুর সঙ্গীত করেন।

সেবা—ভাই গোপালচন্দ্র গুহ গত ১৬ই মে কলিকাতা হইতে রওয়ানা হইয়া, ১৮ই মে টাঙ্গাইলস্থ বাথিল গ্রামে, নববিধানবিশ্বাসী বসু মহাশয়দিগের গৃহে, নববিধানে অটল বিশ্বাসী-গৃহস্থ প্রচারক ও সাধক স্বর্গীয় কালীকুমার বসুর স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তাঁহাদের গৃহ-দেবালয়ে উপাসনা করেন। টাঙ্গাইল হইতে নববিধানমণ্ডলীর অনেকে এই পবিত্র অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। শ্রীমান্ কালিদাস তালুকদার সঙ্গীত করেন। স্বর্গগত বসু মহাশয়ের তিন পুত্র শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বসু, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বসু, ডাক্তার সুকুমার বসু আপন আপন কর্ম্মক্ষেত্র হইতে আসিয়া এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বসু বিশেষ প্রার্থনা করেন। বেশ গম্ভীর ভাবে অনুষ্ঠানটী সম্পন্ন হয়। সন্ধ্যায় পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রে সঙ্গীত ও প্রার্থনা হয়। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ৪৲ টাকা দান করা হইয়াছে। ১৯শে মে মধ্যাহ্নে বসু মহাশয়ের নিজের গৃহদেবালয়ে পারিবারিক ভাবে উপাসনা হয়। সন্ধ্যায় বাথিল হইতে রওয়ানা হইয়া ভাই গোপালচন্দ্র গুহ, শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বসু ও শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বসু টাঙ্গাইল উপস্থিত হন।

২০শে মে, পূর্ব্বাহ্নে টাঙ্গাইল নৈমিষারণ্য নববিধানপল্লিতে স্বর্গীয় শশিভূষণ তালুকদারের জামাতা শ্রীমান্ ভবানীচরণ উকিলের গৃহে তাঁহার মাতৃদেবীর স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে উপাসনা হয়। সন্ধ্যায় স্বর্গীয় শশিভূষণ বাবুর আশা-কুটির নামক গৃহে পারিবারিক উপাসনা হয়।

২১শে মে, রবিবার দুই বেলা টাঙ্গাইল নববিধান সমাজের ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়। এদিনের প্রথম বেলার উপাসনা টাঙ্গাইল নববিধান সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবের প্রস্তুতির ভাবে সম্পন্ন হয়। সন্ধ্যার উপাসনায় স্থানীয় ও দেশের সকলের মঙ্গল কামনা করিয়া বিশেষ প্রার্থনাদি হয়।

৪ঠা জুন, রবিবার, টাঙ্গাইল ব্রহ্মমন্দিরে পূর্ব্বাহ্নে সাপ্তাহিক উপাসনায় "সাধুসঙ্গে বাস" বিষয়ে আত্মনিবেদন করা হয়। ৫ই জুন, টাঙ্গাইল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে তথাকার সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে উপাসনা করেন। ইহলোক পরলোক লইয়া আমাদের উৎসব। অতীতের বর্ত্তমানের, স্বদেশের বিদেশের সকল সাধু ভক্ত মহাপুরুষদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া আমাদের উৎসব, উদ্বোধনে ইহা বিবৃত হয়। বিশ্বাসী অনুগত সাধকজীবনে, সে জীবনের প্রস্তুতি ও প্রয়োজনের অনুরোধে, জীবন্ত জাগ্রত লীলাময় ঈশ্বর কখন পরব্রহ্মরূপে, কখন হৃদয়বন্ধু শ্রীহরিরূপে, কখন মাতৃরূপে সাক্ষাৎ ভাবে শিক্ষা দান করেন। সর্ব্বাবস্থায় তিনি পরিচালনা করেন, সকল ব্যক্তিকে সুপথ প্রদর্শন করেন, এবং আমাদের ন্যায় নিতান্ত কীটানুকীট মলিন জীবনও সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহার পূজা বন্দনার অধিকারী, জীবনের সর্ব্বস্বরূপে তাঁহাকে গ্রহণের অধিকারী, এ নব যুগে এ অধিকার তিনিই তাঁহার বিশ্বাসী মণ্ডলীকে দান করিয়া থাকেন। এই ভাব উপাসনায় ও আত্মনিবেদনে প্রকাশিত হয়।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক ২রা আষাঢ় মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৮ ভাগ। ১০ম সংখ্যা। | ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ১৩৪০ সাল, ১৮৫৫ শক, ১০৪ ব্রাহ্মাব্দ। 30th May, 1933. | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

মা জগৎপ্রসবিনি, এই বিশ্বজগৎ তুমিই প্রসব করিয়াছ। এই প্রকৃতিকে তোমারই প্রকৃতি হইতে জন্মদান করিয়াছ। জড় জীব সকলকেই তোমার জীবনীশক্তি হইতে প্রসূত; কিন্তু মানব-সন্তানকে তোমার প্রকৃতি হইতে জন্ম দিয়া, বিশেষ ভাবে তোমার সন্তানত্বের অধিকারী করিয়াছ; তাই তোমার আমিত্ব হইতেই সে "আমি" "আমি" বলিতে শিখিয়াছে; তোমারই চৈতন্য-শক্তি হইতে সে জ্ঞান-চৈতন্য-লাভের ও বিদ্যাবুদ্ধি-অর্জ্জনের অধিকারী হইয়াছে; তোমার অনন্ত শক্তি হইতে তার অনন্ত উন্নতিলাভের আকাঙ্ক্ষা ও পিপাসা; তোমার প্রেমই মানব-প্রাণে প্রেম, স্নেহ, ভালবাসা, দয়া, সেবা, অনুরাগাদি সঞ্চার করিয়াছে; তোমার অদ্বৈতত্বই তাহাকে কর্ত্তৃত্বে উদ্দীপ্ত করিয়াছে; তোমার পুণ্যেই তাহার নীতিজ্ঞান, পাপের প্রতি ঘৃণা ও শাসনপ্রবৃত্তি এবং তোমার আনন্দস্বরূপেই তাহার সুখ-স্পৃহা, আনন্দ ও শান্তি-লাভের পিপাসা সঞ্চারিত। মানুষ তাই তোমার সন্তান হইয়া, তোমার স্বরূপে স্বরূপবান্ স্বরূপবতী হইতে চাহিলেই, তোমার মত দেবতা হইতে পারে। তোমার মত পূর্ণ হইবার আকাঙ্ক্ষায় আকাঙ্ক্ষিত হইলেই, তোমার দেবত্ব লাভ করিয়া নর দেব দেবী হন। তোমার অবতার-স্বরূপ মহাপুরুষ বা তোমার প্রেরিত ভক্তগণ ত তাহাই হইয়াছেন এবং অপর সাধারণ জনগণেরও পূজ্য হইয়াছেন। আবার অপরদিকে আত্মবিস্মৃত হইয়া, আমিত্বে স্ফীত হইয়া, তোমার স্বরূপশক্তি জ্ঞান, প্রেম পুণ্য ও কর্ত্তৃত্বের অপব্যবহারে এই মানুষই নরাধম পাষণ্ড হইয়াছে। যে মানুষ যত দেবত্বে সমুন্নত, তিনি তত আপনার আমিত্ব, ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দিয়া "সব গুণ্ তেরা ময় নাহি কই", "আমি কিছুই নই", "আমার আমি নাই" বলিয়া মানব-জীবনে দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। আর যে মানুষ যত আপনার আমিত্ব জাহির করিতে উৎসুক হইয়াছে, সেই তত মনুষ্যত্ব হইতে স্খলিত বা পতিত হইয়াছে। তাই, মা, করযোড়ে এই মিনতি করি, তুমি মানুষকে যে তোমার সন্তানত্বের অধিকারী করিয়া জন্মদান করিয়াছ, সেই উচ্চ জন্ম যেন লাভ করি। মোহ, অজ্ঞানতা ও আমিত্ব বা আত্মাভিমান বশতঃ সে অধিকার হইতে আমরা যেন বঞ্চিত বা বিচ্যুত না হই। আমার জ্ঞান, আমার প্রেম, আমার পুণ্য—আমার ত কিছুই নয়, তুমি না দিলে আমি কিছুই পাই না, ইহা সর্ব্বথা মনে রাখিয়া, যেন দীন বিনীত অন্তরে নিত্য তোমারই মুখাপেক্ষী ও কৃপার ভিখারী হইয়া পড়িয়া থাকিতে পারি। আমাদের জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ যাঁহারা

মানবকুলকে উজ্জ্বল করিয়া দেবত্বলাভে ধন্য হইয়াছেন, তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তোমার সন্তানত্বের উপযুক্ত হইতে পারি, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

রাজর্ষি রামমোহনের স্বর্গগমনের শতবার্ষিকী ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জন্মগ্রহণের শতবার্ষিকী।

রাজর্ষি রামমোহন রায়ের স্বর্গারোহণের শতবার্ষিকীর বিপুল আয়োজন হইতেছে; ইহা দেখিয়া আমরা যথার্থ ই আনন্দে পুলকিত হইতেছি। মহাপুরুষদিগের প্রতি যথোপযুক্ত সম্মানদানে আমরা আপনারাই সম্মানিত হই। তাহা না করিলে কখনই কোন জাতি সমুন্নত হইতে পারে না।

মহাপুরুষগণ দেশের ও জাতির শিরোভূষণ। মস্তক যেমন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তেমনি মহাপুরুষগণ জাতির মস্তকস্বরূপ। তাঁহারাই আমাদিগের মুখ উজ্জ্বল করিতে আসিয়াছেন, তাঁহারাই আমাদের জাতীয় গৌরব সমৃদ্ধ করিতে প্রেরিত হইয়াছেন।

সাধারণ ভাবে তাঁহাদের মহত্ত্ব তাঁহাদেরই সোপার্জ্জিত বলিয়া আমরা মনে করি। কিন্তু বস্তুতঃ স্বয়ং বিধাতা পুরুষ তাঁহাদিগকে জাতীয় জীবনের সমুন্নতি-বিধানের জন্যই অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন করিয়া প্রেরণ করেন এবং তাঁহাদিগের দ্বারা কতই আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কার্য্য সকল সম্পাদন করাইয়া জগতের কল্যাণ বিধান করেন। তাই পুরুষের মধ্যে আমরা তাঁহাদিগকে মহাপুরুষ বা মানবজাতির প্রতিনিধি বলিয়া অভিনন্দন করি।

রাজর্ষি রামমোহন বর্ত্তমান যুগে যথার্থই এক ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষ ছিলেন। তাই বলিয়া, ভক্তির আতিশয্যপরতন্ত্র হইয়া, অনেকে যেমন মহাপুরুষদিগকে দেবত্বারোপে ঈশ্বরাবতার-বোধে পূজা করে, আমরা অবশ্যই রাজা রামমোহনকে বা কোন মহাপুরুষকে সে ভাবে পূজা করিব না; কিন্তু তাঁহাদিগকে আমাদিগের পূজ্যপাদ জানিয়া, যাঁহার যাহা প্রাপ্য, তাঁহাকে সেই সম্মান ও কৃতজ্ঞতা দান করিব।

আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় জীবনের ও ধর্ম্মজীবনের পূর্ণ আদর্শের বীজ রাজর্ষি যে বপন করিয়াছেন এবং তাহার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সে বীজ হইতে এখন বিধাতার কৃপায় বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে, সে ভিত্তি হইতে এখন অট্টালিকা নির্ম্মাণ হইয়াছে। বীজবপন বা মূলপত্তন সামান্য ব্যাপার নহে, সে গৌরব তাঁহারই। তাঁহার পরবর্ত্তী যাঁহারা, তাঁহারা তাঁহারই রোপিত বীজ বা ভিত্তির উপর বিধাতার যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়া, বৃক্ষোদ্গমের বা অট্টালিকা-নির্ম্মাণের কার্য্য করিয়াছেন।

রামমোহন ঈশ্বর প্রেরিত হইয়া যে কার্য্য করিয়াছেন, এবং ভীষণ নির্য্যাতন ও পরীক্ষা বহন করিয়া যে অলোকসামান্য তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা না করিলে, পরে যাহা হইয়াছে, তাহা কখনই হইতে পারিত না।

রাজা রামমোহন যাহা করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই অলৌকিক। তিনি পৌত্তলিক হিন্দু পরিবারে জন্মলাভ করিয়া, পিতৃধর্ম্ম পৌত্তলিকতার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া পিতাকর্ত্তৃক তাড়িত হইলেন, ধর্ম্মান্বেষী হইয়া তিব্বত পর্য্যন্ত গমন করিলেন, সর্ব্ব ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে একেশ্বরবাদ প্রতিপন্ন করিয়া সর্ব্বধর্ম্মবাদীদিগের একত্রে এক ঈশ্বরের উপাসনার মন্দির স্থাপন করিলেন। সতীদাহনিবারণ, ইংরাজীশিক্ষাপ্রবর্ত্তন, বাঙ্গালা ভাষায় গদ্যলিখন ইত্যাদিও তাঁহারই অমানুষিক মহত্ত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই; এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় জীবনে স্বাধীন চিন্তাধারার যে একটা সূত্রপাত করিলেন, তাহার জন্য আমরা তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা ভক্তি অর্পণ না করিয়া কি থাকিতে পারি?

বিধাতা তাঁহাকে দিয়া যে কার্য্য আরম্ভ করিলেন, পরে যাঁহারা আসিলেন, বিশেষভাবে আমাদের ধর্ম্মপিতা মহর্ষি শ্রীদেবেন্দ্রনাথ এবং ধর্ম্মাগ্রজ ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্র তাহা পূর্ণ করিলেন। বাস্তবিক ইঁহাদের পরস্পর অধ্যাত্ম সম্বন্ধ যেন অবিচ্ছিন্ন। তাই রাজা রামমোহনকে ইঁহাদের হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া যদি দেখি, কেবল একটি অট্টালিকার কাঠাম মাত্র দেখিতে পাইব, পূর্ণ শোভাসৌন্দর্য্যপূর্ণ গৃহ দেখিতে পাইব না।

রাজা রামমোহন বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে, নিজ নিজ মতের পার্থক্য রক্ষা করিয়া, একত্রে এক ঈশ্বরের

উপাসনা করিবার জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্মনামাভিধানে তাঁহার ধর্ম্মের নামকরণ করিয়া ও মণ্ডলীবদ্ধ হইয়া এক উপাসনা করিবার প্রণালী প্রবর্ত্তন করিলেন। শেষে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র রামমোহন-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম যে বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম বিধাতার নববিধান, ইহা ঘোষণা করিয়া এক নবালোক প্রকাশ করিলেন। সর্ব্ব-ধর্ম্মাবলম্বিগণ নিজ নিজ বিভিন্নতা পরিহার করিয়া অথচ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা করিবে শুধু নয়, এক অখণ্ড পরিবার হইবে, ইহাই বিধাতার বিধান বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন; এবং সর্ব্ববিধর্ম্মশাস্ত্রকেই এক সমন্বয়শাস্ত্রে এবং সকল সম্প্রদায়কে এক সম্প্রদায়ে কার্য্যতঃ পরিণত করিলেন। ধর্ম্মের ঐক্যবন্ধনে জাতীয় ঐকবন্ধন, এবং তাহা হইতে সর্ব্বজাতীয় মহা মিলনের প্রশস্তভূমি প্রতিষ্ঠা করিলেন।

সুতরাং এই তিন মহাপুরুষের অধ্যাত্মযোগ যে অবিচ্ছিন্ন, ইহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। তিনজন যেন একটা সূত্রে গাঁথা। একই বিধাতা ইঁহাদিগকে যন্ত্র-রূপে ব্যবহার করিয়া, বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম সমন্বয়বিধান জগতে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। তাই ব্রহ্মানন্দ রাজর্ষি রামমোহনকে ধর্ম্মপিতামহ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে ধর্ম্মপিতা বলিলেন এবং নিজকে আমাদের ধর্ম্মভ্রাতা বলিয়া আত্মপরিচয় দান করিলেন। বাস্তবিক কোন প্রকার ভ্রান্তসংস্কারবিবর্জ্জিত হইয়া, বিধাতার আলোকে বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের অভিব্যক্তির ইতিহাস যদি আমরা অধ্যয়ন করি এবং এই ইতিহাসে বিধাতার হস্ত-লেখনী পাঠ করি, আমরা ইঁহাদের পরস্পর সম্বন্ধ যে এই ভাবেই নির্দ্দিষ্ট, কখনই তাহা অস্বীকার করিতে পারিব না।

আবার বংশাবলীর ধারা অনুসারে যেমন দেখা যায়, পিতামহের গুণাবলী পৌত্রেই অধিক প্রতিফলিত হয়, তেমনি রাজর্ষি রামমোহন ধর্ম্ম বা সংস্কারকার্য্যের যাহা পত্তন বা সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তাহারই পূর্ণতা সংসাধন করিয়াছেন। রামমোহন হিন্দু, খ্রীষ্টীয়, এসলাম, সকল ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে একেশ্বরবাদ সংকলন করিয়া আপন ধর্ম্ম প্রতিপন্ন করিলেন; ব্রহ্মানন্দ সেই সকল ধর্ম্মশাস্ত্রকে সমন্বিত করিয়া নববিধানশাস্ত্র ব্যাখ্যাত করিলেন। রামমোহন আপন ধর্ম্মের বিশেষ নামকরণ করেন নাই, কেবল ব্রাহ্মীয় ধর্ম্ম বা এক ব্রহ্মসম্বন্ধীয় ধর্ম্ম বলিয়া আখ্যাত করেন; ব্রহ্মানন্দ তাহা প্রত্যক্ষ ঈশ্বরালোকে বিধাতার "নববিধান" বলিয়া ঘোষণা করিলেন। হিন্দু, এস্লাম, খ্রীষ্টান্ সকলে নিজ নিজ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও, একত্রে এক মন্দিরে একেশ্বরের পূজা করিতে পারিবেন, রামমোহন এই ব্যবস্থা করেন; আর সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বিগণ ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষে পরস্পর পরস্পরের ধর্ম্মকে একই অখণ্ড ধর্ম্মান্তর্গত জানিয়া, সাম্প্রদায়িক বিভিন্নতা পরিত্যাগপূর্ব্বক, সর্ব্বধর্ম্মের বিশিষ্ট ভাব সমন্বয়সাধনে একধর্ম্মাবলম্বী হইবেন এবং প্রত্যেকেই সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী হইয়া এক অখণ্ড ধর্ম্মমণ্ডলী হইবেন, ব্রহ্মানন্দ ইহা বিধান করেন। এই সকল রামমোহনের অনুষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের পূর্ণতা ভিন্ন আর কি?

রামমোহন যে সকল সমাজসংস্কারের আভাস মাত্র দিয়াছিলেন, কেশবচন্দ্র তাহা উদার নবধর্ম্মসাধনের জন্য অবশ্য আচরণীয় বলিয়া অনুষ্ঠান করেন। তাই স্ত্রীশিক্ষা, জাতিভেদ বা অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন, মাদকনিবারণ, দুর্নীতি-দূরীকরণ, বাল্যবিবাহ-নিবারণ, বাল্যবিধবাবিবাহ-প্রচলন ইত্যাদি ধর্ম্মের অঙ্গরূপে তিনি প্রবর্ত্তন করেন।

আমাদের বিশ্বাস, রাজর্ষি রামমোহন বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম নববিধানের ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিতেই প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বর্গগমনের শতবার্ষিকীও, বিধাতার অনির্ব্বচনীয় বিধানে, নববিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জন্মোৎসবের শত বার্ষিকীরই প্রাস্তাবিক রূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর রামমোহনের স্বর্গগমনোৎসবের শতবার্ষিকী হইবে, ১৯৩৮ সনের ১৯শে নবেম্বর কেশবচন্দ্রের জন্মোৎসবের শতবার্ষিকী হইবে; অতএব ইহা স্মরণে রাখিয়া, আমরা রাজর্ষির যথোপযুক্ত শতবার্ষিকী সাধনে যেন ব্রহ্মানন্দের জন্মোৎসবের শতবার্ষিকীর জন্য প্রস্তুত হই।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

ব্রহ্মসাগরসঙ্গমে।

সাগরের উপকূলে বসিবামাত্র সমীরণ-সম্ভোগ হয়, সাগরের নিনাদ কর্ণগোচর হয়, আনন্দহিল্লোল নয়নকে আপ্লুত করে, অনন্তের চিন্তায় মন মগ্ন হয়, সাগরে স্নানাবগাহনে বহু ব্যাধি নিবারণ হয়, ইহা যেমন প্রত্যক্ষ, তেমনি ব্রহ্মসাগরসমীপে উপাসনায় বসিলেও এমনই তাঁহার সপ্তস্বরূপের প্রভাব জীবনে প্রত্যক্ষীভূত হয়। কোন সাধ্য সাধনা বা চেষ্টা করিয়া তাহা

করিতে হয় না। চেষ্টাসাধ্য সাধনা যেখানে, আমি আমার কষ্ট কল্পনা সেখানে।

নববিধানের রেডিও।

নববিধানাচার্য্য বলিলেন, "আমি এখানে কথা বলিতেছি, আর এণ্ডিস পর্ব্বতে তাহা প্রতিধ্বনিত হইতেছে"। একবার মুঙ্গেরে এক বন্ধু তাঁহার সহিত উপাসনা করিয়া আফিসে চলিয়া যান। তিনি অনেক দূর পথ চলিয়া গিয়াছেন, তখন আচার্য্যের ইচ্ছা হইল, তিনি ফিরিয়া আসেন। তাঁর নাম করিয়া আচার্য্যদেব খোলে তিনবার চাটী দিলেন, এবং বলিলেন, "ঠিক তিনি শুনিয়া ফিরিবেন।" আশ্চর্য্য বন্ধুটীর মনে হইল, আচার্য্যদেব যেন তাঁহাকে ডাকিতেছেন, আর তিনি ফিরিয়া আসিলেন। তখনকার কালে রেডিও যন্ত্র বাহির হয় নাই। বৈজ্ঞানিক রেডিও দ্বারা যেমন কোন দেশের কোন গান, কোন বক্তৃতা, কোন কথা অন্য দেশে শুনা যাইতেছে, অধ্যাত্মবিজ্ঞান নববিধানেও আমরা বিশ্বাস করি, আমরা যখন উপাসনা করি, পবিত্রাত্মার প্রভাবে তাহার প্রভাব সমগ্র মানবপরিবারে সঞ্চারিত হয়, ভাবের ভাবুক প্রত্যেক প্রাণেই তাহা প্রতিধ্বনিত হয়। এই জন্য যখনই আমরা উপাসনা করি, তখন একা একা বসিলেও, পরিবার, দল, জাতি, জগতের সঙ্গে একাত্মতা-যোগে প্রার্থনা করি, "অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও"। অসত্য হইতে সকলকে সত্যেতে লইয়া যাইবেন, বিশ্বাস করি। তাই আপাততঃ বাহিরে আমাদের দল, মণ্ডলী বা পরিবার ক্ষুদ্র হইলেও, নববিধানের অদৃশ্য মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী, ইহা প্রত্যক্ষ ভাবে আমরা যেন অনুভব করি।

উপাসনার রাজ্য।

উপাসনার রাজ্য অধ্যাত্ম রাজ্য। এক রাজার রাজ্য হইতে অন্য রাজার রাজ্যে প্রবেশ করিলে যেমন দেখা যায়, অনেক বিষয়ে আইন কানুন নিয়ম পদ্ধতি আচার ব্যবহার ভিন্ন এবং সেই রাজারই অধিকারে অধিকৃত হইয়া চলিতে ফিরিতে হয়; তেমনি যখনই আমরা উপাসনার রাজ্যে প্রবেশ করি, তখন আমরা সংসারের রাজ্য হইতে স্বর্গের অধ্যাত্ম রাজ্যে প্রবেশ করি, তখন আর আমাদের আমরা থাকি না, আমাদের স্বাধীনতাও থাকে না, যাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করি, তাঁহার অধীন হইতে হয়। তিনি তাঁহার ইচ্ছা ও হুকুম অনুসারে আমাদিগের বাক্য, চিন্তা, ইচ্ছা রুচি, কামনা বাসনা, এমন কি দেহ ও জীবন পর্য্যন্ত যেমন করিয়া অধিকৃত ও পরিচালিত করেন, তেমনি করিয়া পরিচালিত হইতে হয়। বাস্তবিক এখানে আসিলে সত্যই রূপান্তরিত হইতে হয়। এই রূপান্তরিত হওয়াই প্রকৃত উপাসনা।

শ্রীবুদ্ধ-সমাগম।

বৈশাখী পূর্ণিমার দিন শ্রীবুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন, নির্ব্বাণ লাভ করেন এবং মহাপ্রয়াণও করেন। তাই বৌদ্ধ জগতে এই দিন মহাদিন। নববিধান সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়বিধান, সুতরাং এদিন নববিধানেও বিশেষ স্মরণীয় ও পালনীয় দিন। শ্রীবুদ্ধ প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের অদ্বৈতবাদ, জড়বাদ, জাতিভেদ, কুসংস্কারাদি উচ্ছেদ করিয়া, এক নববিধান বিধানের জন্য রাজৈশ্বর্য্যের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া, জগতের রোগ, দুঃখ, জরা, মৃত্যুর শোকতাপ হইতে কেমনে জগজ্জন মুক্তি ও নির্ব্বাণশান্তি লাভ করিতে পারে, তাহারই পন্থা উদ্ভাবন করিয়া, তিনি এক নববিধান—নির্ব্বাণের বিধান প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। মনের কামনা বাসনা চিন্তা ধ্যান-যোগে নির্ব্বাণ বা নিবৃত্ত করিতে পারিলেই, দুঃখ শোকের শান্তি হয়, ইহাই তিনি আবিষ্কার করিয়া, বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম নববিধানের প্রথমাঙ্গ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। নিবৃত্তির পর যে প্রবৃত্তি, বৈরাগ্যের পর যে সংসার, কামনা বাসনার নির্ব্বাণে যে নিষ্কাম নির্লিপ্ত যোগ সংসারে থাকিয়াই হয়, তাহা সাধন ও শিক্ষা দিবার জন্য নববিধান অবতীর্ণ। তাই শ্রীবুদ্ধদেবকে প্রথম গ্রহণ না করিলে, নববিধানের সংসারে যোগ সাধন হয় না। সুতরাং এই দিন নববিধানে বিশেষ সাধনের দিন। শ্রীবুদ্ধ-সমাগম-সাধনে বুদ্ধের নির্ব্বাণ বৈরাগ্য প্রেম আত্মস্থ করিয়া, যাহাতে আমরা নববিধান সাধনের উপযুক্ত হইতে পারি, মা আমাদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ করুন।

—০—

"ধর্ম্ম-সাধন"।

(আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের সঙ্গতের আলোচনা)

৫০ সংখ্যা—২৭শে শ্রাবণ, রবিবার, ১৭৯৫।

(গিরিধির ডাঃ ভি, রায় হইতে প্রাপ্ত)

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রশ্ন—অন্য লোকের অন্যায় ব্যবহারই আমাদিগের রাগের কারণ কি না?

উত্তর—যে রাগিস্বভাব, তাহার রাগ উত্তেজনার নিমিত্ত অন্য লোকের সহায়তা আবশ্যক করে না। কাছে কোন লোক না পাইলে সে ঘর দুয়ারের সঙ্গেও ঝগড়া করে। একটা দুয়ারে মাথা ঠেকিলে, 'লাগ্, লাগ্, লাগ্' বলিয়া সে রক্তপাত করে। কাগজে মনের মত লেখা না হইলে, সে সজোরে মুড়িয়া গুড়িয়া ছিঁড়িয়া কুটী কুটী করিয়া ফেলিলে তবে সুস্থির হয়। রাগ এমনি শরীরে উৎপন্ন হইয়া আপনাকে পোড়াইয়া মারে।

প্র—কেহ রাগের কথা বলিলে থামাইবার উপায় কি?

উ—রাগের উত্তরে রাগের কথা শুনাইলে রাগের আহ্লাদ হয়, কেননা উত্তরদাতাও তাহার সমান ভূমিতে দাঁড়াইয়াছেন, সে আরো আস্ফালনপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়। রাগের কথা শুনিয়া চুপ করিয়া থাকা ভাল, তাহাতে তাহার অহঙ্কারে ঘা লাগে। সে অপমানিত হইয়া আপনা আপনি চুপ করিয়া যায়। কেবল চুপ না করিয়া সে সময় তাঁহার (ভগবানের) নিকট প্রার্থনা করিলে উভয়ের পক্ষে আরো ভাল হয়।

প্র—আমরা অনেক সময় রাগ করা কর্ত্তব্য বোধ করিয়া, লোকের প্রতি যে রাগ প্রকাশ করি, তাহাতে কি দোষ আছে?

উ—সচরাচর দেখা যায়, কাহারো প্রতি কোন কারণে মনে মনে রাগিয়া আছি, শেষে ছল করিয়া সেই রাগ চরিতার্থ হয়। সে স্থলে রাগের কারণ অনুসন্ধান করিয়া প্রতীত হয়, যাহার উপর রাগ করিয়াছি, তাহার ভাল করিবার ইচ্ছা সহস্রাংশের একাংশ আছে কি না। তাহাকে শুনাইয়া দিব, জব্দ করিয়া দিব, এই ইচ্ছাটী পনের আনা।

প্র—অন্যের মঙ্গলসাধন কি রাগের প্রকৃত উদ্দেশ্য?

উ—অন্যের ভাল করা রাগের প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়, কেননা তজ্জন্য ন্যায়পরতা প্রভৃতি বৃত্তি আছে। রাগের অত্যাচার, অন্যায়-নিবারণ প্রভৃতি উদ্দেশ্য। যেখানে দুর্বৃত্ত সকল পীড়ন করিতেছে, কি অসহায় নিরাশ্রয়ের প্রাণবধে উদ্যত, সে স্থলে রাগ উত্তেজিত হওয়া স্বাভাবিক। ধর্ম্মগত রাগ (Righteous Indignation) হইলে তাহাতে দুর্ব্বলকে শত গুণ বলবান্ করে, নিদ্রিত লোককে জাগাইয়া তোলে, ধর্ম্মগত রাগের কথায় লোকের ন্যায়বৃত্তিকে উৎসাহিত করিয়া দেয়। অত্যাচারিত ব্যক্তির সাহায্যার্থ টাকা সংগ্রহ করে। দশ ঘণ্টায় যে কার্য্য হয় না, এক ঘণ্টায় করিয়া ফেলে।

প্র—কিরূপ স্থলে ক্ষমা করা কর্ত্তব্য?

উ—অন্যের সম্বন্ধে অত্যাচার হইলে রাগ হইবে। নিজের সম্বন্ধে কেউ অত্যাচার করিলে ক্ষমা করিতে হইবে। কেউ সত্য, ধর্ম্ম, ন্যায়, এ সকলের বিরুদ্ধাচারী হইলে রাগ প্রকাশপূর্ব্বক শাসন করা কর্ত্তব্য; কিন্তু নিজের বিরুদ্ধাচরণ করিলে মৃত্যু পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া ক্ষমা করা যাইতে পারে।

প্র—ক্ষমা দেখাইতে গিয়া যদি প্রাণ যায়, সে কি ভাল?

উ—ক্রাইষ্টের ক্ষমা আমাদিগের আদর্শ। যাহারা তাঁর প্রাণ বিনাশ করিতে আসিল, তাহাদের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন, 'পিতা! ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কারণ ইহারা কি করিতেছে জানে না।' ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত আমরা অত্যাচার করিতেছি। তিনি অনন্ত দয়াগুণে আমাদের ক্ষমা করিতেছেন। কে বলিবে, তাঁহার অত ক্ষমা ভাল নয়?

প্র—অপবিত্র রাগের লক্ষণ কি?

উ—যাহার উপর রাগ হইতেছে, তাহার দুঃখ দেখিলে সুখ হয় এবং সুখ দেখিলে কষ্ট হয়। তাহার ধর্ম্মলঙ্ঘনজনিত অনুতাপ দেখিলে যে সুখ হয়, তাহা নহে; কিন্তু যেরূপে হউক, তাহাকে যত বিপন্ন ও নিপীড়িত দেখা যায়, মনোমধ্যে ততই আনন্দের সঞ্চার হইয়া থাকে।

প্র—ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধে কেউ কথা রাগিয়া বলিলে সে সময় তাহার প্রতিকার করা উচিত কি না?

উ—অনেক সময় না করাই ভাল। শূকরের নিকট মুক্তা ছড়াইবার নিষেধ আছে। রাগের মুখে প্রতিবাদ না করা হয়, ইহা একটা নিয়ম বলিয়া লিখিয়া রাখা উচিত। রাগের সময়ে প্রতিবন্ধকতা করিলে কেবল যে রাগ বাড়ে তাহা নয়, হিংসা, বৈরনির্য্যাতন-স্পৃহা প্রভৃতি কুভাবও উত্তেজিত হইয়া থাকে।

প্র—যাহার উপর রাগ করা যায়, তাহার প্রতি ক্ষমা অভ্যাস করিবার উপায় কি?

উ—আমরা অনেক সময় মনে করি, অন্যের নিকট কিছু পাইবার আমাদের (Right) অধিকার আছে। সে তাহা না দিলে বা তাহার বিপরীত আচরণ করিলে রাগ হয়; কিন্তু লোকের দুর্ব্ব্যবহার মনে পড়িলে যেমন রাগ হয়, দুর্ব্বলতা স্মরণ করিলে ক্ষমা আইসে। আমি যাহা অধিকার বলিয়া চাই, তাহা দিবার পক্ষে তাহার কত অক্ষমতা ও কত অবস্থার প্রতিকূলতা থাকিতে পারে। তাহার মত আমার অবস্থা হইলে আমি কি করিতাম? এইরূপ অক্ষমতা ও দুর্ব্বলতা দেখিয়া ক্ষমা আইসে। সেইরূপ কথা অধিক ভাবিতে হইবে। লোকের কতদূর পর্য্যন্ত দোষ ক্ষমা করিতে পারি, চিন্তার দ্বারা ইহা ক্রমে ক্রমে মনের আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করা উচিত।

(সমাপ্ত)

—•—

সাধু হীরানন্দ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পঞ্চদশ বৎসর বয়সে প্রথম শ্রেণীর শেষ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াও, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে ষোড়শ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত, প্রবেশিকা পরীক্ষার অধিকার তাঁহার ছিল না। বিদ্যা বুদ্ধিতে প্রবীণ হইয়াও বয়সে নবীন বলিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার পাশের ঐশ্বর্য্য ও গরিমা হইতে হীরানন্দ বঞ্চিত হইলেন। অনেক গবেষণার, অনেক যুক্তি-তর্কের পর স্থির হইল, হীরানন্দকে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে কলিকাতায় পাঠান হইবে। তদনুযায়ী ১৭ই জানুয়ারী, ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে হীরানন্দ শ্রীকেশবচরণে উপস্থিত হইলেন। পারিপার্শ্বিক নির্ম্মল ও পবিত্র আবহাওয়ার গুণে চরিত্রের সৌন্দর্য্য ও হৃদয়ের প্রসারতা লাভ হয়। শ্রীকেশব সেইজন্য হীরানন্দের আবাসস্থল স্থির করিলেন, কতিপয় ভক্তপ্রাণ ব্রাহ্মপ্রচারকের আবাসস্থল ৬নং কলেজ স্কোয়ারের বাটীতে। চতুর্দ্দিকের

পবিত্রতা, ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিদের অকপট আন্তরিকতা ও প্রফুল্লতা, অনাড়ম্বর সেবা ও সৌজন্য হীরানন্দের জীবনকে আনন্দময় করিয়া দিয়াছিল।

বৈদিক যুগের ঋষি-বালকের ন্যায় সাধু হীরানন্দের পাঠ্য-জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর ন্যায় কঠোর নিয়ম পালন করিয়া হীরানন্দ বিদ্যাচর্চ্চা ও ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে লাগিলেন। আহার বিহারে সংযম, বেশভূষায় সংযম, মিথ্যা ক্রীড়াকৌতুকে সংযম, চতুর্দ্দিকে নিবিড় সংযমের নিগড়ে নিজেকে আবদ্ধ করিলেন।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে হেয়ার স্কুল হইতে ডিসেম্বর মাসে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। শ্রীকেশবের নিকট হইতে নভলরায় সংবাদ পাই-লেন যে, হীরানন্দ সর্ব্ববিষয়েই—কি পাঠে, কি নৈতিক জীবনে—উন্নতি লাভ করিতেছে। এই সংবাদে আনন্দিত হইয়া, বালক মতিরামকেও সৎশিক্ষা-লাভের জন্য শ্রীকেশবের চরণে নিবেদন করিবেন এই আশায়, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে নভলরায় তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মতিরামকে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন এবং শ্রীকেশবের চরণাশ্রয়ে রাখিয়া তিনি দেশে ফিরিয়া গেলেন। হীরার নিকট থাকিয়া মতি শ্রীকেশবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণবিহারী সেনের পরিচালিত এলবার্ট স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেন।

বাল্যাবধি পীড়িত ও আর্ত্তের সেবা এবং দীন দুঃখীকে সাহায্য করা স্বভাবোচিত সৌন্দর্য্যে তাঁহার জীবন সুশোভিত ছিল। কেহ অসুস্থ, কেহ পীড়িত, কেহ আহত এই সংবাদ পাইলে, তিনি কখনই ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিতেন না। কত পীড়িতকে, কত আহতকে সেবা করিয়া জীবন দান করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার জীবনের সব চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য যে, তাঁহার পূজনীয় পিতার মৃত্যুশয্যায় সেবা শুশ্রূষায় নিজের জীবনকে ধন্য করিতে পারি-লেন না। বিধাতা তাঁহার সেবাপরায়ণ পুত্রকে সুদূর বাঙ্গলায় গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে পাঠাইয়াছিলেন। পরীক্ষায় জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। সম্মুখে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা, পশ্চাতে জীবন-পরীক্ষা। ২১শে জুলাই, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে সংবাদ আসিল, তাঁহার স্নেহময় পিতা আর ইহজগতে নাই। ব্রহ্মচারী হীরানন্দ নীরবে সে সংবাদ গ্রহণ করিলেন। শোক ব্রহ্মচারীর জন্য নয়, ভগবদ্‌ভক্তের জন্য নয়। নির্ব্বিকার হীরানন্দ পরদিন প্রাতে কনিষ্ঠ ভ্রাতা মতিরামকে এই সংবাদ দিলেন। মতিরামের নিদারুণ আর্ত্তনাদ শুনিয়া তিনি করুণকণ্ঠে কহিলেন, "মতি, ধৈর্য্য ধর! এই শোক আমাদের, জগৎকে করুণ আর্ত্তনাদে ব্যথিত করিও না। এস, আমরা পরম পিতার চরণতলে আমা-দের পুণ্যময় পিতার আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করি; তাহাতে আমরা সান্ত্বনা পাইব, জগৎ শান্তিতে পূর্ণ হইবে।" করুণ প্রার্থনায় শীতল সান্ত্বনা লাভ করিয়া, মতিরাম অগ্রজের নিকট ভগবন্নির্ভরতার পুণ্য প্রভাব প্রথম অনুভব করিলেন। সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে সেই দুটী ভাই হীরা ও মতি কখনও করুণাময় বিধাতাকে ভুলেন নাই, নিত্য ভগবচ্চরণে হৃদয়ের দীন প্রার্থনা জানাইয়া, তাঁহাদের জীবনকে আনন্দময় করিয়া রাখিয়াছিলেন।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে এফ,এ, পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া, পুরস্কারস্বরূপ মাসিক বিংশতি মুদ্রা করিয়া বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। যাঁহার কোমল হৃদয় ব্যথিতের দুঃখে নিত্য আহত হয়, যাঁহার জীবন পীড়িত ও আতুরের সেবায় উৎসর্গিত, তাঁহার পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিলাভ অতি তুচ্ছ সম্পদ্। যিনি কায়মনোবাক্যে জগতের কল্যাণ কামনা করেন, যিনি করুণাময় বিধাতার শান্তিবাণী প্রচার করিয়া হৃদয়ের ব্যাধি দূর করেন, তিনি কি প্রকারে দীন দুঃখীর শরীরের ব্যাধি দূর করিবেন, সেই চিন্তায় আকুল হন। চিকিৎসা-শাস্ত্রে জ্ঞানলাভই তাঁহার আদর্শের উপযুক্ত শিক্ষা। হীরানন্দ মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইবার জন্য উৎসুক হইলেন, কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নভলরায় সেই উদ্যম হইতে তাঁহাকে বিরত করিয়াছিলেন। অগ্রজের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে বি, এ, ক্লাসে ভর্ত্তি হইলেন।

ছাত্রজীবনে সাধু হীরানন্দের সহিত বাঙ্গলার অনেক মনীষী ও মনস্বীর পরিচয়ের সৌভাগ্য হইয়াছিল। তিনি সকলেরই প্রেমে ও স্নেহে আবদ্ধ ছিলেন। সকলেই তাঁহার মধুর স্বভাব ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে মুগ্ধ ছিলেন। প্রথম দর্শনেই সকলেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেন। বসন্ত যদিও নিষ্ঠুর অত্যাচারে তাঁহার মুখমণ্ডলকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া শ্রীহীন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তথাপি তাঁহার হৃদয়ের চির বসন্ত সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে তাঁহার মুখমণ্ডলকে কমনীয় ও রমণীয় করিয়া রাখিয়া-ছিল। পবিত্রতার শুভ্রতা, ব্রহ্মচর্য্যের দীপ্তি ও করুণার কান্তি তাঁহার মুখশ্রীকে মধুর ও মনোহর করিয়া দর্শকের নয়নাভিরাম করিয়া-ছিল। প্রিয়দর্শন হীরানন্দ যে শ্রীকেশবচন্দ্রের সমস্ত পরিবারের অতি প্রিয় পাত্র হইয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি ডাক্তার মহেন্দ্র-লাল সরকার, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রফেসার টাউনী প্রভৃতি অনেক মনীষীর প্রেম ও প্রীতিলাভের সৌভাগ্য হইয়াছিল।

সাধু হীরানন্দের আরাধ্য দেবতা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সংশয়া-পন্ন পীড়িত হইয়া শয্যাশায়ী ছিলেন। শ্রীকেশবচন্দ্রের জন্য উদ্বেগে, তাঁহার সেবার জন্য ঔৎসুক্যে হীরানন্দের পাঠ্য জীবনের কর্ত্তব্য এক প্রকার ভুলিয়া গিয়াছিলেন। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে ও বন্ধুদের অনুরোধে তিনি বি, এ, পরীক্ষা দিলেন। পরীক্ষাজীবী বাঙ্গালী যুবকের ন্যায় পরীক্ষার ফলাফলের জন্য তিনি বিন্দুমাত্র চিন্তিত ছিলেন না। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কি প্রকারে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিবেন, সেই চিন্তাই দিবারাত্রি তাঁহাকে চিন্তিত করিয়া রাখিয়াছিল। ভক্তজনের অক্লান্ত সেবা ও

পরিশ্রমের মধ্যে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ভারতকে শোকসাগরে ডুবাইয়া, ৮ই জানুয়ারি, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে, রাত্রি ১০টার সময় চির নিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। এই নিদারুণ শোকের মধ্যে আশাতীত পরীক্ষার পাশের সংবাদ পাইয়া হীরানন্দ বিন্দু মাত্র আনন্দিত হইলেন না। বন্ধুবান্ধবেরা ভাবিয়াছিলেন যে, হীরানন্দ এই আনন্দ-সংবাদ পাইয়া নিশ্চয় আত্মহারা হইবেন, সেই আশায় তাঁহার আনন্দের প্রতিধ্বনি জানাইতে দৌড়িয়া আসিয়া নিরাশ হইয়াছিলেন। তিনি যে আনন্দের অমূল্য সম্পদ হারাইয়া চিরকাঙ্গাল হইয়াছেন, এই মনের ভাব তাঁহাদিগের নিকট কোন মতেই প্রকাশ করিতে না পারিয়া, বন্ধুদের নিকট শুধু নীরব ছিলেন। হৃদয়-ভাঙ্গা নীরব নিশ্বাস ও অজস্র নয়নের ধারায় সিক্ত করিয়া, তাঁহার হৃদয়-দেবতার শেষ আশীর্ব্বাদ মাথায় তুলিয়া লইয়া কাজে লাগিবেন, ইহাই প্রতিজ্ঞা করিলেন। "সৎ ও পবিত্র হও, বিবেকের বাণী শুনিয়া নিজ ধর্ম্ম ও নিজ দেশকে পূজা করিও।" স্বর্গগত মহাপুরুষের এই শেষ আশীর্ব্বাদই তাঁহার জীবনের চিরলক্ষ্য ছিল এবং মরণ পর্য্যন্ত এ আশীর্ব্বাদ তিনি কখনও ভুলেন নাই।

বহুদিন প্রবাসবাসের পর সাধু হীরানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্রের তিরোধানের পর জননী ও জন্মভূমির কোমল ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিলেন। তখন সিন্ধুদেশে বি,এ, পাশ করা উচ্চশিক্ষিত যুবকের খুবই অভাব ছিল। আত্মীয় স্বজন সকলেরই ইচ্ছা, হীরানন্দ যেন রাজদরবারের কোনও উচ্চপদের প্রত্যাশী হন। এইরূপ নানা জল্পনা কল্পনার মধ্যে তাঁহার একজন প্রিয়তম বন্ধু আসিয়া কহিলেন—"ভাই হীরানন্দ! তুমি উচ্চ শিক্ষিত হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছ, ইহা আমাদের অতি গৌরবের বিষয়। তোমার শিক্ষা ও দীক্ষা যদি দেশের কল্যাণে নিয়োজিত কর, তাহা হইলে তুমিও ধন্য হইবে, স্বদেশও ধন্য হইবে।" বন্ধুর বাক্যে তিনি দেশমাতৃকার আকুল আহ্বান, বাথিত ও অত্যাচারিত কাঙ্গাল দেশবাসীর করুণ ক্রন্দন শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। সেই মুহূর্ত্তেই তিনি জীবনের পথ স্থির করিয়া লইয়া, দেশসেবার জন্য চির দারিদ্র্য ও চির নির্য্যাতন আমন্ত্রণ করিলেন।

সিন্ধুদেশের প্রসিদ্ধ উকিল, দেশভক্ত ও দানবীর শ্রীদয়ারাম জেঠমলের উৎসাহে ও সৌজন্যে সিন্ধুকলেজ ও সিন্ধুসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের হিতকর কাজকর্ম্ম করিবার এবং দেশের অভাব অভিযোগ দূর করিবার মন্ত্রণাগার সিন্ধুসভা ছিল। দেশীয় ভাষায় দেশের সংবাদ দেশবাসীকে জানাইয়া দেশের প্রতি আকর্ষিত করিবার মত কোনও নির্ভীক সংবাদপত্রের প্রচার সিন্ধুদেশে ছিল না। শ্রীদয়ারাম জেঠমল এবং অন্যান্য সিন্ধুসভার সহকর্ম্মিগণ ইংরেজি সংবাদপত্র সিন্ধুটাইম্‌সের সত্বাধিকারী মিষ্টার এম, এন, পোচাজি এবং মিঃ ডোরাবজিকে বিশেষ অনুরোধে সম্মত করাইয়া স্থির করিলেন, সিন্ধুসভার মুখপত্রস্বরূপ 'সিন্ধুটাইম্‌স' ও 'সিন্ধুসুধার' প্রকাশিত হইবে। উভয় পত্রিকার কর্ম্ম-সচিব হইবেন সিন্ধুসভার মনোনীত একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি। এত বড় দায়িত্ব গ্রহণ করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি সিন্ধুদেশে একমাত্র সাধু হীরানন্দ ছিলেন। নামমাত্র ১৭৫৲ টাকা বেতনে তিনি সম্পাদকের কর্ম্ম করিতে স্বীকৃত হইলেন। দেশসেবা যাঁহার লক্ষ্য, ত্যাগই যাঁহার মন্ত্র, অর্থ তাঁহার নিকট অতি তুচ্ছ। সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ কখনও সুখ ও স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে পান না। নির্ভীকভাবে দেশের ও দশের সেবা করিতে হইলে, হয়ত সম্পাদকগণ রাজ-আক্রোশে পড়েন এবং স্বার্থপর ব্যক্তিদের অতি বিরাগভাজন হন; কিন্তু তাই বলিয়া সম্পাদকগণ তাঁদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য কখনও ভুলেন না। নির্ভীক, তেজস্বী ও সত্যবাদী হীরানন্দের ভাগ্যে এই প্রকার কতকগুলি অসন্তুষ্ট ব্যক্তির নিদারুণ আক্রমণ-লাভের সৌভাগ্য হইয়াছিল; কিন্তু তিনি কখনও সত্যের পথ হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। স্বদেশ এবং দেশদেশান্তরের নানাবিধ সংবাদে, চিন্তাশীল লেখকের গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধে এবং কল্যাণময়ী সচ্চিন্তার ধারায় পরিপুষ্ট হইয়া "সিন্ধুটাইমস" ও "সিন্ধুসুধার" প্রকাশিত হইতে লাগিল। ভারতের ও দেশবিদেশের সত্য এবং সমুচিত সংবাদ যাহাতে এই সংবাদপত্রে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য প্রত্যেক স্থানে এক একটি সংবাদ-প্রেরকের অনুসন্ধান করিয়া কতক কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। তাঁহার অন্তরতম প্রিয়তম বন্ধু, সর্ব্বজনপূজ্য, নির্ভীক দেশকর্ম্মী শ্রীব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কেও প্রবন্ধের জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লেখেন এবং শ্রীব্রহ্মবান্ধব প্রিয়তম বন্ধুর অনুরোধে নিয়মিতরূপে প্রাণস্পর্শী ও তেজোময় প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য হীরানন্দকে পাঠাইতেন। হীরানন্দের অদম্য উৎসাহে এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে 'সিন্ধুটাইমস' 'সিন্ধুসুধার' প্রবল জনমতের নির্ভীক মুখপত্ররূপে সিন্ধুদেশে আদৃত হইল এবং অল্পসময়ের মধ্যে পাঠকের ও গ্রাহকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায়, একাকী পত্রিকাদ্বয়ের পরিচালনা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। সিন্ধুসভার অনুমোদনে শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়কে একশত টাকা বেতনে, ১৮৮৪খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে তাঁহার সহকর্ম্মিরূপে কলিকাতা হইতে তথায় আনাইলেন। দেশের ও দশের অর্থ লইয়া সচ্ছলতালাভ তাঁহার ধর্ম্মবিরুদ্ধ ছিল, সেইজন্য হীরানন্দ নিজের বেতনের হার কমাইয়া মাত্র ৭৫৲ লইতে স্বীকৃত হইলেন।

মহামতি লর্ডরিপণের স্বায়ত্তশাসন বিল কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড এ্যাক্ট ও ডিষ্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট অনুযায়ী কার্য্যের সূচনা ১লা নভেম্বর হইতেই আরম্ভ হয়। সভ্যনির্ব্বাচনের প্রবল উৎসাহ ও উদ্যমে করাচি সহর আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীদয়ারাম জেঠমল ও সাধু হীরানন্দের একান্ত চেষ্টায় উপযুক্ত দেশসেবক কর্পোরেশনের সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

নীচপ্রবৃত্তি ব্যক্তিদের কোনও নিকৃষ্ট পন্থা তাঁহার আশা ও উদ্যমকে ব্যর্থ করিতে পারে নাই।

ভারতবাসীর সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন-লাভের চেষ্টা ও উদ্যম মহামতি লর্ডরিপণ প্রীতি ও সহানুভূতির চক্ষে দেখিয়া অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন, যাহার জন্য কাঙ্গাল ভারতবাসীর নিকট তিনি প্রেমময় ভারতবন্ধুরূপে গণ্য হইয়াছেন। তাঁহার কার্য্যাবসানের পর যখন তিনি স্বদেশে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, তখন ভারতবাসীর বেদনার পুষ্পাঞ্জলিতে তিনি ভারাক্রান্ত হইয়াছিলেন। সমস্ত ভারতবাসীর নিকট হইতে এমন আন্তরিক বিদায়বাথা লাভ করিবার সৌভাগ্য আর কোনও রাজপ্রতিনিধির হয় নাই। সাধু হীরানন্দের যত্ন ও উদ্যমে সিন্ধুদেশ লর্ডরিপণের মর্ম্মস্পর্শী বিদায় উৎসবে সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান করিয়াছিল।

বাঙ্গলার শ্যামল ও কোমল ক্রোড়ে তিনি বিকশিত জীবন লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। বাঙ্গালীর মহাপুরুষ, মনীষী ও দীনবন্ধুর পবিত্রজীবনের মহান্ আদর্শ তাঁহার অমৃতের পথে অমূল্য পাথেয় ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভগবৎপ্রেমোন্মাদ, শ্রীকেশবচন্দ্রের ধৰ্ম্মপরায়ণতা ও দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের দীন দরিদ্রের বান্ধবতা গঙ্গার ত্রিধারার ন্যায় তাঁহার মধুময় জীবনকে প্লাবিত করিয়াছিল। সেই প্রবাহ যাহাতে সিন্ধুদেশকে প্লাবিত করে, সেই আশায় তাঁহার কর্ম্ম-প্রণালী শতমুখী করিলেন।

ধৰ্ম্মই জাতীয় শক্তির সুদৃঢ়ভিত্তি, এই জ্ঞান সাধু হীরানন্দের চিরদিন ছিল। হৃদয়ের নির্ম্মলতায়, উন্মুক্ততায় ও প্রসারতায় পথ একমাত্র ধৰ্ম্মই দেখাইয়া দিবে। প্রত্যেক ধর্ম্মের প্রাণ যে প্রেম, সেই প্রেমই সমস্ত সম্প্রদায়, সমস্ত ধর্ম্মাবলম্বী ও সমস্ত মনুষ্য-জাতিকে উন্নত ও উদ্বুদ্ধ করিয়া মিলনসূত্রে বাঁধিয়া রাখিবে। যেখানে সঙ্কীর্ণতা সেখানে সংঘর্ষ, যেখানে স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াস সেখানে বিরোধ, যেখানে বিদ্বেষ সেখানে বিচ্ছেদ, যেখানে আত্মপ্রতিষ্ঠা সেখানে বিশৃঙ্খলতা; কিন্তু যেখানে প্রেম, যেখানে ত্যাগ, যেখানে উদারতা, যেখানে ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা, সেখানে মিলনের পুণ্যবেদী চির প্রতিষ্ঠিত। পারিপার্শ্বিক অসাধু অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার শ্বাস প্রশ্বাসে মানুষ পীড়িত হইয়া মতিভ্রান্ত হয়। হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা ও সংঘর্ষের সূচনায় হৃদয় কলুষিত হয় এবং প্রেমের পুণ্য প্রভাব মলিন হইয়া পড়ে। এই নিদারুণ দৃশ্য দেখিয়া সাধু হীরানন্দ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। ধৰ্ম্মই হৃদয়ের প্রেম-শতদল প্রস্ফুটিত করিয়া, চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়া মিলনের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবে, এই উদারবাণী তিনি সিন্ধুদেশে প্রচার করিতে লাগিলেন। সমস্ত ধৰ্ম্মই এক, সমস্ত ধর্ম্মের মহামন্ত্র প্রেম। প্রেমের পুণ্যপ্রভাবে বিধাতার পূর্ণপ্রকট। বিভিন্ন ধর্ম্মের, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের, বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন আরাধনা-প্রণালী যে মহৎ এবং একই বিরাট অবিনশ্বর প্রেমপুরুষের চরণে পঁহুছাইয়া দিবার উজ্জ্বল পথ এবং বিধাতার লীলা-নিকেতন, ভক্তের আরাধনাস্থল চিরপবিত্র এবং সমস্ত ধৰ্ম্মাবলম্বীর শ্রদ্ধার সম্পদ্। সমস্ত ধর্ম্মের আরাধনামন্দির সিন্ধুদেশে প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের সুগঠিত মন্দির না থাকায় তিনি মর্ম্মাহত হইলেন। অর্থের অভাবে মন্দির-নির্ম্মাণ অসম্ভব; কিন্তু ধৰ্ম্ম যখন সকলের সম্পদ, তখন সমস্ত ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তির সহায়তা ও সহানুভূতিতে ধৰ্ম্মমন্দির নির্ম্মিত হইবে, এই আশায় তিনি কতিপয় সহকর্ম্মী লইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। সর্ব্বজনপূজ্য সাধু হীরানন্দ ধর্ম্মের জন্য ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইয়া পথের ভিখারী হইলেন। হিন্দু, মুসলমান এবং অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীর মুক্তদানে তাঁহার ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ হইয়াছিল এবং সেই অর্থে তিনি সমস্ত ভগবদ্ভক্তের হৃদয়রঞ্জন করিয়া মনোরম ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন; এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীনভলরায়ের প্রচুর দানে ও নিজের সঞ্চিত অর্থে হাইদ্রাবাদে আর একটী মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅমরেশচন্দ্র সিংহ (এ্যাড্‌ভোকেট, পাটনা)।

একখানি পত্র।

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ধৰ্ম্মতত্ত্বসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

আমার নিম্নলিখিত কথাগুলি ধর্ম্মতত্ত্বে স্থান দিয়া সুখী করিবেন।

নববিধান "পবিত্রাত্মার বিধান", একথা কেন বলা হইল? বিশেষ করে একথা নববিধান সম্বন্ধে কেন বলা হইল, তাহা কি আমরা ভেবে দেখেছি? অন্যান্য সমস্ত বিধানে দেখা যায়, এক একজন Prophetএর জীবনের সঙ্গে সেই সব বিধান অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ; এমন কি, তাঁহাদের নামেই উক্ত বিধান সকল পরিচিত। কিন্তু বর্ত্তমান বিধান কোনও মানুষের নামের সঙ্গে গ্রথিত হয় নাই। বরং পবিত্রাত্মার বিধান বলিয়াই পরিচিত। অন্যান্য বিধান কি পবিত্রাত্মার প্রণোদিত নয়? সকল বিধানই দেবনিশ্বাসে নিশ্বসিত হয়ে, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মধ্য দিয়া প্রকাশ পেয়েছে। ভগবানের যে লীলা উক্ত সব জীবনে প্রকাশিত হয়েছে, তাহা নিয়াই উক্ত সব বিধান ভিন্ন ভিন্ন Prophetএর নামে প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু বর্ত্তমান বিধান কোনও মানুষের নামে গ্রথিত না হয়ে, বলা হয়েছে, ইহা নববিধান—ইহা পবিত্রাত্মার বিধান—এই বিধানের কোনও বিশেষ high priest নাই। অনন্ত কালপ্রবাহের মধ্য দিয়া—অতীতে, বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতের কত স্থানে—এশিয়া, ইউরোপ, ও আমেরিকায়, কিংবা অজানিত কোনও গ্রহতারকাবাসী মনুষ্যলোকে—এই আদর্শের স্বর্ণরশ্মি সকল কত কত জ্ঞান ভক্তির high peaks সকলের মস্তিস্ক স্পর্শ করিয়া, evolution

এর অনিবার্য্য ফলে অদ্য নববিধান নাম ধারণা করিয়া—পবিত্রাত্মার অভ্রান্ত প্রেরণায়, অনন্তের আদর্শ বক্ষে ধারণ করিয়া—মানবজাতির হৃদয়ের স্তর সকল আন্দোলিত করিয়া—সামঞ্জস্যের নব নব রসে পুষ্ট হইয়া—নব হইতে নবতর পূর্ণতায় মণ্ডিত হইয়া—বিন্দু সকলের সামঞ্জস্যে মিলিত প্রবাহ সিন্ধু পানে আবেগের পূর্ণতায় ধাবিত হইতেছে। এই বিশেষত্বই এই বিধানের নূতনত্ব। ইহার আর একটা নূতনত্ব স্বীকৃত হয়েছে যে, ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সকল বিধানের সামঞ্জস্য; কিন্তু এরূপ সামঞ্জস্য কি অন্যান্য বিধানে নাই? দেখা যায়, সকল Prophetই বলিয়া গিয়াছেন, "I have come to fulfil and not to destroy." এই কথা দ্বারাই কি আমরা বুঝিতে পারিতেছি না যে, সকল বিধানই তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব আনিত বিধান সকলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে প্রচারিত হয়েছে? তাহা হইলে আমরা দেখতে পাই যে, নববিধানের বিশেষত্ব ও নূতনত্ব সামঞ্জস্যের ভূমিতে তত উজ্জ্বল নহে, তত সর্ব্ববাদিসম্মত হইবার কারণ নাই।—(যদিও নববিধানের সামঞ্জস্যে সাধুভক্তগণের রক্ত মাংস পান ভোজনের আদর্শে একটা বিশেষ গৌরব আছে। একথা সত্য, যীশু সাধুর রক্ত মাংস পান ভোজনের আদর্শের প্রথম প্রবক্তা। কিন্তু তিনি কেবল তাঁহার নিজের রক্ত মাংস পান ভোজনের কথাই বলে গেছেন। এবং এজন্যই তাঁহার বিধান তাঁহার নামের সঙ্গে co-terminus। নববিধানের আদর্শে সকল সাধুর রক্ত মাংস পান ভোজনের কথা—ইহা একটী নূতন জিনিষ এবং ইহা ইহাকে অন্যান্য বিধান হইতে স্বতন্ত্র করিয়াছে এবং ইহা যে কোনও মানুষের জীবনের সঙ্গে co-terminus নহে, তাহাই প্রমাণ করিতেছে। এরূপ না হলে, ইহাকে একটী নূতন বিধান বলে ঘোষণা করার কোনও প্রয়োজন ছিল না)। সামঞ্জস্যের বিধান চিরকালই আছে। তাহা হইলে প্রমাণ হচ্ছে যে, নববিধানের বিশেষত্ব ও নূতনত্ব—ইহা যে পবিত্রাত্মার বিধান বলে স্বীকৃত হয়েছে এবং ইহা যে কোন মানুষের জীবনলীলার সঙ্গে co-terminus নহে—তাহাতেই প্রধান ভাবে ও উজ্জ্বল ভাবে ফুটে উঠেছে। তবে কি কেশবচন্দ্রের ইহাতে বিশেষ কোনও স্থান নাই? অবশ্যই আছে। সমস্ত Apostles গণের ইহার মধ্যে বিশেষ স্থান আছে। প্রত্যেক প্রকৃত নববিধান-বিশ্বাসীর ইহার মধ্যে বিশেষ স্থান আছে। পবিত্রাত্মা দ্বারা নিশ্বসিত হয়ে যিনি যাহা বলিয়াছেন ও করিয়াছেন, তাঁহারই কথার ও জীবনের এ বিধানে বিশেষ স্থান আছে। তবে কেশবের স্থান কোথায়? Prophet সম্বন্ধে বলিতে গিয়া কেশব সকল Prophetএর বিশেষত্ব স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু ঈশাকে সকলের centre বলিয়া গিয়াছেন—পুত্রত্বকে centreএ স্থান দিয়াছেন। সেইরূপ এই নূতন বিধানে কেশবকে—সকল ভাবের ভাবুক বলে, তাঁহার জীবনে সকল ভাবের সামঞ্জস্যের সমতা দেখে (perfection দেখে)—জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্ম্ম কোনটা কোনটাকে অতিক্রম করিতে না পারা দেখে—central place দিতে আমার ইচ্ছা হয়। নিজের জীবনে যে ভগবানের লীলা, তাহার সঙ্গে তিনি এই বিধানকে co-terminus করিলেন না; কিন্তু তিনি যে এ বিধানের centre, তাহা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য। সকল সামঞ্জস্যের সামঞ্জস্য তাঁহার জীবনে হয়েছে, তাই তাঁহার স্থান centreএ। অন্যান্য Apostlesদের জীবনে দেখা যায় যে, যদিও তাঁহারা সকলেই সকল ভাবের ভাবুক, কিন্তু বিশেষ বিশেষ ভাব তাঁহাদের জীবনে অধিকতর পরিপুষ্টি লাভ করেছে। কেশব-জীবনে সকল ভাবেরই এক অপূর্ব্ব সমতা দেখা যায়। এই সমতাব্যঞ্জক সামঞ্জস্যই তাঁহার বিশেষত্ব এবং ইহাই তাঁহাকে এ বিধানে central figure করেছে। ভাবের intensityর দিক দিয়ে নহে, কিন্তু সমতার দিক দিয়াই কেশবজীবনের বিশেষত্ব। আর একটা কথা। এই যে সমতামূলক সামঞ্জস্য, তাহার চাবিটা ভগবান্ কেশবের হাতে দিয়াছেন। কিন্তু সঙ্গীতে যে আছে, "সম্মুখে অনন্ত জীবন-বিস্তার, নীরব নিস্তব্ধ নিবিড় আঁধার" ইহাও পরম সত্য কথা এবং এই কথা যেন আমাদের ভুল না হয়। কেশব এই সমতামূলক সামঞ্জস্য-বিধানের keyটী পাইয়াছেন বটে, কিন্তু ইহার বিস্তৃতি ও গভীরতা সম্বন্ধে কেশব নিজেই বলেছেন, "নববিধানের পূর্ণ ধর্ম্ম ভবিষ্যতে"। ঋষিতুল্য অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ লিখেছেন, "Does any man know the limits and full contents of the world?.........Whose is the 'Reason' that can take at one view the entire range of time and space as one whole, hold in a single grasp the infinite contents that fill them?" এই ধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশ humanityর বক্ষে অনন্ত কাল চলিবে। ইহার High Priest একমাত্র পবিত্রাত্মা। শ্রদ্ধেয় ভাই মহিম চন্দ্র সেন মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, কেশব যখন Town Hallএ "Am I an inspired Prophet" এই বক্তৃতা দেন ও বক্তৃতায় নিজে Prophetএর position ত্যাগ করেন, তখন বন্ধুদের মধ্যে অনেকে তাঁহার এই কথার প্রতিবাদ করেন। তখন কেশব উত্তরে বলেন যে—"Prophet কখনও মিথ্যা কথা বলতে পারেন না। আমি বলেছি, আমি Prophet নহি। আমি Prophet হইলে মিথ্যাবাদিতার দোষ আমাতে বর্ত্তে। কিন্তু Prophet যখন মিথ্যাবাদী হতে পারেন না, তখন আমি Prophet নহি।" কেশব নববিধানের আচার্য্য (Central figure), Prophet নহেন। এই positionই কেশবকে অন্যান্য Prophet হইতে Single out করিয়া, তাঁহাকে গৌরবান্বিত ও মহিমান্বিত করিয়াছে। ভগবানের ও পবিত্রাত্মার মহিমা ও গৌরব গৌরবান্বিত করিয়া নিজেও গৌরবান্বিত হইয়াছেন ও মহিমার মুকুট মস্তকে ধারণ করিয়াছেন। ঈশা কণ্টকের মুকুট ধারণ করিয়া,

মানবজাতির সঙ্গে, পাপীর সঙ্গে একপ্রাণ হইয়া, পাপীর জন্ত প্রাণত্যাগ করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছেন। কিন্তু কেশব মানবের নিকট ভগবানকে ও পবিত্রাত্মাকে উপস্থিত করিয়া, ভগবানের সঙ্গে ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে মানবের direct সম্পর্ক স্থাপন করিয়া যে অনন্ত উন্নতির পথ অঙ্গুলী-নির্দ্দেশে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই তিনি যে মহিমার মুকুট মস্তকে ধারণ করিয়াছেন, তাহা চিরকাল উজ্জল থাকিয়া মানবাত্মার পরিত্রাণের পথ সুগম করিয়া রাখিবে। এ বিধানের বাহক কেশব একা নহেন। মানবজাতি—অতীতের, বর্ত্তমানের ও ভবিষ্যতের—সকলে ইহার বাহক। সকলের মধ্যে যে পবিত্রাত্মা বাস করিতেছেন, সেই পবিত্রাত্মার নিশ্বাসে এই বিধান গঠিত হইয়াছে এবং চিরকাল নব নব ভাবে ও রসে পরিপুষ্ট হইয়া চির নবীন থাকিয়া, জগতের পরিত্রাণের কারণ হইবে। এ বিধান একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর finally গঠিত পুতুল নহে। ইহা একটী জীবন্ত নব শিশু। এখনও অনেক অপূর্ণতা রয়েছে। "It doth not yet appear what it shall be." কিন্তু এই নবশিশু অনন্ত জীবনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। অনন্তের বক্ষে, অনন্তজীবন-প্রবাহের সংস্রবে, ইহা অনন্তকাল বিকাশ পাইবে। অনেক দেবনিশ্বাস ইহার জীবনের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হয়েছে। অনন্তকাল আরও পবিত্রাত্মার কত নিশ্বাস ইহাকে পরিপুষ্ট করিবে, তাহা চিন্তার অগোচর। "অবাঙ্‌মনসো গোচরং"। "কেশব একখানা নূতন কাপড়ের আগা গোড়া করিতে আসিয়াছিলেন" একথা মিথ্যা নহে। তিনি যে কাপড়-খানা বুনিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর। প্রত্যেক part অন্যান্য সমস্ত partএর সঙ্গে কেমন সুন্দর সামঞ্জস্যে বুনা হইয়াছে। এটী অতি নিখুঁত হইয়াছে, এবং নানা রঙ্গে রঞ্জিত হয়ে অতি চিত্তমুগ্ধকারী হয়েছে। এমতই কাপড় খানা হয়েছে যে, প্রাণ সহজেই প্রলুব্ধ হয় যে, ঐ কাপড় খানা পরিধান করে একবার প্রাণভরে হরিবোল হরিবোল করি। কিন্তু ভবিষ্যৎ বংশ পবিত্রাত্মার আলোকে, ইহার চারিপাশে ও centreএ অনেক নূতন বুনট করিবেন। তাহাও থাপে থাপে এমত সুন্দর ভাবে সামঞ্জস্য মিলায়ে বসিবে যে, কাপড়খানা উজ্জলতর ও সুন্দরতরই হইবে, এবং প্রত্যেক বুনটই বেশ সামঞ্জস্য মিলায়ে বসিবে। নানা রঙ্গের নানা সূতা এমত ভাবে পাশে পাশে বসিবে যে, ইহাকে আরও ঘনবুনটে দৃঢ় ও সবল করিবে। এমতভাবে ইহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইবে ও নূতন সূতার এমন দৃঢ়বন্ধ হইবে যে, ইহা ছিন্ন হইবার আর কোনও কারণ থাকিবে না। ইহার নূতনত্ব চিরনূতন থাকিবে, কিন্তু কোথাও কোনও অসামঞ্জস্যের রেখাও পড়িবে না।

"Ever ascending by ever transcending". (Vaswani)—Keshub holds the key of ever ascending by ever transcending. এবং ইহাই কেশবের নববিধানে নির্দ্দিষ্ট স্থান। আরও অনেক কথা মনে আসে। কিন্তু আশা করি, আমার মনের ভাব ইহাতেই সুধীগণ বুঝিয়া লইতে পারিবেন। আর একটা কথা বলি। যদি কেশবকে পবিত্রাত্মার আলোকে বুঝে, শুধু তাঁহার utterance ধরে চলে গেলেই হইত, তবে কেশব এত আড়ম্বর করে Pilgrimage to Saints—ঈশাসমাগম, বুদ্ধসমাগম, চৈতন্যসমাগম প্রভৃতি মণ্ডলীর সাধনের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করে গেলেন কেন? নিজে এসব সাধন করে, আমাদের জন্ত ও মণ্ডলীর জন্ত, অন্যান্য Prophetদের ন্যায়, শুধু কেশব-সমাগম প্রবর্ত্তিত করে গেলেইতো পারিতেন। ইহাতেই প্রমাণ হয় যে, কেশব মনে করিতেন যে, প্রত্যেক মহাজনের মধ্য দিয়াই এত সব বিশেষত্ব পাওয়া যায়, যাহা তিনি একা দিতে পারেন না। সকল বিশেষত্বের ছাপ কেশবের মধ্যে আছে বটে, এবং সমতাপ্রাপ্ত হয়ে আছে; কিন্তু প্রত্যেক বিশেষত্বের পূর্ণ বিকাশ পেতে হলে, প্রত্যেক মহাজনের নিকট যেতে হবে। এর জন্যই আমি বলিতে চাই যে, কেশবের নিকট নববিধানের চাবী রয়েছে। কিন্তু চাবী দিয়া দরজা খুলে, সকল গণ্ডির কথা, ভুলে যেয়ে, সকলকে গ্রহণ করিতে হইবে। নববিধানের প্রধান কথা, ভক্ত-সঙ্গে ভগবান্‌কে পেতে হবে। সকল ভক্ত-চরিত্র assimitate করে নববিধানী হতে হবে। ভূতের, বর্ত্তমানের, ভবিষ্যতের সকল সাধককে প্রাণে স্থান দিয়া পথে চলতে হবে। এখানে কোনও গণ্ডির রেখা টানিবার দরকার নাই। কেশব এই পথের পথ-প্রদর্শক। কিন্তু তিনি কোনও পূর্ণ ও অভ্রান্ত Prophetএর স্থান চান নাই। ইহাই তাঁহার গৌরব। তিনি স্পষ্টই বলিলেন, "পূর্ণধর্ম্মের আদর্শ যদি রেখে যেতে পারিতাম, তবে ভাল ছিল।" তাহার অর্থ, তাহা পারেন নাই। আরও বলিলেন, "নববিধানের পূর্ণ ধর্ম্ম ভবিষ্যতে"। আমার শেষ কথা—হে নববিধান-বিশ্বাসী ভাই, এত centre, radius ও circumferenceএর কথায় দরকার আছে কি? "অনন্তের টানে, অনন্তের পানে, ধায় প্রাণ-নদী বাধা নাহি মানে; বাঁধা আছি যার সনে প্রাণে প্রাণে, তাঁহারেই প্রাণ চায়।"

এই অনন্তের বক্ষে, কেশবেরই মত সমস্ত গণ্ডি ছিঁড়ে, পক্ষপুট বিস্তার করে উড়তে শিখি। এই অনন্তের টানে সব ভুলে—centre, radius ও circumference সব ভুলে—এই অনন্তের অসীমে চলে যাই। "Ever ascending by ever transcending."(Vaswani) পরিত্রাণের কোনও ভুল হবে না। হে নববিধান-বিশ্বাসী ভাই, এরূপ হলেই নববিধান মহিমান্বিত হবে ও নববিধান জগতে পূজিত হবে। ভাই, নববিধানকে কেশবের গণ্ডিতেও বাঁধিও না। নববিধান "freedom itself"। ইহা স্বয়ং মোক্ষ। ইহা ব্রহ্মের স্বভাবের সঙ্গে co-terminus। এই নববিধানকে কোন বন্ধনে বাঁধিও না। ইহা অনন্ত আকাশে পক্ষপুট বিস্তার করে, সমস্ত বাধা ও গণ্ডি অতিক্রম করে, অনন্ত জীবনে অনন্ত স্বামীর

ক্রোড়ে স্থান পাবে। সেখানেও স্থির নহে। অনন্ত জীবনপ্রবাহ চলিবে। এবং "ভক্তগণ কোলে ভগবতীকে" ক্রমাগত পেয়ে পেয়ে ধন্য হবে।

শ্রীউমাপ্রসন্ন ঘোষ।

পরলোকে মেজর মুখার্জ্জি।

(ইউরোপে ক্যাম্বেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের মৃত্যু)

জুরিচ (সুইজারল্যাণ্ড) হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, তথায় গত সোমবার ১৫ই মে তারিখে, কলিকাতা ক্যাম্বেল হাসপাতালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেজর সত্যেন্দ্রনাথ মুখুজ্যে এম, বি, এফ, আর, সি, এস (এডিন) আই, এম, এস, মারা গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫১ বৎসর মাত্র হইয়াছিল।

কিছুকাল যাবৎ মেজর মুখুজ্যের স্বাস্থ্য ভাল যাইতে ছিল না। স্যার নীলরতন সরকার প্রমুখ বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ পরীক্ষার পর তাঁহার যক্ষ্মা হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। কিছুকাল দার্জ্জিলিংএ বায়ুপরিবর্ত্তনের পর তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন এবং অনেকের পরামর্শে চিকিৎসার্থ ইউরোপ গমন করেন। সঙ্গে তাঁহার পত্নীও ছিলেন। জুরিচের চিকিৎসকগণ তাঁহাকে পরীক্ষার পর বলেন যে, যক্ষ্মা নহে, যকৃতের রোগ। ইতিপূর্ব্বে যক্ষ্মা সন্দেহে কলিকাতায় যে চিকিৎসা হইয়াছে, তাহাতে উপকার না হইয়া বরং ক্ষতিই হইয়াছে। জুরিচ হইতে শেষ পত্রে মেজর মুখুজ্যে লিখিয়া জানান যে, তাঁহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন এবং যে কোনও মুহূর্ত্তে তাঁহার মৃত্যু হইতে পারে।

সংক্ষিপ্ত জীবনী।

মেজর মুখুজ্যে স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখুজ্যের ভ্রাতুষ্পুত্র রায় বাহাদুর মতিলাল মুখুজ্যের পুত্র। প্রথমে তিনি সুবিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশক এস, কে, লাহিড়ীর কন্যাকে বিবাহ করেন। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি বি, এল, গুপ্তের কন্যাকে বিবাহ করেন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে এম, বি পাশ করিয়া তিনি বিলাত যাইয়া এডিনবরা হইতে এফ, আর, সি, এস, উপাধি লাভ করেন। ভারতে প্রত্যাগত হইয়া প্রথমেই তিনি চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করেন। পরে বিগত মহাযুদ্ধের সময় এম্বুলেন্স কোরে যোগদান করেন। যুদ্ধের পর ভারতীয়দিগের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের রেসিডেণ্ট সার্জ্জন নিযুক্ত হন। কিছুকাল সিভিল সার্জ্জনও হইয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি ক্যাম্বেল হাসপাতালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ভারতীয়দিগের মধ্যে ক্যাম্বেল হাসপাতালেও তিনি সর্ব্বপ্রথম এই দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার ৩ পুত্র ও বিধবা পত্নী বর্ত্তমান আছে। চিকিৎসা ব্যবসা ভিন্ন তিনি একজন ভাল খেলোয়াড়, ও ক্রিকেট খেলাতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

("আনন্দবাজার" হইতে উদ্ধৃত)

—০—

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ৭৩নং রাজা দিনেন্দ্র ষ্ট্রীট, শ্রীমান্ বীরেন্দ্রনাথ বানার্জির শিশুকন্যা "লীলার' জন্মদিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। পিতা এই উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে ১৲ দান করিয়াছেন। ভগবান্ শিশুকে ও পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

নামকরণ—গত ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১এ মন্মথ ভট্টাচার্য্য ষ্ট্রীটে, স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র দাসের পুত্র শ্রীমান্ বিমলচন্দ্র দাসের প্রথম সন্তান শিশু কন্যার নামকরণ অনুষ্ঠানে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন এবং শিশুকে "আভারাণী" নাম প্রদান করেন।

গত ২৪শে মে, নিউপার্কষ্ট্রীটে, শ্রীযুক্ত নীহার সেন গুপ্তের শিশুপুত্রের নামকরণে, শিশুর দিদিমাস্থানীয়া শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী সেন উপাসনা করেন এবং শিশুকে "শিশিরকুমার" নাম প্রদান করেন।

ভগবান্ শিশুদিগকে ও তাহাদের পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

জাতকর্ম্ম ও নামকরণ—গত ২২শে মে, ময়ুরভঞ্জ-রাজপ্রাসাদে রাজাবাগে, নন্দগাঁওর রাজাসাহেব শ্রীমান্ সর্ব্বেশ্বর দাস বাহাদুরের এবং ময়ুরভঞ্জের মহারাজকুমারী ও মহারাণী সুচারু দেবীর প্রিয়তমা কন্যা রাণীসাহেবা শ্রীমতী জয়ন্তী দেবীর নবজাত শিশু রাজকুমারের জাতকর্ম্ম ও নামকরণ অনুষ্ঠান নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন এবং রাজাসাহেব নবসংহিতার প্রার্থনা ইংরেজীতে আবৃত্তি করেন। রাজকুমারের নাম "দিগ্বিজয়" রাখা হইয়াছে। উপাসনান্তে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক আশীর্ব্বচন উচ্চারণে ধান্যদূর্ব্বাচন্দনাদি দিয়া শিশুকে অভিনন্দন করেন। গত ২৫শে এপ্রিল এই শিশুরাজকুমার রাজাবাগ রাজপ্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন। ভগবান্ শিশু রাজকুমারকে, পিতামাতা রাজাসাহেব ও রাণীসাহেবাকে এবং নন্দগাঁও রাজ্যকে আশীর্ব্বাদ করুন। এই উপলক্ষে শিশুরাজকুমারের মাতামহী মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ১০০৲ টাকা দান করিবেন।

পারলৌকিক—আমরা গভীর দুঃখের সহিত, শোক-সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে :—

গত ১৫ই মে (১লা জ্যৈষ্ঠ) সুইজারলণ্ডে, জুরিচ নগরে, কাশীপুরের স্বর্গীয় রায় বাহাদুর ডাঃ মতিলাল মুখোপাধ্যায়ের মধ্যমপুত্র, কলিকাতা ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট,

পিতার উপযুক্ত গুণধর পুত্র, অস্ত্রচিকিৎসায় সুনিপুণ, সর্ব্বজনপ্রিয়, পরোপকারী, বিনীত, অমায়িক মেজর সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৫১ বৎসর বয়সে, প্রায় অশীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধা মাতা, তিনপুত্র, দ্বিতীয়া পত্নী, ভাই বোন, বহু আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ (২৮শে মে) কাশীপুরে, ২৯নং হরেকৃষ্ণ শেঠ লেনস্থ ভবনে, তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই অক্ষয়কুমার লধ উদ্বোধন ও আরাধনা, ডাঃ সত্যানন্দ রায় শাস্ত্রপাঠ এবং ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক অনুষ্ঠানের শান্তিবাচন অংশ সম্পন্ন করেন। এই পবিত্র অনুষ্ঠানে বন্ধুবান্ধব অনেকেই যোগদান করিয়া, পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্পণ করিয়াছেন। এই অনুষ্ঠানে নববিধান প্রচারভাণ্ডার ১০৲, নববিধান সমাজ ১০৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ১০৲ ব্রাহ্মরিলিফ ফণ্ড ১০৲, কালা বোবা স্কুল ৫৲, অন্ধ স্কুল ৫৲, *Little Sisters of the Poor* ৫৲, অনাথআশ্রম ৫৲, প্রমথলাল শিক্ষাতীর্থ ৫৲, পুরী নববিধানমন্দির ৫৲, এবং ক্যাম্বেল *Poor Fund*এ ১০৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ১৫ই মে, ময়মনসিংহে, স্বর্গীয় বিহারীকান্ত চন্দের পৌত্র, শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র চন্দের বর্ত্তমান জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ সুশান্তকুমার বহুদিন রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া, ২১ বৎসর বয়সে, পিতামাতা, ভাই বোন, আত্মীয় স্বজনদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, অমরজননীর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। গত ২১শে মে, ময়মনসিংহে তাহার আদ্যশ্রাদ্ধ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। ঢাকার শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র দাস উপাসনা করেন। এই অনুষ্ঠানে কলিকাতা নববিধান প্রচারভাণ্ডারে ২৲, ময়মনসিংহ নববিধান সমাজে ২৲ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ২৲, ঢাকা নববিধান সমাজে ২৲, পাটনা নববিধান সমাজে ২৲, গিরিধি নববিধান সমাজে ২৲ টাকা এবং গরিবদিগের ৮৲ টাকার চাউল দান করা হইয়াছে।

গত ৪ঠা মে, ভাগলপুরে, ভক্ত সাধক স্বর্গীয় হরিসুন্দর বসুর সহধর্ম্মিণী শ্রদ্ধেয়া মনোমোহিনী বসু স্বর্গারোহণ করেন। গত ২১শে মে, গোলকুটীতে, স্বকীয় ভবনে, তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। কটক কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন নিয়োগী উপাসনা করেন। মধ্যম পুত্র ডাঃ প্রেমসুন্দর বসু ভক্তিমতী মাতৃদেবীর সুন্দর জীবনী বর্ণনা করিয়া প্রার্থনা করেন। ভাগলপুরের অনেকেই পবিত্র অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধার্পণ করিয়াছেন।

ভগবান্ পরলোকগত আত্মা সকলকে তাঁর অনন্ত প্রেমবক্ষে নিত্য শান্তিতে রক্ষা করুন এবং পৃথিবীস্থ শোকার্ত্তজনগণের প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

বিশেষ উপাসনা—গত ১২ই মে, পুরীর নবাগত পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ আই দে মহাশয়ের আমন্ত্রণে, তাঁহার গৃহে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। মিঃ দে নিজে সঙ্গীত করেন। গত ১৬ই মে কটকে গিয়া মধুভবনে প্রাতে এবং ভ্রাতা রামকৃষ্ণ রাওর পরিবারে সন্ধ্যায় আমাদের ভাই উপাসনা করেন। আরো কয়েক বাড়ীতে প্রার্থনা ও প্রসঙ্গাদি করেন।

পুরীতে নবশ্রীক্ষেত্রে শ্রীবুদ্ধসমাগম—গত বৈশাখী পূর্ণিমায়, ৯ই মে, মঙ্গলবার, পুরী নবশ্রীক্ষেত্রস্থ নবপর্ণকুটীরে বিশেষ ভাবে শ্রীবুদ্ধ-সমাগম সাধন হয়। প্রাতঃকালীন উপাসনার পর, ভাই প্রিয়নাথ ভিক্ষার ঝুলি লইয়া, মৌনাবলম্বনে সাতটী বাড়ী হইতে দরিদ্র-সেবার জন্য চাউল পয়সাদি ভিক্ষা সংগ্রহ ও দাতাদিগের দ্বারে দ্বারে প্রার্থনা করেন। সমস্তদিন নির্ব্বাকে ধ্যান চিন্তাদিতে যাপন করিয়া, সন্ধ্যায় সামাজিক ভাবে কয়েকটি পরিবার সঙ্গে ভাই প্রিয়নাথ বিশেষ উপাসনা করেন। ভ্রাতা প্রফেসর শ্রীমান্ পুণ্যেন্দ্রনাথ মজুমদার "সাধুসমাগম" হইতে আচার্য্যদেবের প্রার্থনা আবৃত্তি করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রফেসার ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ সেনের সহধর্ম্মিণী ও কন্যা মধুর সঙ্গীত করেন।

সাম্বৎসরিক—গত ২৫শে এপ্রিল, দেরাদূনে, ২৪নং লিটন রোডে, স্বর্গীয়া সারদাসুন্দরী ঘোষের ৪র্থ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, শ্রীমতী হেমন্তকুমারী চৌধুরী বিশেষ উপাসনা করেন। শ্রীমতী সরলা মজুমদার প্রভৃতি কন্যাগণ মাতৃদেবীর পুণ্যস্মৃতিতে প্রচারভাণ্ডারে ৪৲ এবং মুঙ্গের প্রমথলাল আশ্রমের জন্য ৪৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ২০শে মে, গঞ্জামের অন্তর্গত সমুদ্রতীরস্থ গোপালপুরে, শ্রীযুক্ত মনোনীতধন দের প্রবাসভবনে, তাঁহার শ্বশুর স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পালের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস উপাসনা করেন এবং কর্ম্মবীর, চিন্তাশীল, আদর্শবাদী তাঁহার জীবন আলোচনা করিয়া সারগর্ভ উপদেশ দান করেন। মনোনীত বাবুর সহধর্ম্মিণী হৃদয়ের আবেগে প্রার্থনা করেন।

গত ২৭শে মে, শান্তিকুটীরে, নববিধানের প্রেরিতপ্রবর বিশ্বভ্রমণে বিধানবার্ত্তা-ঘোষণাকারী শ্রদ্ধেয় ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন এবং শ্রীমতী সুধা দেবী সঙ্গীত করেন। সন্ধ্যায় ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট্ হলে স্মৃতিসভা হয়। স্মৃতিসভার বিবরণ পরে দেবার ইচ্ছা রহিল।

ভ্রম-সংশোধন।

বিগত ১লা জ্যৈষ্ঠের ধর্ম্মতত্ত্বের ১০২ পৃষ্ঠায় "চয়ন" শীর্ষক প্রস্তাবে, স্বর্গগত ভক্তিভাজন ভাই প্রতাপচন্দ্রের Heart Beats হইতে যে কয়েকটী অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে *Love* এর অন্তর্গত ৫ম ছত্রে "সুখশান্তি"র স্থানে "সুখাসক্তি" হইবে।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে", শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্তৃক ১৭ই জ্যৈষ্ঠ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৮ ভাগ। ১২শ সংখ্যা। | ১৬ই আষাঢ়, শুক্রবার, ১৩৪০ সাল, ১৮৫৫ শক, ১০৪ ব্রাহ্মাব্দ। 30th June, 1933. | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

মা নববিধানেশ্বরি, তুমি তোমার অপার করুণা-গুণে আমাদিগকে নববিধানে বিশ্বাসী করিয়াছ। বর্ত্তমান যুগ বা নবযুগের সকল মানবের মুক্তির জন্যই যে এই নবযুগধর্ম্ম নববিধান আনিয়াছ, ইহা আমরা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করি; কিন্তু ইহার সকল তত্ত্ব, সকল তাৎপর্য্য কি সম্যক্ রূপে আমরা শিখিতে ও বুঝিতে পারিয়াছি? তবে কেমন করিয়া আমরা অপরকে তাহা শিখাইব? বস্তুতঃ আমরা ত শিক্ষক নই। নববিধানের প্রবর্ত্তক যিনি, তিনিও যখন আপনাকে চিরশিষ্য বলিয়া পরিচয় দিলেন, তখন আমরা কে যে, আমরা অন্যকে শিক্ষা দিব, অন্যের কাছে গুরুগিরি করিব? এই বিধানে একমাত্র গুরু, মা, তুমি; তুমি না শিখাইলে তোমার কোন মানবসন্তান কাহারও কথা শুনিবে না, কেহ "পরের মুখে ঝাল খাইবে না", ইহাই তুমি বিশেষ ভাবে বিধান করিয়াছ। কেন তবে আমরা কাহাকেও শিখাইতে যাই? তাহা করিতে যাওয়া আমাদের 'অহং' ভিন্ন আর কিছুই ত নয়। সে অহংকার তুমি আমাদের দূর কর। আমাদের দীন বিনীত শিষ্যপ্রকৃতি দাও। আমরা কাহাকেও শিখাইতে আসি নাই, আসিয়াছি কেবল শিখিতে। আচার্য্য যেমন বলিলেন, "আমি শিখিলেই শিখান হইবে।" ইহাই সত্য কথা। আমরা নিজ জীবনে যাহা শিখিয়াছি, তাহাই যেন বলি। বিশেষতঃ তুমি যেমন অনন্ত, তোমার বিধানও তেমনি অনন্ত; তাই আমাদের যে এখনও কত শিখিতে হইবে, কত জানিতে হইবে, তাহা কি আমরা জানি? তুমি যে নিত্য নিত্য নূতন নূতন পাঠ দিয়া আমাদিগকে নববিধানতত্ত্ব শিক্ষা দাও; কেন না তুমি জান, আমরা কত অহংকৃত, প্রকৃত শিক্ষালাভ করিতে অনিচ্ছুক, ইহার গভীর জ্ঞান আয়ত্ত করিতে কত অক্ষম। এই জন্য প্রকৃত শিক্ষার্থী না হইলে এবং তোমার শিক্ষা আত্মস্থ, জীবনগত, চরিত্রগত না করিতে পারিলে, তুমি কাহাকেও কিছুই শিক্ষা দাও না। অতএব, মা, আমরা নিজে সম্যক্ জ্ঞান লাভ না করিয়াই যে অপরকে উপদেশ দিতে, শিক্ষা দিতে যাই, এই যে আমাদের অহমিকা, ইহা নিবারণ কর। আমরা যেন তোমার চির দীন শিষ্য হইয়া, সকলকার পদানত হইয়া, কেবলই শিক্ষার্থী হই এবং নিত্য নিত্য জীবনের সাধনে তুমি যাহা শিখাইবে, তাহাই শিক্ষা করিয়া নববিধানের সেবা করিবার উপযুক্ত হই, মা, দয়া করিয়া আমাদিগকে তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

শ্রীকেশবচন্দ্র ও নববিধান।

শ্রীকেশবচন্দ্র কে? নববিধান কি? এবং ইঁহাদের পরস্পর সম্বন্ধই বা কি? এ বিষয়ে যে আমাদের এখনও কত শিখিবার ও জানিবার বাকী আছে, তাহা বলিতে পারি না। সুতরাং তৎসম্বন্ধে আমাদের যাহার যাহা জ্ঞান, যাহার যাহা ধারণা, তাহাই যে সম্যক্ নহে, ইহা জানিয়া, অন্যের উপর আমাদের মত চাপাইতে যেন চেষ্টা না করি।

শ্রীকেশবচন্দ্র নিজের সম্বন্ধে তাঁর মাকে বলিলেন, "আমি যে কে, তাহা চিনাইয়া দিবে না?" আবার অন্যত্র বলিলেন, "আত্মপরিচয় দিলাম অনেক দিন, কিন্তু এ আত্মা পরিচিত হইল না; একজনের কাছে এক রকম আমি, আর একজনের কাছে আর এক রকম। হৃদয়ের ঠাকুর, ইঁহারা বলিতে পারিলেন না, কে আমি, কি আমি। ইঁহাদের বুঝাইয়া দাও, আমি কে?" ইহা দ্বারা হৃদয়ঙ্গম হয়, ঈশ্বর না বুঝাইলে কি আমরা বুঝিতে পারি? সম্পূর্ণরূপে শিক্ষার্থীর ভাবে স্বয়ং ঈশ্বর গুরুর নিকট ব্যাকুল প্রার্থনা-যোগে আলোক লাভ বা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে প্রয়াসী হইলে, তবে বুঝিতে ও জানিতে পারিব; এবং তিনি যাহা বুঝাইয়া ও হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিবেন, তাহাই অভ্রান্ত হইবে। তাই আচার্য্যদেব সাবধান করিয়া দিয়া বলিলেন, "বুদ্ধি খাঁড়া দিয়া আমাকে কাটিও না। বুদ্ধির শুষ্ক ভূমিতে আমাকে রাখিও না"।

তাঁহার নিজের কথার গ্রহণ-সম্বন্ধে যদিও বলিলেন, "আমি বাণী শুনিয়া বলি, বানিয়ে বলি না," তথাপি বলিলেন, "আমার কথা মেনো না, যদি না পবিত্রাত্মার আলোতে মিলে।" সুতরাং প্রত্যক্ষ ঈশ্বরালোকই আমাদিগের সকল তত্ত্ব বুঝিবার পথ-প্রদর্শক। এবং তিনি যতক্ষণ না বুঝাইবেন, আমরা কেহ কাহাকেও কোন সত্য বুঝাইতে পারিব না।

শ্রীকেশবচন্দ্র ও নববিধান সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে এখনও যথেষ্টই মতভেদ বা ভাবভেদ রহিয়াছে, দেখিতে পাই। এ সম্বন্ধে শ্রীকেশব স্বয়ং তাঁর ঈশ্বরের নিকট বলিয়াছেন, "প্রেমের হরি, যদি ইঁহারা পাঁচ পথে না গিয়া এক পথে যান, তবে বুঝাইতে পারি, যা' কিছু না বুঝিয়াছেন"। বাস্তবিক আমরা এই পাঁচজনে পাচ পথে যাইতেছি বলিয়াই, শ্রীকেশবচন্দ্রকে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না, নববিধান কি, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না, এবং নববিধানবাদী হইয়াও নববিধান জীবনে লাভ করিতে পারিতেছি না। কারণ নববিধান কেবল মতে বুঝিবার বিধান নয়, ইহা জীবনে সাধন ও সম্ভোগের বিষয়। তাই "নববিধান নববিধানকে যাঁরা বলেন, তাঁহারা যে নববিধান গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না।

আসল কথা এই, ব্রাহ্মসমাজ এক ঈশ্বরের উপাসনা সাধন করিতেই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং তাহা লইয়াই ইহা নিবদ্ধ। ঈশ্বরের উপাসনার পূর্ণতাসাধন মানবপ্রীতি-সাধনে হয়। তাহা কার্য্যতঃ করিতে হইলে, ঈশ্বরের সহিত ঈশ্বরের সন্তানকেও গ্রহণ করিতে হয়। ব্রাহ্ম-সমাজ এখনও সম্যক্ ভাবে বা কার্য্যতঃ ইহা করিতে পারেন নাই। এই জন্যই নববিধানে যাহা অভিব্যক্ত হইল, তাহা গৃহীত হইল না; এবং তাহা গৃহীত হইল না বলিয়াই, শ্রীকেশবচন্দ্রও ব্রাহ্মসমাজে গৃহীত হইলেন না। কেশব পাছে ঈশ্বরাবতার বলিয়া গৃহীত হন এবং নববিধানও কেশব-কেন্দ্রীভূত হয়, এই আশঙ্কা অনেকেরই আছে।

কিন্তু যদি নববিধানের গূঢ় তাৎপর্য্য আমরা বুঝি এবং নববিধানের ঈশ্বর যে জীবন্ত ঈশ্বর, ইহা বিশ্বাস করি, তাহা হইলে কখনই এ সকল আতঙ্ক আমাদিগের মনে আসিতে পারে না। কেন না, জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত বিধানে কোন মানুষের মানবীয়তা কখনই গণ্ডী দিতে পারিবে না। জীবন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাসী যিনি, তিনি নিশ্চয়ই নিঃসঙ্কোচে বিশ্বাস করিবেন, কোন মানুষ কখনও ঈশ্বরের সিংহাসন অধিকার করিতে পারিবে না। আবার পবিত্রাত্মার জীবন্ত বিধানেও যিনি বিশ্বাসী, তিনিই বা কেমনে বিশ্বাস করিবেন, কোন মানুষে জীবন্ত বিধান কেন্দ্রীভূত হইবে? পবিত্রাত্মার অনন্ত প্রবাহ কি হিমালয়ও আটকাইতে পারে।

ঈশ্বর যেমন অনন্ত, তাঁহার বিধানও তেমনি অনন্ত; অনন্ত বিধান-স্রোতঃ কি কখনও কোন মানবীয় গণ্ডিতে নিবদ্ধ হইতে পারে? নব নব জীবনের অনন্ত অভি-ব্যক্তিই যে নববিধান। সুতরাং প্রকৃত বিশ্বাসী হইলে আমাদের কোন কিছুতে আতঙ্ক হইবার কারণ নাই।

এই সঙ্গে ইহাও আমাদিগকে বিশ্বাস ও স্বীকার করিতে হইবে, "Unless the spirit is made flesh

no man seeeth." আত্মা আকার না ধরিলে কেহ দেখিতে পায় না। নিরাকার ঈশ্বর তাঁহার সন্তান বা ভক্তজীবনে আত্মপ্রকাশ করিয়া জগৎকে দর্শন দান করেন। সাকার সৃষ্টি নিরাকারের প্রকাশ, ইহা স্বীকার করিলে কি মানুষকে পূর্ণব্রহ্মত্ব দিতে হয়? প্রকৃত বিশ্বাস বা প্রকৃত ভক্তি তাহা করিতে বলে না। যাঁহার যাহা প্রাপ্য, তাঁহাকে তাহা দিতেই হইবে, আতিশয্য হইলেই ভ্রান্তি আসিবে। অন্যথা কখনই নয়।

বিধান মানিতে হইলেই, বিধানের মানুষকেও মানিতে বা স্বীকার করিতে হইবে। মানুষ বিনা বিধান হয় না। ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস যখন জীবনে সাধিত হইল, তখনই নববিধান হইল। নববিধান মানে নব জীবন, নিত্য নিত্য নব নব জীবন। এই নববিধান যখন এক জন মানুষে মূর্ত্তিমান্ হইল, তখনই ইহা নববিধান বলিয়া ঘোষিত হইল। নববিধান কেবল আকাশকুসুম বা মত বা শব্দ মাত্র নয়। এই নববিধান ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্রের জীবন।

তিনি অপূর্ণ মানুষ, আমরা জানি; কিন্তু তাঁহার জীবন অধিকার করিয়া, তাঁহার মানবীয় অপূর্ণতা, পাপপ্রবণতা, দোষ, ত্রুটী, দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও, জীবন্ত ঈশ্বরই যে তাঁহাকে নববিধানবাহকরূপে দাঁড় করাইয়াছেন, তাঁহাকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া, তাঁহার জীবনকে নববিধানের ছাঁচে শৈশব হইতে শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত ঢালাই করিয়া গঠন করিয়াছেন, এবং বর্ত্তমান যুগে কেমন করিয়া নববিধান জীবনে পাইতে হয়, নববিধানকে জীবনে সাধন ও প্রতিফলিত করিতে হয়, তাহাই দৃষ্টান্তস্বরূপে দেখাইয়াছেন।

তিনিও ঈশ্বর-সন্নিধানে বলিলেন, "যদি এ জীবনে নববিধানের কিছু দৃষ্টান্ত দেখাইয়া থাক, তবে ইঁহারা একজনকে বন্ধু করিয়া বরণ করিয়া হৃদয়ে লইয়া যান।" আরো বলিলেন, "মানুষ যদি না হয়ে থাকে কেউ নববিধানের ভিতর, সব মিথ্যা। দোহাই, হরি, দৃষ্টান্ত দাও, মানুষ দেখাও। গরীব বলিতে চায় যে, ঈশা, মুষার বিধানের সঙ্গে এ বিধান মিলেছে, যদিও স্বতন্ত্রতা আছে। এ গরীব বলিতে চায়, কাল পাপী বাঙ্গালী সিদ্ধ হইয়া আসে নাই, মহাপুরুষদের সঙ্গে কিছুতেই তুলনা হয় না। কিন্তু সে অপ্রেমিক ছিল, প্রেমিক হইল; সাম্প্রদায়িক ছিল, হইল সার্ব্বভৌমিক; কাল মলিন ছিল, ক্রমে জ্যোতির্ম্ময় হইল; কঠিন ছিল, কোমল হইল। সাধুদের পদধূলি শরীরে মুখে সে মেখেছে; তোমার প্রসাদে, তোমার নববিধানের প্রসাদে অনেক সাধন করে, অনেক কেঁদে, অনেক কষ্ট করে নববিধান পেয়েছে। আমার জীবনের পরিবর্ত্তন সকলের আশাপ্রদ। আমি নিশ্চয় বলছি, আমার জীবন দেখ, বিপদ অন্ধকারে কেশবচন্দ্র চন্দ্র হবে। নারকী উদ্ধার হতে পারে, এ যদি দেখিতে চাও, তবে ভাই, এই বন্ধুকে লও, সঙ্গে রাখ। জগৎ সংসারকে ভালবাসিব, বিরুদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রকে এক করে নেব। সমস্ত সাধুদের হৃদয়ে রাখিব। ক্ষমা প্রেম দেব। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নববিধানের দৃষ্টান্ত দেখাতে চাই। স্বদেশ বিদেশকে, হিন্দু মুসলমানকে, তেল জলকে, সকল ধর্ম্মকে মিলাইতে চাই। আমি পাপী হয়ে পুণ্যাত্মা হতে চাই না। আমি সিদ্ধ হয়ে জন্মেছি, তা বলছি না। আমি এই একটা আশার কথা বলিতে চাই যে, একটা খুব পাপী ছিল, মার প্রসাদে তার জীবনে খুব পরিবর্ত্তন হয়েছে। হয় নি যা, তা হবে। অসম্ভব যা, তাও হবে। একটা কাল ছেলে সুন্দর হয়েছে, একটা ছেলে তোমার কাছে দৌড়ে যাচ্ছে।"

কেশবচন্দ্র যা, নববিধানের নবজীবনও তা। তাঁহার দৃষ্টান্তে পাপী হয়েও আমরা সুন্দর হতে পারি, কাল ছেলে হয়েও অনন্ত উন্নতির পথে মার কাছে দৌড়ে যেতে পারি, ইহাই দেখাইতে নববিধান অবতীর্ণ। ইহাই ত দেখাইলেন জীবনের সাধনায় শ্রীকেশবচন্দ্র। নববিধানের মানুষ বলিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করার অর্থ, তাঁহার সঙ্গে এক হওয়া, তাঁহার সঙ্গে একাত্মা হইয়া নববিধানকে জীবনে মূর্ত্তিমান করা, নববিধানের জীবন্ত ঈশ্বরের দ্বারা গঠিত হইতে আত্মসমর্পণ করা এবং অনন্ত নববিধানের অনন্ত জীবনে "মার কাছে দৌড়ে" যাওয়া।

কেশব যাহা হইয়াছেন, তাহা নিজ পুরুষকারে হন নাই; সুতরাং তিনি যে ব্রহ্মকৃপায় ও যে পবিত্রাত্মার বলে হইয়াছেন, আমরাও সেই ব্রহ্মকৃপায় ও সেই পবিত্রাত্মা-প্রভাবে হইব। আমরাও কেবল পুরুষকারসাধনায় হইব না। সেই একই ব্রহ্মের যে অনন্ত স্রোত নববিধানে প্রবাহিত, সেই অনন্ত স্রোতে কেশবকেও বিধাতা গা ভাসাইয়া দিয়াছেন, আমাদেরও ভাসাইবেন, ইহাই নববিধান। মানবীয় পুরুষকারের সীমায় যখন নববিধানসাধন আবদ্ধ নয়, ইহা যখন বিধাতার বিধান,

অনন্তের বিধান, তখন ইহা কোন সীমা বা গণ্ডিতে বদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়?

কেশব যাহা হইয়াছেন, তাহা হওয়া আমাদের কোন রূপেই সম্ভাবনা নাই, ইহা যদি মনে করিতাম, তবে নববিধানকে কেশব-কেন্দ্রীভূত করিতে পারিতাম। প্রকৃত নববিধানবিশ্বাসীর পক্ষে তাহা অসম্ভব; কেন না, নববিধানবিশ্বাসী মাত্রেই বিশ্বাস করেন, এ বিধানে মানুষের হাতে ধর্ম্মজীবনগঠন নয়, পবিত্রাত্মার হাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ বা Self-consecrationই নববিধান। তাই কেশব বলিলেন, "আপনার হাতে ধর্ম্ম যার, তার কুপ্রবৃত্তি ফিরিয়া আসিবেই। দয়াসিন্ধু, ধর্ম্মসাধন তার ক্ষমতার অতীত করিয়া দাও।" ইহাই ত নববিধানের কথা।

যাঁর জীবনে নববিধান মূর্ত্তিমান্ হইল, সেই কেশবের সঙ্গে এক হয়ে বা সকলে "কেশব" হয়ে, কেশব যেমন বলিলেন, "এক শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেমন, তেমনি সকলে এক হয়ে, এক মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়ে, বিধান-সাগরে ভাসিতে থাকি এবং তোমার প্রেমের জ্যোৎস্নায় খেলা করিতে থাকি", তেমনি নববিধান সাধন করিলে, আর "সীমা অন্তরেখা নাহি যায় দেখা"—এক সিন্ধুতে সব বিন্দু মিশিয়া একাকার হইয়া যাইবে।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব।

ব্রহ্মের আত্মদান।

বাইবেল শাস্ত্রে আছে, "ঈশ্বর মানবকে এতই প্রেম করিলেন যে, তিনি তাঁহার একমাত্র আত্মজাত সন্তানকে দান করিলেন; যে কেহ তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া গ্রহণ করিবে, সে অমর জীবন প্রাপ্ত হইবে।" ঈশ্বরের সন্তানপ্রদান নিশ্চয়ই ঈশ্বরের মানব-প্রেমের পরম দান। কিন্তু নববিধানে তদপেক্ষা অধিকতর দান এই যে, তিনি মানবকে আপনাকে দান করিয়াছেন। মানব তাঁহাকেই সর্ব্বস্ব বলিয়া গ্রহণ করিলে, তাহার যাহা কিছু পাইবার সকল পাইবে, তাহার পক্ষে অপ্রাপ্য কিছুই থাকিবে না। তিনি আমাদিগকে একেবারে আপনাকে দিয়া দিয়াছেন। স্বর্গ এবং পৃথিবীতে এক তিনি ভিন্ন এমন বস্তু আমাদের কি আছে? আর এমন বস্তু করতলস্থ হইলে, কিসের আর অভাব? তিনি নিজে যে আমাদের সব হইয়া সব করিতেছেন এবং সব ভার বহন করিতেছেন। ইহা সহজে উপলব্ধি করিতে তিনিই দিয়াছেন।

দীক্ষা ও বিবাহ।

নবসংহিতার বিধি এই যে, বালকবালিকাগণ বাল্যশিক্ষা সমাপন করিয়া ধর্ম্মপ্রবেশের উপযুক্ত বিবেচিত হইলে, যোড়শবৎসর বয়ঃপ্রাপ্তিতে বিবাহের পূর্ব্বে দীক্ষা গ্রহণ করিবে। কিন্তু এখন দেখা যায়, অনেক পরিবারে ছেলে মেয়েদের বিবাহের ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বেই যেন কোন রকমে বিধিরক্ষার জন্য দীক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ইহা নিতান্তই আক্ষেপের বিষয়। নবসংহিতাপালন সম্বন্ধে নববিধানবিশ্বাসিগণের শৈথিল্য অমার্জ্জনীয়। যদিও ইহার অক্ষর আমাদের অনুসরণীয় নয়, ইহার ভাবই গ্রহণীয় ও পালনীয়, কিন্তু সে সম্বন্ধেই বা নিষ্ঠা আমাদের কোথায়? অনেকে আবার দীক্ষার প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করেন না। বাস্তবিক বিবাহের পূর্ব্বে দীক্ষার বিধির তাৎপর্য্য এই যে, প্রথমে নববিধানের ঈশ্বর ও ইহার মূল সত্যে বিশ্বাসস্বীকারপূর্ব্বক মণ্ডলী বা বিধান-পরিবারে অঙ্গরূপে গ্রথিত না হইলে, কেমন করিয়া কোন ব্যক্তি নববিধানের সংসারপত্তনে অধিকারী হইবে? ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রহ্মপুত্র বা ব্রাহ্মকন্যা বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে না পারিলে, কোন্ পাত্র পাত্রী পরস্পরকে ধর্ম্মনিষ্ঠ পতি পত্নী রূপে বরণ বা গ্রহণ করিতে পারেন? অগ্রে ঈশ্বরবিশ্বাসী যিনি হইয়াছেন, তিনিই কেবল বিবাহমন্ত্রে বলিতে পারেন, "আমার হৃদয় তোমার হউক, তোমার হৃদয় আমার হউক, এবং আমাদের উভয়ের মিলিত হৃদয় ঈশ্বরের হউক।" এই নিমিত্ত বিবাহের বহুপূর্ব্বেই বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ কালেই, ছেলে মেয়েদের দীক্ষা দান করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলে মেয়েদের প্রার্থনা-সাধন ও উপাসনা-সাধন শিক্ষা দেওয়া উচিত। তাহা হয় না বলিয়াই, আমাদের ছেলেমেয়েরা ধর্ম্মবিহীন ও উচ্ছৃঙ্খল হইবার উপক্রম হইয়াছে। পিতামাতাগণ এ বিষয়ে চিন্তা করুন।

জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ।

সাধারণ চলিত কথায় "জন্মের" পর "মৃত্যু", তাহার পর "বিবাহ" এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া ইহা উপলব্ধ হয়, যদিও বিধাতার পার্থিব বিধানে প্রথমে জন্ম, তাহার পর বিবাহ, তাহার পর মৃত্যু সংঘটিত হইয়া থাকে; কিন্তু অধ্যাত্ম বিধানে জন্মের পরই দৈহিক জীবনের বা আমিত্বের মৃত্যু সংসাধিত না হলে প্রকৃত বিবাহানুষ্ঠান হয় না। "আমি আমার" বলিদান বা ত্যাগ না করিলে কই প্রকৃত বিবাহ হয়? বিবাহের অর্থ, এক অন্যকে বিশেষ রূপে বহন করিবে। পাত্র পাত্রী বিবাহের পূর্ব্বে যে ভার নিজে নিজে বহন করিতেছিলেন, বিবাহকালে আপনার যাহা কিছু ত্যাগ করিয়া অপরের ভারগ্রহণে আত্মসমর্পণ করিবেন।

কন্যার পক্ষে ত ইহা বিশেষ ভাবে সাধিত হয়। তিনি তাঁর নিজ গোত্র, পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন ত্যাগ করিয়া বরকে আত্মদান করেন; বরও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসা আপন পত্নীকে অর্পণ করেন। পুরাণের আখ্যায়িকা—যোগী শিব মৃত সতীকে স্কন্ধে লইয়া বহন করিয়াছিলেন, কোলে লইয়া যোগ সাধনা করিয়াছিলেন। সতী পতির যোগ-মিলন-সাধন এইরূপই। বিবাহের অপর কথা উদ্বাহ, উর্দ্ধে বহন করা। কেবল শরীরিক ভার বহন নয়, আত্মাকে উর্দ্ধে বহন করাই প্রকৃত উদ্বাহ। পরস্পর পরস্পরকে ধর্ম্মসাধনায় উর্দ্ধগামী করিবেন। পাপ ব্যভিচারের সম্ভাবনা উচ্ছেদ করিয়া নরনারী পরস্পরকে নীতিতে, ধর্ম্মেতে, প্রেমেতে, যোগেতে সমুন্নত করাই বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য। পৃথিবীতে স্বর্গের প্রেম-পরিবার, সুখী পরিবার স্থাপন করিতেই বিবাহ নির্দ্দিষ্ট। জন্মগত আমিত্ব ও স্বার্থপরতার মৃত্যু না হইলে, কি প্রকৃত স্বর্গীয় বিবাহ হয়? দুই অর্দ্ধার্দ্ধ আত্মা একাত্মা হইয়া পরমপতি পরমাত্মায় আত্মসমর্পণই বিবাহের পরিণতি। ইহাই প্রকৃত উদ্বাহ। পার্থিব সকল বিবাহ যেন এই উদ্বাহে পরিণত হয়।

নির্ব্বাক্ শক্তি।

জীবন একটী মহাশক্তি, একটী দৈবশক্তি! কোন্ সূত্র ধরিয়া এই শক্তি মানবের অন্তরে অবতীর্ণ হয়, তাহা আমরা অবগত নহি। তবে শক্তির বাহ্য প্রকাশে যে নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হয়, তাহার সাক্ষাৎ প্রমাণ আমরা, প্রাপ্ত হই। যেখানে জীবন আছে, অথচ সৃষ্টি নাই, সেখানে বুঝিতে হইবে যে, জীবন শক্তিহীন, প্রাণহীন অথবা মৃতকল্প। মৃতজীবন কখন ক্রিয়াশীল হইতে পারে না। জ্যোতিষ্কমণ্ডলী হইতে যেমন আলোকধারা পৃথিবীকে শোভা সৌন্দর্য্যে পূর্ণ করে, জীবন হইতে সেইরূপ নূতন জ্যোতিঃপাতে সংসারের কুজ্ঝাটিকাময় অন্ধকার বিদূরিত হয়।

জীবনে নূতন শক্তি কোথা হইতে আসে? এই শক্তির মূল কি? নূতন ভাব (*idea*) বা নূতন আদর্শ। এই আদর্শ নূতন প্রাণ হইয়া শরীর ও মনে নূতন শক্তি সঞ্চার করে। তখন শক্তি শতধা হইয়া নানা প্রতিষ্ঠানের ভিতর নিজের রূপ ফুটাইয়া তোলে। *"Life begets life"* একটী আদর্শ জীবন অন্য একটী আদর্শ জীবনের জন্মদাতা। একটী জীবন হইতে দশটী জীবন উৎপন্ন হয়, দশটী হইতে শত সহস্র জীবন জন্মলাভ করে। যৌবন তাহার স্বরূপকে নব নব জন্মে ফুটাইয়া তোলে। উদ্ভিদ্ লতা পল্লব যখন যৌবনপ্রাপ্ত হয়, তখনই তাহা ফল ফুলে ফুটিয়া উঠে জীবজগৎও এই নিয়মের অধীন। আত্মিক জগতেও ইহার ব্যতিক্রম হয় না

কথা জীবনের রূপ বা বাহ্যাবয়ব। কথার প্রাণ আছে, কথার শক্তি আছে, কথা রক্তমাংস ভেদ করিয়া মর্ম্মকে স্পর্শ করিতে পারে, কথা জীবনবেদ হইয়া, জীবনভাগবত হইয়া অক্ষয় শাস্ত্র রচনা করে, কথা আরাধনার জীবন্ত মন্ত্র। মন্ত্রই ভগবানের সঙ্গে ভক্তের নিগূঢ় যোগ নিবদ্ধ করে। মন্ত্রই সাধনার প্রথম সোপান।

কথা অসাড়, প্রাণহীন ও নির্জ্জীব হয় কখন? যখন জীবন হইতে কথা বিভিন্ন হয়, যখন জীবন একরূপ, আর কথা অন্যরূপ। সাগরের অবিশ্রান্ত স্রোতের উচ্ছ্বসিত প্রকাশ তাহার তরঙ্গ। সেইরূপ প্রাণের উদ্বুদ্ধ ভাবের বাহ্যপ্রকাশ বাক্য। কথা ভাববিহীন হইলে, অসত্য হইলে, জীবন হইতে পৃথক হইলে, সে কথা আর মানুষকে স্পর্শ করিতে পারে না, শুষ্ক তৃণখণ্ডের ন্যায় বায়ুতে উড়িয়া যায়। বন্ধুগণ, তোমার আমার কথায় ক'জনের প্রাণ জাগ্রত হয়, ক'জনের প্রাণ উদ্বুদ্ধ হয়, ক'জনের প্রাণে আশার উদ্দীপনা আনে, ক'জনের প্রাণে নূতন আলোকের সন্ধান দেয়? অসার কথা মত সৃষ্টি করে, ভেদবুদ্ধি রচনা করে, মনান্তর আনয়ন করে; এজন্য বোধ হয়, প্রাচীন সাধকেরা মৌনব্রত ধারণ করিতেন।

মৌনীর শক্তি অজেয়। শরীরের প্রতি রোমকূপ দিয়া মৌনীর শক্তি ক্ষণপ্রভার মত বৈদ্যুতিক আলোকে বিচ্ছুরিত হয়! নির্ব্বাক্ সাধনা শ্রেষ্ঠ সাধনা, যদি কথা আর জীবন এক না হয়। সৈন্যাধ্যক্ষের তর্জ্জনী-হেলনে সহস্র সহস্র সৈনিক যেমন পরিচালিত হয়, মৃত্যুকে আদরে আলিঙ্গন করে, সেইরূপ মৌনীর দৃষ্টি-সঞ্চালন সাধকের গতি নির্দ্দেশ করে, চঞ্চল মন অচঞ্চল ও স্থির-লক্ষ্য হয়। মৌন সাধকের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ভিতরের প্রাণধারা যদি দুর্ব্বল ও সংকল্পসাধনে বিমুখ হয়, তখন নির্ব্বাক্ হওয়া প্রয়োজন। অসার কথা যেমন মতান্তর ও মনান্তর সৃষ্টি করে, তদ্রূপ কথার সংঘর্ষে দুর্ব্বল প্রাণ আত্মঘাতী হয়।

ধর্ম্মরাজ্যের আর একটী বিশেষ কথা অনুভূতি। প্রাণের ক্ষীণ অনুভূতি টুকুকে উজ্জ্বল করিতে হইলে, তাহাকে আকার দিতে হইলে, বাহিরের সকল বিক্ষিপ্ত ভাব হইতে তাহাকে দূরে রাখিতে হয়। কথা ভাবকে বিক্ষিপ্ত করিবার অপরিহার্য্য অন্তরায়। ক্ষীণ অনুভূতিকে শরীর মনে আকার দিতে হইলে, মৌনব্রত প্রধান সহায়। নির্ব্বাক্ না হইলে, লক্ষ্যহীন মন শক্তিসঞ্চয় করিতে পারে না। বহুক্ষণ আপনাতে আপনি স্থিতি না করিলে, ভাব ঘন হয় না, ভাব রক্তমাংসে পরিণত হয় না।

আপনার অনুভূতিতে আপনি তন্ময় হইয়া থাকাই সাধনার সিদ্ধি। উপাসনার সময় বহুভাষী হওয়া নিষ্প্রয়োজন। এক একটী কথা এক একটী ভাবের উদ্দীপক। ভাবই কথার জন্মদাতা। ভাবহীন কথা, আর প্রাণহীন দেহ দুইই পরিত্যজ্য। যে কথার ভিতর সত্যের অনুভূতি নাই, তাহা পূজার অর্ঘ্যরূপে

ব্যবহার করা নিষিদ্ধ—পূজার সময় বৃথা কথা উচ্চারণ করা মহাপরাধ। বৃথা কথা পূজার মন্ত্র হইতে পারে না। মন্ত্রের ভিতর প্রাণ আছে, শক্তি আছে, আলোক আছে। কায়মান মিলাইয়া সত্যের অনুভূতিকে বাক্যে প্রকাশ করাই মন্ত্র। সাধকের পক্ষে নির্ব্বাক্ উপাসনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। উপাসনার সময় ভগবানের সহিত ভক্তের ভাবের বিনিময় হয়, তখন কথা আড়াল হয়ে দাঁড়ায়, কথা বিঘ্ন উৎপাদন করে, কথায় ভাবের বিক্ষেপ হয়। কথায় অনুভূতির ঘনভাব লঘু হইয়া যায়। ভাবের মধ্যে গাঢ় স্থিতি বা ডুবিয়া যাওয়াই সমাধি। সমাধিস্থ হইলে রসোদয় হয়, নূতন সত্যের অনুভূতি দেহ মনকে নূতন রাজ্যে লইয়া যায়। সমাধির ভিতর যে রসের আস্বাদন, যে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা অন্যত্র সম্ভব নয়।

ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বযুগে সমাজে একটা বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। বিশ্বাস ও কর্ম্মের ঐক্য সাধন করিতে গিয়া এই বিপ্লবের উৎপত্তি হয়। এটা ছিল সামাজিক বিপ্লব। সমাজের প্রচলিত রীতিনীতির সহিত বিশ্বাসের সামঞ্জস্য রাখতে না পারলেই, একটা সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। সংঘর্ষের ফলে একদিকটা যেমন ভাঙ্গিয়া যায়, সেইরূপ অন্য দিকটা গড়িয়া উঠে। এই ভাঙ্গা গড়ার ভিতর সমাজ একটা নূতন আকার গ্রহণ করে। সেই নূতন আকারই বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ। ভৌতিক জগতে যেমন জলপ্লাবনে ক্ষেত্রের শস্যগুলি পচিয়া যায়, নির্ম্মূল হইয়া যায় এবং প্লাবন অন্তর্হিত হইলে নূতন তৃণ ও শস্যাদি গজাইয়া উঠে, সেইরূপ সমাজেও নূতন পুরাতনের সংগ্রামে একটী নূতন সমাজের অভ্যুদয় হয়। যেখানে সংঘর্ষ, সেখানেই প্রলয়; যেখানে প্রলয়, সেইখানেই নব সৃষ্টির সঞ্চার। কিন্তু বাহিরের প্রতিষ্ঠান পুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয়, ব্যক্তিগত জীবনের সংস্কার হইতে। ব্যক্তির (Individual) জীবনে যদি উন্নতি বন্ধ হইয়া যায়, অথবা যে পরিমাণে ব্যক্তিগত জীবনের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়, সেই পরিমাণে সমাজজীবন আহত হয়, সেই পরিমাণে সমাজের প্রাণধারা গতিহীন হয়। ব্যক্তিগত জীবনে উচ্চ বিশ্বাস, সুনীতি, নব নব সত্যের অনুভূতি ও আত্মশুদ্ধির সহিত কর্ম্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য একটা অবিরল সংগ্রাম উপস্থিত হইবেই। এই সংগ্রামের ফলে জীবনে প্রতিনিয়ত ভাঙ্গা গড়া চলিতেছে। এই ভাঙ্গা গড়ার ভিতর দিয়া ব্যক্তির জীবন যত নূতন রূপ ধারণ করিতেছে, মণ্ডলীও তার সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ রূপ পরিবর্ত্তন করিতেছে।

ছোট ছোট অসংখ্য ধারা মিলিত হইয়া যখন একটী প্রবল ধারা রচনা করে, তখন সেই প্রবল ধারাই একটী মহাবেগবান্ প্রপাত সৃষ্টি করে। এক একটী মহাপরাক্রমশালী প্রপাতই বড় বড় নদীকে চিরসরস করিয়া রাখিয়াছে; নদীর নিকটবর্ত্তী জনপদকে শস্যশ্যামলা করিয়া, নব নব সৌভাগ্যের চির মধুরতার আবেষ্টনে, মানবের সকল অভাবের, অভিযোগের নিরাকরণ করিতেছে। ব্যক্তি মণ্ডলীকে বাঁচাইয়া রাখে। ব্যক্তির জীবনে অগ্রগতি রুদ্ধ হইলেই, মণ্ডলীর জীবন বা সমাজের জীবনও শুষ্ক ও মৃতকল্প হইবেই। বাহিরের দিক দিয়া যদি সমাজে কেহ প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে চান, তবে তাঁহার সে চেষ্টা যে পদে পদে বিফল হবে, সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র। ব্যক্তির সাধনা, শিক্ষা, সেবা ও বিশ্বাস মণ্ডলীতে সঞ্চারিত হইবে; ব্যক্তি প্রাণ, মণ্ডলী দেহ। প্রাণহীন দেহের সহস্র চেষ্টায় জীবন রক্ষা করা যায় না বা ফিরিয়া আসে না। যেখানে বড় বড় ধর্ম্মমণ্ডলী বা জাতি সৃষ্ট হইয়াছে, সেখানেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার মূলে আছে ব্যক্তির সাধনা। মহর্ষি ঈশার আদর্শে বড় বড় মার্টার্স যদি আত্মবলিদান না করিতেন, তা'হলে খৃষ্টধর্ম্ম এরূপ ভাবে প্রসারিত হইত না। যদি শ্রীবুদ্ধদেবের অলৌকিক ত্যাগ ও অসাধারণ মৈত্রীর স্পর্শে যুগযুগান্তর ধরিয়া ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের সেবার আশীর্ব্বাদে জগৎ পুষ্ট না হইত, তাহা হইলে আজ অর্দ্ধ জগৎ জুড়িয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের গৌরব মহিমান্বিত হইত না। ব্যক্তির জীবনের ধারাকে চির প্রবাহিত না রাখিলে, বাহিরের প্রতিষ্ঠানের দ্বারা মণ্ডলীর জীবন রক্ষা করা অসম্ভব। ব্যক্তিই ছোট ছোট ধারা হইয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রস হইয়া, মণ্ডলীকে বা সমাজকে চির সরস করিয়া, চির সবুজ করিয়া রাখিবে। এজন্য নির্জ্জন সাধনার বিশেষ প্রয়োজন। মানুষ যত কথা কম বলিবে, মৌনী হইবে, আপনার মধ্যে আপনি যত অধিক স্থিতি করিবে, ততই ভিতরে ভাব ঘনীভূত হইবে, সত্যের অনুভূতি আসিবে। তাহার প্রকাশ হইবে বাহিরে, মণ্ডলীতে, সমাজে বা জাতির মধ্যে। হে সাধক, নির্ব্বাক্ সাধনার শক্তি উপলব্ধি কর। ইহা অজেয় ও ইহা প্রাণপ্রদ। ইহাই নূতন সৃষ্টির বীজ।

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চয়ন।

(স্বর্গগত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের "Hearts Beats" হইতে গিরিধির শ্রীযুক্ত ডি, এন্, মুখার্জি কর্তৃক অনুবাদিত)

Next Door—না, আমি ঈশ্বরের সহিত এক গৃহে বসতি করি না; কিন্তু তিনি আমার অতি নিকট প্রতিবেশী। আমার গৃহের পার্শ্বেই তাঁহার গৃহ। যে মুহূর্ত্তে আমি আপনার বাহিরে গমন করি, অমনি সেই পরম প্রভার জ্যোতির্ম্ময় সত্তা দর্শন করি। আমি সেই সত্তার মধ্যে ভ্রমণ করি, তাহার সহিত যোগে মিলিত হই; কিন্তু নিজ গৃহে প্রবেশ করিবার সময়ে সেই সত্তাকে পথ-প্রান্তে ছাড়িয়া আসি।

Choice & Results—যাহা ন্যায় ও সত্য, তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিবে; যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া একবার গ্রহণ করিবে,

তাহা দৃঢ়তার সহিত পালন করিবে, এবং ফলাফল ঈশ্বরকে সমর্পণ করিবে। কার্য্যের ফল কচিৎ আমাদের আশা ও ইচ্ছা-অনুরূপ হইয়া থাকে, কিন্তু পরিণামে সকল ফল আমাদের অনুকূল হয়। যাহাতে তোমার সাংসারিক ক্ষতি হইল, তাহা যদি তোমাকে ধর্ম্মরাজ্যে অগ্রসর করে, তবে তাহা নিতান্ত ক্ষতি নয়।

Ambition—হাঁ, দীনের দীন, একান্ত বন্ধুবান্ধবহীন, কথার বলা যায় না এমন দরিদ্র; কিন্তু উৎসাহ, উদ্যম ও শক্তিতে পূর্ণ, আশা বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত এবং নিত্য শ্রমশীল—ইহাই আমার জীবনের আদর্শ। নীরবে গুরুভার বহন করিব, সকলের ঘৃণিত, কিন্তু বিশ্বপ্রেমে পূর্ণ,—অনন্তশক্তি পরমাত্মার সহিত সহকর্ম্মী হইয়া নিজের ও আর সকলের পরিত্রাণের জন্ত খাটিব। ইহাই আমার আদর্শ।

Success—যে ব্যক্তি নিজের আত্মাকে চিনিয়াছে, সেই জীবনে সফলতার গূঢ় মন্ত্রের সন্ধান পাইয়াছে। আপনার সম্বন্ধে বৃথা জল্পনা কল্পনা দূর করিয়া দাও, তোমার বিদেশী শিক্ষা দীক্ষা ভুলিয়া যাও, তুমি সত্য হও। তোমার যে উচ্চতম অবস্থা, তাহাই তোমার নিত্য অবস্থা হোক; উপাসনা-কালে যখন ভগবানের বক্ষে বাস কর, তখনকার ভাব তোমার স্থায়ী ভাব হোক; তোমার জীবন সার্থক হইবে।

Conquer—আমি জয়লাভ করিবই করিব, আমি নিশ্চয়ই জয়লাভ করিব, নির্ভীক বীরের মত এই সংগ্রামে আমি জীবন বিসর্জ্জন দিব, এবং তাহার পরে বিদেশ হইতে গৃহ-প্রত্যাগত সন্তানের ন্যায়, হে অনন্তস্নেহময়ী জননী, তোমার বক্ষে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিব—"তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক।"

নববিধানে মহারাণী সুনীতি দেবীর নবজীবন।

যুগে যুগে যত ধর্ম্মবিধান আসিয়াছে এবং যুগে যুগে সেই বিধানের ভিতর দিয়া যত নবীন বিশ্বাসী আসিয়াছেন, সে সম্প্রদায়ের ভূমিকায় পৃথিবীর অত্যাচার ও উৎপীড়ন বর্ত্তমান কণ্টকবিদ্ধ তরু হইতেই সুন্দর ও সুবাসিত গোলাপ পুষ্প বাহির হইয়াছে। খৃষ্টীয় বিধানের ভূমিকায় অত্যাচার ও ক্রুশ অত্যাচারী হেরোদের আগমন অনিবার্য্য। শিষ্য পিটরও ঈশাকে অস্বীকার করিলেন। ঈশার ধর্ম্মে প্রণোদিত সাধু পলকে বলিতে হইয়াছিল, "I am made fool for my master's sake." তপস্বিনী ম্যাডাম গায়ন উপহাসিত ও অত্যাচারিত হইয়া মৌনব্রত ধারণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য এবং মহম্মদও মহা অত্যাচারের মহা তপস্যা লইয়া সত্যের পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বিধাতার প্রেরিত বিধান এ সম্প্রদায়কে আলিঙ্গন করিতে আসিয়াছেন। এই ভিত্তির উপর নববিধানাশ্রিত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবন প্রতিষ্ঠিত। ইহার ভিতর হইতেই ব্রহ্মানন্দকন্যা সুনীতিদেবী আসিয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যখন নববিধানের নবীন প্রভাবের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন, তখন তাঁহার সম্মুখে, "we walk not by sight but by faith", "Many come but few are chosen" এই দুই মহা মন্ত্র বর্ত্তমান। এই মন্ত্রে মন্ত্রপূত ও এই মন্ত্রে দীক্ষিতের সম্মুখে অত্যাচার ও বাধা বিঘ্ন চিরদিনই বর্ত্তমান থাকিবে। গিরিসঙ্কট অতিক্রম না করিলে হিমালয়ের পথিক অগ্রসর হইতে অক্ষম।

যাঁহারা এ পথের পথিক, বিধাতার আদেশ ও আজ্ঞা তাঁহাদের সম্বল। দশম আজ্ঞায় মুশা দীক্ষিত। যখন আদেশ আসে, তখন মানুষ আদেশের ভৃত্য। কুচবিহারবিবাহ-সম্বন্ধে বিধাতার প্রত্যক্ষ আদেশ আসিয়াছিল। যখন কুচবিহারের ভাবী নৃপতি অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে শিক্ষালাভ এবং ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে মার্জ্জিত জ্ঞান লাভ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার সম্বন্ধে তত্ত্বাবধায়ক গভর্ণমেণ্ট বিধাতার এক বিশেষ আলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া আরও উচ্চতর শিক্ষা বিধান করা গভর্ণমেণ্টের একটা বিশেষ লক্ষ্য ছিল; কিন্তু তৎপূর্ব্বে বৈবাহিক সম্বন্ধে তাঁহাকে কোন উন্নতিশীল ও মার্জ্জিতজ্ঞানসম্পন্ন পরিবারের সহিত আবদ্ধ করিয়া, সেই সুদূর প্রদেশে প্রেরণ করা সমীচীন বলিয়া মনে করিলেন। বঙ্গের সেই কুসংস্কারের দিনে, সেই সুদূরবর্ত্তী রেলবর্ত্ম-বিহীন কুচবিহার উন্নতিশীল পশ্চিম বঙ্গ হইতে সংস্কার-সম্বন্ধে আরো অনেক দূরে পড়িয়াছিল। সেই স্বাধীন রাজ্য কুচবিহারকে সেই স্তর হইতে এক উন্নত স্তরে উত্থিত করাই, গভর্ণমেণ্টের প্রধান লক্ষ্য ছিল।

যখন বঙ্গদেশের কেন্দ্রভূমি হইতে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র নবধর্ম্মের নবোন্মেষ লইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন এবং ভারতের চিরপ্রথাগত কুসংস্কার দূরীকরণ জন্য নবধর্ম্মের ভিতর দিয়া প্রকাশ্যভাবে ভারতবাসীকে আহ্বান করিতেছিলেন, তখন সে আহ্বানের ধ্বনি কেবল ভারতকে নহে, সুদূর পাশ্চাত্য ভূমিকেও জাগাইয়া তুলিতেছিল। দূরদর্শী তত্ত্বাবধায়ক গভর্ণমেণ্ট কুচবিহার সম্পর্কে উচ্চ লক্ষ্য লইয়া কেশবচন্দ্রের নিকট তাঁহাদের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। অকস্মাৎ উল্কাপাতের মত যে প্রস্তাব তাঁহার নিকট আসিয়া পড়িল এবং যাহার সম্বন্ধে তাঁহার ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কাররূপ মহাব্রতের ভিতর কোন দিন কোন চিন্তা আসে নাই, তাঁহার নিকট সে প্রস্তাবের সমক্ষে নীরবতা ভিন্ন আর কোন্ ভাব আসিবে? কুচবিহারের অপ্রাপ্তবয়স্ক যুবক নৃপতি ও তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যা উভয়ই তাঁহার সমক্ষে প্রধান অন্তরায়। এ অবস্থায় এ প্রস্তাব প্রস্তুতিবিহীন কেশবচন্দ্র নীরবে প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইলেন। গভর্ণমেণ্ট যে আলোক ও যে প্রত্যাদেশ লইয়া এ প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পক্ষে সে আলোক পরিহারও অসম্ভব হইয়াছিল। তাঁহার নিকট আবার সেই প্রস্তাব আসিল। সেবারেও তাঁহার নীরবতা। যখন তৃতীয়

বার গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সে প্রস্তাব এক প্রত্যাদেশ মত তাঁহার নিকট আসিয়া পড়িল, তখন তাঁহাকে এক নূতন অবস্থায় আসিয়া পড়িতে হইল।

গভর্ণমণ্ট তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, একটা নূতন জাতির ভিতর ব্রাহ্মসমাজের প্রবেশ ও তাহাদিগকে চিরপ্রথাগত কুসংস্কারের ভিতর হইতে উত্থিত করা কি আপনাদের মিসন (Mission) নহে? নব ভাবে ও নবসংস্কারব্রতে ব্রতী কেশবচন্দ্র ইহার উপর আর কোন্ উত্তর দিবেন? মহা নীরবতা আসিয়া পড়িল। একটা নূতন প্রত্যাদেশ তাঁহাকে কোথায় লইয়া গেল। তিনি নীরব গৃহে নীরব আসনে নীরবে ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলেন। প্রত্যাদেশ প্রত্যাদিষ্টকে মহা পরীক্ষায় আনিয়া ফেলেন। কুচবিহার অপেক্ষা করিতেছিল উঠিবার জন্য। তাঁহার নীরব প্রার্থনার ভিতরে ভগবানের ইঙ্গিত ও আদেশ আসিল। ভগবানের আলোকে ও নির্দ্দেশানুসারে উভয় দিকের প্রত্যাদেশের অগ্রসরের পথ উন্মুক্ত হইল। বিধাতা স্থির করিয়া দিলেন যে, বর্ত্তমানে পাত্রপাত্রীর মধ্যে 'বাগ্‌দান' অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হউক। তাহার পর যখন যুবক রাজকুমার উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিবেন এবং উভয়ই প্রাপ্তবয়স্ক হইবেন, তখন ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে প্রকৃত বিবাহ অনুষ্ঠিত হইবে। এই নির্দ্ধারণে ও এই আলোকেই এই প্রত্যাদেশের কাজ অগ্রসর হইল এবং সময়ের পূর্ণতায় তাঁহার আদেশ পূর্ণ হইল। আদেশের কাজে পরীক্ষা অনিবার্য্য। ব্রহ্মানন্দের সমক্ষে মহা পরীক্ষা। এই স্থানে তাঁহার নববিধানের অগ্নিপরীক্ষার মহা পরিচয়।

নববিধানের নূতন ইস্রায়েল ব্রহ্মানন্দ এক হস্তে ভগবানের আদেশ ও অপর হস্তে কন্যাকে লইয়া কুচবিহারে প্রবেশ করিলেন। হিন্দু কুচবিহারের সম্মুখে এ দৃশ্য যে একটা নূতন ও বিসদৃশ, তাহার সন্দেহ নাই। চির প্রচলিত পদ্ধতি ও প্রথার পন্থী কুচবিহার ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে পুরাতন সংস্কার রক্ষা করিয়া আসিতে ছিলেন; আজ সে সংস্কারের বিরোধী ভাবকে কতটুকু স্থান দিতে পারিবেন? ঘোর পৌত্তলিকতাপূর্ণ কুচবিহারের পক্ষে নিরাকারবাদী দলের আগমন নীরবে বহন করা অসম্ভব। প্রকাশ্যে ও গোপনে বিঘ্ন বাধা উপস্থিত হইয়া বিধাতার কার্য্যকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল বটে, কিন্তু ভিতরে তাঁহার বিধান চলিতেছিল। দলের কার্য্য অব্যাহত হয় নাই, কিন্তু বিধাতার বিধান বিঘ্ন বাধার ভিতর পূর্ণ হইয়াছিল। বিধাতার আদেশপালনে প্রস্তুত আত্মাকে কে বাধা দিতে পারে? একদিকে যুবক রাজকুমার সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের প্রত্যাদেশ, আর একদিকে প্রত্যাদিষ্ট ব্রহ্মানন্দ ও আদেশপালনোন্মুখ কন্যা সুনীতি দেবী। সেই পৌত্তলিক কুচবিহারের মার্জ্জিত-জ্ঞান-সম্পন্ন যুবক রাজকুমার নবভাবে নবালোকে প্রণোদিত। ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে নববিশ্বাসী প্রেরিতগণ ও সমবিশ্বাসিগণ এবং 'গভর্ণমেণ্ট হইতে প্রেরিত রাজসাহী বিভাগের কমিশনার মিঃ ড্যাল্টন্ এবং তাঁহার সঙ্গে বঙ্গের খৃষ্টীয় মিসন হইতে সমাগতা অতি বৃদ্ধা চিরকৌমার্য্যব্রতাবলম্বিনী তপস্বিনী পিগট্, এই বিঘ্নবাধাপূর্ণ মিলন-কেন্দ্রে উপস্থিত। বিধাতার কার্য্য অব্যাহত থাকিতে পারে না। এই উভয়ভাবাপন্ন মণ্ডলীর মিলনকেন্দ্রভূমি হইতে বিধানপতির সম্মুখে যে প্রার্থনা উত্থিত হইল, সে প্রার্থনা সত্য সত্য নববিধানের ইতিহাসকে চিরদিন পূর্ণ করিবে। নবীন প্রাণে প্রণোদিত ও বিধাতার নবীন আদেশে উন্মেষিত ব্রহ্মানন্দ ও ব্রহ্মানন্দকন্যা, যুবক রাজকুমারের সেই সৌম্য ও শান্ত মূর্ত্তি, তাঁহার প্রেমানুরঞ্জিত উজ্জ্বল চক্ষু ও ব্রহ্মমুখীনতা এবং নববিধানের সহযোগী ও আদেশবিশ্বাসী আত্মাগণের সহযোগিতা চিরদিনই বিধাতার আদেশ-পালনের সাক্ষ্যদান ও তাঁহার নবসংবাদের পূর্ণতা সাধন করিবে।

যখন নূতন বিধান আসে, মানবীয় দুর্ব্বলতা ও অল্পবিশ্বাস হইতে অনেক বিরুদ্ধ কাহিনী ছড়াইয়া পড়ে। মানুষ সুন্দর কমলকেও তাহার ইচ্ছানুরূপ রঙ্গে রঞ্জিত করিতে পারে। বিধানবিশ্বাস হইতে দূরবর্ত্তী ও উন্নত বঙ্গ হইতে বিভক্ত কুচবিহারের পক্ষে সেই যুগে এরূপ কাহিনী অসম্ভব হইতে পারে নাই। কাহিনী অনেক রঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

নামকুম, রাঁচি। শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার

কয়েকখানি চিঠি

[মহারাণী সুনীতি দেবীর পত্রাবলী]

February 20th.

অতি স্নেহের—

প্রাণের ভালবাসাপূর্ণ কৃতজ্ঞতা লও। তোমার সুন্দর চিঠিখানিতে উৎসবের বিবরণ পড়িতে পড়িতে আমার কি যে অপূর্ব্ব আনন্দ পাইলাম। "মেয়েদের নগরকীর্ত্তন" চক্ষের সম্মুখে একটি ছবির মত আসিয়া পড়িল। কি উৎসব, কি ছবি, কি আনন্দ, স্বর্গ ও কলিকাতা এক হইয়াছিল, তোমাদের সঙ্গে সকল যুগের দেবীগণ এক হইয়াছিলেন। তোমাদের আশীর্ব্বাদ করিবার আমি উপযুক্ত নহি, তোমরা আশীর্ব্বাদ কর, মাথা নত করিতেছি। কি উৎসবই দেখালে সকল নরনারীকে। আমার কথা জিজ্ঞাসা করিও না। পড়িয়া আছি রুগ্ন ও শ্রান্ত। মৃত্যুর জন্য যেন প্রস্তুত থাকি। * * * তুমি আর্য্যনারীসমাজ খুব জাগাইয়া রাখিও। দেব পিতামাতার ইচ্ছা তোমার জীবনে পূর্ণ হউক।

স্নেহের চিঠি

February 19th. 1929.

স্নেহের—

তোমার চিঠিগুলি বড়ই মিষ্ট লাগে। সু—যে আর্য্যনারীসমাজের জন্মদিন বাহির করিয়াছেন, ইহার জন্য তাঁহাকে আমার প্রাণের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ আশীর্ব্বাদ দিও। সেই যে প্রথম প্রথম এই সমাজের অধিবেশন হইত, তোমার চিঠি সেই দৃশ্যগুলি চক্ষের সমক্ষে ধরিল। বৌকে বড় কাছে মনে হয়, সেই অধিবেশনগুলির কথা ভাবিলে। আর কি ভাই আমার লিখিবার ক্ষমতা আছে? কোথায় আমার সে পূর্ব্বের জীবন, কোথায়ই বা ভাষা! তোমরা ভাই লিখিও। এ আর্য্যনারীসমাজ-প্রতিষ্ঠা যে ভারতরমণীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা। বর্ত্তমানে কত সমিতি, কত কি হইতেছে, কিন্তু ধর্ম্মজীবন দেখাইবার শিক্ষা আর্য্যনারীসমাজ ভিন্ন আর কেহ পারেনা। এ সমাজের উন্নতি যে বিশেষ রূপে করিতে হইবে। সু—যেন হাতে লইয়া এ সমাজের জন্মোৎসবটি সম্পন্ন করেন।

এবারে উৎসবের আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারি নাই, কত যেন দূর পড়িয়াছিলাম। উৎসবের সময় কলিকাতার মিলনটি বড় সুখের। * * * সংসারপথ কি দুর্গম! এ ভাঙ্গা জীবনটা এখনও পরীক্ষা দিতে দিতে চলিতেছে।

বাঁচিয়া থাক, দীর্ঘজীবী হও। মাতৃদেবীর বইগুলি আসিয়াছে। মার প্রার্থনা একটি একটি সে সুধাবিন্দু, প্রাণে কত আরাম দেয়। বইগুলি কেহ লইয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারেন না? এইত প্রচারের কাজ। নি—হাতে লইলে ভাল হয়, কি বল? ছেলেদের আশীর্ব্বাদ দিও এবং তুমি প্রাণের স্নেহপূর্ণ ভালবাসা লও।

স্নেহের দিদি

January 7th

স্নেহের—

আজ প্রাণটা কমলকুটীরে যাইবার জন্য বড় কেমন করিতেছে। কেবল সেই পূর্ব্বের দিনগুলি, সেই দৃশ্যগুলি আসিয়া মনটাকে বিচলিত করিতেছে। আত্মায় আত্মায় যেন তোমাদের সঙ্গে কমল উপাসনায় মিলিয়া অমৃতধামে যাইতে পারি। ভক্তের পদতল আমাদের চিরদিনের আশ্রয়। * * * কেমন আছ?

স্নেহের দিদি

December 24th

অতি স্নেহের—

তোমার সুমিষ্ট চিঠিগুলি যথাসময়ে পাইয়াছি। স্নেহ ঢালিয়া দেয় তোমার পত্র। কত যত্ন, কত আদর করিলে, মার স্নেহ তোমার ব্যবহারে পাইয়া বড় সুখী হইয়াছি। সু—র ভিতর যে এত কোমল স্নেহ লুক্কায়িত ছিল, এতদিন তাহা জানিতাম না। প্রাণটা তোমাদের স্নেহ ব্যবহারে কৃতজ্ঞ ও মুগ্ধ।

নানা কারণে ভাই চিঠি পত্র লিখিতে পারি নাই, কাজও অনেক। বড় কষ্ট হইতেছে, সুখময় "২৬"এ তোমাদের সঙ্গে একত্রে বসিয়া উৎসবটি সম্ভোগ করিতে পারিব না, এখানে উপাসনায় তোমাদের সঙ্গে মিলিব। * * * ছেলেদের love দিও। গিয়া অনেক কথা বলিব।

স্নেহের দিদি

August 15th, 1928

স্নেহের—

তোমার স্নেহমাখা সুন্দর চিঠিগুলি যথাসময়ে পাইয়াছি। পুণ্য তোমার জীবনে প্রকাশিত, সরস স্নেহজড়িত, ব্যবহার ও ভাষায় সে জীবনটী সদা সর্ব্বদা সকলকে তুষ্ট করিতেছে। আজ তোমারই পুণ্যবলে তোমার নবগৃহে, নব আনন্দের কল্লোল। আমি আর কি বলিব, এ প্রাণের আশীর্ব্বাদের যদি মূল্য থাকে, তবে এই প্রার্থনা করি, নববিধানের নবভক্তের নবলক্ষ্মী তোমার সংসারে অচলা হইয়া থাকুন। জন্মদিনে যে গৃহে প্রবেশ করিয়াছ, শুনিয়া বড় আহ্লাদ হইল। সবই নূতন করিয়া পাইলে! ঠিক সময় পৌঁছিয়াছে, সকলে নূতন আশা লইয়া ভবিষ্যৎ গড়িতেছ, এ বড় সুন্দর দৃশ্য, বড় সুখের কথা। দীর্ঘজীবী হও, সস্বামী পুত্রদের লইয়া ব্রহ্মানন্দের আনন্দময়ীকে পূজা করিয়া চিরসুখী হও। সকল আনন্দ-উৎসবে স্নেহময়ী মার অভাবটি বোধ হয়। তোমার এ নূতন বাড়ী দেখিলে, মার সেই স্নেহকর-কমলস্পর্শের অভাবটা ও তাঁহার স্নেহভরা ভাষায় আশীর্ব্বাদের অভাবটা বড় কষ্ট দেয়।

তোমাদের অর্থাভাবের ভিতর কষ্টে স্নেহময়ী জননী প্রতিপালন করিয়াছিলেন, তোমাদের সংসারগুলির সুখ সুবিধা দেখিলে কত না মা আজ আনন্দ করিতেন। সুদীর্ঘ জীবন লইয়া সপরিবারে নবলক্ষ্মীর পূজা কর, আনন্দধামে দেব পিতামাতার হাসি দেখিবে। কলিকাতার সংবাদাদি পাই, তবে বেশী খবর রোগ শোকের। কত আত্মীয় স্বজন চলিয়া গিয়াছেন; এখন ইচ্ছা হয়, যাঁহারা আছেন, তাঁহারা "বাঁচিয়া আছেন" শুনিয়া যাই। * * * এ জীবন যেন দয়াময়ের চরণে কৃতজ্ঞতাভরে লুটায়। তাঁর চরণ বিনা আমার সহায় আর কিছুই নাই। এ বৃদ্ধ বয়সে শক্তিহীন ও বুদ্ধিহীন হইয়াছি।

তুমি সু—র কাছে হইয়াছ, ইহা একটি বড় আনন্দের কথা। দুইজনে কেমন করিয়া উপাসনা, সংসার, পরসেবা ইত্যাদি করিতে হয়, দেখাইবে। * * * উৎসবের সময় প্রাণে প্রাণে বাঁধাত আছি, দূর নিকট এক হইবে, একত্র কাজ করিব। * * * ভক্তের ভগবান্ তোমার জীবনে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করুন।

স্নেহের দিদি

Woodlands
Oct. 1st

অতি স্নেহের—

তোমাদের ঋণ ত কখনও শোধ দিতে পারিব না। এ ঋণের ভার আরও গুরু হইতেছে। বিশ্বাস করি, "ভাই বোনের স্নেহ আমাকে ভবসিন্ধুপার" সহজ করিয়া দিবে। * * *

সু—এবার স্নেহ ঢালিয়া দিয়াছেন, আমার আশীর্ব্বাদ যদি সাহায্য করে, বলিও, প্রাণের আশীর্ব্বাদ করিতেছি। ছেলেদের স্নেহ দিও, সকলে ভাল থেক।

প্রাণের বি—র বিচ্ছেদ-যাতনা হৃদয়টা নীরবেই সহ্য করে, কিন্তু প্রাণটা ছুটিয়া কোথায় চলিয়া যাইতে চাহে। চক্ষের দৃষ্টি ক্ষীণ, ভাল করিয়া লিখিতে পারিলাম না। প্রাণের ভালবাসা, স্নেহ এবং আশীর্ব্বাদ লও।

স্নেহের দিদি
(ক্রমশঃ)

—•—

নূতন গান।

(নালুদার মৃত্যু উপলক্ষে শ্রীদামোদর পাল কর্ত্তৃক রচিত)

[কালের প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে]—সুর।

"ডুবিলাম ডুবিলাম প্রাণারাম-সাগরে"
কে গাহিয়ে ঐ চলে যায়!
দেখিতে দেখিতে, কোন্ অদৃশ্যেতে,
ডুবিয়া গেলেন তায়!
নশ্বর এ দেহ গেহ পরিহরি,
অপূর্ব্ব চিন্ময়, আত্মারূপ ধরি,
কোন্ সুগভীরে, প্রাণ-সিন্ধু-নীরে,
মিশিল আজ কোথায়?
জলন্ত পুণ্যের হোমাগ্নি জ্বালিয়া,
বৈরাগ্য প্রেমের আহুতি ঢালিয়া,
নিত্যোৎসব-পূর্ণ জীবন করিয়া,
ধরি রূপ জ্যোতির্ম্ময়;
চারিদিক আজি মধুময় করি,
শত শতদল বক্ষঃস্থলে ধরি,
পূজিতে গেলেন, যথায় শ্রীহরি,
সবে মিলে চল তথায়।
সে অমরধাম ঐ যে সম্মুখে,
কেন হেথা বসে থাক ম্লানমুখে?
অধীর হইয়া তুচ্ছ সুখ দুঃখে,
রোগে শোকে মৃতপ্রায়;
অমৃতপথের, ওগো যাত্রি! যারা,
বহিছে যথায় নিত্য শান্তিধারা,
সেইখানে গিয়ে হও আত্মহারা,
মিশে ঐ জীবন-ধারায়!

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, আমাদের অগ্রজ নববিধান-প্রচারক শ্রদ্ধেয় ভাই চন্দ্রমোহন দাসের বড়শীতিতম জন্মদিন উপলক্ষে শান্তিপুরে বিশেষ উপাসনা হইয়াছে। এই দীর্ঘ জীবনে বিধানজননীর অনির্ব্বচনীয় কৃপা-স্মরণে শ্রদ্ধেয় ভাই প্রাণের গভীর কৃতজ্ঞতা অর্পণ করেন। আমরাও তাঁহার সহিত একাত্মতা অবলম্বনে, মার চরণে কৃতজ্ঞতা-ভক্তিভরে লুণ্ঠিত হই।

কলিকাতার স্বনামধন্য, অধ্যবসায়শীল, স্বাবলম্বী কর্ম্মবীর, বাঙ্গলার সুসন্তান, প্রসিদ্ধ "মার্টিন কোম্পানির" প্রধানতম অধ্যক্ষ মাননীয় স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, গত ২৩শে জুন, অশীতিতম বৎসরের পদার্পণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার এই শুভজন্মদিনে, আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও শুভাকাঙ্ক্ষাপূর্ণ অভিনন্দন তাঁহাকে জ্ঞাপন করিতেছি। নববিধানের প্রেরিতদলের প্রতি তাঁহার অকপট শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল; কত বিষয়ে তিনি তাঁহাদের সেবা ও সাহায্য করিয়াছেন। এই সুদীর্ঘ জীবনে দেশের এবং দশেরও কত উপকার করিয়াছেন। দীর্ঘকাল ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর সভ্যশ্রেণীভুক্ত থাকিয়া, সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ে মণ্ডলীর প্রতি কতই সদয় ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। ভগবান্ তাঁকে আরও দীর্ঘজীবী করিয়া দেশের মঙ্গলসাধনে নিযুক্ত রাখুন।

জাতকর্ম্ম—গত ১৮ই জুন, ১০নং নারিকেল বাগান লেনে, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের গৃহে, তাঁহার দৌহিত্রের (শ্রীমতী বীণা সরকারের নবজাত পুত্রের) জাতকর্ম্ম অনুষ্ঠান উপলক্ষে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

শুভবিবাহ—গত ২রা আষাঢ়, (১৬ই জুন), শুক্রবার, টাঙ্গাইল-নিবাসী স্বর্গীয় শশিভূষণ তালুকদারের দ্বিতীয় পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ কালিদাস তালুকদারের সহিত, বালেশ্বর-নিবাসী স্বর্গীয় ধ্রুবনাথ করের মধ্যমা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী কল্যাণকুমারীর শুভবিবাহানুষ্ঠান নবসংহিতামতে, কলিকাতায় ৭৩নং রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ এই শুভানুষ্ঠানে আচার্য্য ও পুরোহিতের কাজ করিয়াছেন। ভগবান্ নবদম্পতিকে স্বর্গের শুভাশীষ দান করুন।

দীক্ষা—গত ১লা আষাঢ়, ৭৩নং রাজা দীনেন্দ্রষ্ট্রীটে, বালেশ্বরের স্বর্গীয় ধ্রুবনাথ করের মধ্যমা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী কল্যাণকুমারী নবসংহিতামতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। ভাই অখিলচন্দ্র রায় দীক্ষার্থিনীকে উপস্থিত করেন এবং ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনানন্তর দীক্ষা দান করেন। ভগবান্ নবদীক্ষিতাকে নববিধানের নবজীবন দান করুন।

পরলোকগমন—আমরা গভীর দুঃখের সহিত নিম্নলিখিত পরলোকগমন-সংবাদ প্রকাশ করিতেছি :—

আমাদের প্রিয়তম নন্দদার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র, আমাদের প্রিয়তম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বিজনকুমার সেনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার সেন ৫০ বৎসর বয়সে, গত ২১শে জুন, কলুটোলাস্থ নিজ বাটীতে (২৮নং রামকমল সেন লেন), পিতা, ভ্রাতা, পত্নী, পুত্র, কন্যা ও বহু আত্মীয় স্বজনদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি রোগশয্যায় কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই শান্তভাবে গভীর বিশ্বাসের সহিত পরলোকে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে ছিলেন। তিনি কলিকাতার মধ্যে দীর্ঘতম পুরুষ বলিয়া সকলের নিকট আদৃত ছিলেন।

গত ১৩ই জুন, কলিকাতায়, স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পালের পত্নী, বিপিনবাবুর পরলোকগমনের ঠিক একবৎসর পরে, পরলোকগমন করিয়াছেন; গত ২৫শে জুন, তাঁহার পবিত্র শ্রাদ্ধানুষ্ঠান কলিকাতায় সম্পন্ন হইয়াছে।

নববিধানজননী তাঁহার প্রিয়তম সন্তানদিগকে তাঁর অনন্তশান্তিক্রোড়ে রক্ষা করুন এবং পৃথিবীস্থ সকল শোকার্ত্তজনের প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ২৫শে জুন, রবিবার, কাশীপুরে, ২৯নং হরেকৃষ্ণ শেঠ রোডে, স্বর্গীয় রায় বাহাদুর ডাঃ মতিলাল মুখোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া নিস্তারমোহিনী দেবীর পবিত্র আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান নবসংহিতানুসারে, গম্ভীরভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ভাই অক্ষয়কুমার লধ উদ্বোধন ও আরাধনা, ডাঃ সত্যানন্দ রায় শাস্ত্রপাঠ, ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক প্রার্থনা করিয়া শান্তিবাচন করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ভ্রাতৃগণের সহিত দণ্ডায়মান হইয়া প্রধান শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করেন। বিধানমুরলী শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মধুর কণ্ঠে সঙ্গীত করেন। মাননীয় স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি প্রভৃতি গণ্যমান্য আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধব অনেকে উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া পরলোকগত মাতৃ-আত্মার প্রতি শ্রদ্ধার্পণ করিয়াছেন। নববিধানজননী তাঁর সতীকন্যার আত্মাকে পতিপুত্রসনে চিরশান্তিময় অমরভবনে স্থান দান করুন এবং পৃথিবীস্থ সকল শোকার্ত্তজনের প্রাণে নিত্য শান্তি বিধান করুন। এই অনুষ্ঠানে নিম্নলিখিত দান বিজ্ঞাপিত হইয়াছে :—নববিধান প্রচারভাণ্ডার ৩০৲, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির ১৫৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ১৫৲, পুরী নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ১০৲, হিন্দু-অনাথাশ্রম ১০৲, মুসলমান অনাথাশ্রম ১০৲, ব্রাহ্ম রিলিফ ফণ্ড ১০৲, রামকৃষ্ণ মিশন অনাথাশ্রম ১০৲, অন্ধদের স্কুল ১০৲, মূক ও বধিরদের স্কুল ১০৲, *Little Sisters of the Poor* ১০৲, ত্যাবলায় বিধবাদের ৩০৲, পুঁড়ার বিধবাদের ২০৲, ভবানীপুর বিধবাদের ১০৲, ভগিনীসমিতি ১০৲, কাশেল 'সত্যেন্দ্র' ছাত্র ফণ্ড ২০৲, প্রমথলাল শিক্ষাতীর্থ ১০৲, আচার্য্য তিনজন ও গায়ক ৪০৲, গোবিন্দ কুমারী হোম ১০৲, আতুরাশ্রম ১০৲, মোট ৩০০৲।

অদ্য ঢাকায় জ্যেষ্ঠ কন্যা শ্রীমতী মনোরমা দেবীও মাতৃশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন।

আরোগ্যলাভ—স্বর্গীয় প্রেরিত ভাই কেদারনাথ দের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী অশোকলতা দাস দীর্ঘকাল কার্ব্বাঙ্কল রোগে কষ্ট পাইয়া, কিছুদিন হইল আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। তাঁর আরোগ্য উপলক্ষে, গত ১লা জুন, রাত্রিকালে, ১৫বি রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট ভবনে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে নববিধান প্রচারভাণ্ডারে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। মা বিধানজননী তাঁর কন্যাকে আবার সেবাব্রতসাধনে সক্ষম করুন।

তীর্থবাস ও সেবা—গত ৬ই জুন, সস্ত্রীক ও সবান্ধবে, ভাই প্রিয়নাথ ভুবনেশ্বর ও খণ্ডগিরি-গুহায় তীর্থযাত্রা করিয়া, ধ্যান প্রার্থনাদি করিয়া আসেন। ফিরিবার সময় মিঃ এস. সি, রায়ের বাড়ী সন্ধ্যায় উপাসনা করেন।

সেবা—ভাই অখিলচন্দ্র রায় বিগত ১৭ই জুন, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫টার সময়, চন্দননগর ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করিয়া, তৎপরে চুঁচুড়া ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যা ৭টার সময় উপাসনা করেন, এবং ১৮ই জুন, রবিবার প্রাতে ৮টার সময় চুঁচুড়া বাণীমন্দির-বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী কুমারী লাবণ্যকণা বসুর আবাসে বিশেষ উপাসনা করেন। চুঁচুড়া নববিধান মন্দিরে প্রায় দেড় বৎসর কাল ১৫দিন অন্তর উপাসনা চলিতেছে। উভয় স্থলেই বিশ্বাসী ভাই ভগিনীগণ যোগদান করেন।

গত ২০শে জুন, পুরী বিশ্রামকুটীরে, মিসেস পি, সি, সেনের প্রবাস-ভবনে, ভাই প্রিয়নাথ সস্ত্রীক গমন করিয়া সান্ধ্য উপাসনা করেন। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী সঙ্গীত করেন।

নবপর্ণকুটীর, পুরী—গত গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে, বর্দ্ধমান রাজকলেজিয়েট স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত করুণাকুমার চট্টোপাধ্যায় সস্ত্রীক এবং হাওড়ার বন্ধু শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ মৈত্র সস্ত্রীক ছেলেমেয়ে ও আরো দুইটী মহিলার সহিত পুরী নবপর্ণকুটীরে গিয়া, প্রায় একমাস কাল একত্রে নিত্য উপাসনা, সাধন ভজন ও এক পরিবারের ন্যায় সেবক সেবিকার সঙ্গে অবস্থান করিয়া গিয়াছেন। কুটীরটী ক্ষুদ্র হইলেও, দুই তিনটী পরিবার প্রীতি ও সদ্ভাবে একত্রে কেমন করিয়া নববিধানের প্রেম-পরিবারের ভাব সাধন করা যায়, তাহার আভাস অনুভব করিয়া সকলেই সুখী হইয়াছেন।

পুরী সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় নববিধান-প্রতিষ্ঠানের রবিবাসরীয় সামাজিক উপাসনা, ভাই প্রিয়নাথের অনুপস্থিতিকালে, এক সপ্তাহে অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ সেন ও পর সপ্তাহে অধ্যাপক পুণ্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদন করেন।

চন্দননগর ব্রহ্মমন্দির—অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, প্রায় ১৫ বৎসর পরে, গত ৩রা জুন, চন্দননগর ব্রহ্মমন্দিরে

আবার ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ হইয়াছে। ভ্রাতা ডাক্তার অনুকূলচন্দ্র মিত্র ভাই অখিলচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া তথায় গমন করিয়া, ঐ দিন অপরাহ্নে ৫॥টার উপাসনা আরম্ভ করিয়াছেন। তথাকার বন্ধুগণ পুনরায় উৎসাহী হইয়াছেন।

খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দির—খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরের অন্যতম ট্রাষ্টী ভাই অখিলচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন:—গোবরডাঙ্গা ষ্টেসনের অনতি দূরে খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দির। ঐ মন্দিরটী স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয় নির্ম্মাণ করাইয়া, শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ দেব দ্বারা প্রতিষ্ঠা করান। এই বহু পুরাতন ব্রহ্মমন্দির সম্বন্ধে আলিপুর জজ আদালতে মোকদ্দমা হওয়ায়, আদালতের অভিপ্রায় মতে শ্রদ্ধেয় দত্ত মহাশয় ও অপর পক্ষ ১০জন ট্রাষ্টী নিয়োগ করেন। এই ট্রাষ্টীদের মধ্যে অনেকেই পদত্যাগ করায়, বর্ত্তমানে নিম্নলিখিত নববিধানবিশ্বাসিগণ ট্রাষ্টীপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন:—মিঃ প্রশান্তকুমার সেন, ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ, ডাক্তার করুণাকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার শচিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী সরস্বতী সেন, শ্রীমতী স্নেহলতা দত্ত, শ্রীমতী আশালতা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার খাস্তগীর, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন ও সেবক ভাই অখিলচন্দ্র রায়। আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত জনসাধারণকে জানাইতেছি যে, শ্রদ্ধাভাজনীয়া শ্রীমতী সরস্বতী সেন মহাশয়া এই ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা ও ব্রহ্মমন্দিরের সংস্কারাদি কার্য্যের জন্য যে ৮০০০৲ আটহাজার টাকার গভর্ণমেণ্ট পেপার দান করিয়াছিলেন, কিছুদিন পূর্ব্বে একখানি স্বতন্ত্র ট্রাষ্টডীড করিয়া ঐ টাকা অন্যতম ট্রাষ্টী ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ ও ডাক্তার শচিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের হস্তে দিয়াছেন। এখন হইতে ডাক্তার ঘোষ ও ডাক্তার চাটার্জি অন্যান্য ট্রাষ্টীদের সহযোগে ঐ ব্রহ্মমন্দিরসম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যয়াদি উক্ত টাকার সুদ হইতে সম্পন্ন করিবেন।

ভাই অখিলচন্দ্র ইহাও লিখিয়াছেন:—গোবরডাঙ্গা খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরে নিয়মিত সাপ্তাহিক উপাসনা এখনও প্রবর্ত্তিত হয় নাই। যদিও ১০জন ট্রাষ্টীর হস্তে এই ব্রহ্মমন্দির ও তৎসংলগ্ন সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার পড়িয়াছে এবং তাঁহারা ভাই অখিলচন্দ্র রায়, ডাক্তার অনুকূলচন্দ্র মিত্র ও ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ বসুর হস্তে এই ব্রহ্মমন্দিরে নিয়মিত উপাসনার ভার দিয়াছেন, তথাপি ভারপ্রাপ্ত সেবকগণ কয়েকটী অসুবিধায় পড়িয়া সুব্যবস্থা করিতে পারিতেছেন না। তবে আশা করা যায়, অচিরেই সমস্ত বাধা বিঘ্ন দুর হইবে। এক মাসের মধ্যে উঁহারা তিন জন তিনবার খাঁটুরা যাইয়া সাময়িকভাবে ব্রহ্মোপাসনাদি করিয়াছেন। এ বিষয়ে ট্রাষ্টীগণেরও বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রার্থনীয়।

সাম্বৎসরিক—গত ২৭শে মে, ভক্তিভাজন প্রেরিতপ্রবর প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের স্বর্গারোহণদিন উপলক্ষে, শান্তিপুরে বিশেষ উপাসনা, সংকীর্ত্তন ও "আশীষ" পাঠ হইয়াছিল। শ্রদ্ধেয় প্রচারক ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনার কাজ করিয়াছিলেন।

গত ২২শে জুন, ৮ই আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ভাই প্রিয়নাথের মাতৃদেবীর স্বর্গারোহণ-সাম্বৎসরিক পুরী নবপর্ণকুটীরে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই নিজেই উপাসনা করেন ও শ্রীমান্ শচীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী ও কুমারী জ্যোৎস্না গুপ্তা সঙ্গীত করেন। এই উপলক্ষে কিছু দরিদ্র-সেবা হয়। প্রচারক মহাশয়দিগের সেবার জন্য সেবিকা হেমন্তকুমারী মল্লিক ১৲ টাকা অভিভাবক মহাশয়কে পাঠান।

বিগত ১৮ই জুন, সন্ধ্যায়, ১৫বি, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে, স্বর্গীয় মনোমতধন দের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন; মধ্যমা ভগিনী অশোকলতা দাস সকাতরে প্রার্থনা ও কন্যাগণ সহ সঙ্গীত করেন। জামাতা হুমায়ুন কবির প্রভৃতি ভক্তির সহিত যোগদান করেন। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ২৲ দান করিয়াছেন। ঐদিন, ঐ উপলক্ষে, পল্লীগ্রামের অন্তর্গত সমুদ্রতীরবর্ত্তী গোপালপুরে ভ্রাতা মনোমতধন দের প্রবাসভবনে এবং রাঁচিতে জ্যেষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমতী হেমলতা চন্দের প্রবাসগৃহেও উপাসনাদি হইয়াছে। এই উপলক্ষে শ্রীমতী হেমলতা চন্দ প্রচারভাণ্ডারে ১৲ ও রাঁচিতে গরিবদিগকে গরম বস্ত্র, চাল ও আম দান করিয়াছেন। সংসারের ঘোরতর কার্য্যব্যস্ততার মধ্যেও মনোমতধন দে স্থির শান্ত ভাবে ও ভক্তির সহিত ভগবানের নামগানে তন্ময় হইয়া যাইতেন; তাঁহার সুমধুর সঙ্গীত শুনিয়া সকলে বিমোহিত হইতেন। স্বর্গের পাখী যেন দিন কয়েকের জন্য নন্দনের অমিয় সুধা বিতরণ করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। নববিধানের সুগায়ক এখন অমরধামে ভক্তবৃন্দকে মা নাম শুনাইতেছেন।

গত ৯ই জুন, স্বর্গীয় মোহিতচন্দ্র সেনের সাম্বৎসরিক দিনে, তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা মীরা দেবী ও জ্যেষ্ঠ জামাতা মিঃ অজয়কুমার গুপ্তের ২৫।২ রোলাণ্ড রোডস্থ গৃহে ডাঃ সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন।

কোচবিহারের সংবাদ—গত ১৭ই মে, ভ্রাতা কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের পঞ্চম পুত্র শ্রীমান্ সুনীতিকুমারের এবং ১৭ই জুন, তৃতীয় ও চতুর্থ পুত্রের জন্মদিন উপলক্ষে করুণাকুটীরে বিশেষ উপাসনা হয়। গত ১৮ই জুন, প্রিন্‌সিপাল শ্রীযুক্ত মনোরথধন দের বাড়ীতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় মনোমতধন দের সাম্বৎসরিক দিনে ভ্রাতা নবীনচন্দ্র আইচ উপাসনা করেন। মনোরথ বাবু বিশেষ প্রার্থনা করেন। ভ্রাতা নবীনচন্দ্র আইচই এখনও স্থানীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনাদি পূর্ব্ববৎ করিতেছেন।

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৮ ভাগ। ১৩শ সংখ্যা। | ১লা শ্রাবণ, সোমবার, ১৩৪০ সাল, ১৮৫৫ শক, ১০৪ ব্রাহ্মাব্দ। 17th July, 1933. | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে আমাদের রক্ষক, প্রতিপালক ও সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল-বিধায়ক পরম দেবতা! নবযুগের নবধর্ম্ম, নবধর্ম্মের নূতন মণ্ডলী ও পরিবার তোমারই শ্রীহস্তের রচনা। আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের মঙ্গলের জন্য, সদ্গতিবিধানের জন্য, নব নব ভাবে স্বাস্থ্য ও সামর্থলাভের জন্য, তোমার কি বিপুল আয়োজন! তবে কেন আমরা এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি? নিষ্প্রভ হইয়া পড়িতেছি? অনেক সময় এই পৃথিবীতে দেখা যায়, বড় বড় ধনীর পুত্র কন্যাদিগের দেহ মনে বড় বড় রোগ। ধন সম্পদের অভাব নাই, আহার পরিচ্ছদের আয়োজনের ত্রুটি নাই, স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে পরামর্শদাতা সুযোগ্য চিকিৎসকগণও উপস্থিত; অথচ তারই মধ্যে ধনীর গৃহের পুত্র কন্যাদিগের দৈহিক ও মানসিক জীবনে দুরারোগ্য গূঢ় রোগ। ধনীর পুত্রকন্যাদিগের বাহ্য লাবণ্যময় শরীর মন ক্রমে দুর্ব্বল, মলিন, প্রভাহীন। আমাদের অগ্রণী ও জ্যেষ্ঠগণ তোমার প্রদত্ত ধনে ধনী হইলেন, কত স্বর্গের রূপলাবণ্যময় অমর জীবনের শ্রীসৌন্দর্য্যে পূর্ণ হইয়া আপনারা মোহিত হইলেন, স্বদেশ, বিদেশকে আকৃষ্ট করিলেন, কত ধন সঞ্চয় করিলেন, কত ধন বিলাইলেন; যথাসময়ে জীবনের কর্ত্তব্য এখানে শেষ করিয়া, আমাদেরই জন্য সে শ্রীসৌন্দর্য্যপূর্ণ অমর জীবন রাখিয়া, তোমার বক্ষে অমরপুরে প্রবেশ করিলেন। আমরা সেই গৃহের, সেই পরিবারের তোমারই সন্তান। আমরা বুঝি, গৃহের প্রচুর ধন ঐশ্বর্য্য দেখিয়া অহঙ্কারী হইয়াছি, অভিমানী হইয়াছি, অলস ও জড়ভাবাপন্ন হইতেছি? ধর্ম্মরাজ্যে অহঙ্কারের পুরোভাগে যে পতন। ধর্ম্মরাজ্যে অলসতা, জড়তার যে স্থান নাই। এ যে চির বিনয়ী, চির দীনাত্মাদিগের রাজ্য। এ যে চির কর্ম্মঠ, তোমার চির অনুগত দাসদাসীদিগের রাজ্য। আমাদের বুঝি অনেক ভুল হইয়াছে, আমরা বুঝি তোমার নিত্য আদেশ উপদেশের তেমন করিয়া অনুগত হইতেছি না, তেমন করিয়া জোর প্রার্থনা করিতেছি না, তেমন করিয়া তোমা হইতে আলোক ও ধর্ম্মবল লাভ করিতেছি না। তাই আমাদের মধ্যে কত জীবনে কত রোগ প্রবেশ করিতেছে, আমাদের মধ্যে কত দুর্ব্বলতা আসিতেছে। আমাদের নিজ চেষ্টা, নিজবলে রোগ দূর করিবার উপায় নাই, স্বাস্থ্য সামর্থ লাভ করিবার ক্ষমতা নাই। আমাদের গূঢ় রোগ দেখিয়া তোমারই শরণাপন্ন হইতেছি; তুমি নিজগুণে তোমার গৃহকে, তোমার মণ্ডলীকে রক্ষা কর। তুমি নিজগুণে আমাদিগের মধ্যে স্বর্গের স্বাস্থ্য ও সামর্থ

বিধান করিয়া, আমাদের ও জগতের আশা বিশ্বাস বৃদ্ধি কর, তবে চরণে এই কাতর প্রার্থনা।

শান্তিঃ ! শান্তিঃ !! শান্তিঃ !!!

—০—

সত্যের সমাদর।

নবধর্ম্মের বিশেষ মৌলিকতা স্বাধীন ভাবে সত্য-গ্রহণ। স্বাধীন ভাবে সত্য গ্রহণ, সত্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সত্যের অধীন হওয়া, ধর্ম্মের হওয়া। সত্যই ধর্ম্ম, সত্য-গ্রহণ ও ধর্ম্ম-গ্রহণ একই কথা। সত্য কোন দেশকালে আবদ্ধ নহে, কোন বিশেষ মহাপুরুষেও আবদ্ধ নহে। সত্য অনন্ত, অসীম, আবার সত্য নানা বিচিত্রতায় পূর্ণ। ঈশ্বর সত্যের মুল প্রস্রবণ। তাঁহা হইতে নানা আকারে সত্য আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। সত্য-গ্রহণে বিমুখ না হই, এজন্য আমাদের প্রাণে সত্য-গ্রহণের অনন্ত পিপাসা গূঢ় ভাবে নিহিত রহিয়াছে। প্রাণের অবস্থা, জীবনের অবস্থা সহজ স্বাভাবিক থাকিলে, আমাদের জীবন সত্য-গ্রহণ বিষয়ে অনুকূল হয়; আর আমাদের জীবন, আমাদের প্রাণ যদি চতুর্দ্দিকের অসত্যমূলক বিষাক্ত বায়ুতে বিকৃত হইয়া যায়, যাহা অসত্য, অনাত্ম, অথবা কল্পনা-প্রসূত, সেই সকল বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া সেই সকলের রসাস্বাদনে অভ্যস্ত হয়, তাহা হইলে আমাদের জীবনে সত্যগ্রহণের অধিকার বিলুপ্ত হইয়া যায়। চতুর্দ্দিকে সত্য ছড়ান রহিয়াছে, অথচ এই জন্য অনেকের সে দিকে দৃষ্টি পড়ে না, মন সে পথে ধাবিত হয় না, সত্যগ্রহণের পিপাসা তেমন করিয়া প্রাণে উদ্ভাসিত হয় না। তাহার সঙ্গে সত্যের মূলস্বরূপ ঈশ্বরের প্রতিও বিমুখতা উপস্থিত হয়।

জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা থাকিলে, সত্যগ্রহণে কি প্রকার আগ্রহ উপস্থিত হয়, সফলতা লাভ হয়, আমরা আমাদের অগ্রবর্ত্তী ধর্ম্মাগ্রজগণের জীবনের কথা উল্লেখ করিয়া সহজে প্রদর্শন করিব। প্রথমে আমাদের ধর্ম্মপিতামহ রামমোহন রায়ের জীবনের কথা বলি। তিনি বাল্যে সে সময়ের প্রচলিত প্রথানুসারে মুসলমান মৌলবীর নিকট পারস্যভাষা শিক্ষা করেন, সেই সঙ্গে কোরাণের একেশ্বরের ভাব তাঁহার প্রাণকে স্পর্শ করে। ঈশ্বর অখণ্ড এবং এক অদ্বিতীয়, এই মূল সত্য তাঁহার সরল বাল্য মনকে সহজেই অধিকার করে। পরবর্ত্তী সময়ে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে একেশ্বরবাদ ও বহুদেববাদ যখন পাঠ করিলেন, তখন হিন্দুধর্ম্মের একেশ্বরবাদ নানা বাদ প্রতিবাদ ও প্রতিকূলতার মধ্যেও সমর্থন ও প্রতিষ্ঠিত করা তাঁহার পক্ষে প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া পড়িল। ষোলবৎসর বয়সেই এ সত্যে দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়া, তিনি একেশ্বরবাদ সমর্থন করিয়া একখানা পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। দেশীয় ও বিদেশীয় সকল ধর্ম্মশাস্ত্র মধ্যে এই সত্যের সমর্থন ও প্রচার তাঁহার বিরাট জীবনের সর্ব্ব প্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য হইয়াছিল।

ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথ ধনীর গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, গৃহ পরিবারে নানা অনুষ্ঠানে বাহ্যমূর্ত্তিতে খণ্ড দেবদেবীর পূজা হইতেছে, দেখিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার প্রথমে ধারণা ছিল, হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র বুঝি মূর্ত্তিপূজার বিধি ব্যবস্থাতেই পূর্ণ, নিরাকারের কথা তাহাতে নাই। কিন্তু যখন তাঁহার হাতে উপনিষদের একখানা খণ্ড পাতা আসিয়া পড়িল, এবং রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের মুখে সেই পত্রে লিখিত শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিলেন, অমনই সত্যের অগ্নি দাউ দাউ করিয়া তাঁহার প্রাণকে অধিকার করিয়া বসিল; সত্য নিরাকার ব্রহ্মের বিশুদ্ধ জ্ঞান তিনি সত্য উপলব্ধি-যোগে লাভ করিলেন। সেই উপলব্ধিকে আরও গভীর, আরও উজ্জ্বল, আরও জীবন্ত করিবার জন্যই তাঁহার জীবনব্যাপী পর পর সাধনা। সত্যের অগ্নি সরল তৃষিত প্রাণে সহজেই জ্বলিয়া উঠে।

তাহার পর আমাদের ধর্ম্মনেতা, ধর্ম্মাগ্রজ ব্রহ্মানন্দের জীবন দেখি। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চ্চার ভিতর দিয়া যুবক কেশবচন্দ্রের প্রাণ ধর্ম্মক্ষেত্রে সত্যের অনুসন্ধিৎসু হইয়া পড়িল। তিনি দেখিলেন, প্রাচীন সমাজের প্রচলিত বিধি ব্যবস্থায় তাঁহার তৃপ্তিলাভ হইল না। ইংরেজি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন বলিয়া, বাইবেল শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ প্রবেশ ছিল; কিন্তু খৃষ্ট সম্প্রদায়ের প্রচলিত আচার আচরণেও সত্যের পিপাসার তৃপ্তিলাভ হইল না। তিনি শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গগত রাজনারায়ণ বসুকৃত তৎকালের ব্রাহ্মসমাজের বিধিব্যবস্থা-সম্বলিত একখানা পুস্তিকা তাঁহাদের কলুটোলার গৃহে এই সময় প্রাপ্ত হইলেন। পুস্তিকা পাঠ করিয়া সহজে তাঁহার প্রতীতি হইল, তিনি যে সত্য ধর্ম্মের প্রয়াসী, তাহার মূল এখানে রহিয়াছে। সত্যের সন্ধান পাইলেন, সত্যের আস্বাদন লাভ করিলেন, বিনা বিচারে ব্রাহ্ম-

সমাজে যোগদান করিলেন। ব্রহ্মানন্দ সত্যের মহিমা বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন—"সত্যের কি আশ্চর্য্য মহিমা! যে ব্যক্তির হৃদয়ে সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়, তিনি এই মর্ত্ত্যলোকে থাকিয়াও দেবতাদিগের ন্যায় গৌরবান্বিত হন। যে দেশে সত্যের রাজ্য সংস্থাপিত হয়, সে দেশ দেবলোকের ন্যায় স্বর্গীয় আনন্দ ও শান্তি-নিকেতন হয়। সত্য কাহারও নিজস্ব নহে, অথচ ইহাতে সকলেরই অধিকার। সত্য অর্থের দাস নহে, সম্রাটের অনুগত নহে। * * * ইহা দেশেও বদ্ধ নহে, কালেও বদ্ধ নহে, সকল দেশে সকল কালে ইহার আধিপত্য। সত্য মহৎ এবং উদার। ইহা আবার জীবন্ত বলীয়ান্। ইহার আধার নির্জ্জীব জ্ঞানও নহে, তরল ভাবও নহে, জীবনই ইহার আবাসভূমি; জীবনেতেই ইহার যথার্থ প্রকাশ। যখন সমুদয় জীবন স্বর্গীয় বলে সংসারকে পরাস্ত করিয়া, পাপ তাপ ও মৃত্যুকে পদানত করিয়া ঈশ্বরাভিমুখে উন্নত হয়, তখনই সত্যের প্রকৃত মহিমা প্রতীয়মান হয়। বাস্তবিক সত্যই আমাদের জীবন এবং যে পরিমাণে আমরা সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হই, সে পরিমাণে আমরা জীবনবিহীন ও জড়ভাবাপন্ন হই। সত্যের এরূপ জীবন্ত বল যে, ইহার কণামাত্র কিরণে অমানিশার অভেদ্য তমোজাল ছিন্ন ভিন্ন হয়। ইহার সংস্পর্শমাত্রে সহস্রাধিকবর্ষসঞ্চিত বৃহদায়তন পাপরাশি চূর্ণ হইয়া যায়, নিরাশ মুমূর্ষু ব্যক্তি নবজীবন ও নব উদ্যম প্রাপ্ত হয়, অতি দুর্ব্বল ভীরু ব্যক্তি মহাবীরের ন্যায় বীর্য্যবান্ হয়, এবং অতি সামান্য ক্ষুদ্র ব্যক্তিও সম্রাট্-পরাজিত প্রতাপে, সহস্র সহস্র লোকের মনকে বশীভূত করিয়া, তাহাদের দ্বারা স্বীয় মহান্ লক্ষ্য সংসাধন করিয়া লয়। সত্যের বলের নিকটে জ্ঞানবল, ধনবল, দেহবল সকলই পরাভূত হয়; কেবল পরাভূত এমন নহে, কিন্তু অনুগত দাসের ন্যায় ইহার কার্য্য করে। * * এই উদার ও জীবন্ত সত্যের উপরে আমাদের পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্থাপিত। ফলতঃ সত্যই ব্রাহ্মধর্ম্ম।"

নবযুগের নবধর্ম্মক্ষেত্রের তিনটী প্রধান ব্যক্তির জীবনের কথা আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ করিলাম। তাঁহাদের পর, প্রেরিত প্রচারক, সাধক, বিশ্বাসী, বিশ্বাসিনী যত লোকই এই পবিত্র ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে আসিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেরই জীবনের কথা বলিতে গেলে এই বলিতে হয়, কেহ একটী ধর্ম্মগ্রন্থপাঠের ভিতর দিয়া, কেহ একটী পত্রিকাপাঠের ভিতর দিয়া, কেহ কোন সৎ-প্রসঙ্গের ভিতর দিয়া, কেহ একটী সাধু আচার, আচরণ ও ভাবের দর্শনের ভিতর দিয়া, কেহ কোন উপাসনার ভিতর দিয়া, কেহ একটী ব্রহ্মসঙ্গীতশ্রবণের ভিতর দিয়া তন্নিহিত সত্যে আকৃষ্ট হইয়া, এই নবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এবং নব ধর্ম্মমণ্ডলী আলিঙ্গন করিয়া চির জীবনের জন্য আপনাকে ও আপন পরিবার পরিজনকে ইহার অন্তর্ভুক্ত করিয়া, আপনাদিগকে ধন্য মনে করিয়াছেন।

সে দিন যেন বর্ত্তমানে নাই; সে সত্যের সমাদর এখন যেন আমাদের মণ্ডলী ও পরিবারে তেমন নাই, বাহিরেও দেশের মধ্যে তেমন নাই। আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনেও এখন সত্যের সমাদরের অভাব দেখিয়া আমরা ম্রিয়মাণ হইতেছি। আমাদের মধ্যে এখন কি গ্রন্থের অভাব আছে? এখন কি পুস্তক, পুস্তিকা, ধর্ম্মপত্রিকার অভাব আছে? দৃষ্টান্তের, আদর্শের কি অভাব আছে? অভাব নাই, অথচ অভাবজনিত প্রতিক্রিয়ার ফল আমরা ভোগ করিতেছি। ধর্ম্মক্ষেত্রে আমাদের দেশ নানা কল্পনার সূত্র আশ্রয় করিয়া, সত্যের পথ হইতে আচার ও আচরণে কত দূরে সরিয়া পড়িতেছে, তাহা কি আমরা দেখিতেছি না? আমাদের নিজ মণ্ডলীতে, নিজেদের জীবনেও ব্রাহ্মসমাজের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের ন্যায় তেমন যেন সত্যের সমাদর নাই। তাই প্রচুর আয়োজন সত্ত্বেও আমাদের জীবন, আমাদের মণ্ডলী ও পরিবার ক্রমে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িতেছে। সকল সত্যের মূল প্রস্রবণ জীবন্ত ঈশ্বরের আমরা উপাসক। এ বিষয়ে তাঁহার একান্ত শরণাপন্ন হইয়া তাঁহারই সহায়তা ভিক্ষা করি, তিনি সত্যসাধনে আমাদিগকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করুন। "সত্যমেব জয়তে নানৃতম্"। সত্যেরই জয় হইবে, মিথ্যা বিজয়ী হইবে না। সত্যেতে আমরা নব জাগরণ লাভ করি, দেশ নব জাগরণ লাভ করুক; সত্যের রাজ্য, সত্যযুগ ধরাধামে নবভাবে সমাগত হউক।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

নববিধানের ঈশ্বর।

নববিধানাচার্য্য বলেন, "দেবতা দেবতা সকলে বলে। আমি সাক্ষাৎ দেবতা, জাগ্রৎ ঈশ্বর তাঁকে বলি, যে দেবতা কাজ করেন, বলেন ঠিক মানুষের মত, অথচ মানুষ নন।" "বাস্তবিক ইহাই

জীবন্ত ঈশ্বরের প্রকৃত রূপ। জীবন্ত মানুষ আর মরা মানুষে যেমন পার্থক্য, নববিধানের জীবন্ত ঈশ্বর ও মানুষের মনঃকল্পিত বা হস্তরচিত মৃত ঈশ্বরের তেমনি পার্থক্য। জীবন্ত মানুষ কাজ করে, কথা বলে, কিন্তু মৃত মানুষ তাহা কি পারে? তেমনি আর যত লোকে যত রকম ঈশ্বর কল্পনা করিয়া, কিম্বা আন্দাজে সিদ্ধান্ত করিয়া, বা নাম জপ করিয়া, বা শাস্ত্রের তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া, অথবা মৃত্তিকার মূর্ত্তিতে গঠন করিয়া পূজা অর্চনা বন্দনা করিতেছে, সকলই অপ্রত্যক্ষ মৃত দেবতা। কেননা, যে দেবতা জীবন্ত ব্যক্তির ন্যায় প্রত্যক্ষ বিশ্বাসচক্ষে স্বয়ং দর্শন না দেন, বা প্রার্থনার উত্তর বিবেকের বাণীতে না দেন, তিনি কখনই জীবন্ত ঈশ্বর নন। জীবন্ত ঈশ্বরের পূজায় জীবন চাঙ্গা হয়, জ্ঞানচক্ষু উজ্জ্বল হয়, আত্মদৃষ্টি খুলিয়া যায়, এবং সর্ব্বকার্য্যে তাঁহার কার্য্যশীলতা উপলব্ধ হয় ও পাপ প্রবৃত্তি ধ্বংস হয়। ভক্তগণ তাঁহাকে নানা নামে ডাকেন, বা নানা ভাবে দেখিয়া তাঁর বিভিন্ন নাম দেন; কিন্তু তিনি বলেন, "আমি যা, তাই আমি"। এই ঈশ্বর নববিধানের জীবন্ত ঈশ্বর।

প্রকৃত প্রার্থনার অবস্থা।

প্রার্থনার অবস্থা যথার্থ ভিখারীর অবস্থা। দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত, ক্ষুধায় কাতর ভিখারী যেমন অনন্যগতি হইয়া অন্ন জলের জন্য ভিক্ষা করে, তেমনি ভিক্ষার্থীর ভাবই প্রকৃত প্রার্থনার অবস্থা। নিরন্ন ব্যক্তির অন্ন না হইলে যেমন চলেনা বলিয়া সে ব্যাকুল অন্তরে অন্নের জন্য ভিক্ষা করে, তেমনি নিরুপায় হইয়া, তাহা না হইলে চলে না বলিয়া, ব্যাকুল অন্তরে চাওয়াই প্রার্থনা। এমন অবস্থা মনের না হইলে প্রকৃত প্রার্থনা হয় না। সে অবস্থা আমাদের হয় না বলিয়াই প্রার্থনা সফল হয় না; প্রার্থনার উত্তর লাভ হয় না। তাহার কারণ, উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি কখনও ভিক্ষা করিতে চায় না, কিম্বা যাহার বাড়ীতে কিছু অন্নসংস্থান আছে, সে ব্যক্তিও তেমন ভিক্ষা করিতে পারেনা। আমাদের মনে, পুরুষকার দ্বারা বা সাধন দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিতে পারি, এই অহং আছে বলিয়াই, প্রকৃত প্রার্থনার অবস্থা আমাদের আসে না। পুরুষকার দ্বারা বা সাধন দ্বারা ধর্ম্ম অর্জ্জন করিয়া সিদ্ধ হইতে পারি, ইহা সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিতে যে পারে, সেই প্রকৃত প্রার্থনা করিতে পারে এবং সেই ব্যক্তিই প্রার্থনা দ্বারা হাতে হাতে ফল লাভ করে। এই জন্যই ঈশ্বর কেশবচন্দ্রকে বলিলেন, "প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর, প্রার্থনা করিলে সব পাইবে। তোর বই ও নেই, কিছুই নেই, তুই কেবল প্রার্থনাই কর।" এবং কেশবও অনন্যগতি হইয়া কেবল প্রার্থনাই করিলেন, "সবেধন নীলমণি" যাকে বলে, প্রার্থনাকে তাই করিলেন এবং "প্রার্থনা মানি বলিয়াই জীবন যাহা তাহা" ইহাই স্বীকার করিলেন। ইহাই প্রার্থনার প্রকৃতি অবস্থা।

জগন্নাথের রথযাত্রা।

শ্রীকৃষ্ণ রাজা হইয়া রথযাত্রা করিয়া রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহারই নিদর্শন জগন্নাথের রথযাত্রা। রথের উপর আরূঢ় হইয়া জগন্নাথ রাজ্য-বিস্তারে যাত্রা করেন ও শত সহস্র ভক্ত স্বহস্তে দড়ি ধরিয়া রথ টানিয়া লইয়া যান। তাঁহাদের বিশ্বাস, রথে জগন্নাথকে দর্শন করিয়া তাঁহার রথ টানিলে বৈকুণ্ঠে তাঁহাদের সদ্গতি হইবে, জীবনান্তে আত্মা স্বর্গে চলিয়া যাইবে। আমরাও বিশ্বাস করি, এই মানবজীবনই গমনশীল রথস্বরূপ; এই জীবনের জীবন হইয়া প্রাণনাথ জগন্নাথ, যিনি নিত্য অধিরূঢ় হইয়া আছেন, তাঁহার অনুজ্ঞা মত যদি আমরা এই জীবনরথকে টানিতে পারি, নিশ্চয়ই আমাদের জীবনের অনন্ত গতি, অমরলোকে সদ্গতি হইবে এবং সমগ্র জীবনে তাঁর রাজ্য বিস্তার হইবে। ধর্ম্মবিধানরূপ রথেও জগন্নাথ আরূঢ় হইয়া তাঁহার রাজ্য বিস্তার জগতে করিতেছেন। সে বিধানরথ টানিলেও আমাদের সদ্গতি হইবে।

নববিধানে মহারাণী সুনীতি দেবীর নবজীবন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অসবর্ণ ও আন্তর্জাতিক মিলন কোন দিন হিন্দুসমাজ ও হিন্দুশাস্ত্র সমর্থন করিতে পারে নাই। তাই হিন্দু কুচবিহার অসবর্ণ মিলনকে সেই রেলবর্ত্ম বিহীন সুদূর ভূমি হইতে হিন্দু অনুষ্ঠানের বিসদৃশ রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া চারি দিকে বিস্তৃত করিলেন। এমন কি, ব্রাহ্মসমাজেও যাঁহারা বিধাতার আদেশ ও তাঁহার বিশেষ প্রকাশরূপ আলোক হইতে অনেক দূরে পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের হৃদয়েও সে বিষয়ে প্রকৃত আলোক উপস্থিত হইতে পারে নাই। অবশ্য, অনুষ্ঠানক্ষেত্রে তাঁহারা উপস্থিত থাকিলে, সেই সমরকেন্দ্র হইতে সমুত্থিত প্রার্থনা ও বিধাতার বিশেষ আদেশানুগত ব্রহ্মানন্দ, ব্রহ্মানন্দকন্যা এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক সংস্কার হইতে বিনির্মুক্ত যুবক রাজকুমারের বীরোচিত শান্ত ও সমাহিত ভাব ও স্বর্গীয় চিত্রে এ অনুষ্ঠানের অভিধান অনেকটা উপলব্ধি করিতে পারিতেন। এই আদেশ-সম্মত অনুষ্ঠানে সহযোগিতা-ও-সহানুভূতিকারক বিশ্বাসিবর্গের সেই আলোক-সম্ভূত মহাভাবের ভিতরেও সে অভিধান উন্মুক্ত হইয়াছিল। অধীতব্য বিষয় যাঁহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাই বিধাতার বিশেষ প্রকাশ অর্থাৎ এই Revelation এর বিশদ অর্থ সংগ্রাম ও কোলাহলের ভিতরেও বুঝিতে পারিয়াছিলেন। "Seven seals opened comes the truth out." সাতটা সীল উন্মুক্ত না করিলে সত্য বাহির হয় না।

গীতার ব্যাখ্যা সরল না হইলে কেহ গীতা বুঝিতে পারে না।

এক শ্লোক ও এক উপদেশের অনেক অর্থ হইয়া যায়। বিধাতা স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া তাঁহার দুর্ব্বোধ্য সত্যকে সরলভাবে ও সরল অভিধানে প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় অনুষ্ঠানে পাত্র ও পাত্রী বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যখন তাঁহারা বিধাতার বিধানে ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে প্রকৃত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন, তখন সেই বাগ্‌দান-বাসরে তাঁহার আলোকে ব্রহ্মানন্দের ভিতর হইতে কন্যাকে উপদেশচ্ছলে বিধাতার যে অভিধান প্রকটিত হইল, তাহাতেই তাঁহার অভিপ্রায়ের গীতা সরল হইতে সরলতর হইয়া পড়িল। ব্রহ্মানন্দ কহিলেন, "সুনীতি, তুমি মনে করিও না যে, তুমি রাণী হইলে। আমি দেখিতেছি তুমি দাসী হইলে"। কন্যা একটা বিধাতার অমুক্তাত রাজ্যে, নবসংস্কার-বিহীন নরনারীদিগের ভিতরে দাসী রূপে জীবন উৎসর্গ করেন ও তাঁহাদের ভিতরে বিধাতার নবালোকের মন্ত্রে দীক্ষিতারূপে ব্যবহৃত হয়েন, উভয়দিকের প্রত্যাদেশের ভিতর দিয়া ব্রহ্মানন্দের ভিতরে এই নবালোক আসিয়াছিল। এই আলোকে ব্রহ্মানন্দ কুচবিহারকে দর্শন করিলেন। ব্রহ্মানন্দ এই আলোকে প্রণোদিত হইয়া "রাজ্যাধিকার" প্রার্থনায় বলিয়াছেন, "তোমার আদেশে কন্যাকে অন্ধকারের ভিতর ফেলিয়া দিলাম।" অন্ধকারের পর আলোক আসে। এই মহাবিশ্বাসে সুদূর দেশে, অজ্ঞাত ও নবালোক-বিহীন জাতির মধ্যে কন্যাকে এই ভাবে ফেলিয়া দিলেন। বিধাতার বিধানে তাঁহার নূতন বিধানকে সরল ও বিশদ করিবার জন্য তাঁহার পূর্ব্বায়োজনরূপে (Pre-arrangements) তাঁহার কত গুপ্ত রহস্যের কার্য্য চলিতে থাকে। ফুল প্রথমে তরুর কঠিন কাণ্ডের ভিতরে অদৃশ্য ভাবে নিহিত থাকে। তাহার পর তরুর সেই কঠিন কাণ্ড ভেদ করিয়া কোরকে এবং তৎপরে বিকশিত সুরভিপূর্ণ কুসুমে পরিণত হয়। বিধাতা কুচবিহার-বিবাহে সেই সত্য বিকশিতভাবে প্রকাশ করিলেন; এবং দেখাইলেন, কত গুপ্ত পথ ভেদ করিয়া আলোকের গতি চলিয়া যায়। ব্রহ্মানন্দ কুচবিহার প্রদেশে প্রবেশের প্রত্যাদেশ যে কেবল যুবক রাজকুমারের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা নহে; ব্রহ্মানন্দের এই আলোক রাজগণসম্ভূত আর এক সুশিক্ষিত যুবকের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। আদেশবাদী, সুশিক্ষিত ও মার্জ্জিতজ্ঞান-সম্পন্ন যুবক কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ এই আলোক ও প্রত্যাদেশের স্পর্শ অনুভব করিলেন। ব্রাহ্মসমাজের নবীন পরিবারের সহিত আধ্যাত্মিক যোগে যুক্ত হইয়া, তিনিও তাঁহার স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণের পথে আপনাকে নিয়োজিত করেন। প্রত্যাদেশের সঙ্গে প্রত্যাদেশের মিলন এইরূপই হইয়া থাকে। ব্রহ্মানন্দ তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যাকেও বিধাতার আদেশে কুচবিহারে প্রেরণ করিলেন। কুচবিহারের দ্বারদেশে ব্রহ্মানন্দের দ্বিতীয়বার প্রবেশে এই ব্রহ্মগীতা আরও সহজ ও বোধগম্য হইয়া গেল। দুই দিকের দুই হস্ত আবার মিলিল। এক দিকে নবালোকসম্পন্ন দুই যুবক রাজকুমার, অপর দিকে দুই ভগিনীর নবীন ক্ষেত্রে মিলন; এই নবীন ক্ষেত্রে প্রত্যাদিষ্ট ব্রহ্মানন্দের প্রত্যাদেশ। এক হিমালয় হইতে পঞ্চস্রোত এক প্রশস্ত স্রোতে আসিয়া মিলিল। বিধাতার এক নূতন কাচফলকে আসিয়া সকল আলোক এক নবীন আলোকে মিলিয়া গেল।

এই স্থানে ইঁহাদের নূতন জন্ম। এই স্থানে নববিধানের নবীন মীরার নবীন জন্ম। বিধাতার আদেশ আসিয়া কুচবিহার প্রদেশে কোন্ সত্য প্রকাশ করিলেন, ইহা প্রত্যেক বিশ্বাসীর দ্রষ্টব্য ও অধীতব্য বিষয়। From the oldness of things to the newness of spirit. ঘোর পৌত্তলিক কুচবিহার হইতে অপৌত্তলিক নিরাকারবাদী রাজসন্তান ও রাজপরিবার বাহির হইলেন। এই মহাভাবের ভিতর হইতে ভক্তিমতী নবীন মীরা ভক্তির নবীন পথে ভগবান্ ও ভগবৎসন্তানদের সেবায় আত্মদান করিলেন। এই স্থানে মীরার সঙ্গে আবার দ্বিতীয় মীরা আসিয়া মিলিলেন। উৎসর্গীকৃত জীবনের ভিত্তির উপর, এই ভূমিতে নববিধানমন্দির বিধানমাহাত্ম্য ঘোষণার জন্য উন্নতশিরে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার মনোনীত ও প্রতিষ্ঠিত মন্দির ও রাজপরিবার হইতে বিধানপতির গৌরব ঘোষিত হইল। নববিধানের কুচবিহার নবীন দৃশ্য ধারণ করিলেন। নববিধানের নবীন Testament ও সেই পুরাতন ক্যানা বিবাহের (Marriage of Canna) নবীন দৃশ্য দেখাইলেন। ক্যানা বিবাহে পানীয় জল বিশ্বাসীর চক্ষে আধ্যাত্মিক সুরায় (wines of spirit) পরিবর্ত্তিত হইল। অবিশ্বাসীর চক্ষু দেখিতে পাইল না। "And I, Daniel alone, saw the vision; for the men that were with me saw not the vision." এই মহান্ সত্য কুচবিহার ব্যাপারে প্রমাণিত হইল। কাঁটার গাছে যাঁহারা গোলাপ দেখিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারাই দেখিতে পাইবেন যে, অনেক অবিশ্বাস, বিঘ্ন বাধা ও বিরোধীর বিরুদ্ধাচরণ অতিক্রম করিয়া, এই কুচবিহার দৃশ্য গোলাপের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিধাতার সত্য চিরদিনই বিঘ্ন-বাধা-সাপেক্ষ। এ বাধা চিরদিনই চলিবে। এই বিধাতার প্রেরিত নবীন সমাচারের সাক্ষ্য কে প্রদান করিবে? এই মহা কোলাহল ও সংগ্রামপূর্ণ ব্যাপার, সেই অটল পাহাড়ের মত দণ্ডায়মান ব্রহ্মানন্দ, সেই ব্রহ্মানন্দকন্যা, আর চিরপ্রথানুগত ভ্রমসংস্কারপূর্ণ প্রদেশ ও পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন যুবক রাজকুমারের বীরোচিত উত্থান ও নবধর্ম্মগ্রহণ ইহার সমীচীন সাক্ষিরূপে চিরদিন বিশ্বাসী জগতের সমক্ষে থাকিয়া যাইবে। ব্রহ্মানন্দের নীরবতা এবং তাঁহার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে উত্থিত প্রাণপূর্ণ বাণী "Posterity would judge" এই ইতিহাসের লেখনীরূপে চিরদিন বর্ত্তমান থাকিবে। "লূক" "মথিই" সমাচার লিখিতে পারেন। কে বলিবে, কখন ইঁহাদের আগমন হইবে? নববিধানের প্রেরিতবর্গ ও নববিধানের বিশ্বাসিবর্গ, যাঁহারা এই ব্যাপারে সহযোগী হইয়া সেই কুরুক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে

ভক্তের প্রধান সহযোগী ভক্তবীর প্রতাপচন্দ্র, গৌরগোবিন্দ ও ত্রৈলোক্যনাথ, ব্রহ্মানন্দের তিরোধানের পর "Life and Teachings of Keshub Chunder Sen", "আচার্য্য কেশবচন্দ্র" এবং "কেশবচরিত" মহাসাক্ষ্যপূর্ণ গ্রন্থ লিখিয়া ভবিষ্যতের হস্তে নিবেদন করিলেন। পাশ্চাত্য তপস্বিনী খৃষ্টবাদিনী কুমারী "পিগট্‌ও"ও, তাঁহার নবতিবর্ষে নিভৃত হিমালয়-কক্ষে বসিয়া, তাঁহার ক্ষীণচক্ষু ও ক্ষীণ শক্তি লইয়া, হস্তে লেখনী ধারণ করিলেন; এবং তিনি সেই প্রত্ন দেশাচার ও সংস্কারপূর্ণ কুচবিহার ভূমিতে উপস্থিত হইয়া, সেই সংগ্রামপূর্ণ ব্যাপারে বিধাতার বিশেষ বিধান (Spiritual Dispensation) ও বিশেষ প্রকাশের (Special Revelation) যে সকল কার্য্য দেখিয়া আসিয়াছিলেন, তাহারই সাক্ষ্যস্বরূপ "Keshub Chunder Sen" পুস্তিকা পৃথিবীর হস্তে দান করিলেন। নববিধান "মথি" ও "লূকের" অপেক্ষা করিতেছেন।

সুসমাচার-লেখকেরাই পৃথিবীর বিঘ্নবাধা অতিক্রম করিয়া সুসমাচার লিখিতে পারেন, অন্যেরা কেবল উপরের আবরণ অধ্যয়ন করেন। "The evangelists only can write the evangels as others study only the surface". So truly the writers of such things come long after. এ সত্য পৃথিবীতে চিরদিন থাকিয়া যাইবে। কুচবিহার ব্যাপারের সুসমাচার-লেখক পরে আরো আসিতেছেন।

নামকুম, রাঁচি। শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

সন্তানবৎসলা সাধ্বী নিথরমোহিনী দেবী।

সে অনেক দিনের কথা, দুইটী বন্ধু, কাকা ভাইপো গৃহের বাহির হইয়া আসিলেন। সংকল্প, স্বাবলম্বনে জীবনের উৎকর্ষ সম্পাদন করিবেন। একজন আজ অশীতিবর্ষ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বাবলম্বনে ও ভগবানের আশীর্ব্বাদে সৌভাগ্যের কত উচ্চ শিখরেই উঠিয়াছেন। ধন্য, স্বনামধন্য স্যার রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি আরো দীর্ঘজীবী হউন, আরো সৌভাগ্যশালী হইয়া, বঙ্গের ও ভারতের প্রকৃত নক্ষত্র হইয়া, জাতির ও দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন।

অপর বন্ধু রায় বাহাদুর ডাঃ মতিলাল মুখোপাধ্যায়। পরসেবা সাধন দ্বারা জীবনের উৎকর্ষ সম্পাদন করিবেন, এই আকাঙ্ক্ষায় চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নে নিরত হইলেন, এবং তাহাতে কৃতিত্ব লাভ করিয়া, গভর্ণমেণ্টের কার্য্য লইয়া, নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া, বহু লোকের সেবা-সাধনে ধন্য হইলেন।

ক্রমে ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্রের ও নববিধানের প্রেরিতগণের প্রভাবাধীনে আসিয়া, নববিধানে পূর্ণ বিশ্বাস স্বীকারপূর্ব্বক, ব্রহ্মনিষ্ঠ সুখী পরিবার গঠনে নিরত হইলেন। এই মহাব্রত-সাধনের পূর্ণ সহায় ও সহযোগিনী পাইলেন সহধর্ম্মিণী দেবী নিথরমোহিনীকে। গোঁড়া হিন্দু পিতার ও হিন্দু আত্মীয় আত্মীয়াগণের ঘোর প্রতিবন্ধকতা ও নির্য্যাতন তুচ্ছ করিয়া, সতী সাধ্বী দেবী স্বামীর পূর্ণ অনুগামিনী হইলেন এবং কি দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত অক্ষুন্নভাবে নববিধান সাধন করিতে ও পরিবারে তাহা প্রতিষ্ঠিত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন।

"নিত্য উপাসনা, ইন্দ্রিয়দমন, পর-উপকার, বৈরাগ্যসাধন" সতাই সংসারধর্ম্মপালনে তাঁহাদের সার মন্ত্র করিয়াছিলেন। স্বামী স্ত্রী মিলিত হইয়া এবং সন্তান সন্ততিদিগকেও এ সঙ্গে লইয়া, উপাসনা সাধন করা তাঁহাদের যেমন নিত্য ব্রত করিয়াছিলেন, এমন অতি অল্প পরিবারেই দেখিতে পাওয়া যায়।

তাঁদের জ্যেষ্ঠ সন্তান আমোদ করিয়া অনেক সময় বলেন, "আমাদের বাবা মা যে উপাসনা করিয়াছেন, আমাদের তিন পুরুষ আর উপাসনা না করিলেও চলিবে।" ইহা আমোদের কথা বটে, কিন্তু বাস্তবিকই পরিবারবর্গের জীবনে উপাসনা-ধন যেন চির সম্বল করিয়া দেওয়াই তাঁহাদের সংকল্প এবং নিষ্ঠা ছিল।

দেব স্বামীর তিরোধানের পরও সতীর উপাসনা-সাধনই জীবনের অন্নপান হইয়াছিল। কি ব্যাকুল প্রাণেই প্রার্থনা করিতেন। এমন কি, শেষ নিশ্বাস বাহির হইবার পূর্ব্বেও উপাসনা করিতে, ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া প্রণাম করিতে বিস্মৃত হন নাই।

যেমন স্বামীর ধর্ম্মপালনে তিনি নিরতা ছিলেন, তেমনি পরসেবা-পরায়ণা ও সন্তানবৎসলাও তিনি ছিলেন। চিকিৎসক স্বামী যেমন চিকিৎসা দ্বারা সকল শ্রেণীর রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরই সেবায় নিরত ছিলেন, অর্থোপার্জ্জন অপেক্ষা চিকিৎসা করিয়া রোগ আরোগ্য করাই তাঁহার যেন একমাত্র লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ছিল, বিনা মূল্যে গরীব দুঃখী ও ব্রাহ্মসমাজের সকল লোকের চিকিৎসা করাই যেন তাঁহার ব্রত ছিল; তেমনি সকলকার নানা প্রকারে, বিশেষতঃ গরীব দুঃখীদিগকে অর্থ ও পথ্যাদি দিয়া সেবা করা নিথরমোহিনী দেবীর জীবনের কার্য্য ছিল।

সকল মাই সন্তানবৎসলা হন, কিন্তু নিথরমোহিনী যেন সন্তান-স্নেহে কিছু অধিক বিভোর। অথচ সন্তান সন্ততিগণের মধ্যে ধর্ম্মনিষ্ঠা ও উপাসনাশীলতা যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহাই তাঁহার বিশেষ আকাঙ্ক্ষা ছিল।

সন্তানবাৎসল্যের জন্য আত্মদানের দৃষ্টান্ত দেখাইতে যেন তিনি আসিয়াছিলেন। তাই তাঁহার মধ্যমপুত্র, চিকিৎসাব্যবসায়ে দেশীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রায় সর্ব্বোচ্চপদাভিষিক্ত, বঙ্গের গৌরবস্থানীয়, কৃতি সন্তান মেজর সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যু হইলেও সেই মহাশোক নির্ব্বাণ করিতে, পরলোকে গিয়া স্বামী-পুত্রের সহিত পুনর্মিলন জন্যই যেন ইচ্ছা-মৃত্যু অবলম্বন করিয়া, অমরধামে যাত্রা করিলেন।

স্বর্গের অনন্ত সন্তানবৎসলা মা যেমন প্রিয় সন্তানের মৃত্যু সহ্য করিতে পারেন না এবং সন্তানের জন্য আত্মদান করেন, মা নিথরমোহিনী দেবীও যেন সেই আদর্শে আত্মদান করিয়া চলিয়া গেলেন। ভক্তবৎসলা মা তাঁর সন্তানবৎসলা সতী কন্যাকে তাঁহার প্রেমমুখ উজ্জ্বলরূপে দর্শন দিয়া, পতিপুত্রসহ অমরদলে নিত্য শান্তি-ক্রোড়ে রক্ষা করুন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত সন্তান সন্ততিদিগকেও সেই মা হইয়া শান্তি ও সান্ত্বনা দান করুন।

—•—

পুণ্যাশ্রমের বার্ষিক রিপোর্ট।

দয়াময় ঈশ্বরের অপার করুণায়, তাঁর অনন্ত আশীর্ব্বাদ মাথায় লইয়া, আমাদের এই পুণ্যাশ্রমের চারি বৎসর পূর্ণ হইল। নানা-প্রকার বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, অনেক বিপদ্ পরীক্ষা ও ঝড় তুফানের মধ্য দিয়া, ইহাকে আসিতে হইয়াছে। মঙ্গলময় ভগবানের অসীম করুণাই আমাদের জীবনপথের একমাত্র আলোক ও প্রাণের চির সম্বল। সেই অনন্ত করুণার বলেই ইহা চারি বৎসর সঞ্জীবিত রহিয়াছে। তবে এতদিনে ইহার আশানুরূপ কতদূর উন্নতি হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। যে মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া ইহার জন্মগ্রহণ, যে উচ্চ সেবাব্রত ইহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, তাহা কতদূর সফল হইয়াছে, বলিতে পারি না। মনে হয়, ইহার এই কয় বৎসরে যতদূর আশা ছিল, তাহার কিছুই পূর্ণ হয় নাই। যে মহাদায়িত্বভার মাথায় তুলিয়া লওয়া হইয়াছে, সে কঠিন কর্ত্তব্যপালনে কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারা গেছে, তাহা বলা যায় না। ইহার প্রকৃত উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য যতদূর যাহা করা উচিত ছিল, তাহার কিছুই, বোধ হয়, করিতে পারা যায় নাই। এই সব নানাবিধ দোষ ত্রুটী অপরাধের জন্য, যথার্থ ই অনুতপ্ত-হৃদয়ে ও অকপটভাবে, ভগবানের চরণে আজ ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। সেই করুণানিধান প্রেমময় বিশ্বদেবতা আমাদের সকল দোষ ত্রুটী অপরাধ নিজ গুণে দয়া করিয়া মার্জ্জনা করুন। নূতন বৎসরে নূতন করে, এই সেবাব্রতপালনে, কঠিন কর্ত্তব্য-সাধনে বল শক্তি বিধান করুন এবং ইহার যথার্থ উন্নতি ও মঙ্গল-সাধনকার্য্যে আলোক ও আশীর্ব্বাদ দান করিয়া কৃতার্থ করুন, হৃদয়ের সহিত কায়মনোবাক্যে তাঁহার চরণতলে এই প্রার্থনা করি।

যে অনন্ত করুণাময়ী বিশ্বজননীর অসীম কৃপায়, এই পুণ্যাশ্রম এতদিন সঞ্জীবিত থাকিয়া, তাঁহারই করুণার গুণকীর্ত্তন করিতেছে, তাঁহার অসীম কৃপার মহিমা ঘোষণা করিতেছে, সেই জগজ্জননীর মঙ্গলময় অভয় চরণে প্রাণভরা ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জানাইয়া, অবনতমস্তকে লুণ্ঠিতহৃদয়ে বারবার প্রণাম করিতেছি। আর যাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক হৃদয়ের সহানুভূতি, সাহায্য ও আশী-র্ব্বাদদানে এই পুণ্যাশ্রমকে এতদিন বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন, সেই সহৃদয় শুভাকাঙ্ক্ষীদের চরণে বিনীত হৃদয়ের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ শত শত ধন্যবাদ জানাইয়া প্রণাম করি।

ইহার আয় ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। ইহাতে এখন মোট ১৫।১৬ জন থাকে, স্থানাভাবে ও অর্থাভাবে অনেককে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইতেছে।

এককালীন দান।

ডাক্তার পাল ২০৲, শ্রীমতী ভক্তিমতি ২৲, শ্রীমতী তরুবালা সেন ২৲, শ্রীমতী নীরুবালা দাস গুপ্ত ১৲, শ্রীমতী হেমকুসুম মল্লিক ১৲, শ্রীমতী এ, সি, সেন ১৲, শ্রীমতী এম, চালমিয়া ১৲, শ্রীমতী হিরণ্ময়ী গুপ্ত ১৲, শ্রীমতী বীণা সেন ॥০, শ্রীমতী কুমুদিনী বসু ২৲, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী (সংগৃহীত) ১ম বারে ১৩৲, ২য় বারে ১২৲, ৩য় বারে ১৮৲, শ্রীযুক্ত অনিল মৈত্রের মাতা ১৲, ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ সরকার (পুরী হইতে সংগৃহীত)—১০৲, মিসেস মল্লিক ২৲, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মজুমদার ২৲, শ্রীমতী জানকী দেবী ২৲, শ্রীমতী নীলী ২৲, মিসেস মৃণালিনী চাটার্জ্জি ৫৲, শ্রীমতী প্রতিমা ব্যানার্জ্জি ৫৲, শ্রীমতী রমা দেবী (সংগৃহীত) ১১৲, ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেনের মাতা ৫৲, স্বর্গীয় মতিলাল মুখার্জ্জির স্ত্রী ৫৲ টাকা। মোট ১৩০॥০।

মাসিক চাঁদা।

মহারাণী সুচারু দেবী মাসিক ১০৲ হিঃ ৫০৲, শ্রীমতী মণিকা মহলানবিশ ॥০—৬৲, শ্রীমতী সুধা ব্যানার্জ্জি ॥০—১॥০, শ্রীমতী প্রফুল্ল হালদার ৫৲—৮৫৲, শ্রীমতী অমলা সেন ১৲—৪৲, শ্রীমতী সুধা সেন ১৲—৮৲, শ্রীমতী কমলা সেন ১০৲—১৪২৲, শ্রীমতী সুশীলা মুখার্জ্জি ১০৲—১২০৲, শ্রীমতী পুণ্যপ্রভা বসু ১০৲—১২০৲, শ্রীমতী সুধা দাস ৫৲—৬০৲, শ্রীমতী সরলা দাস ৫৲—৬০৲, শ্রীমতী কিরণময়ী সেন॥০—৬৲, শ্রীমতী হেমন্তবালা চাটার্জ্জি ॥০—৬৲, শ্রীমতী বাণী চাটার্জ্জি ॥০—৬৲, শ্রীমতী মল্লিকা রায় ॥০—৬৲, ভগিনিসমিতি ২৲—২৪৲, মিসেস মুখার্জ্জি ১৲—১২৲, শ্রীমতী স্নেহলতা দাস।০—৩৲, শ্রীমতী শোভা বসু ২৲—২৪৲, শ্রীমতী দেবী ব্যানার্জ্জি ১৲—১২৲, শ্রীমতী সুজাতা সেন ১৲—২৲, শ্রীমতী উষারাণী দত্ত ২৲—৬৲, শ্রীমতী প্রভাষিণী সেন ১৲—৫৲, শ্রীমতী অনিলা রায় ২৲—৬৲, শ্রীমতী সোণামুখী চক্রবর্ত্তী ৫৲—১০৲, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সিংহ ১—৯৲, শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্র বসু ১৲—৩৲, শ্রীযুক্ত সত্য-হরি দত্ত ২৲—৬৲ টাকা। মোট ৮০২৲ টাকা।

মাসিক চাঁদা—		৮০২৲
মেয়েদের চাঁদা—		২১০৲
এককালীন দান—		১৩০॥০
মোট	জমা	১১৪২॥০
মোট	খরচ	৯৪৩॥০
		১৯৯৲

পূর্ব্বের ধার—২৩৭৲

শোধ—১৯৯৲

ধার বাকী— ৩৮৲

পুণ্যাশ্রমের মোট মাসিক খরচ—

বাড়ীভাড়া ৪০৲, লাইট ৩৲, ধোপা ৪৲, মেথর ১৲, খাওয়া খরচ মোট ৪৬৲ *। মোট ৯৪৲ টাকা।

* এখন মেয়ে বেশী হওয়াতে খাওয়া খরচ বেশী হইতেছে।

শ্রীসরলা দাস

সম্পাদিকা।

কয়েকখানি চিঠি

[মহারাণী সুনীতি দেবীর পত্রাবলী]

অক্টোবর ১০ই

অতি স্নেহের—

তোমার চিঠিখানি ১৮ই সেপ্টেম্বরের। দুঃখিনী দিদিকে মনে করিয়া যে সেদিন লিখিয়াছ, ইহার জন্য বিশেষ আশীর্ব্বাদ লও। এই শোকজর্জ্জরিত বক্ষে তোমাদের স্নেহ সান্ত্বনাবারি হইয়া শান্ত করে। কোথায় ছিলাম, কত উচ্চে, কত আনন্দে, ১৮ই আসিয়া সব ভাঙ্গিয়া দিল! পূর্ব্বের চিত্রগুলি ভগ্ন! এত পরিবর্ত্তন এত অল্প সময়ের ভিতর আর কাহারও জীবনে কি হইয়াছে? কিন্তু এত আঘাতে মনটা কেন এত নীরস ও শুষ্ক হইল! ভাল করিয়া যে গান গাইতে পারিনা, উপাসনা করিতে পারিনা; কেন, এত বিকৃত মন প্রাণ হইল? আমি যে শেষের দিনে হাসিতে হাসিতে যেতে চাই। অনেক চক্ষের জল ফেলিয়াছি, এখন তোমরা আশীর্ব্বাদ কর, হাসিয়া যেন চক্ষু মুদি। কত অপরাধী, কত পাপই করিয়াছি; আজ শোকাশ্রুর সঙ্গে অনুতাপের হাহাকার যে প্রাণে। * * * কেমন আছ? আগামী বৎসরে আমেরিকায় যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ আসিয়াছে, চল একবার সকলে যাই। Bristolএর সংবাদপত্রের ছবি পাঠাইতেছি। কি সুন্দর উৎসবটি হইল। অনেক লোক হইয়াছিল। বর্দ্ধমানের রাজা বেশ বলিলেন। * * * যাই ভাই।

স্নেহের দিদি

October 7th

ভাই—

তোমাদের চিঠিগুলি স্বর্গের বাতাস হইয়া তাপিত এ দেহ মনে স্নিগ্ধতা দিয়া যায়। কত সময় যে কীর্ত্তনের শব্দ কাণে ঝঙ্কার করে, কতবার মিষ্ট মিষ্ট গানের সুর প্রাণটাকে আরাম দেয়, বলিতে পারিনা। কোথা হইতে এ শব্দ পাই, বলিতে পার? আমার দেহটা বড় শ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। * * * দেশের অশান্তির কথা ভাবিলে প্রাণটা কেমন করে। এখানে সকলেই যাইতে নিষেধ করিতেছে। বলে, সেখানে কিছুই করিতে পারিব না। আমার প্রাণটা যাইবার জন্য অস্থির হয়। স্নেহের নালুর অভাবে কি যে হইতেছে, জানিনা। কাহারও যেন প্রাণে শক্তি নাই। প্রাণের স্নেহ ও ভালবাসা লও।

স্নেহের দিদি

(প্রবাসের চিঠির সারাংশ)

আগামী মাঘোৎসবে তোমরা ভাই অনেকগুলি ভার লইও। স্নেহের নালুর বড় ইচ্ছা ছিল, মেয়েরা বিশেষরূপে নববিধানের সেবা করেন। তুমি অনেক করিতে পারিবে।

শোকের আগুন ভিতর বাহির শুষ্ক করিয়াছে। এখন এই প্রার্থনা, যেখানে মৃত হই না কেন, যেন প্রস্তুত হইয়া মরিতে পারি। এই প্রার্থনা।

উৎসবের প্রসাদ পাঠাইতে ভুলিও না। "আমাদের নালুর" অভাবে উৎসব কি করিয়া হইবে, জানিনা। চারিদিকে যেন শূন্যতা। বড় তাড়াতাড়ি সব ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। বাঁচিয়া ফিরিয়া যদি যাই, ভিক্টোরিয়া কলেজের সেবা করিতে ইচ্ছা রহিল। তুমি আর্য্যনারীসমাজটীর শ্রীবৃদ্ধি কর। সু—সাধ্যাতীত পরিশ্রম ও সেবা করিতেছেন, তোমাদের এ সেবায় উৎসব জয়যুক্ত হইবেন।

উৎসবের Programmeখানি নি—পাঠাইয়াছেন, বড় উপকার হইল। প্রাণে প্রাণে সকলে এক সঙ্গে আছি, কিন্তু কোন দিন কি হইবে জানিয়া আরও কাছে কাছে থাকিব, এই প্রার্থনা করিতেছি। নহবতের বাদ্য, আর্য্যনারীসমাজের স্বর্গীয় দৃশ্য, মন্দিরের গাম্ভীর্য্য এবং পূর্ণতা খুব ভাল করিয়া যেন সম্ভোগ করিতে পারি, এই প্রার্থনা। রাত্রে যখন অনিদ্রায় সময় কাটাই, তখন কল্পনা যে কত দৌড়াদৌড়ি করে; ভাবি মুসলমানপাড়ায় ভিক্টোরিয়া কলেজের মেয়েরা বাগানের ভিতর বসিবে, খেলা করিবে। মঙ্গলপাড়া প্রতাপবাবুর বাড়ী আশ্রম হইবে, মন্দিরের পাশের জমীতে Hall & Library হইবে, মন্দিরের পশ্চাতের জমীতে রান্নাদির ব্যবস্থা থাকিবে। কিছুই কি পূর্ণ হইবে না? কল্পনায় সব থাকিবে?

তোমার মিষ্ট চিঠিখানি পড়িতে কি ভাল লাগিল। মাতৃদেবীর জীবনটীতে যে যশোধরা দেবীর মূর্ত্তি প্রকাশিত দেখিতেছ, জানিয়া আরও বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। যশোধরার জীবনটী প্রস্ফুটিত পদ্ম, চোখে মুখে বুকে রাখিতে ইচ্ছা হয়। সু—যে বইয়ের সুখ্যাতি করিয়াছেন, ইহা আমার পুরস্কার। কয়দিন অসুখে পড়িয়া নানা অবস্থার ভাবসাগরের তরঙ্গে ডুবিয়া ভাসিয়া যাইতেছি। এক এক রাত্রে মনে হয়, বুঝি পৃথিবীর সূর্য্যোদয় আর দেখিব না। বুকটা শূন্য, শক্তি বুদ্ধি চলিয়া গিয়াছে। আর কি কাজ আছে যে এ জীবনে, জানিনা।

তোমরা ভাই উৎসবের আয়োজন করিতে চেষ্টা করিও।

এবার সব ভাঙ্গা লইয়া কাজ করিতে হইবে। বার্দ্ধক্যে যৌবন দেখাইতে হইবে। সব নূতন, নববিধানের জুবিলীর সব নূতন।

গত কল্য হিতিবাবার সহাস্য মুখখানি দেখিবার জন্য প্রাণটা কেমন করিতেছিল। তুমি তাহাকে কত স্নেহ করিতে, আর কতকাল সেই প্রাণের পুতুলগুলি ছাড়িয়া থাকিব।

তোমার সুন্দর চিঠিখানি পাইলাম, বাঁচিয়া থাক, সুখী হও, তোমার এ সুমিষ্ট স্নেহটী যেন অনন্তকাল সম্ভোগ করিতে পারি। ভগবান্ ভক্ত পুত্র কন্যা সহ তোমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন।

তোমার মিষ্ট চিঠিখানি পড়িতে বড় ভাল লাগিল। এত তোমাদের স্নেহ ভালবাসার যেন উপযুক্ত হই। পৃথিবীতে আমার মত সৌভাগ্যবতী কেহ ছিল না। অতীতের জন্মদিন গুল যেন সুখের কূল-কিনারা-হারা সাগরে জীবনতরী ভাসাইয়াছে, আজ তরী ভাঙ্গা, সাগরের জল শুকাইয়া গিয়াছে, ভাঙ্গা তরী আর ভাসে না। স্নেহমাখা ভালবাসা লও।

মরিবার আগে জয় জয় ধ্বনি কি শুনিব না? ধর্ম্মে ও কর্ম্মে জয় চাই। জুবিলীর জন্য তোমরা আশা ও উৎসাহের অগ্নি জ্বালাইয়া দাও। বড় ইচ্ছা করে, তোমাদের কাছে ছুটিয়া যাই, তোমাদের কাছে ভাল কথা শুনি, সেই অতীতের সুখের গল্প করি। ভাল থাক সকলে, তোমাদের মুখের হাসিই আমার স্নেহের পুরস্কার।

১৯৩০ খৃ:

জানালার অদূরে শ্বেতপুণ্যস্মৃতিমন্দিরটি। শান্ত স্থিরভাবে কত দেখিতেছেন, আমার প্রাণের প্রিয়। ১৮বৎসর হইল, তাঁহাকে এখানে বিদায় দিয়াছি। ভেবেছিলাম, আর বুঝি এস্থানে থাকিতে পারিব না; এবার দেখিতেছি, তিনি ত দূরে নাই, বড় যে কাছে। আরও জানাইতেছেন, আমিই দূরে গিয়াছি, কিন্তু তিনি যে স্থানের, ঠিক সেই খানেই অনন্তের কোণে আছেন। মহারাজা সেই সুন্দর, সবল দেহটি আজ শ্বেতমূর্ত্তি ধরিয়া যেন পথপ্রদর্শক ভাবে গম্ভীর ভাবে, শান্তিধামের পথ দেখাইয়া দিতেছেন। আমার এ অস্থির জীবন যেন এবার শান্ত হয়, মহারাজার সেই সবল হস্ত এ দুর্ব্বল স্ত্রীর হাত ধরিয়া স্বধামে লইয়া যেন যায়, তোমরা এই আশীর্ব্বাদ কর।

দিন দিন কতদিন, কত বৎসর চলিয়া গেল! বৎসর গুণিতে কি বসিয়া রহিলাম? মহারাজার স্বর্গারোহণের পর তোমরা যখন কুচবিহারে আসিয়াছিলে, সু—সন্ধ্যার সময় আমার প্রিয় উপাসনার ঘরটীতে যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কথাগুলি মনে হইতেছে।

শ্রীবুদ্ধদেবের মধ্য পথ।

মহাত্মা গান্ধী একবিংশতি দিবস উপবাস করিলেন। ইহা পৃথিবীর ইতিহাসে একটী বিস্ময়কর বিশেষ ঘটনা বলিয়া উল্লিখিত হইবে। শারীরিক বিজ্ঞানের অধিকার অতিক্রম করিয়া, তিনি যে আত্মার শক্তিকে জয়যুক্ত করিলেন, ইহা ধর্ম্মের ইতিহাসেও একটী অদ্ভুত ঘটনা বলিয়া স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবে। আত্মার শক্তি যে শরীরের বিধিকে জয় করিতে পারে, ইহা তিনি নিজ জীবনে সপ্রমাণ করিলেন। তাঁহার এই অসাধারণ শক্তির নিকট বড় বড় বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিতের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের অভিমান চূর্ণ হইল। বড় বড় রাজপুরুষদিগের মদমত্ত পার্থিব শক্তির গৌরব ও মহিমা হীন বলিয়া বিবেচিত হইল। দেশ স্তম্ভিত হইল, পৃথিবী স্তম্ভিত হইল! দেশের নেতৃগণকে—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ সকলকে এই মহাশক্তি একাসনে মিলিত করিল। এই শক্তির বিরুদ্ধে কেহ কি দণ্ডায়মান হইতে পারে? কেহ কি তর্জ্জনী সঞ্চালন করিতে পারে?

পৃথিবীতে শক্তির পূজা চিরকালই প্রতিষ্ঠিত আছে, আর ভবিষ্যতেও থাকিবে। যাঁহারা শক্তির উপাসক, তাঁহাদের কি একথা মনে করা উচিত নয় যে, মানুষ শরীর, মন ও আত্মা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে? শরীরের কতকগুলি বিধি আছে, এবং মন ও আত্মারও কতকগুলি বিধি আছে। এই ত্রিবিধ বিধির সমবায়ে মানবের জীবন প্রতিষ্ঠিত। শরীরের বিধিকে যদি মানুষ উল্লঙ্ঘন করে, তবে তাহাকে দণ্ডভোগ করিতে হয়, শরীর পীড়াগ্রস্ত ও দুর্ব্বল হয় এবং ক্রমে ক্রমে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে; এবং মন ও আত্মার বিধিকে যদি কেহ অতিক্রম করিবার চেষ্টা করে, তবে মানব-স্বভাব-সুলভ স্বাভাবিক সত্যের পথ তাহার নিকট রুদ্ধ হইয়া যায় এবং দুর্গতি ও পাপে সে লিপ্ত হয়। বিধাতা শরীর, মন ও আত্মার এমন একটা ভেদরেখা (Line of demarcation) টানিয়া রাখেন নাই যে, আমরা শরীরকে কতটা অবহেলা করিয়া, মন ও আত্মার উন্নতিসাধন করিতে পারি, অথবা কতটা মন ও আত্মার প্রতি উদাসীন হইয়া, শরীরের পুষ্টি সাধন করিতে পারি। তবে আমাদের সহজজ্ঞানে ইহার বিচার ও মীমাংসা করা বহু পরিমাণে সম্ভব হয় যে, আমাদের ত্রিবিধ শরীর, মন ও আত্মার সত্তা রক্ষা করিতে হইলে, শরীর, মন ও আত্মার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হয়। শরীরের সহিত মন ও আত্মার এই সম্বন্ধ যে, একের ক্ষয়ে অন্যের বৃদ্ধি এবং অন্যের বৃদ্ধিতে অপরের ক্ষয় বহু পরিমাণে নির্ভর করে। তুমি পাঠ কর, চিন্তা কর, উপাসনা কর, বিহার কর, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ কর, সকল অবস্থায় তোমার শরীরের ক্ষয় অনিবার্য্য। এই অনিবার্য্য ক্ষয়কে পূরণ করিবার জন্য বিধাতা আহার পানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই শরীরের ভার বিধাতা যখন আমাদের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন, তখন আমাদের চিন্তা করা উচিত যে, কি পরিমাণে, কোন্ সাধু সংকল্প সাধনের জন্য, শরীরের বিধিগুলিকে অতিক্রম করিতে পারি?

শরীরের পক্ষে আহার যেমন বিধাতার বিধি, অনশনও সেই রূপ বিধাতার ব্যবস্থার ভিতর স্থান লাভ করিয়াছে।

রোগে অনশন করিতে হয়, মনের একাগ্রতা সাধনের জন্য অনশনের ব্যবস্থা আছে, অথবা কোন ধর্ম্মব্রত পালন করিবার জন্য অনশন, অর্দ্ধাশন বা স্বল্পাশনের বিধি প্রায় প্রত্যেক ধর্ম্মমণ্ডলীর পক্ষে নির্দ্দেশ বা ব্যবস্থা আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। অনশন স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত। দেশের পাপের জন্য বা জাতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপে মহাত্মা গান্ধী নিজ জীবনে যাহা দেখাইলেন, তাহা ভারতবর্ষব্যতীত অন্যত্র কোথায়ও দৃষ্টিগোচর হয় না। বৌদ্ধ সাধনায় এরূপ অনেক কঠোর ব্রতধারণের কথা শুনা যায়। ক্ষুৎপিপাসার উপর জয় লাভ করিয়া শ্রীবুদ্ধদেব ও তাঁহার অনুবর্ত্তী অনেক সাধক মন ও আত্মার অসীম বল লাভ করিয়াছেন, ইহা ইতিহাসের কথা। এখনও ভারতের কোন কোন স্থানে সাধকেরা মাসাবধিকাল উপবাস করিয়া ব্রত উদ্‌যাপন করেন। সভ্য জগতে তাঁহাদের কথা ধর্ত্তব্য নয়। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী সুপণ্ডিত, সুবিবেচক ও সুসংস্কৃত পুরুষ হইয়া, এত দীর্ঘকাল উপবাস করিয়া, শরীরকে ক্লিষ্ট ও অকর্ম্মণ্য করিলেন কেন, ইহা অনেকের মনে প্রশ্ন উঠিতেছে। ইহা কি বিধাতার অনুমোদিত? বিধাতার আদেশ ও নির্দ্ধারণ বলিয়া যদি কেহ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তাহা বিচার করিবার অধিকার কাহারও নাই। ভবিষ্যৎ বংশ এ প্রশ্নের উত্তর দান করিবে।

মহাত্মা গান্ধীর দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া সহস্র সহস্র কণ্ঠ হইতে প্রার্থনার ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে। যাঁহার জীবনের সঙ্গে দেশের মঙ্গল জড়িত, তিনি শরীরকে এরূপ ক্লিষ্ট ও অকর্ম্মণ্য করিলেন কেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার কি আমাদের নাই? মহাপুরুষদিগের দৃষ্টান্ত সাধারণ নরনারীর পথপ্রদর্শক। অনেকেই তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতেছেন এবং ভবিষ্যতে আরো অনেকে করিবেন। এ বিষয়ে আমাদের কি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত নয়? আমরা কোন পথে চলিব? শ্রীবুদ্ধদেবের অসাধারণ কঠোর বৈরাগ্য শরীরকে যখন কঙ্কালসার করিল, অথচ সিদ্ধি সুদূরপরাহত, তখন তিনি মধ্যপথ অবলম্বন করিলেন; অর্থাৎ যতটুকু আহার গ্রহণ করিলে সাধনার ব্যাঘাত না হয়, ততটুকু গ্রহণীয়। ইহাই মধ্যপথ, সংযমের পথ বা সমন্বয়ের পথ। এই মধ্যপথ বা সমন্বয়ের পথই বিধাতার অভ্রান্ত বাণী। এই সমন্বয়ের পথ ধরিয়াই বিধাতা সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন। দিবসের জাগরণের সহিত যদি রাত্রির নিদ্রার ব্যবস্থা না থাকিত, তাহা হইলে জীবনরক্ষা হইত না; বৈশাখের প্রচণ্ড উত্তাপের পর যদি শ্রাবণের অবিশ্রান্ত ধারা না পড়িত, তাহা হইলে পৃথিবীর প্রাণান্ত হইত। বিধাতা যখন শরীর ও আত্মাকে একত্রে স্থাপন করিয়াছেন এবং পরস্পরের সুখ দুঃখ পরস্পরকে বহন করিতে হয়, তখন আত্মা ও শরীরের সামঞ্জস্য রক্ষা করাই মানবের অবশ্যকর্ত্তব্য। একদিকে বিলাস বাসনা বর্জ্জন ও অন্যদিকে ক্ষুৎপিপাসার অধিকারকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার না করাই শ্রীবুদ্ধদেবের মধ্যপথ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। সাধকেরা শরীরকে আত্মার অনুগামী করিতে সতত চেষ্টা করেন। আত্মার মধ্যে যে সাধু সংকল্প বা বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, শরীরকে তাহার সহায় করিবার জন্য শরীরের অনেক অধিকার স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিতে হয়; কিন্তু যাহাতে একেবারে শরীর ভাঙ্গিয়া না পড়ে, সে বিষয়ে সাধকের দৃষ্টি রাখা উচিত। তবে যদি এমন কোন ঘটনা উপস্থিত হয় যে, ধর্ম্ম রক্ষা করিতে গিয়া শরীরের পতন অনিবার্য্য, সেখানে ধর্ম্মরক্ষা করা সাধকের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

যেমন সত্য প্রচার করিতে ঈশাকে ক্রুশে প্রাণ দান করিতে হইল; এ সকল ঘটনার উপর সাধকের কোন হাত নাই, তখন মৃত্যুকে বরণ করাই একমাত্র পথ। কিন্তু সাধারণ অবস্থায়, সাধারণ সাধকদিগের পক্ষে শরীর ও আত্মার পারস্পরিক যোগ রক্ষা করিয়া চলাই মঙ্গলকর। সংযমের পথে বা মধ্য পথে থাকিয়া, আত্মার উচ্চ সংকল্পের সহিত শরীরের বৈরাগ্য রক্ষা করা নববিধানের আদর্শ। শরীরের সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই, যাঁহারা একথা বলেন, অথবা অনুচিত বিলাসে গা ঢালিয়া দিয়া আত্মার সাধুতা বা উচ্চব্রত রক্ষা করা যায়, যাঁহারা একথা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের মত আমরা সঙ্গত মনে করি না। আমরা যত দিন পৃথিবীতে বাস করিব, ততদিন শরীরের সহিত আত্মার সংগ্রাম অপরিহার্য্য। শরীরের ক্ষয়ে বা শরীরকে অকর্ম্মণ্য করিয়া আত্মার জয় ঘোষণা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। অন্যান্য তত্ত্বের ন্যায় আত্মার শক্তি কি পরিমাণে শরীরকে অতিক্রম করিতে পারে, তাহা জ্ঞানের ক্রমবিকাশের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইবে। তবে একটী কথা মনে রাখিতে হইবে যে, শরীরকে কর্ম্মঠ রাখিয়া, অথচ শরীরকে অতিক্রম করিয়া, মনের সাধু ইচ্ছা ও আত্মার সংকল্প যাহাতে জয়যুক্ত হয়, ইহাই যেন আমাদের সাধনার চরম লক্ষ্য হয়। ইহাই নির্ব্বাণ-সাধনার আদি গুরু শ্রীবুদ্ধদেবের মধ্য পথ।

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—০—

আমাদিগের প্রমোদকুমার।

আমাদিগের শ্রীমদাচার্য্যের কলুটোলার ভবন হইতে একটী আশার বস্ত চলিয়া গেলেন! শ্রীমদাচার্য্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রমোদকুমার, বিগত ২১শে জুন তারিখে, তাঁহার বর্ত্তমান্ পিতা ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, কনিষ্ঠা ভগিনী এবং পরিবারস্থ আর আর সকলকে কাঁদাইয়া এই পৃথিবী হইতে চলিয়া গেলেন! প্রমোদকুমারের ভক্তিমতী মাতা ইতিপূর্ব্বে পরলোকে অগ্রসর হইয়াছেন, আজ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁহার অনুগমন করিলেন। আমরা কুচবিহারে থাকিতে যুবক প্রমোদকুমারকে বিশেষভাবে চিনিতে পারিয়াছিলাম। ইঁহার পিতা যখন কুচবিহার ষ্টেটে একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেলরূপে কার্য্যে ব্রতী ছিলেন, যুবক প্রমোদকুমার তখন ঐ

আফিসে কার্য্য বিশেষে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার সরল প্রকৃতি, তাঁহার উদ্যম উৎসাহ ও তাঁহার সুমিষ্ট ব্যবহার তাঁহার সহযোগিবর্গের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল। এই সময়ে তাঁহার ভক্তিমান্ পিতার আগ্রহে তাঁহার বাটীতে সপ্তাহের মধ্যে একদিন ব্রহ্মোপাসনা হইত, আর যুবক প্রমোদ সে উপাসনায় আগ্রহের সহিত যোগদান করিতেন। আমাদের শ্রদ্ধাস্পদা মহারাণী সুনীতি দেবী প্রতিষ্ঠিত "সুনীতি কলেজের" বালিকাদিগকে পারিতোষিকবিতরণোপলক্ষে যে সমস্ত সুন্দর সুন্দর বস্তু সংগ্রহের প্রয়োজন হইত, উদ্যমশীল প্রমোদকুমার তাহা তাঁহার অক্লান্ত উদ্যমের সহিত কুচবিহার ও কলিকাতার বাজার হইতে সংগ্রহ করিতেন। প্রমোদকুমারের পিতা তখন "সুনীতি কলেজের" সম্পাদক। ষ্টেটের কার্য্য হইতে অবসরপ্রাপ্ত হইয়া পিতা যখন কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিলেন, তখনও প্রমোদকুমার "সুনীতি কলেজ" সম্বন্ধীয় মহান্ ব্রত হইতে অবসর গ্রহণ করেন নাই।

আজ আমরা এই সুবর্ণরেখার সুদূর বেলাভূমি হইতে, প্রমোদের ভক্তিমান্ পিতা, তাঁহার ভ্রাতা ও ভগিনী এবং পরিবারস্থ আর আর সকলের প্রতি হৃদয়ের সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি। ভক্তিমান্ পিতা হৃদয়ের যে বল ও বিশ্বাস লইয়া এই অগ্নিপরীক্ষা বহন করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের নিকট এক মহা শিক্ষা। তিনি স্বহস্তে এই শোকাবহ সংবাদপূর্ণ পত্র লিখিয়া আমাদিগকে জানাইয়াছেন। আজ আমরা সেই শান্তিদাতা বিধাতার শান্তিপ্রদ চরণতলে অবনত হইয়া, সেই স্বর্গগত আত্মার জন্য কল্যাণ প্রার্থনা করি। তিনি এই শোকসন্তপ্ত পরিবারের হৃদয়ে শান্তি বিধান করুন।

শোক-সন্তপ্ত—শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

—০—

সংবাদ।

নামকরণ—গত ১২ই আষাঢ়, সোমবার, ভাই নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া কন্যার শুভনামকরণ শিশুর মাতামহ ভ্রাতা হরিসুন্দর দাসের কলিকাতায় ৮৩।১।১ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট বাসভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। শিশুর পিতামহ ভাই নগেন্দ্রনাথ উপাসনা করেন এবং কন্যাকে "শিখা" নাম প্রদান করেন। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

জন্মোৎসব—গত ২৯শে জুন, পুরী, "বিচভিউ" নামক প্রাসাদে, শ্রদ্ধাস্পদ, সর্ব্বজনসম্মানিত, বঙ্গের সুসন্তান স্যার্ আর্ এন্ মুখার্জির অশীতিতম জন্মোৎসব তাঁহার কন্যা শ্রীমতী প্রেমলতা দেবীর উদ্যোগে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে পুরী-প্রবাসী অনেকগুলি গণ্যমান্য ব্যক্তি ও ভদ্রমহিলা নিমন্ত্রিত হন। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দীর্ঘ জীবন ও কৃতিত্বলাভের জন্য ভগবচ্চরণে কৃতজ্ঞতা করেন ও আরো দীর্ঘজীবন এবং সৌভাগ্য লাভের জন্য প্রার্থনা করেন। সমবেত নরনারীগণ উপাসনান্তে মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে তার যোগে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। বি, এন, আর, কোঃ ডি, সি, ও, মিঃ চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীমতী প্রেমলতা দেবী নিজে উপাসনায় সঙ্গীত করেন।

আনন্দজ্ঞাপন—ময়ূরভঞ্জের মহারাজকুমার, ব্রহ্মানন্দের সেজকন্যা মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবীর প্রিয়তম পুত্র শ্রীমান্ ধ্রুবেন্দ্রচন্দ্র কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি,এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন শুনিয়া, আমরা অতীব আনন্দ ও শুভাকাঙ্ক্ষার সহিত আমাদের প্রাণের অভিনন্দন তাঁহাকে জানাইতেছি এবং কৃতকার্য্যতার জন্য ভগবচ্চরণে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি। নববিধানজননী তাঁহার প্রিয়তম সন্তানকে শুভাশীষ দান করুন এবং ব্রহ্মানন্দের ও স্বর্গগত পিতৃদেব মহারাজার শুভাশীর্ব্বাদ তাঁহার মস্তকে বর্ষিত হোক।

পরলোকগমন—আমরা গভীর দুঃখের সহিত সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, গত ৬ই জুলাই (২২শে আষাঢ়), হাওড়া বাঁটরা নিবাসী শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাসের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী তারাসুন্দরী দেবী নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া, ৬৩ বৎসর বয়সে, স্বামী, তিনপুত্র, চারিকন্যা ও বহু নাতি নাতিনী ও আত্মীয়স্বজনদিগকে রাখিয়া, আনন্দময়ী জননীর চিরশান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। ৩২শে আষাঢ় (১৬ই জুলাই), রবিবার, প্রাতে ৫৩নং কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় লেনে, তাঁহার পবিত্র শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পুত্রকন্যাগণ কর্ত্তৃক স্বগৃহে সম্পন্ন হইয়াছে। অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ আগামীবারে প্রকাশিত হইবে। পরমজননী পরলোকগত আত্মাকে তাঁর অনন্ত শান্তিবক্ষে স্থান দান করুন এবং শোকার্ত্ত পরিবারে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

বিশেষ উপাসনা—গত ২রা জুলাই, রবিবার, ২৮নং রামকমল সেন লেনে, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সেনের জ্যেষ্ঠপুত্র স্বর্গীয় প্রমোদকুমার সেনের স্বর্গগত আত্মার স্মরণার্থে বিশেষ উপাসনা হয়। ময়ূরভঞ্জের মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী সুমিষ্ট উপাসনা করেন। পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করিয়া এবং শোকার্ত্ত পিতা, ভ্রাতা, পত্নী, পুত্র, কন্যা ও আত্মীয় স্বজনগণের জন্য স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা ভিক্ষা করিয়া ব্যাকুল প্রার্থনা করেন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ২৫শে জুন, রবিবার, ঢাকায়, রায় ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় বাহাদুরের সহধর্ম্মিণী, পিতামাতার জ্যেষ্ঠসন্তান শ্রীমতী মনোরমা দেবী স্বীয়া মাতা নিথরমোহিনী দেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ কলিকাতাস্থ ভাইবোনেদের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিয়া সম্পন্ন করেন। ভক্তিভাজন ভাই মহিমচন্দ্র সেন ও ভাই দুর্গানাথ রায় পবিত্র অনুষ্ঠানে রোগতপ্ত অক্ষম দেহ লইয়া উপস্থিত হন এবং ভাই মহিমচন্দ্র সেন উপাসনা করেন। ললিতবাবু

শাস্ত্রপাঠ ও আচার্য্যের প্রার্থনা পাঠ করেন। পরমজননী স্বর্গস্থ আত্মাকে নিত্য শান্তিধামে রক্ষা করুন এবং শোকার্ত্ত পরিবারে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন। এই পবিত্র অনুষ্ঠানে নিম্নলিখিত দান উৎসর্গিত হইয়াছে :—

কলিকাতা :—নববিধান প্রচারভাণ্ডার—৫৲, নববিধানসমাজ—৪৲, মূক ও বধির বিদ্যালয়—৪৲, অন্ধবিদ্যালয়—৪৲, সাধু প্রমথলাল শিক্ষাতীর্থ—৫৲, Campbell Poor Fund—৫৲, আতুর আশ্রম—৪৲, কুষ্ঠাশ্রম—৪৲, Little Sisters of the Poor—৪৲, Brahmo Relief Fund—৪৲।

ঢাকা :—নববিধানসমাজ—৫৲, অনাথাশ্রম—৪৲, মূক ও বধির বিদ্যালয়—৪৲, বিধবাশ্রম ৪৲ টাকা।

এতদ্ব্যতীত ভোজ্য—দুই প্রস্থ, পরিধেয় বস্ত্র ও গৈরিক দুই প্রস্থ, ভৃত্যদিগের জন্য আম ও মিষ্টান্ন, ভিখারীদের চাউল ও পয়সা।

সেবা—আমাদের ভ্রাতা ডাঃ অনুকূলচন্দ্র মিত্র লিখিয়াছেন :—গত ১লা জুলাই, শনিবার, ডাক্তার অনুকূলচন্দ্র মিত্র চন্দননগর ও চুঁচুড়া ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করিয়াছেন এবং তথায় সমাগত উপাসকগণের নিকট শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গগত ভাই প্রমথলালের সাধুজীবনে ব্রহ্মের অবতরণ সম্বন্ধে কিছু বলেন। সে মধুমাখা উচ্চ জীবনের মহাভাগবত তাঁরা আরোও শুনিতে উৎসুক। যদি মণ্ডলীর কেহ যাইতে ও সেবায় ব্যবহৃত হইতে ইচ্ছা করেন, তবে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট যাইলে, তিনি সকল বন্দোবস্ত করিয়া দিতে সদা প্রস্তুত। গত ২রা জুলাই, ডাক্তার মিত্র থাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরেও উপাসনা ও সঙ্গীত করিয়া আসিয়াছেন। নববিধানজননী তাঁহার সেবকগণের জীবনে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে থাকুন।

উপাধিলাভ—আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি, নববিধানের গৃহস্থবৈরাগী স্বর্গীয় রাজমোহন বসুর স্বাবলম্বী কৃতিমান্ পুত্র শ্রীমান্ অমূল্যচন্দ্র বসু লণ্ডনের রয়েল ইনষ্টিটিউট অফ ফিউয়েলস এর (*Royal Institute of Fuels*) *Fellow* বলিয়া সম্মানিত ও F.I.F. উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি জামসেদপুর *Tata Iron & Steel Works*এ একটি বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীর পদে কৃতিত্বের সহিত কার্য্য করিতেছেন। সর্ব্বসম্মানদাতা শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ তাঁহার মস্তকে বর্ষিত হউক।

সাম্বৎসরিক—স্বর্গগত ভাই প্রমথলাল সেনের (নালুদার) স্বর্গারোহণসাম্বৎসরিক উপলক্ষে, গত ৩০শে জুন, প্রাতে শান্তিকুটীরে ডাঃ কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় কীর্ত্তনাদি হয়, বিধানমুরলী শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কীর্ত্তনে নেতৃত্ব করেন। ১লা জুলাই, সন্ধ্যায়, শান্তিকুটীরে "আমাদের সঙ্ঘের" অধিবেশনে উৎসবের ভাবে, নববিধানজননীর আরতি ও উপাসনাদি হয়। ডাঃ সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন, শ্রীমতী নির্ঝরপ্রিয়া ঘোষ সঙ্গীতে নেতৃত্ব করেন; শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় "নালুদার" সুন্দর ও সুলিখিত জীবনী পাঠ করেন। এই উপলক্ষে ৩০শে জুন, প্রাতে, হাজারিবাগ ব্রহ্মমন্দিরে, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন; ভাই প্রমথলাল যে প্রকৃত নববিধানের পথ ধরিয়াছিলেন ইহা বলিয়া, সাধুসম্মাননা শুধু বাহ্যানুষ্ঠানে পরিণত না হইয়া, যাহাতে সাধুদের জীবন নিজ জীবনে আয়ত্ব হয়, এ ভাবে আত্মনিবেদন করেন। শ্রীমতী নির্ম্মলা বসু লিখিয়াছেন, রাঁচিতেও, সকলের শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় নালুদার পুণ্যস্মৃতিতে কয়েকজন মিলিত হইয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছেন। পুরী, নবপর্ণকুটীরেও ঐ দিনে ভাই প্রমথলালের সাম্বৎসরিক সাধিত হইয়াছে। ২রা জুলাই, রবিবার, সন্ধ্যায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের সামাজিক উপাসনায়ও ডাঃ সত্যানন্দ রায় "নালুদার" সাধুজীবনের কথা বলেন।

গত ৩০শে জুন, ১২৮নং হ্যারিশন রোডে, রায় সাহেব ডাক্তার প্রবোধচন্দ্র রায়ের মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিকে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। ঐ দিন প্রাতে অমরাগড়ী সমাধিমন্দিরে ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন; অপরাহ্নে বালিকাবিদ্যালয়ে স্মৃতিসভা হয়, শ্রীমতী মৃন্ময়ী রায় সভানেত্রী হন। স্বর্গীয়া গোলাপসুন্দরী দেবীর জীবনের সৌরভ ও গৌরবের কথা আলোচনা করিয়া সকলে মুগ্ধ হন। রাত্রিতেও সমাধিমন্দিরে সঙ্গীত ও প্রার্থনা হয়।

গত ১লা জুলাই, ১৪৫।এ ল্যান্সডাউন রোডে, ডাঃ সত্যানন্দ রায়ের মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিকে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

গত ৯ই জুলাই, খুরুটরোডে, শ্রীযুক্ত জগবন্ধু পালের পিতৃদেবের সাম্বৎসরিকে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। প্রচারভাণ্ডারে একটাকা দান করা হয়।

গত ১০ জুলাই, ৫৩নং কালীপ্রসাদ ব্যানার্জ্জি লেনে, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাসের গৃহে, তাঁহার মাতৃদেবী ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় সূর্য্যকুমার দাসের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ৫৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ১১ই জুলাই, ২৪।৩নং বাহির মির্জ্জাপুর রোডে, স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র দত্তের সাম্বৎসরিক দিনে, তাঁহার পুত্রগণের বাসভবনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

গত ১৩ই জুলাই, ১৭নং বৈঠকখানা রোডে, স্বর্গীয় সুধাংশুনাথ চক্রবর্ত্তীর সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন; সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী পুণ্যদায়িনী চক্রবর্ত্তী কাতর প্রার্থনা করেন। প্রচারভাণ্ডারে দুই টাকা দান করা হয়।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্ত বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৮ ভাগ। ১৪শ সংখ্যা। | ১৬ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১৩৪০ সাল, ১৮৫৫ শক, ১০৪ ব্রাহ্মাব্দ। 1st August, 1933. | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

জীবন্ত ঈশ্বর, আমরা তোমারই পূজা করি। কেন না, তুমিই আমাদিগকে তোমার জীবন্ত পূজা করিতে শিখাইয়াছ; তোমা ছাড়া আর অন্য দেবতা আমরা কল্পনা না করি, অন্য দেবতা আমরা গঠন না করি, মনের চিন্তায় বা আন্দাজে তোমার কোনরূপও কল্পনা না করি, ইহা তুমিই স্বয়ং আমাদের কাণে কাণে প্রাণের অন্তরে মন্ত্র দিয়া বলিয়া দিয়াছ। আমরা বাল্যকালে আমাদের পিতা-মাতা গুরুজনদিগের দেখাদেখি, মৃন্ময় দেবদেবীকে তোমা-রই প্রতিমাবোধে পূজা করিতে শিখিয়াছিলাম এবং তাহাতে কত ভক্তি নিষ্ঠা অনুভব করিতাম; কিন্তু কি আশ্চর্য্য কৌশলে, কি অলৌকিক মন্ত্রবলে, তুমি আমাদের মনের চিন্তায় ও বিশ্বাসে যে পরিবর্ত্তন আনিয়া দিলে, তাহা ভাবিলে আমরা অবাক হইয়া যাই। কোন গুরুর উপদেশে বা কোন শাস্ত্রগ্রন্থ-পাঠে যে আমাদের মন তোমার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহা ত বলিতে পারি না। তোমারই প্রত্যক্ষ প্রেরণা আমাদিগকে তোমার পূজা করিতে শিখাইয়াছে, তোমাকে জীবন্ত ঈশ্বররূপে দেখিতে ও বিশ্বাস করিতে শিখাইয়াছে। এক্ষণে তুমি যেমন আমাদিগকে একমাত্র তোমাকেই পূজা করিতে শিখাইয়াছ, এমনই আমাদের দেশবাসী, বিভিন্নজাতীয় এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়স্থ ভাই ভগ্নীদিগকেও, তেমনি তেমনি করিয়া তোমাকেই দেখিতে, বিশ্বাস করিতে ও পূজা অর্চ্চনা করিতে আকা-ঙ্ক্ষিত কর, শিক্ষিত কর। প্রকৃত ধর্ম্মভীরু, ধর্ম্মনিষ্ঠ বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত বহু নরনারীকে দেখিতে পাই, তাঁহারা ধর্ম্মার্থে ধর্ম্মের নামে কতই কষ্ট কল্পনা ও সাধ্য সাধনা করিতেছেন, কতই তীর্থপর্য্যটন, শাস্ত্রাধ্যয়ন, পূজা অর্চ্চনা, প্রার্থনা, গান, কীর্ত্তন, ব্রতপালনাদি করিতেছেন; কিন্তু হায়! তোমায় না চিনিয়া, তোমায় না পাইয়া, যেন মেঘাচ্ছন্ন আলো আঁধারে তাঁহারা জীবন কাটাইতেছেন। প্রত্যক্ষ সূর্য্য-দর্শনে যেমন সূর্য্যোত্তাপে জীবন জ্বলন্ত জীবন্ত হয়, তাহা কই হইতেছে? মৃত দেবতার পূজার্চ্চনা ও সাধ্য সাধনায় জীবনলাভ কেমনে হইবে? সে সকলই মৃত সংস্কারমাত্রে পরিণত হইতেছে। জীবন্ত ঈশ্বরের পূজা বিনা কি জীবনলাভ হয়? জীবনে ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করিব, ইহা যদি সাধন ভজন, পূজা প্রার্থনার উদ্দেশ্য না হয়, তাহা হইলেই বা তাহা জীবনপ্রদ হইবে কেন? অতএব যদি নববিধানে প্রেমময়ী মা হইয়া, তোমার নিজ কৃপালোকে এবার সকলকে প্রত্যক্ষ দর্শন দান করিবে বলিয়া ইচ্ছা করিয়াছ, তবে "দাও মা আনন্দময়ী সর্ব্বজনে

দর্শন, তব প্রেমানল প্রসন্ন বদন, যার দরশনে পাপজীবনে সঞ্চারে নবজীবন।”

শান্তিঃ ! শান্তিঃ !! শান্তিঃ !!!

—০—

জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত বিধান।

মহাসাগর সর্ব্বদাই তরঙ্গায়িত। তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিতেছে, পড়িতেছে; কতই বিচিত্র বীচিমালা উচ্ছুসিত হইতেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, নিত্যই নূতন তরঙ্গ, নিত্যই নূতন শোভা, নিত্যই নূতন দৃশ্য; শেষ নাই, একই ভাব, অথচ পলে পলে নূতন। জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত বিধান এমনই নিত্য নূতন। ইহাই সজীবতার পরিচয়, ইহাই নববিধানের আদর্শ। এই জন্যই জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত বিধান, নববিধান—নব নব বিধান। ইহা কখনই কিছুতে নিবদ্ধ হইতে পারে না। তবে সাগরের তরঙ্গ নিবদ্ধ হয় কখন, যখন তাহা বালুকাস্তূপে প্রবিষ্ট হয়।

আকাশের বাতাসও কত ভাবে কতরূপে, কখনও মৃদুমন্দ সমীরণে, কখনও প্রচণ্ড ঝটিকার বেগে বিশ্বময় ঘুরিতেছে। তাহা জড় জীবের প্রাণবায়ু সঞ্চার করিকরিতেছে, কিন্তু তাহা কি কিছুতে নিবদ্ধ হয়? নিবদ্ধ হয় কেবল তখন, যখন তাহা বৃষ্টির আকার ধরিয়া মৃত্তিকায় পরিণত হয় ও আত্মত্যাগ করে।

জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত প্রেমলীলার নামই বিধান। ক্রিয়াশীল ঈশ্বর যখন তাঁহার প্রেমলীলা কার্য্যতঃ বিশ্বমানবজীবনে সম্পাদন করেন, তখনই তাহা তাঁহার বিধান নামে অভিহিত হয়; যখন সেই বিধান নিত্য নব নব ভাবে চলিতেছে, কার্য্য করিতেছে, সর্ব্বজীবনে নব নব জীবন সঞ্চার করিতেছে, সাগরের তরঙ্গের ন্যায় “উঠিছে পড়িছে করিছে রঙ্গ নবীন নবীন রূপ ধরি,” তখনই ইহা নববিধান বলিয়া সমাদৃত। নিত্য সজীবতা ও নূতনত্বই নববিধানের স্বরূপ, ইহাই নববিধানের জীবন।

নববিধান জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত ক্রিয়াশীলতার পরিচয়। জীবন্ত ঈশ্বর কখনও মৃত বা ক্রিয়াশূন্য অথবা লীলাশূন্য হইতে পারেন না; তাঁহার নববিধানও নিত্য নবনব-জীবনশূন্য হয় না। নববিধানে মৃত্যু নাই, ক্রিয়ার শূন্যতা নাই; ক্রিয়াশূন্যতা বা জীবনবিহীনতা যেখানে, নববিধান নাই সেখানে। অগ্নি যেমন উত্তাপবিহীন হয় না, সূর্য্য যেমন আলোকশূন্য হইতে পারে না, নববিধান তেমনি উন্নতিবিহীন বা নৈমিত্তজীবনশূন্য হইতেই পারে না; কেন না, ইহা জীবন্ত ঈশ্বরের স্বরূপের প্রকাশ।

এক্ষণে যত সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম আছে, সকলই অভ্যুদয়কালে বিধানরূপেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহা প্রবর্ত্তক ও শাস্ত্রে নিবদ্ধ হওয়াতেই তাহাদের জীবনপ্রবাহ বদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহার উদার প্রসার সংকীর্ণতায় পরিণত হইয়াছে এবং ইহারই জন্য বিশেষ ভাবে বিধাতা বর্ত্তমান যুগধর্ম্মবিধান নববিধান প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। নিত্য নূতনতা, নব নব উন্নতি এবং প্রসার তাহার প্রকৃতিগত স্বরূপ। নববিধান চির নববিধানই থাকিবে। ইহা কিছুতে নিবদ্ধ হইবে না।

এই নববিধানের বীজ ব্রাহ্মসমাজের প্রারম্ভেই প্রোথিত। ব্রাহ্মসমাজ সাম্প্রদায়িক বিধি ব্যবস্থা এবং দলে আবদ্ধ করিয়া ইহাকে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মে নিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু বিধাতা তাহা হইতে দেন নাই। যাঁহারা ইহাকে নিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারাই দলে, মতে বা বিধি ব্যবস্থার গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহাদের উন্নতির চেষ্টা, সত্যসন্ধানের অনুরাগ, মনের উদারতা, প্রেমের প্রগল্‌ভতা, এবং নিত্য নব নব জীবনলাভের সাধনশীলতা আর নাই। ইহারই নাম অকালমৃত্যু। এই মৃত্যু যে ব্রাহ্মসমাজকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, ইহা কখনই আমরা অস্বীকার করিতে পারি না।

ইহার কারণ, জীবন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাসের স্বল্পতা এবং জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত নববিধানগ্রহণে অনাস্থা ও অরুচি। নববিধানে বিশ্বাসী হইয়া নববিধানের জীবন্ত ঈশ্বরের যিনি পূজা করিবেন, তাঁহার কখনই এ রকম অকালমৃত্যু হইবে না। কারণ, নববিধানের ঈশ্বর “এক দণ্ড দেয় না বসিতে, নাকে দড়ী দিয়ে টানে মারে পিঠেতে; ঠাকুর আপনি মেতে মাতান যত সাঙ্গোপাঙ্গ সহচর।”

নববিধানাচার্য্য তাই বলিলেন, “এ যে শতদ্রুর স্রোত; ইহা কি আটকান যায়, এখানে কি পেছিয়ে যাওয়া যায়?” ইহাই নববিধানের লক্ষণ। “মার দিকে দৌড়ানই” নববিধানশিশুর স্বভাব। তাহা হইলেও বিধানে বিধি থাকিবে। কিন্তু সে বিধি বন্ধন নয়, মুক্তির বিধি,

অনন্ত উন্নতির বিধি। ঈশ্বর যেমন জীবন্ত, তেমনি জ্ঞানময়; তাঁহার জীবন্ত বিধানও নীতি বিধির দ্বারা সংরক্ষিত ও সঞ্চালিত। পূজা সাধন ভজন শাস্ত্র বিধি আদর্শ সকলই নববিধানে আছে, কিন্তু গণ্ডীতে বা সীমাতে আবদ্ধ করিবার জন্য নয়। সকলই আধ্যাত্মিক স্ফূর্ত্তি-বিধায়ক। সকলই নব নব জীবনপ্রদ। সমস্ত সত্য, সমস্ত প্রেম এবং সমস্ত পবিত্রতার আধার যে অদৃশ্য মণ্ডলী, তাহাই ইহার মণ্ডলী।

জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসক, জীবন্ত নববিধানে বিশ্বাসী মাত্রেই আত্মজ্ঞানে ইহা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে পারেন যে, নিত্য নিত্য নব নব জীবন, নব নব আলোক জীবনে উদ্ভাসিত হইতেছে; নব নব উপাসনা, নব নব প্রার্থনা নব নব উন্নতির পথে জীবনকে অগ্রগামী করিতেছে। আজ জীবনের যে স্তরে রহিয়াছি, কাল আর তাহাতে থাকিতে মন তৃপ্তি অনুভব করিতেছে না। নব নব ভাব, নব নব ভক্তি, নব নব কর্ত্তব্যজ্ঞান, নব নব যোগ-পিপাসা, নব নব কর্ম্মোৎসাহ জীবনকে আন্দোলিত করিতেছে এবং এই জীবনই যে জীবনবেদ, স্বয়ং ঈশ্বর-হস্ত-রচিত, ইহাও উপলব্ধি হইবে। প্রত্যেক শাস্ত্র, প্রত্যেক সাধু, প্রত্যেক ধর্ম্ম, প্রত্যেক সাধনের ভিতর নব নব জ্ঞানের স্ফুরণ হইবে। যদি তাহা হয়, তাহা হইলেই বুঝিতে পারি, আমার হাতে আমার জীবন নয়, আমার হাতে আমার নববিধান-সাধনও নয়, আমি জীবন্ত ঈশ্বরের পাল্লায় পড়িয়া আছি। আমি এই পর্য্যন্ত যাইব, আর যাইব না, ইহা বলা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। যাহা হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট, ইহা কখনই বলিতে পারি না। সত্য যাহা শিখা হইয়াছে, ইহাই শেষ, কেমন করিয়া বলিব? ইহারই নাম নববিধান। এই লক্ষণ যাঁহার জীবনে প্রতিফলিত, তিনিই প্রকৃত নববিধানবিশ্বাসী। শ্রীকেশবচন্দ্র নিজজীবনে এই আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, বা বিধানপতি স্বয়ং তাঁহার জীবনে তাহা প্রতিফলিত করিয়া দেখাইয়াছেন।

নববিধানের আর একটি বিশেষ লক্ষণ, কেবল মতে জানা বা শাস্ত্রে শেখা নয়, আচরণে হওয়া, চরিত্রে জীবনে দেখান। বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণে যাহা শিক্ষা পাই, ঈশা, গৌরাঙ্গ, বুদ্ধ, মোহম্মদ ও ঋষিদিগের জীবনে যাহা দর্শন করি, তাহা জীবনে আত্মস্থ করাই নববিধান; এবং তাহারও উপর ঈশ্বর স্বয়ং আদর্শ হইয়া যেখানে লইয়া যাইবেন, সেই দিকে ধাবিত হইতে আকাঙ্ক্ষাই নববিধানের সাধন। তাই নববিধানাচার্য্য বলিলেন, "কেবল ঈশা ঈশা বলিও না, ছোট ছোট ঈশা হও।" আরো বলিলেন, "মহামান্য ঈশা মহীয়ান্ হউন। শ্রীগৌরাঙ্গকে যথেষ্ট ভক্তি করি; কিন্তু তাঁহাদিগকেও জীবনের আদর্শ করি না। যেখানে ঈশার আলোক পৌঁছিতে পারে না, ঈশ্বর আদর্শ হইয়া নিজ আলোকে সে স্থান প্রকাশ করেন।" "ঈশ্বর যেমন পূর্ণ, তেমনি পূর্ণ হও" ইহাই নববিধানের আদর্শ। জীবন্ত ঈশ্বরই নববিধান-রথের জীবনদাতা সারথি। সে রথের গতি অনন্তের নিরতি।

জীবন্ত ঈশ্বরের পূজায়, জীবন্ত নববিধানের সাধনায়, সব পুরাতন মত যাহা কিছু, সকলই নূতন ও জীবন্ত হয়। পুরাতন মৃত ধর্ম্ম চান, আর সকল ধর্ম্মের মৃত্যু হউক, এক আমার ধর্ম্মই থাক। তাই হিন্দু বলেন, সকল ধর্ম্মের উচ্ছেদ হইবে, কেবল হিন্দুধর্ম্ম থাকিবে। খৃষ্টান চান, সব খ্রীষ্টানে পর্য্যবসিত হইবে। মুসলমান চান, সব মুসলমান হইবে, আর কেহ থাকিবে না। কিন্তু নববিধান সকলকে নবজীবন দিতে আসিয়াছেন। তাই তিনি চান, সবাই সজীব হইয়া, সবার বৈচিত্র ও বিশিষ্টতার সমন্বয় হইবে; কাহারও উচ্ছেদে যে সমতা, তাহা হইবে না। স্বর্গরাজ্যে সবার মিলন, সবার স্থান। বাইবেলেও তাই আছে, "যখন ঈশা স্বর্গরাজ্যে রাজা হইবেন, তখন যাঁহার যাহা আছে, সবাই তাহা তাঁহাকে উপঢৌকন দেবেন।" ইহারই প্রতিধ্বনিস্বরূপ ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "অপ্রেমিক চান, আমার ঘর ঐ, ও যাইতে পাইবে না। কিন্তু সকলের জন্য তুমি একটি একটী ছোট ঘর, বড় ঘর প্রস্তুত করেছ। ওখানে গেলে সকলেরই গান বাজনা করিতে হইবে। কেহ ছোট সুরে, কেহ বড় সুরে। জননি, কাহারও আছে ভাল সুর, কাহারও সুর ভাল নয়। এইটী হরি, এঁরা বোঝেন না। সকলে না গেলে, হয়ত মোটাসুর থাকিবে না, নয়তো সরু সুর থাকিবেনা, নয়ত যোগ থাকিবেনা, নয়তো ভক্তি থাকিবেনা।" এইটীই বিশেষ কথা। তাই তিনি প্রার্থনা করিলেন, "যাহার যেমন প্রয়োজন, তেমনি রেখেছ। হরি, ঐ নববিধান। সকলে ঝগড়া কলহ দূর করে, আনন্দের সহিত হাত ধরাধরি করে ঐ বাড়ীতে যাই।" ইহাই জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত বিধান, ইহাই নববিধানে নূতন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

সুখ ও দুঃখ।

শরীরের রোগনিবারণের জন্য তিক্ত এবং মিষ্ট দুই প্রকার আহারই প্রয়োজন। আত্মার পুষ্টির জন্যও সুখ এবং দুঃখ দুইয়ের আবশ্যক। অনেক সময় মিষ্ট অপেক্ষা তিক্তই অধিক মিষ্ট বোধ হয়। তেমনি সুখ অপেক্ষা দুঃখের উপকারিতা অধিক। কেন না, দুঃখেই দুঃখহারী হরিকে অধিক মনে পড়ে এবং তাঁর কৃপা লাভ হয়। এই জন্য ভক্তাত্মা বলেন, "দুঃখেতে পাই যদি হে তোমায়, চাহি না সুখ সম্পদ ওহে হরি দয়াময়।"

বৃদ্ধ বয়সের দৃষ্টি।

যত বয়স বাড়ে, তত দৃষ্টিশক্তি হ্রাস হয়; ক্রমে আর চক্ষে দূরের বস্তু দৃষ্টিগোচর হয় না। খুব নিকটস্থ না হইলে কাহাকেও চেনা যায় না। এমনই জীবনের দিন যত যায়, তত ঈশ্বর দূরে থাকিলে আর চলে না। তিনিও নিকট হইতে নিকটতর হইয়া দেখা দিতে চান এবং তিনি নিকট হইলে, তাঁহার সঙ্গে স্বর্গলোক এবং স্বর্গস্থ অমরাত্মাগণও প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর হন। তাঁরাও, সঙ্গের সাথী সহযাত্রী হইয়া ব্রহ্মের মধ্যে একত্রে যাহাতে সবে মিলে বাস করি, ইহাই চান এবং তাহারই সহায়তা করেন।

দ্বৈতাদ্বৈত যোগ।

ঈশ্বর বলিলেন, "আমিই তোর আমি, তুই আমার দেহযন্ত্র, আমার শক্তি তোর প্রাণের শক্তি, আমার মন তোর মনের মন। আমারই ইচ্ছায়, আমার যন্ত্ররূপে ব্যবহার করবার জন্য, তোকে এনেছি, রাখছি। মস্তক যেমন দেহকে চালায়, দেহের হাত পা নিজে মস্তকের চিন্তা ও প্রাণের বল বিনা যেমন কিছুই কর্ত্তে পারে না, আমার সঙ্গে তোর তেমনই সম্বন্ধ; আমা ছাড়া তোর স্বতন্ত্র অস্তিত্বই নাই। আমা হইতে তোমাকে স্বতন্ত্র মনে করা তোমার মস্তিষ্কের বিকার মাত্র। বিকারশূন্য হইলেই বুঝিতে পারিবে, তুমি আমার যন্ত্রমাত্র, আমিই তোমার যন্ত্রী।"

আত্ম-দর্শন।

দেখিলাম, আমার আমি আমি নয়, জড় দেহ নয়, চিন্ময় বস্তু। জড়দেহ হইতে স্বতন্ত্র। জড়ে আবদ্ধ থাকিলেই ধড়ফড় করে, অশান্তি বোধ করে, প্রায়ই রোগ ভোগ করে। বদ্ধ হাওয়া তার অসহ্য। বাড়ীর বাইরে ফাঁকা হাওয়ায় থাকে ভাল। সাগরের মুক্ত বাতাস সেবন করিতে, কি আকাশ আকাশযানে উঁড়িতে পাইলেই, অধিক সুস্থতা ও শান্তি অনুভব করে। সংসারের অলিগলির দুর্গন্ধে তার প্রাণ হাপু হাপু করে অপরিচিত লোকের সঙ্গে মিশিতে মুখে কথাই বাহির হয় না, সর্ব্বক্ষণ আপনার লোক আত্মীয় অন্তরঙ্গের সঙ্গে থাকিতেই ভাল লাগে। মনের মানুষ পাইলে স্ফূর্ত্তির সীমা থাকে না। নিত্য আমোদ আহ্লাদ, উৎসব, খেলা ধুলা, ভোজ পাইলেই খুসী। এ ব্যক্তি আমাকে দেখিলেই কিন্তু চটিয়া যায়, আমাকে দেখিলেই গম্ভীর হয়। আর পাঁচজনের সঙ্গে বেশ থাকে, আমার সঙ্গে যেন অন্য রকম হইয়া যায়। কি জানি, আমিতে আমিতে কেন এত বিবাদ! কবে এ বিবাদ মিটিবে, কবে সদ্ভাব হইবে? এই ব্যক্তিই আমি হব?

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র।

(৮ই জানুয়ারী, ১৯৩৩, সাম্বৎসরিক মৃত্যুদিন উপলক্ষে, রেঙ্গুন ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে শ্রীমতী মুক্তা রুদ্র কর্ত্তৃক পঠিত)

রজনীর শেষে উষার প্রথম জ্যোতিরুন্মেষের ন্যায় রাজা রামমোহন প্রথম 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' মন্ত্র ঘোষণা করিয়াছিলেন যে দেশে; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঋষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন যে দেশে; পাগলা নিমাই আপনি পাগল হইয়া দেশশুদ্ধ ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছিলেন, আপনি চোখের জলে ভাসিয়া সকলকে কাঁদাইয়া আকুল করিয়াছিলেন যে দেশে; রামকৃষ্ণ পরমহংসের সরল অনাড়ম্বর জীবন একটী পদ্মফুলের মত বুকভরা মধু লইয়া, দেশ বিদেশ দূর দূরান্তর সৌরভে আমোদিত করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে দেশে—সেই দেশে, সেই আকাশের তলে, সেই জলে মাটিতে গত শতাব্দীতে আর একটী সুন্দর জীবন ফুটিয়াছিল, আর একটী বিশাল প্রাণ স্পন্দিত হইয়াছিল, আর একটী বিশ্বাসী ব্যাকুল আত্মা জাগিয়াছিল, আর একটী বাণী উত্থিত হইয়াছিল, যাহাতে সকল যুগের সকল দেশের সাধক ও ভক্তের কথার প্রতিধ্বনি শোনা গিয়াছিল।

প্রকৃতির নানা বিচিত্রতার মধ্যে আশ্চর্য্য অদৃশ্য এক শক্তির লীলা দেখিয়া মুগ্ধ বিস্মিত ভীত মানুষ প্রথমে প্রকৃতি পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আমরা প্রকৃতিকে পূজা দিই না; কিন্তু যে কৌশলী যাদুকর প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে মায়ার পর মায়ার জাল বুনিতেছেন, তাঁহাকে আমরা প্রণাম করি। জড় শক্তির কারখানায় দৈবশক্তির বিকাশ দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়া চাহিয়া থাকি। কিন্তু যেদিন মানবজীবনে সেই দৈবশক্তির বিকাশ দেখিতে আসি, সেদিনই আমাদের মহা উৎসবের দিন।

অনেক দিন আগে এমন একটি দিনে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। আজ সেই ঘটনা স্মরণ করিয়া এখানে সকলে মিলিত হইয়াছি। এই মহাপুরুষকে পাওয়া যখন আমাদের দেশের দরকার ছিল, তখনি ভগবান্ তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন; কিন্তু যখন তাঁহাকে তুলিয়া লইলেন, তখন কি দেশের পক্ষে তাঁহার প্রয়োজন ফুরাইয়া গিয়াছিল? বয়সের মধ্য পথে, জীবনের মধ্যাহ্নেই তিনি বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন না কি? কিন্তু

সেই আধখানা জীবনেই তিনি জীবনের পূজা সমাপ্ত করিয়া গিয়াছিলেন। জীবন-দেবতার প্রসাদ জীবন ভরিয়া পাইয়া ছিলেন; এবং সংসার হইতে বিদায় লইবার সময় শিষ্যদের হাতে সেই একমাত্র সম্পদ্ সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। যাহা বলিবার বলিয়া গিয়াছেন, যাহা করিবার করিয়া গিয়াছেন, যাহা দিবার দিয়া গিয়াছেন, যাহা দেখাইবার দেখাইয়া গিয়াছেন।

কেশবচন্দ্রের সমস্ত জীবনবৃত্তান্ত আমি আলোচনা করিব না, —পারিবও না। আমি মূর্খ মেয়ে, ইতিহাস আমার জানা নাই, জীবনচরিত সমালোচনা করিবার মত বুদ্ধি বিবেচনা কিছুই নাই। আমি দরিদ্র, আমি সঞ্চয় করিতে পারি নাই, আমি কি দান করিব? তবু আসিয়াছি, আমার সতীর্থ ধর্ম্মবন্ধুদের মেলায়, আমার শ্রদ্ধাস্পদ জ্ঞানবৃদ্ধ সমাজপতিদের সভায়—আমি আমার শিক্ষার্থী জিজ্ঞাসু মন লইয়া সসঙ্কোচে সবিনয়ে সকলের মধ্যে একটু ঠাঁই করিয়া লইয়াছি, আমিও কিছু দিতে চাই বলিয়া। এই শ্রাদ্ধবাসরে আমার অতি সামান্য একমুঠি সঞ্চয় সেই মহান্ আত্মাকে স্মরণ করিয়া উৎসর্গ করিয়া দিব। এই ভারতের আকাশে একদিন যে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক উদিত হইয়াছিল, এক ভক্ত পুরুষ নিজের জীবনকে বিশ্বেশ্বরের দেবালয়ে আরতির দীপ করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য কয়েকটী শ্রদ্ধাশীল চিত্ত যে দীপাবলী জ্বালাইয়া আজ পূজার আয়োজন করিয়াছেন, আমিও তাহার মধ্যে আমার ক্ষুদ্র দীপশিখাটুকু আনিয়াছি। কালের সাগরের এ পারে দাঁড়াইয়া ওপারের উদ্দেশে আমার প্রদীপ ভাসাইয়া দিব।

আমাদের এ যুগের ধর্ম্মজীবন, আমাদের এ যুগের সামাজিক জীবন, গত যুগের কেশবচন্দ্রের নিকট অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী। তিনি যে অধিকার, যে স্বাধীনতা, যে উদার বিশ্বজনীন ধর্ম্ম দান করিয়া গিয়াছেন, যে অমৃতউৎসের সন্ধান বলিয়া দিয়াছেন, এ দেশ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া তাঁহারই সাধনা করিবে। যুগগুরু রাজা রামমোহন রায় যে আদর্শ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, এই তেজস্বী বীরপুরুষ তাহাকে নিজের জীবনে অনুষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইঁহাকে সত্যবীর অথবা ধর্ম্মবীর বলা যায়। উচিত বলিয়া, ধর্ম্ম বলিয়া, যাহা বুঝিয়াছিলেন, বিরোধ বিদ্রোহ—গুরুজনের বিরাগ, প্রিয়জনের অসন্তোষ—সব অগ্রাহ্য করিয়া তাহাকেই শিরোধার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার এই চরিত্রই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহার এই চরিত্রই আমাদের সমাজের শরীর হইতে জাতিবর্ণভেদ রূপ কুসংস্কারের আগাছা উৎপাটিত করিয়া দিয়াছে, নারীগণের ধর্ম্মচর্চ্চার পথ সরল করিয়া দিয়াছে।

তাঁহার চরিত্রের আর একটা বিশেষত্ব ছিল যে, তিনি আজীবন ছাত্র ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, এমন কোন লোকের সংস্পর্শে তিনি আসেন নাই, যাহার নিকট হইতে তিনি কিছুই আকর্ষণ করিয়া লন নাই। অপরের সাধুভাব তিনি সহজেই আত্মসাৎ করিতে পারিতেন। বেদ বাইবেল কোরাণ পুরাণের সমন্বয় তাঁহার জীবনে ঘটিয়াছিল। তাঁহার জীবনের প্রাঙ্গণে ঈশা, মুষা, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য এক চন্দ্রাতপতলে মিলিত হইয়াছিলেন। রাজা রামমোহন সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের দৈববাণী ঘোষণা করিয়া গিয়াছিলেন—কেশবচন্দ্রের জীবনে বিভিন্ন কালের বিভিন্ন ধর্ম্মমতসাধনার একত্র সমাবেশ প্রত্যক্ষ হইল। এই একটী আশ্চর্য্য জীবন—যাহাতে খৃষ্টের প্রার্থনাপরায়ণতা, পাপ-বোধ ও ক্ষমাভিক্ষার ভাব, বুদ্ধের কঠোর তপস্যা ও বিবেকামুগত্য, এবং শ্রীচৈতন্যের ভক্তি, প্রেম ও অশ্রুর বন্যা—এই সমস্ত ভাবগুলি পাশাপাশি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। একটী ভাবের আওতায় পড়িয়া আর একটী ভাব শুকাইয়া যায় নাই,—সবগুলিই সমান বিকাশ লাভ করিয়াছিল। অপূর্ব্ব! চমৎকার!!

কতকগুলি অমানুষিক শক্তি ও গুণ সঙ্গে লইয়াই তিনি পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার আকৃতি যেমন মনোহর ছিল, তাঁহার প্রকৃতিও তেমনি মুগ্ধকর ছিল। কি যেন যাদু-মন্ত্রের প্রভাবে তিনি মানুষের হৃদয় বশ করিতেন। তৎকালীন বাঙ্গালী সমাজের মনোবৃত্তির গতি, চিন্তার ধারা, ধর্ম্মসাধনার রূপ সবই তিনি সহসা বদলাইয়া দিলেন। কে ভাবিতে পারিয়াছিল, নব্যশিক্ষিত মার্জ্জিতবুদ্ধি পাশ্চাত্য-সভ্যতার ছাপ-মারা যুবকগণ ছোটলোকদের মত কেবল করতাল লইয়া রাস্তায় রাস্তায় দল বাঁধিয়া গান করিবেন? কে কল্পনা করিতে পারিত, দেশের ইংরাজীশিক্ষিত সংশয়ী অবিশ্বাসী নাস্তিক ভদ্রলোকেরা আবার ঐ খোল করতালের সংকীর্ত্তনে মাতিয়া চোখের জল ফেলিবেন? কেশবচন্দ্র কি দেখাইলেন? কেশবচন্দ্র দেখাইলেন, অনেক দিন আগে গৌরাঙ্গ যে জাতিনির্ব্বিশেষে প্রেমের বন্যা বহাইয়া দিয়াছিলেন, হরিনামের বীজমন্ত্র দান করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা কেবল ইতিহাসের পাতায় বাঁচিয়া থাকিবার জন্য নয়, তাহার প্রয়োজন ও তাহার কার্য্যকারিতা অতীত হয় নাই। কেশবচন্দ্র বুঝাইয়া দিলেন যে, বুদ্ধদেব বহুকাল পূর্ব্বে গাছের তলায় বসিয়া যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন—সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া অর্দ্ধ জগৎ নতমস্তকে যাহা স্বীকার করিয়াছে—আরও সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া সমস্ত জগৎ তাহারই সাধনা করিবে, তবু তাহার প্রয়োজন কোন দিন ফুরাইবে না। তবু তাহার সত্য কোনদিন মরিবে না। মনুষ্যত্ব ধর্ম্মকে বাদ দিয়া কোন দেশে, কোন কালে, কোন ধর্ম্ম পালন করা যায় না। কেশবচন্দ্র দেখাইলেন, দূর দূরান্তরে পৃথিবীর অপর প্রান্তে যে মনুষ্য জাতি বাস করে, যাহাদের আকৃতি প্রকৃতি, যাহাদের আহার বিহার, যাহাদের ভাষা ব্যবহার সকলই ভিন্ন, সকলই বিপরীত, সেইখানেও ধর্ম্মপ্রচারকগণ যে উপদেশ দেন, সে দেশেরও ধর্ম্মগ্রন্থগুলি যাহা বলে, আমাদের হিন্দুর ধর্ম্মকে তাহা মারে না। ধর্ম্ম তো ধর্ম্মকে আঘাত করে না। সত্য তো সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করে না।

প্রত্যেক লোকের জীবনে এমন একটী ক্ষণ আসে, যখন সে অনুভব করে যে, ইহ জীবনই তাহার সর্ব্বস্ব নয়, এই সংসার তাহার গৃহ নয়, পথ মাত্র। দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার লঙ্ঘন করিয়া তাহাকে অগ্রসর হইতে হয়, অন্তরের প্রদীপে বিশ্বাসের অগ্নিকণা সংযোগ করিয়া। কে পথ বলিয়া দেয়? কে ভরসা দেয়? কে হাত ধরে? তাই তো মানুষ শাস্ত্র লেখে, তাইতো মানুষ শাস্ত্র অন্বেষণ করে, তাইতো মানুষ (ধর্ম্ম) সমাজ স্থাপন করে, তাইতো মানুষ মণ্ডলী গঠন করে। যেন একজন পড়িয়া গেলে আর একজন সাবধান করিতে পারে, যেন ডাকিলে পরস্পরের নিকট হইতে সাড়া পাওয়া যায়, যেন একজনের সংস্পর্শে আর একজন বললাভ করিতে পারে, যেন একজনের প্রভাবে আর একজন সঞ্জীবিত হইতে পারে। কিন্তু সেই প্রভাব যে কতদূর বিস্তৃত হইতে পারে, একটী হৃদয়ের আহ্বান কত সাগর বন প্রান্তর পার হইয়া আর একটী সমবিশ্বাসী হৃদয়ের দুয়ারে আঘাত করিতে পারে, একটী প্রাণ-স্পন্দন যে শত যোজন দূরস্থিত আর একটী প্রাণ-তন্ত্রীতে সঞ্চারিত হইতে পারে, ইহার সম্ভাবনা কে কল্পনা করিতে পারিত? ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ধর্ম্মজীবনে এমন একটী কেন্দ্র পাইয়াছিলেন, যেখান হইতে সাত সমুদ্র তের নদীর পারে তাঁহার বার্ত্তা প্রেরণ করিতেন, ডাকিলেই সাগর পার হইতেও সাড়া পাইতেন। অতীতে ভবিষ্যতে দূর দুরান্তে মানুষ যে হৃদয়ে হৃদয়ে পরস্পরে গাঁথা হইয়া আছে, ইহাই তিনি প্রমাণ করিলেন। তিনি সূর্য্যের মত বিপুল বলে আপন পার্শ্বচরগণকে আকর্ষণ করিতে পারিতেন; তিনি সূর্য্যের মত আপনার সহজ উত্তাপে চতুর্দ্দিক উত্তপ্ত করিয়া তুলিতে পারিতেন।

তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের আর একটা দিক ছিল প্রার্থনা। কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন, তাঁহার জীবনের প্রথম ও প্রধান কথা প্রার্থনা। প্রার্থনাই তাঁহার গুরু, প্রার্থনাই পথপ্রদর্শক, প্রার্থনাই তাঁহার বন্ধু, প্রার্থনাই সহায়, প্রার্থনাই একমাত্র সম্বল ছিল। কি আশা, কি বিশ্বাসই তিনি পাইয়াছিলেন! তিনি বলিতেন, আমার বিশ্বাসের হিমালয় আছে, আমার ভক্তির সরোবর আছে, আমার ভয় নাই। ধন্য তিনি, যিনি পরিপূর্ণ বিশ্বাসে, পরিপূর্ণ ভক্তিতে, পরিপূর্ণ প্রেমে, একান্ত দীনতায়, একান্ত আনুগত্যে, ইষ্টদেবতার পায়ের তলে আপনার সমস্ত জীবনটী সমর্পণ করিয়া দিতে পারেন। ধন্য তিনি, একখানি জীবনের প্রদীপ তুলিয়া জীবন-দেবতার মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া যিনি সংসার ভুলিয়া যাইতে পারেন। ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা বিধাতাকে পিতা রূপে স্বীকার করেন, বিশ্বকর্ম্মাকে বন্ধু বলিয়া ডাক দিতে পারেন। তাঁহারা কি ধন পাইয়া পৃথিবীর ধন সম্পত্তিকে অবহেলা করেন, কি ভালবাসার সংবাদ পাইয়া পৃথিবীর বন্ধুত্ব, সমাজের বন্ধুত্ব উপেক্ষা করেন, কিসের লোভে পার্থিব খ্যাতি প্রতিপত্তির প্রতি ভ্রূক্ষেপের দ্বারা অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন; কোন্ প্রেরণায় তাঁহারা অসাধারণ কাজ করেন, অসম্ভব কথা বলেন, কাহার নির্দ্দেশে তাঁহারা যুক্তি তর্ক উড়াইয়া দিয়া সৃষ্ট ছাড়া পথে চলেন, সাধারণ লোকের সহজ বুদ্ধিতে তাহা কিছুতেই বোধগম্য হয় না। রহস্য ভেদ করিতে না পারিয়া লোকে তাঁহাদের গালি দেয়, সমালোচনা করে, অবজ্ঞা করে, উপহাস করে। কিন্তু এ সমস্তকে উপেক্ষা করিবার মত শক্তিও তাঁহাদের থাকে। সাধারণ দশজনের মতামতের তুলাদণ্ডে তাঁহাদের বাক্য ও কার্য্য ওজন করা চলে না। ব্যতিক্রম লইয়াই তাঁহারা সংসারে আসেন। লোকে যখন বিরুদ্ধতা করে, তাঁহারা ধৈর্য্য সহকারে অপেক্ষা করেন,—যাহারা পাগল বলিয়া বিদ্রূপ করিতে থাকে, তাহাদের প্রসন্নচিত্তে আশীর্ব্বাদ করিয়া যান।

এই অবিচলিত নিষ্ঠা, এই অটল বিশ্বাস, এই অহৈতুকী ভক্তি, এই অপরিসীম ধৈর্য্য, এই উচ্ছলিত প্রেম, এই অগাধ আনন্দ, এই অনন্ত বেদনা, আমরা ধারণা করিতে পারি না; আমাদের ভাণ্ডারে এত কুলায় না, আমাদের অন্তর সংকীর্ণ, আমাদের হৃদয় অপ্রশস্ত। কিন্তু এই মূর্ত্তি কি আমরা চিনি না? এই রূপই কি তপস্বী ভারতবর্ষের, সাধক ভারতবর্ষের সনাতন রূপ নয়? চিরকাল ধরিয়া এই শক্তিই কি আমাদের আকর্ষণ করিয়া লইতেছে না? চিরকাল এই মূর্ত্তির সম্মুখেই কি আমাদের দেশ মাথা নত করে নাই? আজও কি তাহাই করিব না? আজও তো শক্তি সংগ্রহ করিতে আসিয়াছি। আমাদের কর্ম্মব্যস্ত মুখর চঞ্চল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দিনগুলির মধ্যে যাহার দেখা পাই না, আমাদের প্রতিদিনকার সুখ সুবিধার হরেক রকম আয়োজন প্রয়োজনের স্তূপের মধ্যে যাহাকে ঠাঁই দিতে পারি না, আজ একটী বিশেষ তিথি, বিশেষ লগ্নে, সেই শক্তি-সন্ন্যাসীর অভ্রভেদী মহিমাকে, সেই বিরাট মনুষ্যত্বকে একটী প্রণাম নিবেদন করিয়া দিতে আসিয়াছি। একটী মুহূর্ত্তের জন্য সব মুখরতা নিস্তব্ধ হইয়াছে, সব চঞ্চলতা স্থির হইয়াছে, সব তর্ক নীরব হইয়াছে, সব অবিশ্বাস লজ্জিত হইয়াছে, সব বিজ্ঞতা বিনীত হইয়াছে। গৃহে ফিরিবার সময় এখান হইতে আজ এক কণা ভক্তি ভিক্ষা লইয়া যাইব, যাহা আমাদের জীবনের সকল ক্ষতি, সব দুঃখ শোক সার্থক করিয়া তুলিবে;—বিশ্বাসের একটী স্ফুলিঙ্গ সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইব, দুঃখ দুর্দ্দিনের সংগ্রামে যে রক্ষা করিবে;—এক অঞ্জলি শান্তিবারি মাগিয়া লইব, যাহা অঙ্গনে ছিটাইয়া দিলে আমাদের সংসারের দাহ জুড়াইবে।

(১লা আষাঢ়ের তত্ত্বকৌমুদী হইতে গৃহীত)

যৌবনের স্বপ্ন।

এখনও মনে আছে, যখন আমার বয়স ১৪।১৫ বৎসর তখন কঠিন উদরাময় রোগে আক্রান্ত হই। ৫।৬ বৎসর ক্রমাগত

শয্যাগত, লেখাপড়া ত দূরের কথা, বাড়ীর সকলেই আমার জীবনের বিষয়ে নিরাশ হইলেন; বিশেষতঃ আমি যে কখন জীবনে কর্ম্মক্ষম হইব, এ কথা কেহ মনে করিতে পারেন নাই। ক্রমে ক্রমে ভগবানের কৃপায় কিছু সুস্থ হইলাম; পিতা ও খুল্লতাত মহাশয় স্থির করিলেন যে, ইহার দ্বারা আর পড়াশুনা হইবে না, কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করা হউক। বিখ্যাত ব্যারিষ্টার স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত এ পরিবারের জ্ঞাতিসম্পর্ক ছিল এবং খুল্লতাত মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতাও ছিল। তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, তাঁহার আফিসে আমাকে নিযুক্ত করা হইবে। এ কথাটা আমার মনকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। আমি বিছানায় পড়িয়া ক্রমাগত স্বপ্ন দেখিতেছি—কখন সহস্র লোকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমি বক্তৃতা করিতেছি, কখন ব্রাহ্মণ-কন্যাদিগের উপর কৌলীন্যের নির্য্যাতন-নিবারণকল্পে ব্রাহ্মণ-দিগের সহিত সংগ্রাম করিতেছি, কখন লোকাচারের বিরুদ্ধে শাস্ত্র-বাক্য সংগ্রহ করিয়া সমাজসংস্কার করিতেছি, কখন জাতিবৈষম্য দূর করিবার জন্য দেশে দেশে প্রচার করিতেছি। আমার জীবন একটা অবিশ্রান্ত স্বপ্নের লহরী হইল—স্বপ্নের বিচ্ছেদ নাই—বিরাম নাই। স্বপ্নের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া এক অজানা অচেনা জগতে জীবনের গতি নির্দ্দেশ করা, আর মরণের পথে অগ্রসর হওয়া একই কথা। স্বপ্ন আমাকে পরিত্যাগ করিল না—আমিও স্বপ্নের কুহকে পড়িয়া খুল্লতাতের কথা অস্বীকার করিলাম।

পিতার অনুমতি লইয়া কলিকাতা আসিলাম। কলিকাতার প্রথম অভিজ্ঞতা অতিশয় ভীষণ—ঘরে বাহিরে যে সকল সঙ্গী পাইলাম, তাহাদের হাবভাব, কথাবার্ত্তা, আলাপ পরিচয়, চাল চলন আমার প্রাণে নরকের একটা কলুষিত মূর্ত্তি অঙ্কিত করিল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলাম। আমার বাল্যবন্ধু নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের সহিত দেখা করিলাম, তিনি আমাকে পাইয়া খুব আশ্চর্য্য হইলেন, আনন্দিত হইলেন। আমিও পুরাতন বন্ধু পাইয়া যারপর নাই সুখী হইলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রায় প্রতিদিনই দুজনে মিলিতাম। তিনি কলেজস্কোয়ারে, হেদুয়ায় বা বিডন পার্কে এবং কোন কোন দিন গঙ্গার ধারে ধর্ম্মবিষয়ে বক্তৃতা করিতেন আমাকেও সঙ্গে লইয়া যাইতেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের বিশ্বাস, সাধনপ্রণালী ও সাধুচরিত্র বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন, বেশ বক্তৃতা হইত। ইহার পূর্ব্বে অল্পবয়স্ক যুবকের মুখে এমন সুন্দর বক্তৃতা আমি আর পূর্ব্বে শুনি নাই। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে, তিনি আমাকে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিতেন। আমি কখনও বক্তৃতা করি নাই, তাহার পর আমি ব্রাহ্মসমাজের কথা কিছুই জানিনা এবং ইহার সাধন-প্রণালীও অবগত নহি; আমি কি বলিব? একটু বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতাম, আমার স্বপ্ন আমার সহায় হইত। আমি ৫।৬ বৎসর রোগশয্যায় পড়িয়া যে সকল স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহাই স্মরণ করিতাম। স্বপ্নে ধর্ম্মসংস্কারের যে সকল চিত্র দেখিয়াছি, স্বপ্ন আমাকে সমাজের হিতকল্পে যে সকল নব নব প্রতিষ্ঠানের সূচনা করিয়া, যজ্ঞসম্পাদনের জন্য আমাকে ঋত্বিকের পদে বরণ করিত, দেখিয়াছি, স্বপ্ন আমাকে কৌলীন্যের অভিশাপ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য যে সকল বাণী দান করিত আমি তাহারই কথা বলিতাম। নগেন্দ্রবাবুর বক্তৃতা ধর্ম্মবিষয়ক—আমার বক্তৃতা সমাজবিষয়ক। তাঁর বক্তৃতা ভক্তিতে সরস, আমার বক্তৃতায় ভক্তির কথা থাকিত না; তবে আমি আমার স্বপ্নের এক একটী চিত্র, যতদূর সম্ভব, ভাষার সাহায্যে উজ্জ্বল করিয়া শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে ধরিতাম। তাঁহারা আকৃষ্ট হইতেন। আমার বন্ধুও তাহাতে মুগ্ধ হইতেন। এজন্য তিনি আমাকে তাঁহার সহকর্ম্মিরূপে গ্রহণ করিলেন, উভয়ের মধ্যে মণিকাঞ্চনের যোগ উপস্থিত হইল।

তিনি আমাকে শ্রীকেশবচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত "আশার দলে" (*Band of Hope*) লইয়া গেলেন। ব্রহ্মবিদ্যালয়ে লইয়া গেলেন। শ্রীকেশবচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্রের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ের পরীক্ষার দিন পরীক্ষার্থিরূপে ভাই নগেন্দ্রচন্দ্রের সহিত একদিন উপস্থিত হইলাম। আমার উপর—"আদেশ কাহাকে বলে?"—এই প্রশ্নের উত্তর দান করিবার ভার অর্পিত হইল। আমি বিদ্যালয়ের ছাত্র নহি, এ সকল বিষয় কখন চর্চ্চাও করি নাই, কি লিখিব? স্বপ্ন আমার সহায় হইল—স্বপ্নের ঘোরে দুই এক কথা লিখিয়া দিলাম। আচার্য্যদেব দেখিয়া সস্নেহ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইলেন। সেই দৃষ্টি আমাকে চিরদিনের জন্য বাঁধিয়া রাখিল। আচার্য্যদেব যখন নববিধান ঘোষণা করিলেন, তখন ব্রাহ্মসমাজে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এলবার্টহলে (পুরাতন) প্রতিবাদসভা করিয়া বক্তৃতা দান করিতেন। নগেন্দ্রবাবু তাহা খণ্ডন করিতেন। নগেন্দ্রবাবুর বক্তৃতা সুযুক্তিপূর্ণ, প্রাঞ্জল ও সুমিষ্ট হইত। এরূপ তিন চারিটী বক্তৃতা হয়। বক্তৃতাগুলি তখন-কার ধর্ম্মতত্ত্বে ছাপা হইয়াছিল কিনা, মনে নাই; তবে দুই একখানি ছোট পুস্তিকায় তাহা বাহির হইয়াছিল বলিয়া আমার স্মরণ হয়। সেগুলি পাওয়া গেলে, ভবিষ্যৎ বংশ যখন নববিধানের প্রাচীন ইতিহাস লিখিবে, তখন কাজে আসিবে।

"আশার দলে" (*Band of Hope*) যোগদান করিয়া এবং ঋষি প্রতাপচন্দ্রের বক্তৃতা শুনিয়া, আমাদের মনে অসাধারন উৎসাহ হইল। ভাই নগেন্দ্রচন্দ্র ও আমি উভয়ে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, মদ্যপাননিবারণকল্পে এমন কিছু করা চাই, যাহাতে অচিরে এই ভীষণ পাপ দেশ হইতে দূরীভূত হয়। আমাদের শক্তি, সময় ও চিন্তা মিলিত হইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে, সহরের মদের দোকানগুলিকে আক্রমণ করিতে হইবে। প্রথম যৌবনের অদম্য উৎসাহ, কোন বাধা না মানিয়া, অভিধানের মধ্যে যত কঠোর শব্দ ছিল তাহা সংগ্রহ করিয়া, মদ্যপায়ীদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিবার জন্য মদের দোকানে সম্মুখে গিয়া বক্তৃতার মেসিনগন (*Machine Gun*) ছাড়িলাম। শত্রুরা অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত

হইয়া "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল। আমরা বক্তৃতার গোলাগুলি ছাড়িতে লাগিলাম, তাহারা ছোট ছোট ইট ও প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া আমাদের উপযুক্ত উত্তর দান করিল। প্রহার খাইয়া আমাদের উৎসাহ শত গুণ বর্দ্ধিত হইল। আমরা সহরের যে সকল দোকানে যাইয়া বক্তৃতা করিতে লাগিলাম, সেখানেই কোথায় লোষ্ট্র নিক্ষেপ, কোথায় কর্দ্দমাক্ত জল সর্ব্বাঙ্গে সেচন, কোথায় অশ্লীল গালিবর্ষণ, কোথায় নানাবিধ অপমান ও লাঞ্ছনা দ্বারা পুরস্কৃত হইতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে সংগ্রামের গতি ফিরিয়া গেল, লোকেদের মনে দয়ার সঞ্চার হইল। এক্ষণে একদল লোক যখন আমাদের মারিতে আসিত, তখন তাহাদেরই মধ্যে আর একদল তাহাদের বিরোধী হইত, তাহাদের বাধা দিত। উভয় দলে মারপিট চলিত, আমরা দুঃখের সহিত স্থান পরিত্যাগ করিতাম। এখনকার দিন হইলে আমরা *Ordinance* এ গ্রেপ্তার হইতাম, অথবা জেলখানায় বাস করিতে হইত। আমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টা যে একেবারে নিষ্ফল হইল, একথা বলিতে পারি না। কোন কোন স্থলে কিছু কিছু উপকার দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল।

প্রাতঃকালে একদিন গঙ্গার ঘাটে বহুলোক স্নান করিতেছে, আমরা উভয়ে তথায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। ঘাটে সকলেই প্রায় হিন্দুস্থানী, আমরা হিন্দি জানিনা; তথাপি ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দিতে গঙ্গাস্নানের অসারত্ব প্রতিপন্ন করিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলাম। বক্তৃতার দুই এক কথা এখনও মনে পড়ে, কেন না, তাহা চিরদিন মনে থাকিবারই কথা। আমি যাহা বলিলাম যে, "ভক্তিগঙ্গামে স্নান করনেসে পরিত্রাণ হোতা হ্যায়, ইস গঙ্গামে কিছু নাই হোতা হ্যায়", অমনি ৫।৭জন হিন্দুস্থানী আমাদের নিকট দৌড়াইয়া আসিল, আর আমাদের জলে ডুবাইয়া মারিবে বলিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। নগেন্দ্রবাবু তাহাদের হাত ছিনাইয়া চলিয়া গেলেন, আমাকে একবুক জলে লইয়া গিয়া বলিল যে, "মার ডালে গা" "আগর এসা কাম আউর নেহি করোগে তো ছোড় দেঙ্গা।" আমি বলিলাম যে, "কভি নেহি বোলেগা"। আমাকে ডুবাইয়া ধরিতে চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় কতকগুলি লোক আসিয়া আমাকে উদ্ধার করিল। বিধাতার সাক্ষাৎ কৃপার হস্ত যেন স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া জীবন রক্ষা করিল, আমি দিব্য চক্ষে দর্শন করিলাম। ইহাতে আমাদের বিশ্বাস শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। আমরা অবসর ও সুযোগ পাইলেই বড়বাজারের গঙ্গার ঘাটে এরূপ বক্তৃতা করিতাম। ক্রমে ক্রমে বহুলোক আমাদের বক্তৃতা শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিত। কলেজ স্কোয়ার প্রভৃতি স্থানেও একদল ছেলে আমাদের অপমান করিত এবং মধ্যে মধ্যে মারিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিত; আর একদল আমাদের বন্ধু হইয়া রক্ষা করিত। এইরূপ অপমান ও নির্য্যাতনের মধ্য দিয়া আমরা মদ্যপান-নিবারণ-কল্পে ও ছাত্রমণ্ডলীর নৈতিক জীবন উন্নত করিবার জন্য বহু বৎসর ধরিয়া এইরূপ কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিয়া ছিলাম। অবশেষে কতকগুলি ছাত্রের সহিত আমাদের বন্ধুতা হইল, তাহারা আমাদের সহায়রূপে অনেক কার্য্যে যোগদান করিতে লাগিল। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার ভিতর দিয়া বিধাতা আমাদের জীবনকে অগ্রসর করিতে লাগিলেন। আমার জীবনের স্বপ্ন কিছু কিছু বাস্তব জীবনে আকার গ্রহণ করিতে লাগিল দেখিয়া, আমার আনন্দ রাখিবার স্থান রহিল না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—•—

চয়ন।

(স্বর্গগত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের "Heart-Beat's" হইতে গিরিধির শ্রীযুক্ত ডি, এন, মুখার্জি কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

Christ—হে দেবনন্দন, তুমি সিংহশাবকের মত মহা-তেজস্বী ছিলে। তোমার কাজ করিবার শক্তি যেমন অদ্ভুত ছিল, তোমার দুঃখ কষ্ট সহ্য করিবার শক্তি তেমনি অদ্ভুত ছিল। তোমার কথার বল যেমন আশ্চর্য্য ছিল, নীরবে লাঞ্ছনা অত্যাচার বহন করিবার বলও তোমার তেমনি আশ্চর্য্য ছিল। মেষপালক যেমন দুর্ব্বল মেষশিশুকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া যায়, তুমি আমাকে সেইরূপে বহন করিবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। তুমি আমাকে তোমার প্রকৃতি দান করিয়া রূপান্তরিত কর।

Christ Unique—যীশুর সহিত কি অন্য কাহারও তুলনা হয়? তাঁহার চরিত্রের সাধুতা এবং তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস তাঁহাকে মানবজাতির সর্ব্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আবার যখন স্মরণ করা যায় যে, তাঁহাকে জীবনে কত লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল, এবং যে লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতনে অপরের হৃদয় তিক্ত ও কঠোর হইয়া যাইত, তাহা তিনি নীরবে সহ্য করিয়া অত্যাচারীদের প্রতি অসীম স্নেহ প্রেম প্রদর্শন করিয়া-ছিলেন—তখন তাঁহার সহিত তুলনা করিবার আর কাহাকেও দেখিতে পাই না। অবশেষে মহা গৌরবময় মৃত্যুতে তাঁহার দুঃখ কষ্টের অবসান হইল। যদি এইরূপেই তাঁহার জীবনলীলা ফুরাইত, তাহা হইলেও তিনি মানবেতিহাসের একটী উজ্জ্বলতম রত্ন বলিয়া পরিগণিত হইতেন। কিন্তু তিনি মৃত্যু হইতে উত্থিত হইয়াছেন এবং তাঁহার আত্মা যে এখনও পৃথিবীতে বর্ত্তমান, চারিদিকেই তাহার প্রমাণ দেখা যায়। মৃতেরা তাঁহার নাম লইয়া নবজীবন লাভ করিতেছে এবং জীবিতেরা তাঁহাকে ভক্তি করিয়া দিন দিন নব শক্তি প্রাপ্ত হইতেছে। সংসারে যত জ্ঞানী ব্যক্তি আছেন, যত মিষ্টপ্রকৃতির লোক আছেন, যত সাধু সজ্জন আছেন—যীশুর দীনতা ও বিনয় তাঁহাদের সকলের মাথার মুকুট। সকল প্রকার পাপ, তাপ, শোক ও বেদনা

তাঁহার ভাবে দেখিলে পবিত্র হইয়া যায়। পৃথিবীতে তাঁহার সহিত আর কাহার তুলনা করিব?

Jesus—সমগ্র মানববংশের মধ্যে তুমিই ধন্য, হে যীশু, তোমার কথা চিন্তা করিতে কি আনন্দ! দিনের পর দিন আমার মস্তক লক্ষ্য করিয়া যে লাঞ্ছনা ও অপমান বর্ষিত হইতেছে, সেই লাঞ্ছনা ও অপমানের জ্বালা নিভিয়া যায়, যখন ক্রুশকে চুম্বন করিয়া তোমার জয়গান করি। সংসারে যে মোহ ও মিথ্যার আবেষ্টন, তাহার মধ্যে তুমি সত্যরূপে বিরাজিত বলিয়া যখন স্বীকার করি এবং তোমার স্থাপন নির্য্যাতন হইয়াছিল, আমি তাহারই একটু অংশ পাইয়াছি প্রিয়নাথ মল্লিক মহাশয় কহিতে তখন আমি অপূর্ব্ব শান্তিলাভ করি। তুমি আরাধনাদি কর্ত্তা, তুমি মানবজাতির শিরোভূষণ, আমি তোমার আনন্দ লাভ করিতে কামনা করি। তোমার প্রাণে যে শান্তি ছিল, তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও যদি আমি পাই, আমি সকল নির্য্যাতন আনন্দের সহিত বহন করিব। তুমি মৃত্যু হইতে উত্থিত হইয়া এখন ভগবানের বক্ষে বাস করিতেছ। যাহারা তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহাদের হইয়া তুমি ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিও। আমরাও একদিন সেই পুণ্যধামে উপনীত হইয়া তোমাকে ভগবানের দক্ষিণ পার্শ্বে দর্শন করিব।

স্বর্গীয়া ভগিনী তারাসুন্দরী।

(শ্রাদ্ধবাসরে পাঠের জন্য প্রেরিত)

যে সূত্র লইয়া এই পরলোক-প্রস্থিতা ভগিনীর পরিবারের সঙ্গে আমাদের আত্মিক ও পারিবারিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, আজ সেই সম্বন্ধের ভিত্তিপ্রস্তরে যাঁহার নাম অঙ্কিত রহিয়াছে, তাঁহাকে প্রথমে প্রণাম করি। এই প্রস্তরে ভক্ত "কান্তিচন্দ্রের" নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত। কন্যা "শান্তিদায়িনী" এই পরিবারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, ভক্ত কান্তিচন্দ্র তাঁহার সুদীর্ঘ পত্রে আমাকে লিখিয়াছিলেন, "এই পরিবার নববিধানভক্ত এক বিশিষ্ট পরিবার। ইঁহাদের আচার, ব্যবহার ও নিষ্ঠা ব্রাহ্মণপরিবারের মত।" এই পত্র এই রাঁচি প্রবাসে অবস্থানকালে তাঁহার নিকট হইতে আসিয়াছিল। "সুবর্ণরেখার" বেলাভূমিতে বসিয়া ভক্ত কান্তিচন্দ্রের প্রত্যাদেশের ভিতর বিধাতার আলোক প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া, বিধাতার বিশেষ ইচ্ছায় কন্যাকে এই পরিবারে তাঁহারই নামে নিবেদন করিলাম। তাহার পর যতই এই পরিবারের সঙ্গে প্রেম, ভালবাসা ও বিশ্বাসের যোগে যুক্ত হইতে লাগিলাম, ততই দেখিলাম যে, ভক্ত কান্তিচন্দ্রের ভিতর দিয়া বিধাতার যে ইচ্ছা প্রকটিত হইয়াছিল, তাহা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইতেছে। যুবক-জীবনে পুস্তকে যে কৌলীন্যের লক্ষণ পাঠ করিয়াছিলাম, তাহা এই পরিবারকে দেখিয়া সর্ব্বদা মনে হইত।

"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠা বৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্॥"

আজ যাঁহার পবিত্র স্মৃতিতীর্থে উপস্থিত, তাঁহারই হৃদয়পটে এই লক্ষণের চিত্র অঙ্কিত। নববিধানে আসিয়া তাঁহার কৌলীন্য আরও ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার উপাসনা-প্রিয়তা পরিবারের ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। উপাসনা তাঁহার নিত্য নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান ছিল। উপাসনালয়ে যখন তিনি ও তাঁহার ভক্ত স্বামী হরপার্ব্বতীর ন্যায় বসিতেন, তখন তাঁহাদের সৌন্দর্য্য আরও ফুটিয়া উঠিত। উপাসনা তাঁহার জীবনে অন্ন-পানে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার সেই জীর্ণ দেহ তাঁহার সে পথের অন্তরায় হইতে পারে নাই। বিগত ১৯৩১ সালে বড় দিনের সময়ে তাঁহার নূতন ভবনে আমরা সদলে অবস্থান করিতে ছিলাম। তিনি সেই জীর্ণ দেহ লইয়া বাটীর ত্রিতল প্রদেশে উঠিয়া, উপাসনা-প্রকোষ্ঠে আমাদের উপাসনায় যোগদান করিতেন। এই সময়ে এই দেহ লইয়া তিনি কলিকাতায় মাঘোৎসবের উপাসনায় যোগদান করিয়াছেন। মহাভারতে লেখা আছে, "যে নারী পতির প্রতি অনুরক্তা ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া, আপনাকে সংযত করিয়া, নিত্য দুশ্চর ব্রত আচরণ করেন, তিনিই পতির ব্রতভাগিনী হয়েন।" আমাদের তপস্বিনী ভগিনী তাঁহার জীবনে তাহা সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

শ্রদ্ধাঞ্জলি।

(৬ই জুলাই, স্বর্গীয় প্রমোদকুমার সেনের শ্রাদ্ধবাসরে লিখিত শ্রদ্ধাঞ্জলি)

আজ শ্রীমান্ প্রমোদকুমারের শ্রাদ্ধের দিনে, মা, তোমার পরলোকবাসী সন্তানের অপেক্ষায় শ্রদ্ধাঞ্জলি লইয়া দাঁড়াইয়া আছি। তুমি একবার তাঁকে বুকে করে' আমাদের শোকার্ত্ত হৃদয়ে উদয় হইয়া আমাদের এই শোকাশ্রু আনন্দাশ্রুতে পরিণত কর। তোমার সেই সন্তানের অসাধারণ সহিষ্ণুতা, দৃঢ় বিশ্বাস, পূর্ণ নির্ভর এবং প্রফুল্ল বদন অন্তিমকালে তোমারই মহিমা প্রচার করিয়াছে। তুমি যে অকিঞ্চননাথ, আত্মারাম, প্রেমপ্রস্রবণ ও শান্তিনিকেতন, তা তিনি শেষ জীবনে হৃদয়ঙ্গম করিয়া, নির্ভয় নিশ্চিন্তচিত্তে আশাপূর্ণহৃদয়ে এ দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, তার কোন সংশয় নাই।

শ্রীমান্ প্রমোদের পরলোকযাত্রার দশদিন পূর্ব্বে, ১১ই জুন রবিবার বৈকালে ৫॥টার সময়, আমি তাঁহার নিকটে যাই। তখন তিনি তাঁর ঘরের দক্ষিণ দিকের বারাণ্ডায় লোহার খাটে বিছানার উপর পা ঝুলায়ে বসিয়াছিলেন। তাঁর কন্যা ভিজে গামছা দিয়ে তাঁর পা মুছাইয়া, অডিকলনের জল মাথায় দিয়া চুল আঁচড়াইয়া দিতেছিল। আমাকে দেখিয়া তিনি সাদরে তাঁর বিছানায় বসাইয়া বলিলেন:—"এই রোগে পড়িয়া আমি

সকলকে বড় কষ্ট দিতেছি। মা আমাকে ধোপার পাটে ফেলে আছড়াচ্ছেন। সাদা ধপ্‌ধপে করে' আমাকে নিয়ে যাবেন। অনেক ময়লা ধরেছিল কি না, তাই পরিষ্কার করিতে দেরী হচ্চে। কেচেকুচে সাদা ধপ্‌ ধপে হলেই তিনি তাঁর গাড়ী পাঠায়ে দেবেন, আমি সেই গাড়ী চড়ে' মার কাছে যা'ব। সেই প্রতীক্ষায় রসে' আছি।" এই বলে' তিনি "মা, মা, মা, মা বল, মা বল" মৃদু মধুর সুরে মা নাম গান করিতে লাগিলেন। আমিও তাঁর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলায়ে প্রাণ ঢেলে যোগ দিলাম। তাঁহার কল্যাণে, ইহপরকালের সন্ধিস্থলে বসিয়া, এক সঙ্গে মায়ের নাম করিয়া, নামামৃতের কিঞ্চিন্মাত্র আস্বাদনে কৃতার্থ হইলাম। পরে গান বন্ধ করিয়া বলিলেন, "আমি প্রায় সমস্ত রাত্রি বালিশ বুকে করিয়া মা মা করি, আর ভাবি, মা কবে আমার জন্যে গাড়ী পাঠাবেন।"

এই সাংঘাতিক পীড়াতে যদি কোন প্রকারে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে পারি ভাবিয়া তাঁর কাছে গিয়াছিলাম; কিন্তু তাঁর এই সকল কথা শুনিয়া আমার সকল অভিমান অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া গেল। দর্পহারী শ্রীহরি আমার সকল গর্ব্ব খর্ব্ব করিলেন। সেই দিন হইতে রোজই ভাবি, কবে আমি এইরূপ বিশ্বাস ভক্তি নির্ভরের সহিত এই দেহ ত্যাগপূর্ব্বক মায়ের সঙ্গে মায়ের গাড়ীতে চড়ে' হাস্‌তে হাস্‌তে ড্যাং ড্যাং করে চলে' যা'ব। আমার ভাগ্যে কি এমন দিন হ'বে? এ অভিমানীর প্রতি দীননাথের দয়া কি হবে?

শুনিলাম, উহার দুই চারি দিন পরে, তিনি ঐ ভাবের কথা আরও কয়েকজনকে বলেছিলেন। আরও শুনিলাম, একদিন অভ্যাগত মহিলারা অন্যত্র যাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময় গাড়ী আসিলে যখন তাঁহারা উঠিলেন, তখন তিনি বলিলেন, "এইরূপে আমার গাড়ী কবে আসিবে।" ২১শে জুন, যে দিন তিনি দেহত্যাগ করিবেন, সেইদিন সকালে শৌচান্তে ছোট ভাই শ্রীমান্‌ বিজনকুমারকে বলিলেন, "আজ আমি খুব ভাল আছি, কোন কষ্ট নেই, ডাক্তার আনিতে হবে না।" ইহার ২।৪মিনিট পরেই মাটীর দেহ মাটীতে রেখে, সকলকে কাঁদায়ে, মায়ের ছেলে মায়ের কাছে চলে' গেলেন।

অনেক দিন হ'তে এই সাংঘাতিক রোগযাতনা ভোগ করিয়া খুব কাহিল হ'লেও, কখন বিছানা ময়লা করেন নাই। নির্দ্দিষ্ট স্থানে শৌচাদি সম্পন্ন করিয়া কাপড় ছাড়িয়া শুদ্ধভাবে থাকিতে ভালবাসিতেন। ডাক্তারদের নিষেধ সত্ত্বেও, যে যখন তাঁহাকে দেখিতে আসিত, জানিতে পারিলে তখনই তাহাকে কাছে বসাইয়া আলাপ করিতেন এবং প্রয়োজন হইলে কোন কোন লোককে কাজ কর্ম্মের ব্যবস্থা বলিয়া দিতেন। মানা করিলে বলিতেন, "যে কয়দিন বেঁচে আছি, সে কয়দিন যদি আমার কথায় উহাদের কোন উপকার হয়, তো বল্‌বো' বই" বাল্যকাল হইতে তাঁর প্রাণ উদার ছিল, পরশ্রী দেখিয়া সুখী হইতেন, সংসারের প্রতি কখনই একটা টান ছিল না। স্বেচ্ছাচারী হইলেও ঐ সকল গুণে তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

যুগে যুগে কত দুষ্ট ছেলে শিষ্ট হ'য়েছে। তাঁহাদের জীবনের পরিবর্ত্তনে দেখি যে, সেই সেই যুগধর্ম্মবিধানপ্রবর্ত্তকদিগের প্রভাব উঁহাদের জীবনে প্রতিফলিত। বর্ত্তমান যুগধর্ম্মবিধানে, দুষ্টের পরিবর্ত্তনে দেখিলাম, কেবল মায়েরই মহিমা জাজ্বল্যমান স্বর্ণাক্ষরে তাহার হৃদয়ফলকে অঙ্কিত। আমার ন্যায় দুষ্ট ছেলেদের কত আশা, ভরসা, সাহস ও বিশ্বাসের প্রবর্দ্ধক।

প্রাতঃস্মরণীয় পরম ভাগ[illegible]য় রামকমল সেনের বংশধর, তুমি [illegible] শেষ [illegible] শ্রীক[illegible]হা দেখাইয়া গেলে, তাহা অ[illegible] —ভাগ্যে ঘটে না। কণামাত্র অভিমান থাকিতে কেউ [illegible]তে সর্ব্বস্ব সঁপিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। তুমি তোমার মাকে সকল ভার দিয়াছিলে বলিয়াই, তোমাকে তিনি সাদা ধপ্‌ধপে করে' এই মর্ত্তাধাম হইতে অমরধামে লইয়া গেলেন।

প্রমোদ! তোমার জন্য প্রার্থনা করিবার কিছু খুঁজে পাই না। তুমি এই মাটীর দেহ ফেলে এখান হ'তে চলে' গেছ বলে', আমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ যায় নাই। তুমি যেখানেই থাক না কেন, মায়ের কোলে আছ, সেখানে দেশকালের ব্যবধান নাই। মায়ের অনাদি, অনন্ত, অখণ্ড প্রেমসূত্রে আমরা সকলেই গাঁথা। তাই আকুলপ্রাণে তোমাকে বলিতে ইচ্ছা হয় যে, তুমি তোমার মাকে বলে' ক'য়ে, তাঁর সঙ্গে একবার চিদাকাশে চিদাভাসে উদয় হ'য়ে, আমাদের তাপিত প্রাণকে শীতল কর।

মাগো, তুমি অন্তরে থাকিয়া সব জানিতেছ। আমাদের মোহ আবরণ উন্মোচনপূর্ব্বক, অনুমান-আঁধার হইতে বর্ত্তমান-সত্যালোকে পরলোকবাসী প্রিয়জনদের সঙ্গে প্রকাশিত হও। ব্যাকুল হৃদয়ের এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। নিঃসংশয়চিত্তে প্রাণভরে বলি, ওঁ শান্তি! শান্তি! শান্তি!

প্রত্যক্ষদর্শী।

সংবাদ।

স্মৃতিমন্দির-প্রতিষ্ঠা—আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতিভাজন ভ্রাতা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার ভক্তিমতী সাধ্বী মাতৃদেবী (স্বর্গীয় পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কালীনাথ বসু মহাশয়ের স্বর্গীয়া পত্নী) স্বর্গীয়া কুমুদিনী বসুর স্মৃতিরক্ষার্থ পুরী বসন্তকুমারী বিধবাশ্রমে এক সহস্র মুদ্রা দান করিয়া, একটী পাঠাগার নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। আশ্রমের অধিনেত্রী শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীর উদ্যোগে এবং আহ্বানে, গত ১লা জুলাই, শনিবার, বিশেষ উপাসনা ও নবসংহিতার প্রার্থনা অবলম্বনে এই স্মৃতিমন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন ও প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন এবং লেডী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীমতী সুধাংশুবালা সেনের নেতৃত্বে

আশ্রমের ভগ্নীগণ মধুর স্তোত্র পাঠ ও সঙ্গীত করেন। দাতাকে ঈশ্বর অজস্র আশীর্ব্বাদ দান করুন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ১৬ই জুলাই, হাওড়া বাঁ্যাটরার, ৫৩নং কালীপ্রসাদ ব্যানার্জি লেনে, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাসের সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া তারাসুন্দরী দেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ পুত্রকন্যাগণ কর্ত্তৃক নবসংহিতামতে গম্ভীর ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। কীর্ত্তন করিতে করিতে পবিত্র ভস্মাধার সহ সমাধিস্থলে উপস্থিত হইলে, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ প্রার্থনা করিয়া পবিত্র স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ উক্ত ভস্মাধার সমাধিস্তম্ভে স্থাপন করেন। তৎপর কীর্ত্তনান্তে উপাসনা আরম্ভ হয়। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উদ্বোধন ও শান্তি বাচন করেন, ভাই অক্ষয়কুমার লধ আরাধনাদি করেন. তিন জনে সমস্বরে শ্লোক পাঠ করিলে ডাঃ সত্যানন্দ রায় শ্লোকব্যাখ্যা করেন। ভাই প্রিয়নাথ উদ্বোধন ও প্রার্থনায় পরলোকগতা মাতৃদেবীর সদ্‌গুণ উল্লেখ করিয়া, তাঁহার সুন্দর জীবনের প্রতি সকলের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করেন। পুত্রগণের লিখিত মাতৃ-দেবীর সুন্দর সংক্ষিপ্ত জীবনীটী জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত সত্যচরণ দাস কর্ত্তৃক পঠিত হয়। পুত্র, কন্যা ও পুত্রবধূগণ সকলে দণ্ডায়মান হইলে, জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ বিনয়কুমার দাস প্রধান শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করেন। বিধানমুরলী শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মধুরকণ্ঠে সঙ্গীত করেন। উপাসনার প্রথমে ও শেষে শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে সুন্দর কীর্ত্তন করেন। অনুষ্ঠানটী পরিবারবর্গের এবং উপস্থিত সকলের শ্রদ্ধাপূত ভাবে সুসম্পন্ন হয়। অবিরাম বৃষ্টি ও ভয়ানক দুর্য্যোগ সত্ত্বেও মণ্ডলীর ও বন্ধু বান্ধব অনেকেই উপস্থিত হইয়া, পরলোকগত আত্মার উদ্দেশে হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন। উপাসনান্তে মাতৃদেবীর ইচ্ছানুসারে ভুরিভোজনে সকলকে আপ্যায়িত করা হয়। এই পবিত্র অনুষ্ঠানে নিম্নলিখিত যে সকল দান উৎসর্গিত হইয়াছে, তন্মধ্যে উপাসনাশীলা, উৎসবানুরাগিণী মাতৃদেবীর ইচ্ছামত, নিজ গৃহে প্রতিবৎসর অনুষ্ঠিত বাঁ্যাটরার উৎসবটীকে স্থায়ী করিবার জন্য যে দান উৎসর্গিত হইয়াছে, তাহাতে স্বর্গীয় মাতৃ-আত্মা কত না তৃপ্ত হইয়াছেন এবং সন্তানদিগকে কত না আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। নব-বিধানের জীবন, নববিধানের গৃহ যে উৎসবময়, তাহারই প্রমাণ তিনি নিজ জীবনে দিয়ে গেলেন। নিত্যোৎসবলোকে উৎসবময়জীবন অমর সাধু সতীদের সঙ্গে এখন সে আত্মা নিত্যানন্দে থাকুন। নব-বিধানজননীর আশীর্ব্বাদে, সে অমর আত্মার অমর প্রভাব পরিবারে চির অক্ষুণ্ণ থাকিয়া, সকলের জীবনকে উৎসবময় ও শান্তিময় করুক।

হাওড়া—বাঁ্যাটরা অনাথবন্ধু-সমিতি ২০৲, বাঁ্যাটরা করো-নেশন বালিকাবিদ্যালয় ২০৲, হাওড়া উচ্চ বালিকাবিদ্যালয় ও বাণীনিকেতন (২টী রৌপ্য পদক) ১০৲, বাঁ্যাটরা সাধারণ পুস্তকাগার ১০৲, বাঁ্যাটরা মহিলা-সমিতি ৫৲; কলি-কাতা—ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির ২০৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ২০৲, বালিকাদিগের নীতিবিদ্যালয় ১৫৲, নববিধান প্রচারভাণ্ডার ২০৲, ভগ্নীসমিতি (কাপড়) ১০৲, বালকদিগের রবিবাসরীয় নীতি-বিদ্যালয় ১০৲, বালিগঞ্জ পুণ্যাশ্রম ১০৲, নারীরক্ষণ-সমিতি ১০৲, নববিধান ট্রাষ্ট ১০৲, ভবানীপুর সম্মিলনীসমাজ ৫৲; পুরী—নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ও হাওড়া ব্রহ্মানন্দাশ্রম ২০৲; রাঁচি—দাতব্য সমিতি ৫৲, রাঁচি ব্রাহ্মসমাজ ৫৲; বাঁকিপুর—ব্রাহ্মসমাজ ১০৲; কাঁথি—ব্রাহ্মসমাজ ৫৲; সিঁথি—বালিকা-বিদ্যালয় ৫৲; বালেশ্বর—ব্রাহ্মসমাজ ৫৲; স্থানীয় অভাবগ্রস্ত পরিবারবর্গের জন্য বস্ত্র ৫৫৲, দরিদ্রের জন্য মিষ্টান্ন ৪০৲ টাকা। মোট ৩৪৫৲ টাকা মধ্যে ভগ্নীগণ ৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত পুত্রগণ স্বর্গীয়া মাতৃঠাকুরাণীর ইচ্ছানুযায়ী বাঁ্যাটরা ব্রাহ্মসমাজের বাৎসরিক উৎসবটী স্থায়ী করিবার জন্য বার্ষিক ৩০৲ টাকা আয়ের কোম্পানীর কাগজ ৫০০০৲ টাকার, এবং প্রতিবৎসর মাতৃদেবীর স্বর্গারোহণ উপলক্ষে অভাবগ্রস্ত পরিবারবর্গের জন্য কাপড় ইত্যাদি ২৫৲ ও প্রতিবৎসর একটী বালিকার শিক্ষার জন্য বৃত্তি ২৫৲, এই ৫০৲ টাকা আয়ের কোম্পানির কাগজ ১০০০৲ টাকার। মোট ৬০০০৲ টাকার কোম্পানির কাগজ স্থায়ী ফণ্ডরূপে দান করা হইয়াছে।

পারলৌকিক—গত ৪ঠা জুলাই, কলুটোলায়, ৯নং মুরলীধর সেন লেনে, শ্রীযুক্ত গিরীন সেনের পত্নী দেবী অমরলোকে প্রস্থান করেন। তদুপলক্ষে গত ১৯শে জুলাই, ঐ গৃহে পরলোকগত আত্মার স্মরণার্থ ও কল্যাণার্থ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সেন উপাসনা করেন। অনন্ত করুণাময়ী জননী তাঁহার কন্যার আত্মাকে নিত্য শান্তিবক্ষে রক্ষা করুন এবং শোকার্ত্ত পরিবারে শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

গত ১৬ই জুলাই, রাঁচিতে, শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদারের গৃহে, তাঁহার বৈবাহিক স্বর্গীয় রায় বাহাদুর সুরেশচন্দ্র সরকারের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ ও বৈবাহিকী স্বর্গীয়া তারাসুন্দরী দেবীর (হাওড়ার শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাসের সহধর্ম্মিণী) আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে, উভয় পরিবারের সঙ্গে আত্মিক ভাবে যুক্ত হইয়া গৌরীবাবু বিশেষ উপাসনা করেন।

পরলোকগমন—আমরা গভীর দুঃখ ও সমবেদনার সহিত নিম্নলিখিত পরলোকগমনসংবাদ প্রকাশ করিতেছি:—

গত ১৮ই জুলাই, মঙ্গলবার, প্রত্যুষে ৬টার সময়, গিরিধিতে নববিধান ব্রহ্মমন্দিরের আশ্রমকুটীরে, শান্তসাধক ঋষি স্বর্গগত ভাই কেদারনাথ দের তৃতীয়া কন্যা, স্বর্গীয় রাধানাথ দেবের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী প্রেমলতা দেবী, হঠাৎ হৃদয়ের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাওয়াতে, ভ্রাতা, ভগ্নী ও বহু আত্মীয় স্বজনদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, অমরধামে অমরজননীর ক্রোড়ে আশ্রয়লাভ করিয়াছেন। তাঁর উপাসনাশীল পবিত্র সুন্দর প্রেমপূর্ণ জীবনের প্রভাব, উচ্চ ও সুমিষ্ট কণ্ঠে প্রার্থনা ও সঙ্গীতের স্বরলহরী প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছি। হঠাৎ চলিয়া যাওয়াতে ভাই বোন কেহই কাছে থাকিবার সুযোগ পান নাই। শেষ সময়ে নাকি কেবল "মেজদা"

"মেজদা" করেছিলেন। পৃথিবীর শূন্যঘর পরিত্যাগ করিয়া এখন সে আত্মা অনন্তের পূর্ণ ঘরে শান্ত ও তৃপ্ত হইয়াছেন। ১৪ই আগষ্ট, শান্তিকুটীরে, ভ্রাতাভগ্নীগণ তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন।

গত ৬ই শ্রাবণ, ২২শে জুলাই, শনিবার, রাত্রি ১—৩৫মিঃ সময়, রাঁচি প্রবাসে, অন্তরীণ অবস্থায়, আকস্মিক সন্ন্যাসরোগে, চট্টগ্রামের স্বনামধন্য উকীল, ব্রাহ্মসমাজের ও দেশের পরমোপকারী বন্ধু স্বর্গীয় যাত্রামোহন সেনের গুণধর মধ্যম পুত্র, কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র, চট্টগ্রামের কৃতিসন্তান, নির্ভীক কর্ম্মবীর ও সুবক্তা, বাঙ্গালীর বড় আদরের ও বড় গৌরবের দেশপ্রিয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন, আকাশের মধ্যাহ্ন ভাস্করের ন্যায়, ৪৮ বৎসর বয়সে অস্তমিত হইলেন। তাঁহার পরলোকগমনে দেশের ও দশের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। তাঁহার অভাবে দেশব্যাপী গভীর শোকোচ্ছাস উত্থিত হইয়াছে। তাঁহার আত্মত্যাগ, দেশপ্রিয়তা, নিরলস কর্ম্মপ্রবণতা, চরিত্রের পবিত্রতা ও মধুরতা, সকলের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করিবার ক্ষমতা বর্ত্তমান যুবজীবনের আদর্শ হয়ে থাকুক। ২৪শে জুলাই সোমবার মহা সমারোহের সহিত কলিকাতায় কেওড়াতলায় রাঁচী হইতে আনীত শবদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। সেদিনকার জনতা ও দৃশ্য অবর্ণনীয়। কলিকাতার নরনারী দেশপ্রিয় সন্তানের প্রতি শেষ শ্রদ্ধাভক্তি অর্পণ করিবার সুযোগ পাইয়া ধন্য হইয়াছেন। শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণকুমার মিত্র শ্মশানে প্রার্থনা ও বাড়ীতে একদিন উপাসনা করিয়াছেন। ৩০শে জুলাই, যথোচিত সম্মানের সহিত, চট্টগ্রামে "যাত্রামোহন হলের" প্রাঙ্গণে স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ পবিত্র দেহভস্ম সমাহিত হইয়াছে।

ভগবান্ পরলোকগত আত্মাদিগকে যথোচিত উন্নতলোকে স্থান দান করুন এবং শোকার্ত্তজনের প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ১০ই জুলাই, স্বর্গীয় গৃহস্থ বৈরাগী রাজমোহন বসুর পুত্র শ্রীনির্ম্মলচন্দ্রের স্বর্গাদিন-স্মরণার্থ কটক মধুভবনে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। আত্মীয় ও পরিবারস্থ সকলে যোগদান করেন।

গত ১১ই জুলাই প্রাতে, ভাই প্রিয়নাথের একমাত্র ধ্রুবোপম পুত্র শ্রীপ্রমোদনাথের স্বর্গারোহণদিনস্মরণে, কটকস্থ ভ্রাতা রামকৃষ্ণ রাওর ভবনে বিশেষ উপাসনা হয়। স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের নেতা শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কর, রায় বাহাদুর ডাঃ জয়ন্ত রাও প্রভৃতি অনেকগুলি বন্ধুবান্ধব উপাসনায় যোগদান করেন। ভাই প্রিয়নাথই উপাসনা করেন, বিশ্বনাথবাবু বিশেষ প্রার্থনা করেন এবং স্বর্গীয় প্রশান্তকুমার রাওর পত্নী দেবী সঙ্গীত করেন। উপাসনান্তে মহানদীতীরস্থ সমাধিতীর্থে প্রমোদ-বটতলে ধ্যান ও প্রার্থনাদি হয়। সন্ধ্যায় পুরী নবপর্ণকুটীরেও বিশেষ উপাসনা হয়।

গত ২৪শে জুলাই ১২।১ বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীটে, অনাথআশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গগত ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্তের সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া কান্তমণি দেবীর সাম্বৎসরিকে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

কোচবিহারের সংবাদ—গত ২৮শে জুন, করুণাকুটীরে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান্ অরুণকুমারের শুভজন্মদিন উপলক্ষে উপাসনা হয়। কেদারবাবু উপাসনা করেন। গত ২২শে জুলাই, "ল্যান্সডাউন হলে", রেভিনিউ অফিসার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্তের সভাপতিত্বে, শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী "নবাভারতের জাতীয় ধর্ম্ম" বিষয়ে সুন্দর হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। রেভিনিউ অফিসার এবং জজ সাহেবও কিছু কিছু বলেন। একজন শিক্ষয়িত্রী সুন্দর দুইটী গান করেন। পরদিন ২৩শে রবিবার, প্রাতে, মহারাজকুমারী প্রতিভা সুন্দরীর স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে মহেশবাবুই উপাসনা করেন এবং সন্ধ্যায় তিনিই ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করেন। ঐ শিক্ষয়িত্রীই উভয়স্থলে গান করেন। সন্ধ্যার উপাসনার পর জমাট কীর্ত্তন হয়। বক্তৃতা ও উপাসনায় প্রায় সমুদায় রাজকর্ম্মচারী, অন্যান্য বহু ভদ্রলোক, ছাত্রবৃন্দ ও মহিলাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ভাদ্রোৎসব—নিম্ন প্রণালীমতে ভাদ্রোৎসব সম্পন্ন হইবে—

১৫ই আগষ্ট, মঙ্গলবার, স্বর্গগত ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিকে প্রাতে ৭॥টায় নবদেবালয়ে উপাসনা, সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে প্রসঙ্গ। ১৬ই বুধবার, ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যা ৭টায় বক্তৃতা। ১৭ই বৃহস্পতিবার, পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের সাম্বৎসরিক দিন প্রাতে ৭॥টায় নবদেবালয়ে উপাসনা ও সন্ধ্যায় ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে স্মৃতিসভা। ১৮ই শুক্রবার, সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে মহিলাদিগের জন্য বিশেষ উপাসনা। ১৯শে, শনিবার, জেনেরল বুথের সাম্বৎসরিকে প্রাতে ৭॥টায় নবদেবালয়ে উপাসনা ও সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে মুক্তিফৌজদলের বক্তৃতাদি। ২০শে (৪ঠা ভাদ্র), রবিবার, ব্রহ্মমন্দিরে সমস্তদিনব্যাপী উৎসব—প্রাতে ৮টায় কীর্ত্তন, ৮॥টায় উপাসনা, মধ্যাহ্ন ৩॥টায় উপাসনা, তৎপর পাঠ ও প্রসঙ্গ, ৬টায় কীর্ত্তন, সন্ধ্যা ৭টায় উপাসনা। ২১শে, সোমবার, স্বর্গগত ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র ও বলদেবনারায়ণের সাম্বৎসরিকে প্রাতে ৭॥টায় নবদেবালয়ে উপাসনা, সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে প্রসঙ্গ। ২২শে, (৬ই ভাদ্র), মঙ্গলবার, রামমোহন কর্ত্তৃক উপাসনা-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ব্রহ্মমন্দিরে, সন্ধ্যা ৭টায় উপাসনা। ২৩শে (৭ই ভাদ্র), বুধবার, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা-প্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৭॥টায় ও সন্ধ্যা ৭টায় উপাসনা। ২৪শে বৃহস্পতিবার, ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যা ৭টায় বক্তৃতা। ২৫শে শুক্রবার, সন্ধ্যা ৭টায় শান্তিকুটীরে কীর্ত্তনাদি। ২৬শে, শনিবার, সন্ধ্যা ৭টায় শান্তিকুটীরে "আমাদের সঙ্ঘের" উৎসব। ২৭শে, রবিবার, স্বর্গগত ব্রজগোপাল নিয়োগীর সাম্বৎসরিকে প্রাতে ৭॥টায় নবদেবালয়ে ও সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৮ ভাগ। ১৫শ সংখ্যা। | ১লা ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৪০ সাল, ১৮৫৫ শক, ১০৪ ব্রাহ্মাব্দ। 17th August, 1933. | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে জগতের পরিত্রাতা লীলাময় শ্রীহরি! তুমি যুগে যুগে তোমার নিজ কৃপাগুণে জীবের পরিত্রাণের জন্য, উচ্চগতি-বিধানের জন্য সময়োপযোগী যুগধর্ম্ম-বিধান পাঠাইয়া থাক। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যত ধর্ম্মবিধান পাঠাইয়াছ, সকলই স্বর্গের মহিমা গৌরবে পূর্ণ, তাহার প্রত্যেকটীই অসীম। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে যে ধর্ম্মবিধান পাঠাইয়াছ, ইহার বিস্তৃতি, ইহার বিচিত্রতা, ইহার বিরাট ভাব, সর্ব্বগ্রাসী শিক্ষা, সাধনা ও গ্রহণের বিধি ব্যবস্থা যতই আমরা চর্চ্চা করিতেছি, যতই সে সকলের গুরুত্ব আমাদের নিকট প্রতিভাত হইতেছে, আমাদের অযোগ্যতা ও অপরাধ ততই আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া ম্রিয়মাণ হইতেছি। শিক্ষা, সাধনা ও গ্রহণের কি বিরাট আয়োজন ও ব্যবস্থা এই নববিধানে; তাই তুমি এবার শিক্ষা দিবার ভার নিজে গ্রহণ করিয়াছ। কিন্তু আমরা তো কেশবের মত সুশিষ্য হইয়া তেমন করিয়া তোমার কাছে শিখিতেছি না। শিখিবার সে ব্যাকুলতা কোথায়, গ্রহণ করিবার সে আগ্রহ ও অনুরাগ কোথায়? আবার শুধু তোমার কাছে শিখিলে হইবে না, শিষ্যানুশিষ্য হইয়া তোমার সাধুভক্তদিগের কাছেও শুধু শিখিলে হইবে না; ছোট, বড় যিনি আমাদের সম্মুখীন হইবেন, নিতান্ত সামান্য ব্যক্তিও যদি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হন, তাঁহার নিকটও শিখিতে হইবে। আমাদের স্বভাব চর্চ্চা করিলে দেখি, অন্যকে শিখাইবারই আমাদের আগ্রহ বেশী; কিন্তু শিখিবার বা জানিবার তেমন আগ্রহ ও ব্যাকুলতা নাই। স্বয়ং তোমার নিকট, তোমার প্রেরিত সাধু ভক্ত মহাজনদিগের নিকট এবং ছোট বড় যে কোন ব্যক্তির নিকটই আমরা শিখিয়া জানিয়া, আমাদের শিক্ষার পূর্ণতা, জ্ঞানের পূর্ণতা, গ্রহণের পূর্ণতা সাধন করিব, ইহা ভিন্ন বিধানের পূর্ণতা আমাদের জীবনে সাধন হইবে না, এ চেতনাও আমাদের মধ্য তেমন করিয়া উপস্থিত হইতেছে না। আমাদের গণনার দিন ক্রমে ফুরাইয়া আসিতেছে, কিন্তু আমাদের জীবনে শিক্ষা ও সাধনার ক্রটী ও অভাবের অন্ত নাই; তাই জীবনের ক্রটী ও অভাব স্মরণ করিয়া, প্রাণের ব্যথা লইয়া, ভীতচিত্তে তোমার চরণতলে উপস্থিত হইতেছি এবং কাতরপ্রাণে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি নিজগুণে আমাদের কঠোর হৃদয়কে কোমল করিয়া লও, গর্ব্বিত চিত্তকে বিনীত করিয়া লও, ভাল করিয়া আমাদের দৈন্য বুঝিতে দিয়া আমাদিগকে খাঁটি দীনাত্মা করিয়া লও। আমরা বিনীত ও দীন শিষ্য হইয়া ব্যাকুলচিত্তে তোমার নিকটে

শিখি, তোমার প্রেরণায় ও আলোকে তোমার চিহ্নিত প্রেরিত সাধুভক্তদিগের নিকট হইতে শিখি, এবং তোমারই নিদেশে দীন অকিঞ্চন ভাবে অতি সামান্য ব্যক্তির নিকটেও যাহা শিখিবার শিখিয়া ও সকলকে সাদরে গ্রহণ করিয়া, তোমার নববিধানের বিরাট শিক্ষার পূর্ণতা সাধন করি। তুমি কৃপা করিয়া সহায় হও।

শান্তিঃ ! শান্তিঃ !! শান্তিঃ !!!

ভাদ্রোৎসবের বান।

"ভাদ্রোৎসবের বান ডেকেছে আয়রে ভাই দি গা ভাসান,
অনায়াসে গিয়ে ভেসে পাব সুরপুরে স্থান।"

ভাদ্রমাসে গঙ্গায় বান ডাকে। নৌকার মাঝি মাল্লারা বহু পরিশ্রম করিয়া যে নৌকাকে একপাও অগ্রসর করিতে পারিতেছিল না, মুহূর্ত্ত মধ্যে বান আসিয়া নৌকাকে তর তর বেগে লইয়া চলিল; মাঝি মাল্লাদের আর দাঁড় টানিতে হইল না, হাল দাঁড় তুলিয়া গান গাহিতে গাহিতে চলিল। অবিলম্বে নৌকা ঘাটে পৌঁছাইয়া গেল।

নববিধানের ভাদ্রোৎসবও সেই রকম বান। উৎসব মাত্রেই স্বর্গের বান। সাধ্য সাধনা, পুরুষকার ও চেষ্টায় যখন আমাদের জীবনতরী বলশক্তিবিহীন হয়, ব্যক্তি-গত, পরিবারগত ও মণ্ডলীগত জীবনে ভাটা পড়িয়া আসে, তখনই আমাদের নববিধানবিধায়িনী আনন্দময়ী জননী উৎসবের বান আনিয়া, আমাদের জীবনতরীকে স্বর্গীয় বলে আপনি নব নব জীবনের উন্নতির স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যান। সকল উৎসবেই ইহা আমরা উপলব্ধি করি। বিশেষ ভাবে ভাদ্রোৎসব ভাদ্রমাসের গঙ্গার বানের ন্যায় আসিয়া, আমাদের জীবনকে স্বর্গের দিকে প্রবলবেগে টানিয়া লইয়া যাইবার জন্য প্রেরিত হয়।

নববিধানের প্রথম বীজ এই ভাদ্রমাসেই বিধাতার অনির্ব্বচনীয় কৌশলে ধর্ম্মপিতামহ রাজর্ষি রামমোহন দ্বারাই উপ্ত হয়। আবার এই মাসেই বিধাতা নব-বিধানাচার্য্য শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে দিয়া ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করাইয়া, তাহাতে নব ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তন করান। জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত উপাসনাই স্বর্গের মহাবান। নিরাকার ব্রহ্মের মন্দির ধরায় স্থাপনের ন্যায় নূতন ব্যাপার আর কি হইতে পারে? রাজর্ষি যে আদি "ব্রাহ্মসমাজগৃহ" স্থাপন করেন, তাহাও তিনি "ব্রহ্মমন্দির" নামে অভিহিত করেন নাই। ব্রহ্মানন্দ অধ্যাত্ম প্রেরণায় প্রেরিত হইয়াই প্রথম ব্রহ্মের নামেই এই মন্দির উৎসর্গ করিলেন, এবং নবদর্শন-শ্রবণ-সাধন-সম্ভূত ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তন করিলেন, ইহা সাধারণ ঘটনা নয়। ইহার গভীর স্বর্গীয় ভাব উপলব্ধি করিয়া যেন এবার আমরা ভাদ্রোৎসব-সাধনে প্রবৃত্ত হই এবং সত্যই এই মহোৎসবে গা ভাসান দিয়া পরলোকগত অমরাত্মাগণের সঙ্গে সশরীরে, সপরিবারে, সদলে মিলিয়া উৎসবানন্দ-সম্ভোগে ধন্য হই, মা আমাদিগকে এমন শুভাশীর্ব্বাদ দান করুন।

সাধন-সাম্রাজ্য।

ধর্ম্মশাস্ত্রের সাম্রাজ্য পর্য্যটন করিয়া, শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া আমাদের ধর্ম্মপিতামহ মহাত্মা রামমোহন রায় সকল শাস্ত্রের উপপাদ্য একেশ্বরবাদ ও একেশ্বরের পূজা বন্দনারূপ মহারত্ন ভবিষ্যৎ বংশের জন্য উদ্ধার করিয়া গেলেন। ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদ্‌রূপ হিন্দুশাস্ত্রের সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে পর্য্যটন করিয়া, তাহা হইতে ঈশ্বরের সপ্ত স্বরূপ, সপ্ত অমৃতভাণ্ডার, সেই একেশ্বরের পূজা-সাধনের মহা আয়োজন রূপে আমাদের জন্য সঞ্চয় করিলেন। ভক্ত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তাঁহার স্বভাবসুলভ প্রার্থনা-যোগে সেই সপ্ত স্বরূপকে তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনের আয়ো-জনরূপে গ্রহণ করিলেন। এই সপ্তস্বরূপ-যোগেই কেশবজীবনে কত কত সরল সুন্দর বিচিত্র ব্রহ্মদর্শন সম্ভব হইল, এই সপ্তস্বরূপ-যোগেই তিনি কত ভাবে জীবনে ব্রহ্মপ্রেরণা লাভ করিলেন, অতীতের সকল ধর্ম্ম-বিধানগুলির পরস্পর সামঞ্জস্য এই সপ্ত স্বরূপের যোগেই দর্শন করিলেন এবং এই নব যুগে অতীতের সকল ধর্ম্মবিধানগুলির নব ভাবে পুনরুদ্ধার করিয়া সকলের মধ্যে মহা মিলন সাধন করিলেন। অতীত ও বর্ত্তমানের সাধু ভক্ত মহাজন, গুণী ও জ্ঞানিগণের জীবন এই সপ্ত স্বরূপকে অবলম্বন করিয়া পাঠ করিলেন, গ্রহণ করিলেন এবং আত্মস্থ করিলেন। এই স্বরূপের সহায়তায়,

স্বদেশের বিদেশের ধর্ম্মশাস্ত্রগুলির প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইলেন ও নানাভাবে ব্যাখ্যা করিলেন। এই স্বরূপের আলোকে তিনি অতীত ও বর্ত্তমানের ধর্ম্মরাজ্যের কত প্রকার জটিল প্রশ্নের সহজ মীমাংসা করিলেন। এই সপ্ত স্বরূপের যোগে উজ্জ্বল ও গভীর ব্রহ্মানুভূতি-যোগে যে জীবন্ত স্বর্গরাজ্য প্রকাশিত হইল, সেই স্বর্গরাজ্যের শোভা সৌন্দর্য্যে ও মহিমা গৌরবে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র স্বয়ং কতই মোহিত হইলেন, তাহার বিশদ ও রসাল ব্যাখ্যায় সকলকে মোহিত করিলেন এবং প্রার্থনা ও উপদেশের আকারে কত অমৃতভাণ্ডার ভবিষ্যৎ বংশের জন্য রাখিয়া গেলেন। এই সপ্ত স্বরূপের সাধনেই তাঁহার জীবনে ধর্ম্মসমন্বয়ের মহাধর্ম্ম নববিধান উদ্ভাসিত হইল।

খণ্ড খণ্ড রাজ্যের সমষ্টিতে একটী মহা সাম্রাজ্য বাহ্যজগতে গঠিত হয়। ধর্ম্মরাজ্যে, আধ্যাত্মিক জগতে ঈশ্বরের এক একটী স্বরূপ এক একটী খণ্ড রাজ্য। পৃথিবীর খণ্ডরাজ্যগুলিতো নিতান্ত সীমাবদ্ধ; আবার খণ্ডরাজ্যগুলির সংখ্যা যতই কেন অধিক হউক না, সেই খণ্ডরাজ্যগুলির সম্মিলনে যে পৃথিবীর সাম্রাজ্য, তাহা খুব প্রকাণ্ড হইলেও সসীম, নানাভাবে সীমাবদ্ধ এবং বিশ্বের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র। কিন্তু ঈশ্বরের যে খণ্ড খণ্ড এই সাতটী স্বরূপ, ইহার প্রত্যেক স্বরূপ অনন্ত, কোন স্বরূপেরই সীমা নাই। প্রত্যেক স্বরূপের বিস্তৃতি কত, গভীরতা কত, উচ্চতা কত, কে নির্দ্ধারণ করিবে? ইহকাল পরকাল ব্যাপিয়া যে মানবজীবন, সেই সমগ্র জীবনে প্রত্যেক স্বরূপ সাধন কর, এক এক স্বরূপের বিচিত্রতা ক্রমাগত দর্শন কর, এক এক স্বরূপের গভীরতায় ক্রমাগত ডুবিয়া যাও, এক এক স্বরূপের বিস্তারের মধ্যে ক্রমাগত বিচরণ কর, এক এক স্বরূপামৃতভাণ্ডার হইতে ক্রমাগত পান কর ও দান কর, তাহা হইলে এক এক স্বরূপসাগর হইতে কত ধন রত্ন সঞ্চয় করিবে, কত বিলাইবে, ফুরাইবে না, শেষ হইবে না। এই সপ্ত স্বরূপের অক্ষয় উপাদানেই আমাদের পূর্ণাঙ্গ অক্ষয় জীবনও ক্রমাগত লাভ হয়। এই সপ্ত স্বরূপের সমষ্টিগত মিলনেই আমাদের সাধনসাম্রাজ্য।

মানবপ্রকৃতিতে ধন সম্পদ্ বৃদ্ধি করিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি রহিয়াছে। যাহার পার্থিব বিষয় আছে, সে তাহা বৃদ্ধি করিতে ব্যস্ত; যাঁহারা ধর্ম্মক্ষেত্রে স্বর্গের ধনৈশ্বর্য্য সঞ্চয় করিতে রত হন, তাঁহারাও যত ধন সঞ্চয় করেন, আরও সঞ্চয় করিতে ব্যাকুল হন। পার্থিব ধন, সম্পদ্, রাজ্য, সাম্রাজ্য যতই কেন আমরা বৃদ্ধি করিনা, পার্থিব রাজ্য ও সাম্রাজ্যকে যতই কেন দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিনা, অন্ততঃ ব্যক্তিগত জীবন-সম্পর্কে তাহাদের সঙ্গে সম্পর্ক আমাদের অতি অল্প সময়ের জন্য। অনেক সময়ে এই আজ আছে, কাল নাই; আজ যে রাজা বা সম্রাট্, কাল হয়ত সে ফকির বা পথের ভিখারী। পার্থিব ধন সম্পদ, রাজ্য সাম্রাজ্য বেশী স্থায়ী হইলে ততক্ষণ, এই পৃথিবীর জীবন যতক্ষণ। পৃথিবীর জীবনের শেষ হইলে, পৃথিবীর সম্পদ্ কাহারও সম্পদ্ বা সম্বল বলিয়া গণ্য হয় না। কথিত আছে, কোন এক বাদসাহ ইহলোক হইতে চলিয়া যাওয়ার প্রাক্কালে তাঁহার অনুচরদিগকে এই আদেশ করিয়াছিলেন, তিনি দেহ-মুক্ত হইলে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ যেন ঢাকিয়া দেওয়া হয়, কেবল হস্ত দুইখানা যেন বাহির করিয়া রাখা হয়। শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগের পূর্ব্বে তিনি হাত দুইখানি খুলিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। সেই অবস্থায় যখন তিনি দেহ-মুক্ত হইলেন, তাঁহার হাত দুইখানি বাহিরে রাখিয়া আর সকল অঙ্গ ঢাকিয়া দেওয়া হইল। অনুচরবর্গ বাদসাহের এ আদেশের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া, একজন সাধুর নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞাসু হইল। সাধু বলিলেন, বাদসাহ ইহা দ্বারা জগৎকে এই কথা বলিয়া গেলেন, "আমি শূন্যহস্তে এই জগতে আসিয়াছিলাম, শূন্যহস্তে চলিয়া গেলাম; পৃথিবীর রাজ্য, ধন, কিছুই আমার সঙ্গের সম্বল হইল না।"

সত্যই পৃথিবীর উপার্জ্জিত বা সঞ্চিত ধনৈশ্বর্য্য, রাজ্য, সাম্রাজ্য কিছুই আমাদের চিরদিনের সম্বল হয় না; মৃত্যু-কালে পার্থিব যাহা কিছু, সবই আমাদিগকে পরিত্যাগ করে। কিন্তু ঈশ্বরের সপ্তস্বরূপ লইয়া যে সাম্রাজ্যের কথা বলা হইতেছে, সে সাম্রাজ্যের যোগে আমরা ইহকাল পরকালের পরম সম্বল ঈশ্বরকে বিচিত্র ভাবে লাভ করি। ঈশ্বর ও ধর্ম্ম সাধারণ লোকে পরকালের জন্যই সঞ্চয় করিতে প্রয়াসী হয়; কিন্তু ঈশ্বর যেমন পরকালের অক্ষয় সম্বল, নিত্য সম্বল, তেমনই ঈশ্বর আমাদের ইহকালে, বাল্যে, যৌবনে, প্রৌঢ়ে, বার্দ্ধক্যে, জন্মে মরণে পরম সম্বল, পরম সহায়। এই নব যুগে সপ্ত স্বরূপ লইয়া যে সাধনমার্গ অবতীর্ণ হইয়াছে, সে সাধন আমাদিগকে এই

শিক্ষা দান করে, তিনি আমাদিগের সংসারে গৃহধর্ম্ম-প্রতি পালনে, শিক্ষা-ক্ষেত্রে, কর্ম্ম-ক্ষেত্রে, বিষয় বাণিজ্যে, ইহকালের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কর্ত্তব্যে আমাদের শিক্ষা-দাতা, বলবুদ্ধিদাতা, সহায় ও সম্বল। এইরূপে নানা স্বরূপের ভিতর দিয়া তিনি প্রতিজীবন অবতীর্ণ ও ক্রিয়াশীল। এই সপ্ত স্বরূপের সাধনে আমরা ইহকালে ধর্ম্মের অখণ্ড সাম্রাজ্যে স্থিতি করিয়া, অখণ্ড সাম্রাজ্য সম্ভোগ করিয়া ধন্য হই এবং পরলোকেও সেই অখণ্ড সাম্রাজ্যে বাস করিয়া, অখণ্ড সাম্রাজ্য সম্ভোগ করিয়াধন্য হইব, তাহার পূর্ব্বাভাস এখানেই পাইয়া, অটল বিশ্বাসে ও আশা উৎসাহে পূর্ণ হই।

ইতিপূর্ব্বে ঈশ্বরকে কেহ নির্ব্বিশেষ সত্তারূপে সাধন করিয়া এবং আপনার সত্তা তাঁহাতে নিমগ্ন করিয়া, বিভূতি-যোগে ধর্ম্মের পিপাসা চরিতার্থ করিয়াছেন। আবার কেহ বা তাঁহাকে পিতৃভাবে, কেহ বা মাতৃভাবে, কেহ বা হৃদয়-বিহারী শ্রীহরিরূপে, কেহ বা পরম প্রভুরূপে, বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন ভাবে, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিরূপে সবিশেষে সাধন করিয়া, জীবনে উচ্চ তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। ইহাতে সাধনের প্রকৃতি বিভিন্ন হইল, পথ ও প্রণালী বিভিন্ন হইল, আয়োজনও বহু পরিমাণে বিভিন্ন হইল। ফলে হইল যত মত, তত পথ। পৃথিবীতে বহুধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। একে অন্যের ভাব গ্রহণ করিতে না পারায়, ধর্ম্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সম্প্রদায় মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ, অমিলন, ধর্ম্মের নামে যুদ্ধ বিগ্রহ পর্য্যন্ত সংঘটিত হইল। ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য, ইহলোকে পরলোকে, সকলের মধ্যে শান্তি ও আনন্দের সম্মিলন-স্থাপন। ইহলোকে পরলোকে শান্তি-সংস্থাপন এবং দেশকাল, জাতিবর্ণ ও ধর্ম্মসম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সকলের মধ্যে স্বর্গের আনন্দসম্মিলনপ্রতিষ্ঠার জন্যই, নব যুগে ঈশ্বরের স্বরূপ-বিশ্লেষণে সপ্ত স্বরূপের সমষ্টিতে ধর্ম্ম-সাধনার ব্যবস্থা। এই সপ্ত স্বরূপের সাধনে, স্বয়ং পবিত্রাত্মার প্রেরণায় ও আলোকে আমরা প্রত্যক্ষ করি, অতীতে ও বর্ত্তমানে, স্বদেশে ও বিদেশে যতগুলি যুগধর্ম্ম জগতে সমাগত হইয়াছে, সকলই এই সপ্ত স্বরূপেরই বিশেষ বিশেষ অভিব্যক্তিতে পরিপূর্ণ। যত সাধু মহাজন যুগে যুগে পৃথিবীতে ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন, সকলেই এই সপ্ত স্বরূপেরই বিশেষ বিশেষ স্বরূপমূলকবিধানপ্রচারক, ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মবীর।

তাই অতীতের যত যুগধর্ম্মবিধান, সকলই আমাদের সপ্ত স্বরূপের সাধনে সাক্ষাৎ সাধনক্ষেত্র; যত সাধু মহাজন স্বদেশের এবং বিদেশের, সকলেই আমাদের সাধনক্ষেত্রে সঙ্গী ও সহায়। ইহকালের পরকালের সকলকে লইয়া, সকলের সহিত সম্মিলনে আমাদের এই সপ্ত স্বরূপের সাধনা। ইহ পরকালের সব লইয়া আমাদের অখণ্ড ধর্ম্ম-পরিবার। ইহ পরলোকের সকলের সহিত সম্মিলনে আমাদের অখণ্ড সাধনসাম্রাজ্য।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

ঈশ্বর নিরাকার কেন ?

এই বিশ্বের ঈশ্বর আপন শোভা সৌন্দর্য্য এবং ঐশ্বর্য্য সকলই দান করিয়া এই বিশ্বপ্রকৃতিকে মণ্ডিত করিলেন। আবার মানব-সন্তানকে শেষে, আপনার যে বাহ্য আকারটী, তাহা পর্য্যন্ত দান করিয়া সম্পূর্ণ আত্মশূন্য হইলেন। তাই বুঝি, তিনি শূন্যাকার নিরাকার হইয়াছেন। এমনই তাঁর আত্মত্যাগ যে, বহির্জগতে কিছু করিতে হইলে তাহা বিশ্বপ্রকৃতির ভিতর দিয়া বা মানুষের হাত দিয়া করেন, তদ্ভিন্ন করেন না। এমন কি গরীবকে দুইটী পয়সা দিতে হইলেও, সন্তান সন্ততির হাত দিয়া দান করেন। এমন সর্ব্বত্যাগী আমিত্বশূন্য নিরাকার আর কে ?

নববিধান কি ?

নববিধান বিধাতার নবযুগধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্ম, খ্রীষ্টধর্ম্ম, এসলাম ধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম, সকলই ইহার অন্তর্ভুক্ত। আদি ব্রাহ্মসমাজ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সকলই নববিধানের অন্তর্গত। নববিধান কোন সমাজ বা সম্প্রদায় নয়। লবণ যেমন সকল তরকারীকে লবণাক্ত করিয়া সুস্বাদু করে, তেমনি সকল সমাজে, সকল ধর্ম্মে নবজীবন সঞ্চার করিবার জন্যই নববিধান অবতীর্ণ। ইহা পবিত্রাত্মার অবতারণা, ইহা অত্যাশ্চর্য্য শক্তি এবং নিত্য নব নব জীবন। কেবল যিনি ইহাতে অবিশ্বাস করেন, তিনিই নববিধান-বিরোধী।

দীক্ষার নূতন অর্থ।

মা সন্তানকে বলিলেন, "মা বলিয়া কেন ডাক না। আমি তোর মা, তুই আমার সন্তান।" ইহাই যথার্থ দীক্ষা। দীক্ষার উদ্দেশ্য দ্বিজত্ব। পৃথিবীর জননীর গর্ভে আমরা পৃথিবীতে জন্মলাভ করিয়াছি, কিন্তু যখন বিশ্বজননী আমাদিগকে সন্তান বলিয়া স্বীকার করেন এবং তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতে বলেন, তখনই আমাদের দ্বিজত্ব লাভ হয়। ইহারই নাম প্রকৃত দীক্ষা। ঈশ্বরকে মা বলিয়া আমরা ডাকিতে পারি, কিন্তু যতক্ষণ

না তিনি বলেন, "তুমি আমার প্রিয় পুত্র, আমি তোমাতে তুষ্ট", ততক্ষণ আমরা প্রকৃত দ্বিজত্ব লাভ করি না বা দীক্ষিত হই না। মায়ে পোয়ে চেনা পরিচয় হইয়া আত্মিক সম্বন্ধ স্থাপনই দীক্ষা।

আমিই আমরা।

শ্রীনববিধানাচার্য্য বলিলেন, "এই দৃশ্যমান 'আমির' পশ্চাতে অদৃশ্যমান 'আমরা'। আমি আমার ভাই এক। আমরা এক শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। যে যেখানে যায়, সেই এক পুরুষ যায়। এখানে আমি ও আমার হইতে পারে না, সবে মিলে একজন।" ইহাই নববিধানের সাধন। একা একা সাধন বা স্বার্থপর সাধন নববিধানে নাই। এই শরীরের কোন একটী অঙ্গ যেমন অপর অঙ্গচ্যুত হইয়া বাঁচিতে বা তিষ্ঠিতে পারে না, তেমনি স্বতন্ত্র হইয়া একা একা কেহ নববিধান সাধন করিতে পারে না। সংকীর্ত্তন যেমন একা হয় না, ব্যাণ্ড যেমন একটা যন্ত্রে বাজে না, তেমনি নববিধানের সাধন পরিবার, দল ও সর্ব্ব মানবকে না লইয়া হয় না। সংবাদ-পত্রের সম্পাদক যেমন আপনার ভিতর মানবমণ্ডলী অনুভব করিয়া "আমরা" বলিয়া লেখেন, তেমনি নববিধানবিশ্বাসীও, কখনই একা নন, জনগণ সঙ্গে এক অঙ্গে গাঁথা, ইহাই অনুভব করেন। তিনি "সদল অখণ্ড"। যিনি বিচ্ছিন্ন হন বা আপনাকে বিচ্ছিন্ন মনে করেন, তিনি নববিধানে অবিশ্বাসী।

শ্রীমতী প্রেমলতা দেবী।

(১৪ই শ্রাবণ, শান্তিকুটীরে, শ্রাদ্ধবাসরে, কনিষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমতী বনলতা দে কর্ত্তৃক পঠিত)

আজ চক্ষের সমক্ষে ভাসিতেছে সেই গিরিধি নববিধান মন্দির। সম্মুখে বৃক্ষাদি-পরিশোভিত সুন্দর পুষ্পোদ্যান, মহুয়া বৃক্ষতলে শুভ্র মর্ম্মরবেদিকা সাধু সাধ্বীগণের জীবনের শত শত পুণ্যস্মৃতি বক্ষে লইয়া দণ্ডায়মান। তাহারই মধ্যস্থ ক্ষুদ্র কুটীরে শান্তিপ্রিয় ঋষিকন্যা অনন্ত যোগে মগ্ন হইলেন। আসক্তি মোহ বন্ধন ছিন্ন করিয়া, মুক্ত আত্মা-পক্ষী অনন্ত আকাশে আনন্দে গান করিতে করিতে উড়িয়া গেল। "কেহ নাই হেথা তুমি আর আমি, অনন্ত জীবনে হে অনন্ত স্বামী"। আত্মীয় কাহাকেও আসিবার সুযোগ দিলেন না, নিকটস্থ ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা ভাই বোনেরাও কেহ জানিতে পারিলেন না; চিন্ময় আত্মা একাকী পরমাত্মার ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিল। অল্প দিন আগেই দেখা হইলে বলিলেন, "আমি এখানে বড় শান্তিতে আছি, কেহ কাছে নাই বলিয়া আমার কোন ভয় বা কষ্ট হয় না। দিবা-নিশি দয়াময় নাম সাধন করি, প্রাণে বড় আনন্দ পাই। কি আশার ও আনন্দের সংবাদ আমাদের জন্য রাখিয়া গেলেন। আজ আমরা দুঃখ করিব কেন? পিতৃদেব যে শান্তির প্রয়াসী ছিলেন, যে ব্রহ্মে একাত্মতা নির্জ্জনে সম্ভোগ করিতেন, যে ব্রহ্মযোগে নিমগ্ন থাকিতেন এবং সন্তানসন্ততিগণের জীবনে যাহা দেখিবার আশা করিতেন, মাতৃদেবী যে ব্রহ্মসুখে আমাদের সুখী হইবার জন্য সর্ব্বদাই আশীর্ব্বাদ করিতেন, তাঁদের ইচ্ছা, তাঁদের আশীর্ব্বাদ যে কন্যার জীবনে পূর্ণ হইল, ইহা অপেক্ষা আশার কথা আমাদের জন্য আর কি হইতে পারে? তাহা মনে করিয়া আজ আমাদের শোকদগ্ধ অশান্ত চিত্তকে শান্ত করি, সকলে মিলিয়া তাঁহার প্রতি হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা অর্পণ করি এবং আজিকার এই পবিত্র দিনে, এই পবিত্র গৃহে তাঁহার সুন্দর সুমিষ্ট জীবনের দু' চারিটি কথা স্মরণ করি।

শ্রীমতী প্রেমলতা দেবী শান্তসাধক ঋষি কেদারনাথ দের পঞ্চম সন্তান ও তৃতীয়া কন্যা। ভক্ত পিতামাতার ক্রোড়ে পালিত হইয়া বাল্যকাল হইতেই তাঁহার জীবনে ভক্তিভাব, কোমলতা, সহিষ্ণুতা ও কর্ম্মনিষ্ঠা প্রভৃতি কয়েকটী সদ্‌গুণ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছিল এবং ক্রমে ক্রমে বিকাশ লাভ করে। বাল্য জীবনে ভিক্টোরিয়া স্কুলে বিদ্যাশিক্ষাকালে শিক্ষয়িত্রীগণ ও ছাত্রীগণ সকলেই তাঁহার মধুর স্বভাবে আকৃষ্ট হইতেন। আমাদের পূজনীয় কাকাবাবু, বড় কাকাবাবু ও সৌদামিনী মাসীমা তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন।

পিতৃদেবের স্বর্গগমনের পর, ১৭ বৎসর বয়সে, বারুইপুর-নিবাসী ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্ম রাধানাথ দেবের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। রাধানাথবাবু বিপত্নীক ছিলেন এবং তাঁহার পূর্ব্ব পত্নীর গর্ভজাত একটী অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা ছিল; সপ্তদশবর্ষীয়া বালিকা সপত্নীজাত অষ্টমবর্ষীয়া কন্যাকে প্রতিপালন করার ভার সানন্দে গ্রহণ করিলেন এবং আশ্চর্য্য স্নেহ দান করিয়া অতি অল্পদিনের মধ্যেই কন্যার চিত্তকে এমনই আকৃষ্ট করিয়া লইলেন যে, সকলেই মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিলেন। রাধানাথবাবু বড় উদার স্বভাবের লোক ছিলেন, মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতেন এবং আশ্রয়প্রার্থী আত্মীয়, অনাত্মীয় সকলকেই আশ্রয় দান করিয়া, যত্ন, আদর করিতে ভালবাসিতেন। আর্য্যনারীগণের যে আশ্চর্য্য পতিভক্তি ও পতির জন্য স্বার্থত্যাগের কথা শুনিয়াছি, বিধানকন্যা প্রেমলতা দেবীর জীবনে তাহা প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। পতির ইচ্ছাপালনই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। স্বামীর গৃহে গিয়া পর্য্যন্ত কিরূপে তাঁহাকে সুখী করিবেন, তাঁহার আত্মীয়গণের সেবা করিবেন, তাঁহার কন্যাকে নিজ কন্যা করিয়া লইবেন, স্বার্থ ভুলিয়া প্রাণপণ যত্নে প্রফুল্লচিত্তে তাহাই করিতেন এবং তাহাতে সফলকাম হইয়াছিলেন। রাধানাথবাবু বেশ বড় উকীল ছিলেন ও যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেন এবং দেখিয়াছি, উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থ আনিয়া প্রত্যহ পত্নীর হস্তে প্রদান করিতেন। ইচ্ছা করিলে তিনি তাহা হইতে নিজের জন্য অনেক অর্থ সঞ্চয় করিতে

পারিতেন; কিন্তু সে দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না, সে অর্থে তিনি পরসেবা করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেন। তাঁহার গৃহ সর্ব্বদাই আত্মীয় স্বজনে এবং অতিথি অভ্যাগতে পূর্ণ থাকিত; এবং তিনি সকলকে স্বহস্তে পরিবেশনপূর্ব্বক তৃপ্ত করিয়া খাওয়াইয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিতেন। সেই ৬নং আণ্টনী বাগান লেনস্থ তাঁহার নিজ বাড়ীর কথা যখনই স্মরণ করি, তাঁর সেই প্রেমময়ী গৃহলক্ষ্মী মূর্ত্তি চক্ষের সমক্ষে দেখিতে পাই। তাঁহার নিজের সন্তান হয় নাই, কিন্তু রাণীকে ও ভাসুরপো ভাসুরঝিগুলিকে সন্তানের মতই ভালবাসিতেন এবং নীতি, জ্ঞান, ধর্ম্মশিক্ষায় বিভূষিত করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন। তাঁহাদের শিক্ষা তাঁহার কাছেই আরম্ভ হইয়াছিল।

উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত পাত্র ৺বরদাপ্রসাদ ঘোষের পুত্র শ্রীমান্ শচীন্দ্রপ্রসাদের সহিত পরম সমারোহে আদরের কন্যা রাণীর বিবাহ দেন এবং চিরদিনই তাঁহাদের প্রাণের সহিত যত্ন আদর করিয়াছেন এবং শেষের দিন পর্য্যন্ত নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থায় পড়িলেও তাঁহার সে স্নেহের হ্রাস হয় নাই।

৩২।৩৩ বৎসর বয়সে প্রেমলতা দেবীর পতিবিয়োগ হয়। রাধানাথবাবু পত্নীর জন্য কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। এই দুর্দ্দিনে তিনি একেবারে আশ্রয়হীন হইয়া পড়েন। আশ্রয়হীনা কন্যার কষ্ট দেখিতে না পারিয়া, মাতৃদেবী তাঁহাকে নিজ গৃহে লইয়া আসেন। তখন হইতে মার শেষ দিন পর্য্যন্ত মাতৃসেবা করিয়া তিনি ধন্য হইয়াছেন। মনে হয়, এই সংসারসুখে বঞ্চিত করিয়া ভগবান্ তাঁহাকে সামাজিক কার্য্যের জন্য প্রস্তুত করিলেন। এই সময় সাধ্বী কর্ম্মযোগিনী দেবী কৃষ্ণভাবিনীর সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার জীবন কর্ম্মের পথে অগ্রসর হয় এবং স্ত্রীজাতির উন্নতিকল্পে খাটিবার জন্য মাতৃদেবীর পরামর্শ লইয়া ভারতস্ত্রীমহামণ্ডলের কার্য্যে যোগদান করেন। সঙ্গীতবিদ্যায় তাঁহার স্বাভাবিকী শক্তি ছিল। তাঁহার কণ্ঠস্বর অতি সুমিষ্ট ছিল এবং সঙ্গীত অতিশয় ভাবগ্রাহী হইত। তাই এই সঙ্গীতবিদ্যারই অধিকতর উৎকর্ষ সাধন করিয়া, তিনি বালিকাদিগকে সঙ্গীতশিক্ষা দান করিতে আরম্ভ করেন। এই কার্য্যে তিনি অনেক পরিবারে পরিচিত হন এবং হিন্দু ব্রাহ্ম সকলের শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও সম্মান লাভ করেন। কিছুদিন দার্জ্জিলিং মহারাণী স্কুলেও বালিকাদিগকে সঙ্গীতশিক্ষা দান করেন এবং মধুর প্রেমপূর্ণ ব্যবহারে ছাত্রীগণের বিশেষ প্রিয় হন। গান করিতে ও শিখাইতে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন। শেষ জীবনেও পাটনা বালিকাবিদ্যালয়ের বোর্ডিংএর বালিকাদিগকে সুবিধা পাইলেই নূতন নূতন ব্রহ্মসঙ্গীত শিখাইতেন। আজও তাহারা প্রায়ই প্রভাতে ঈশ্বরবন্দনার সময় সেগুলি গান করে।

পিতামাতা নাম দিয়াছিলেন তাঁহার প্রেমলতা; সে নামের সার্থকতা যথার্থই তাঁহার জীবনে হইয়াছিল। এমন ভালবাসায় ভরা মন অল্পই দেখা যায়। শুধু স্বামী, কন্যা, ভাইবোন, আত্মীয় বন্ধুবান্ধব নয়, সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কীয় লোকও যে কেহ তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, সকলকেই তিনি আত্মীয় করিয়া লইতে পারিতেন। এই শান্তিকুটীরের মাসীমাকে তিনি বিশেষ ভালবাসিতেন এবং মাসীমাও ঠিক নিজ কন্যার মতই তাঁহাকে স্নেহ করিতেন। একখানি চিঠিতে দেখিতেছিলাম, তিনি গিরিধি গেলে মাসীমা লিখিয়াছেন—"আমার প্রেম, তুমি পাখীর মত উড়ে উড়ে গান গেয়ে বেড়াচ্চ। হঠাৎ শুনলাম তুমি এখানে নাই, যদিও সব সময় তোমাকে কাছে পাই না, তবু মনটা খালি হয়ে গেল; কেমন আছ? তৃপ্তিকুটীরে তৃপ্তিতে আছ।" মাসীমার কাছে সুবিধা পেলেই আসিয়া কয়েকদিন তাঁর কাছে থাকিতে ও তাঁর সেবা করিতে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহার কত যে বন্ধু ছিল, গণনা করা যায় না। Lady Sinha, Lady Mittra, Lady Mukherjee প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত মহিলাগণও তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত বন্ধুভাবে মিশিতেন। আবার সকল সম্প্রদায়ের ধনী নির্ধনী, ইতর ভদ্র, গরীব দুঃখী, শোকার্ত্তা ব্যথিতা, যে কেহ তাঁহার সহিত পরিচিত হইত, সকলেই তাঁহার বন্ধু হইয়া যাইত।

তাঁহার স্বভাবে ও কথায় এমন একটী মিষ্টতা ছিল যে, পথে ট্রেণে বিদেশে যখন যাহার সঙ্গে পরিচয় হইয়াছে, অল্পক্ষণেই তাহার সঙ্গে আত্মীয়তা হইয়া যাইত। পাটনায়, রাঁচিতে, দ্বারভাঙ্গায়ও মজঃফরপুরে অবস্থান কালে, তাঁহার সঙ্গীতে ও মধুর স্বভাবে আকৃষ্ট হইয়া, তাঁহার অনেক নূতন বন্ধু হয়। কয়েকজন ইংরাজ মহিলার সঙ্গেও তাঁহার আলাপ হয়। তাঁহারা এখনও দেখা হইলেই সেজদির কথা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেন। একজন সেজদির একখানি পত্র পাইয়া লিখিয়াছিলেন, "তোমার চিঠি পাইয়া যত আনন্দ হইয়াছে, এক থলি মোহর পাইলেও তাহা হয় না।" মান্দ্রাজে অবস্থিতিকালেও তাঁহার এইরূপ একজন বন্ধু হয়। বিমান লিখিয়াছেন, এখনও তিনি সেজদির বিষয় প্রায়ই জিজ্ঞাসা করেন। সকলেই তাঁহার ভালবাসায় মুগ্ধ হইতেন। একজন সম্ভ্রান্ত বিহারী হিন্দুস্থানী মহিলা সেদিন বলিতেছিলেন, তাঁহার মত প্রেমপূর্ণ হৃদয় আর দেখি নাই।

সরলতা, প্রফুল্লতা, সহাস্যভাব ও সকল সৎকার্য্যে উৎসাহ এই কয়টীও তাঁহার জীবনের বিশেষ গুণ। শত দুঃখ দৈন্য নিরাশাও তাঁহার মুখের হাসি মলিন করিতে পারে নাই। "রোগের বেদনা, শোকের যাতনা, তার সঙ্গে ভবপারের ভাবনা" কিছুই তাঁহার মনের স্বাভাবিক আনন্দকে বিনষ্ট করিতে পারে নাই। এই সেদিন শেষ যখন গিরিডিতে তাঁহাকে দেখিলাম, রোগে দেহ একেবারে শীর্ণ, একাকিনী, অসহায় অবস্থায় রহিয়াছেন, কিন্তু মুখে তবু সেই পবিত্র স্বর্গীয় হাসি।

ছোট বড় সকলের সঙ্গে তিনি প্রাণ খুলিয়া সরল ভাবে মিশিতে পারিতেন। ভ্রাতা ভগ্নীদের কাছে যখন থাকিতেন, পুত্র কন্যাদের লইয়া গান বাজনা শেখান, গল্প বলা, তাদের

খেলার সঙ্গী হওয়া, তাদের জন্ম নূতন নির্দ্দোষ আনন্দের আয়োজন নিত্যই চলিত। ছেলে মেয়েদের লইয়া একবার একটী ক্লাব খুলিয়াছিলেন, তাহার নাম দিয়াছিলেন "নববিধান ক্লাব"। তাহাকে আনন্দের ভিতর দিয়া শিশুদের কোমল হৃদয়ে নীতি ও ধর্ম্মের বীজ রোপণ করিয়াছিলেন। সুশীল, সুধীরা, কুইন প্রভৃতি আমাদের বাড়ীর সব ছেলেমেয়েদের সঙ্গীতশিক্ষার আরম্ভ তাঁহার কাছেই হয়।

সমাজের প্রতি তাঁহার আন্তরিক ভালবাসা ছিল। সমাজের কোন কাজ করিতে পারিলে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিতেন। আর্য্যনারীসমাজে, ভগ্নীসমিতিতে, বাঁকিপুর অঘোরনারী-সমিতিতে, "আমাদের সঙ্ঘে" সুবিধা পাইলেই যোগ দিতেন। মাঘোৎসবে প্রতিবৎসর পরম উৎসাহে যোগ দিতেন। আর্য্যনারীসমাজের উৎসবে, ব্রাহ্মিকা-উৎসবে ভাবের সহিত গান করিতেন। পাটনায় মন্দিরে প্রতি রবিবারেই, শরীর সুস্থ থাকিলে, সঙ্গীত করিয়া সকলের উপাসনার সহায়তা করিতেন। কোন কোন স্থানে মন্দিরে তিনি উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার প্রার্থনা, উপাসনা অত্যন্ত সরল ও আন্তরিক।

মেয়েদের উচ্চ শিক্ষায় তিনি অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। মেজদিদির দুটী মেয়েই উচ্চশিক্ষিতা বলিয়া তিনি বড়ই গর্ব্ব অনুভব করিতেন, এবং তাহাদের সঙ্গে গল্প করিয়া বড়ই তৃপ্ত হইতেন। যে সব মেয়েরা শিক্ষাকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাহাদিগকে তিনি বিশেষ ভালবাসিতেন, সম্মান করিতেন ও উৎসাহ দিতেন।

দাসদাসীগণকে ভালবাসা তাঁর জীবনের বোধ হয় সর্ব্বোচ্চ গুণ। এটী তিনি মাতৃদেবীর কাছেই পেয়েছিলেন। যেখানে যখন থাকিতেন, সকল দাসদাসী তাঁহার বিশেষ বশীভূত হইত। সেজদি যখন যেখানে থাকিতেন, কখনও সেখানে ভৃত্যেরা ছাড়িয়া যাইত না। কেবল মিষ্ট কথায় ও ব্যবহারে তাহাদের বশ করিতেন। শেষ পর্য্যন্ত অল্পবয়স্ক ভৃত্য রামচন্দ্র নিজের মা বাপকে ছেড়ে পাটনা থেকে গিরিডিতে এসে, রোগশয্যায় ৮ মাস যাবৎ, শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যথার্থ প্রাণের সহিত তাঁহার অক্লান্ত সেবা করিয়াছিল। তাহার ঋণ আমরা শোধ দিতে পারিব না। পাটনায় আমাদের বাড়ীর সমস্ত ভৃত্যগণ বলিতেছে, তাঁহার ন্যায় প্রভু তাহারা কখনও পায় নাই। তিনি দেবতা ছিলেন, তাই স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন।

অনেক বৎসর হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছিল। দার্জ্জিলিং থাকিতেই একবার কঠিন Influenza হয়, তাহার পর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াও মধ্যে মধ্যে এই অসুখে ভুগিয়া, পরে তাহা হাঁপানীর আকার ধারণ করে। কখনও ভাল থাকিতেন, আবার কখনও বাড়িত। শেষে গত ডিসেম্বর মাসে গিরিডিতে উপকার হইবে ভাবিয়া, তাঁহার এক ভাসুরপো শ্রীযুক্ত নারানচন্দ্র দেবের বাড়ী যান। এঁকে তিনি ছোট থেকে নিজের কাছে রেখে সন্তানের মতই পালন করেছিলেন। তিনিও কাকীমার এই অবস্থায় প্রাণের সহিত সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছেন। গিরিডিতে প্রিয় শ্রদ্ধেয় যোগাদাদা ঠিক নিজের বোনের মতন যত্ন করিয়া চিকিৎসা করিয়াছেন। সেখানে তিনি অনেকটা উপকার পেয়েছিলেন। ২রা জুলাইও আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার সময়, এখন অনেক ভাল আছেন বলিয়া আমার মনকে নিশ্চিন্ত করেন। কিন্তু ভগবান্ তাঁহার কন্যাকে আর পৃথিবীর যন্ত্রণা ভোগ করিতে দিবেন না স্থির করিয়াছেন, তাই ১৮ই জুলাই প্রত্যুষে সহসা heart fail করিয়া তিনি অনন্তধামে চলিয়া গেলেন।

সেজদি, আজ যে তুমি আর গিরিডিতে নাই, সে কথা তো ভাবতে পারি না। শেষ সময়ে তোমার কাছে থাকতে পেলাম না, সে দুঃখ তো আমাদের কারো কখন যাবে না। ভাই বোনদের যে বড় ভালবাসতে। আজ যে সকলে সন্তপ্ত, তোমার প্রাণের ভাই মেজদা, মনোরথ, বিমান সকলেই শোকে কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। পরলোকে কোথায় তুমি রয়েছ, কেমন মিষ্ট সুরে কি গান করছ, কেমন করে পতির সঙ্গে মিলিত হয়ে, মা, বাবা, দাদা, নদাদা, মাসীমা ও তোমার প্রিয়জনদের সঙ্গে আনন্দে ব্রহ্মনাম করছ, বড় যে দেখতে ইচ্ছা করে। এ পৃথিবী যে অনিত্য, মায়ামরীচিকাময়, ঐ পরলোকেই আমাদের ঘর, ঐখানেই আমাদের দল বাড়ছে, ঐদিকেই আকর্ষণ বাড়ছে। ওখান থেকে, মনে হয়, ডাকছ, অমনি করে বিশ্বাসের সহিত প্রস্তুত থাকতে বলছ। আশীর্ব্বাদ কর, অমনি পবিত্র জীবন যাপন করে, আমরাও যেন অমনি সরল বিশ্বাসী হতে পারি।

দয়াময়ী, মঙ্গলময়ী জননী, তুমি যে তোমার সিংহাসনের আসন থেকে নেমে এসে, একলা বিজন ঘরে বসে তোমার যে কন্যা তোমার গান করছিলেন, তাঁকে বরণডালা হাতে নিয়ে আদর করে নিয়ে গিয়েছ তোমার নিজের কাছে, এতে কি সংশয় আছে? তুমি তাঁকে সুখী কর, মা, আর আমাদের তা দেখতে দিয়ে সান্ত্বনা দাও, শান্তি দাও। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

ব্রাহ্মের লক্ষ্য কি ?

(ব্রহ্মমন্দিরে সামাজিক উপাসনায় নিবেদিত)

যাঁরা আচার্য্যদেবের "ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান" নামক পুস্তিকাখানি পড়েছেন, তাঁরাই জানেন, জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে, ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া, তাঁকে লাভ করা; ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মানন্দরসপান, হৃদিপদ্মে ব্রহ্মপাদপদ্ম ধারণ করা। কিন্তু কয়জন ব্রাহ্ম জীবনের এই লক্ষ্য, জীবনের এই উদ্দেশ্য অনুসারে চলেন? কয়জনের এই লক্ষ্য স্থির আছে? কয়জন এই লক্ষ্য ভেদ করতে

পেরেছেন? সত্য বটে, আচার্য্যদেবের সময় অনেক সাধক ব্রহ্ম-দর্শনের আনন্দে মগ্ন থাকতেন এবং জীবনে তার পরিচয়ও দিয়ে গেছেন; কিন্তু আজকাল ব্রাহ্মসমাজে সে হাওয়া বদলে গেছে, ব্রহ্মোপাসনায় আর মন বসে না, ব্রহ্মোপাসনা আর ভাল লাগে না। খানিকক্ষণ চুপ করে বসে ধ্যান করা যেন সময় নষ্ট করা বলে মনে হয়। এ যুগ কেবল কর্ম্মকাণ্ডের যুগ। কেবল কাজ, কাজ, কাজ। কাজ যে ঈশ্বরাদেশে সেবার ভাবে করতে হয়, অনেক সময় তা আমরা ভুলে যাই। ঈশ্বরকে জীবনের মধ্যবিন্দু করে, তাঁরই আলোকে কণ্টকময় সংসারপথে চলতে হয়। জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর অধীন মানুষের জীবন, সুখ দুঃখের চক্রবৎ পরিবর্ত্তনে আন্দোলিত এই জীবন-পথ, পদ্মপত্রের বারির মত চঞ্চল, তরল তড়িৎ সম ক্ষণস্থায়ী এই দেহ ধারণ করে, যদি আমরা জীবনের ধ্রুবতারাকে হারিয়ে ফেলি, দুর্গতির আর সীমা থাকে না। যাঁরা জীবনের প্রভাত হ'তে, বিধাতার আলোকে, বিধাতার পথে, বিধাতার আদেশে চলতে শিখেছেন, তাঁরাই রক্ষা পান, বেঁচে যান।

"চলতি চাকী সব কোই দেখে, কীল না দেখে কোই,
যো কীল পাকড়কে রহে, সাবেৎ রহে সোই।"

পুরাকালে কি নিয়ম ছিল? তাঁরা কি রকম ভাবে চলতেন? তাঁরা কি রকম করে' জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতেন?

"শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্।
বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম্॥"

তাঁদের শৈশবকালেই সমস্ত বিদ্যা অভ্যস্ত হ'ত, তাঁরা যৌবনে ভোগসুখ অনুভব কর্‌তেন এবং বৃদ্ধ বয়সে মুনিবৃত্তি অবলম্বন ও চরমে যোগবলে তনুত্যাগ কর্‌তেন। এখন কি সে নিয়ম আছে? সেদিন এখন চলে গেছে। বিধাতা মানুষকে আপনার ছাঁচে গড়েছেন; জীবাত্মা পরমাত্মার পুত্র, তাঁরি হচ্ছে অনুরূপ। মানুষ তার দেহ মন আত্মার কত উন্নতি করতে পারে, কত উৎকর্ষ সাধন করতে পারে, মানুষ কত বড় হতে পারে—যা অন্য কোন সৃষ্ট জীব হতে পারে না, তা আমরা দেখেছি। এই মানব-দেহ এমন দৃঢ় ও ভারসহ করা যায় যে, তার বুকের উপর দিয়ে, পেটের উপর দিয়ে চলন্ত মোটর গাড়ী, একশত মণ ভারি লোহার রোলার অনায়াসে টেনে নিয়ে যাওয়া যায়। আমাদের দেহের উন্নতি অসীম বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। মন সম্বন্ধেও তাই। বেদ, বেদান্ত, গীতা, ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র সবই মানুষের তৈয়ারী। এসব মানুষের অসীম জ্ঞানের পরিচয় দিচ্ছে। প্রতিভাবলে মানুষ অলৌকিক কাজ করতে পারে, অসম্ভব সম্ভব করতে পারে। স্মরণশক্তির প্রখরতায় শ্রুতিধর হতে পারে। জ্ঞানের সাহায্যে বিজ্ঞানের অভিনব তত্ত্ব সকল আবিষ্কার করতে পারে। আকাশের চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ উপগ্রহের সঠিক খবর দিতে পারে। এমন কি, উদ্ভিদের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত করতে পারে। নিমেষ মধ্যে ভূমণ্ডলের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে খবর পাঠাতে পারে। বিদ্যাবলে, জ্ঞানের কৌশলে কি না হয়?

অক্ষর, অব্যয়, অজর, অমর, মানবাত্মা অনন্ত উন্নতিশীল, অমৃতের পুত্র। দেবত্ব তার সোণার নিধি, বিধিদত্ত ধন। মানুষ দেবতা হতে পারে, যদি ভগবানের পথে চলে। সকল বিষয়ে বড় হতে পারে। ঈশ্বরের অবতার বলে পূজিত হতে পারে এবং তাই এতকাল হয়ে আসছে। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, ঈশা, মহম্মদ, নানক, চৈতন্য প্রভৃতিকে লোকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করে। তাঁদের মধ্যে এমন সব অসাধারণ গুণের সমাবেশ দেখতে পায়, যে তাঁদের পায়ে লুটিয়ে পড়ে এবং তাঁদের উদ্ধারকর্ত্তা বলে' পূজা করে। ঈশ্বর বলে জানে। এমন কি, মানুষের দশ দশাকে ভগবানের দশ অবতারগ্রহণ বলে কল্পনা করে। জননী-জঠরে ভ্রূণ অবস্থায় মানুষের মীনের আকার। ভূমিষ্ঠ হ'বার পর কূর্ম্মের মত সে হামাগুড়ি দিয়ে চলে। শৈশব অবস্থায় বরাহের মত বিষ্ঠা চন্দনে সমজ্ঞান। তারপর তার অর্দ্ধেক মানুষ, অর্দ্ধেক জন্তুর আকার। বাল্যে বামনাকার। যৌবনে পরশুরামের মত কুঠার হস্তে সে অদ্বিতীয় বীর। প্রৌঢ়াবস্থায় শ্রীরামচন্দ্রের মত আদর্শ মানুষ, অবিচলিতচিত্ত দৃঢ়ব্রত পুরুষ। বার্দ্ধক্যে বলরামের মত নানাতীর্থপর্য্যটনকারী মুনি। তারপর সে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত যোগী, বুদ্ধ। এক্ষণে কলিতে সে কল্কী অবতার। যাঁরা বিবর্ত্তন মানেন, তাঁরাও সেই রকম কল্পনা করেন। প্রথমে ধরা জলময় ছিল। জলে মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি বিচরণ করত। তারপর ডাঙ্গায় জন্তুর উদয় হলো; ক্রমশঃ খানিকটা জন্তু, খানিকটা মানুষের আকার পেল। তারপর বামনাকার ছোট ছোট মানুষ হলো। ক্রমে জীব পূর্ণাঙ্গের মানুষের আকারে পরিণত হলো। প্রথমে মানুষ অসভ্য ছিল; জ্ঞান, সভ্যতা কিছুই ছিল না। ক্রমশঃ জ্ঞান, বুদ্ধি, সভ্যতার বলে সে বড় হলো, বিশ্বসভায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করলো। যাঁরা পূজা, অর্চ্চনা, যাগ, যজ্ঞ, হোম, ব্রতপালন, বেদ অধ্যয়ন, বেদগান, ব্রহ্মোপাসনা, ব্রহ্মধ্যান প্রভৃতি করতেন, তাঁরা ব্রাহ্মণ হলেন; যাঁরা যুদ্ধ করে' দুষ্টের দমন, শত্রুর নিধন, রাজ্যস্থাপন করতে লাগলেন, তাঁরা ক্ষত্রিয় হলেন; যাঁরা কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত রইলেন, তাঁরা বৈশ্য হলেন। পরাজিত, অসভ্য, বর্ব্বর জাতিরা শূদ্র থেকে গেল।

আর্য্য ঋষিরা উচ্চকণ্ঠে গাহিলেন:—

"তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি॥"

যার মন ব্রহ্মমনন করে না, তার জীবন ধারণ করা বৃথা, সে মৃত। আরও বল্লেন, "নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্।" অনন্তের পূজা, অনন্ত আয়োজন, অনন্ত অন্বেষণ; গণ্ডী, সীমা, অন্তরেখা নাই। জীবাত্মা পাশমুক্ত, অনন্ত পথের যাত্রী; কেউ তাকে ধরে রাখতে পারে না। অল্পে তার তুষ্টি হয় না। অকূল সমুদ্রে সাঁতার দিতে চায়। বিপুল উৎসের সন্ধানে ছুটে যেতে সে চায়। প্রাণ-সখাকে বুকে ধরতে চায়। "এত যদি দিয়ে

সখা, আরো দিতে হবে হে, তোমারে না পেলে আমি ফিরিব না ফিরিব না।" এই তার প্রার্থনা। আচার্য্যদেবও বলেছেন, যে হৃদয়-সখাকে সদা হৃদয়ে বিরাজিত দ্যাখেনা, সে আবার কিসের ব্রাহ্ম?

দিন যায়, ক্ষণ যায়, সময় বেগে ধায়; সুযোগ, সুবিধা, সুবাতাস বহে যায়। বিধাতার প্রসাদ-তরণী অবিরামগতিতে চলেছে। যুগযুগান্তের তপস্যার ফলে অমূল্য মানবজন্ম লাভ করে, আমরা কি করলুম? সোণাফলা জমিতে কি আবাদ করলুম? ব্রাহ্মসমাজে এসে, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করে, জীবনের কি সদ্ব্যবহার করলুম? কলিতে নিরাকার ভগবান্‌কে দেখা যায়, তাঁর কথা শুনা যায়, তাঁর স্পর্শ পাওয়া যায়, তাঁর সহবাসানন্দ ভোগ করা যায়, এই নতুন সংবাদ পেয়েও আমরা মিছে কাজে দিন কাটালুম। আমাদের দায়িত্বের গুরুত্ব বুঝতে পারলুম না। গোণা দিনের আয়ু নিঃশেষ হয়ে এল। অপরিমিত, অভূতপূর্ব্ব, গচ্ছিত মানব-জীবনের এই পরিণাম, এই নিয়তি, এইখানেই কি সমাপ্তি? ঐ শোন, মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আস্‌ছে। ভূমানন্দের মহা আহ্বান-শঙ্খ কি দুর্জ্জয়, তীব্র ধ্বনি করছে? "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" এই শব্দ দিবানিশি স্তব্ধতা মথিত করে অনাহত বাজছে। এ জীবন ছেলেখেলা নয়, বৃথা ক্ষয় করবার নয়। Life is real, life is earnest, grave is not its goal. জলের বিম্ব জলে উদয় হয়ে, হঠাৎ জল হয়ে জলে মিশিয়ে যাবার মত নয়। অনন্ত উন্নতির রাজটিকা কপালে লেখা। শাশ্বত, অক্ষয় মুক্তির হিরণ্ময় মুকুট অদূরে অলক্ষ্যে বিরাজমান। বিদ্যা, বুদ্ধি, টাকা-কড়ি, মান, মর্য্যাদা, সুখ সৌভাগ্য আমাদের কাম্য নয়, প্রেয় নয়। দু'দিনের পান্থনিবাস, আমাদের চিরবাসস্থান নয়। যাত্রা এই সবে সুরু হয়েছে, দীর্ঘপথের অনেক বাকী। অনন্ত বিশালবক্ষ চিদানন্দসাগর সাম্‌নে ধূ ধূ করছে। খেলনা-প্রত্যাশী শিশুর মত আত্মা অবোধ নয়। কলুর চোখঢাকা বলদের মত ঘুরতে সে এখানে আসে নি। "নলিনীদলগত-জলমতি তরলম্, তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্" বলে উড়িয়ে দেয় না। এ জীবন নিশার স্বপন, সে কথা সে বলে না; সসাগরা ধরার আধিপত্য তার চরম লক্ষ্য নয়। তার বাণী, "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্।" "অমর হব, এমনি রব, দয়াল হরির চরণ ধরে", এই তার বাসনা, কামনা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

শ্রীকেশবচন্দ্র ও বঙ্গের মুসলমান সমাজ।

ভারতের বিখ্যাত সমাজসংস্কারক শ্রীযুক্ত এন, জি, চণ্ডাভারকার, ৮ই জানুয়ারী, এক স্মৃতিসভায় বলিয়াছিলেন যে, "ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র শুধু বঙ্গদেশের কি ভারতের লোক নহেন, কিন্তু সর্ব্বদেশময় ব্যাপ্ত, সর্ব্বসম্প্রদায়ভুক্ত একটী মহামানব; মানুষ মাত্রেরই তাঁহার উপর স্বভাবতঃ পূর্ণ অধিকার।" এই বিশ্বপ্রেমিকের মহাপ্রস্থানের পরে একটী একটী করিয়া প্রায় ৫০ বৎসর আসিল এবং চলিয়া গেল। শ্রীযুক্ত চণ্ডাভারকারের বাণী যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য, তাহার অভ্রান্ত প্রমাণ এই অর্দ্ধ শতাব্দীর ভিতরেই চতুর্দ্দিকে নানা অবস্থার ভিতর দিয়া নানা আকারে ফুটিয়া উঠিতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বাঙ্গালা প্রদেশ সাম্প্রদায়িক বিবাদের একটী প্রধান কেন্দ্রস্থল বলিয়া চিহ্নিত হইলেও, এখানকার মুসলমানসমাজ ব্রহ্মানন্দদেবকে ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ বলিয়া সরলপ্রাণে স্বীকার করিতেছেন।

বাস্তবিকই বঙ্গের উচ্চ শিক্ষিত মুসলমানগণের মধ্যে এমন অনেকে দল বাঁধিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন, যাঁহারা সত্যের খাতিরে সাম্প্রদায়িকতা পরিহারপূর্ব্বক, নববিধান-মণ্ডলীর সঙ্গে উদার ধর্ম্মভাবের আদান প্রদান করিতে খুবই ইচ্ছুক, এবং সুযোগ পাইলেই এইরূপ ভাব-বিনিময় করিয়াও থাকেন। ইহার একটী কারণ এই বলিয়া মনে হয় যে, তাঁহারা হজরত মহম্মদের বিশ্বজনীন ধর্ম্মভাব নববিধানের ভিতরে পরিস্ফুট আকারে দেখিতে পাইতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা অগ্রগামী, তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, মুসলমান সমাজ ও হিন্দু সমাজের প্রকৃত মিলন যদি কোন দিন সম্ভবপর হয়, তবে তাহা কেশবপ্রচারিত মহাসমন্বয়বাদকে মধ্যবিন্দু করিয়াই হইবে। এই সত্যনিষ্ঠ স্বাধীনচিন্তাপথের পথিক ইসলামবাদিগণ শ্রীকেশবচন্দ্রকে কি যে গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির চক্ষে দর্শন করেন, তাহা ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা ঘটনার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতেছে। এখানে দুই একটী দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি।

১। বাঙ্গলা ভাষার বিশ্বস্ত সেবক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কাজী মোতাহার হোসেন এম্,এস্,সি, সাহেব মৎপ্রণীত "কেশব-সমাগম" গ্রন্থের সমালোচনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন,—

"যে সমস্ত মহাপুরুষের চেষ্টা ও যত্নে বাঙ্গালী সমাজ অধঃপাতের মুখ হইতে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উন্নীত হইয়াছে, স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন তাঁহাদের মধ্যে একজন। তাঁহার যুগ বাঙ্গালীর এক মহাগৌরবময় সৃষ্টিযুগ।

"শ্রীযুক্ত মতিলাল দাশ মহাশয় 'শ্রীকেশব-সমাগম' নামক একখানা পুস্তিকায় মহাপুরুষ কেশবচন্দ্রের আধ্যাত্মিক জীবনের

পরিচয় দিয়া বাঙ্গালী পাঠকবর্গের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। আত্মিক জীবনের আলোচনায়ই মানুষের কর্ম্মজীবনের মূল সূত্রগুলি খুঁজিয়া পাওয়া যায়। মতিলাল বাবু ভক্তির চক্ষে শ্রীকেশবকে দর্শন করিয়া, উক্ত মহাপুরুষের চরিত্র ও সাধনার বিকাশ কিরূপে হইল, তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যুক্তি তর্কের চেয়ে ভক্তিই সহজভাবে প্রাণ স্পর্শ করে। তাই পুস্তকখানা বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। মতিলালবাবু নিজেও একজন সাধক। প্রথম অধ্যায়ে, কিরূপে তিনি শ্রীকেশবের সহিত আধ্যাত্মিক যোগ অনুভব করিতেন, তাহার অতি চমৎকার বর্ণনা করিয়াছেন। একটী আলোক-পিপাসী আত্মার আলোক-প্রাপ্তির ইতিহাস মনোরম হইবারই কথা। তারপর নববিধানের সমন্বয়বাদ ও অন্যান্য প্রধান আদর্শগুলি প্রকটিত করিয়া, বিশেষ ভাবে শ্রীকেশবের বিশ্বাসতত্ব, ভক্তি-যোগ এবং প্রেম ও পবিত্রতা সাধন বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। সর্ব্বত্রই কেশবচন্দ্রের নিজের লেখা হইতে অসংখ্য উৎকৃষ্ট বাণী উদ্ধৃত করিয়া প্রতি-পাদ্য বিষয়ের প্রাঞ্জলতা বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইহাতে পুস্তকখানা অধিকতর সরস ও মূল্যবান্ হইয়াছে।

"কেশবচন্দ্রের অদ্ভুত পাপ-বোধ, উদার সমন্বয়বাদ, সরল প্রেম, নিরহঙ্কার সেবা-বৃত্তি, মুক্তি বিষয়ে আশাবাদ, সহজ স্বাভাবিক যোগতত্ব এবং ভগবানে নির্ভরশীলতার কথা চমৎকার ভাবে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে।"

২। আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত, বাঙ্গলা সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত, "স্মৃতির ফুল", "অরুণ আলো" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা মৌলনা নুর আহাম্মদ এম, এ, সাহেব লিখিয়াছেন,—

"শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল দাশ মহাশয়ের লেখা 'শ্রীকেশব-সমাগম' পুস্তকখানি পরম আগ্রহের সহিত পড়লুম। তিনি ভক্ত ও জিজ্ঞাসু মন নিয়ে স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের যে জীবনা-লোচনা করিয়াছেন, তা ভাবে ভাষায় চরিত্রসৃষ্টিতে সার্থক হয়েছে। কেশবচন্দ্র বহু গুণের অধিকারী ও বিরাট্ মনীষা-সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সে ব্যক্তিত্ব ও মনীষা পরম হৃদয়গ্রাহী এবং শিক্ষাপ্রদ ভাবে আর কারো লেখায় এমন ভাবে ফুটে উঠেছে বলে আমার মনে পড়ে না। বস্তুতঃ যাঁরা স্বর্গীয় কেশবচন্দ্রের অনন্যসাধারণ জীবনের সাথে পরিচিত হতে চান, এ পুস্তক তাঁহাদিগকে সে বিষয়ে প্রচুর সাহায্য করবে।

"সঙ্কীর্ণ সামাজিকতার ঊর্দ্ধে যে সমস্ত মহাপুরুষ বিশ্বপ্রেমের ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের দীপশিখা জ্বালিয়েছেন, তাঁরা যুগে যুগে জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে মানুষের নমস্য। শ্রদ্ধেয় কেশবচন্দ্রও সে নমস্য-দের একজন। তাঁর দৈনন্দিন জীবনের 'রোজ নামচা', তাঁর জীবনবেদের অনেকখানি খবর আমরা এই পুস্তকে পাই, আর পাই তাঁর অমৃতবাণীর আস্বাদ, তাঁর জীবন খাতার যোগ বিয়োগের হিসাব নিকাশ। যাঁরা নূতন পথের যাত্রী, তাঁদের ভাগ্যে চিরজীবন অভিশাপের জয়টিকা অক্ষয় হয়ে থাকে। আরবের অন্ধকার মরুবুকে যখন হজরত মোহম্মদ নূতন জীবনের দিকে, ভবিষ্যৎ কল্যাণসুন্দর পথের দিকে মানুষকে চালিত করতে চেয়েছিলেন, তখন পেলেন তিনি মানুষের অভিশাপ, খেতাব পেলেন পাগল যাদুকর। কেশবচন্দ্রের ভাগ্যেও ছিল তাই, কিন্তু তিনি দেখ্‌ছিলেন এই অসম্মান অভিশাপের পেছনে সৃষ্টিসুন্দরের অভিনব স্বপন। মানুষের দেওয়া গালিকে তাই তিনি দলিত করে গেছেন নির্ব্বিকারচিত্তে বাসী ফুলের মতো।

"শ্রীযুক্ত মতিলাল বাবুর বইখানিতে একটী জাগ্রৎ জীবনের সুষ্ঠু সুন্দর ইতিহাস পাই, এজন্য তাঁর নিকট আমরা ঋণী।"

বলা বাহুল্য যে, কেশবচরিত্রের যাদুশক্তিপ্রভাবে হিন্দু-সমাজের সুধী ও সাধকগণের মধ্যেও অনেকে "শ্রীকেশব-সমাগম" গ্রন্থ আগ্রহ ও নিষ্ঠার সহিত পাঠ করিয়া খুবই আনন্দিত হইয়াছেন।

চারিদিক হইতে এই ভাবের উৎসাহ ও সহানুভূতি লাভ করিয়া, আমি কেশবজীবনের কাহিনী অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয় খণ্ড "শ্রীকেশব-কাহিনী" প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইয়াছি। আগামী ভাদ্রোৎসব উপলক্ষেই আমার সাধনার এই দ্বিতীয় ফলটী প্রিয় নববিধানমণ্ডলীর হস্তে অর্পণ করিতে পারিব বলিয়া আশা করি।

মঙ্গলকুটীর, বিধানপল্লী;
ঢাকা।
শ্রীমতিলাল দাশ।

—•—

সংবাদ।

জন্মদিন—কলুটোলায়, কুঞ্জভবনে, গত ১৩ই জুলাই, পূর্ব্বাহ্ণে, শ্রীযুক্ত গগনবিহারী সেনের মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ প্রদ্যোৎকুমারের জন্মদিনে, ১লা আগষ্ট, পূর্ব্বাহ্ণে, শ্রীযুক্ত গগনবিহারী সেনের জন্মদিনে, ৪ঠা আগষ্ট, সন্ধ্যায়, শ্রীযুক্ত কুমুদবিহারী সেনের স্বর্গীয় পুত্র বিধানকুমারের ও শ্রীযুক্ত গগনবিহারী সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুজিতকুমারের জন্মদিনে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

ভাই প্রিয়নাথের পঞ্চসপ্ততিতম জন্মদিনস্মরণে, শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে, গত ১৬ই জুলাই, ৩২শে আষাঢ়, সন্ধ্যায়, বিশেষ উপাসনা হয়। স্থানীয় বন্ধুগণ কেহ কেহ যোগদান করেন। ভ্রাতা রসিকলাল বিশেষ প্রার্থনা করেন।

গত ২২শে জুলাই, স্বর্গীয় কিশোরীমোহন দাস বড়ুয়ার পুত্র শ্রীমান্ বিদুরের জন্মদিনে ভাই প্রিয়নাথ নবদেবালয়ে বিশেষ উপাসনা করেন।

গত ১১ই আগষ্ট, ৬৩।৭ হ্যারিশন রোডে, বিধানমুরলী শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পুত্র শ্রীমান্ ধ্রুবের জন্মদিনে ভাই অক্ষয়কুমার নন্দ উপাসনা করেন। পিতা সন্তানের কল্যাণ

ভিক্ষা করিয়া বিশেষ প্রার্থনা করেন। প্রচারভাণ্ডারে ১৲ দান করা হয়।

জাতকর্ম্ম—গত ৭ই আগষ্ট, ১৫বি, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে, শ্রীমতী অশোকলতা দাসের গৃহে, তাঁহার দৌহিত্র ও অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীমান্ হুমায়ুন কবীরের নবজাত শিশুপুত্রের জাতকর্ম্ম উপলক্ষে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। মাতা শ্রীমতী শান্তি নবসংহিতা হইতে জাতকর্ম্মের প্রার্থনা পাঠ করেন। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ৫৲ টাকা দান করা হইয়াছে। শিশুটী গত ৩০শে জুন, কলিকাতায়, উক্ত গৃহে জন্মগ্রহণ করে।

গত ১০ই শ্রাবণ, ১এ মন্মথ ভট্টাচার্য্য ষ্ট্রীটে, শ্রীমান্ বিজয়মোহন সেনের নবজাত শিশুপুত্রের জাতকর্ম্ম অনুষ্ঠানে শ্রীমতী কুমুদিনী দাস উপাসনা করেন। শিশুটী গত ২৮শে আষাঢ়, জন্মগ্রহণ করে। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ১৲ দান করা হইয়াছে।

ভগবান্ নবজাত শিশুদিগকে ও তাহাদের পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

নামকরণ—গত ১২ই আগষ্ট, ১৪৫এ, ল্যান্‌স্‌ডাউন রোডে, ডাঃ সত্যানন্দ রায়ের শিশুপুত্রের শুভনামকরণানুষ্ঠানে, শ্রদ্ধেয় কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন, এবং শিশুকে "সুনন্দন" নাম প্রদান করেন। জন্মমাত্র মাতৃহীন হইলেও, পরমজননীর বিশেষ স্নেহ ও আশীর্ব্বাদে, পিতার অক্লান্ত সস্নেহ যত্নে, একাধারে পিতৃমাতৃকর্ত্তব্যসাধনে ও লালনপালনে এবং সকলের শুভাকাঙ্ক্ষায় শিশু যে দিন দিন আপদ বিপদ হইতে রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে, এজন্য সকলের মনেই কত আনন্দ। এখন সকলেরই প্রাণের প্রার্থনা. "সুনীতির" নন্দন প্রকৃত "সুনন্দন" হয়ে, পিতার প্রাণের নিত্য সান্ত্বনা ও মণ্ডলীর গৌরব হউক। নববিধানজননী শিশুকে ও শিশুর পিতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

শুভবিবাহ—গত ৯ই আগষ্ট, বুধবার, শ্রীহট্ট-নিবাসী স্বর্গগত রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র দেবের তৃতীয় পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রচন্দ্রের সহিত, ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের চতুর্থ কন্যা কল্যাণীয়া কুমারী উমা দেবীর শুভবিবাহ, কলিকাতায়, ৯৪।১সি গড়পার রোডস্থ ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করেন। ভগবান্ নবদম্পতিকে স্বর্গের শুভাশীষ দান করুন।

উৎসব—গত ১লা আগষ্ট, ব্রহ্মানন্দাশ্রমের দ্বাত্রিংশতম সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে, দুই বেলা উপাসনা, প্রীতিভোজন, শিশুসম্মিলন, বন্ধুসমাগম, পাঠ ও আলোচনা ইত্যাদি যথাবিহিত সম্পন্ন হইয়াছে।

পারলৌকিক—আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে গত ১লা আগষ্ট, মজঃফরপুরে, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের দ্বিতীয় জামাতা, ঢাকার শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসুর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ অনিলকুমার বসু, ৩০বৎসর বয়সে, টাইফয়েডে, পিতামাতা, অল্পবয়স্কা স্ত্রী, একমাত্র শিশুকন্যা ও বহু আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়া অমরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। যোগেশ বাবু শোকার্ত্তা কন্যাকে লইয়া কলিকাতা আসিয়াছেন। গত ১১ই আগষ্ট, ঢাকায় শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতায়, যোগেশ বাবুর গৃহ, ১০নং নারকেলবাগান লেনে, গত ১৩ই আগষ্ট, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ পরলোকগত আত্মার কল্যাণার্থ বিশেষ উপাসনা করেন; ১৪ই সন্ধ্যায় বিধানমুরলী শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে পরলোক-সম্বন্ধীয় সুন্দর কীর্ত্তন হয়, ভাই অক্ষয়কুমার লধ প্রার্থনা করেন। ভগবান্ পরলোকগত আত্মার কল্যাণ করুন এবং সকল শোকার্ত্ত প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনা দিন।

সেবা—গত ২৩শে জুলাই, প্রাতে, দেউলটীনিবাসী ভ্রাতা সত্যচরণ সিংহের বাড়ীতে, তাঁর বিশেষ আহ্বানে, পরিবারস্থ সকলকে লইয়া ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন এবং সন্ধ্যায় বাগনান ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা করেন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ৩০শে জুলাই, কলিকাতায় শান্তিকুটীরে, স্বর্গগত শান্ত সাধক ভাই কেদারনাথ দের তৃতীয়া কন্যা ও স্বর্গীয় রাধানাথ দেবের সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া প্রেমলতা দেবের আদ্যশ্রাদ্ধ পবিত্রভাবে শ্রদ্ধাসহকারে ভ্রাতাভগ্নীগণকর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ উদ্বোধন ও আরাধনা, ভাই অক্ষয়কুমার লধ পাঠ ও ভাই গোপালচন্দ্র গুহ শেষ প্রার্থনা করিয়া শান্তিবাচন করেন। তৃতীয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মনোরথধন দে প্রধান শোককারী রূপে প্রার্থনা করেন। কনিষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমতী বনলতা দে ভগ্নীর সুন্দর জীবনী পাঠ করেন; তাহা অন্যত্র দেওয়া গেল। অন্য কুচবিহারেও, কুচবিহার কলেজের প্রিন্‌সিপাল শ্রীযুক্ত মনোরথধন দের গৃহে শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র আইচ উপাসনা করেন। মান্দ্রাজে, কনিষ্ঠভ্রাতা, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ডাঃ বিমানবিহারী দেও ভগ্নীর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। শ্রদ্ধেয় এস্‌, সি, বানার্জি উপাসনা করেন। ডাঃ দে ভগ্নীর জীবনী পাঠ করেন এবং ১০৲ টাকা তত্রত্য কালাবোবা স্কুলে এবং ৪০৲ টাকা স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন ফণ্ডে দান করেন। এই উপলক্ষে কলিকাতায় ভ্রাতা ভগ্নীগণ নিম্নলিখিত দান করিয়াছেন—

কলিকাতা—ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির ১০৲, ব্রহ্মমন্দিরের অর্গ্যান মেরামতের জন্য ১০৲, নববিধান প্রচারভাণ্ডার ২০৲, আমাদের সঙ্ঘ ৫৲, ভগ্নিসমিতি ৫৲, দীপালি শিক্ষামন্দির ১০৲, সাধু প্রমথলাল শিক্ষাতীর্থ ১০৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ১০৲, স্যালভেসন আর্মি ৫৲, বাণীভবন ৫৲, পুণ্যাশ্রম ৫৲; বাঁকিপুর—ব্রহ্মমন্দির ১০৲, অঘোরনারীসমিতি ৫৲; গিরিধি—ব্রহ্মমন্দির ১০৲, ঢাকা—নববিধানসমাজ ১০৲, মুঙ্গের—প্রমথলাল যাত্রিনিবাস ১০৲; সঙ্গীতের জন্য পুরস্কার—ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউসন ১০৲, দার্জ্জিলিং মহারাণী স্কুল ১০৲, পাটনা বালিকাবিদ্যালয় ১০৲, সঙ্গীতসম্মিলনী ১০৲; প্রচারকগণের জন্য বস্ত্রাদি ৩০৲, চিকিৎসকগণকে

রজতপাত্রের স্মৃতি-উপহার ৮০৲, দরিদ্রদিগকে চাউল, পয়সা ও বস্ত্রাদি (গিরিডি, কলিকাতা এবং পাটনা) ৫০৲, প্রিয় ভৃত্য রামচন্দ্রকে কাপড় ও জামা ১০৲, ভোজা ১টি শান্তিকুটীর প্রচারাশ্রমের জন্য ১০৲; মোট ৩৬০৲ টাকা।

কৃতিত্ব—আমরা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম, ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষের ভাইঝি, ইন্দোরের পোষ্ট মাষ্টার শ্রীযুক্ত প্রমোদ কুমার ঘোষের কনিষ্ঠা কন্যা ডাক্তার কুমারী সুবর্ণা কৃতিত্বের সহিত এম,বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এতদুপলক্ষে কন্যার মাতৃদেবী শ্রীমতী সুহাসিনী ঘোষ প্রচারভাণ্ডারে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। ভগবান্ তাঁর প্রিয়তমা কন্যাকে শুভাশীষ দান করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ২০শে জুলাই, শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে, স্বর্গীয় গৃহস্থ বৈরাগী সাধক রাজমোহন বসুর পত্নী সাধ্বী ক্ষেমঙ্করী দেবীর সাম্বৎসরিকদিন-স্মরণে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা ও ভ্রাতা রসিকলাল রায় প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে আশ্রমের সেবিকা প্রচার ভাণ্ডারে একটাকা দান করিয়াছেন। কটকেও মধুভবনে বিশেষ উপাসনা হয়।

গত ২৪শে জুলাই, বারিপদায় বিনয়কুটীরে, ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্বৎসরিকে, ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন; ভাই নগেন্দ্রনাথ তাঁর পিতৃদেবের রচিত সঙ্গীত ও পিতৃচরিত্রের দেবভাবগুলি লাভের জন্য প্রার্থনা করেন।

বিগত ৩১শে জুলাই, ১৫ই শ্রাবণ, অমরাগড়ীতে সমাধিমন্দিরে, প্রাতে স্বর্গীয় ভাই ফকির দাসের ত্রিচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনার কার্য্য করেন। রাত্রিতে জমাট সংকীর্ত্তন এবং পাঠ ও প্রার্থনা হয়। অদ্য হাওড়ায় জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী হেমপ্রভার গৃহে, ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে ৩রা আগষ্ট অপরাহ্ণে, জয়পুর ফকিরদাস হাইস্কুলে, শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে, স্মৃতিসভায় প্রায় দেড়শত ছাত্র ও শিক্ষক যোগদান করেন। সভাপতি, সহকারী প্রধান শিক্ষক, পণ্ডিত বৃদ্ধ রামপদ মণ্ডল এবং সেবক ভাই অখিলচন্দ্র রায় ভক্তের ভক্তিময় জীবনের বিষয় বলেন।

গত ২৯শে জুলাই, কুচবিহারে, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের গৃহে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র করুণাকুমারের সাম্বৎসরিক দিনে, কেদারবাবু উপাসনা করেন।

গত ৭ই আগষ্ট, বাগনানে ভ্রাতা রসিকলাল রায়ের পত্নী স্বর্গীয়া ভুবনেশ্বরীর স্বর্গারোহণদিনে ভাই প্রিয়নাথ বিশেষ উপাসনা করেন।

গত ৮ই আগষ্ট, ২৮।১, চক্রবেড়ে লেনে, কুমার কমলেন্দ্র নারায়ণের শিশু পুত্রের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

দানপ্রাপ্তি—শ্রদ্ধা, বিনয় ও কৃতজ্ঞতার সহিত, দাতাদিগকে প্রণাম করিয়া, নিম্নলিখিত দান-প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। ভগবান্ দাতাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

মার্চ্চ—১৯৩৩,—শ্রীযুক্ত মতিরাম সখীরাম আদভানী মাসিক দান ২৫৲, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন মাসিকদান ২৲, শ্রীমতী সরলা সেন মাসিকদান ২৲, শ্রীমতী হেমন্তবালা চাটার্জ্জি মাসিক দান ১৲, শ্রীমতী মাধবীলতা চাটার্জ্জি মাসিকদান ১৲, শ্রীযুক্ত গগনবিহারী সেন মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী সুমতি মজুমদার মাসিকদান ১৲, স্বর্গীয় অমৃতলাল ঘোষের পুণ্যস্মৃতিতে মাসিক দান ২৲, শ্রীমতী সরলা দাস মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন মাসিকদান ১৲, শ্রীমান্ সুকুমার চৌধুরী পিতৃশ্রাদ্ধে ২৲, শ্রীমতী ইন্দু সিংহ শ্বশ্রুমাতার সাম্বৎসরিকে ২৲, শ্রীযুক্ত মনোমোহন দে পিতৃসাম্বৎসরিকে ২৲, শ্রীমতী মনোরমা মুখার্জ্জি মাসিকদান দুইমাসের ৪৲ ও পিতৃসাম্বৎসরিকে ১০৲, ডাঃ উমাপ্রসন্ন ঘোষ মাসিকদান ২৲, শ্রীমতী হেমলতা চন্দ পিতৃসাম্বৎসরিকে ২৲, শ্রীমতী বনলতা দে পিতৃসাম্বৎসরিকে ১০৲, শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী সেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সাম্বৎসরিকে ১৲, স্বর্গীয় রায় বাহাদুর ডাঃ মতিলাল মুখোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী স্বামীর সাম্বৎসরিকে ১৫৲ টাকা।

এপ্রিল, ১৯৩৩—শ্রীযুক্ত মতিরাম সখীরাম আদভানি মাসিক দান ২৫৲, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন মাসিকদান ২৲, শ্রীমতী সরলা সেন মাসিকদান ২৲, শ্রীমতী হেমন্তবালা চাটার্জি মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী মাধবীলতা চাটার্জি মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী সুমতি মজুমদার মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী সরলা দাস মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন মাসিকদান ১৲, স্বর্গীয় অমৃতলাল ঘোষের পুণ্যস্মৃতিতে মাসিকদান ২৲, শ্রীযুক্ত গগনবিহারী সেন মাসিকদান ১৲, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মাসিকদান দুইমাসের ৪৲, শ্রীযুক্ত যোগানন্দ প্রামাণিক প্রথম পৌত্রীর নামকরণে ২৲, রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় মাসিকদান দুইমাসের ৪৲, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার গুপ্ত পত্নীর সাম্বৎসরিকে ১০৲, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মজুমদার পিতৃসাম্বৎসরিকে ৫৲, ডাঃ উমাপ্রসন্ন ঘোষ মাসিকদান দুই মাসের ৪৲, শ্রীমতী মনোরমা মুখার্জি মাসিকদান ২৲, শ্রীযুক্ত সুপ্রকাশচন্দ্র দাস পুত্র "ধ্রুবের" সাম্বৎসরিকে ২৲, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার মাসিকদান ৫৲, লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল জ্যোতিলাল সেন (I.M.S.) মাসিকদান পাঁচমাসের ১০৲, শ্রীমতী সরোজিনী সরকার ২৲, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মিত্র শ্বশুরের আদ্যশ্রাদ্ধে ২৲, শ্রীমতী সুশীলা পাল স্বর্গীয় স্বামী দ্বিজেন্দ্রনাথ পালের আদ্যশ্রাদ্ধে ১০৲, শ্রীমতী সুমতি সেহানবিশ স্বামীর সাম্বৎসরিকে ২৲, ডাঃ শৈলেন্দ্রভূষণ দত্ত পিতৃসাম্বৎসরিকে ৪৲, শ্রীযুক্ত মিলনানন্দ রায় ভ্রাতার শুভ বিবাহে ২৲, শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ গুপ্ত মাতৃসাম্বৎসরিকে ২৲ টাকা।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক ২রা ভাদ্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৮ ভাগ। ১৬শ সংখ্যা। | ১৬ই ভাদ্র, শুক্রবার, ১৩৪০ সাল, ১৮৫৫ শক, ১০৪ ব্রাহ্মাব্দ। 1st. September, 1933. | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

মা, ধন্য তুমি, যে আবার একটি ভাদ্রোৎসব আনিলে ও আমাদের ভাগ্যে তাহা সম্ভোগ করিতে দিলে। উৎসব মাত্রেই স্বর্গীয়, উৎসব মাত্রেই তোমার স্বহস্তের দান, মানুষের চেষ্টায় উৎসব আসে না, মানুষের আয়োজন উদ্যোগে উৎসব হয় না। সাধারণ উপাসনা সাধন সাধনায় হইতে পারে, কিন্তু উৎসব স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হয়। জীবন্ত ঈশ্বর, তোমার প্রত্যক্ষ কৃপা-গুণেই উৎসব সম্ভোগ হয়। তাই ঝড়ের সঙ্গে, বানের সঙ্গে উৎসবের উপমা দেওয়া হয়। বাতাস সাধারণতঃ দৈনন্দিন বয়, নদীর স্রোত দৈনন্দিন প্রবাহিত হয়। কিন্তু যেমন আকস্মিক ভাবে আকাশে ঝড় উঠে, কিম্বা নদীতে বান ডাকে; তাহা সাধারণ নিয়মে হয় না, বিশেষ বিধানে হয়। এই জন্য স্বভাবতঃই বিশ্বাসী মাত্রেই উপলব্ধি করেন, উৎসব ভগবানের বিশেষ কৃপা, বিশেষ বিধান। উৎসবের সময় উপাসনা, প্রার্থনা, গান, সংকীর্ত্তন, ধ্যান, ধারণা, আলোচনা, পাঠ, প্রসঙ্গ, প্রীতিভোজন, বন্ধু-সম্মিলন, পরস্পরের ভাবের বিনিময় সকলই যেন ঐশ্বরিক, সকলই যেন নূতন, সকলই যেন বিশেষ ভাবে মনকে স্বর্গের দিকে সমুন্নত করে; সকলই যেন অমানুষিক ভাবে কোথা হইতে আসে, কোথায় লইয়া যায়। সকল উৎসবেই ইহা অনুভব হয়, সম্ভোগ হয়। বিশেষ ভাবে এই যে, মা, তুমি ভাদ্রোৎসব আনিয়া দিলে, নববিধানে ইহা যে যথার্থই অলৌকিক, ইহা কি কেহ আমরা অস্বীকার করিতে পারি? রাজর্ষি শ্রীরামমোহন এই ভাদ্রমাসে তোমারই প্রেরণায় "ব্রাহ্মীয় সভা" স্থাপন করেন। ইহা হইতেই ত নবযুগধর্ম্মের বীজ উপ্ত হইল। আবার নববিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ যে তোমারই আদেশে ও আলোকে এই মাসেই নববিধানের নব উপাসনা-প্রণালী প্রবর্ত্তন ও প্রতিষ্ঠা করিলেন, ইহা কি সামান্য? বাষ্পীয় কল যে দিন আবিষ্কৃত হইল, সেই দিন যেমন বিজ্ঞানরাজ্যে এক নূতন যুগ আসিল, তাঁহার চেয়েও বিশেষ দিন সেই দিন, যে দিন আকাশযানে মানুষ আকাশে উড়িল। নববিধানের উপাসনা-রূপ রথের আবিষ্কার কি তাহা অপেক্ষাও অলৌকিক এবং অদ্ভুত নয়? ইহাতে যে সত্য সত্যই, কেবল সশরীরে নয়, সপরিবারে সদলে স্বর্গে গিয়া, স্বর্গের নিত্য আনন্দোৎসবের সম্ভোগ লাভ হইল। অতএব ইহা কি সামান্য আনন্দদায়ক, সামান্য উৎসবপ্রদ? মা, আশীর্ব্বাদ কর, যদি এমন নিত্যোৎসব-সম্ভোগের সৌভাগ্য আমাদিগকে দিলে, যেন এই উৎসব আমরা চিরদিনের জন্য বুকে

গাঁথিয়া রাখিতে পারি। আবার, মা, এই সমসাময়িক সময়ে পরলোকসাধন ও তদ্দ্বারা আমিত্বের যে মৃত্যু-সংসাধন করাইলে এবং পরলোকগত অমরাত্মাদের সঙ্গে স্বর্গের উৎসব সহজে সম্ভোগের যে ব্যবস্থা করিয়া দিলে, তাহারও জন্য তোমার চরণে কৃতজ্ঞতাভরে লুণ্ঠিত হই। ধন্য ধন্য, মা, তুমি।

শান্তিঃ ! শান্তিঃ !! শান্তিঃ !!!

—০—

ভাদ্রোৎসব কেন ?

ভাদ্রোৎসব আসিল, ভাদ্রোৎসব চলিয়া গেল। নদীতে বান ডাকিল, আবার ভাটাইয়া গেল। আকাশে ঝড় উঠিল, আবার প্রশমিত হইল। প্রকৃতিতে যেমন বান বা ঝড় আসে ও থামে, অধ্যাত্মরাজ্যেও তেমনি উৎসব আসে, আবার চলিয়া যায়। ঝড় বা বান যাঁহার প্রেরিত, উৎসবও যে তাঁহারই প্রেরিত।

প্রাকৃতিক নিয়ম যেমন, অধ্যাত্মরাজ্যের নিয়মও প্রায় তেমন। বিধাতার বিধান সর্ব্বত্রই সমান। তবে মানুষ বিজ্ঞানবলে যেমন প্রাকৃতিক বিকার কিছু কিছু বিনাশ করিতে পারে, তেমনি অজ্ঞানতার বশে নিজ জীবনে অধ্যাত্ম কিছু কিছু বিকার উৎপাদনও করিতে পারে। বিধাতা মানুষকে তাঁর অনুগামী সন্তান ও সহকারী সেবক রূপে নিযুক্ত করিয়াছেন। যদি আমরা সেই আত্মজ্ঞান লাভ করি, এবং তাঁহার নির্দ্দেশ মত কার্য্য করি, তবে আমরা সফলকাম হই এবং তাঁহার ইচ্ছাপালনে জীবনে ধন্য হই। যদি তাহা না করি, মনুষ্যত্ব হারাই এবং নরকের পথে যাই।

আকাশে ঝড় যে উঠে, নদীতে বান যে ডাকে, কিম্বা নৈসর্গিক আলোড়ন বিলোড়ন যাহা হয়, তাহা কিছুই বৃথা হয় না, তাহার ফল কিছু না কিছু অবশ্যই হয় ; তেমনি কি আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, এই যে ভাদ্রোৎসবের বান ডাকিল, ইহা আমাদের জীবনে বিফল হইল না, ইহা আমাদের অধ্যাত্ম জীবনে কিছু না কিছু স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া গেল। তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে ইহাই প্রমাণিত হইবে, আমরা এই উৎসবের প্রভাবাধীনে পড়ি নাই, আমরা যথার্থ উৎসব করি নাই। বিধাতার যাহা করিবার, তাহা করিলেন ; কিন্তু আমাদের যাহা করিবার, তাহা করা হয় নাই।

ঝড় এবং বন্যা যেমন ঈশ্বর-প্রেরিত হইয়া জড় প্রকৃতিতে তাহার চিহ্ন, তাহার ফল রাখিয়া যাইবেই যাইবে ; ঈশ্বর-প্রেরিত উৎসবও তেমনি সাধক সাধিকাদিগকে নিশ্চয়ই স্বর্গীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত করিয়া, স্বর্গীয় জীবনে কতক পরিমাণেও সমুন্নত করিয়া যাইবেই। উৎসব কখনও বৃথা যাইতে পারে না, বৃথা যাইবেনা

ভাদ্রোৎসব পূর্ব্বে মাত্র একদিন সাধিত হইত। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া এখানে যে দিন নব ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তিত হইল, তাহারই সাম্বৎসরিক দিন স্মরণে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই জন্যই ইহা সাধনোৎসব বলিয়া বরাবর সাধিত হইত। প্রতিবর্ষে কি নব নব সাধন অবলম্বনে অধ্যাত্ম জীবন সমুন্নত হইবে, তাহারই নিমিত্ত এই ব্রহ্মযজ্ঞানুষ্ঠান।

এই উপলক্ষে আমাদের স্মরণ করা উচিত, কেন রাজা রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত "আদিব্রাহ্মসমাজগৃহ" হইতে নববিধানাচার্য্য বাহির হইলেন এবং কেনই বা ভারতবর্ষীয় "ব্রহ্মমন্দিরের" প্রতিষ্ঠা করিলেন ; আবার কেনই বা আদিব্রাহ্মসমাজের বিধিবদ্ধ নির্দ্দিষ্ট উপাসনা-পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিয়া নব ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তন করিলেন।

সাধারণ বিচারবুদ্ধি-পরতন্ত্র সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণ এই অনুযোগ করেন যে, ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মানন্দকে কতই স্নেহ করিলেন, কতই সাহায্য করিলেন, কতই সম্মান করিলেন, ব্রাহ্মসমাজের ঈশ্বর-প্রেরিত আচার্য্য বলিয়া বরণ করিলেন ; ব্রহ্মানন্দ কেমন অনায়াসে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া এক নূতন সমাজ গঠন করিলেন এবং পূর্ব্ব উপাসনা-পদ্ধতি পর্য্যন্ত বদলাইয়া দিয়া আপনার মত জাহির করিতে নূতন ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তন করিলেন। ইহা আপাততঃ স্থূল দৃষ্টিতে হয় ত তাঁর দাম্ভিকতা বা ধৃষ্টতা বলিয়াই মনে হইতে পারে। বস্তুতঃ তাঁর তখনকার বিরোধিগণ এই বলিয়াই দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে দণ্ডিত করেন।

কিন্তু প্রকৃত সত্য কথা কি? শ্রীকেশব ঈশ্বর-নিয়োজিত বিধানবাহকরূপে সত্য দ্বারা প্রদীপ্ত হইয়া, জীবন্ত ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আলোকে যখন দেখিলেন, বিধাতৃবিহিত নবযুগধর্ম্মবিধানবীজ কেবল হিন্দু বৈদান্তিক গণ্ডীতে নিবদ্ধ হইয়া এক সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মে পরিণত হইতেছে এবং রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত সমাজগৃহও জীবন্ত ব্রহ্মের মন্দির না হইয়া কেবল ব্রাহ্মসাধারণের

"সমাজগৃহ" মাত্র হইয়া রহিয়াছে; যাঁহারা তাহার অধিকারী, তাঁহাদের সহিত সত্য রক্ষা পূর্ব্বক মিলিত থাকিবার জন্য কেশবচন্দ্র প্রাণগত ভাবে চেষ্টা করিয়াও যখন তাহাতে কৃতকার্য্য হইলেন না, বরং সেখান হইতে তাড়িতই হইলেন, তখনই ঈশ্বরাদেশে একান্ত বাধ্য হইয়াই, এই "ব্রহ্মমন্দির" প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং সার্ব্বজনীন ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে শ্লোক সংগ্রহ করিয়া যেমন উদার নববিধানের শাস্ত্র রচনা করিলেন, তেমনি সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়-সাধনোপযোগী নবব্রহ্মোপাসনা-প্রণালীও প্রবর্ত্তন করিলেন।

ধর্ম্মপিতার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি অনুরাগ অক্ষুন্ন রাখিয়া, অথচ তাঁহার পবিত্র স্নেহের মায়ায় আবদ্ধ না হইয়া, এবং ধর্ম্মস্বাধীনতায় উদ্দীপ্ত হইয়া একমাত্র বিধাতার জীবন্ত পরিচালনাতেই বাধ্য হইয়া তিনি ইহা করিতে সক্ষম হইলেন; ইহাতে কেশবচন্দ্রের মানবীয়তা কিছুই ছিল না, বরং ইহা তাঁহার আমিত্বহীনতারই পরিচয়। ইহা যে জীবন্ত বিধাতার জীবন্ত বিধান। তিনি কেমন করিয়া তাঁহার বিশ্বজনীন বিধানকে কেবল বৈদান্তিক ভাবে নিবদ্ধ থাকিতে দেবেন?

তাই এই জীবন্ত বিধাতার যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াই শ্রীকেশব এই সুবিশাল বিশ্বরূপ পবিত্র ব্রহ্মমন্দিরের অনুরূপ এই "ব্রহ্মমন্দির" প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়সাধনের উপযোগী ব্রহ্মোপাসনা-প্রণালী প্রবর্ত্তন করিলেন।

ভাদ্রমাসের বারিধারা-বর্ষণে যেমন ক্ষেত্র-নিহিত বীজ অঙ্কুরিত ও বৃক্ষাকারে পরিণত হয়, স্বাতি নক্ষত্রের জল পড়িলে যেমন মাণিক গজায় বলে, তেমনি সর্ব্বসমন্বয় বিধান নববিধানের গর্ভাধান যেন এই ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির গঠনে ও এই নবব্রহ্মোপাসনা-প্রণালী প্রবর্ত্তনে হইল। মহানদীর স্রোত যে বাঁধে আবদ্ধ হইতেছিল সে বাঁধ কাটিয়া গিয়া তাহা অবাধে এখন প্রবহমাণ হইল।

আমাদের ইহাও স্মরণীয় যে, "ব্রহ্মমন্দির" নামে কোন মন্দির ইতিপূর্ব্বে আর কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। হিন্দু দেবদেবীর "মন্দির" হইয়াছে। নিরাকার ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ দেবতার ন্যায় পূজা ও দর্শনের জন্যই এই ব্রহ্মমন্দির স্থাপিত। আবার সর্ব্বধর্ম্মসম্প্রদায়ের যত ধর্ম্মমন্দির, মসজিদ, গির্জ্জা, স্তূপ, সমাকার সমন্বয়াকারে ইহা গঠিত। এবং ব্রহ্মোপাসনা-প্রণালীর ভিতরও, উদ্বোধন, আরাধনা, ধ্যান, যোগ, নামপাঠ, শাস্ত্রপাঠ, প্রার্থনা, সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তনাদি সর্ব্বধর্ম্মের সকল সাধনপ্রণালী সমন্বিত ও একীভূত হইয়া, সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ সাধনপ্রণালী রূপে ইহা প্রবর্ত্তিত।

এই উপাসনাই নববিধান-মূর্ত্তিমান জীবন লাভের উপাদান এবং ইহাই নববিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দের প্রাণ। ধর্ম্মবিধান মূর্ত্তিধারণ না করিলে তাহা মানবের নিকট দৃশ্যমান হয় না। তাই বিধাতা তাঁর বিধান দৃশ্যমান করিবার জন্যই ব্রহ্মানন্দকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া, তাঁহার দ্বারা ব্রহ্মমন্দির রূপ মহাসমন্বয়তীর্থ স্থাপন করিলেন এবং সর্ব্বধর্ম্মের সর্ব্বসাধনসমন্বয়ে ব্রহ্মোপাসনারূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সাধনপ্রণালী প্রবর্ত্তন করিলেন। ধরায় স্বর্গরাজ্যপ্রতিষ্ঠার জন্য এই ব্রহ্মমন্দির এবং পাপী মানবকে মূর্ত্তিমান ব্রহ্মানন্দ করিবার জন্য এই ব্রহ্মোপাসনা। হিন্দু বিধানের ব্রহ্মদর্শন এবং পাশ্চাত্য ইহুদি ও এসলাম বিধানের ব্রহ্মবাণীশ্রবণ ইহাতে সমন্বিত।

আবার এই ব্রহ্মোপাসনার বিশেষত্ব এই যে, ইহা কেবল একা একা সাধনীয় নয়, সদলে সপরিবারে মিলিত হইয়া অখণ্ড জীবন লাভের উপাদান এই ব্রহ্মোপাসনা। তাই "অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও," "আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা কর" ইত্যাদি সমবেত প্রার্থনা ইহার সাধন। তাই ত ইহা সম্পূর্ণ নূতন। তাই বর্ত্তমান নবযুগধর্ম্মবিধানে ইহাই বিধাতার প্রত্যক্ষ স্বর্গের দান, এই সৌভাগ্যলাভের জন্য বিশেষ আনন্দ উল্লাস করিতেই এই ভাদ্রোৎসব।

আমরা পাপী মানুষ হইয়াও সকলে মিলিয়া এই ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া নিরাকার পরব্রহ্মকে দেবদেবীর ন্যায় প্রত্যক্ষ ব্যক্তিরূপে দর্শন করিব এবং তাহার সঙ্গে তাহার প্রত্যক্ষ বাণীশ্রবণে বা প্রেরণায় তাঁহার উপাসনা করিব অর্থাৎ তাঁহার কাছে বসিয়া তাঁহার পূজা করিব ও তদ্দ্বারা নববিধান জীবনে মূর্ত্তিমানরূপে গঠিত হইবে বা তাঁহার স্বরূপসাধনে তাঁহার স্বরূপে স্বরূপবান্ স্বরূপবতী হইব। ইহা কি সামান্য সৌভাগ্য? এই সৌভাগ্য স্মরণ করিলেই কি আমাদের হৃদয় আনন্দোৎসবে উন্মত্ত হয় না?

বাস্তবিক যদি আমাদের ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহার স্বর্গের অমরদল এবং আমাদের আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ ও প্রেরিতদলের সঙ্গে আমাদিগকে মিলাইয়া উৎসবানন্দ সম্ভোগ করাইবার জন্য এই ভাদ্রোৎসব আনিলেন, "সুবিশালমিদং

বিশ্বং"রূপ তাঁহার পবিত্র মন্দিররূপ তীর্থে আনিয়া তাঁহার জীবন্ত ব্রহ্মোপাসনা-যোগে আমাদিগের দ্বারা এই যে স্বর্গের মহোৎসব করাইলেন, ইহার প্রভাব তবে কি ব্যর্থ হইবে? এই ব্রহ্মমন্দিররূপ মহাতীর্থের সম্বন্ধে আমরা কতই অপরাধী, ইহার মর্য্যাদা যেন আর আমাদের নিকট খর্ব্ব না হয়। আর বিশ্বমানবের সহিত একাত্মতায়, সদলে সপরিবারে, এই ব্রহ্মোপাসনারূপ নবজীবনপ্রদ মহাসাধন-সোপান যাহা আমরা লাভ করিয়াছি, তাহা হইতে কখনও যেন আমরা বিচ্যুত না হই। বাস্তবিক সশরীরে, সদলে, সপরিবারে, সমগ্রমানবপরিবারকে লইয়া স্বর্গসম্ভোগের উপায় এই ব্রহ্মোপাসনা, ইহা যে আমাদের নিত্য অন্ন পান। ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া এই উপাসনা-সাধনে কেহই যেন আমরা আর অবহেলা না করি।

জীবন্ত ব্রহ্মের সহিত যোগসমাধানে, স্বর্গস্থ ভক্তবৃন্দের সহিত যোগে, আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে নববিধানাচার্য্যের সহিত একাত্মতায় পরস্পরের সহিত ও বিশ্বমানবের সহিত একাত্মতাসম্পাদনে, ধরায় স্বর্গরাজ্য-স্থাপনের উপাদান এই ব্রহ্মোপাসনা। ইহার ন্যায় সহজ সাধনপ্রণালী এ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। এই ভাদ্রোৎসবের বানে আমাদের প্রাণে ইহাই যেন থাকিয়া যায়।

—•—

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বারিবর্ষণ।

আকাশের বারিবর্ষণ স্বর্গের ক্রন্দন। বারিবর্ষণ বিনা শস্যোৎপাদন হয় না। সাধনের অশ্রু এবং ভগবানের কৃপাবারিবর্ষণ বিনাও জীবন-ক্ষেত্রে ভক্তি প্রেমের ফসল ফলে না।

উৎসবের প্রসাদ জীবনে রক্ষা।

শ্রীনববিধানাচার্য্য বলিলেন, "উৎসবের পরের সময় এই যে সময়, বিশেষ বিপদের সময়, পরীক্ষার সময়। যাহা পাইলাম, তাহা যদি রাখিতে পারি, তবে আর বিপদ নাই। যাহা পাইলাম, যদি অবহেলাতে হারাই, মহাবিপদ। এই জন্য মিনতি করি, যাহা পাইলাম, অবহেলাতে যেন না পলায়ন করে।" ইহাই আমাদের এখন সবার প্রার্থনা হওয়া উচিত। যখন আকাশ হইতে বারিবর্ষণ হয়, কৃষক আলি বাঁধিয়া সে বারি যদি আটকাইয়া না রাখে, ক্ষেত্র শুষ্ক হইয়া যায়, আর তাহাতে ফসল ফলে না; তেমনি যে স্বর্গের কৃপাবারি উৎসবে বর্ষণ হইল, তাহা আমরা জীবনের সম্বল করিয়া যদি না রাখি, আমরা নিতান্ত কৃপাপাত্র, আমরা নিশ্চয়ই মনের শুষ্কতা-দণ্ডে দণ্ডিত হইব। আর যদি আমরা সম্বল করিয়া রাখিতে পারি, আমাদের জীবন সরস ও সমুন্নত হইবে।

পরস্পরকে চেনা।

আয়নাতে মুখ দেখিলে আপনাকে আমরা দেখিতে পাই, চিনিতে পারি। এক আয়নাতে পরস্পরের মুখ দেখিলেও পরস্পরকে চিনিতে পারি। সে চেনা পরিচয় বাহিরের। কিন্তু অন্তরের চেনা পরিচয় করিতে হইলে, চিন্ময় ব্রহ্মরূপ আয়নার ভিতর দিয়া পরস্পরকে দেখিতে ও চিনিতে হইবে। তাঁহার ভিতর দিয়া না দেখিলে পরস্পরের প্রকৃত চেনা পরিচয় কখনও হয় না। অণুবীক্ষণ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্র বিনা সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম বস্তু বা দূরস্থ বস্তু দেখা বা চেনা যায় না। ব্রহ্মের আলোক অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ উভয় যন্ত্রের কাচ অপেক্ষাও স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল; কেন না, তাতে নিরাকার মন ও আত্মা উজ্জ্বলরূপে দৃষ্ট হয়।

জন্মাষ্টমী ও খৃষ্টমাস।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত ও শ্রীখৃষ্টের জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে যথেষ্টই সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ জন্মিলেন কারাগারে, শ্রীখৃষ্টও জন্মিলেন অশ্বাগারে। শ্রীকৃষ্ণ কংস দ্বারা হত হইবার ভয়ে পিতা বসুদেব কর্ত্তৃক যশোদার নিকট লুক্কায়িত হইলেন, শ্রীখৃষ্টও হিরোদের ভয়ে পিতা বসুদেব কর্ত্তৃক দূর দেশে পলায়িত ও রক্ষিত হন। শ্রীকৃষ্ণ কালীয়দমন ও তারকা বধ করিলেন, শ্রীখৃষ্টও সয়তানকে জয় করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরার রাজা হইলেন, শ্রীখৃষ্টও স্বর্গরাজ্যে পরম পিতার সিংহাসনের পার্শ্বে বসিলেন। উভয়ের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সত্যতা নির্দ্ধারণ না হউক, আধ্যাত্মিক ভাব নিরূপণ করা কঠিন নয়। ইতিহাসে খৃষ্টমাসের দিন নিরূপিত নাই, কিন্তু জন্মাষ্টমী নিরূপিত আছে। যাহা হউক, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে ভক্তগণ জন্মগ্রহণ করিলে, বিধাতার অনির্ব্বচনীয় কৌশলে তাঁহাদের মধ্যে যথেষ্টই সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। তাঁহারা যে একই ব্রহ্মজাত সহোদর, নববিধানের অধ্যাত্ম বিজ্ঞান ইহাই আবিষ্কার করিয়াছেন।

অনুকরণ নয়,—অনুসরণ।

অনুকরণ করা মৃতকল্পের ধর্ম্ম। একের অনুকরণে আমার স্বাধীন ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিলোপ করিতে হয়। কিন্তু অনুসরণ করিলে আমার বিশেষত্ব রক্ষা করিয়াও অপরের উচ্চাদর্শ ও ধর্ম্মাদর্শ গ্রহণ করা যায়। নববিধানের ইহাই বিশেষ সাধন। বিধাতা আমাকেও এক বিশেষত্ব দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, সে স্বাধীন বিশেষত্ব আমি বিলোপ করি, তিনি তাহা চান না। নববিধানাচার্য্যকেও

গ্রহণ করিতে হইলে আমার আমিত্ব বলিদান দিব ; কিন্তু স্বাধীন ব্যক্তিত্ব ও বিশেষত্ব বিলোপ করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ যেন না করি, ইহাই তিনি প্রত্যেকের নিকট চাহিয়াছেন।

ব্রাহ্মের লক্ষ্য কি ?

(ব্রহ্মমন্দিরে সামাজিক উপাসনায় নিবেদিত)

পূর্ব্বানুবৃত্তি

মানুষ রোগের ঔষধ খোঁজে। অকালমৃত্যু নিবারণ করতে চায়। কিন্তু শরীরের রোগ, শরীরের মৃত্যুই একমাত্র নয়। কেউ রোগে মরে, কেউ শোকে মরে, কেউ দুঃখ, দরিদ্রতায় মরে, কেউ অজ্ঞানতায় মরে। ইহা অপেক্ষা শতগুণে ভয়ানক মৃত্যু, পাপে মরা। যে নরাধম পাপে মরে, সে নিজেও মরে এবং অপরকেও সেই পথে নিয়ে যায়। এ বড় সংক্রামক। তাই মঙ্গলময় "অমৃতের" সৃষ্টি করেছেন। মাঝে মাঝে জগতে পাঠান। এবারেও জীব তরাতে সোণার কলসি ক'রে পাঠিয়েছেন। এই দেবভোগ্য অমৃত পান করাবার জন্তে আচার্য্যদেব যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তবুও আমাদের সাধের ঘুমঘোর ভাঙ্‌লো না, দীন-দশা ঘুচ্‌লো না। আমরা অমৃতের পিয়াসী হ'লাম না। ব্রহ্মসহবাসাকাঙ্ক্ষী হ'লাম না। আত্মা যেখানেই থাক—উচ্চে নীচে, দেশদেশান্তে, জলগর্ভে কি আকাশে—ব্রহ্মসহবাস ছাড়া, ব্রহ্মপ্রকাশের মধ্যে বাস করা ছাড়া "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে[illegible]য়নায়।" পূর্ণ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সঙ্গে আত্মার যোগ হলে, [illegible]া, ব্যাধি, মৃত্যু, শোক, দুঃখ, অভাব, কিছুই থাকে না। আত্মার হিরণ্ময় কোষে "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্ আনন্দরূপমমৃতম্" ব্রহ্মের [illegible] জ্যোতি পড়্‌লে ; রোগ, শোক, অভাব, দরিদ্রতার স্থান [illegible]থা ? অনন্ত করুণাময় পরমেশ্বর জীবকে কখনও কষ্ট দে[illegible]না, সে শুধু আমাদের মোহ, অজ্ঞানতা। আমরা মনে করি, [illegible] দুঃখ, তাই দুঃখ ; জ্ঞান হ'লে সে বোধ থাকে না। অজ্ঞানত[illegible] আমাদের সকল কষ্টের মূল, যত দুঃখের নিদান। আচার্য্যদে[illegible] বলেছেন, "আমরা আছি, কিসে আছি ? দুঃখে নয়, সুখে [illegible]ছি।" তাই বিধাতা এ যুগে মরাকে বাঁচাবার জন্তে মৃতসঞ্জীব[illegible] সুধা নববিধান পাঠিয়েছেন। মহাত্মা গান্ধীজীর জীবনেও এই [illegible]ধানের আশার তরুণ মধুর আলো, স্বর্গের অপূর্ব্ব জ্যোতি, [illegible]মন্বয়ের নবীন বার্ত্তা, কর্ম্মজ্ঞানের ভক্তি-যোগের নূতন শিক্ষা, জীবন্মুক্তির নিঃসংশয় সুসমাচারের প্রকাশ দেখা যায়। আমরা আশা-নয়নে জগতের সব দেশে, সব জাতির মধ্যে এই নবালোক প্রবেশের প্রতীক্ষা করছি। আমরা বিশ্বাস করি, নববিধানের মঙ্গলালোকে সব আঁধার চূর্ণ হবে, সব মৃত্যু অমৃতে পূর্ণ হবে, সব স্বার্থ, দৈন্য, জড়তা লয় পাবে, সব মায়া, মোহ, মিথ্যা, স্বপ্ন ভেঙ্গে যাবে, সব ভয় ভাবনা, অত্যাচার, অবিচার, আর্ত্তনাদ, হাহাকার থেমে যাবে। পুণ্যপ্রভাতে অরুণোদয়ে বিশ্বের হৃদয়-শতদল খুলে যাবে, "সুগভীর তরঙ্গিত নীরনিধি, হিমরঞ্জিত শোভনতুঙ্গগিরি" ভরা এই রমণীয় ধরা বিমল প্রেমানন্দে ভরে যাবে, অন্নপূর্ণার অক্ষয় ভাণ্ডারপূর্ণ স্বর্গের অমৃতদ্বার একেবারে খুলে যাবে। "শুনহে নূতন বিধি আনন্দের সমাচার, পাপী তরাইতে স্বর্গ হতে এসেছে ভবে এবার।"

দয়ার ঠাকুর দয়া করে এমন বিধান আমাদের দিলেন, আমরা তার যোগ্য হ'লাম কৈ ? জীবনে তার পরিচয় দিলাম কৈ ? কি প্রমাণ দিতে পারি ? "নহে এতো ছেলেখেলা, অন্ধকারে ঢিল ফেলা"। জীবনে তা'র নিদর্শন দেখাতে হবে। বলা অনেক হয়েছে ; লেখাও যথেষ্ট হয়েছে ; উপদেশ প্রসঙ্গেরও অভাব নেই। কিন্তু লোকে নববিধান নিলে কৈ ? ইতিমধ্যে দশহাজার লোককে যে এই ধর্ম্মে দীক্ষিত কর্‌বার কথা ছিল। দশহাজার কেন ? সারা বসুধাকে এই বিধানের নিশানতলে দাঁড় করাবার কথা। জীবনে প্রমাণ না দিলে, কেউ এ ধর্ম্ম নেবে না। যার দর্শনমাত্রেই হরি-ভক্তির উদয় হয়, এই যদি বৈষ্ণবের লক্ষণ হয়, তবে নববিধান-বাদীর জীবনস্পর্শেও ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মে স্থিতি ও ব্রহ্মবাণী-শ্রবণের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাবে।

এ যুগধর্ম্মে আমরা ত তাঁকে চাই নি, তিনি আমাদের চেয়েছেন ; তাঁর করুণা দ্বারে দ্বারে ফিরছে। "আমি পবিত্রাত্মা হরি এসেছি দ্বারে। হৃদয়ের সমগ্র প্রেম দাও হে আমারে। না দিলে প্রেম ষোল আনা, কিছুতে মোর মন উঠে না, সংসারের—উচ্ছিষ্ট প্রেম দিস্‌নে আমারে।" তিনি আমাদের সর্ব্বস্ব হরণ করতে চান। তাঁর প্রেম সর্ব্বগ্রাসী। জলে, স্থলে, নীলাকাশে, শশী তারাদলে, তরুলতাফলফুলে, নানাদিকে, নানামতে, নানা সুরে, নানা তালে তিনি আমাদের মন হরণ কর্‌তে চান। একাকী প্রাণসিংহাসনে রাজা হয়ে বসতে চান। সেখানে কারু আর অধিকার নেই—একমাত্র পতির প্রতিমা যেমন সতীর প্রাণমন্দির আলো করে থাকে। পতি সতীর আঁখির জ্যোতি, শ্রবণের শ্রুতি, কণ্ঠ মাঝে বাণী; তিনিই তার দেহের শক্তি, হৃদয়ের বল, প্রাণের শান্তি, মন মাঝে চিন্তামণি। আমাদেরও তিনি ছাড়া আর কেউ নেই। তাই বলি—

"ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব॥"

দয়াময়, প্রেমসিন্ধু হে, আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন জীবন দিয়ে নববিধান প্রচার করতে পারি। ভারতে যে আলো জ্বেলেছ, তা কি নিভে যাবে ? তোমার এ মহাদান কি ব্যর্থ হবে ? কতকাল পরে ভারতের দুঃখসাগর পারে, বিপন্নিশির অবসানে, নবীন প্রভাতে, "স্বরগ হতে এসেছে [illegible]মধুর আশার বারতা"; তা কি আমাদের দোষে মিছে হয়ে যাবে ? ভাব্‌তেও প্রাণে ব্যথা লাগে। প্রভু, দয়া কর, দয়া কর। বাঁচাও, বাঁচাও।

মা মেয়ে এই মরাদের বাঁচাও। সামনে তোমার দীপ্ত দীপ তুলে ধর। প্রাণে আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও। আজ দেশের দুর্দ্দিনে, সঙ্কটের সন্ধিক্ষণে, আমরা যেন আবার নব উদ্যমে, নব উৎসাহে নববিধান প্রচার কর্‌তে পারি! তোমার করুণায় সব হতে পারে। "পর্ব্বতসম বাধা বিঘ্ন যায় দূরে।" এই বর দাও, তোমায় দেখে, তোমার কথা শুনে, আমাদের জীবন যেন সার্থক হয়; যেন বল্‌তে পারি, "চক্ষু কর্ণের হয়েছে বিবাদভঞ্জন।" মা, অনুগ্রহ করে, আমাদের মাথায় হাত দিয়ে এই আশীর্ব্বাদ কর, আজ্‌কের প্রার্থনা পূর্ণ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তি!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

—•—

যৌবনের স্বপ্ন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এ সকল আমাদের ছাত্রজীবনের কথা। নগেন্দ্রবাবু কলিকাতায় এ সকল কার্য্য ব্যতীত মধ্যে মধ্যে কলিকাতার বাহিরে যাইতেন। হাওড়া, হুগলি, শ্রীরামপুর, চুঁচুঁড়া, বর্দ্ধমান, প্রভৃতি স্থান হইতে উৎসবে তাঁহার নিমন্ত্রণ আসিত। আমিও তাঁহার সহকর্ম্মিরূপে মধ্যে মধ্যে গমন করিতাম। উপাসনা ও বক্তৃতা করিবার ভার আমার উপর অনেক সময় আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও অর্পিত হইত। তিনি আমাকে সহোদরের ন্যায় ভাল-বাসিতেন। তাঁহার সঙ্গ ব্যতীত আমি একাকী যাহাতে কার্য্য করিতে অভ্যস্ত হই, এজন্য সকল কার্য্যেই আমার কিছু না কিছু ভার অর্পণ করিতেন। একবার বর্দ্ধমানে উৎসব হইবে, তাঁহার নিমন্ত্রণ আসিল, আমিও যাইব স্থির হইল; কিন্তু তাঁহারা যাহা পাথেয় পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে একজনের মাত্র যাতায়াত হয়। আমার যাওয়া না হওয়াতে উভয়ের মনই ক্ষুণ্ণ হইল। আমি রাত্রিতে শয়ন করিতে গেলাম, নিদ্রা আসিল না—স্বপ্নাবেশ হইল—স্বপ্নের ঘোরে কোথা হইতে শব্দ আসিল—কে যেন কাণে কাণে কথা বলিয়া গেল, "সাধু যার উদ্দেশ্য, ঈশ্বর তার সহায়"। হঠাৎ সর্ব্বশরীর অগ্নিময় হইয়া উঠিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা দৃঢ় হইল যে, অর্থের অভাবে বর্দ্ধমান যাওয়া বন্ধ হইবে কেন? অতি প্রত্যূষে উঠিয়াই বর্দ্ধমানের দিকে রওনা হইলাম। পথ ঘাট চিনি না। হাওড়া ষ্টেসন পার হইয়া গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া চলিতে লাগিলাম। দুধারে মাঠ, জঙ্গল, মধ্যে মধ্যে গ্রাম ও জনপদ দেখা যাইতেছে। গ্রীষ্মকাল—প্রখর রৌদ্র মাথায়—ছাতা নাই, স্বপ্নের ঘোরে চলিয়াছি; হাতে একটীও পয়সা নাই, ক্ষুধা-নিবৃত্তির উপায় নাই—যখন পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইতেছে, তখন গৃহস্থের বাড়ীতে গিয়া একটু জল ভিক্ষা করিয়া পান করিতেছি। প্রায় ১টার সময় হুগলিতে গিয়া পঁহুছিলাম। দুধারে জঙ্গল, হঠাৎ মানবের আর্ত্তনাদ শ্রুতিগোচর হইল। কোন সংকটে পড়িয়া অথবা কঠিন পীড়ার দরুণ বাক্যরোধ হইলে, অথচ কথা বলিবার চেষ্টা করিলে, একটা অস্পষ্ট গোঁ গোঁ শব্দ যেমন বাহির হয়, ইহাও সেইরূপ। ঠিক মানুষের স্বর কিনা, তাহা ঠিক করিতে পারিতেছি না—কি জানি, যদি কোন জন্তু জানোয়ারই হয়, ভয়ে ভয়ে সেই শব্দটী লক্ষ্য করিয়া জঙ্গলের দিকে অগ্রসর হইলাম; যত শব্দের নিকটবর্ত্তী হইতেছি, ততই মানুষের স্বর বলিয়া উপলব্ধি হইতেছে। ক্রমে ক্রমে নিকটে গিয়া দেখি যে, একটী অসহায় লোক কঠিন উদরাময় অথবা বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া একটু জলের জন্য আর্ত্তনাদ করিতেছে। তাহার নিকট একটী লৌহ কটাহ মাত্র আছে। নিকটেই পুকুর, প্রায় ত্রিশ ফুট নীচে, ঘাট নাই, নামিবার উপায় নাই; অতি কষ্টে সেই কড়াটী করিয়া এক কড়া জল তাহার নিকট রাখিয়া দিলাম—মুখে একটু জল দিলাম। জল খাইয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিল। অনুসন্ধানে জানিলাম যে, তাহার বাড়ী আজমগড়, আসামে কুলি হইয়া গিয়াছিল; অতিরিক্ত শ্রমে ও কদর্য্যাহারে তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে, সাহেবেরা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। সে এখন দেশে ফিরিতে চায়। যতক্ষণ হাঁটিবার শক্তি ছিল, ততক্ষণ হাঁটিয়া আসাম হইতে হুগলি পর্য্যন্ত আসিয়াছে। পীড়িত হইয়া পুকুরের ধারে জল খাইতে আসিয়াছিল, আর উঠিতে পারে নাই। এখন সে আজমগড় যাইতে চায়, রেলের ভাড়া চায়। সে করুণ কাহিনী শুনিয়া আমার প্রাণ গলিয়া গেল। হাতে একটীও পয়সা নাই! কি করি! ভিক্ষা করিয়া কিছু পয়সা সংগ্রহ করিয়া তাহার পাথের যোগাড় করিবার জন্য প্রাণে প্রবল ইচ্ছার উদয় হইল। দুই এক মাইল দূরে হুগলি সহর। ভিখারীর ন্যায় গৃহে গৃহে যাইয়া দু একটী করিয়া পয়সা সংগ্রহ করিয়া যাহা পাইলাম, তাহার হাতে দিয়া চলিয়া গেলাম। বেলা অপরাহ্ণ হইয়াছে, বর্দ্ধমানে গিয়া উৎসব সম্ভোগ করা অসম্ভব দেখিয়া, কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইলাম। মনে মনে চিন্তা হইল, কে আমাকে এখানে লইয়া আসিল—কে এই অসহায় লোকটীর সেবার জন্য আমাকে নিযুক্ত করিল—কে ঈশ্বর আর্ত্তনাদ বাতাসের মধ্য দিয়া "সাধু যার উদ্দেশ্য, ঈশ্বর তার সহায়" এই ব্রহ্মবাণীরূপে পূর্ব্ব রাত্রে কর্ণে প্রবিষ্ট করিল! হে ভগবান্, তোমার জগতে কোন কার্য্য আকস্মিক নহে! তুমি এইরূপেই একজনের দুঃখ রোগ শোকের বোঝা অন্যের স্কন্ধে চাপাইয়া মানবের কল্যাণ কর। স্বপ্নের প্রতি আমার অধিকতর বিশ্বাস হইল—স্বপ্নের ঘোরে যে বাণী আসে, তাহা আমার নিকট সত্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। উৎসবের পরিবর্ত্তে আমি মহোৎ-সব লাভ করিয়া, কোন দেশ জয় করিয়া সৈনিকপুরুষেরা যেমন আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করে, আমিও সেইরূপ অগ্নিময় উৎসাহ লইয়া আবার পদব্রজে কলিকাতার দিকে চলিলাম। দিবসে আহার নাই, সমস্ত দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া পায়ের মাংসপেশি-

গুলি কঠিন হইয়া গিয়াছে। রাত্রি ৮টার সময় শ্রীরামপুরে আসিয়া পৌঁছিলাম। সে দিন তাঁহাদের সামাজিক উপাসনার দিন। আমাকে দেখিয়া বন্ধুগণ উপাসনার জন্য অনুরোধ করিলেন। উপাসনার বেদীতে বসিয়া মনে হইল, যেন অস্থি চূর্ণ হইয়া গিয়াছে—মাংসপেশিগুলি কঠিন—সমস্ত শরীর বেদনাময়—মুখে কথা সরিতেছে না। কেমন করিয়া উপাসনা করিব! কি জানি, যেন কোথা হইতে এক আশ্চর্য্য শক্তি প্রাণে অবতীর্ণ হইল, মন প্রাণ অগ্নিময় হইল, ভাষা অগ্নিময় হইল, রসনা হইতে যেন ঝড় বহিতে লাগিল। দৈবশক্তির একটা আশ্চর্য্য অভিজ্ঞতা সে দিন হৃদয়কে অভিভূত করিয়া ফেলিল। সমস্ত দিন অনাহার, রৌদ্রে প্রায় ৪০।৪৫ মাইল ঘুরিয়া শরীর যখন একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল, তখন শক্তি কোথা হইতে আসিল? সে শক্তি যে দৈবশক্তি, তাহাতে আর সন্দেহ করিবার অণুমাত্র সংশয় রহিল না। মানুষ যখন নিজের শক্তির উপর নির্ভর করে, তখন তাহার শক্তি সীমাবদ্ধ; আর যখন ভগবানের উপর নির্ভর করে, তখন তাহার শক্তি অপরিমেয়, অজেয়। প্রাণে এই অভিজ্ঞতা দান করিবার জন্যই যেন ভগবান্ একটী অশক্ত ক্লান্ত দেহকে লইয়া তাঁহার যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিলেন। দেখাইলেন, ভগবানের শক্তির নিকট মানুষের শক্তি কত অকিঞ্চিৎকর! উপাসনা শেষ হইলে বন্ধুরা কিছু জলযোগের ব্যবস্থা করিলেন। জলযোগ করিয়া সমাজগৃহেই নিদ্রা গেলাম। প্রাতে উঠিয়া সমস্ত শরীরে বেদনা অনুভব ক[illegible]তেছি। শ্রীরামপুর হইতে হাটিয়া কলিকাতা আসিবার সাম[illegible] নাই। এ দিকে কপর্দ্দকবিহীন। দেখি যে, তাঁহারা (ব[illegible]রা) একখানি টিকিট কিনিয়া আমার হাতে অর্পণ ক[illegible]লেন। বিধাতাকে ধন্যবাদ দিলাম। বুঝিলাম যে, মানুষ যত[illegible] সহ করিতে পারে, ভগবান্ তাহার অধিক কষ্ট মানুষকে দেন[illegible] না। তার পরদিন নগেন্দ্রবাবুর সহিত দেখা হইলে সকল কথা[illegible]লাম, তিনি শুনিয়া অবাক্ হইলেন। জীবনের প্রত্যেক ঘটনা[illegible] বিধাতা পূর্ব্ব হইতে যে ব্যবস্থা করিয়া রাখেন, তাহার পরিচ[illegible] পাইলাম। বর্দ্ধমানে একত্রে না গিয়া ভালই হইয়াছে, এই ব[illegible] বলিয়া উভয়েই ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিলাম।

ন[illegible]ন্দ্রবাবু সাধুপ্রকৃতির লোক ছিলেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহা[illegible] সঙ্গে মৃত্যু পর্য্যন্ত কাটাইয়াছি, কখন কোন উত্তেজনার কারণ উপস্থিত হইলে তাঁহাকে রাগ করিতে দেখি নাই। ইহা তাঁহার চরিত্রের একটা বিশেষ ভাব। একদিন আমরা কলেজ স্কোয়ারে প্রচার করিয়া গৃহে ফিরিতেছি, একটী দুরন্ত যুবা আমাদের প্রহার করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। প্রথম ঝগড়া করিয়া মারামারি করিবার ইচ্ছা ছিল, অনেক অশ্লীল গালাগালি করিতে লাগিল, আমরা কথা না কহিয়া চলিয়া গেলাম। নগেন্দ্রবাবু তাহার বাড়ী জানিতেন, পরদিন এক গ্লাস মিছরির সরবৎ লইয়া তাহার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন যে, ভাই, কাল তোমার মুখটা তিক্ত হইয়াছিল, একটু মিষ্ট সরবৎ খাইয়া মুখটা মিষ্ট কর। এই ব্যক্তি মিষ্ট ব্যবহার পাইয়া আমাদের সহিত আর শত্রুতা করিত না, অথবা আমাদের বক্তৃতায় বাধা দিত না।

বাল্যকাল হইতে নগেন্দ্রবাবুর আশ্চর্য্য ধর্ম্মভাব, প্রচারকার্য্যে অনন্ত উৎসাহ, কলিকাতার ছাত্রমণ্ডলীর নৈতিক জীবনের উন্নতিকল্পে ঐকান্তিক চেষ্টা, শান্তিপূর্ণ ভ্রাতৃমণ্ডলীর কার্য্যভার গ্রহণ, মফঃস্বলের নানাস্থানে প্রচারকার্য্যে শক্তি, সময় ও চিন্তা নিয়োগ, নববিধানের সত্য ঘোষণা করিবার জন্য বক্তৃতা ও পুস্তকাদিপ্রণয়ন দেখিয়া অনেকে তাঁহাকে ছোট কেশব বলিয়া ডাকিত। ঈশ্বরের ইচ্ছা বিনা বায়ু পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে অথবা উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রবাহিত হয় না; তাঁহার ইচ্ছা বিনা একবিন্দু বারি আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হয় না, একটী তৃণও পৃথিবীতে জন্মলাভ করে না। বিধাতা জানিতেন, কাহার সহিত কাহার মিলন সংঘটিত হইলে, তাঁহার ইচ্ছা পৃথিবীতে পূর্ণ হইবে। আমাদিগের এই আবাল্য যোগের ভিতর বিধাতার প্রত্যক্ষ হস্ত দেখিতে পাই। যৌবনের স্বপ্নগুলি যে অল্পে অল্পে জীবনে আকার গ্রহণ করিতেছে, ইহার মূলে কি আমাদের বন্ধুতার অবিচ্ছিন্ন যোগ ও অকৃত্রিম ভ্রাতৃপ্রেমের কোন স্থান নাই! ভগবান্ পূর্ব্ব হইতেই সকল ব্যবস্থা করিয়া রাখেন এবং যথাসময়ে তাহার প্রকাশ হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহারাণী সুনীতি দেবী।

যাঁহার জীবন আর্য্যনারীসমাজের গৌরব ছিল, সেই পূজনীয়া স্নেহময়ী ভগ্নী সুনীতি দেবীর পুণ্যস্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া কাতর অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি। তাঁহার সুন্দর জীবনের সদ্‌গুণরাশি সম্যক্ বর্ণনা করিবার আমার শক্তি নাই। তাঁহার জীবন প্রকৃত আর্য্যনারীর জীবন ছিল। তাঁহার উচ্চ জীবনের সংস্পর্শে যাহা দেখিয়াছি, তাহা কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা আছে। সেই সতী কন্যা আর্য্যনারীসমাজের উদ্দেশ্য চির জীবন সাধন করিয়াছেন। তাঁহার জীবন পাশ্চাত্য দেশের ও স্বদেশের সতী রমণীগণের সদ্‌গুণরাশির সামঞ্জস্যস্থল ছিল। পতিপ্রাণা সতী, ভক্তিপরায়ণা কন্যা, সন্তানবৎসলা জননী, স্নেহময়ী ভগ্নী, প্রজাবৎসলা রাজ্ঞী, সহৃদয়া সঙ্গিনী, দয়াবতী রমণী, ধর্ম্মপ্রাণা আর্য্যনারী, নববিধানের বিশ্বাসী দাসী—বর্ত্তমান যুগে দৃষ্টান্তস্থল হইয়া আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত। উচ্চ উপাধিধারী ব্যক্তি ও দরিদ্র সকলেই সম[illegible]দর সম্মান তাঁহার নিকটে লাভ করিত। বিধাতা তাঁহাকে রাজরাজেশ্বরী পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় দুঃখী ধনী সকল

নরনারীকে সমজ্ঞানে গ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহার দৈনিক জীবন হিন্দু রমণীর ন্যায় শুদ্ধ ছিল। প্রতিদিন তিনি স্নানান্তে পট্ট-বস্ত্র পরিধান করিয়া, উপাসনা-গৃহ পুষ্প দ্বারা সজ্জিত করিয়া, সেখানে ব্রহ্মারাধনা করিতেন। গৃহে পরিবার মধ্যে সামান্য বেশভূষা করিতেন। রন্ধনকার্য্যে তিনি সুদক্ষা ছিলেন। এতদ্ব্যতীত সংসারের নানারকম কার্য্যে সুনিপুণা ছিলেন। নিজহস্তে প্রতিদিন তরকারী কুটীতেন। বড়ি, আচার, মিষ্টান্ন, সুপারি কাটা সবই সুন্দররূপে করিতেন। শিল্প কাজ ও চিত্রাঙ্কনে সুদক্ষা ছিলেন। সুচারুরূপে নানাপ্রকারে কবরী বন্ধন করিয়া দিতে পারিতেন।

স্বামিভক্তি তাঁহার জীবনের ভূষণ ছিল। প্রতিদিন ভক্তি ভরে পতিপদযুগল পুষ্প দিয়া বন্দনা করিতেন। স্বামী যখন যুদ্ধে যাত্রা করেন, তখন তিনি ভূমিতে শয়ন ও সামান্য আহার করিয়া দিন কাটাইয়াছিলেন। স্বামীর বিচ্ছেদে তপস্বিনী বৈরাগিনীর বেশে জীবন যাপন করিয়াছেন। স্বামীর প্রতিকৃতি সর্ব্বদা কণ্ঠে পরিয়া থাকিতেন। পিতামাতার উপর তাঁহার অগাধ ভক্তি ছিল। চিরজীবন পিতৃদেবের বচন শিরোধার্য্য করিয়া সংসারে বিচরণ করিয়াছেন। নববিধানে তাঁর অটল নিষ্ঠা ছিল, পরিবারে প্রতি অনুষ্ঠান নবসংহিতামতে করিয়াছেন। তাঁহার এক পুত্রের কোন রাজকন্যার সহিত বিবাহের সব ঠিক হইয়াও, পূর্ণ সংহিতামতে কন্যার পিতা কার্য্য করিতে অস্বীকৃত হওয়াতে, বিবাহ দিতে অসম্মত হয়েন। কুচবিহার হিন্দুরাজ্যে তাঁহার প্রভাবে নববিধানের মন্দির স্থাপিত হয়। সকল অনুষ্ঠান ব্রাহ্মমতে হয়। প্রতি বৎসর সে রাজ্যে উৎসবাদি মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত। তাঁহার ধর্ম্মজীবন আশ্চর্য্য। শৈশবাবধি যে ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ধর্ম্ম অটল নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রচারে অদম্য উৎসাহ ছিল। দেশ বিদেশে উপাসনা প্রার্থনাদি করিয়া শ্রোতৃ-বর্গকে মোহিত করিতেন। মণ্ডলীর হিতসাধন, প্রচারকদিগের সেবা, সমাজের উন্নতিসাধন, উপাসনা, সঙ্গীত, রচনা, কথকতা, বক্তৃতা তাঁহার নিত্য কার্য্য ছিল। প্রচারকগণকে ভক্তি করিতেন, তাঁদের পরিবারস্থ সকলকে আত্মবৎ প্রীতি করিতেন। সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া তাঁহাকে কন্যাবৎ স্নেহ করিতেন। রাজ-অট্টালিকায় *(Buckingham Palace)* তাঁহাকে অতিথিরূপে রাখিয়াছিলেন। আহারে বসিয়া সাম্রাজ্ঞীর স্বাস্থ্যরক্ষা-প্রার্থনায় মদ্যপান করিতে বলায়, তিনি অসম্মতি প্রকাশ করেন। অন্য কেহ এরূপ ব্যবহার করিলে সাম্রাজ্ঞী অপমানিত মনে করিতেন; কিন্তু মহারাণী সুনীতি দেবীর পক্ষে ইহা পান করা নীতিবিরুদ্ধ, শ্রবণ করিয়া সাম্রাজ্ঞী বিরক্তি প্রকাশ করা দূরে থাকুক, বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। সাম্রাজ্ঞী আলেকজান্দ্রা ও সাম্রাজ্ঞী মেরী [illegible] বৎসর তাঁহাকে পত্র লিখিতেন। রবিবারে পিতৃগৃহে নিরামিষ আহার ও উপাসনা কীর্ত্তনাদিতে অতিবাহিত হইত। তিনি সে নিয়ম চিরদিন পালন করিয়াছেন। রবিবারে বাহিরে কোন নিমন্ত্রণাদি গ্রহণ করিতেন না। সে দিবস গৃহে পরিবারের সকলে মিলিয়া উপাসনা ও নিজেরা রন্ধনাদি করিয়া একত্রে আহার করিতেন। কন্যাদিগকে রন্ধনাদি শিক্ষা দান করিয়াছিলেন, রবিবারে তাহারা প্রত্যেকে কিছু কিছু রন্ধন করিয়া সকলকে আহার করাইত।

দেশীয় বিদেশীয় উচ্চপদধারী ব্যক্তিগণ তাঁহাকে সসম্মানে কত আদর যত্ন করিয়াছেন। সামাজিক শত শত কর্ত্তব্যরাশির মধ্যেও নিয়মিত উপাসনা ও গৃহের কর্ত্তব্যরাশি ভুলিতেন না। একদিন রাত্রিকালে লাটগৃহে আহারে নিমন্ত্রণে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন; হীরক মুকুট ও বহু অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা, রাজ-পরিচ্ছদ-পরিহিতা রাজমহিষী যখন পূজাগৃহে করযোড়ে সেই বিশ্বরাজের পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন, সে স্বর্গীয় দৃশ্য হৃদয়পটে চির অঙ্কিত হইয়া আছে।

যুবরাজ জর্জ্জ (বর্ত্তমান সম্রাট) পত্নীসহ মহারাণীর গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া আহার করিয়াছিলেন। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড তাঁহাদের বিশেষ বন্ধু জ্ঞান করিতেন। বড়লাট পত্নীসহ সর্ব্বদা তাঁহাদের বাড়ী আসিতেন। লাটপত্নীকে মহারাণী নিজের অলঙ্কার ও সাড়ী পরাইয়া, ভূমিতে বসাইয়া, বাঙ্গলা আহার করাইতেন। ভারতবর্ষীয় রাজা মহারাজাগণ সসম্মানে তাঁহাকে সমাদর করিতেন। মহারাজাগণ কেহ মাতা, কেহ ভগ্নী, কেহ মাতৃস্বসা বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিতেন। পাতিয়ালার বর্ত্তমান মহারাজা তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন, তাঁহার পায়ের কাছে ভূমিতে বসিয়া থাকিতেন; নিষেধ করিলে বলিতেন, "আপনার ছোট ছেলে হিতি যেমন, তেমনি আমিও আপনার ছেলে।" বরোদার মহারাজা তাঁহাকে ভগ্নী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। মহারাণী সুনীতি দেবী তাহাকে ভাই ফোঁটা দিয়া ছিলেন। পরে ইঁহারই কন্যার সহিত মধ্যম রাজকুমার জিতেন্দ্রনারায়ণের বিবাহ হয়।

সুদূর প্রবাসে, লণ্ডনে প্রতিরবিবারে সামাজিক উপাসনা করিতেন। সেই দিনে তাঁহার গৃহে সকলকে বাঙ্গালা রান্না করাইয়া আহার করাইতেন। লণ্ডনে এসিয়াবাসিনী মহিলা-দিগের জন্য একটী সমিতি গঠন করেন। বিভিন্ন দেশস্থ মহিলাদিগের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাববৃদ্ধিই এই সমাজের উদ্দেশ্য ছিল। প্রবাসে পাঠোদ্দেশে যে সকল ছাত্র ছাত্রীগণ গমন করিত, তাহাদিগকে নানা প্রকারে সাহায্য করিতেন। সুদূর প্রবাসেই তাঁহার প্রিয়তম স্বামী ও প্রাণের পুত্রদ্বয়কে হারাইয় ছিলেন। তাঁহার প্রিয়তম স্বামীর স্মরণার্থ একটী স্মৃতিস্তম্ভ সেখানে রক্ষিত হইয়াছে।

তিনি সন্তানবৎসলা জননী ছিলেন। সন্তানদের রন্ধন করিয়া খাওয়াইতে ভালবাসিতেন। রুগ্ন সন্তানের সেবা নিজ হস্তে করি-তেন। সুন্দর শিল্পকার্য্য করিয়া সন্তানদের পরিচ্ছদ প্রস্তুত

করিতেন। শিক্ষার্থে পুত্রসন্তানদের দূর দেশে পাঠাইতে জননীর সুকোমল অন্তর কাতর হইত। প্রাণাধিক তিনটি পুত্র ও একটী কন্যার মৃত্যুতে তিনি শোকে পাগলিনীপ্রায় হইয়াছিলেন। পরম পিতার উপর তাঁর অটল বিশ্বাসই এই ঘোর পরীক্ষার মধ্যে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছে।

ভাই ভগ্নীর প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ ভালবাসা ছিল। সুখে দুঃখে রোগে শোকে তাঁদের প্রাণ দিয়া সেবা করিয়াছেন। মাতৃসমা ভগ্নীকে হারাইয়া ভাই ভগ্নীগণ আজ শোকে ভগ্ন। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব সকলের তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া কত প্রকারের সেবা ও সাহায্য করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত। দাতব্য তাঁহার জীবনের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। প্রতিমাসে তিনি সহস্র টাকা দাতব্যে দান করিয়াছেন। নিয়মিত দান ও চাঁদা, সৎকর্ম্মে বিশেষ দান তাঁর নিত্য ক্রিয়া ছিল। রাজপথে যত দরিদ্র দেখিতেন, গাড়ী থামাইয়া তাহাদের হস্তে রৌপ্য মুদ্রা দান করিতেন। প্রতিবৎসর হাসপাতালে ফল, মিষ্টান্ন ও পাখা প্রত্যেক রুগ্ন ব্যক্তিকে বিতরণ করিতেন। ব্রতাদি গ্রহণ করিয়া পরের সেবা করিতেন। বৈশাখমাসে নিয়মিত জলচ্ছত্র করিতেন। সেবিকা-ব্রত গ্রহণ করিয়া তিনি পরের সেবা করিতেন।

তিনি সুলেখিকা ছিলেন। ইংরাজিতে কয়েকখানি সুন্দর বই লিখিয়াছেন। নিজ জীবনীও তাঁহার সহজ ও সুমধুর ভাষায় লিখিয়াছেন। বাঙ্গলাতে কত গান রচনা করিয়া পুস্তিকা আকারে মুদ্রিত করাইয়াছেন। তিনি বিভিন্ন দেশে গমন করিয়া উৎসব করিয়াছেন। দার্জ্জিলিংএ "মহারাণীস্কুল" তিনিই প্রতিষ্ঠিত করেন। "ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউসন" তিনিই রক্ষা করিয়াছিলেন, অবশেষে কমলকুটীর ক্রয় করিয়া স্কুলের জন্য দান করিয়াছেন। তাঁহার জীবনে কত সৎকার্য্য যে হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করা সাধ্যাতীত। সর্ব্বোপরি তাঁহার ভগবৎপ্রীতি তাঁহাকে নারীকুলভূষণা, সমাজের শীর্ষস্থানীয়া, সতী সাধ্বী আর্য্যনারী নামে চির উজ্জ্বল করিয়াছে। তিনি চিরদিন বাঙ্গলার বুকে বাঙ্গালী রমণীর আদর্শরূপে চির প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন।

শ্রীমণিকা মহলানবিশ।

—০—

উৎসব।

(১)

বালেশ্বর উৎকল নববিধানসমাজের চতুঃষষ্টিতম সাম্বৎসরিক উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :—

মা বিধানজননীর কৃপায়, বালেশ্বরে, ৮ই জুলাই হইতে ১৫ই পর্য্যন্ত ৮দিনব্যাপী উৎসব হইয়াছে। প্রথমতঃ বারিপদা হইতে ভাই নগেন্দ্রনাথ ও কলিকাতা হইতে ভাই অখিলচন্দ্র আসিয়া উৎসবে বৃত হন; পরে ভাই প্রিয়নাথ সস্ত্রীক আসিয়া যোগদান করেন। ৮ই ব্রহ্মমন্দিরে উদ্বোধন, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র পাণ্ডা উৎকল ভাষায় সংক্ষেপে উপাসনা করেন। ৯ই সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ বর্দ্ধন উপাসনা করেন, পরে সৎপ্রসঙ্গ হয়। ১০ই সিদ্ধিয়ায় শ্রীযুক্ত ভাগবত বিশালের মঠে আলোচনাদি হয়। ১১ই পুরাণ বালেশ্বরের চুনপাড়া মঠে, সংকীর্ত্তন, উপাসনা ও হিন্দুধর্ম্মের সারতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা এবং প্রীতিভোজন হয়। ১২ই ব্রহ্মমন্দিরে মহিলাদের উৎসব, ভাই নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন ও মহিলারাই সঙ্গীত করেন; প্রীতিভোজনান্তে পল্লিবাসিনীগণ ভাই নগেন্দ্রনাথের সহিত ধর্ম্মের তত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করেন। সায়ং সংকীর্ত্তনের উপাসনায় শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র পাণ্ডা নেতৃত্ব করেন, শেষাংশে ভাই অখিলচন্দ্র রায় মহোৎসবের প্রসাদ ভিক্ষা করিয়া প্রার্থনা করেন। ১৩ই সমস্তদিনব্যাপী উৎসব, ১০টার সময় উপাসনা আরম্ভ হয়, ভ্রাতা গোবিন্দ পাণ্ডা ও ভাই নগেন্দ্রনাথ সংগীত করেন এবং ভাই অখিলচন্দ্র রায় বেদীর কার্য্য করেন। আচার্য্যের দৈনিক প্রার্থনা হইতে "নবসন্ন্যাসধর্ম্ম" প্রার্থনাটী পাঠ করেন ও আত্মত্যাগ বিষয়ে আত্মনিবেদন করেন। অদ্য অপরাহ্ণে ভাই প্রিয়নাথ, ভাই অখিলচন্দ্র ও নগেন্দ্রনাথ প্রার্থনাযোগে শ্রীদরবারের মিলন সম্বন্ধে গভীরভাবে আলোচনা করেন। সায়ংকালে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন এবং নববিধানের বিশেষত্ব সম্বন্ধে আত্মনিবেদন করেন। নববিধানের নূতনত্বের গভীর বিষয়গুলিকে সহজ ভাষায় বর্ণনা করেন। ১৪ই প্রাতে ১০টার সময় উপাসনার প্রথমাঙ্গ ভাই প্রিয়নাথ সম্পন্ন করিলে, ভাই অখিলচন্দ্র রায় সিদ্ধিয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত ভাগবত বিশালকে নবসংহিতানুসারে যথাবিধি দীক্ষা দান করেন। শেষাংশে ভাই প্রিয়নাথ দীক্ষার্থীকে নববিধানের আদর্শচরিত্রসাধনই দীক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া শান্তিবাচন করেন। সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দির হইতে প্রার্থনা করিয়া নগরকীর্ত্তন বাহির হয় এবং মতিগঞ্জবাজারে যাইলে, শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ বর্দ্ধন উড়িয়া ভাষায় সহজ ব্রহ্মদর্শন বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ভাই অখিলচন্দ্র বক্তৃতা আরম্ভ করিলেই প্রবলবেগে বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় বিশেষ কিছু বলা হয় নাই। তৎপরে বারবাটী প্রভৃতি স্থানে উচ্চকণ্ঠে কীর্ত্তন করিতে করিতে রাত্রি প্রায় ১২টায় ব্রহ্মমন্দিরে প্রত্যাগমন করিলে, ভাই অখিলচন্দ্র রায় কাতরপ্রাণে প্রার্থনা করেন। কীর্ত্তনান্তে প্রীতিভোজন হয়। ১৫ই প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরেই ভাই প্রিয়নাথ, ভাই নগেন্দ্রনাথ ও ভাই অখিলচন্দ্র রায় সমযোগে উপাসনা করেন। ভাই প্রিয়নাথ শেষাংশে প্রার্থনাপাঠাদি ও শান্তিবাচন করেন। অদ্যই সায়ংকালে ভাই প্রিয়নাথ সস্ত্রীক হাওড়ায় গমন করেন, এবং অদ্য সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরেই উৎকল নববিধান সমাজের বার্ষিক অধিবেশনে ভাই অখিলচন্দ্র রায় সভাপতির কার্য্য করেন, সহকারী সম্পাদক কর্ত্তৃক গত বৎসরের রিপোর্ট ও হিসাবাদি পঠিত হইলে, সর্ব্ব-

সম্মতিতে বর্ত্তমান বর্ষের জন্য পুনরায় কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হয় এবং শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর বিশাল সম্পাদক, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র পাণ্ডা সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। গতবর্ষে অধ্যক্ষসভার কোন অধিবেশন হয় নাই, সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকই সমাজের কার্য্যাদি নিজেদের দায়িত্বে সম্পন্ন করিয়াছেন; এজন্য অধ্যক্ষসভার কোন কোন সভ্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং অদ্যকার সভাপতিও তাহাতে যোগদান করেন। তৎপর শান্তিবাচন হয়। এবার এই উৎসবে সভাই মার অজস্র আশীর্ব্বাদ ও স্বর্গের প্রসাদলাভে সবান্ধবে ও সপরিবারে আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

বিনীত সেবক—শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

(২)

বারিপদা (ময়ূরভঞ্জ) নববিধান ব্রাহ্মসমাজের অষ্টম সাম্বৎসরিক উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ—

নববিধানজননীর কৃপায়, বিগত ২৫শে জুলাই হইতে ২৮শে পর্য্যন্ত চারিদিনব্যাপী বারিপদা নববিধানমন্দিরের অষ্টম সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়াছে। এই উপলক্ষে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক সপরিবারে ও ভাই অখিলচন্দ্র রায় বারিপদায় গমন করেন।

২৫শে জুলাই, সায়ংকালে উৎসবের আরতির মধুর সংকীর্ত্তনটী ভাই নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গীত হয় এবং ভাই প্রিয়নাথ ভাবযোগে আচার্য্যদেবের আরতি প্রার্থনা আবৃত্তি করেন। অনেকগুলি স্থানীয় বন্ধু ও ভদ্রমহিলা যোগদান করেন।

২৬শে জুলাই, বারিপদা ব্রহ্মমন্দিরপ্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে সমস্তদিনব্যাপী উৎসব হয়। প্রাতে ৯টায় ভাই নগেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে সংগীত হইলে, ভাই অখিলচন্দ্র বেদীর কার্য্য করেন, এবং "সর্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্বে ও ভগিনীত্বের মধ্যে স্বর্গদর্শন এবং প্রেমময়ী মার বক্ষে পাপী সাধু সকলের মিলন", এই বিষয়ে নিবেদন করেন। ভাই প্রিয়নাথ ব্যক্তিগত প্রার্থনা করেন। এই উপাসনার শেষাংশে বালেশ্বর হইতে ভক্ত গায়ক শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র পাণ্ডা সদলে আসিয়া যোগ দেন। মধ্যাহ্নে বিনয়কুটীরে প্রীতিভোজন হয়। অপরাহ্নে ৪॥টা হইতে ৬॥টা পর্য্যন্ত গভীর আলোচনা ও পাঠাদি হয়। সন্ধ্যায় জমাট সংকীর্ত্তনান্তে ভাই প্রিয়নাথ বেদীর কার্য্য করেন। ইনিও খুব ভক্তিভাবে মাতৃপূজার সাধক সাধিকাদিগকে স্মরণ করেন। তিনি আত্মনিবেদনে, ৮বৎসর মনে পূর্ব্বে এই পবিত্র ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠা ও এই রাজ্যের স্বর্গীয় মহারাজ শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেও বাহাদুরের ধর্ম্মনিষ্ঠা, আত্মত্যাগ, অকিঞ্চনতা, প্রজাবাৎসল্য এবং বর্ত্তমান রাজমাতা মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবীর নববিধানসাধন ও প্রচার এবং এই রাজ্যে নব-[illegible]র জন্য তাঁহার উৎসাহ ও ত্যাগের বিষয় প্রকাশ করেন। বর্ত্তমান নববিধান মহাপ্রেমের বিধান, এই বিধানে প্রত্যক্ষ ব্রহ্মদর্শনের কথাও ব্যক্ত করেন। খুব জমাট ভাবের সহিত রাত্রি প্রায় ১০॥টায় উপাসনা শেষ হয়।

২৭শে জুলাই, প্রাতে যাত্রিনিবাসেই উষাকীর্ত্তন ও বেলা ১০টার সময় পূর্ণচন্দ্রপুর পাঠশালায় উৎসব হয়। খোলা মাঠের মধ্যে পাঠশালায় পর্ণকুটীরে উৎসব হয়। প্রকৃতিমাতার কোমল ক্রোড়ে পুত্রকন্যাগণ তাঁর গুণগানে মোহিত হন। এই পাঠশালার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিমোহন দাস উড়িয়া ভাষায় উপাসনা করেন, উড়িয়া ভাষায় কয়েকটী মধুর সঙ্গীত হয়; ভাই প্রিয়নাথ আচার্য্যের প্রার্থনা হইতে "দীনসেবা" বিষয়টী ভক্তিভাবে আবৃত্তি করিয়া, বিগলিতপ্রাণে শান্তিবাচন করেন। ভাই নগেন্দ্রনাথও উচ্ছ্বসিতপ্রাণে, এখানে মায়ের অপূর্ব্ব প্রেমের লীলার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রদান করিয়া কাতর প্রার্থনা করেন। এই উৎসবে উৎসবের যাত্রী, স্থানীয় বিশ্বাসিগণ এবং দরিদ্র হরিজন ছাত্র ছাত্রী প্রায় শতাধিক যোগদান করেন। সায়ং ৭॥টায় সময় বারিপদা ব্রহ্মমন্দির হইতে নগরসংকীর্ত্তন আরম্ভ হয়। ভাই প্রিয়নাথ আচার্য্যের প্রার্থনা হইতে সময়োপযোগী প্রার্থনা আবৃত্তি করিলে, মহা উৎসাহে কীর্ত্তনকারী ভক্তদল ব্রহ্মমন্দির হইতে বাহির হন, এবং সঙ্গীতাচার্য্যের রচিত "নববিধান-মিলনতানে, অনন্তেরজয়গানে" কীর্ত্তনটী গাহিতে গাহিতে বারিপদা মিউনিসিপ্যাল বাজারের সম্মুখে আসিলে, সেবক ভাই অখিলচন্দ্র উচ্চকণ্ঠে বিশ্বনাথের দর্শন যে সহজ, তিনি পাপী তাপী সকল সন্তানকে দেখা দিবার জন্য ব্যস্ত, তাঁর মহাপ্রেমে এবার স্বর্গ মর্ত্ত এক হয়েছে, মহম্মদ যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রেমালিঙ্গন দিচ্ছেন, আমরা আর কাহাকেও ছাড়িতে পারিব না ইত্যাদি, স্বর্গীয় প্রেমের বার্ত্তা মহা উৎসাহের সহিত বলিয়াছিলেন। তৎপরে "কি সুখ [illegible]বনভার, বহিবে বল আর" এই সংকীর্ত্তনটী করিতে করিতে [illegible]বাড়ীতে যাইয়া, সেখানে রাজবাড়ীর ২য় ও ৩য় প্রকোষ্ঠে প্রা[illegible] একঘণ্টা কাল সংকীর্ত্তন হয়। মহারাজের খুল্লতাত তাঁর [illegible]তাবর্গসহ ও রাজান্তঃপুরের মহিলাগণ ভক্তিসহকারে ব্রহ্মগুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াছিলেন। এখানে আসিলেই সেই পুণ্য[illegible]ক ব্রহ্মভক্ত স্বর্গীয় মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেওর অমরা[illegible] দিব্যস্মৃতি অন্তরে জাগিয়া উঠে। তৎপরে নগর ভ্রমণ করিয়া কীর্ত্তনের দল ভাই নগেন্দ্রনাথের সংসারাশ্রম বিনয়কুটী[illegible] প্রত্যাগমন করিয়া, মহামত্ততার সহিত সংকীর্ত্তন করিয়াছি[illegible]। পরিশেষে ভাই অখিলচন্দ্র মত্ততার আবেগে প্রার্থনা করিলে[illegible] কীর্ত্তনান্তে প্রীতিভোজন হয়। এই প্রীতিভোজন ও সেবা আয়োজনে ভাই নগেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা বধূ শ্রীমতী আভাময়ী ও কন্যা শ্রীমতী বনলতা মাতৃবেশে আকুল হয়ে, শ্রান্ত ক্লান্ত সন্তানদের সেবাশুশ্রূষায় তাঁহাদিগকে পরম আহ্লাদিত করেন।

২৮শে জুলাই, প্রাতে ৯টায় ব্রহ্মমন্দিরে, শান্তিবাচনের উপাসনা ভাই প্রিয়নাথ করেন। ভাই নগেন্দ্রনাথ প্রার্থনা করেন। তৎপর শান্তিবাচনের প্রার্থনা পঠিত হইয়া, কাতর প্রার্থনার সহিত উৎসবের কার্য্য শেষ হয়। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

চতুঃষষ্টিতম ভাদ্রোৎসবের কার্য্যবিবরণ।

আমরা উৎসবানন্দদায়িনী পরমজননীর শ্রীপদে প্রণাম করিয়া, এবারকার ভাদ্রোৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করিলাম।

১৫ই আগষ্ট, ১৯৩৩, ৩০শে শ্রাবণ, ১৩৪০, মঙ্গলবার, ভক্তিভাজন ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক। প্রাতে ৭॥টায়, নবদেবালয়ে এই উপলক্ষে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। তাঁহার আত্মজীবনী হইতে তাঁহার জীবনের স্বর্গীয় নিয়োগ বিষয়ে পাঠ হয়। তাঁহার ঐকান্তিক সত্যনিষ্ঠ জীবন গ্রহণ সম্পর্কে প্রার্থনা হয়। সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে প্রসঙ্গ হয়। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক আচার্য্যদেবকৃত একটী প্রার্থনা-পাঠান্তে, নিজে প্রার্থনা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। তৎপর স্বর্গগত ভাই গিরিশচন্দ্রের জীবনী অবলম্বনে প্রসঙ্গ হয়।

১৬ই আগষ্ট, বুধবার, সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে পাঠ ও প্রসঙ্গ হয়। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু ও ভাই অখিলচন্দ্র রায় ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ হইতে পাঠ করেন। তৎপর ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ উপাধ্যায়কৃত শ্রীকৃষ্ণের জীবনী অবলম্বনে প্রসঙ্গ করেন।

১৭ই আগষ্ট, বৃহস্পতিবার, শ্রীমৎ পরমহংসদেবের স্বর্গারোহণ-সাম্বৎসরিক। প্রাতে ৭॥টায় নবদেবালয়ে এই উপলক্ষে উপাসনা ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক সম্পন্ন করেন। সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে প্রসঙ্গ হয়। প্রথমে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক আ[illegible]র্য্যদেবের একটী প্রার্থনা পাঠ করিয়া, উপস্থিত সকলকে প্র[illegible] করিবার জন্য আহ্বান করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দ[illegible] পরমহংসদেবের জীবনী অবলম্বনে দীর্ঘ প্রসঙ্গ করেন। ভাই [illegible]নাথ মল্লিক পরমহংসদেবের সঙ্গসহায়তা যোগে প্রাপ্ত আপনার [illegible]নের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া প্রার্থনা করিলে, অদ্যকার ক[illegible] শেষ হয়। শ্রোতারূপে পরমহংসদেবের দলের কেহ কে[illegible] প্রসঙ্গে যোগদান করিয়া ছিলেন।

[illegible]৮ই আগষ্ট, শুক্রবার, সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে মহিলাদিগের জন্য উপাসনা। মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী সুমিষ্ট ভাবে উপাসনার কার্য্য করেন। এবার অনেকেই উপাসনায় যোগদান করিয়াছিলেন।

[illegible]শে আগষ্ট, শনিবার, প্রাতে ৭॥টায় নবদেবালয়ে উপাসনা হয়। ২০শে আগষ্ট, জেনারেল বুথের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক দিন, রবিবার হওয়ায়, অদ্য সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে মুক্তিফৌজদলের প্রার্থনা ও বক্তৃতাদি হয়। ব্রহ্মমন্দিরে সকলে সমবেত হইলে, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু ইংরেজিতে মুক্তিফৌজদলের সাদর অভ্যর্থনা করেন। তৎপর মুক্তিফৌজদলের লোকেরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় প্রার্থনা, সঙ্গীত ও বক্তৃতা করেন।

২০শে আগষ্ট, রবিবার, সমস্তদিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে ৮টায় বিধানমুরলী শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে কীর্ত্তন হয়। তৎপর ৮॥টায় উপাসনা আরম্ভ হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। তিনি তাঁহার স্বাভাবিক ভাবোচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইয়া উদ্বোধন, আরাধনা, পাঠ প্রসঙ্গাদির কার্য্য করেন। "নমো দেব নমো দেব" শেষ কীর্ত্তনটী হইয়া প্রায় ১১॥টায় এ বেলায় কার্য্য শেষ হয়। এ বেলায় পাঠ ও আত্মনিবেদনে বিশেষ এই কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ হয়। পুরাতন কিছু লইয়া লোকের প্রাণে যথার্থ আনন্দ লাভ হয় না। তাই উৎসবের বিশেষ লক্ষণ এই, সেখানে সকলই নূতন। বাহিরে মন্দিরের সাজ সজ্জা যেমন নূতন, তেমনই উৎসবে ঈশ্বরের দর্শন নূতন, তাঁহা হইতে প্রেরণা নূতন, শিক্ষা নূতন, তাঁহার বাণী-শ্রবণ নূতন, তাঁহা হইতে প্রসাদগ্রহণ নূতন, সবই নূতন ভাবে নূতন ব্যাপার। ভাদ্রোৎসব ব্যাপার ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা ও নবযুগে নব উপাসনা-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ করিয়া। "সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্"—আমাদের যথার্থ উপাসনামন্দির কোন সীমাতে আবদ্ধ নয়; অনন্তের উপাসনা—জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় ও বিশ্বমানবকে লইয়া উপাসনা সীমাবদ্ধ কোন কিছুতে সম্ভব হয় না। তবে আমাদের এই ইট কাঠের ব্রহ্মমন্দির সেই সীমাহীন ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিকৃতিরূপেই বিদ্যমান। এই ব্রহ্মমন্দিরকে সেই সীমাহীন ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিরূপ রূপে স্বীকার করিতে হইবে। নব যুগে নববিধানের নবব্রহ্মের উপাসনায় পূর্ব্ব পশ্চিমের সর্ব্ব ধর্ম্মের বিশেষ সংযোগ আমরা দেখিতে পাই। ভারতের ব্রহ্মদর্শন-যোগ এবং এব্রাহিম হইতে মুষা, ঈশা ও মহম্মদের জীবনের ব্রহ্ম-বাণী শ্রবণ-যোগ মিলিত হইয়া বর্ত্তমান বিধানের মহা উপাসনা। এই উপাসনা-মদিরা পান করিয়া প্রমত্ত হইবার জন্য বেদী হইতে বিশেষ অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়।

অপরাহ্ন ৩টায় মাধ্যাহ্নিক উপাসনা ভাই অখিলচন্দ্র রায় নির্ব্বাহ করেন। তৎপর পাঠ ও প্রসঙ্গ হয়। প্রথমে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র "ঈশ্বর আবৃত, না অনাবৃত" এ উপদেশটী পাঠ করেন। "ঈশ্বর আবৃত, না অনাবৃত" বিষয়ে বলিবার জন্য ভাই গোপালচন্দ্র গুহকে অনুরোধ করা হয়। তিনি বলেন, ঈশ্বর সর্ব্বদাই স্বপ্রকাশ, তিনি শুদ্ধ ও মুক্তস্বভাব হইয়া সর্ব্বদা সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইয়াই আছেন; তাই তিনি অনাবৃত। তবে তিনি সাংসারিক বিষয়াসক্ত লোকের নিকট আবৃত। আমরা সাধারণতঃ এবং স্বভাবতঃ ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পৃথিবীর পিতামাতাকে চিনিয়া লই, তৎপর দূর নিকট অন্যান্য আত্মীয় বান্ধবগণকে চিনিয়া লই, পৃথিবীর খাওয়া পরার বস্তুর আস্বাদন গ্রহণ করি, তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হই। বাহ্যেন্দ্রিয়-যোগে বাহ্য বস্তু দর্শন করি ও গ্রহণ করি। এ অবস্থায় ঈশ্বরকে চিনিতেও পারি না, দর্শনও করিতে পারি না। তাই এ অবস্থায় ঈশ্বর আমাদের নিকট সম্পূর্ণ আবৃত। ঈশ্বর[illegible] করিবার জন্য অন্তরেন্দ্রিয়ের বিকাশ প্রয়োজন। তাই ভারতের

ঋষিযুগে বালক এবং যুবক শিষ্যগণকে বাহিরের শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে, পরাবিদ্যা, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মের পরিচয় শিক্ষা দেওয়া হইত। অন্তরের চক্ষুর বিকাশের জন্য, ব্রহ্মস্ফুরণ অন্তরে প্রাপ্তির জন্য, সৎসঙ্গে বাস, সৎগ্রন্থ পাঠ, সাত্ত্বিক ভাবে খাওয়া পরা, ক্রমে স্মরণ, মনন ইত্যাদি প্রয়োজন। যতই আমাদের আত্মার চক্ষু বিকাশ লাভ করিবে, ততই ঈশ্বরের প্রকাশ ক্রমে অধিকতর-রূপে আমাদের মধ্যে সম্ভব হইবে। ততই আমাদের নিকট ঈশ্বর অনাবৃত হইবেন। তপস্যা ও সাধনের ফলে সাধকের নিকট ঈশ্বর কিরূপ অনাবৃত, কিরূপ তাঁহার সর্ব্বগ্রাসী প্রকাশ সাধক উপলব্ধি করিয়া থাকেন, তাহা কয়েকটী ঋষি-জীবনের ব্রহ্মদর্শনমূলক শ্লোক উল্লেখ করিয়া প্রদর্শন করেন। ঈশ্বর যত আমাদের নিকট অনাবৃত হয়েন, তাঁহার প্রকাশে আমরাও প্রকাশিত হই, অন্যথা আমরাও আমাদের নিকট আবৃত। "তমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" ঈশ্বরের জ্যোতিতে সকলই জ্যোতিষ্মান্ তাঁহার প্রকাশে সকলই প্রকাশিত। অতএব ঈশ্বর আবৃত ও অনাবৃত, একথা কেবল জীবের উপলব্ধির তারতম্যেই কথিত হইয়া থাকে। অন্যথা ঈশ্বর সর্ব্বদাই স্বপ্রকাশ, সর্ব্বদাই অনাবৃত। তৎপর পূর্ব্বাহ্নের উপাসনা ও বেদী হইতে প্রদত্ত উপদেশ অবলম্বনে প্রসঙ্গ হয়। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী মিত্র, শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মিত্র ক্রমে সে বিষয়ে প্রসঙ্গ করেন। সকাল বেলায় উপদেশের মধ্যে ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মবাণীশ্রবণ, এই বিষয়ে বিশেষ কথাবার্ত্তা হওয়ার পর, ঐ বিষয়ের বিশদ-ব্যাখ্যা-মূলক "ব্রাহ্মধর্ম্মের অগ্নি" শীর্ষক আচার্য্যদেবের উপদেশটী শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মিত্র পাঠ করেন। তৎপর ধ্যানের উদ্বোধনান্তে ধ্যান ও প্রার্থনা হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ধ্যানের উদ্বোধন করিলে ধ্যান হয়। ধ্যানান্তে প্রার্থনা করেন। তৎপর ৬টার পর কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়া ৭টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হয়। বিধানমুরলী শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কীর্ত্তনে নেতৃত্ব করেন। কীর্ত্তনান্তে ডাক্তার প্রেমসুন্দর বসু বেদী গ্রহণ করিয়া এ বেলার উপাসনার কার্য্য করেন, এবং বেদী হইতে সারগর্ভ হৃদয়গ্রাহী উপদেশ দান করেন। "ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দতে" এই শ্লোকটী অবলম্বনে, বেদে ব্রহ্ম, উপনিষদে পরমাত্মা, পুরাণে ভগবান্ একেরই ক্রমিক ত্রিবিধ প্রকাশ বর্ণন করিয়া, ধর্ম্মপিতামহ রামমোহনের জীবনে ব্রহ্মভাব, ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথের জীবনে পরমাত্মার ভাব, এবং আমাদের ধর্ম্মনেতা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনে লীলার ভাব, ভগবদ্ভাব বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হইয়া, কিরূপে নববিধানের সমন্বয়ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইল, তাহা তিনি এই তিন জীবনের সাধন-সম্পদ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা করেন।

(ক্রমশঃ)

সংবাদ।

পারলৌকিক—আমরা গভীর দুঃখের সহিত নিম্নলিখিত পরলোকগমন-সংবাদ প্রকাশ করিতেছি :—

চুঁচুঁড়ার প্রাচীনা লেডী ডাক্তার শ্রীমতী হৈমবতী সেন, বিগত ৫ই আগষ্ট, নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁর পুত্রকন্যাদিগের আগ্রহে, গত ১৯শে আগষ্ট, শনিবার অপরাহ্ণ ৫টার সময়, তাঁর বাড়ীতে শ্রদ্ধেয় ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা ও স্বর্গীয়া মাতৃ-আত্মার প্রতি শ্রদ্ধার্পণ করেন। স্বর্গীয়া হৈমবতী সেন অতি দয়াবতী ও পরদুঃখকাতরা ছিলেন।

স্বর্গীয় মতিলাল গুপ্তের সহধর্ম্মিণী, ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেনের শ্বশ্রূমাতা শ্রীযুক্তা শরৎকুমারী গুপ্ত ৬৮ বৎসর বয়সে, আগষ্টের মধ্যভাগে, কলিকাতায় স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

বিধানজননী তাঁর কন্যাদ্বয়কে পরলোকে তাঁর শান্তিময় শ্রীচরণে স্থান দান করুন এবং শোকার্ত্ত জনগণের প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

ব্রহ্মমন্দিরপ্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক—বিগত ২৪শে আগষ্ট, চুঁচুঁড়া ব্রহ্মমন্দির-প্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, ঐ মন্দিরে অপরাহ্নে ৫টা হইতে সংকীর্ত্তন, পাঠ ও বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই অখিলচন্দ্র রায় বেদীর কার্য্য করেন। এখানকার সমাজ-মন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে শ্রীমদাচার্য্যদেব ৫৮ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৭৫খৃঃ "ধর্ম্মসাধন—তীর্থযাত্রা" বিষয়ে যে সুন্দর উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করা হয়। চন্দননগর হইতে [illegible] ভক্তিপিপাসু বন্ধু ও স্থানীয় ৮।৯টী ব্রাহ্মব্রাহ্মিকা যোগ দিয়া [illegible] সংগীত ও সংকীর্ত্তন করিয়া উৎসবকে বেশ জমাট করিয়াছি[illegible]। স্বর্গীয় ভক্ত ডাঃ নকুড়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাতর প্রার্থনা[illegible] ও তাঁর আত্মত্যাগের নিদর্শন-স্বরূপ সুন্দর মন্দিরটী আজও [illegible] বিশ্বাসীদিগের সাধনার স্থান হইয়া আছে।

সাম্বৎসরিক—গত ২১শে আগষ্ট, বাঁকিপুরে, স্ব[illegible] উপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্রী, স্বর্গীয় অমৃতানন্দ রায়ের [illegible] কন্যা শ্রীমতী চিত্ততোষিণী ও জামাতা শ্রীমান্ পূর্ণানন্দ [illegible]ের গৃহে, ভক্তিভাজন ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রের (চিত্ততোষিণী[illegible] বড় আদরের বড়দাদু) সাম্বৎসরিক দিনে বিহার ন্যাশন্যাল ক[illegible]জের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন উপাসনা করেন।

গত ২৪শে আগষ্ট, বিধানবিশ্বাসী ধর্ম্মনিষ্ঠ স্বর্গীয় রম[illegible]কান্ত চন্দের সাম্বৎসরিক দিনে, কলিকাতায় ১৫বি, রাজা [illegible] ষ্ট্রীটে শ্রীমতী অশোকলতা দাসের গৃহে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। রাঁচিতে সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী হেমলতা চন্দের গৃহে এবং পাটনায় শ্রীমতী বনলতা দের গৃহেও বিশেষ উপাসনাদি হয়। এই উপলক্ষে শ্রীমতী অশোকলতা দাস ভাদ্রোৎসবে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.
কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৮ ভাগ। ১৭শ সংখ্যা।

১লা আশ্বিন, রবিবার, ১৩৪০ সাল, ১৮৫৫ শক, ১০৪ ব্রাহ্মাব্দ।
17th. September, 1933.

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে জীবের ভাগ্যবিধাতা পরম দেবতা, হে জগৎ-পালিনী পরমা জননী! তোমার বিচিত্র জগতের বিচিত্র লীলাভিনয় দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়া যাই। কোন ঘরে সন্তানের শুভ জন্মোৎসবে শঙ্খধ্বনি, কোন ঘরে সন্তানের অকাল মৃত্যুতে বিলাপ ও ক্রন্দন, কোন ঘরে ধনৈশ্বর্য্যের বিপুল প্রাচুর্য্য, কোন ঘরে দুঃখ দৈন্যের অসহনীয় কশাঘাত। কোন সাধু উপদেশ-বাক্য বলিয়া গেলেন, "যাহারা আনন্দ করে, তাহাদের আনন্দে আনন্দিত হও; যাহারা ক্রন্দন করে, তাহাদের সহিত ক্রন্দন কর।" তোমার নববিধানের নবভক্তেরও বাণী ঐরূপ, "একই সময়ে বিবাহোৎসবের বাড়ীতে বিবাহোৎসবের আনন্দের অনুষ্ঠান আনন্দের সহিত সম্পন্ন কর, আবার সেই সময়ে মরণের শোক বিলাপের বাড়িতে শোকের অনুষ্ঠান শোকার্ত্তহৃদয়ে সম্পন্ন কর; ইহা যদি তুমি না পার, তবে তুমি নববিধানের সেবকের উপযুক্ত নও।" যত এই সকল উপদেশের বাণী প্রাণকে স্পর্শ করে, যত সেরূপ ঘটনার সঙ্গে জীবন সাক্ষাৎ ভাবে বিজড়িত হয়, নিজের অযোগ্যতা, অপ্রস্তুতি স্মরণ করিয়া সময়ে সময়ে মন খুবই ভীত হয়। প্রাণ বলে, দশের সঙ্গে তেমন একপ্রাণতা সাধন হইয়াছে কৈ? তেমন সকলের সঙ্গে জীবন্ত সহানুভূতি কৈ? তেমন উদারতা ও প্রীতির সরলতা কৈ? তেমন পরদুঃখ-কাতরতা কৈ? কিন্তু বুঝিয়াছি, হৃদয় মনের অভাব, অপ্রস্তুতি দেখিয়া তোমার শরণাপন্ন হইলে, তুমি অভাব ও অপ্রস্তুতি রাখ না; তুমি হৃদয় মনের সকল প্রস্তুতি বিধান করিয়া, যাহা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয় মনে করি, তাহা সম্ভব করিয়া তুমি অনায়াসে আমাদের দ্বারা করাইয়া লও। তাই তোমার কৃপাই আমাদের জীবনপথে, জীবনের গুরুতর কর্ত্তব্য-পথে একমাত্র ভরসা। এই যে বঙ্গে দুর্গোৎসবের সময় উপস্থিত হইতেছে, এ সময় অনেক পরিবারে, অনেকের ঘরে, যে ভাবেই হউক, যে প্রণালীতেই হউক, মা, তোমার নামে আনন্দের উৎসব হইবে। আবার দুঃখে, দৈন্যে, রোগে, শোকে, নানা গুরুতর পরীক্ষার আঘাতে, বিশেষভাবে বন্যা-প্রপীড়িত ক্ষেত্রে বন্যার পীড়নে উৎপীড়িত বহু পরিবারের এ সময় যেন দুঃখের রাত্রি অবসান হইতে চাহে না। মা দুঃখ-বিপন্নাশিনী, উৎসবানন্দদায়িনী জননি! আশীর্ব্বাদ কর, আমরা এ সময় ভয়-দুঃখ-দুর্গতিনাশিনী চিন্ময়ী শ্রীদুর্গারূপে তোমার পূজা দেশের সঙ্গে [illegible] সঙ্গে একপ্রাণ হইয়া করিয়া, তোমার সত্য পূজার বিমলানন্দে

মত্ত হই। যাঁহারা আনন্দের উৎসব করিবেন, তাঁহাদের সহিত আনন্দের উৎসব করি; আর যাঁহারা নানা অবস্থার পীড়নে নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া, দুঃখ, দৈন্য, অভাব, অনটন ও দুঃসহ দুর্গতি সহ্য করিতেছেন, তাঁহাদের সহিত পূর্ণ সহানুভূতিতে একপ্রাণ, একহৃদয় হইয়া, তাঁহাদের দুঃখে দুঃখ, তাঁহাদের অভাব অনটনে অভাব অনটন অনুভব করি এবং তোমার চরণে তাঁহাদের দুঃখ দুর্গতি নিবেদন করিয়া, হে দুর্গতিনাশিনী শ্রীদুর্গা, সকল প্রকার দুর্গতি দূর করিবার জন্য যেন প্রাণের সরল ও ব্যাকুল প্রার্থনা করিয়া ধন্য হইতে পারি। তুমি নিজ কৃপাগুণে সময়োপযোগী করিয়া আমাদের হৃদয় মনকে প্রস্তুত কর।

শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

—০—

বঙ্গে দুর্গাপূজা।

কোন্ সুদূর অতীত হইতে এই আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসবের আনন্দোৎসব বঙ্গের ঘরে ঘরে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে, তাহা বলা সহজ নহে। কিন্তু আমাদের দীর্ঘ জীবনে আমরা যাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি ও দেখিতেছি, তাহা হইতে এই বলিতে পারি, বঙ্গদেশ সারা বৎসর সুখ, দুঃখ, বিপদ, পরীক্ষা, জন্ম, মরণ, আশা ও আনন্দের সকল অবস্থার ভিতর দিয়া জীবন যাপন করিয়া, এই আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসবের সময় একটা ঘনীভূত জমাট বিমল সুখ, আরাম, আনন্দ লাভ ও সম্ভোগ করিবার জন্য, প্রাণে আশা ও উৎসাহ লইয়া প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। পরীক্ষা, বিপদ, জন্ম মরণ, শোক তাপ কাহার ঘরে না আছে? রাজার ঘরে আছে, প্রজার ঘরে আছে, ধনীর ঘরে আছে, দরিদ্রের ঘরে আছে, পণ্ডিত-মূর্খ-নির্ব্বিশেষে সকলের ঘরে আছে। সারা বৎসর ঘরে ঘরে অধিকাংশ লোক কত দুঃখ দারিদ্র্য রোগ শোকের আঘাতের ভিতরে জীবন যাপন করে। অনেকেরই ব্যক্তিগত জীবনে ও পরিবারে, বিভিন্ন ভাবে অশুভ ঘটনার নিরানন্দ যেমন আছে, শুভ অনুষ্ঠানের আনন্দও অল্পাধিক পরিমাণে বৎসরের সকল সময় ভোগ হইয়া থাকে। প্রত্যেক জাতির মধ্যে, প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায় মধ্যে, মানুষের জীবনে একটা সমবেত বা দলগত জাতীয় উৎ- [illegible]নন্দ সম্ভোগ করিবার স্পৃহা আছে। এ স্বাভাবিক স্পৃহা, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, পৃথিবীর সকল প্রধান প্রধান জাতি বা ধর্ম্মসম্প্রদায়, বৎসরের মধ্যে বিশেষ বিশেষ জাতীয় সম্মিলিত উৎসবানন্দের অনুষ্ঠান দ্বারা চরিতার্থ করিয়া থাকেন। সমস্ত বৎসরের মধ্যে হিন্দুজাতির জাতীয় জীবনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উৎসবানন্দের ব্যাপার এই আশ্বিনের দুর্গাপূজা। যে বাড়ীতে দেবীপূজার অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়, সে বাড়ীতে উৎসব; যে বাড়ীতে বাহিরে পূজার অনুষ্ঠান নাই, সে বাড়ীতেও উৎসব। অবস্থানুসারে প্রতি পরিবারে বালকবালিকা হইতে আরম্ভ করিয়া, সম্ভব হইলে প্রৌঢ়, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, সকলের জন্য, নূতন বস্ত্র আসিতেছে। চাকর চাকরাণীগণও নূতন কাপড় হইতে বাদ পড়িতেছে না। বিবাহিতা কন্যাগণ, ভগ্নীগণ সমাদরে এ সময় পিতৃমাতৃগৃহে ভ্রাতৃগৃহে, আনীত হইতেছে। কত আদান প্রদানের ভিতর দিয়া প্রীতি, স্নেহ ও আদরে পরস্পর পরস্পরকে গ্রহণ করিতেছে। এ সময়ে কাপড়ের দোকান, খেলনার দোকান, জামা জুতার দোকান প্রভৃতিতে সর্ব্বাপেক্ষা বিক্রয়ের উৎসব। গৃহে, পরিবারে, রাস্তায়, হাটে, বাজারে উৎসব যেন জীবন্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শ্রীদুর্গার মহাপূজা ঘোষণা করিতেছে। এ সময় শোকাতুর পিতা মাতা পুত্র-শোক ভুলিয়া, স্বামিহীনা পত্নী স্বামি-শোকের তীব্র আঘাত ভুলিয়া, ক্ষতিগ্রস্ত বিষয়ী গুরুতর ক্ষতির আঘাত চিত্ত হইতে মুছিয়া ফেলিয়া, অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য সকলের সঙ্গে এই উৎসবানন্দের ভাগীদার না হইয়াই পারিতেছে না। হিন্দুর গৃহের এই উৎসবে প্রতিবাসী মুসলমানগণও উৎসবের নূতন পোষাক পরিধান করিয়া, নূতন আহার পানের ব্যবস্থা করিয়া, উৎসবের ভাগীদার হইয়া প্রাণে গূঢ় উৎসবানন্দ সম্ভোগ করেন। বঙ্গে এ উৎসব, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টিয়ান প্রভৃতি সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে, কোন না কোন আকারে সার্ব্বভৌমিক উৎসব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই তো হইল প্রতিবৎসরের দুর্গোৎসব সময়ের সাধারণ চিত্র। কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরে বঙ্গ ভারতের জীবন পূর্ব্ব হইতেই নানা দুঃখ দৈন্যে, অভাব অনটনে, গুরুতর পরীক্ষার পীড়নে প্রপীড়িত; তাহার উপর জানিনা, বিধাতার কি শাসন বা কি শিক্ষা উপলক্ষে, এ বৎসর যতই বঙ্গে দুর্গাপূজার দিন সমাগত হইতেছে, বঙ্গের নানা স্থানে প্রবল বন্যা উপস্থিত হইয়া লোকের দুর্দ্দশা, দুরবস্থা

শতগুণ বৃদ্ধি করিতেছে। বঙ্গদেশ এই মহোৎসবের প্রাক্কালে মহাশোকের ও দুঃখের পরিচ্ছদ পরিয়া হাহাকার করিতেছে। অতএব এ বৎসরই যথার্থ প্রাণ ভরিয়া দুর্গতিনাশিনী মহাদেবীকে ডাকিবার দিন। এ বৎসর যথার্থ দুর্গতিনাশিনী শ্রীদুর্গার পূজা বন্দনা করিয়া, তাঁহা হইতে বল, শক্তি, উপায়, আশা ও আনন্দ লাভ করিবার দিন। কিন্তু বঙ্গের অধিকাংশ নরনারী তো বহুকাল হইতে মায়ের যথার্থ পূজা ভুলিয়া গিয়াছে।

এই দুর্গোৎসবের সময় মা চিন্ময়ী দুর্গাকে সম্মুখে রাখিয়া, মা দুর্গার চরণতলে বসিয়া, কয়জন নরনারী নিজ জীবনের অথবা গৃহ পরিবারের যথার্থ দুর্গতির জন্য জননীর চরণে প্রাণের ক্রন্দন জ্ঞাপন করে? কয়জন ব্যাকুলান্তরে যথার্থ দুঃখ দুর্গতি দুর করিবার জন্য প্রাণের ক্রন্দন জানায়? দুর্গোৎসবের সময় বঙ্গের ঘরে ঘরে কেবল আহার পানের আমোদ, পরণ পরিচ্ছদের আমোদ, নৃত্য গীতের আমোদ। সাধারণতঃ এই ভাবেই বহু দিন হইতে বঙ্গের দুর্গোৎসবের আমোদ সম্ভোগ হইয়া আসিতেছে। কোন কোন গৃহে নির্দ্দোষ ছাগ, মেষ, মহিষাদির বলিদানেরও ব্যবস্থা আছে। যথার্থ চিন্ময়ী দেবীর পূজা বঙ্গদেশে হইতেছে না এবং যথার্থ চিন্ময়ী দুর্গাপূজার ফললাভও হইতেছে না। তাই কবি গাইলেন—"শক্তি-পূজা [illegible]থার কথা মা; যদি কথার কথা হতো, তবে এ ভারত শক্তি পূজে শক্তিহীন হতো না।"

[illegible]মরা নববিধানের লোক; যথার্থ চিন্ময়ী দুর্গা-পূজার সন্ধান আমরা পাইয়াছি। দুর্গতিনাশিনী চিন্ময়ী দুর্গার পূজা আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু আমা[illegible] মধ্যে প্রধানতঃ চিন্ময়ী দুর্গাপূজা এখনও কেবল ব্যক্তিগত, পরিবারগত ও আপন মণ্ডলীগত সাধন [illegible]ম্ভোগের ব্যাপার হইয়া রহিয়াছে। শক্তি-দায়িনী, জ্ঞানদায়িনী, শুভবুদ্ধিদায়িনী ও সকল সঙ্কট হইতে মুক্তিদায়িনী জননী তিনি; তাঁহার নিকট আমাদের ব্যক্তিগ[illegible] ক্রন্দন জানাইতে আমরা একটু শিখিয়াছি, একটু অভ্যস্ত হইয়াছি। দশের জন্য, দেশের জন্য তেমন ব্যাকুল প্রার্থনা লইয়া তাঁহার চরণতলে উপস্থিত হই কই? আসুন, আমরা মণ্ডলীর ভাই ভগ্নীগণ সকলে মিলিত হইয়া, এসময় আপনাকে ভুলিয়া, দেশের জন্য, দশের জন্য, চিন্ময়ী দুর্গতিনাশিনী শ্রীদুর্গার পূজা করি; দেশের এবং দশের দুর্গতি দুর করিবার জন্য তাঁহার চরণে প্রাণের প্রার্থনা জানাই। আমাদের সকল আশা ও ভরসা কেবল তাঁহারই চরণে। তাঁহার পূজা করিয়া, সত্য ভাবে তাঁহাকে ডাকিয়া, সত্য প্রার্থনা তাঁহার চরণে নিবেদন করিয়া, সদ্য ফল লাভ করি; আশা, বিশ্বাসে ও বিক্রমে আমরা পূর্ণ হই, এবং দেশের নিকট চিন্ময়ী দুর্গাপূজার সুসংবাদ ঘোষণা করিয়া, প্রচার করিয়া, আমরা ধন্য হই।

—০—

ধর্ম্মতত্ত্ব।

ধর্ম্মের বিধি, সংসারের রীতি।

ধর্ম্ম বলেন, "ঈশ্বরকেও চাও, যাহা পাইবার সকলই পাইবে।" "সর্ব্ব প্রথমে স্বর্গরাজ্য অনুসন্ধান কর, পরে সংসারের যাবতীয় অভাব পূরণ হইবে।" কিন্তু সংসার বলেন, "আগে পেটের চিন্তা, তারপর ধর্ম্মকর্ম্ম।" জীবনের পরীক্ষায় ধর্ম্মের বিধিই সর্ব্বথা জয়যুক্ত হইতে দেখিয়াছি। যাঁহারা সংসারের রীতি অনুসরণ করেন, তাঁহাদের পেটের চিন্তা কখনই ঘুচে না, ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবারও সময় হয় না।

—

নববিধানের "আমি"।

নববিধানের "আমি" দৃশ্যমান একজন "আমি" হইলেও, তাঁহার সঙ্গে বহুজন "আমরা" সংযুক্ত। অর্থাৎ নববিধানে স্বার্থপরতা বা 'আমি আমি' নাই। সর্ব্বজনকে একই দেহের অঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়া, প্রত্যেক নববিধানবিশ্বাসী সর্ব্বদা বিচরণ করেন। নববিধানাচার্য্য তাই বলেন, "আমি সদল অখণ্ড"।

—

সংসার কখন ধর্ম্মের সহায়?

রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা যেমন সমুদয় পদার্থ হইতে সার নির্য্যাস বাহির করা যায়, তেমনি নববিধানের নব উপাসনার প্রক্রিয়ার প্রভাবে সমুদয় জাগতিক পদার্থের মধ্য হইতে ব্রহ্ম বস্তু, সার বস্তু উদ্ভাবন করা যায়। এই ভাবে প্রত্যেক মানবের ভিতর হইতে ব্রহ্মাত্মা উদ্ভাবিত করিয়া দেখিলে, আর মানুষের অসার দিক, খোসার দিক দেখা যায় না। তাহা হইলে মানুষের ভিতর ব্রহ্মপুত্রকন্যাই দেখা যায়, আর অন্য কিছু দৃষ্ট হয় না। এমনই আহার পান বা সংসারের সকল কার্য্যের ভিতর ধর্ম্ম কর্ম্মই উপলব্ধ হয়, এবং তাহা হইলেই স্নান, আহার পান, কাজ কর্ম্ম সকলই পরিত্রাণের সহায় হইয়া থাকে।

—

প্রকৃত হিন্দুত্ব।

"ধিক্ বলং ক্ষত্রিয়বলং, ব্রাহ্মণস্য বলং বলং" [illegible] সর্ব্বোচ্চ নীতি। গায়ের জোরে জয়লাভ হইবে, হিন্দুর

কখনও ইহা নির্দ্দেশ করেন না। শরীরকে পশুর মধ্যেই হিন্দু গণ্য করিয়া থাকেন। তাই পাশবিক বল প্রয়োগ করা হিন্দু মাত্রেই ঘৃণা মনে করেন। হিন্দুয়ানীর নাম লইয়া যাহারা অন্যের উপর পাশবিক বল প্রয়োগ করে, তাহারা হিন্দু নামের উপযুক্ত নয়।

—০—

ভাই বলদেব নারায়ণ।

ভাই বলদেবের স্মৃতি ও জীবনী নববিধানে এক নূতন অধ্যায় রচনা করিয়াছে। যে নবীন যুবক তাঁহার জীবনের নবোদ্যমে, শ্রীব্রহ্মানন্দের বিহার প্রদেশে নববিধানপ্রচারের যুগে, জন্মভূমি গয়ানগরে নবীন শিশুর মত নববিধানে ধৃত হইয়াছিলেন, যিনি নববিধানের জন্য সেই সুদূর প্রদেশে বাগদাদ নগরে বন্ধু বান্ধবদিগের অগোচরে পার্থিব চক্ষু মুদ্রিত করিলেন এবং ইসলামবাদীর সমাধি-ক্ষেত্রে নীরবে শয়ন করিলেন, তাঁহার জীবনী সত্য সত্য নববিধানে এক নূতন অধ্যায় যোগ করিয়াছে। ব্রহ্মানন্দের তিরোধানের পর স্বর্গগত উপাধ্যায় পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়ের নিকট প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়া, নববিধানের সেবকচূড়ামণি ভক্ত কান্তিচন্দ্রের নিকট হইতে চারি আনা মাত্র পয়সা গ্রহণ করিয়া, তাঁহার স্বদেশ বিহারভূমে প্রচারার্থ আগমন করিলেন। মজঃফরপুরে তাঁহার প্রথম প্রচারক্ষেত্রের উপক্রমণিকা। এই সময়ে বিহারভূমির নবীন ব্রাহ্ম ভ্রাতা ব্রহ্মদেব নারায়ণ তত্রত্য ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে ব্রতী। তিনিও বিহারে নববিধান-প্রচারক্ষেত্রে বলদেবের কার্য্যে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত বিস্তার করিলেন। ভাই বলদেবের কার্য্য কেবল মজঃফরপুরে আবদ্ধ থাকিতে পারিল না। তাঁহার প্রচার সমস্তিপুর ও বিহারের অন্যান্য স্থানেও বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তিনি এ দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে কুটীরবাসী কৃষক, এমন কি গোচারণ-ক্ষেত্রে গোরক্ষক বালকদিগের সঙ্গেও মিশিয়া হিন্দিতে হরিনাম গান করিতেন। তাঁহার এমন দিন গিয়াছে যে, সমস্তিপুরের অনতিদূরে দলশিংসরাই রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী গ্রামে, মুসলমান কৃষকদিগের ক্ষুদ্রকুটীরে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া, তাহাদের প্রদত্ত পান্তাভাত খাইয়াও দিনযাপন করিতে হইয়াছে। আমরা তখন সমস্তিপুরে। আমাদের গৃহ তাঁহার নিজ গৃহ হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি আমার সহধর্ম্মিণী সুমতি দেবীকে "মা" বলিয়া ডাকিতেন। মজঃফরপুর নগরে তাঁহার স্বদেশবাসীদিগের নিকট অদ্ভুতপূর্ব্ব ভাবে পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। কোন সময়ে তিনি এই নগরবাসীদিগের ভিতরে "হোলি'' উৎসবে নামসংকীর্ত্তনের জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। বলদেব যখন উৎসব-ক্ষেত্রে উপস্থিত, তখন [illegible] স্থানে সমবেত বন্ধুদিগের নিকট হইতে এক ছিন্ন পুরাতন জুতার মালা তাঁহার গলদেশে আসিয়া পড়িল। সহাস্যমূর্ত্তি বলদেব সেই জুতার মালা পরিয়া, উৎসব-ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া, এক-তারা লইয়া গান ও নৃত্য করিতে লাগিলেন।

মজঃফরপুর হইতে বাঁকিপুরেও তাঁহার এক প্রচারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বিধাতার বিধানে এই সময়ে মুর্শিদাবাদ ব্রাহ্মসমাজ হইতে আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতা গণেশপ্রসাদও এখানে "বিধান আশ্রমের'' ভার লইয়া আসিয়া পড়িলেন। এই বাঁকিপুরে আশ্রম-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে ভাই বলদেব নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ভাঙ্গা ও জীর্ণ গৃহে এক পয়সার ছাতু খাইয়া দিন কাটাইয়াছেন। বাঁকিপুরে অবস্থানকালে বোম্বাই, করাচি ও ম্যাঙ্গালোর প্রভৃতি স্থান হইতে প্রচারের আহ্বান আসিয়াছিল। সেই আহ্বানানুসারে তিনি সেই সেই স্থানে প্রচার করিতে যাত্রা করেন। এদেশের কোন পল্লীতেও তিনি উপরোক্ত ভাবে জুতার মাল্যে সম্মানিত হইয়াছিলেন। ম্যাঙ্গালোর তাঁহার বিশিষ্ট প্রচারক্ষেত্র হইয়াছিল। এখানে প্রাচীন বন্ধু "উলাল রঘুনাথ'' "কে রঙ্গরাও'' প্রভৃতির বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। করাচিতে আমাদের ভক্ত বন্ধু ভ্রাতা নন্দলাল সেন মহাশয়ের বিশেষ সহযোগিতা লাভ করিয়াছিলেন।

ভগবানের লীলা কে বুঝিতে পারে? ভক্তদের লইয়া তিনি কত লীলা করেন! ভগবানের নিকট হইতে তিনি ইসলাম ভূমিতে নববিধান-প্রচারার্থ বিশেষ আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। কপর্দ্দকবিহীন নিঃস্ব বলদেবের নিকট এ আদেশ আসিল। বোম্বাই-নিবাসী নববিধানবিশ্বাসী ধনী ব্যবসায়ী রায় গোবর্দ্ধন দাস বাহাদুর স্বেচ্ছা-প্রবৃত্ত হইয়া, তাঁহার হস্তে এই উদ্দেশ্যে সার্দ্ধ শত টাকা দান করিলেন। বলদেব মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিলেন। যে বিশ্বাসী প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়া প্রচারাশ্রম হইতে চারি আনা পয়সা লইয়া বাহির হইয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে প্রচারকার্য্যে এত টাকা সম্বল করিয়া যাওয়া [illegible] অসম্ভব। তিনি তাঁহার জলপথে যাত্রার ব্যয় স্বরূপ [illegible]শত টাকা মাত্র রাখিয়া, অবশিষ্ট পাচশত টাকা এক রেজিষ্টারি খামে ম্যাঙ্গালোর মিসনে পাঠাইয়া দেন এবং এক খানা [illegible] তাঁহাদিগকে লেখেন যে, এই খাম যেন এখন খোলা না [illegible]। যখন তাঁহার মৃত্যুসংবাদ আসিবে, তখন যেন খোলা হয়। [illegible]ঙ্গালোর কর্ত্তৃপক্ষগণ সেইরূপই করিয়াছিলেন। তিনি [illegible] অবশিষ্ট টাকা গোবর্দ্ধন দাস বাহাদুরকে ফিরাইয়া দিতে পারেন নাই, কারণ তিনি মিসন কার্য্যে তাহা উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

করাচির বন্ধুগণ তাঁহার পারস্য দেশে যাত্রার সংবাদে ভয় পাইয়াছিলেন এবং সেরূপ মতও দিতে পারেন নাই। ভাই বলদেব তাঁহাদিগকে বলিলেন যে, "উপরছে হুকুম আয়া, হাম কেয়া করেগা"। হুকুম প্রাপ্ত বলদেব পারস্য যাত্রা করিলেন। তথায় প্রথমে "বুসহর'' নগরে উঠিলেন। স্থান নাই, কোথায় থাকেন। তথায় ভগবানের ব্যবস্থায়, ঐ নগরে *British Political Agent*এর আফিসে কামিনীকুমার মুখোপাধ্যায়

নামক জনৈক খৃষ্টবাদী বাঙ্গালী কর্ম্মচারীকে পাইলেন। পারস্য দেশে আর বাঙ্গালী ছিলেন না। এই সদাশয় ব্যক্তিই তাঁহাকে স্থান দিলেন। কোথায় আর প্রচার করিবেন। তাঁহাকে সে দেশবাসীরা "কাফের" ও বৃটীশ দূত বলিয়া মনে করিতে লাগিল। তিনি সন্ধ্যায় তত্রত্য *Cooffee House*এ গিয়া তথায় উপস্থিত লোকদিগের ভিতরে কোরাণের ভিতর দিয়া নববিধান প্রচার করিতে লাগিলেন। কোরাণবিশ্বাসী ইসলাম-বাদিগণ তাঁহাদের বদ্ধমূল বিশ্বাসের বাহিরে নবালোকে প্রচারিত ইসলামকে কতটুকু গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবেন? পারস্য দেশে অবস্থানকালে তথায় বিসূচিকা রোগের ভীষণ প্রাদুর্ভাবে একটা দেশব্যাপী আতঙ্ক চলিতেছিল, সুতরাং তাঁহার প্রচারের পথে অনেক বিঘ্ন বাধা আসিয়া পড়িল। ভাই বলদেব সে সময়ে তুরস্ক যাত্রা সমীচীন বলিয়া মনে করিলেন। সেই সুদূর তুরস্কের পথে টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর সঙ্গমস্থান "বসোরা" নগরে তিনি জনৈক মুসলমান জমীদারের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। সেই উন্নতমনা ও উদারচেতা ইসলামবাদী তাঁহাকে অপর ধর্ম্মাবলম্বী জানিয়াও, ধর্ম্ম-প্রচারের সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে সন্ধ্যায় অনেক স্থানীয় মুসলমান সমবেত হইতেন। একদিন অপরাহ্নে সমবেত মুসলমানদিগের ভিতরে ভাই বলদেব পারস্যকবি হাফেজের "গজোল" যখন আবৃত্তি ও ইসলাম সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে বাটীর বাহিরে বন্দুকের শব্দ শুনিতে পাইলেন। পরক্ষণেই শুনিলেন যে, [illegible]হার অতিথি সৎকারক জমিদার বন্ধু বন্দুকের গুলীর আঘাতে হত [illegible]য়াছেন। তখনই জানা গেল যে, তিনি বিধর্ম্মী কাফেরকে স্থান [illegible]ওয়াতে, তাঁহার স্বধর্ম্মী লোকের হাতে নিহত হইলেন। বলদে[illegible] বুঝিলেন যে, তাঁহার পক্ষে বিপদ উপস্থিত। তাঁহার সেই অতি[illegible]সৎকারকের গৃহে আর তাঁহার স্থান নাই। তিনি তথা [illegible]হইতে বাগদাদ যাত্রা করিলেন। কে তাঁহাকে স্থান দিবে [illegible] তিনি একটা মসজিদের পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র লোকশূন্য পর্ণকুটী[illegible] উপস্থিত হইলেন। সেই পর্ণকুটীরে মুসলমানের চিহ্নবি[illegible] বিদেশী লোককে দেখিয়া, কোন কোন মুসলমান কৌতূহল[illegible]বশ হইয়া আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন। সেই কু[illegible]রে তাঁহার তিন রাত্রি চলিয়া গেল। চতুর্থদিনের রাত্রে তি[illegible] সময় বুঝিয়া সমবেত লোকদের মধ্যে নববিধানের আলোকে কোরাণ ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। তাঁহার সে ব্যাখ্যা তাঁহাদের বদ্ধমূল বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যাইতেছিল, সুতরাং তাঁহাদের ভিতর একটা উত্তেজিত ভাব আসিয়া পড়িয়াছিল। রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত তাঁহার সে ব্যাখ্যা চলিয়াছিল। ঐদিন রাত্রি-শেষে তিনি সাংঘাতিক বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইলেন। তিনি এই চারিদিন বাজার হইতে দুইচারি পয়সার জিনিষ আনিয়া তাহাই খাইয়া দিন কাটাইতেন। কে জানে, ইহার ভিতর কোন রহস্য ঘটিয়াছিল? স্থানীয় বৃটীশ কন্সল জেনারেল ভারতবাসী বৃটিশ প্রজার এই রোগাক্রান্ত হওয়ার সংবাদ পাইয়া, তাঁহাকে স্থানীয় Turkish Hospitalএ আনাইয়া লইলেন। সেই হস্পিটালে বার ঘণ্টা পরে তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস পড়িয়া গেল। তিনি কি রাখিয়া গেলেন? কয়েকখানি ছিন্নবস্ত্র-পূর্ণ ক্ষুদ্র পোঁটলা ও তাহার ভিতরে চারি আনা পয়সা। আর কি রাখিয়া গেলেন, তাহা সেখানে কয়জন দেখিতে পাইলেন? তিনি নববিধানে পূর্ণ বিশ্বাস এবং ভগবান্ ও ভগবানের আদেশে অক্ষুণ্ণ ও অটল বিশ্বাস জগতের সমক্ষে রাখিয়া গেলেন। যে চারি আনা পয়সা লইয়া তিনি প্রচারক্ষেত্রে বাহির হইয়াছিলেন, তাহাই আবার রাখিয়া গেলেন। বিধাতার রহস্য কে বুঝিবে? সম্মুখে তাঁহার কোন সমবিশ্বাসী নাই, কোন ভারতবাসী নাই যে, তাঁহার সেই সমাহিত ও নীরব মূর্ত্তির সম্মুখে এক বিন্দু অশ্রু নিবেদন করেন। যে বলদেব বুদ্ধভূমিতে গয়ানগরে নববিধানে ধৃত হইয়া, ব্রহ্মানন্দের সম্মুখে "হাম না পাক কুত্তা হায়" (আমি অপবিত্র কুকুর) বলিয়া করযোড়ে দাঁড়াইয়া ছিলেন, আজ তিনি সেই সুদূর ইসলামভূমিতে ইসলামবাদীর সমাধিক্ষেত্রে শায়িত!! জয় নববিধানের জয়!

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

—•—

সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় বা সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের ভিত্তি।

(ভবানীপুর ব্রাহ্মসম্মিলনসমাজে বিবৃত)

পৃথিবীতে যখনই কোন নূতন ধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়, তখনই দেখিতে পাই, সেই ধর্ম্ম উদার ভাবে পরিপূর্ণ। প্রথম প্রথম কয়েক শত বৎসর ধর্ম্মের সেই উদার ভাব অক্ষুণ্ণ থাকে; ধর্ম্ম-সমাজ যত পুরাতন হইতে আরম্ভ করে, ততই ধর্ম্মে মলিনতা দেখা দেয় এবং উদার ভাব নষ্ট হইয়া যায়। পরিশেষে এমন অবস্থা ঘটে, মূলের সঙ্গে পরবর্ত্তী সময়ের ধর্ম্মের আর মিল থাকে না। উদার ধর্ম্ম পরবর্ত্তী কালে আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদির গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া কূপমণ্ডূকের অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই জন্য ধর্ম্মকে সংস্কার করিবার জন্য যুগে যুগে ধর্ম্মসংস্কারকের আবির্ভাবের প্রয়োজন হয়। তাঁহারা সকল প্রকার গণ্ডী হইতে ধর্ম্মকে মুক্ত করিয়া মানুষের সঙ্গে ভগবানের সাক্ষাৎ যোগ স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন। প্রত্যেক ধর্ম্মের উদার ভাব নষ্ট হইয়া যাওয়াতে, প্রত্যেক ধর্ম্মা-বলম্বী মনে করেন, তাঁদের স্ব স্ব ধর্ম্মের লোক ভিন্ন আর সকলেই অনন্ত নরকে বাস করিবে, একমাত্র তাঁরাই অক্ষয় স্বর্গের অধি-কারী হইবেন। ইহা অপেক্ষা ধর্ম্মসমাজ ও ধর্ম্মমতের সংকীর্ণতা আর কি হইতে পারে?

বর্ত্তমান সময়ে সকলেই আপনাদের দুর্ব্বলতা ও দুঃখ দুর্দ্দশার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া, নিজেদের দোষ ও সংকীর্ণতা পরিত্যাগ

করিয়া, অন্যের সঙ্গে মিলিত হইতে চেষ্টা করিতেছেন। এই সার্ব্বভৌমিক মিলনভূমি কোথায়? সকল জাতি ও সকল ধর্ম্মের লোকদের মিলন না হইলে, পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হইতে পারে না এবং ধরাতলে স্বর্গরাজ্য বা ধর্ম্মরাজ্যের অবতরণ সম্ভবপর হইতে পারে না।

সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ই নিরাকার এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে মানে; এ বিষয়ে কাহারও সঙ্গে কাহারও বিবাদ নাই। আমরা যদি সংকীর্ণতা পরিত্যাগ করিয়া, স্ব স্ব সমাজের ক্ষুদ্রতা ও অসত্যের বেড়া ভাঙ্গিয়া, অদ্বিতীয় সর্ব্বশক্তিমান্ নিরাকার ঈশ্বরকে পূজা করিতে তাঁর চরণতলে মিলিত হইতে পারি, তবে সকল জাতির, সকল ধর্ম্মের লোকের মিলন সম্ভব হইতে পারে। এই মিলন-ভূমিতে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উপযোগী ভাবে, এক অদ্বিতীয় নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারা, পৃথিবীতে এক জাতি, এক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে।

বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সত্যদ্রষ্টা ঋষি ঈশ্বরবিশ্বাসী মহাজনদের দ্বারা প্রচারিত নূতন নূতন শাস্ত্র, আচার অনুষ্ঠান আমরা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিব। অতীতের আচার অনুষ্ঠানও বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী রূপে নূতন করিয়া লইতে হইবে। কোন সম্প্রদায়ের মহাপুরুষ বা শাস্ত্রের নিন্দা করিতে পারিব না। সকল সাধু ও মহাপুরুষকে এবং সকল শাস্ত্রের সত্যকে শ্রদ্ধা করিতে হইবে। শাস্ত্র এবং মহাপুরুষকে ঈশ্বরের আলোকে আমরা যতদূর বুঝিতে পারিব, ততদূর গ্রহণ করিতে ও আত্মস্থ করিতে চেষ্টা করিব। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহা সত্য ও ভাল জিনিষ আছে, তাহাই অন্যকে প্রেমের সঙ্গে শ্রদ্ধার সহিত প্রদান করিতে হইবে এবং অন্যের মধ্যে যাহা ভাল আছে, তাহাও প্রেমের সঙ্গে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। এরূপ সত্যের আদান প্রদান চলিবে।

আমরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা বিভিন্ন ধর্ম্মের শাস্ত্র ও মহাপুরুষের জীবনী অধ্যয়ন করি না; বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে যাহা সত্য সুন্দর জিনিষ আছে, তাহা আমরা জানিনা ও তাহার আস্বাদ পাই না; এ জন্য আমাদের মন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমতের প্রতি উদার ও শ্রদ্ধাভাবাপন্ন নয়। বরং নিজ নিজ সংকীর্ণ মতের জন্য বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন।

হিন্দুর কোরাণ, বাইবেল ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইবে; মুসলমান ও খৃষ্টানের উচিত, নিজ ধর্ম্ম ভিন্ন অন্যান্য ধর্ম্মের শাস্ত্র ও মহাপুরুষের বা সাধুদের জীবনী অধ্যয়ন করা। আমরা যদি পরস্পর পরস্পরের শাস্ত্র ও সাধু ভক্তের জীবনী শ্রদ্ধার সহিত অধ্যয়ন করি ও পরস্পরকে বুঝিতে চেষ্টা করি, তবে নিশ্চয় সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামীর ভাব কমিয়া যাইবে, মন উদার হইবে, সকলের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিবে। আমরা যদি এরূপ হইতে পারি, তবে সকলেই মিলিয়া সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিতে ও মিলিত ভাবে এক অদ্বিতীয় নিরাকার ঈশ্বরের পূজা করিতে সক্ষম হইব।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সত্য গ্রহণ করিতে উপদেশ প্রদান করেন এবং নিজের অনুগামীদের দ্বারা বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রের ইংরেজী ও বাঙ্গলা অনুবাদ করিয়া সর্ব্বসাধারণে প্রচার করেন। যেমন উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়ের শ্রীকৃষ্ণের জীবনী ও ধর্ম্ম, গীতা ও বেদান্তের সমন্বয়-ভাষ্য, মৌলবী গিরিশচন্দ্র সেনের মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্র, ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র, সাধু অঘোরনাথের বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র, সঙ্গীতাচার্য্য ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের ভক্তিশাস্ত্র ইত্যাদি। সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সকল শাস্ত্র ও সকল সাধুর প্রতি সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন, তিনিই সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের আভাস পৃথিবীতে সর্ব্বাগ্রে প্রদান করেন। এই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন বঙ্গদেশে বাঙ্গালী জাতির মহাপুরুষ দ্বয়ই করিয়াছেন। ইঁহাদের অনুবর্ত্তীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সিমলার ব্রহ্মমন্দিরেই হিন্দু মুসলমানের মিলন বৈঠক বসিয়াছিল। তাহা হিন্দুর দেবালয়ে বা মুসলমানদের মস্‌জিদে বসিতে পারে নাই। কারণ এক সম্প্রদায় নিজেদের সংকীর্ণতার জন্য অন্য সম্প্রদায়কে নিজেদের ভজনালয়ে প্রবেশ করিতে দিতে পারে নাই।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এই নবযুগের প্রবর্ত্তক। রামমোহনের এই উদার ভাব তাঁর আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র লাভ করিয়াছিলেন; তাই তিনি সকল শাস্ত্র ও সকল সাধু ভক্তদের প্রতি জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের বা নববিধানের এই উদার ভাব মহাত্মা গান্ধীও প্রাপ্ত হইয়াছেন। সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের কার্য্যে তিনিও ব্যবহৃত হইতেছেন। সকল ধর্ম্মের প্রতি, সকল সাধু ভক্তদের প্রতি, সকল সত্যপথের যাত্রীর প্রতি এবং মানবমণ্ডলীর প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধার ভাব তাঁহার চিন্তা, বাক্য ও কার্য্য দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে।

আমরা যদি গীতার, রামমোহনের, কেশবচন্দ্রের উদার সার্ব্বভৌমিক মত গ্রহণ করিতে পারি, তবে হিন্দু অহিন্দুকে ম্লেচ্ছ বলিয়া, মুসলমান অমুসলমানকে কাফের বলিয়া, খৃষ্টান অখৃষ্টানকে হিদেন বলিয়া ঘৃণা করিবে না। ধর্ম্মরাজ্য চক্ষুষ্মান্ ব্রহ্মবাদী মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন আসিয়া, ধর্ম্মান্ধ বিভিন্ন সম্প্রদায়কে এক অনন্ত, অদ্বিতীয়, নিরাকার, সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে দেখাইয়া দিতেছেন। মহাত্মা গান্ধীও ইঁহাদের অনুবর্ত্তী হইয়া কাজ করিতেছেন। অন্ধ আমরা যদি ব্রহ্মজ্ঞানরূপ চক্ষুর সাহায্যে সকল জাতি, সকল ধর্ম্ম, সকল সাধু ভক্তের মধ্যে ভগবানের বিভিন্ন রূপের প্রকাশ দেখিতে চেষ্টা করি এবং সকলকে শ্রদ্ধা করিতে পারি, তবে এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের প্রকাশ সর্ব্বত্র দেখিতে পাইব এবং সংকীর্ণতা

ও আত্মবিবাদ পরিত্যাগ করিয়া, সবাই প্রেমেতে মিলিত হইয়া, সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের বা সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের, যাহাকে ব্রহ্মানন্দ নববিধান বলিয়াছেন, তাহার অন্তর্গত হইতে পারিব।

একমাত্র নিরাকার একেশ্বরবাদের পতাকা-তলেই পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের, সকল সম্প্রদায়ের, সকল জাতির লোকের মিলন সম্ভব, অন্যত্র কোথাও নয়। ব্রাহ্মসমাজ এই মিলনভূমি বা সর্ব্ব ধর্ম্মসমন্বয়ের ভূমি প্রস্তুত করিয়া সবাইকে সাদরে আহ্বান করিতেছেন। আসুন, আমরা সবাই এখানে নিজের সংকীর্ণতা পরিত্যাগ করিয়া মিলিত হই ও সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া এক অদ্বিতীয় নিরাকার ঈশ্বরের পূজা করিয়া ধন্য হই। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, এ শুভ দিন আমাদের মধ্যে শীঘ্র আগমন করুক। বিশ্বের সকলজাতীয় লোকের ইহাই মিলনভূমি, বিশ্ব-মৈত্রী ও ভ্রাতৃভাব স্থাপনের ইহাই একমাত্র পথ।

"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"
"সত্যমেব জয়তে নানৃতম্॥"

শ্রীপ্রসন্নকুমার মজুমদার।

স্বর্গীয়া ক্ষীরোদাসুন্দরী দেবী।

(৫ই সেপ্টেম্বর, প্রথম সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধবাসরে স্বামীর নিবেদন)

দেবি! তুমি ত চলে গেলে! আজ দেখতে দেখতে এক বছর কেটে গেল! কত ঝড় ঝাপটা যে মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। কত দুশ্চিন্তা, কত মনস্তাপ, কত উদ্বেগ আমাদের শরীর মনকে নিদারুণ আঘাত করে, পরিবারের সুখ-স্বপ্ন অকালে শ্মশানের আগুনে ছাই করে যে চলে গেল, তোমার বিদেহী আত্মা কি তা জানতে পারছে? তোমার দেহের চির বিচ্ছেদ, নবজীবনের বিদেশ-যাত্রা, বধূ, কন্যা ও ছেলেদের প্রায় প্রত্যেকেরই দুরারোগ্য ব্যাধির প্রকোপ, জীবন মরণের সন্ধিস্থলে এসে আমাদের বুকের পাঁজরা যখন গুড় করে দিয়ে গেল, তখন তোমার কাতর প্রার্থনা কি আমাদের প্রার্থনার সঙ্গে মিলে বিধাতার চরণকে স্পর্শ কর্‌ছিল? নিশ্চয়ই। কদিন আগে গায়ত্রীর রোগশয্যার পার্শ্বে বসে যাই প্রার্থনা করলে যে, "ভগবান্ ওর, ব্যারাম আমাকে দাও, ও ভাল হ'ক, আর আমি মরে যাই", অমনি দেবতা স্বকর্ণে শুনে তোমাকে এমন রোগ দিলেন—তোমার যাবার এমন হুড়াহুড়ি পড়ে গেল যে, আমাদের আর চখে, কাণে দেখতে শুনতে দিলে না। তোমার সেই জীবন্ত প্রার্থনা এখন আমাদের সঙ্গে কি আর নেই? অদেহী হলে বলে তোমার সেই সজাগ মন, তোমার সেই সচেতন আত্মা, তোমার সেই অফুরন্ত ভালবাসা কি আমাদের ছেড়ে গেল? একথা বিশ্বাস করতে পারছি না। তুমি আছ, নিশ্চয়ই আছ—আমাদের মনের মন হয়ে, আত্মার আত্মা হয়ে, হৃদয়ের শোণিত হয়ে, শরীরের বল হয়ে, চক্ষের জল হয়ে, কর্ণের শ্রুতি হয়ে। যখন শরীরে ছিলে, তখন ত ছিলে আমার ধর্ম্মে সহধর্ম্মিণী, আমার কর্ম্মে সহকর্ম্মিণী। তুমি ত ছিলে আমার ভয়েতে অভয়া, সংকটে সাহস, আমার সকল অভাবের পূর্ণতা, আমার পর্ণকুটীরে স্বর্ণ প্রতিমা। আজ শরীর নেই বলে কি, তোমার সকল সদ্‌গুণ, সদ্ভাব, সাহস, স্নেহ, দয়া, বাৎসল্য, মন, ও আত্মা দশমীর প্রতিমার মত গঙ্গাজলে ভেসে গেল? একথা মনে ঠাঁই পাচ্ছে না। আছ বই কি! তোমার সেই মন, সেই আত্মা এখন প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের নিরীক্ষণ করছে, আমার মর্ম্মের ভিতর তোমার জীবন্ত বাণী দুন্দুভির শব্দের মত মধ্যে মধ্যে ঝঙ্কার করে উঠে—পৃথিবীতে কোন বস্তুরই ক্ষয় নাই—বিনাশ নাই—তুমিও আছ—তোমার সেই অফুরন্ত ভালবাসাও সাথে সাথে রয়েছে।

দেবি! তোমার যাবার দিন ছেলেমেয়েরা কত করে সাজিয়ে দিলে—তোমার রক্তাভ গৌরবর্ণ কান্তির লাবণ্য বিচিত্র পুষ্পরাশির শোভা সৌন্দর্য্যের সঙ্গে মিলে এমন এক দিব্য শ্রী ধারণ করেছিল যে, সে কথা বলবার আমার ভাষা নেই। আমার লোভ হচ্ছিল যে, এমনি করে সেজে আমিও তোমার সঙ্গে চলে যাই। এই প্রবল লোভ থেকেই, বোধ হয়, সতীর সহমরণ এদেশে প্রথম আরম্ভ হয়। কই সতীর সঙ্গে সৎপতির সহমরণের কথা ত শোনা যায় না? স্বামীর সহমরণের কথা না থাকলেও, স্বামীর প্রগল্‌ভা উন্মাদনার কথা পাওয়া যায়। সতী যখন পতিনিন্দা শুনে দেহত্যাগ করলেন, তখন মহাদেব সতীর প্রাণহীন দেহটী স্কন্ধে করে পাগলের মত বেড়াতে লাগলেন; শবদেহ পচে গিয়ে এক একটী অঙ্গ যেখানে পড়ল, সেখানে এক একটী তীর্থ হল। দেহী অদেহী না হলে আত্মার রূপ ফুটে বেরোয় না। সতীর আত্মার জ্যোতি থেকেই ত এক একটী তীর্থ, এক একটী মহাকীর্ত্তি জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমিও তোমার প্রাণহীন দেহের রূপটী এখনও কত স্নেহের চক্ষে দেখি, তোমার দেহের সুন্দর প্রতিমাখানিকে আমি এখন বুকে করে সর্ব্বদা ঘুরে বেড়াই। আমার ও সাধও হয় যে, তোমার পুত্র কন্যাগণ, আত্মীয় স্বজনগণ, যিনি যেখানে আছেন, তোমার নির্ম্মল সদ্ভাবের এক একটী কণা তাঁদের অন্তরে পড়ে যেন এক একটী তীর্থ রচনা করে। শাস্ত্রের কথা আমাদের গৃহে পরিবারে যেন সার্থক হয়।

তোমার যাবার প্রথম আয়োজন বেশ কলরবপূর্ণ হলেও, শোকের উচ্ছ্বাস গৃহের বায়ুকে কম্পিত করে তুল্লেও, অশান্তির তীব্রতা ছোট বড় সকল প্রাণকে অতিষ্ঠ করে ফেল্লেও, তোমার সুন্দর ওষ্ঠাধর দুটীর ভিতর থেকে যাই তিনবার "শান্তি শান্তি শান্তি" উচ্চারিত হল, অমনি যেন কোথা হতে স্বর্গের পবিত্র প্রশান্তি নিস্তব্ধতা গৃহকে, গৃহস্থিত সকল প্রাণকে, গৃহের খাট সকল বস্তুগুলিকে পর্য্যন্ত শান্তির স্নিগ্ধতায় পূর্ণ করে তুল্‌ল,

জড় অজড় সকল প্রাণ থেকে যেন শান্তির নিশ্বাস ধীরে ধীরে পড়তে লাগল, শোকের উচ্ছ্বাস, আবেগ, হাহুতাশ যেন মুহূর্ত্তে উবে গেল। ঠিক এই সময়ে আমি তোমার দিব্য শ্রীমূর্ত্তিখানি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলাম—তোমার নূতন ভাগবতী তনু ঐশ্বর্য্যে মহিমান্বিত হয়ে আমার নিকট ফুটে উঠল। সেটা কল্পনা নয়, সেটা Direct Vision, যে প্রত্যক্ষ দর্শন থেকে সাধক ঈশ্বর ও পরলোক প্রত্যক্ষ করেন, আমিও সেই দর্শন থেকে তোমার ভাগবতী দিব্য দেহখানি প্রত্যক্ষ করলাম। সে দর্শন আমার আত্মা থেকে : কখনও মুছে যাবে না—সে দর্শনের সৌন্দর্য্যটুকু আমার প্রাণ থেকে কখনও মলিন হবে না—সে দর্শনের রূপমাধুরী, তার অপার্থিব জ্যোতিঃ, তার জীবন্ত দীপ্তি ভাষায় প্রকাশ করবার নয়—সে অব্যয় ও অরূপের রূপ কেবল দিব্য চক্ষে দেখিবার বস্তু।

তোমার এই অপার্থিব মনোহর রূপ দেখিয়ে, এখন তোমার আমার যোগের সূত্র কোথায়, তারই একটু আভাস দিয়ে গেলে। তোমার সেই সৌন্দর্য্য-বিজড়িত পূর্ণচন্দ্রের শুভ্র-জ্যোৎস্না-বিনিন্দিত আলোকময়ী প্রতিমাখানি আমি বুকে করে রেখেছি, আমি রোজই সেই স্বর্ণপ্রতিমাটী পলকবিহীন নেত্রে অবাত-কম্পিত দীপশিখার ন্যায় স্থির চিত্তে দেখি। আমি রোজই ভক্তির পঞ্চ প্রদীপ জ্বালিয়ে, তোমার সেই শুদ্ধ সত্ত্ব নির্ম্মল ভাগবতী মূর্ত্তিটীকে আরতি করি। শরীরে বাস করে তোমার অশরীরী দিব্য দেহের সহিত কিরূপে একাকার হতে পারি, তাই আমার বর্ত্তমান জীবনের সাধনা। তোমার ভাগবতী তনুর জ্যোতির্ম্ময় স্পর্শে আমার পার্থিব রূপের অবসান হয়ে, শরীরী হয়েও অশরীরী দিব্য দেহ ধারণ করে, উভয়ে একাকার হয়ে, প্রাণেশ্বরের চরণে কিরূপে প্রেমের পবিত্র অঞ্জলি প্রতিদিন প্রতিক্ষণে প্রদান করব, তাহারই প্রতীক্ষা করছি।

তোমার ক্ষণিক স্পর্শ, তোমার ক্ষণিক দর্শন, অমরলোক হতে কখন কখন তোমার বাণীশ্রবণ করে আর মনের তৃপ্তি হয় না—এখন সংসারের অতীত হয়ে তুমিও যে লোকে, আমিও সেই লোকে প্রবেশ করতে চাই। যাবার সময় কিছু বলবার চেষ্টা করেছিলে, কিন্তু সে কথা কাণে শোনা গেল না—হাত নাড়া, ঠোঁট দুটীর উত্থান পতন, চক্ষের পলক ও স্থির দৃষ্টির ভিতর দিয়ে তোমার অস্পষ্ট অশব্দ কথা বুঝবার চেষ্টা করলাম। তোমার অশব্দ বাণী আমার মর্ম্মকে স্পর্শ করল। এই তোমার প্রথম অশব্দ বাণী আমি শুনলাম। এবার শব্দের অতীত হবে বলে, শরীর থাকতেই অশব্দ বাণী শুনবার ইঙ্গিত দিয়ে গেলে। সে বাণীর ভিতর তোমার বার্ত্তা ছিল এই যে, আমিও যেন শীঘ্র তোমার সহিত মিলিত হই। আমিও নির্ব্বাক্ কথায় তার উত্তর দিলাম, নিঃশব্দে উভয়ের কথাবার্ত্তা চল্‌ল। সে কথা [illegible] মর্ম্মকে স্পর্শ করল; তোমার মুখের ভাবভঙ্গী দেখে মনে হল যে, তুমিও আমার কথায় সায় দিয়েছ।

তোমার স্মৃতিকে ধরে রাখবার জন্য কয়েকটী তোমার প্রিয় বস্তুকে আমরা সজাগ করে রেখেছি—ঘরে ঢুকলেই তারা তোমার কথা আমার মনে জাগিয়ে দেয়। আমি ঘর থেকে বাইরে যাই, অনেকক্ষণ বাইরে থাকলে মনে হয়, যেন তোমার বিদেহী আত্মা আমাদের বিয়োগের বিচ্ছেদ-বেদনা অনুভব করছে—তাড়াতাড়ি ঘরে এসে তোমার অশব্দ বাণী শোনবার প্রতীক্ষায় বসে থাকি—প্রত্যক্ষ দর্শনের ভিতর ভাবের আদান প্রদান বেশ ঘন ও মিষ্ট হয়ে উঠে। দেহে বাস করে অদেহী আত্মার সঙ্গে যোগ রক্ষা করা যে কি দুরূহ, আমি তা পদে পদে বুঝতে পারছি। সর্ব্বদা সশঙ্কিত হয়ে থাকতে হয়—কিসে শরীর মনের শুদ্ধতা রক্ষা হয়—কিসে নিষ্ঠা বজায় থাকে—কিসে ঐকান্তিকতার ত্রুটী না হয়—কিসে মনের বিক্ষেপ না আসে। কিরূপে সংসারে বাস করে, সংসারের অতীত হয়ে থাকা যায়—এ কঠোর সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে হলে, সর্ব্বদা প্রাণপণ করে নিঃশ্বাস ফেল্‌তে হয়, এবং কঠোর কাজ করতে হয়, আমি তার আভাস কিছু পাচ্ছি।

এই এক বৎসরের ভিতর তোমার অদেহী আত্মার প্রভাব আমার উপর কতকটা পড়েছে, তা বেশ বুঝতে পারছি। এতদিন তুমি আমার কথার অনুসরণ করে চলতে, আমার ধর্ম্ম কর্ম্ম তোমার ধর্ম্ম কর্ম্মকে আকার দেবার চেষ্টা করেছে; কিন্তু এখন দেখছি যে, তুমি আমাকে ভেঙ্গে চুরে নূতন করে গড়ছ—আমি তোমাতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছি—তোমার আত্মার ক্রিয়া আমার ভিতরে নিঃশব্দে যেমন চলেছে এবং এতো শীঘ্র শীঘ্র অবস্থা রূপান্তরিত হচ্ছে যে, আমি নিজেই নিজেকে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যাই। এখন কেমন অজ্ঞাতসারে তোমার ভাব-গুলি আমার মধ্যে ফুটে উঠছে, তোমার ভাব আমার [illegible] আকার দিচ্ছে, তোমার চিন্তা বাক্য কর্ম্ম সব আমার ভিতর নূতন রূপ দান করছে।

ভাব ভাবের সাথী অন্বেষণ করে, প্রেমিক প্রেমাস্পদের খোঁজে ঘুরে বেড়ায়, চৈতন্য আধারকে আশ্রয় করে [illegible] ফুটিয়া হয়; তাই তোমার আত্মা অজ্ঞাতসারে আমার মধ্যে [illegible] ধারণ করছে। একাকার হওয়াই যোগ; শরীরের ব্যবধান, স্থানের ব্যবধান, সময়ের ব্যবধান, চিন্তা ও কর্ম্মের ব্যবধান আর আমাদের পৃথক রাখতে পারবে না। পরলোক [illegible] অনেক দূরে, পরলোকের কথা যে শুনতে পাওয়া যায় না, একথা আমি আর বিশ্বাস করি না। তোমার পরিষ্কার কথা আমি যখন কাণ পেতে শুনি, তখন মনে হয়, যেন তুমি ইহলোকে এই ঘরটীর ভিতরে বসেই কথা কইছ। ব্রহ্মবাণী যেমন অভ্রান্ত সত্য, অমরাত্মাদের বাণীও সেইরূপ নিঃসন্দেহ সত্য।

দেবি! তুমি যে চিতানলে উঠে তোমার রূপ রস গন্ধ স্পর্শ সব বিসর্জ্জন দিলে, সোণার মানুষটীকে আগুনে আহুতি দিয়ে চলে গেলে, আজ সেই চিতানলের স্বর্ণশিখাটী আমার

নিকট কত প্রিয় হয়ে এসেছে ! যে চিতানল তোমার বাহিরের শরীরখানিকে, তোমার সৌন্দর্য্যের স্বর্ণপ্রতিমাখানিকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেল্লে, আজ সেই চিতানল কত মিষ্ট হয়ে আমার ভিতর প্রবেশ করেছে—ভিতরের যত ময়লা মাটী, জঞ্জাল আবর্জ্জনা সব পুড়িয়ে ছাই করছে। তোমার প্রাণহীন দেহটীকে চিতানলের বেদনা বহন করতে হয় নি, কিন্তু আমার ছোটখাট সব জিনিষগুলিকে হুতাশনে আহুতি দিবার সময় মর্ম্মান্তিক ব্যথা বহন করতে হচ্ছে। প্রতিপদে আঘাতের ঘায়ে খানিকটা এগিয়ে যাচ্ছি, মাঝে মাঝে অশরীরী অবস্থার অনুভূতি আমাকে যেন গ্রাস করে ফেলে। তোমার শ্মশানভূমি আমার নিকট মহাতীর্থ! আমি প্রতিদিন অশরীরী হয়ে সেখানে বাস করি—সেখানে বসে তোমার সঙ্গে দুদণ্ড দুটো কথা কইবার সুযোগ ঘটে—তোমার ভাগবতী জ্যোতির্ম্ময়ী প্রতিমার নিকট আমার সুখ দুঃখ, আমার দেহ মনকে অর্ঘ্যরূপে উৎসর্গ করবার সুযোগ তথায় যেমন পাই, অন্যত্র তেমন হয় না।

তুমি যদি আগে পরলোকে না যেতে, তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ এতো মিষ্ট হত না—তোমার সঙ্গে দেখা শুনার নূতন স্বাদ এমন করে গ্রহণ করতে পারতাম না। চর্ম্মচক্ষে যা দেখছি, সেটা বরং ভ্রান্তিমিশ্রিত; কিন্তু যা দিব্য চক্ষে দেখছি, সেটা অভ্রান্ত, সুনিশ্চিত সত্য। সাকার একবার নিরাকার হচ্ছে, আবার নিরাকার সাকার হচ্ছে, *Form* এবং *Spirit* এর ক্রমাগত সংঘর্ষ চলেছে। তাই আত্মা একবার রূপ ধারণ করছে, আবার রূপ অরূপে মিলিয়ে যাচ্ছে। দুয়ের মাঝখানে যা বস্তু আছে তা সত্তাহীন হবে কেন? আছে, সব আছে। দেবি! তুমিও আছ, আমিও আছি। তোমার আত্মা আমাকে আধার করে, আশ্রয় করে, নূতনরূপে ফুটে উঠছে।

তোমার স্মৃতিটুকুকে এখন সকলে জাগিয়ে রেখেছে, কিন্তু কালের আঘাতে সেটুকু আস্তে আস্তে মুছে যাবে; আজ যাহা ধ্রুবতারার মত উজ্জ্বল হয়ে আছে, কাল তাহা আলো আঁধার মিশ্রিত হয়ে থাকবে, ক্রমে সবই আঁধারে ডুবে যাবে। মানুষের মনের গতি সবই ভোলবার দিকে। এখন বাহিরের দিক দিয়ে যারা তোমাকে ধরতে যাবে, তারা তোমাকে ধরতে পারবে না; আর তুমিও তাদের হতে বহু দূরে—এখন দেহে বাস করে অদেহী না হলে কেউ তোমায় পাবে না। দেহ ধারণ করে অদেহী হয়ে, অমরাত্মাদের সঙ্গে বাস করা সম্ভব, একথা যদি জীবনে প্রমাণিত হয়, তা'হলে মানুষ বুঝবে যে, পরলোক সত্য—মৃত্যুর মধ্যে অমৃতের সন্ধান পাওয়া যায়।

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চতুঃষষ্টিতম ভাদ্রোৎসবের কার্য্যবিবরণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

২১শে আগষ্ট, ৫ই ভাদ্র, সোমবার, শ্রদ্ধেয় ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র ও শ্রদ্ধেয় ভাই বলদেবনারায়ণের স্বর্গারোহণ-সাম্বৎসরিক। প্রাতে নবদেবালয়ে এই উপলক্ষে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ বিশেষ প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যা ৭টায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে প্রসঙ্গ হয়। প্রথমে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক "দাসামুক্তি" আচার্য্যদেবের প্রার্থনা পাঠ করিয়া, "ভৃত্যের আত্মপরিচয়" হইতে অংশ বিশেষ পাঠ করেন। তৎপর ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ বলদেবনারায়ণের ইংরেজি ভাষায় লিখিত জীবনচরিত হইতে কিছু পাঠ করেন। পরে প্রসঙ্গ হয়। মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুচারুদেবী ও ভক্তকন্যা শ্রীমতী মণিকা মহলানবিশ অন্যান্য সকলের সঙ্গে মিলিয়া প্রসঙ্গের কার্য্য করেন।

২২শে আগষ্ট, ৬ই ভাদ্র, মঙ্গলবার, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ব্রহ্মোপাসনা-প্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে সন্ধ্যা ৭টায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু উপাসনার কার্য্য করেন।

২৩শে আগষ্ট, ৭ই ভাদ্র, বুধবার, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনা প্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক। ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৭॥টায় ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন। নববিধানের সাধনা স্বাভাবিক পথে এই বিষয়ে শ্রীমদাচার্য্যদেবের উপদেশ পাঠ করিয়া তিনি প্রার্থনাদি করেন। এবেলার উপাসনা বেশ সরল ও মধুর ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

সন্ধ্যায় ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। তিনি আচার্য্যের উপদেশ "ব্রহ্মখণ্ডের সংযোগ" ও "কলিকাতায় নববিধান" হইতে অংশ বিশেষ এবং আচার্য্যের প্রার্থনা "অদ্ভুত নববিধানসাধন" পাঠ করিয়া, নব উপাসনাপ্রণালীর বৈশিষ্ট্য ও নূতনত্ব বিষয়ে আত্মনিবেদন করেন। তাঁহার আত্মনিবেদনে বিশেষ কথা এই—যে উপাসনাপ্রণালী অদ্যকার পুণ্যদিনে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ একটী নূতন প্রণালী। অতীতকালে স্বদেশে বিদেশে বিভিন্ন ধর্ম্মবিধানে যতগুলি বিভিন্ন সাধনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার সকল হইতে এ প্রণালী ভিন্ন। নবযুগে এই নববিধানে ইহা সম্পূর্ণ নূতন প্রণালী। আমাদিগের স্বরূপারাধনার মধ্যে উপনিষদের উদ্ধৃত বাক্যগুলি ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ পরিশ্রমের ফল। মহর্ষিদেবের সময়ে আমাদের উপাসনাপ্রণালী বর্ত্তমান পূর্ণাঙ্গ আকার ধারণ করে নাই। ভক্ত কেশবচন্দ্র উদ্বোধন, আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা ও শান্তিবাচন এই পাঁচটী প্রধান অঙ্গে

উপাসনাপ্রণালীকে বিভক্ত করিয়া, পরে তাহার সঙ্গে শাস্ত্রবাক্য ও স্তোত্রপাঠ ইত্যাদি সংযোগ করিয়া বর্ত্তমান উপাসনাপ্রণালীর পূর্ণাঙ্গ দান করেন। এই উপাসনাপ্রণালীর মধ্যে বেদ, বেদান্ত, কোরাণ, পুরাণ, তন্ত্র, ভাগবত ইত্যাদির ভাব ও সাধনা যেমন সন্নিবিষ্ট, তেমনই এই প্রণালীর মধ্যে বুদ্ধ, মুষা, ঈশা, মহম্মদ, চৈতন্য, নানক প্রভৃতির ভাব ও সাধনা সন্নিবিষ্ট। তাই আমরা এই বর্ত্তমান উপাসনাপ্রণালীকে অবলম্বন করিয়া, অতীতের স্বদেশের বিদেশের সকল সাধনার স্বাদ আস্বাদন করি ও সকল সাধনাকে আপনার সাধনা বলিয়া গ্রহণ করি। সত্যং জ্ঞানং অনন্তং প্রভৃতি ঈশ্বরের বিভিন্ন স্বরূপ অবলম্বনে বিশ্লেষণে ঈশ্বরের বিভিন্ন স্বরূপের স্বাদ গ্রহণ করিয়া, সমষ্টিতে তাঁহাকে ধারণা করার প্রণালীটী যেমন নূতন ব্যাপার, তেমনই ইহা বিশেষ ব্যাপার। এই স্বরূপবিশ্লেষণের সাধনা-যোগে ঈশ্বরের বিভিন্ন স্বরূপের স্ফুরণে তাঁহাকে পূর্ণভাবে ধারণা ও গ্রহণের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মের অখণ্ড সত্তার ধারণা ও ধ্যান ব্রহ্মসাধনার প্রাথমিক প্রণালী। পরবর্ত্তী কালে একই ঈশ্বরকে, তাঁহার নানা নামে, খণ্ডখণ্ডভাবে সাধনা ও ধারণার ফলে ভারতে বহু ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। কাহারও সাধনার সঙ্গে কাহারও মিল ছিল না। এখন ঈশ্বরের স্বরূপ-বিশ্লেষণে সাধনার ফলে প্রত্যেক সাধকের জীবনে ঈশ্বরের বিভিন্ন নামে বিভিন্ন ভাবের প্রকাশকে সাদরে গ্রহণ করিয়া, সকল ভাবের, সকল নামের সাধনার সমষ্টিকে একেতে পরিণত করিয়া, অখণ্ডে গ্রহণের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যেক সাম্প্রদায়িক সাধনার বৈশিষ্ট্য রহিয়া গেল, অথচ সাম্প্রদায়িকতা চলিয়া গেল। সকল শ্রেণীর সাধকের এক অখণ্ড পরিবারে পরিণত হইবার সুযোগ উপস্থিত হইল। অপর দিকে পূর্ব্বে যেমন কাহারও জ্ঞানপ্রধান জীবন, কাহারও ভক্তিপ্রধান, কাহারও যোগ-প্রধান জীবন ছিল, এখন এই বিশ্লেষণে সাধনার ফলে সকল ভাবের অঙ্গাঙ্গী স্ফুরণের দ্বারা, আত্মার সকল বিভাগের পূর্ণ বিকাশ ও পূর্ণাঙ্গ উন্নতির সুযোগ উপস্থিত হইল।

২৪শে আগষ্ট, বৃহস্পতিবার, ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যা ৭টায়, শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী "নব ভারতের ধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। পূর্ব্বের সকল ছাঁচ বদলাইয়া এক নূতন ছাঁচে নবযুগে নবযুগধর্ম্ম বিধাতা কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হইয়াছে। এই নবযুগধর্ম্মের নামই সমন্বয়-প্রধান নববিধান। তিনি বিশেষ ভাবে ধর্ম্মপিতামহ রামমোহনের জীবনের বহুদিগ্ব্যাপী কর্ম্ম ও ভক্ত ব্রহ্মানন্দ-জীবনের লীলাপ্রধান সমন্বয়ধর্ম্মের অভিব্যক্তি ব্যাখ্যা করিয়া, "নববিধানের জয় নিঃসংশয়" ধ্বনিতে বক্তৃতা শেষ করেন।

২৫শে আগষ্ট, শুক্রবার, সন্ধ্যা ৭টায়, শান্তিকুটীরে ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস ভক্তিভাবে কীর্ত্তন করেন।

২৬শে আগষ্ট, শনিবার, সন্ধ্যা ৭টায়, শান্তিকুটীরে "আমাদের সত্সঙ্গ" উৎসব হয়। ডাক্তার দত্তানন্দ রায় উপাসনা করেন। ছেলেমেয়েরা মিলিত হইয়া সঙ্গীত করেন। আরাধনার শেষে শ্রীমতী নির্ঝরপ্রিয়া ঘোষ বেদীর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, নববিধান যে সকল প্রেরিতবর্গ-যোগে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া, তাঁহাদের পরিবারের মধ্যে স্বর্গগত ভাই কালীশঙ্কর কবিরাজের সহধর্ম্মিণী একমাত্র এখন জীবিত আছেন উল্লেখ করেন, এবং তাঁহার হস্তে নববিধানের চিহ্নিত একটী মাল্য দিয়া তাঁহারই হস্ত দ্বারা ঐ মাল্যটী নববিধানমণ্ডলীর সুগায়ক বিধানমুরলী শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পুত্র শ্রীমান্ ধ্রুবেন্দ্রের গলদেশে ঝুলাইয়া দিয়া আদর ও উৎসাহিত করা হয়। শ্রীমান্ ধ্রুবেন্দ্র এই অল্প বয়সেই পিতার সঙ্গে সুকণ্ঠে সঙ্গীত করিয়া মণ্ডলীর যেরূপ সেবা করিতেছে, ভবিষ্যতে যাহাতে বিধানমুরলী পিতার উপযুক্ত সন্তান হইয়া বিধানসঙ্গীত দ্বারা মণ্ডলীর সেবা করিয়া ধন্য হইতে পারে, তজ্জন্য সকলের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করা হয়। তৎপর প্রার্থনা ও সঙ্গীত হইয়া জলযোগান্তে অদ্যকার উৎসব সম্পন্ন হয়।

২৭শে আগষ্ট, রবিবার, শ্রদ্ধেয় ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগীর স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক। প্রাতে ৭টায় নবদেবালয়ে উপাসনা হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন। সন্ধ্যা ৭টার ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ডাক্তার কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন। তিনি উপাসনার প্রথমাংশ শেষ করিয়া নিবেদনে ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগীর জীবনের সেবার দিক্, বিশেষ ভাবে নিম্নশ্রেণীর বিপন্ন ছেলেমেয়েদিগের সেবার কাহিনী, দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িতদের সেবা, আপনার স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছেন, ভাবের সহিত বর্ণনা করিয়া শেষ প্রার্থনা করেন। এরূপ উৎসবজননীর কৃপায় এবারকার ভাদ্রোৎসব সম্পন্ন হয়।

সংবাদ।

জন্মদিন—২৮শে আগষ্ট, সোমবার, সন্ধ্যায়, [illegible]টোলার কৃষ্ণভবনে, শ্রীযুক্ত কুমুদবিহারী সেনের আহ্বানে তাঁহার মাতৃ-দেবীর জন্মতিথি উপলক্ষে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

গত ১লা সেপ্টেম্বর, ৬৫।১ হ্যারিশন রোডে, বিধানমুরলী শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের দ্বিতীয়া কন্যা কল্যাণীয়া রমার জন্ম-দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। পিতা কন্যার মঙ্গল ভিক্ষা করিয়া বিশেষ প্রার্থনা করেন। পিতা এই উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

উৎসব—ঢাকার নববিধানবিশ্বাসিমণ্ডলী ব্রহ্মমন্দির-প্রতি-ষ্ঠার সাম্বৎসরিক ভাদ্রোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে আহূত হইয়া, কলিকাতা হইতে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক সস্ত্রীক, ভাই অখিলচন্দ্র রায় এবং বিধানমুরলী শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তথায় গিয়াছিলেন।

বিদেশ-যাত্রা—গত ৫ই সেপ্টেম্বর, চট্টগ্রামের স্বর্গীয় রাজেশ্বর গুপ্তের কনিষ্ঠ সন্তান, আমাদের সকলের প্রিয় শ্রীমান্ বিজয়শ্রী গুপ্ত সস্ত্রীক শিশুপুত্র সহ পুনরায় জার্ম্মানী যাত্রা করিয়াছেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি সস্ত্রীক জার্ম্মানী হইতে দেশে আসিয়াছিলেন। মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছা তাঁহাদের জীবনে পূর্ণ হোক।

সেবা—গত ১৭ই জুলাই, ভাই অখিলচন্দ্র রায় বালেশ্বরের সুগায়ক শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র পাণ্ডাকে সঙ্গে লইয়া, কাঁথিতে নববিধানপ্রচারার্থে গমন করিয়া, তথায় ৬দিন স্থিতি করেন। প্রায় প্রতিদিন সায়ংকালে ব্রাহ্ম জমিদার বাবু বিপিনবিহারী শাসমলের বাড়ীতে উপাসনা, আচার্য্যের উপদেশ-পাঠ, সংগীত ও সংকীর্ত্তনযোগে বিধান প্রচার করিয়াছেন। কেবল ২০শে জুলাই, সায়ংকালে কাঁথি ব্রহ্মমন্দিরে বিশেষ উপাসনা হয়; ঐ দিন কাঁথির ব্রাহ্মব্রাহ্মিকা প্রায় ৬০ জন উপাসনায় যোগ দেন। ভাই অখিলচন্দ্র রায় বেদীর কার্য্য করেন, আচার্য্যের উপদেশ হইতে "স্বর্গীয় প্রেম" বিষয়ক উপদেশটী পাঠ করিয়া, এই প্রেমই যে সমস্ত মানবপরিবারকে একতার সূত্রে বদ্ধ করিয়া ধরাকে স্বর্গে পরিণত করিবে, তাহাই বিবৃত করেন। কাঁথি ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনায় সপরিবারে যোগদান ও উপাসনায় অনুরাগ দেখিয়া আমরা অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়াছি। প্রিয়বন্ধু বিপিনবাবুর পরিবারের আদর যত্ন ও অতিথিসৎকার বাস্তবিকই অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ। কাঁথি উপবিভাগে মফঃস্বলে ও সহরে অনেকগুলি বিশ্বাসী পরিবার আছেন। এটী নব[illegible]ানপ্রচারের একটী প্রশস্ত ক্ষেত্র। মঙ্গলময় তাঁর বিধান রাজ্য বিস্তার করুন।

জন্মদিন ও স্বর্গদিন—গত ১০ই সেপ্টেম্বর, রবিবার, পূর্ব্বাহ্নে, ১৪৫।এ, ল্যান্সডাউন রোডস্থ ভবনে, ডাক্তার সত্যানন্দ রায়ের [illegible] পুত্র শ্রীমান্ সুনন্দনের জন্মদিন ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী [illegible]তি রায়ের স্বর্গারোহণের প্রথম সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, শ্রীযুক্ত বে[illegible]ধব দাস উপাসনার কার্য্য করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ও [illegible]নীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী বিশেষ প্রার্থনা করেন। সা[illegible]র ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনায় ভাই অক্ষয় কুমার লধ তাঁহার জীবনে নববিধানের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম কেমন সমন্বিতভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা উল্লেখ করেন।

বিশেষ কৃতিত্ব—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, এলাহাবাদ-প্রবাসী, আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট এবং সেসনজজ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৌহিত্রী কুমারী রমা বোস এবার দর্শনশাস্ত্রের এম্.এ. পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব ও প্রশংসার সহিত প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম স্থান লাভ করিয়াছেন। কন্যাটি আই,এ, পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান এবং বি,এ, পরীক্ষায়ও দর্শনশাস্ত্রে অনার্সে প্রথমবিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম স্থান লাভ করিয়াছিলেন। ভগবান্ তাঁহার কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ২৫শে আগষ্ট, স্বর্গীয় লক্ষ্মণচন্দ্র সিংহের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী বসন্তকুমারীর এবং ২৬শে আগষ্ট স্বর্গীয় লক্ষ্মণচন্দ্র সিংহের সাম্বৎসরিক স্মরণে নবদেবালয়ে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন।

গত ২৭শে আগষ্ট, ভক্তিভাজন প্রেরিত ভাই অমৃতলালের স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে ৫।১ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট ভবনে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন এবং শ্রীমতী ভক্তিমতী দেবী ও শ্রীমতী চিত্তবিনোদিনী দেবী উভয়েই বিশেষ প্রার্থনা করেন।

গত ২৭শে আগষ্ট, স্বর্গগত ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগীর সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ প্রেসিডেন্সি জেলে গিয়া শ্রীমান্ জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর সঙ্গে বিশেষ উপাসনা করেন। শ্রীমান্ জ্ঞানাঞ্জন সুন্দর প্রার্থনা করেন। ভগবান্ তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করুন। ঐদিন প্রাতে নবদেবালয়ে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ এবং সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে ডাক্তার কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন। কামাখ্যাবাবু নিয়োগী মহাশয়ের সুন্দর প্রেমপূর্ণ সেবার জীবনের বিষয়ে ব্যক্তিগত সাক্ষ্য দান করেন।

গত ২৭শে আগষ্ট, বাহির মির্জ্জাপুর রোডে, শ্রীমান্ সন্তোষ কুমার দত্তের মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

গত ১৭ই ভাদ্র, প্রাতে, হাওড়া, বাঁটরা নিবাসী স্বর্গীয় ডাক্তার শরৎকুমার দাসের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনার কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে অমরাগড়ী প্রচারফণ্ডে ১৲ ও নববিধান প্রচারফণ্ডে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ১লা সেপ্টেম্বর, স্বর্গীয় মহারাজা রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুরের স্বর্গারোহণ-সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, কোচবিহারে কেশবাশ্রমস্থ সমাধিমণ্ডপে বিশেষ উপাসনা হয়। ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন। রাজকর্ম্মচারিগণ প্রায় সকলেই উপস্থিত থাকিয়া শ্রদ্ধাদান করেন। এই উপলক্ষে শ্রীমদাচার্য্যদেবের পরিবারবর্গের উদ্যোগে কমলকুটীরে নবদেবালয়েও উপাসনা হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী প্রমুখ পরিবারস্থ কেহ কেহ যোগদান করেন। মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী প্রার্থনা করেন। পুরী নবপর্ণকুটীরেও ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন।

গত ৫ই সেপ্টেম্বর, ৪৪নং নিউ থিয়েটার রোডে, শ্রদ্ধেয় কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া ক্ষীরোদাসুন্দরী দেবীর প্রথম সাম্বৎসরিকে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত দেবজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় মাতৃ-আত্মার উদ্দেশে হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। কামাখ্যা বাবু সহধর্ম্মিণীর উদ্দেশে যে নিবেদন করেন, তাহা স্থানান্তরে দেওয়া গেল।

গত ৭ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলপাড়ার বাড়ীতে, স্বর্গগত ভাই রামচন্দ্র সিংহের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে, ভাই

প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে পুত্রবধূ শ্রীমতী ইন্দুরেখা সিংহ প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ১০ই সেপ্টেম্বর, সন্ধ্যার সময়, শ্রীমতী নির্ম্মলা বসুর রাঁচি তৃপ্তিকুটিরে, স্বর্গীয়া ভগিনী সুনুর প্রথম সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীমতী হেমলতা চন্দ উপাসনার কার্য্য করেন। নির্ম্মলা বসু প্রার্থনা ও সঙ্গীত করেন। এই উপলক্ষে, মুঙ্গের প্রমথলাল যাত্রিনিবাস-নির্ম্মাণার্থ ২৲ টাকা দান স্বীকার করা হইয়াছে।

রাজর্ষির শতবার্ষিকী—পুরীতে ধর্ম্মপিতামহ রাজর্ষি রামমোহন রায়ের স্বর্গারোহণের শতবার্ষিক উৎসব সম্পাদনের জন্য একটী কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা গঠিত হইয়াছে। এই সভার সভাপতি কালেক্টর মিঃ এন, পি, থডানি, সম্পাদক পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ জে, এন, দে এবং শ্রদ্ধেয় ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক, স্থানীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ কমিটীর সভ্য মনোনীত হইয়াছেন। নববিধানের নবশ্রীক্ষেত্র-ভূমিতে মণ্ডপ করিয়া উৎসব সম্পন্ন করা স্থির হইয়াছে।

ব্রহ্মমন্দির—গত ১৩ই আগষ্ট, ভাদ্রোৎসবের পূর্ব্ব রবিবার, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনাকালে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ যে আত্মনিবেদন করেন, তাহার মর্ম্ম সংক্ষেপে এই ভাবে গৃহীত হইতে পারে। সম্মুখে সাধন-প্রধান ভাদ্রোৎসব। এ সময়ে আমরা এই নবযুগে নববিধানে কত বড় সাধনসম্পদ স্বর্গ হইতে লাভ করিলাম, তাহার কিরূপ ব্যবহার আমরা জীবনে করিলাম, তাহার হিসাব লইয়া এ সময় আমাদের উৎসবদায়িনী জননীর চরণসমীপে উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন। আমরা প্রকাণ্ড সাধনসম্পদ পরম পিতামাতা হইতে পাইয়াছি। অতীতের স্বদেশের বিদেশের বিচিত্র বিধান, স্বদেশের বিদেশের সাধু ভক্ত মহাজনদিগের পবিত্র চরিত্র, বর্ত্তমান বিধানে অভিব্যক্ত কত দর্শন, শ্রবণ ও ঈশ্বরের বাণীর অনুসরণমূলক কত সাধন-সম্পদের অধিকারী হইয়াছি; কিন্তু আমাদের জীবনে এই সাধনসম্পদের ব্যবহার কিরূপ হইল, তাহা নিজ নিজ জীবনে চর্চ্চা করিলে আমরা দেখিতে পাই, আমাদের অধিকাংশ জীবনে সাধনসম্পদের কতই অপব্যবহার হইয়াছে। বাইবেলে কথিত অমিতাচারী পুত্রের মত নিজকে অপরাধী জানিয়া, যদি পরম পিতাতে আত্মসমর্পণ করিতে পারি, তবে তিনি আমাদিগকে তাঁহার চরণে আত্মসমর্পিত ক্ষতিগ্রস্ত অনুতপ্ত সন্তানরূপে পাইয়া, আপনার আহ্লাদে আমাদিগকে লইয়া স্বর্গের তাঁহার সাধু ভক্ত সুসন্তানগণ সহ এমন উৎসব করিবেন যে, সে উৎসবের আর তুলনা হয় না।

দানপ্রাপ্তি—চুঁচুঁড়া ব্রহ্মমন্দিরের সম্পাদক ডাক্তার অনুকূলচন্দ্র মিত্র কৃতজ্ঞতার সহিত, চুঁচুঁড়া ব্রহ্মমন্দিরের সাময়িক [illegible]নের জন্য, নিম্নলিখিত দানপ্রাপ্তি স্বীকার করিতেছেন—

(১) ব্রহ্মানন্দনন্দিনী শ্রীমতী সাবিত্রী দেবীর আদ্যশ্রাদ্ধে তদীয় পুত্র কুমার বিকাশেন্দ্রনারায়ণ ৫৲; (২) স্বর্গগত ডাক্তার নকুড়চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধে তদীয় পুত্র ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৲; (৩) একমাত্র সন্তান শ্রীমান্ প্রেমেন্দ্রনাথের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে তদীয় জননী শ্রীমতী সুধাংশুবিকাশিনী বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ।

শ্রীমদ্গীতা প্রপূর্ত্তিঃ বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশ করিতে বহু টাকা ঋণ হয়। পরম মঙ্গলময়ের কৃপাতে সেই ঋণ পরিশোধ হইয়াছে। এজন্য মঙ্গলময়ের চরণে কৃতজ্ঞ অন্তরে বার বার প্রণাম করি এবং যে সকল দয়ার্দ্র বন্ধু বিবিধ উপায়ে অর্থানুকূল্য, সাহায্য এবং সহানুভূতি করিয়াছেন, সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহাদিগকে স্মরণ ও নমস্কার জ্ঞাপন করিতেছি।

১। প্রীতিভাজন ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মনোমোহন দাস বি,এল, নিবাস পোড়া মহল্লা, ঢাকা, হাতিয়াতে (নোয়াখালী) উকিল, এ কার্য্যে ২০০৲ দুইশত টাকা দান করিয়াছেন।

২। এলাহাবাদনিবাসী শ্রদ্ধেয় জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হইতে ১০০৲টাকা হাওলাত গ্রহণ করি। গ্রন্থবিক্রয় দ্বারাই তাঁহার ৯০৲ টাকা পরিশোধ হয়। বাকি দশ টাকার গ্রন্থ তিনি গ্রহণ করিয়া আমাকে ঋণমুক্ত করিয়াছেন।

৩। স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ভাই বিহারীলাল সেন এককালীন ১০৲ টাকা দান এবং কয়েকখণ্ড গ্রন্থ বিক্রয় করিয়া সাহায্য করিয়াছেন।

৪। ময়ূরভঞ্জের মহারাজা শ্রীশ্রীপ্রতাপচন্দ্র ভঞ্জদেব নগদ মূল্য দিয়া গ্রন্থের দশ খণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন।

৫। কলিকাতা গিরিশবিদ্যারত্ন ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীমান্ জিতেন্দ্রমোহন সেন পিতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে এই গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ জন্য ১০৲ টাকা সাহায্য করিয়াছেন।

৬। অধ্যাপক শ্রীমান্ নিরঞ্জন নিয়োগী [illegible] সহিত গ্রন্থ বিক্রয় করিয়া সাহায্য করিয়াছেন। [illegible] পরিশোধ হওয়াতে গ্রন্থের মূল্য কম করা গেল।

কাপড়ে বাঁধা গ্রন্থ ৫৲ স্থলে ৩৷৷০ টাকা; কাগজে বাঁধা ৪৷৷০ স্থলে ৩৲ টাকা।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন।
৩৫ বিধানপল্লী, পোঃ রমণা, ঢাকা।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক ২রা আশ্বিন, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৮ ভাগ।
১৮।১৯শ সংখ্যা।

১৬ই আশ্বিন ও ১লা কার্ত্তিক, ১৩৪০সাল, ১৮৫৫শক, ১০৪ব্রাহ্মাব্দ।
2nd & 18th. October, 1933.

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

মা, তোমার নববিধান সত্যই উৎসবের বিধান। এই বিধা[illegible] পাল্লায় যে পড়ে, তাহাকে উৎসবের পর উৎসব আসিয়া চির উন্মত্ত করে। যাহাদিগকে তুমি তোমার নববিধানের ঘোরতর ধর্ম্মের ভিতর ফেলেছ, তাহাদিগকে সত্যই তুমি নাকে দড়ি দিয়ে টান এবং পিঠে মারিতে মারি[illegible] উৎসবের পর উৎসব করাইয়া নেহাল করিয়া তোমে[illegible] আমরা ভাবিয়া চিন্তিয়া সংসারের পথে যখন চলি এবং এ[illegible]টু আধটু নিয়ম রক্ষা মত উপাসনা করিয়া দিন কাটাই, তখন পাপ চিন্তা, সংসার-চিন্তা, নীচ কামনা বাসনা আসিয়া আমাদিগকে গ্রাস করে। তাই তুমি উৎসবের পর উৎসব দিয়া এমনই মত্ত করিয়া রাখিতে চাও যে, যাহাতে আমাদের পাপ করিবার, বিষয়বাসনায় মজিয়া থাকিবার অবসরই না থাকে। দিন রাত্রিতোমারই পূজায়, তোমারই সেবায়, তোমারই নামগানে, তোমারই উৎসব-সাধনে দিন কাটাইতে ব্যস্ত যে, তাহার ছুটী কোথায় পাপ করিতে। পৌরাণিক হিন্দু সাধকগণও বুঝি, তাই উপর্য্যুপরি উৎসব সাধন করিয়া, ধর্ম্মোন্মত্ততায় উন্মত্ত হইয়া থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন; আজ দুর্গোৎসব, কাল লক্ষ্মীপূজা, পরে শ্যামাপূজা, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, জগদ্ধাত্রী পূজা, কার্ত্তিকপূজা ইত্যাদির অনুষ্ঠান। নববিধানে এ সমুদয় উৎসবই আধ্যাত্মিক ভাবে সম্পন্ন করিতে তুমি শিখাইয়াছ। তা ছাড়া সর্ব্বধর্ম্মের সকল উৎসবেই আমাদিগকে প্রণোদিত কর এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক সাময়িক উৎসবসাধনেও যোগ সমাধান করাইয়া কতই আমাদিগকে ধন্য করিয়া থাক। আবার এবার এই জাতীয় উৎসব-সময়ে, আমাদিগের ধর্ম্মপিতামহ রাজর্ষি রামমোহনের স্বর্গারোহণের শতবার্ষিকী সাধনও এক মহা উৎসব রূপে আনিয়া দিয়াছ। এই উৎসবে যেন আমরা আমাদিগের ধর্ম্মপিতামহের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাদানে তাঁহার স্মৃতি চির রক্ষা করিয়া ধন্য হইতে পারি। তিনি আমাদের জাতির ও দেশের ঘোর অন্ধকার ও জঙ্গলময় অবস্থায়, জীবন্ত ঈশ্বরের প্রেরণায়, মহাবীরত্বে ও ধর্ম্মসাধনায় উদ্দীপ্ত হইয়া নববিধানের বীজ বপন করিলেন, যাহা হইতে আমরা নিত্য নিত্য নব নব উৎসব-সম্ভোগের অধিকার পাইলাম। আশীর্ব্বাদ কর, যেন এই নববিধানে বিশ্বাসী হইয়া, আমাদের দেশ, আমাদের জাতি এবং সমগ্র জগৎ নিত্য উৎসবে নিত্য ব্রহ্মানন্দসম্ভোগে ধন্য হয়। দেশের ও জাতির যত কিছু দুর্গ[illegible], যাহা [illegible] দুর্দ্দিন, সকলই যাহাতে দূর হয়, এবং সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয়ে,

সর্ব্বজাতির সম্মিলনে, সকল প্রকার জড়বাদ, অপ্রেম অশান্তি নির্ব্বাণ হয়, মা দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ ! শান্তিঃ !! শান্তিঃ !!!

—০—

ধর্ম্মপিতামহ রাজর্ষি রামমোহন রায়ের স্বর্গারোহণের শত-বার্ষিকী।

"নমি ধর্ম্মপিতামহ রাজর্ষি রামমোহন,
করিলেন যিনি নবযুগধর্ম্মবীজ বপন,
স্তব স্তুতি বিদ্যা বুদ্ধিবলে করি উদ্ভাবন,
সর্ব্বধর্ম্মশাস্ত্রমর্ম্ম এক ব্রহ্ম নিরঞ্জন।"

আমাদের ভক্তিভাজন ধর্ম্মপিতামহ রাজর্ষি শ্রীরাম-মোহন ১৮৩৩সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর, বৃষ্টল নগরে, এই নশ্বর দেহ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গারোহণ করেন। সেই দিনের শতবার্ষিক সাম্বৎসরিক দিন, সেই ২৭শে সেপ্টেম্বর দিন, ধর্ম্মজগতে এক বিশেষ স্মরণীয় দিন। এই পবিত্র শ্রাদ্ধবাসরে আমরা আমাদিগের ধর্ম্মপিতামহের দিব্য আত্মার প্রতি প্রাণগত ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়া ধন্য হইলাম।

রাজা রামমোহন রায় যে বহুগুণসম্পন্ন মহাপুরুষ ছিলেন, ইহা সর্ব্বজন স্বীকৃত। তাঁহার অসামান্য ধীশক্তি, বিদ্যাবত্তা, ধর্ম্মস্বাধীনতা এবং স্বদেশপ্রিয়তা স্মরণ করিলে, স্বতঃই অন্তরে কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি উচ্ছ্বসিত হয়। তাঁহার প্রতি সম্মান দান করা মানব মাত্রেরই স্বাভাবিক কর্ত্তব্য। বিশেষ ভাবে আমরা যখন নববিধানে বিশ্বাস লাভ করিয়াছি, তখন আমাদিগকে তাঁহার সঙ্গে বিশেষ ব্যক্তিগত সম্বন্ধে বিধাতা সম্বদ্ধ করিয়া দিয়াছেন; তাই নব-বিধানাচার্য্য এক কথায় সেই সম্বন্ধ ব্যক্ত করিয়া, তাঁহাকে আমাদিগের ধর্ম্মপিতামহ বলিয়া অভিনন্দন করিয়াছেন। বাস্তবিক তাঁহার সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ অতি নিগূঢ়। নববিধানের আদি বীজ ভগবান্ তাঁহাকে দিয়াই বপন করিয়াছেন।

নববিধান সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়জীবনের বিধান। জ্ঞান ও [illegible] এই ধর্ম্মবিধানের আদি মত রামমোহনের প্রাণে উদ্ভাবিত হয়। আশ্চর্য্য অলৌকিক মেধাবলে তিনি সকল ধর্ম্মশাস্ত্র মন্থন করিয়া, একেশ্বরবাদ যেরূপে প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাতে বিধাতারই প্রেরণা ভিন্ন আর কি পরিলক্ষিত হয়? তাই ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "শত সহস্র টাকার ঋণে আমরা তাঁহার নিকটে ঋণী। তিনি আমাদিগের ভক্তিভাজন, কৃতজ্ঞতাভাজন। সাধুভক্তি যদি আমাদিগের প্রতি ঈশ্বরের আদেশ হয়, তবে আমরা কি রামমোহনকে বিদায় করিয়া দিতে পারি? কোথায় থাকিত এ ব্রাহ্মসমাজ? যদি ব্রহ্মসন্তান রামমোহন না আসিতেন। তিনি বড় লোক, কি রাজা ছিলেন, তাহার বিচার আমরা করিব না। আমরা তাঁহার নিকট একটী বিস্তীর্ণ জমীদারী পাইয়াছি। সেই তালুকের প্রজা আমরা। ভয়ানক পৌত্তলিকতার বন কাটিয়া তিনি একখণ্ড ভূমি আবাদ করিলেন। সেখানে কতকগুলি প্রজার বসতি করিয়া দিলেন। জ্বরবিকারে কণ্টকবনে লোকে মরিতেছিল, এই যে সামান্য ভূমিখণ্ড, ইহা হইতে ব্রহ্ম-আরাধনা এই দেশে আবার প্রবল হইল। আবার কয়েকটী লোক এক ব্রহ্মকে পূজা করিতে লাগিল। ভগবান্ই তাঁহার পুত্র রামমোহনকে পাঠাই-লেন। তাঁহার জন্য ভারতে ব্রাহ্মসমাজ আপনার মস্তক উত্তোলন করিয়াছে। তাঁহার স্তব স্তুতিতে, বিদ্যাবুদ্ধিতে পবিত্র ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইল। এই জন্য তাঁহার নাম কৃতজ্ঞতা ফুলে গলায় জড়াইয়া রাখি। সেই ধর্ম্ম-পিতামহ এত উপকার করিয়া গেলেন, তিনি হাতে হাতে ধর্ম্মধন দিয়া গেলেন। যখন ব্রাহ্মসমাজে বসিয়া, প্রজা হইয়া শস্য সংগ্রহ করিতেছি, তখন যাঁহার নিকট এই তালুক লাভ করিলাম, যিনি ঘোর অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া সহস্র লোকের তীব্র নির্য্যাতনে ব্যথিত হইয়া, জয় জগদীশ! জয় জগদীশ! বলিয়া কেবল ঈশ্বরের মুখের পানে তাকাইলেন, ব্রহ্মের ঘর প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তিনি জয়ী হইলেন। ভগবান্ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, বলিলেন, 'প্রিয় সন্তান, ঘরে এসো'। তিনি ভবে ঈশ্বরের কার্য্য করিয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন। তাঁহার জন্য প্রার্থনা করিব। পরাৎপর পরব্রহ্ম তাঁহার ঈশ্বর। তাঁহার ও আমাদের ঈশ্বরের নিকট তাঁহার জন্য শুভ ইচ্ছা উত্থিত হউক।"

নববিধানাচার্য্য যদিও অন্যত্র বলিলেন, "মত হইতে জীবন বড়, ব্রাহ্মসমাজ হইতে নববিধান বহু দূরে", কিন্তু বীজপত্তন না হইলেত বৃক্ষের উদ্গম হয় না, ভিত্তি-

স্থাপন না হইলেত অট্টালিকা-নির্ম্মাণ বা অট্টালিকায় বাস সম্ভবপর হয় না। তাই আমাদের ধর্ম্মপিতামহ ঈশ্বর-প্রেরিত হইয়া, স্বীয় স্বাধীন ধর্ম্মমতের প্রতিষ্ঠা জন্য নিজ পিতৃদেব কর্ত্তৃক বর্জ্জিত হইয়া, দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া সত্য শিক্ষা ও সঞ্চয় করিলেন; সেই সময়ে অগম্য তিব্বতে পর্য্যন্ত গমন করিলেন, প্রাণসংশয়াপন্ন হইয়া দেশে ফিরিলেন, এবং আরবী, পারস্য, সংস্কৃত, হিব্রু, গ্রীক ইত্যাদি ভাষা অধ্যয়ন করিয়া, এসলাম ধর্ম্ম, হিন্দু ধর্ম্ম, খ্রীষ্টধর্ম্ম ইত্যাদি হইতে একেশ্বরবাদ সংগ্রহ-পূর্ব্বক বিভিন্ন ভাষায় পুস্তকাদি রচনা করিলেন। তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সহিত তর্ক বিতর্ক এবং আলোচনা করিয়া আপন মত প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং সর্ব্ব-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের একত্র মিলিত হইয়া এক ঈশ্বরের উপাসনা করিবার জন্য ব্রাহ্মীয় সভা স্থাপন ও সমাজগৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অভিনব সমন্বয়বিধির মূল পত্তন করিলেন। ইহা কি সামান্য? ইহা কি সাধারণ লোকে পারে?

এতদ্ব্যতীত বাংলা ভাষায় গদ্য রচনা আবিষ্কার ও তাহার ব্যাকরণ রচনা, রাজসহায়তায় ভীষণ সহমরণ-প্রথা নিবারণ এবং ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন ও নানা প্রকার সংস্কারের সূত্রপাত করিয়া সর্ব্ব প্রথম সমুদ্র-যাত্রা করিয়া বিলাত গমন ও ভারতের প্রতি ইংরাজ-রাজপ্রতিনিধিদিগের করুণ দৃষ্টি আকর্ষণ, এই সকলি কি অলৌকিক নয়?

বঙ্গদেশের হুগলী জেলার সামান্য ক্ষুদ্রপল্লী রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া, বিলাতের বৃষ্টলনগরে দেহত্যাগ, ইহাও তখনকার সময়ের পক্ষে এক আশ্চর্য্য অদ্ভুত ব্যাপার ভিন্ন আর কি বলিব? বিধাতার বিধানে বিশ্বাসী হইয়া এই অসাধারণ মহাপুরুষের জীবনলীলা-কাহিনী যদি আমরা অধ্যয়ন করি, ইহার প্রত্যেক অক্ষরে অক্ষরে বিধাতারই হস্তলিপি প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হই।

কি উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ সঙ্গীত সকল রচনা করিয়া তিনি ভারতকে নবজাগরণে জাগ্রত করিয়া গিয়াছেন। নববিধানে পরে যে একাত্মতার সাধনা ব্রহ্মানন্দ-জীবনে পরিস্ফুট ও প্রত্যক্ষীভূত হইল, সমগ্র মানবসমাজ যে এক এবং সর্ব্বধর্ম্ম, সর্ব্ব-জাতি, সর্ব্বদেশ, সর্ব্ব মানব এক দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রূপে গাঁথা হইয়া একত্বলাভ করিবে, ইহা যে তিনি নিজ জীবনে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তাহারও আভাস কি সুন্দররূপে আমাদের ধর্ম্মপিতামহ তাঁহার রচিত এই গানে দিয়া গিয়াছেন :—

> কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি,
> তোমার রচনা মধ্যে তোমাকে দেখিয়া ডাকি।
> দেশভেদে কালভেদে রচনা অসীমা, প্রতিক্ষণে সাক্ষ্য
> দেয় তোমার মহিমা; তোমার প্রভাবে দেখি না
> থাকি একাকী॥

ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে তাই একাত্মতা অবলম্বন করে, আমরাও তাঁহাকে আমাদের ধর্ম্মপিতামহ জানিয়া, অন্তরের শ্রদ্ধা অর্পণ করি এবং আচার্য্যের সহিত প্রার্থনা করি, "যদিও আমরা বাহ্যভাবে এখন তাঁহা হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছি, কিন্তু আধ্যাত্মিক যোগে যেন নিত্যকাল একই ব্রহ্মের মধ্যে বাস করিতে পারি।" তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া ভারতে এবং জগতে যে নববিধানের স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহাও আশা ও বিশ্বাসনয়নে দর্শন করি।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

ঈশ্বর ও পরলোকবাসী অমরাত্মাগণ।

ঈশ্বর নিরাকার হইয়াও যেমন নিত্য আছেন, পরলোকগত আত্মাগণ দেহমুক্ত হইয়াও আকারশূন্য অবস্থাতেই রহিয়াছেন। ঈশ্বরকে দেখিতে হইলে যেমন বিশ্বাসচক্ষে দেখা যায়, তেমনি পরলোকস্থ আত্মাদিগকে দেখিতে চাহিলেও বিশ্বাস-চক্ষুই খুলিতে হয়। মা যিনি, তিনি সন্তান ছাড়া থাকেন না; তাই মা যেখানে, সন্তানগণও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করেন। উপাসনা-কালে যেমন আমরা মার কাছে যাই বা মাকে কাছে পাই, তেমনি মার ভিতর দিয়া পরলোকগত আত্মাদিগকেও কাছে পাইতে পারি। ঈশ্বর ও পরলোক একই। ঈশ্বরেতে অবস্থানই পরলোকে অবস্থান। বাহ্যভাব পরিত্যাগ করিয়া এক ঈশ্বরে বাস করাই পরলোকে একত্র বাস করা। পরস্পরের সহিত যথার্থ কাছাকাছি হইবারও উপায়, একই ঈশ্বরের উপাসনা বা ঈশ্বরের কাছে বসা।

মূর্ত্তিপূজা।

মূর্ত্তিপূজা কল্পনার পূজা, আসল পূজা নয়; ইহা মূর্ত্তির উপাসকও স্বীকার করেন। কেন না, মৃন্ময়ী দেবী গঠন করিয়া, যতক্ষণ না "ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ" "এখানে এস, ইহার [illegible] অবস্থান কর" এই মন্ত্র-যোগে সে মূর্ত্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা না করা

হয়, ততক্ষণ সে মূর্ত্তির পূজা হয় না। তবে কেমন করিয়া বলিব, মৃন্ময় দেবদেবীর উপাসনা হইতে পারে, কিম্বা মৃন্ময়ের পূজা কেহ করেন। মৃন্ময় কেবল উপলক্ষ্য মাত্র। স্থির ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে, সম্মুখস্থ স্থান শূন্য মনে করিয়া, "দয়াল এস হে, এস হে" বলিয়া, ঈশ্বরের আবির্ভাব অনুভব করিয়া উপাসনা করাও যা, "ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ" বলাও তাই। তবে মৃন্ময় মূর্ত্তি গঠন করিয়া পূজা করা কেবল একটা কল্পিত অভ্যাস বা সংস্কার ভিন্ন আর কিছুই নয়; ইহার প্রয়োজনীয়তা কিছুই নাই। এই জন্যই পরমহংস রামকৃষ্ণদেব ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সহিত ধর্ম্মবন্ধুতা হইলে, মাঝে মাঝে ভাবাবেশে মৃন্ময়ী কালীকে গালাগালি দিয়া বলিতেন, "তুই আমাকে এদ্দিন আসল মাকে দেখতে দিস্‌নি"; এবং শ্রীকেশবকেও বলিতেন "তোমার কাছে এলে আমার চৌদ্দপো মা গলে যায়।" অর্থাৎ নিরাকারা চিন্ময়ী হয়ে যায়।

নিরাকারকে দেখা।

অজ্ঞানতাই অন্ধতা। চক্ষু অন্ধ হইলে সম্মুখে কিছুই দেখিতে পায় না, কেবল অন্ধকার বা শূন্য দেখে বা কল্পনা করে। বাহ্য-চক্ষু যার আছে, সে বাহিরের বস্তু দেখে; কিন্তু জ্ঞানচক্ষু না থাকিলে কোন্ বস্তু কি, তাহা চিনিতে পারে না। কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আমরা দেখিয়াও দেখি না; কেন না, সেই ব্যক্তি যে বিশেষ ব্যক্তি, তাঁহাকে চিনিতে পারি না। এই জন্য জ্ঞানই যথার্থ চক্ষুর জ্যোতি, জ্ঞানই চক্ষু। এই চক্ষু থাকিলে অন্ধকারেও আলো দেখা যায়। বিজ্ঞানচক্ষু দ্বারা দেখা যায়, মাধ্যাকর্ষণী শক্তি সমুদয়কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, তেমনি অধ্যাত্ম জ্ঞানচক্ষু দেখিতে পায় প্রত্যক্ষ নিরাকারকে—তিনিই এই এখানে উজ্জলরূপে আছেন, সমুদয় শূন্য পূর্ণ করিয়া আছেন এবং তাঁর নিরাকার প্রেমের বাঁধনে জগৎকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, পরস্পরকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। গ্রহ নক্ষত্র পৃথিবী পরস্পর যেমন নিরাকার আকর্ষণী শক্তির বাঁধনে বাঁধা, সমুদয় মানব-সমাজও পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা।

মৃন্ময়ে চিন্ময়।

বহির্জগতের যাহা কিছু, তাহা মৃন্ময় হইলেও, তাহার ভিতরে চিন্ময় নিহিত। মৃন্ময়ে চিন্ময়ে সংমিশ্রিত হইয়া এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। বিজ্ঞান যেমন বিশ্লেষণ করিয়া পদার্থের অভ্যন্তরস্থ সার যাহা কিছু তাহা বাহির করিতে পারে, তেমনি বিশ্বাস-বিজ্ঞানে মৃন্ময় দেব দেবী বা বাহ্য অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, সংস্কার আচরণ, সাধনপ্রক্রিয়া আদি সকলকার ভিতর হইতেই সার ব্রহ্ম-[illegible] স্বরূপ বাহির করিতে পারা যায়। এই জন্য নববিধান সকল ধর্ম্মের সকল সাধন অনুষ্ঠান হইতেই সত্য উদ্ভাবন করিয়া আপনার আত্মার পুষ্টি সম্পাদন করেন। কিছুকেই সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য বলিয়া চিরবর্জ্জন করেন না।

দুর্গোৎসবের বিশেষ শিক্ষা।

সকল ধর্ম্মের সকল উৎসবে প্রায় ঈশ্বরের এক এক ভাব বা এক এক স্বরূপকে দেবতারূপে বা উপাস্য রূপে উপলব্ধি করিয়া তাহারই পূজা হইয়া থাকে। যাঁহারা একেশ্বরবাদী, তাঁহারা ত একই ঈশ্বরকে নিজ নিজ ভাবে পূজা করেন; যাঁহারা বহুদেবতার উপাসক, তাঁহারাও এক এক সময় বা এক এক স্থানে এক এক দেবতারই পূজা বা উৎসব করেন। শিব, কালী, কৃষ্ণ, রাম, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক এইরূপ এক একটি দেবতারই পূজা বা উৎসব হইয়া থাকে; কিন্তু দুর্গোৎসবের বিশেষত্ব, একাধারে সকল দেবতার পূজার উৎসব। দেবীকে যখন মাতৃভাবে উদ্ভাবিত করিয়া পূজা করা হইয়াছে, তখন মা তাঁর সন্তান সন্ততিগণ সহ, মা কখন সন্তান ছাড়া হইতে পারেন না, গৃহস্থের পূজা গ্রহণ করিয়া, গৃহস্থকে সপরিবারে আনন্দ উৎসব দান করেন। মা যেমন সপরিবারে সসন্তানে স্বর্গের উৎসব দান করেন, তেমনি উপাসকও সপরিবারে, সসন্তানে, সপরিজনে তাঁহার প্রসাদ সম্ভোগ করিয়া ধন্য হইবেন। ইহাই দুর্গোৎসবের বিশেষ শিক্ষা। নববিধানেও এই জন্য একা একা সাধন হয় না, সপরিবারে সদলে মার পূজা করিতে হয়।

শারদীয় উৎসব।

ব্রহ্মানন্দ বলেন, "উৎসবের অর্থ নূতন।" নূতন কিছু দেখিলেই স্বতঃই মন আনন্দ উৎসবে উন্মত্ত হয়। আকাশের পূর্ণচন্দ্র, নদীর ভরা জল, স্নিগ্ধ সমীরণ, পক্ষীর মধুর সঙ্গীত, ফুলের সৌরভ ও সৌন্দর্য্য, প্রকৃতির বিচিত্র শোভা, সাগরের আনন্দ-তরঙ্গের উচ্ছ্বাস দেখিবা মাত্র কাহার না মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়? আবার তাহা প্রথম নূতন দেখিলে কাহার মন না উৎসবানন্দে পূর্ণ হয়? তাই এক এক ঋতুর পরিবর্ত্তনে, নববিধানাচার্য্য বিশেষ-ভাবে এক একটি উৎসব-সাধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শরৎকাল তাই উৎসবের একটী বিশেষ সময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। বর্ষার জলে শুষ্ক ক্ষেত্র ভরাট ও প্লাবিত হইল, ধান্যক্ষেত্রে শস্যারোপণ হইল, আকাশ মেঘমুক্ত হইয়া পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইল, এক দিকে বর্ষা শেষ হইল, আর এক দিকে শীতের আরম্ভ হইল, এমন সময়ে পৃথিবীতে লক্ষ্মীর দৃষ্টি পড়িল, ইহা অনুভব করিয়া শারদীয় উৎসব করা যে বিশেষ আনন্দপ্রদ, ইহা কি আমরা অস্বীকার করিতে পারি? নদীবক্ষে বা সাগরোপকূলে এই উৎসব-সাধন যথার্থই আত্মার পক্ষে বিশেষ কল্যাণপ্রদ। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে আমাদের মলিন আত্মা প্রকৃতিস্থ ও সৌন্দর্য্যসম্পন্ন হয়, ইহাই এই উৎসবের সাধন ও শিক্ষা।

রাজশ্রী নৃপেন্দ্র-সমাগম।

(কোচবিহারে ১৮ই সেপ্টেম্বর, সাধারণ শ্রাদ্ধসভায় ভাই প্রিয়নাথের অভিভাষণ)

"অহমস্মি"—আমি আছি। "আমি জীবিতদিগের ঈশ্বর, মৃতদিগের নই"। "Faith beholdeth God and beholdeth immortality."

আর্য্য ঋষিগণ পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে এই ঋগ্বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন :—

"যত্তে যমং বৈবস্বতং মনো জগাম দূরকম্।
তত্ত আবর্ত্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥
যত্তে বিশ্বমিদং জগন্মনো জগাম দূরকম্।
তত্ত আবর্ত্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে
যত্তে ভূতং চ ভব্যং চ মনো জগাম দূরকম্।
তত্ত আবর্ত্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥"

"তোমার যে আত্মা দূরে পরলোকের দেবতার নিকট গিয়াছে, আমরা তাহাকে পুনরাহ্বান করিতেছি; তাহা আমাদের মধ্যে বাস করুক ও জীবিত থাকুক। তোমার যে আত্মা আজ এই নিখিল বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে, আমরা তাহাকে পুনরাহ্বান করিতেছি; তাহা আমাদের মধ্যে বাস করুক ও জীবিত থাকুক। তোমার যে আত্মা সুদূর অতীতে বা সুদূর ভবিষ্যতের পথে গিয়াছে, আমরা তাহাকে পুনরা[illegible] করিতেছি; তাহা আমাদের মধ্যে বাস করুক ও জীবিত থাকুক।"

আমরাও আজ এই কুচবিহারাধিপতি রাজশ্রী নৃপেন্দ্রনারায়ণের পবিত্র শ্রাদ্ধবাসরে, ঋষিদিগের সেই মন্ত্রই পুনরাবৃত্তি করিলাম। এই রাজ্যের কোন্ অধিবাসী, প্রজা বা অমাত্য কিম্বা সমগ্র ভারতবাসী কে না আমাদের এই মন্ত্রোচ্চারণে সমতানে যোগদান করিবেন? কোন্ প্রাণ আজ না চায়, তাঁর সেই দিব্য আত্মা আবার আমাদের মধ্যে পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইয়া শুভাগমন করেন, এখানে জীবিত থাকিয়া অধিবাস করেন? বিশেষ ভাবে এই রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহার আত্মার পুনরাগমন কাহার না একান্ত প্রার্থনীয়?

বাস্তবিক ঋষিগণের সহিত আমরা বিশ্বাস করি যে, আত্মা অবিনশ্বর এবং চিরজীবিত। যদিও নৃপেন্দ্রনারায়ণের দিব্যদেহ ভস্মাবশিষ্ট হইয়া ঐ সমাধির অভ্যন্তরে রক্ষিত, কিন্তু তাঁহার মুক্ত দিব্যাত্মা জীবন্ত ঈশ্বরের বক্ষে জীবন্তরূপে সমাধিস্থ; এবং এখানে কেবল তাহার মর্ম্মরমূর্ত্তি নয়, তাঁহার দিব্য আত্মাও এই সভাধিষ্ঠিত।

আমরা কখনই বিশ্বাস করি না, অমরাত্মাগণ দেহমুক্ত হইলেই তাঁহাদিগের আত্মজন ও প্রিয়জনকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারেন। তাঁহারা যে জীবের পরিত্রাণের জন্য, সংসারের দুষ্কৃতি দূর করিবার জন্য এবং নব নব ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য, এক এক দেশে, এক এক যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।

আমরা তাই বিশ্বাস করি, সেই ভাবে ঈশ্বর-প্রেরিত হইয়াই, মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ এই কুচবিহার রাজ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যথার্থ ই বর্ত্তমান যুগধর্ম্মবিধান এই রাজ্যে প্রবর্ত্তন করিয়া আজ অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

যথার্থ ই তিনি সাধারণ মানুষ নন। তাঁহার জীবনের ইতিহাস যাঁহারা লিখিবেন, তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি এক অসামান্য ঐশীশক্তি-সম্পন্ন হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ কুচবিহারের সাধারণ বিধি অনুসারে হয়ত তাঁহার পিতৃসিংহাসন পাইবারই আশা ছিল না; কিন্তু ইংরাজরাজকর্ম্মচারী নৃপেন্দ্রনারায়ণের শিশুসুলভ রাজলক্ষণ দর্শন করিয়া, যেন ঈশ্বর-প্রেরণায় তাঁহাকে শূন্য গদিতে বসাইয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

নৃপেন্দ্রনারায়ণ অসামান্য মাতৃভক্তি এবং শিক্ষা-প্রভাবে, বাল্যকালেই তাঁহার ভবিষ্যৎ মহত্ত্বের পরিচয় দিয়া, ইংরাজরাজপুরুষদিগের বিশেষ শ্রদ্ধা এবং বাৎসল্য আকর্ষণ করিলেন। ইংরাজরাজের শিক্ষাধীনে কতই ত রাজপুত্রগণ শিক্ষিত হইয়া নিজ নিজ রাজ-সিংহাসনে অভিষিক্ত হইতেছেন; কই, ইংরাজরাজত তাঁহাদের পারিবারিক ধর্ম্মসংস্কারাদি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন না? নৃপেন্দ্রনারায়ণের প্রতি তাঁহারা এমনি আকৃষ্ট হইলেন যে, তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা সমাধান করিবার জন্য, তাঁহার বৈবাহিক সম্বন্ধ করিতেও স্বয়ং লাট সাহেব প্রস্তুত হইলেন। ইহা বিধাতার আশ্চর্য্য কৌশল ব্যতীত আর কি বলিব?

কোচবিহারের রাজবংশ ইতিপূর্ব্বে বহুবিবাহকারী এবং নানাপ্রকার জাতীয় সংস্কারের অধীন ছিলেন। বিধাতা স্বয়ং কিনা এই প্রাচীন হিন্দুজাতীয় রাজপরিবারকে পূর্ব্ব অবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়া নব ইস্রেইল বংশে পরিণত করিবেন; তাই শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণকে নববিধান-প্রবর্ত্তক ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সুকন্যা শ্রীমতী সুনীতি দেবীর সহিত উদ্বাহবন্ধনে বদ্ধ হইবার জন্য স্বয়ং বঙ্গেশ্বর পর্য্যন্ত ঘটকালী করিলেন। এই কাহিনী যখন বিশদরূপে লিপিবদ্ধ হইবে, তখন ইহা বিধাতার বিশেষ লীলারূপে নিশ্চয়ই বর্ণিত হইবে।

কোথায় প্রাচীন কোচবিহারের শিব বংশ, আর কোথায় বঙ্গেশ্বর বল্লাল সেনের অংশ বংশ। আপাততঃ দেখিলে এবং হিন্দু সংস্কার গণনা করিলে, এই দুই বংশের কি কখনও মিলন হইবার সম্ভাবনা হইত? কিন্তু ভগবানের নিকট কিছুই অসম্ভব নাই; তাই তিনি স্বয়ং প্রজাপতি হইয়া, সকল বাধা বিঘ্ন, ধর্ম্মভেদ, মতভেদ, জাতিভেদ অনায়াসে উচ্ছেদ [illegible] শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ ও শ্রীমতী সুনীতি দেবীকে উদ্বাহবন্ধনে বাঁধিয়া দিলেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ টেরাই সমরে সৈনিকপদ-গ্রহণে যে

বীরত্ব প্রদর্শন করেন এবং বীরত্বের আরও কত কাহিনী যা শুনি, তাঁহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বীরত্ব তাঁহার এই উদ্বাহ-ক্রিয়া। তখন শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ কোচরাজবংশীয় রাজা, মাত্র বয়স ১৬ বৎসর, ইংরাজরাজের শিক্ষায় শিক্ষিত; কিন্তু মাতৃভক্তি এবং প্রাচীন হিন্দুর জাতীয় সংস্কার তাঁহার অন্তরতম প্রাণে নিহিত।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র উচ্চ বংশের হইলেও, বৈরাগ্য-ব্রত-গ্রহণ হেতু আর্থিক অবস্থায় নিতান্ত নিঃস্ব। তাঁহার কন্যাও তখনও অতি অল্পবয়স্কা বালিকা। খুব উচ্চ শিক্ষাতেও তখনও শিক্ষিতা হন নাই। তাই কেশবচন্দ্রই প্রথম তাঁহাকে রাজরাণী হইবার উপযুক্ত বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। তাহা ছাড়াও, রাজবংশের পূর্ব্বকাহিনী জানিয়া, আপন কন্যাকে সে বংশে বিবাহ দান করার পক্ষে কত অন্তরায়, সাধারণ মানব-বুদ্ধিতে ইহা অনায়াসেই উপলব্ধ হইতে পারে। তাহার পর উভয় পক্ষে বিরোধী দল যেরূপ ভয়ঙ্কর বিরোধানল প্রজ্বলিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহাও কাহারও অবিদিত নহে। সামান্য পার্থিব পারিবারিক ব্যাপার হইলে, এই বিবাহ কখনই সংসাধিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না; কিন্তু গবর্ণমেণ্টের কর্তৃপক্ষগণও আশ্চর্য্যরূপে ঈশ্বর-প্রেরণায়, কোচবিহার বংশের এবং রাজ্যের ভবিষ্যৎ মঙ্গলার্থে, এই বিবাহদানে একেবারে বদ্ধপরিকর হইলেন। কেশবচন্দ্রও নিজের পারিবারিক ভাব সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া, তিনি যে ঈশ্বরকর্তৃক দেশসংস্কারকের উচ্চ কর্ত্তব্যে ব্রত, যে কার্য্যে একটি দেশের ও জাতির উদ্ধার হইবে, তাহার সহায়তা করা তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ কার্য্য, ইহা উপলব্ধি করিয়া এবং তাহা প্রত্যক্ষ ঈশ্বরের আদেশ অনুভব করিয়া, কন্যাকে দান করিলেন। তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছার নিকট আপনার ইচ্ছা শুধু বলিদান দিলেন, তাহা নহে; দলের মায়া পর্য্যন্ত একমাত্র ঈশ্বরের কথায় ত্যাগ করিলেন।

শ্রীকেশব এ সম্বন্ধে বলেন—"If my conscience acquits me, none can convict me.......As a private man, I should not probably have acted as I have done. ...I have acted as a public man under the imperative call of public duty. All other considerations were subordinated to this sacred call, this Divine injunction.......I was an enchained victim before a strange and overpowering dispensation of the living Providence of God, I did not calculate consequences,......though I saw clearly that the contemplated step involved risks and hazards of a serious character, as the Raja was an independent Chief and might fall back upon evil customs prevalent in his territory, I trusted, I hoped with all my heart that the Lord would do what was best for me, my daughter and my country. Duty was mine, future consequences lay in the hands of God."

তিনি ঈশ্বর-সন্নিধানেও প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, "তুমি যখন বলিলে চাই, তখন আর কিছু শুনিলাম না; বিপদের মধ্যে অন্ধকারে সেই কন্যাকে ফেলিয়া দিলাম। তুমি যখন চাহিলে, বলিলে আমি বেহারে অমৃত ঢালিব, আমি বঙ্গদেশে দুই শাখার বিবাহ দিব, দুই প্রদেশ বদ্ধ করিব, কন্যা দাও, আমি দুই দেশের মিলন করিব; আমি নবরক্ত দিয়া নব ইস্রেল এই বেহারকে নির্ম্মল করিব; তুমি কাণে কাণে বলিলে, আর আমি মাথা দিলাম, দুঃখিনী কন্যা দিলাম। কিন্তু আমি একদিনের জন্য মনে করি নাই, সম্পদ মান ঐশ্বর্য্যের জন্য দিয়াছি। আমি তোমার অনুজ্ঞা পালন করিলাম। সুনীতির সঙ্গে সুনীতি, আলোক, পরিত্রাণ কোচবিহারে প্রবেশ করিবে।"

শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণও স্বাক্ষরে লিখিয়া দিলেন:—I believe in one true God and I am in my heart a theist." তিনি আরও লিখিলেন, "It has always been my opinion, that no man should take more than one wife. I can assure you that I hold that opinion still"

"আমি একমাত্র সত্য ঈশ্বরে বিশ্বাস করি এবং অন্তরে আমি একেশ্বরবাদী।" "আমার চিরদিন ইহাই মত যে, কোন ব্যক্তি একের অধিক দার পরিগ্রহ করিবেনা, এবং এখনও আমার সেই মত বদ্ধমূল রহিয়াছে।"

আবার যখন বিবাহ-চুক্তি বিরোধীদিগের ষড়যন্ত্রে ভাঙ্গিবার উপক্রম হইয়াছিল, সেই সন্ধিক্ষণে শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ যে অমানুষিক সাহসিকতা দেখাইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, "এই কন্যার সহিত বিবাহ না হইলে, আমি আর বিবাহই করিব না, এবং আমি কুচবিহার হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিব।"

কোচরাজবংশীয় ষোল বৎসরের বালকের পক্ষে এরূপ উচ্চ বিশ্বাসের প্রতিজ্ঞা-পত্র লিখিয়া দেওয়া এবং এরূপ দৃঢ় সংকল্প কি সামান্য সৎসাহসের পরিচয়? এই সৎসাহসের পরিচয়দান হইতেই, এই বংশ হইতে চিরদিনের তরে বহুবিবাহ উচ্ছেদ হইল এবং বহু-ঈশ্বরবাদী রাজ্যে একেশ্বরবিশ্বাসের পতাকা বিস্তৃত হইল। রাজ্যের রাজাকে যে সকল ধর্ম্মাবলম্বী প্রজার ধর্ম্মকেই রক্ষা করিতে হয়, নৃপেন্দ্রনারায়ণের সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের এই বিশ্বাস হইতেই ত নববিধানের নবালোক কেবল এই রাজ্য নয়, সমগ্র জগতে উদ্ভাসিত হইল।

নৃপেন্দ্রনারায়ণ যে বহুগুণে ভূষিত মহৎ ব্যক্তি ছিলেন, যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে তাহার সাক্ষ্য দান করিবেন। কিন্তু তাঁহার সকল গুণের পরিচয় অপেক্ষা, তিনি যে যথার্থই একজন ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষের ন্যায়, এই রাজ্যকে, এই দেশকে নবধর্ম্ম, সুনীতি এবং সুশিক্ষাদানে নববিধানের নবরাজ্যে

সমুন্নত করিতে আসিয়াছিলেন, ইহা সকলকেই মুক্ত-কণ্ঠে, স্বীকার করিতে হইবে।

যাঁহার সহযোগিতায় এবং সহধর্ম্মসাধনায় এই মহৎ ব্রত-সম্পাদনে শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাঁহার সেই সহধর্ম্মিণী সতী সুনীতি দেবীও আজ দেহমুক্ত হইয়া অমর-ধামে তাঁহারই সহিত মিলিত হইয়াছেন। যূথভ্রষ্ট চাতকিনীর ন্যায় এতাবৎ কাল যিনি নানা প্রকার শোক, তাপ, বিরহ, মনো-বেদনা সহ্য করিয়া, হা নাথ! হা নাথ! করিয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন, আজ তিনিও সকল শোক, তাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বামী, পুত্রগণ ও কন্যা সঙ্গে পুনর্মিলিত হইয়াছেন।

কোচবিহারের যাহা কিছু নবজাগরণ, তাহা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ও সুনীতির যুগলমিলনেরই ফল, ইহা কি আমরা আজ বিস্মৃত হইব? তাঁহাদের দেহাবস্থান কালে এই রাজ্যে যে নবাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল এবং যাহা আমাদের হয়ত নিজ অপরাধে আপাততঃ নিতান্ত হীনপ্রভ অনুভব করিতেছি, তাঁহাদের দিব্য আত্মার পুনরাগমন বিনা কেমন করিয়া সে অগ্নি চির প্রজ্বলিত থাকিবে? তাই, তাই আমরা তাঁহাদের আত্মার পুনরাগমন প্রার্থনা করিতেছি। জীবন্ত ঈশ্বরবক্ষে তাঁহারা অমর-জীবন প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া কি তাঁহারা এ কোচবিহার পরিহার করিয়াছেন? কখনই না।

বর্ত্তমান মহারাজা শ্রীজগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের মস্তকে বিধাতার অজস্র আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক। তিনি পিতা, পিতামহের পদা[illegible]সরণ করিয়া এবং তাঁহাদিগের দিব্য আত্মার স্বর্গীয় প্রভাবে প্রণোদিত হইয়া, এই রাজ্যে বিধাতার স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধন্য হউন, ইহাই সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি। শ্রীনৃপেন্দ্র-নারায়ণ ও দেবী সুনীতির আত্মা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করুন। মহারাজমাতা ও রাজপরিবার এবং অমাত্যবৃন্দ ও প্রজাবর্গের মস্তকেও স্বর্গের শান্তি বর্ষিত হউক।

---o---

যৌবনের স্বপ্ন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মুদিয়ালীতে ভক্ত শ্রীকুঞ্জবিহারী দেবের আশ্রম। তিনি এখানে একটী ব্রাহ্মসমাজগৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার প্রমত্ত কীর্ত্তনে বহুলোক আকৃষ্ট হইত। প্রেরিত অমৃতলাল বসু, ভাই ফকিরদাস রায় এখানে প্রায়ই যাতায়াত করিতেন। শ্রদ্ধেয় ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ইঁহাদিগের সহসাধক ছিলেন। ভাই অমৃতলালের অসাধারণ উৎসাহ, ভাই নন্দলালের ভাব ভোলা নৃত্য, সাধক কুঞ্জবিহারীর কীর্ত্তনের প্রমত্ততা, যখন একত্রে মিলিত হইত, তখন শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া গোপিনীগণ যেমন পাগল হইয়া ছুটিয়া যাইত, সেইরূপ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ইঁহাদের কীর্ত্তনে আকৃষ্ট হইতেন। একবার কুঞ্জবাবুর প্রমত্ত কীর্ত্তনের অগ্নিময় আবহাওয়ার ভিতর কমলকুটীরে শ্রীআচার্য্য-দেব নাচিতে নাচিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। উৎসবের সময় লোকে লোকারণ্য। সকলে বলিতে লাগিলেন, "কীর্ত্তন থামাও থামাও", আচার্য্য অজ্ঞান হইয়া গিয়াছেন। তখন কুঞ্জবাবুও কীর্ত্তন উন্মত্ত চৈতন্যরহিত। তিনি বলিলেন, "নামে বাঁচলেও ভাল, মলেও ভাল"; এই বলে দ্বিগুণ উৎসাহে মাতিয়া উঠিলেন। আচার্য্যদেব উঠিয়া কুঞ্জবাবুর গলা ধরিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। সে স্বর্গের দৃশ্য যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বলিয়াছেন যে, বঙ্গে আবার গৌরাঙ্গের পুনরাবির্ভাব!

ছাত্রদের নৈতিক উন্নতির জন্য কুঞ্জবাবু একটী "সুনীতি-সঞ্চারিণী সভা" প্রতিষ্ঠা করেন। সভাপ্রতিষ্ঠার দিন ভাই নগেন্দ্রনাথ কলিকাতা হইতে আসিয়া বক্তৃতা করেন। ২০।২৫ জন ছাত্র ইহাতে যোগ দিয়াছিল; কিন্তু অকালে ইহার আয়ু শেষ হইল। কয়েকটী ছাত্র লইয়া একটী প্রার্থনা-সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রার্থনা-সভার ভার আমার উপর অর্পিত হয়। প্রতি সন্ধ্যার সময় আমাদের প্রার্থনা আরম্ভ হইত, রাত্রি ১২টা।১টা পর্য্যন্ত আলোচনা চলিত। আমরা যেন পাগল হইয়া গেলাম। পড়া শুনা সব ঘুচিয়া গেল। কোন দিন নির্জ্জন গঙ্গার ধারে, কোন দিন নির্জ্জন প্রান্তরে, কোন দিন পত্রপুষ্প-শোভিত উদ্যানে উপাসনার পর বক্তৃতা হইত। সে বক্তৃতায় কি ভাবের উচ্ছ্বাস, কি প্রগল্‌ভা উন্মাদনা, কি অনর্গল ভাষার প্রবাহ! এখনও স্মরণ করিলে সত্য সত্যই আশ্চর্য্য হইতে হয়। এ সময় ভাই নগেন্দ্রচন্দ্রের সহিত আমার যে সব চিঠিপত্রের আদান প্রদান হয়, তাহা গভীর ধর্ম্মভাবপূর্ণ। চিঠিগুলি বহু যত্নে রক্ষা করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন তাহা আর পাওয়া যাইতেছে না। আমাদের বাল্যের খেলাঘর কেমন সত্যিকার সৌধ অট্টালিকায় পরিণত হইল, এখন ভাবিয়া অবাক হইয়া যাই! ধূলার খেলাঘর নির্ম্মাণ করিতে গিয়া, তাহার ভিতর অজস্র রত্ন কুড়াইয়া পাইলাম।

আমি সম্মুখে ভবিষ্যতের একটী উজ্জ্বল চিত্র সর্ব্বদাই দেখিতে পাইতাম—একটা স্বপ্নের ঘোর আমার চিন্তা, বাক্য, কর্ম্ম, উপাসনা, লোকজনের সহিত দৈনন্দিন আচার ব্যবহারকে পর্য্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করিত। আমার ভাবজীবনে অন্তরের স্মৃতি বাস্তব জীবনের অন্তস্তলে যাহা অল্প স্বল্প দাগ রাখিয়া গিয়াছে, তাহারই দুই একটী কথা বলিতে আজ আনন্দ অনুভব করিতেছি। কলি-কাতায় আসিয়া আরো কয়েকটী বিশেষ ধর্ম্মবন্ধু প্রাপ্ত হইলাম; তাঁহাদের মধ্যে ভবানীবাবু (পরে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়), গিরীন্দ্র-নাথ গুপ্ত ও শশিভূষণ বসুর (পরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক) নাম উল্লেখ-যোগ্য। ইঁহাদের [illegible] উৎসাহ ও সুচরিত্র আমার ধর্ম্মপথের অনুকূল হইয়াছে।

যখন সঙ্গীতপ্রচারক স্বর্গীয় ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয়

"জয় ঈশা, মুষা, মহম্মদ, শাক্য, গৌর সুন্দর" গানটী প্রথম রচনা করেন, তখন আমরা ৫।৬টী বন্ধু মিলিয়া কলিকাতার পাড়ায় পাড়ায় গানটী গাহিয়া বেড়াইতাম। ভদ্রমহিলাগণ আমাদের গৃহ-প্রাঙ্গণে ডাকিয়া লইয়া এই গানটী শ্রবণ করিতেন। সকল সাধু মহাপুরুষের নাম ইহাতে সন্নিবিষ্ট আছে শুনিয়া, ভক্তিভরে তাঁহারা প্রণাম করিতেন এবং আমাদের অজস্র আশীর্ব্বাদ করিতেন। আমরা মধ্যে মধ্যে রামকৃষ্ণপুর, সালকিয়া, শিবপুর প্রভৃতি স্থানে গমন করিতাম। এক একদিন এই গানটী শুনিবার জন্য চারপাঁচশত লোকের সমাগম হইত। গানের পর প্রার্থনা করিতাম, এই চারপাঁচশত লোক আমাদের প্রার্থনার ভক্তির সহিত যোগদান করিত এবং প্রার্থনার শেষে যখন আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতাম, তখন সকলেই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিত। সে স্বর্গের দৃশ্য দেখিয়া আমরা অবাক হইয়া যাইতাম। ছোট ছোট বালক ও অল্পবয়স্ক যুবকদের লইয়া তিনি কি অসম্ভব সম্ভব করিতে পারেন, আমরা হাতে হাতে তাহার পরিচয় পাইতাম। কলিকাতার পাড়ায় পাড়ায় এবং স্কুল কলেজের ছাত্রদের ভিতর এই গানটীর প্রচার এতো অধিক হইয়াছিল যে, আমরা যখন সন্ধ্যাকালে গোলদীঘিতে বেড়াইতে যাইতাম, তাহারা কথাবার্ত্তা কহিত যে, "ভাই আর একদল ধর্ম্মসম্প্রদায় বাহির হইয়াছে যে, তাহারা সকলের দেবতাদের ভক্তি করে, সকল মহাপুরুষদের সম্পর্কে গান করে।" আমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টা যে কার্য্যে পরিণত হইয়েছে, স্কুল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে যে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, দেখিয়া আমরা আনন্দে পূর্ণ হইতাম।

একদিন আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে, যেখানে রাজর্ষি রাজা রামমোহন রায়ের পৌত্র হরিমোহন রায়ের দোকান ছিল, সেই স্থানে আমরা প্রাতঃকালে প্রমত্তভাবে গান করিতেছি, আর ভক্তিভাজন প্রতাপবাবু মহাশয় প্রাতর্ভ্রমণ করিয়া গৃহে ফিরিতেছেন, আমাদের গান শুনিয়া তিনি তৃপ্ত হইলেন; কিন্তু আমাদের চিনিতে পারিলেন না। সে দিন ছিল রবিবার, উপাসনার পরে নগেন্দ্রবাবুকে বলিতেছিলেন যে, "দেখ, কয়েকটী ছেলে গৈরিক পরিধান করে আমাদেরই গান করিতেছে, আমার খুব ভাল লাগিল।" নগেন্দ্রবাবু বলিলেন যে, "তাহারা আমাদেরই, কামাখ্যানাথই সকল ছেলেদের লইয়া প্রতি প্রত্যূষে গান করিয়া বেড়ায়"। তিনি শুনিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। এই ঘটনা হইতে ঋষি প্রতাপচন্দ্রের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা বর্দ্ধিত হইল। পর জীবনে আমি তাঁহাকেই আদর্শ করিয়া চলিয়াছি। উপাসনার জন্য আমি তাঁহার নিকট অশেষ ঋণী। তাঁহার ভাবপূর্ণ উপাসনা, ভাবের অবিচ্ছিন্ন আবেগ ও উন্মাদনা, ভাষার ঐশ্বর্য্যময় অলঙ্কার [illegible] প্রাণকে কোন্ অজানিত লোকে লইয়া যাইত! তাঁহারই উপাসনার আদর্শে আমার উপাসনা গঠিত, মার্জ্জিত, পুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। এখনও সেই জীবন্তভাবের স্পর্শ আমাকে উপাসনার পথে পরিচালিত করে।

আজ একটী বিশেষ ঘটনা আমার স্মরণ হইতেছে। প্রথম যখন হাওড়ার পুল নির্ম্মিত হয়, তখন যাত্রীদের নিকট হইতে একটী করিয়া পয়সা পারানি লওয়া হইত। একদিন ইচ্ছা হইল, কলিকাতার বাহিরে প্রচার করিতে যাই। দুটী পয়সা মাত্র আমার সম্বল ছিল, একটী পয়সা দিয়া পুল পার হইয়া, বোধ হয়, ১০।১২ মাইল দূরে মাকড়দহ নামক একগ্রামে গেলাম। পূর্ণিমার রাত্রি—শুভ্র চাঁদের আলো গ্রামের নিবিড় গাছপালা ভেদ করিয়া সংকীর্ণ পথকে আলোকিত করিয়াছে, সেই পথ দিয়া গ্রামে পৌঁছিলাম। রাত্রিতে করতাল যোগে দ্বারে দ্বারে হরিনাম গান করিতে লাগিলাম। সুর নাই, তাল নাই গানের; ভাবের উচ্ছ্বাস—প্রাণের উৎসাহ—হৃদয়ের ঐকান্তিকতা বেসুরা বেতালা গানের সঙ্গে মিলিয়া একটা নূতন প্রাণ মাতান সুর সৃষ্টি করিল। নিজে প্রমত্ত হইলাম। আমার বেতালা প্রমত্ততা অনেকের আকর্ষণের বস্তু হইল। অনেক আবালবৃদ্ধবনিতা বেশ একাগ্রতার সহিত গান শুনিতে লাগিল। ইহাই আমার নিকট খুব আশ্চর্য্যের বিষয় হইল। এখনও সে কথা মনে করিলে, আমি অবাক হইয়া যাই। এইরূপ প্রমত্ততার সহিত রাত্রি দশটা কি এগারটা পর্য্যন্ত গান গাহিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে। একটী দোকানে গিয়া এক পয়সার গজা খাইয়া এক ঘটী জল খাইলাম। এই পয়সাটীই আমার শেষ সম্বল। দোকানদারকে বলিলাম যে, বাপু, তোমার দোকানে কি আমাকে একটু শোবার জায়গা দিবে? সে [illegible] যে, গ্রামের ভিতর যান, কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে স্থান পাইবেন।" আমি বলিলাম যে, দেখ, এখানকার জমীদার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের জ্ঞাতি ও বিশেষ পরিচিত; তবে আমি সেখানে যাইব না। তুমি যদি স্থান না দাও, তবে তোমার সম্মুখে বৃক্ষতলে রাত্রি কাটাইব, এই বলিয়া আমি বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। কি জানি, তাহার মনে কেমন দয়ার সঞ্চার হইল; অবশেষে তাহার বিছানা পত্র যাহা ছিল, তাহা দিয়া আমাকে যত্নের সহিত শোয়াইল, আর নিজে বিনা বিছানায় নিদ্রা গেল। আমি আশ্চর্য্য হইলাম। এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে ব্যক্তি একটু স্থান দিতে সঙ্কুচিত হইতেছিল, পরমুহূর্ত্তে সেই ব্যক্তি আত্মীয়ের ন্যায় আদর ও যত্নে আমাকে আপ্যায়িত করিল। যে অসহায় ও কাঙ্গাল, ভগবান্ তাহার বন্ধু, এই সত্যটী আমার মর্ম্মে মর্ম্মে স্পর্শ করিল।

পরদিন প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিয়া, দোকানদারকে ধন্যবাদ দিয়া, ঐ গ্রামের হেডমাষ্টারের বাড়ীতে গেলাম। তাঁহার সহিত আমার পূর্ব্বে পরিচয় ছিল না। আমি বলিলাম যে, আপনাদের গ্রামে ধর্ম্ম-বিষয়ে একটী বক্তৃতা করিতে চাই; আপনার স্কুল গৃহটী যদি ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে উপকৃত হইব। হেড মাষ্টার বলিলেন, আপনি কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত? আমি বলিলাম,

আমি কেশবচন্দ্রের লোক। কেশবচন্দ্রের লোক শুনিয়া বেশ শ্রদ্ধা করিলেন। আমাকে বলিলেন, অনেকে কেশবচন্দ্রের উপাসনা শুনিয়া টাট্টা বিদ্রূপ করিত, আমিও একদিন বিদ্রূপ করিবার ছলে মন্দিরে গেলাম। মহাশয়, সে যে কি শুনিলাম, তাহা আর কি বলিব! যেন মুখে সরস্বতী অবতীর্ণ হইয়াছে—মুখ হইতে বেদ বেদান্ত সব বাহির হইতেছে; আমি বুঝিয়াছি যে, তিনি নিশ্চয়ই একজন মহাপুরুষ। তাঁহার স্কুলে বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সে দিন শনিবার, ১॥টার সময় ছুটীর পর বক্তৃতা হইবে। অন্যান্য গ্রামে নিমন্ত্রণপত্র দিয়া, প্রায় ৪।৫শত লোকের বসিবার স্থান করিয়া দেন। পূর্ব্বদিন রাত্রিতে কেবল এক পয়সার গজা খাইয়া ছিলাম, সুতরাং বেলা দ্বিপ্রহরের সময় খুব ক্ষুধার উদ্রেক হইল। ১-১৫মিঃ সময় স্কুলে আসিলাম, হেডপণ্ডিত মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি ভাত খাইয়াছেন? আমি বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, আপনার জন্য গরম ভাত রাঁধা হইয়াছে, আমার বাড়ীতে চলুন, এখনও পনের মিনিট সময় আছে। আমি ত অবাক! তাঁহার সঙ্গে আমার পূর্ব্বে কখন পরিচয়ও ছিল না। কে আমার ক্ষুধা-নিবারণের জন্য এরূপ আশ্চর্য্য ভাবে আহারের ব্যবস্থা করিল! ভগবান্, একি তোমার সাক্ষাৎ পরিচয় নয়? তুমি এইরূপেই আমাদের নিকট আত্মপরিচয় দিয়া চিরদিনের জন্য বাঁধিয়া রাখ। সভার তিন চারিটী গ্রাম হইতে প্রায় পাঁচশত লোকের সমাবেশ হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে আমি আর কখন এরূপ বৃহৎ সভায় ধর্ম্মবিষয়ে বক্তৃতা করি নাই।

শ্রীকেশবচন্দ্রের প্রতি হেড মাষ্টার মহাশয়ের প্রগাঢ় শ্রদ্ধার পরিচয় পাইয়া, আমি "শ্রীকেশবের ধর্ম্ম ও সাধন" বিষয়ে বক্তৃতা দিলাম। বক্তৃতা খুব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল; যখন তাঁহার ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মশ্রবণের কথা বলিতেছিলাম, তখন শ্রোতৃবর্গের মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল—অনেকের চক্ষু দিয়া অশ্রুজল প্রবাহিত হইল—অনেকে মুহুর্মুহু 'হরিবোল হরিবোল' করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল—সভা যেন অগ্নিময় হইয়া গেল। প্রায় তিন ঘণ্টা কাল বক্তৃতা হইয়াছিল। বক্তৃতার পর শরীর অবসন্ন—পূর্ব্বদিনের অতিরিক্ত শ্রমে দেহ চলচ্ছক্তি-রহিত; সেই দিন রাত্রিতেই কলিকাতায় ফিরিবার কথা। হাতে পয়সা নাই, চলিবারও শক্তি নাই, কি করিয়া আসিব এই চিন্তা করিতেছি; এমন সময় দেখি যে, সেখানকার ভদ্রমহোদয়গণ আমার জন্য একখানি গাড়ী আনিয়া উপস্থিত। আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম। যাহার ক্ষুধার অন্ন নাই, তুমি তাহার মুখে অন্ন দাও—যাহার চলিবার শক্তি নাই, তাহার জন্য তুমি যান বাহনের ব্যবস্থা কর! ইহা অপেক্ষা তোমার লীলার সাক্ষাৎ নিদর্শন আর কি পাইব! একটী কাণাকড়ি লইয়া তোমার নামে যে ঘরের বাহির হয়, তুমি তাহাকে লক্ষটাকার মালিক কর, তাহার কোন অভাব তুমি রাখ না। এই ক্ষুদ্র ঘটনার ভিতর দিয়া তুমি এই মহা সত্য আমাকে শিক্ষা দান করিলে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—•—

উপাসনাশিক্ষা।

(২০শে আগষ্ট, ১৯৩৩, ৪ঠা ভাদ্র, ভবানীপুর ব্রাহ্মসম্মিলন-সমাজে ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে নিবেদনের সার মর্ম্ম)

বন্ধুগণ! আমি যে পরিবারে জন্ম গ্রহণ করি, সে পরিবারের ধর্ম্মভাব, নিষ্ঠা আমার ধর্ম্মভাবকে বাল্যকালেই জাগ্রত করিল। পূজা, পাঠ, ব্রতপালন, উপবাস পরিবারের প্রত্যেকেই সাধন করিতেন; বিশেষতঃ মাতৃদেবীর একনিষ্ঠ সাধনা—প্রত্যুষে উঠিয়া নিয়মিতরূপে এক প্রহর কাল পূজাহ্নিক বিষয়ের সহিত দর্শন করিতাম। ঠাকুর ঘরে বসিয়া ত্রিসন্ধ্যা ও প্রণব মন্ত্র জপ করা পরিবারের প্রচলিত প্রথা। এই সময় যুগধর্ম্মের প্রবল ঝটিকা আকাশে বহিতে লাগিল, সেই আঘাতে আমার প্রাচীন বিশ্বাস চঞ্চল হইয়া উঠিল। ধর্ম্ম বুঝি আর না বুঝি, নির্জ্জনে বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক ও গায়ত্রী জপ করিয়া মনে শান্তি পাইতাম; মন শান্ত ও সংযত হইত। ক্রমে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলাম; উপাসনায় যোগ দিলাম। উপাসনার বহু কথা শুনিতাম, সকল কথা মনে রাখিতে পারিতাম না—বহু ভাবের বিকাশ অনুভব করিতাম, ভাব ধরিয়া রাখিতে পারিতাম না। এ সকল উপাসনার অন্তরায় হইল। তারপর আমি নির্জ্জনে বসিয়া একাকী পূজা করিয়াছি, বহুলোকের সহিত বসিয়া মন স্থির হইত না। আমিও দেখা দেখি চক্ষু মুদ্রিত করিতাম, কিন্তু আমার মন চক্ষুর আবরণ ভেদ করিয়া আকাশ পাতালে বিচরণ করিত। ইহাও আমার উপাসনার বিশেষ অন্তরায় হইল।

উপাসনা শুষ্ক বোধ হইত—রসবোধ হইত না—উপাসনা মর্ম্মকে স্পর্শ করিত না। উপাসনা পরিত্যাগ করিলাম। যদি মধ্যে মধ্যে বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধ অথবা ইচ্ছায় প্রকাশ্য উপাসনায় যোগ দিতাম, তাহা আমার পক্ষে ভীষ্মের শরশয্যা বলিয়া মনে হইত। উপাসনা পরিত্যাগ করিলাম। প্রাচীন সাধনার উপরও আস্থা-শূন্য—এখন কি করি। আমার প্রাচীন বন্ধু নির্জ্জনতার শরণাপন্ন হইলাম। বলিলাম, হে নির্জ্জনতা, তুমি একবার কাছে এস—তোমার শান্তিময় সঙ্গ দান কর। একটী নির্জ্জন স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। কাশিমিত্রের শ্মশান ঘাটের উত্তরদিকে গঙ্গার ধারে একটি নির্জ্জন স্থান পাইলাম, সন্ধ্যার পর যেখানে কোন গোলযোগ থাকিত না। [illegible] সন্ধ্যায় সেখানে গিয়া বসিতাম। কোন কথা বলিতাম না, কোন মন্ত্র জপ করিতাম না—উপাসনাও করিতাম না, সাধ্য মত কোন

চিন্তাকে মনে ঠাঁই দিতাম না। কেবল লক্ষ্যহীন শূন্য মন লইয়া বসিয়া থাকিতাম—শূন্য মন লইয়া গৃহে ফিরিতাম। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস এইরূপে কাটিয়া গেল। সর্ব্বদাই মনের ভিতর যেন সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিত।

মানুষ কতদিন শূন্য মন লইয়া বাস করিতে পারে? প্রকৃতির বিধান শূন্যকে পূর্ণ করা। প্রকৃতি আমার সহায় হইল; কখন শান্তসলিলা ভাগীরথীর কলকলধ্বনি আমার চিত্তকে আকৃষ্ট করিত—কখন অনন্ত আকাশের অসীম ব্যাপ্তি আমাকে মুগ্ধ করিত—কখন হীরকখচিত নভোমণ্ডলের শোভা ও সৌন্দর্য্য আমার চিত্তকে হরণ করিত—কখন জ্যোৎস্নাপ্লাবিত শরতের চন্দ্র-সুধা বিস্ময়-বিহ্বল-নেত্রে পান করিতাম—কখন কোলাহলশূন্য নিস্তব্ধ নিথর রাত্রির গাম্ভীর্য্য আমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিত। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এইরূপ কাটিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে এক ব্যাপ্তিময়ী সত্তার অনুভূতি মনে জাগিয়া উঠিল। আকাশ, পৃথিবী, চন্দ্র তারকা, জীব জন্তু, লতা পল্লব সকলেই যেন সেই সত্তার মধ্যে ডুবিয়াছে—সেই সত্তাই যেন সকলকে সত্তাবান্ করিয়াছে। সেই বিরাট বিশাল সত্তার স্পর্শানুভূতিই আমার ধর্ম্ম-জীবনের প্রথম পরিচয়।

প্রকৃতির সহিত আমার সম্বন্ধ নিগূঢ়তর ও ঘনিষ্ঠতর হইতে লাগিল—জলের মধ্যে জলের আত্মাকে দর্শন করিলাম—আকাশের মধ্যে আকাশের আত্মাকে দর্শন করিলাম—তারকামণ্ডিত নভোমণ্ডলে তাহার আত্মার স্পর্শ পাইলাম—নিস্তব্ধ নিশীথে তাহার গাম্ভীর্য্যময় আত্মার অনুভূতি লাভ করিলাম। আমি ভাব-যোগে তাহাদের সহিত একাকার হইয়া যাইতাম। যতই যোগ ঘনিষ্ঠ হইতে লাগিল, ততই ভাবের আদান প্রদান চলিতে লাগিল—ক্রমে ক্রমে তাহাদের বাণী শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। পবিত্র ভাগীরথীর নির্ব্বাক ধ্বনি কাণ পাতিয়া শুনিতাম। নক্ষত্রলোক হইতে সংবাদ আসিত—চন্দ্রলোক হইতে সাড়া পাওয়া যাইত। প্রকৃতি আমার বন্ধু হইল—সুখ দুঃখের কথা—অভাব অভিযোগের কথা—জীবন মরণের প্রশ্ন প্রাণ খুলিয়া তাহাদেরই বলিতাম। ভাবের আদান প্রদানের মধ্য দিয়া ভাব ক্রমে ঘনতর ও মিষ্টতর হইতে লাগিল। ভাব ভাষাকে জন্ম দেয়, ভাবের পূর্ণতা হইতে আমার মুখে কথা ফুটিল। যে অনাহত ও অখণ্ড সত্তার সহিত আমার প্রথম পরিচয়, সেই অনাহত সত্তাই আহত হইয়া রূপময়, গন্ধময়, শোভা-সৌন্দর্য্যময়, গম্ভীর ও মহিমাময় প্রকৃতিকে জন্মদান করিয়াছে—সেই অনাহত সত্তাই আহত হইয়া জীবনের এক এক অবস্থায় এক এক রূপে মূর্ত্ত হইয়া উঠিল।

[illegible] অনাহত শব্দ, সেই শব্দই আহত হইয়া সৃষ্টিকে শব্দ দান করিল। পৃথিবীতে এমন কোন্ পদার্থ আছে, যাহার শব্দ নাই, যাহার ভাষা নাই? অণু পরমাণুর ভাষা আছে—ফুটন্ত ফুলের ভাষা আছে—আকাশ পাহাড়ের ভাষা আছে—লতা পল্লবের ভাষা আছে—জীব জন্তুর ভাষা আছে—মানুষের ভাষা আছে। যিনি সকলকে ভাষা দিলেন, তিনি কি নির্ভাষী? আমরা প্রকৃতির ভাষা বুঝি না—বুঝিবার চেষ্টাও করি না—পশু পক্ষীর ভাষা বুঝি না, বুঝিবার চেষ্টাও করি না এবং মানুষেরও ভাষা বুঝি না। যে প্রাণের উদ্বোধন হইলে একজনের মর্ম্মকথা অন্যে বুঝিতে পারে, সেই প্রাণের প্রেরণায় মানুষ প্রকৃতির নির্ব্বাক ভাষা ও পশু পক্ষীর শব্দময় ও সচিৎকার ভাষা বুঝিতে পারে এবং সেই প্রাণের জাগরণেই মানুষ ব্রহ্মবাণী শুনিতে পায়। সত্তার জীবন্ত অনুভূতি, সত্তার বাণীময় প্রকাশ, সত্তার অনন্ত ব্যাপ্তির পরিচয় হৃদয়ে 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং' এই তিনটি বীজমন্ত্র দান করিল; এই অনুভূতিই আমার আরাধনাকে রূপ দান করিল। নিজের উপার্জ্জিত একটী কাণা কড়ি অন্যের উপার্জ্জিত লক্ষ টাকা অপেক্ষা মূল্যবান্।

এই সময়ে আমি ঋষি প্রতাপচন্দ্রের উপাসনায় মধ্যে মধ্যে যোগ দিতাম। সত্যের অনুভূতি বা ভাবের স্পর্শ আমার নিকট যাহা অস্পষ্ট বা আলো ছায়া মিশ্রিত হইয়া আসিত, উপাসনায় যোগ দিয়া তাহা পরিস্ফুরণ হইত, ভাবের প্রসারণ হইত ও সত্যের স্পষ্ট উপলব্ধি হইত। কিন্তু যে সকল সত্যের অনুভূতি বা ভাবের স্পর্শ নিজের অন্তরে বিন্দুমাত্র বিকাশ হইত না, সে সকল সত্য ধরিতে পারিতাম না। অন্নরসজ্ঞ সঙ্গীতকার সুগায়কের গান শুনিয়া তাহার ভিতর তান লয়ের স্পষ্ট উপলব্ধি যেমন জাগিয়া উঠে, কিন্তু রসহীন অন্তরে [illegible] দাগ পড়ে না, সেইরূপ অস্পষ্ট অনুভূতি ও ক্ষীণ ভাবের স[illegible] হইলে, সাধকের সত্যের সুস্পষ্ট উপলব্ধি ও পূর্ণভাবের স্পর্শ পাইয়া অনুভূতি স্পষ্ট হয় ও বিকশিত হয়। যেখানে অনুভূতি ও ভাবের কোন চিহ্ন দেখা যায় না, সেখানে উচ্চ স্তরের সাধনায় যোগ দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

কর্ম্মসূত্রে বাঁকিপুরে যাত্রা করিলাম। বাঁকিপুর (এক্ষণে পাটনা) নির্ব্বাণ-ধর্ম্মের আদিগুরু শ্রীবুদ্ধদেবের বিহারভূমি। পাটলিপুত্রের অজস্র ধূলিকণা এখনও স্বর্গের স্বর্ণরেণু হইয়া সাধকের নূতন ভাগবতী তনু সৃষ্টি করিতেছে, সিদ্ধার্থের অমর জীবন এখনও মৈত্রীর অমৃতময় স্পর্শ দিয়া কত নব নব প্রেম-পরিবার গঠন করিতেছে। এখানে সাধু প্রকাশচন্দ্রের তপোভূমি। নূতন প্রেমপরিবার গঠনই তাঁহার তপস্যার মহাসিদ্ধি। আমি এই পরিবারে স্থান লাভ করিলাম। প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে এই মহাতীর্থের মন্দাকিনীপ্রবাহে অবগাহন করিয়া পূজার অর্ঘ্য লইয়া আশ্রমবাসীরা সমবেত হইতেন—যে অর্ঘ্য পুষ্প চন্দন অপেক্ষা পবিত্র। মহাসংকল্পের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়া তাহাতে কামকে ভস্মীভূত করা হইত; পবিত্র ভাগবতী তনু ধারণ করিয়া মৈত্রীর সাক্ষাৎ প্রেরণা ও "জীবে দয়া" সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিবার জন্য সাধু প্রতিদিন দ্বার ভিক্ষা করিতেন। এই আশ্রম "অঘোর-

পরিবার" নামে প্রসিদ্ধ। সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, জীবনে মরণে রক্তের সম্পর্ক অপেক্ষা ধর্ম্মের সম্বন্ধ যে ঘনিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ, আশ্রমবাসীদের প্রতিদিন তাহার পরীক্ষা করা হইত; পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পরিবারে স্থান পাওয়া যাইত।

এখানে আসিয়া জীবনের নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। সত্যের অনুভূতি ও ভাবের উচ্ছ্বাস যে কেবল একমাত্র সাধনা নয়, সাধুর জীবনের স্পর্শ পাইয়া তাহা বুঝিলাম। রোগে শোকে আর্ত্ত নরনারীর জন্য আপনাকে যে তিলে তিলে বলিদান করিতে হয়, তাহার পরিচয় পাইলাম। মানব-প্রেমের অগ্নি-পরীক্ষায় শরীর মনকে দগ্ধ করিয়া নূতন জন্ম গ্রহণ করিতে না পারিলে—নূতন আত্মিক দেহের সৌরভে প্রাণকে পূর্ণ করিতে না পারিলে, ভগবৎ-প্রেমের অনুভূতি প্রাণকে স্পর্শ করে না, প্রেমস্বরূপ শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হয় না। সাধু প্রকাশচন্দ্রের "পরিবার-সাধনার" ভিতর দিয়া আমার মধ্যে প্রেমরূপের আরাধনার অগ্নিময় মন্ত্র ফুটিয়া উঠিল—প্রেমের আরাধনা শ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় সরল ও সহজ হইল! গঙ্গাজলে স্নান করিয়া শরীর যেমন শীতল হয়, উপাসনার অশ্রুজলে স্নান করিয়া প্রতিদিন মন স্নিগ্ধ হইতে লাগিল—নূতন শ্রীসম্পদে আত্মা রূপান্তরিত হইল।

গাজীপুর গোলাপের জন্য প্রসিদ্ধ। গোলাপের নয়নতৃপ্তিকর সুন্দরবর্ণ ও মিষ্ট সৌরভে গাজীপুরের আকাশ বাতাস পরিপূর্ণ। গাজীপুরে সিদ্ধপুরুষ শ্রীনিত্যগোপালের আশ্রম। তাঁহার বর্ণ যেমন গোলাপের ন্যায় সুন্দর ও মনোরম, তাঁহার চরিত্র তদ্রূপ গোলাপের সৌরভ অপেক্ষা মিষ্ট ও পবিত্র। তাঁহার উপাসনায় ইষ্টমন্ত্র "শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধং"; তাঁহার উপাসনায় শুদ্ধতার সৌরভ ঠিক আতর গোলাপের মত উপাসকদিগের শরীর মনকে স্নিগ্ধ ও পবিত্র করিত, তাঁহার বাক্য সাধকের মনে শুদ্ধতার একখানি মনোরম পট অঙ্কিত করিয়া দিত—তাঁহার আচার ব্যবহার চিন্তা বাক্য ও কর্ম্ম মলয়পবনের মত গৃহের চারিদিকে পবিত্রতার শুদ্ধ আবহাওয়া সঞ্চালিত করিত। বিধাতা যথাসময়ে আমাকে এই আশ্রমে আশ্রয় দান করিলেন। তাঁহার পবিত্র চরিত্রের মধুর ধারা আমার শরীর মনকে সিক্ত করিল। শুদ্ধস্বরূপ শ্রীভগবান্ অন্তরাত্মায় মূর্ত্ত হইয়া উঠিলেন। সাধুতার আবির্ভাবে তাঁহার পূজার বেদীতে মন সহজেই নত হইয়া পড়িত। "শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধং" মন্ত্র আমার বীজমন্ত্র হইল। ক্রমাগত দুই বৎসর কাল "শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধং" এই মন্ত্রের উপাসক হইলাম। দুই বৎসর ক্রমাগত এই মন্ত্রই জপ করিতাম। "শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধং" এর সোনালি রংএ আমার প্রতিদিনের উপাসনা রঞ্জিত হইয়া উঠিত, আমার নাসারন্ধ্র দিয়া শুদ্ধতার তপ্ত বায়ু প্রতিক্ষণে নিঃসৃত হইত। সাধুর সাধুতাকে আশ্রয় করিয়া, অনন্ত সাধুতার আকর শ্রীভগবানের পুণ্যস্বরূপ অন্তরে রূপ গ্রহণ করিল।

গাজীপুরে পুণ্যশ্লোক পাওহারী বাবার পুণ্যাশ্রম। তাঁহার সাধনতত্ত্ব ও জীবন এক অপার্থিব পদার্থ। এক একটী সাধু স্বর্গের এক একটী অপূর্ব্ব রত্ন হইয়া পৃথিবীকে ঐশ্বর্য্যশালী করেন। তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণাকে মন্ত্রবলে জয় করিয়াছিলেন। প্রথমে প্রতিদিন এক পোয়া করিয়া দুগ্ধ পান করিতেন, তারপর মধ্যে মধ্যে কিছু পান করিতেন, পরে তিনটি বিল্বপত্র আহার করিতেন, অবশেষে কেবল বায়ুভক্ষণ করিয়া যোগ সমাধিতে জীবন কাটাইতেন। তাঁহার আশ্রমে সাধু নিত্যগোপালের সহিত গমন করিতাম। তিনি সচ্চিদানন্দের উপাসক। রোগে আনন্দ—শোকে আনন্দ—দুঃখে আনন্দ—সংকটে আনন্দ! নিঃসঙ্গ হইয়া সচ্চিদানন্দের সঙ্গে সুখে কাল কাটাইতেন। স্বহস্ত-নির্ম্মিত একটি গহ্বর বা গুহা ছিল তাঁহার যোগভূমি—যে যোগের বিরহ নাই, বিচ্ছেদ নাই, বিরাম নাই—যোগের পর মহাযোগ, সমাধির পর মহাসমাধিতে সাধু নিমগ্ন! মধ্যে মধ্যে দর্শনার্থী হইয়া কেহ গমন করিলে গুহার মধ্যে বসিয়া কথা কহিতেন—সে কথা যেন কোন জ্যোতির্ম্ময় লোক হইতে সুধা রূপে ঝরিয়া পড়িত। অন্তিমকালে পীড়াবশতঃ সাধনার ব্যাঘাত হইত, যোগানন্দের বিচ্ছেদ ঘটিত, বেদনা সাধুর অসহ্য হইত; সেজন্য একদিন হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া রুগ্ন শরীরকে হোমে উৎসর্গ করিলেন, ঘৃত ও সিন্দুর সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে বসিলেন, মুখে "আনন্দম্ আনন্দম্" বলিতে বলিতে তিলার্দ্ধ ক্ষণে দেহ ভস্মে পরিণত হইল! মহানন্দে আত্মা স্বর্গধামে চলিয়া গেল। এই মহাজীবনে মহানন্দের স্পর্শ পাইলাম। আনন্দস্বরূপের উপাসনা করিতে শিখিলাম। প্রথম জীবনে যেমন প্রকৃতি সহায় হইল, মধ্য জীবনে সাধুদিগের সুচরিত্রের স্পর্শ অন্তরে আরাধনার মন্ত্র প্রেম, পুণ্য ও আনন্দের জ্যোতির্ম্ময় রূপ ফুটিয়া উঠিল। যে যাহা চায়, শ্রীভগবান্ তাহাকেই তাহা দান করেন। "ডাকের মত ডাকলে পরে আর কি হরি থাকতে পারে, দয়াময় নামে তিনি পরিচিত এ সংসারে।" এই বাক্য ভগবান্ সাধকের জীবনে সার্থক করেন। উপাসনা শিক্ষণীয় বস্তু, জ্ঞানোপার্জ্জনের ন্যায় উপাসনা অর্জ্জন করিতে হয়। উপাসনা সত্যের অনুভূতি, উপাসনা কথা নয়, এই সত্য জীবনে লাভ করিলাম। সবাক উপাসনা অপেক্ষা নির্ব্বাক উপাসনাই শ্রেষ্ঠ।

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—০—

নববিধানের দুর্গোৎসব।

আমাদিগের নববিধান কি দুর্গোৎসববিহীন? যতই দিন চলিয়া যাইতেছে, ততই দেখিতেছি, নববিধানের ভিতর মহা দুর্গোৎসব। নববিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এই দুর্গোৎসবের মধ্যে মহাভাবে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার সমক্ষে প্রতিদিনের জীবনে মহা দুর্গোৎসব। এই দুর্গা-ভাবের মধ্যে তিনি মহা সার্ব্বভৌমিক নিরাকারা চিন্ময়ী দুর্গাকে প্রত্যক্ষ করিলেন।

এ দুর্গা-ভাব মহা সার্ব্বজনিক ভাব। ব্রহ্মানন্দের শারদীয় উৎসব নববিধানের মহা দুর্গোৎসব। এখন দেখিতেছি, এই মহা দুর্গাভাব অস্থি মজ্জার ভিতর প্রবেশ না করিলে, নববিধান পূর্ণ হয় না। পাশ্চাত্য ধর্ম্মতত্ত্ব অধ্যয়ন করিলে বেশই বুঝা যায় যে, ইউরোপ প্রদেশেও এই দুর্গাভাব আসিয়াছিল। জর্ম্মণ শর্ম্মণও এই দুর্গাভাবের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। জর্ম্মণ ভাষায় যে "*Dourga*" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছিল, সেই শব্দের মহাভাব ভারত ঋষির ভিতরও আসিয়াছিল! জর্ম্মণ ভাষায় "*Dourga*" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থে যে ভাব প্রকাশ পায়, ভারতীয় "দুর্গা" শব্দের ভাবেও সেই অর্থ। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে উভয়েরই অর্থ "*Difficult to enter in*" অর্থাৎ দুষ্প্রবেশ্য। ভারতীয় দুর্গাভাবের ভিতর যেমন লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ প্রভৃতির মহাভাব আসিয়াছে, প্রাচীন গ্রীস ভূমিতেও সেইভাব আসিয়াছিল। ভারতীয় যে ভাবে "লক্ষ্মী" শব্দ আসিয়াছে, সেইভাবে ইউরোপে "*Ceres*" শব্দ আসিয়াছিল। সেইরূপ "সরস্বতীর" ভাবে "*Minerva*", "গণেশের" ভাবে "*Jupiter*" এবং "কার্ত্তিকের" ভাবে "*Mars*" আসিয়াছে। সাধনশীল ভারত এবং সাধনশীল ইউরোপ এই মহাসাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এই মহা দুর্গাভাব কোন আকার কিম্বা সীমায় আবদ্ধ নয়। আকাশ যেমন সীমাহীন, নিরাকারা দুর্গাও সেইরূপ সীমাহীন। এ ভাবের ভিতর আকার নাই এবং পরিমাণও নাই। ইহার ভিতরে চিন্ময় আকাশের ভাব। সাধক আর কোথায় যাইবেন? এই মহাদুর্গাভাব ভিন্ন তাঁহার সাধনা সিদ্ধ হয় না। তাঁহার সামনে আর আকার নাই, মূর্ত্তি নাই। হিন্দু উপাসক মূর্ত্তি অর্থাৎ প্রতিমার সমক্ষে আসিয়া, "ইহাগচ্ছ" "ইহ তিষ্ঠ" এই বলিয়া তাঁহার মহাপূজা আরম্ভ করিলেন। এখন তাঁহার সে মূর্ত্তি ও সে প্রতিমা কোথায় চলিয়া গেল! তাঁহার সম্মুখে চিন্ময় আকাশ, তাঁহার সম্মুখে নিরাকারা দেবী ও তাঁহার সম্মুখে সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বজনিক চিন্ময়ী দুর্গা বর্ত্তমান। তিন দিন পরে তাঁহার মহাবিজয়া ও মহাসিদ্ধিলাভ। তিনি এখন আকার ও সীমা হইতে অনেক দূরে। তাঁহার বিজয়া আর কিছুই নয়, কেবল নিরাকারা চিন্ময়ী দুর্গা। শিশু আর "*Kindergarten*" এ আবদ্ধ নহে। যতই তাহার জ্ঞানপথ খুলিয়া যায়, তাহার আর "*Kindergarten*"এর প্রয়োজন হয় না। তাহার ভিতরে সাধনারূপ নিরাকার "*Kindergarten*"। শিশু ভূগোলবিদ্যায় জ্ঞান লাভ করিবার জন্য, পঠদ্দশায় সম্মুখে মানচিত্র দর্শন করে। তাহার দর্শন-জ্ঞান শেষ হইলে, সে আর মানচিত্রে আবদ্ধ থাকে না। ভিতরে তাহার মহাভূমণ্ডলের চিত্র ফুটিয়া উঠে। তাহার ভিতরে ভূবিদ্যা সম্বন্ধে মহাপরাজ্ঞান আসিয়া পড়ে। এক্ষণে আমরা বলিতেছি যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুর্গাভাব মহাসমন্বয়ের মধ্যে আসিয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়াছে। দুর্গার ভিতরে মহা নববিধান। বিশ্বাসী পাঠক ও পাঠিকা এই মহা নববিধান অধ্যয়ন করুন। ভক্ত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তাঁহার সাধনশীল জীবনে এই নববিধান প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভিতরে মহাশারদীয় উৎসব আসিয়া যাহা পড়িল, তাহা তাঁহার ভিতরে সার্ব্বসাময়িক উৎসবে পরিণত হইয়াছিল। বিশ্বাসী ভাই, ভগিনীগণ, এই উৎসব ভুলিও না। ভক্ত প্রমথলাল এই মহাভাবের ভিতর এই উৎসবকে দুর্গোৎসব বলিয়া গিয়াছেন। দুর্গাদাস ভিন্ন কে দুর্গোৎসব বুঝিতে পারে? আজ অশীতিবর্ষে আসিয়া, দুর্গাভক্ত হিন্দুপ্রধান ভারতভূমি ও দুর্গাভক্ত ইউরোপ, তোমাদিগকে নমস্কার করি। দুর্গাভক্ত ব্রহ্মানন্দ তাঁহার দুর্গোৎসবের ভিতর আসিয়া তোমাদিগকে নমস্কার করিয়া গিয়াছেন। আজ আমি ব্রহ্মানন্দদাস হইয়া তোমাদিগকে দুর্গোৎসবের দিনের নমস্কার করিতেছি। আমার অশীতিবর্ষের নববিধানকে আজ প্রাণ ভরিয়া নমস্কার করিতেছি।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

—•—

মহাপুরুষ।

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের সামাজিক উপাসনায়, ৮ই অক্টোবর, ১৯৩৩, তারিখে নিবেদিত)

বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানব-সৃষ্টি। এইখানেই তাঁর কৃতিত্বের পরাকাষ্ঠা। মানুষের ভেতরেই তাঁর আত্মার বিশেষ প্রকাশ। মানুষের ভেতরেই তিনি হাতে কলমে ধরা পড়েছেন। তাঁর আত্মা থেকেই মানুষের আত্মা হয়েছে। তিনি আপনার [illegible] ছাঁচে মানুষকে তৈয়েরি করেছেন। আপনার আদর্শ তাকে দিয়েছেন। তাই ভক্ত কবি বল্লেন, "আদর্শ তোমারে দেখিব যত, তোমার স্বভাব পেয়ে হ'ব তোমার মত।" প্রথমে, বিশ্বমাঝে, প্রকৃতির ভেতর, তাঁর প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। চন্দ্রে, সূর্য্যে, গ্রহ তারকায়, জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে, ফুলে, ফলে, সর্ব্বত্র তাঁর অসীম মহিমার দিব্য প্রকাশ দেখতে পাই। হিমরঞ্জিত শোভন তুঙ্গ গিরিশিরে, সিন্ধুর উত্তাল তরঙ্গভঙ্গে, তটিনীর মৃদু মধুর কলতানে, বিহঙ্গের কাকলিতে, কুসুমের হাসিতে, যাবৎ চরাচরে তাঁর অপরূপ, অনুপম সৌন্দর্য্য ও অমোঘ শক্তির প্রকাশ প্রত্যক্ষ আমরা দেখতে পাই। জলচর, স্থলচর, উভচর, খেচর, অসংখ্য জীব জন্তু, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ প্রভৃতি সৃজন করে বিশ্বস্রষ্টা মহিমান্বিত হয়েছেন। কত কোটি কোটি রকম তরু, লতা, গুল্ম, ফুল, ফল বিধাতা সৃষ্টি করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু, মানুষ সৃষ্টি করেই তিনি আপনাকে ধরা দিয়েছেন, আপনাকে দান করেছেন, আপনাকে জন্ম দিয়েছেন। "তুমি তাই এসেছ নীচে, আমায় নইলে তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে।"

জীবাত্মা পরমাত্মার পুত্র। পুত্রের ধর্ম্ম পিতার অনুরূপ হওয়া, পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়ে চলা। কিন্তু, সকল পুত্রই

কি পিতার মত হয়, পিতার কথা শুনে? আদর্শ পুত্র যাঁরা, ভাল ছেলে যাঁরা, তাঁদেরই সার্থক জন্ম, তাঁদের কথাই ইতিহাসে লেখা থাকে। তাঁদের জীবনী নিয়েই ইতিহাস রচিত হয়। তাঁদের জীবনে বিধাতার আত্মপ্রকাশের কথাই ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। ইতিহাস আর কিছু নয়, কেবল মহাপুরুষদের জীবন-চরিত। মহাপুরুষ, আদর্শপুরুষ, অতিমানব, মহামানব, পয়গম্বর, যুগাবতার কাকে বলি? তাঁরা কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জেলে ধরায় আসেন? তাঁরা বিধিদত্ত অসাধারণ শক্তি নিয়ে এখানে আসেন। ভগবানের দূত হয়ে, জীবের মুক্তির সংবাদ নিয়ে, বিশেষশক্তিসম্পন্ন হয়ে, জন্মসিদ্ধ হয়ে, বিধাতার আদেশে তাঁরা পৃথিবীতে আসেন। জীবের দুঃখে কাতর হয়ে, জুড়াতে না পেরে, জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে, নিবিড়-ঘন-ঘোর গাঢ়মোহনিদ্রা ভাঙ্গাবার জন্যে, যুগযুগান্তের ভ্রম, কুসংস্কারের শৃঙ্খল মুক্ত করবার জন্যে, স্বর্গের দীপ্ত দীপ জেলে জীব তরাতে তাঁরা আসেন। ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হলেই তাঁদের উদয় হয়। বিধাতা বিশেষ জ্ঞান, প্রাণভরা প্রেম, অমানুষিক বল, পুণ্যের মুকুট দিয়ে তাঁদের সাজিয়ে পাঠান। যাঁরা অসাধ্য সাধন করেন, অসম্ভব সম্ভব করেন, সাধারণ শক্তির অতীত কাজ করেন, অমানিশায় চন্দ্রোদয় করান, তাঁরাই মহাপুরুষ। যাঁরা ধরার বিষম ভার মাথায় করে নেন, বিশ্বের তীব্র বেদনায় ছটফট করেন, অশেষ দুঃখ অভাবকে স্বেচ্ছায় বরণ করেন, পরের জন্যে অকাতরে প্রাণ দেন, তাঁরাই অবতার। তাই বলে তাঁহাদিগকে আমরা ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করি না, অনন্ত ঈশ্বর ক্ষুদ্র মানুষ হয়ে জন্মেছেন, বিশ্বাস করি না। সে যা হ'ক, ধূমকেতুর ন্যায়; জগতে তাঁদের হঠাৎ উদয়, হঠাৎ অন্তর্ধান। ধূমকেতুর অদ্ভুত নিয়মানুসারেই তাঁদের গতিবিধি, চলা ফেরা। সূর্য্যের অভাবে প্রকৃতি যেমন বাঁচেনা, মহাপুরুষদের শুভাগমন না হ'লে মনুষ্য-সমাজও তেমনি চলে না। তাঁদের বিহনে সংসারের আধ্খানা আঁধারে লুকিয়ে থাকে।

মুক্তির পথপ্রদর্শক যাঁরা, তাঁদের কথাই আমরা আলোচনা করবো। বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র আদর্শ পুরুষ। জ্ঞানে, প্রেমে, পুণ্যে, শৌর্য্যে, বীর্য্যে, ঐশ্বর্য্যে অদ্বিতীয়। একমাত্র গীতার উপদেষ্টা বেশেই তিনি আদর্শ-চরিত্র। সকল শাস্ত্রের সার, সকল ধর্ম্মের সমন্বয়, সকল মতের মিলন, সকল বিরোধের মীমাংসা, সকল পথের শেষ এই গীতার দ্বারাই সম্পন্ন হয়েছে। সমন্বয়াচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের জীবনেও প্রমাণিত হয়েছে। সব ছেড়ে একমাত্র ভগবানেতে আত্মসমর্পণ করলেই মুক্তি লাভ হয়।

"বহুধাপ্যাগমৈ র্ভিন্নাঃ পন্থানঃ সিদ্ধিহেতবঃ।
ত্বয্যেব নিপতন্ত্যোঘাঃ জাহ্নবীয়া ইবার্ণবে॥"

যেরূপ গঙ্গার প্রবাহ সকল বিভিন্ন পথে প্রবাহিত হইয়া অবশেষে সমুদ্রে গিয়া পতিত হয়, সেইরূপ পুরুষার্থসিদ্ধির উপায় সকল শাস্ত্রভেদে ভিন্নরূপ হইলেও তোমাতেই (তাঁহাতেই) পর্য্যবসিত হয়।

তারপরে বুদ্ধদেব। যাগ, যজ্ঞ, পূজা, হোম, ক্রিয়া, পদ্ধতি, ব্রত, উপবাস, স্তব স্তুতি, প্রার্থনা, বন্দনা, কৃপা, দেবানুগ্রহ সব উড়িয়ে দিয়ে, একমাত্র পুরুষকার, আত্মচেষ্টার উপর ধর্ম্মকে দাঁড় করালেন। বর্ণভেদ, জাতিভেদ, উচ্চনীচভেদ, অবরোধ-প্রথা, অস্পৃশ্যতাবিচার, বেদানবিকারশাসন সব উঠিয়ে দিলেন, মানলেন না। কোনও অনুশাসনের বশবর্ত্তী হলেন না। তাঁর হুঙ্কারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের লোমহর্ষণ হলো, চতুর্দ্দশ ভুবন কম্পিত হলো। ভারত, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, চীন, জাপান, অর্দ্ধভুবন তাঁর অনুসরণ করলো। আজও ভারতভূমি "নির্ব্বাণ-ক্ষেত্র" নামে ঘোষিত হচ্ছে।

প্রেমাবতার মহামতি ঈশা, যাঁর জ্যোতিতে ধরা ভাসমান, যাঁর নয়নে দীপ্তি, অন্তরে শান্তি, কার্য্যে প্রীতি, যাঁর প্রাণ ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দরসপানে নিমগ্ন, যাঁর হাত ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যসাধনে রত, কি তাঁর কণ্ঠের বাণী ছিল? ব্রহ্মকৃপা জীবের দুঃখে কাতর হয়ে, জীব তরাতে স্বর্গ হতে ভবে এসেছে এবার। ব্রহ্মকৃপা শ্রান্ত, ক্লান্ত, যূথভ্রষ্ট, পরিত্যক্ত, পলায়িত মেষের দ্বারে দ্বারে অন্বেষণ কর্‌ছে, ফির্‌ছে এবার। উপেক্ষিত, লাঞ্ছিত, দলিত, বঞ্চিত, পতিতের, হরিজনদের ডাক্‌ছে এবার। "আমিতো তোমারে চাহিনি জীবনে, তুমি অভাগারে চেয়েছ" এই তাঁর কথা ছিল, এই সত্যই তিনি প্রচার করে গেছেন। প্রায় দু'হাজার বছর কেটে গেল, আজও জগৎ তার রহস্য বুঝ্‌তে পারলো না।

ধর্ম্মবীর অগ্নি-অবতার মহম্মদ। যখন তিনি ঈশ্বরের আদেশ পেলেন, তাঁর বাণী শুন্‌লেন, কেউ তাঁকে বিশ্বাস করলোনা। একটী ১৮ বছরের যুবক, একজন নিরক্ষর ভৃত্য ও তাঁর সহধর্ম্মিণী ছাড়া কেউ তাঁর অনুগামী হলো না। কিন্তু আরবের দুস্তর মরু-প্রান্তরে, উচ্চ গিরিকন্দরে সে বজ্রবাণী ধ্বনিত হতে লাগলো। অচিরে "একমেবাদ্বিতীয়মের" সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হলো।

যখন সময় হ'ল, ভগবান্ মত্ত-মাতঙ্গ প্রমত্ত শ্রীগৌরাঙ্গকে পাঠিয়ে ভক্তির প্রবাহে, প্রেমের বন্যায় দেশকে ভাসিয়ে দিলেন। তাতে জাতিভেদ, অচলায়তনদেশাচার সব ভেসে গেল। আচণ্ডাল হরিভক্তিরসে ডুবে, মজে, মেতে গেল। বঙ্গরঙ্গভূমিতে ভক্তির জয় হলো। বিশ্বপতি, বিশ্বের নিয়ন্তা, বিশ্বের কল্যাণ-কল্পে, সময়ে সময়ে, এই রকম আরও কত মহাপুরুষকে পাঠিয়ে জীবের উদ্ধারের পথ সুগম করেছেন, তা বলা যায় না। এবারে বিধাতা সব মিলিয়ে নববিধানের লীলা জগতে বিশেষভাবে প্রচার করেছেন। নববিধানই বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম, সাম্যের মঙ্গলশঙ্খ, পরিত্রাণের পথ, মুক্তির সোপান।

প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়, যুগাবতার মাত্রেই এসিয়াবাসী। একমাত্র জার্ম্মাণ সন্ন্যাসী মার্টিন লুথার ইউরোপের লোক, যিনি অকুতোভয়ে পোপের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। অনাচার, অত্যাচার, দুরাচার, ব্যভিচার দূর করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। যাঁর প্রতিবাদে সমগ্র ইউরোপের হৃৎকম্প হয়েছিল। অবশেষে *Protestantism* দৃঢ়রূপে স্থাপিত হয়েছিল।

আলোকস্তম্ভস্বরূপ এই সকল স্বার্থশূন্য, দৃঢ়বিশ্বাসী, বজ্রদেহী, অমিততেজা, ভূভারহারী মহাপুরুষদের অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি না দিয়ে কি আমরা বিদায় করে দেব? তাঁরা ত কিছু চাননা। না চাহিতে সব দিয়ে জগতের জন্যে তাঁরা ফকির হয়ে ছিলেন। তাঁদের প্রতি আমাদের কি কর্ত্তব্য, আমাদের কি ধর্ম্ম? বিশ্বমাঝে, বিশ্বরূপের বিরাট প্রকাশ দেখে যদি আমরা স্তম্ভিত, অভিভূত হই, তাঁর অপার রচনা-কৌশল, ধন-ধান্য-ভরা বিচিত্র রমণীয় ধরার সৌন্দর্য্য দেখে বিমোহিত হই, তবে যাঁদের করুণা-স্পর্শে নির্ব্বিকার আত্মামধ্যে অখণ্ড মণ্ডলাকার পূর্ণব্রহ্মের জ্যোতি প্রতিবিম্বিত হয়, বৈরাগ্যের ছিন্নকন্থা মধ্যে অমূল্য চিন্তামণিধন লাভ হয়, তাঁদের অন্তরের অন্তঃপুরে স্থান না দিয়ে বাহিরের দেউড়িতে বসিয়ে রাখবো, তাত হতে পারে না, নববিধানবাদী তা করতে পারেন না। সাধুভক্তি, মহাজনসেবা তাঁর অন্তরে গাঁথা, রক্তে লেখা, গলার হার, ধর্ম্মের অঙ্গ। এবার মা জননী ভক্তকোলে ভগবতীরূপে এসেছেন। ভক্তকে বাদ দিলে চলবে না। বিধাতা ভক্তকে সৃষ্টি করেন, ভক্ত জগৎকে নূতন করে সৃষ্টি করেন। তাঁরা ভাঙ্গা যোড়া দেন। তাঁদের ভক্তি করা, সম্মান করা ত স্বাভাবিক। তাঁদের সেবা করলে, শ্রদ্ধা করলে, তাঁরা বড় হবেন না; আমরাই ধন্য হব, কৃতার্থ হব, জীবন সার্থক হবে।

সাধু, ভক্ত, মহাজনেরা কোনও দেশ, কালে বদ্ধ নন। অতীতের বস্তু নন। মৃত নন। যুগ, যুগান্তর ধরে তাঁদের বাণী নিত্যকাল ধ্বনিত হচ্ছে, অনাহত বাজছে। তাঁরাও ভগবানের মত, স্থানেতে এখানে, কালেতে এখন। হরিলীলার নিত্য-নিকেতন। তাঁদের সঙ্গে আমাদের নিত্য সম্বন্ধ। তাঁদের পূজা আজন্মের অধিকার। এই সাধুভক্তি নিয়ে পৃথিবীতে কত মারামারি, কাটাকাটি, রক্তপাত হয়ে গেছে। ছোট, বড় বিচার নিয়েই যত বিরোধ, বিবাদ, বিসম্বাদ। "ভগবান্ বলিলেন, ভক্তকে বিচার করিব আমি, ভক্তি করিবে তুমি। তুমি যদি সাধুর বিচার কর, অনধিকারচর্চ্চা-দোষে দণ্ডনীয় হইবে। * * ভক্ত পরীক্ষা করিবার ভার কেবল নববিধানের লোকের উপরে নাই।" নববিধানে সাধুদিগকে ভাগ করে আহার করে, তাঁদের রক্ত, মাংস অন্তরে নিবিষ্ট করে, সাধুচরিত্র লাভ করবার কথা, সাধু হয়ে যাবার কথা।

অতীতের কোন্ নিভৃতে, নিরালায় মানুষের সৃষ্টি হয়েছিল, ধরার কোন্ সঠিক জনপদে তার বাস ছিল, কালের তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে কোথায় এসে পড়েছে, আদিম বন্য অবস্থা থেকে উন্নতির যে উন্নত শিখরে আজ এসে পড়েছে, বিজ্ঞানের নবালোকে তার জ্ঞানের রুদ্ধ দুয়ার যতটা আজ খুলে গেছে, জীবনের উচ্চ লক্ষ্য যতটা উপলব্ধি করতে পেরেছে, তাতে "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" অবলম্বন করা ছাড়া, তাঁদের পদচিহ্ন অনুসরণ করা ছাড়া আর উপায়ান্তর নেই, মানবদেহ-ধারণের সার্থকতা নেই। এমন দুর্লভ মানবজন্ম পেয়ে, জীবনে জীবনদাতার চিহ্ন না হয়ে, তাঁর অমর সুপুত্রগণের পদধূলি মাথায় না নিয়ে, কি করলুম, সব বৃথা, পণ্ডশ্রম হলো। "এই কি ভালবাসা তাঁর প্রতি ওরে মন, জীবনে কৈ দেখাইলে তার নিদর্শন।" অতএব, এস ভাই, বোন, ভগবান্‌কে ভালবেসে, ভগবানের প্রেরিত প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষদের ভালবেসে, বিনা আয়াসে, আমরা ভবসিন্ধু পার হয়ে যাই। মা, দয়া করে এই আশীর্ব্বাদ কর।

"নমামি নারায়ণপাদপঙ্কজম্
করোমি নারায়ণপূজনং সদা।
বদামি নারায়ণনাম নির্ম্মলম্
স্মরামি নারায়ণতত্ত্বমব্যয়ম্" ॥

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

রাজা রামমোহন রায়।

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর, বুধবার, ভারতের সর্ব্বত্র রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিবার্ষিকী দিবস অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এক শতাব্দী পূর্ব্বে এই দিনে রাজা রামমোহন ইংলণ্ডের ব্রিষ্টল সহরে দেহত্যাগ করেন। এই এক শতাব্দীতে ভারতে যুগ পরিবর্ত্তন হইয়াছে; ধর্ম্মে, সমাজে, সাহিত্যে, রাষ্ট্রনীতিতে, সকল দিক দিয়াই এক নবীন জাতি এই প্রাচীন আর্য্যভূমিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই নবযুগের প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে এই মহাপুরুষ বিরাট হিমালয়ের মতই ভারতের বুকে পা দিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং অঙ্গুলি-সঙ্কেতে জাতিকে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাসম্পন্ন এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ বর্ত্তমান যুগে কেবল ভারতে কেন,—সমগ্র পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। পৃথিবীর যে কোন দেশে জন্মগ্রহণ করিলে উন্নতশীর্ষ মহীরুহের মতই সকলে অনায়াসে তাঁহাকে চিনিয়া লইতে পারিত। পরাধীন ভারতে তাহার অধঃপতনের যুগে তিনি যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এ বিধাতারই বিশেষ বিধান বলিয়া আমরা মনে করি। পৃথিবীতে সময়ে সময়ে এক একজন মহাপুরুষ আসেন, যাঁহাদের বিরাট শক্তি ও প্রতিভা মানবসমাজকে ভাঙ্গে, গড়ে, জগতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে, তাহার সম্মুখে

নূতন আদর্শ স্থাপন করে। রাজা রামমোহন সেই শ্রেণীর লোক। মোগল রাজত্বের অবসানে এবং ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে—ভারতের তখন সকল দিক দিয়া অধঃপতনের যুগ—জাতি অবসন্ন, প্রাণহীন; মুমূর্ষু এবং এই অবসন্ন জাতির সম্মুখে একটা শক্তিশালী জাতি তাহার নূতন সভ্যতা লইয়া সমুপস্থিত। এই প্রাচ্য-প্রতীচ্য-সজ্ঘর্ষে ভারতের জাতীয় জীবনের সন্ধিক্ষণে রাজা রামমোহনের আবির্ভাব—তিনি যদি সে সময়ে না আসিতেন, তবে আমাদের জাতীয় জীবনের গতি কোন্ দিকে পরিবর্ত্তিত হইত, কে বলিতে পারে?

রামমোহনই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও দূরদৃষ্টিবলে, নব্য ভারতের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন। ধর্ম্মে, সমাজে, সাহিত্যে রাজনীতিতে, শিক্ষা-ব্যবস্থায় সর্ব্বত্র তাঁহার প্রতিভার ছাপ পরিস্ফুট হইল। তিনি ছিলেন, 'একাই একশত',—শতহস্তে শতদিকে তিনি কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন; একজন মানুষের পক্ষে, এক জীবনে যে এত কাজ করা সম্ভব, ইহা ভাবিয়া অনেক সময় বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু, তিনি ভগবানের বিশেষ আদেশ শিরে ধারণ করিয়া আসিয়াছিলেন, এই মুমূর্ষু জাতির দেহে প্রাণ সঞ্চার করিবার জন্য। তাঁহার সেই মহান্ ব্রত তিনি উদ্যাপন করিয়া গিয়াছেন। শতাব্দী পূর্ব্বে তিনি যে আলোক প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, সেই আলোকে এখনও আমরা দুর্গম পথে অন্ধকারে যাত্রা করিতেছি। আজ তাঁহার এই শতবার্ষিক মৃত্যুতিথিতে তাঁহার অমর কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া আমরা ধন্য হই—পবিত্র হই।

রাজা রামমোহন রায়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষে—

মহাত্মা গান্ধীর বাণী:—

"আমি আধুনিক কালের হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সংস্কারকদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়কে অন্যতম মনে করি।"

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বাণী:—

"রাজা রামমোহন রায় বর্ত্তমানে ভারতের অন্যতম স্রষ্টা, অতিমানব, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারক, সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা ও সর্ব্বসম্প্রদায়ের মিলনকর্ত্তা ছিলেন।"

দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের বাণী:—

"ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপ্রাণ মনীষী, বাঙ্গালার বিখ্যাত সমাজ-সংস্কারক, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনপ্রয়াসী মহাপুরুষ রামমোহন রায়ের জীবনব্যাপী সাধনার পেছনে একমাত্র ধ্যান ছিল, ধর্ম্মকে ভিত্তি করিয়া মানবের বিভিন্ন ধর্ম্ম-প্রচেষ্টার ভিতর ঐক্য ও সামঞ্জস্যের অধিকারপূর্ব্বক সাম্য ও মৈত্রীর পুনঃ সৃষ্টি।"

("আনন্দবাজার পত্রিকা" হইতে উদ্ধৃত)

ডাঃ আনি বেশান্ত।

মহাব্যক্তিত্বশালিনী, অসামান্যমনীষাসম্পন্না, তেজস্বিনী, বিশ্ব-বিশ্রুতা, ভারতের শ্রেষ্ঠ জননায়িকা, বিশ্বময় ভারতীয় কৃষ্টি ও থিয়োসোফীর প্রচারিকা, থিওসোফিক্যাল সোসাইটীর সভানেত্রী, ভারতমাতার আত্মিক সুকন্যা—যাঁহার ধর্ম্ম ও কর্ম্মের আদর্শে ভারতের নবজাগরণ ও আত্মবোধ সঞ্চার হইয়াছে, এতাদৃশী মহীয়সী নারীললামভূতা শ্রীযুক্তা ডাঃ আনি বেশান্ত, গত ২০শে সেপ্টেম্বর, মাদ্রাজে আদিয়ারে, প্রায় ৮৬ বৎসর বয়সে, শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, পরলোকে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। ভগবান্ তাঁহার আত্মাকে যথাযোগ্য উন্নত স্বর্গলোকে স্থান দান করুন। বিশ্বময় তাঁহার স্বর্গীয় আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলির বাণী উত্থিত হইতেছে। কলিকাতার পৌরজন-প্রতিনিধি-সভায় যে শ্রদ্ধাঞ্জলির বাণী লিপিবদ্ধ হইয়াছে, আমরাও সকলের সহিত নিম্নোক্ত সেই বাণীতে আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি—

"সমগ্র জগৎ ও মানবতার সেবায় অর্দ্ধশতাব্দীর অধিককাল যাবৎ উৎসর্গীকৃত-প্রাণ ডাঃ আনি বেশান্তের * * * চত্বারিংশৎ বর্ষাধিককালের সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবন ভারতের সেবায় নিয়োজিত ছিল এবং তিনি ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন জাতীয়তার সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকিয়া এতদ্দেশের শিক্ষা, সংস্কার, ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতিক প্রগতির জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহার পরিমাপ হয় না। তাঁহার অপূর্ব্ব বাগ্মিতা, অসামান্য সংগঠন-শক্তি, বিপুল উৎসাহ ও কঠোর আদর্শ-নিষ্ঠা বর্ত্তমান ভারতের নব-জাগরণের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, আমাদের জাতীয়তার ইতিহাসের প্রত্যেক অধ্যায়ে তাঁহার অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। মাতৃভূমি বলিয়া গৃহীত ভারতভূমির সেবাকল্পে তাঁহার বহুধা কর্ম্মপ্রচেষ্টার কথা ইতিহাস চিরকাল সকৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ রাখিবে।"

—০—

বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিলা কবি

পরলোকে শ্রীযুক্তা কামিনী রায়।

(সাহিত্য, সমাজ ও নারীর কল্যাণ-কর্ম্মীর তিরোধান)

বাঙ্গলার সুপ্রসিদ্ধা কবি শ্রীযুক্তা কামিনী রায় গত ২৭শে সেপ্টেম্বর, বুধবার, রাত্রি ৩ঘটিকার সময় তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে (৪২এ, হাজরা রোড) নিমোনিয়া রোগে পরলোক-গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৯ বৎসর হইয়াছিল। কেওড়াতলা শ্মশান ঘাটে মহাসমারোহে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর, শনিবার দিবস শ্রীযুক্তা কামিনী রায় রামমোহন শতবার্ষিকী কমিটীর এক অধিবেশনে বক্তৃতা করিয়া একটু অসুস্থতা বোধ করেন। রবিবার দিন তিনি জ্বরাক্রান্ত হইয়া পড়েন। সোমবার চিকিৎসকগণ মত প্রকাশ করেন যে, তিনি নিমোনিয়াগ্রস্ত হইয়াছেন। ২৭শে সেপ্টেম্বর মহাষ্টমী তিথিতে তিনি দেহত্যাগ করেন। শতবর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান রামমোহন রায়ও উক্ত দিবসে মানবলীলা সংবরণ করেন। বঙ্গজননীর এই দুইটী কৃতী সন্তানের একই দিবসে তিরোধান নিতান্তই রহস্যজনক।

শ্রীযুক্তা কামিনী রায়ের জীবনের তিনটী দিক লক্ষ্য করিবার বিষয়। উহা হইল তাঁহার সাহিত্যিক কার্য্যকলাপ, সমাজসেবা এবং নারীজাতির প্রতি ঐকান্তিক দরদ।

বঙ্গ-সাহিত্য যখন রবীন্দ্রনাথের রশ্মিপাতে সমুজ্জ্বল হয় নাই, তখন শ্রীযুক্তা কামিনী রায়ের কাব্য-প্রতিভা বঙ্গসাহিত্যের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিল। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার "আলো ও ছায়া" এক অভিনব অবদান। তাঁহার গীতি-কবিতা ও জাতীয় সঙ্গীতগুলির এক একটী জাতীয় সম্পদ্ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার সামাজিক কার্য্যকলাপ বহুবিধ। বাল্যে ধর্ম্মভাবের কঠোর বন্ধনে প্রতিপালিতা হইলেও, আধুনিক সমাজের অন্যায় অবিচার এবং উৎপীড়নের প্রতি তাঁহার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। "সেবাধর্ম্ম" "এরা যদি জানে" "সত্যাগ্রহী" প্রভৃতি কবিতায় বাঙ্গলার অস্পৃশ্যদের প্রতি তিনি যে দরদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার সমাজে পতিতদের প্রতি আন্তরিক প্রীতিরই সূচনা দিতেছে।

তাঁহার 'নারীনিগ্রহ' 'নারীর দাবী' এবং "নারীর জাগরণ" প্রভৃতি কবিতা বাঙ্গলার নারীর আশা আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ ও দুঃখের কাহিনী অতুলনীয় ভাষায় মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৯২৩ সালে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইলে, নারীর ভোটাধিকারের জন্য একটী ডেপুটেশন তদানীন্তন বড়লাট লর্ড লিটনের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। নারীর দুঃখ দৈন্য মোচনের দাবী উপস্থিত করিবার জন্য শ্রীযুক্তা কামিনী রায় এই ডেপুটেশনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৯৩০সালে লেবার কমিশন ভারতে শ্রমিকদের অবস্থা অনুসন্ধান করিবার জন্য আসিলে পর, বাঙ্গলা সরকার শ্রীযুক্তা রায়কে শ্রমিক স্ত্রীলোকদিগের অভাব অভিযোগ অবগত হইয়া কমিশনের নিকট জানাইবার জন্য এসেসর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উপরি উক্ত কার্য্যগুলি, শ্রীযুক্তা রায়ের বাঙ্গলার নারীজাতির প্রতি কিরূপ দরদ ছিল, তাহারই পরিচায়ক।

তারপর ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার আজীবন কার্য্যাবলী সমাজসেবার অপূর্ব্ব প্রতীকস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে।

শ্রীযুক্তা রায়ের তিরোধানে বাঙ্গলা যে শুধু একটী সাহিত্যরত্নই হারাইল তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলার নারীজাতির আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং আদর্শেরও একটী দীপশিখা নির্ব্বাপিত হইল। শ্রীযুক্তা রায় ছিলেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাবধারায় একটী নিখুঁত মূর্ত্তি।

শ্রীযুক্তা কামিনী রায়ের মৃত্যুতে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র—

"১৮৮৮ সালে বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া অবধি পরলোকগত কবি কামিনী রায়ের সহিত আমার পরিচয় হয়। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ সেন মহাশয়ের সহিতও আমার পরিচয় ছিল। তিনি একজন ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণ সভ্য ছিলেন এবং আমিও বাল্যকাল হইতে সেই সমাজভুক্ত। "আলো ও ছায়ার" কবিতাগুলি কবি অল্প বয়স হইতেই রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু রচয়িত্রীর সেগুলি লোকসমক্ষে প্রচার করিবার মত সাহস ছিল না। আমার স্মরণ আছে, শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন দাস তাঁহার বন্ধু কবিবর ৺হেমচন্দ্র বান্দ্যোপাধ্যায়কে নিমন্ত্রণ করিয়া 'আলো ও ছায়ার' পাণ্ডুলিপি সমর্পণ করিয়াছিলেন। কবিবর এগুলির রচনাপ্রণালীতে মুগ্ধ হন এবং স্বয়ং পুস্তকটীর ভূমিকা লিখিয়া রচয়িত্রীকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। 'আলো ও ছায়া' প্রকাশিত হইবামাত্রই আমি উহা আগাগোড়া কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলাম। কখনও কখনও প্রেসিডেন্সী কলেজে আমার রসায়নশাস্ত্রে লেক্‌চার দিবার সময়েও ঐ সকল কবিতা আবৃত্তি করিতাম।

"আলেয়ার উৎপত্তি এবং বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার আলোচনা করিবার সময় আমি স্বতঃই আবৃত্তি করিতাম :—

> "গেছে, যাক্ ভেঙ্গে সুখের স্বপন—
> স্বপন এমন ভেঙ্গেই থাকে ;
> গেছে, যাক্ নিবে আলেয়ার আলো—
> গৃহে এস ফিরে ঘুর না পাকে।"

"বলিতে গেলে 'আলো ও ছায়া' বঙ্গ-সাহিত্যের এক অপূর্ব্ব দান। সে সময় রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা তত্টা প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হয় নাই, সুতরাং ইহা রবিচ্ছায়ার আওতায় পতিত হয় নাই এবং ইহার মৌলিকতাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। অবশ্য 'আলো ও ছায়া' রচনার পরে তিনি অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, 'আলো ও ছায়া" কবির শ্রেষ্ঠতম রচনা, সেরূপ রচনা আর তাঁহার লেখনীপ্রসূত হয় নাই।

"'আলো ও ছায়া' প্রকাশিত হইবা মাত্রই সাহিত্য-জগতে, শ্রীযুক্তা কামিনী রায়ের স্থান অতুচ্চ বলিয়া সর্ব্ববাদিসম্মত হইল। কবিতাগুলির আদ্যোপান্ত উচ্চভাবময়।

"কবি তাঁহার বিবাহের পর শেষ জীবনে পারিবারিক অনেক শোক তাপ পাইয়াছেন এবং ইদানীং তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত, যেন একটা বিষাদ-ছায়া তাঁহার মুখমণ্ডলে বিরাজ করিতেছে।

"আর অধিক বলিব না, এই বৃদ্ধ বয়সেও 'আলো ও ছায়ার' কবিতাগুলি আমার হৃদয়পটে অঙ্কিত রহিয়াছে।

"বঙ্গ-সাহিত্য তাঁহার তিরোধানে অশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।"

("আনন্দবাজার পত্রিকা" হইতে উদ্ধৃত)

শারদীয় উৎসবের বিবরণ।

ভক্ত ব্রহ্মানন্দ বলিলেন—"যদি পূজা করিতে হয়, মাতৃপূজার তুল্য আর পূজা নাই"। নববিধানে ঈশ্বরের মাতৃভাবের প্রকাশের ন্যায়, এমন মধুময়, এমন শোভাময়, এমন ঐশ্বর্য্যময়, এমন আশা ও আনন্দের ঘনীভূত প্রকাশ আর কি হইতে পারে? আমরা পৃথিবীর দীন দুঃখী গরিব কাঙ্গাল; এই মাতৃপূজা করিয়া, মাতৃদর্শনের ও তাঁহার অভয় ও আশাপ্রদ বাণীশ্রবণের এবং তাঁহার বিমল স্নেহ করুণা লাভের সত্যই অধিকারী হই, এবং তাঁহার পূজানন্দের ভিতরে প্রকৃত শান্তি আরাম সম্ভোগ করি। এই মহাশক্তির আরাধনার মধ্যে আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং দেশের ও সমস্ত বিশ্বের অমর জীবন, আশার ভবিষ্যৎ এবং সকল প্রকার মঙ্গল যতই প্রত্যক্ষ করি, ততই আমরা আমাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের, দেশের জীবনের সকল প্রকার রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য ও পরীক্ষার ভিতরেও সে সকল অবস্থার অতীত হইয়া, স্বর্গের অখণ্ড অমর পরিব[illegible], অমর জীবনের বিমলানন্দ ও শান্তি আরাম সম্ভোগ করিয়া ধন্য হই। যদিও এমন মাতৃপূজায়, এমন জাতীয় মহোৎসবে এখনও আমরা দলে বলে তেমন জমাটভাবে পূজাক্ষেত্রে মিলিতে পারিতেছি না, যদিও এবার শারদীয় উৎসবে মায়ের পূজার বাহ্য তেমন কোনই আয়োজন ছিল না বলিলেই হয় তথাপি, যে কয়েকটী তাঁহার কাঙ্গাল গরিব পুত্রকন্যা পূজাক্ষেত্রে তাঁহার নামে মিলিত হইয়াছিলাম, আমরা আশাতীতরূপে মায়ের শ্রীহস্তের প্রসাদ সম্ভোগ করিয়া ধন্য হইয়াছি। নিম্নে এবারের সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী চারিদিনের উৎসবের বিবরণ প্রকাশ করিতেছি।

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১০ই আশ্বিন, মঙ্গলবার, সপ্তমী দিনে পূর্ব্বাহ্ণে, নবদেবালয়ে, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। সন্ধ্যায়ও ব্রহ্মমন্দিরে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন, আচার্য্যদেবকৃত একটী সময়োপযোগী প্রার্থনা পাঠ করেন। সন্ধ্যায় ভাই অখিলচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্রনাথ রায় ভাবের সহিত মাতৃসঙ্গীত গান করিয়া সকলকে তৃপ্তিদান করেন। অখণ্ড চিদ্ঘন মাতৃ-প্রকাশের মধ্যে ইহলোক, পরলোক মিলিত। এখানে সম্প্রদায়ভেদের, জাতিভেদের, দেশকালভেদের কোন গণ্ডি নাই। অখণ্ড অনন্ত মাতৃপ্রকাশের মধ্যে তাঁহার সকল পুত্র কন্যা লইয়া অখণ্ড পরিবারের অখণ্ড উৎসব, ইহাই আমরা এ দিনে মাতৃপ্রকাশের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হই।

২৭শে সেপ্টেম্বর, ১১ই আশ্বিন বুধবার, অষ্টমীর দিন—এ দিন রাজর্ষি রামমোহন রায়ের স্বর্গারোহণের শতবার্ষিক দিন। প্রাতে নবদেবালয়ে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন, সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে ডাঃ প্রেমেন্দ্রনাথ রায় উপাসনার কার্য্য করেন। শ্রীমান্ শশিকুমার চট্টোপাধ্যায় সঙ্গীতের কার্য্য করেন। প্রেমেনবাবু ভাবের সহিত উদ্বোধন ও আরাধনা করিয়া সমস্বরে প্রার্থনাদির পর, বিশেষ বিশেষ স্থান হইতে সময়োপযোগী অংশ পাঠ করেন। তাঁহার পাঠ ও আত্মনিবেদনে অষ্টমী পূজার বিশেষ ভাবের সঙ্গে ধর্ম্মপিতামহ রামমোহনের সার্ব্বভৌমিক একেশ্বরবাদপ্রতিষ্ঠার মিলন প্রদর্শিত হইয়াছিল। তিনি এদিনের অন্যান্য পাঠের মধ্যে উর্দ্দু ভাষায় বর্ণিত একেশ্বরভাবপ্রধান উক্তি পাঠ করিয়া পাঠ ও প্রসঙ্গকে জমাট করিয়া তুলিয়াছিলেন।

২৮শে সেপ্টেম্বর, ১২ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার—নবমীর দিন পূর্ব্বাহ্ণে নবদেবালয়ে ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে ডাক্তার সত্যানন্দ রায় উপাসনার প্রথমাংশ এবং ডাক্তার অনুকূলচন্দ্র মিত্র পাঠ ও প্রার্থনাদি করেন। এ দিনের উদ্বোধন, আরাধনা এবং পাঠ ও প্রার্থনাদি বেশ সরল ও সুন্দর হইয়াছিল।

২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৩ই আশ্বিন, শুক্রবার—দশমীর দিন পূর্ব্বাহ্ণে নবদেবালয়ে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনার কার্য্য করেন। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন। ভাই অক্ষয়কুমার লধ মাতৃস্তোত্রপাঠের নেতৃত্ব করেন ও শ্রীমদাচার্য্য দেবের প্রার্থনা "সত্যসাধনা" পাঠ করেন। শ্রীমতী নির্ভরপ্রিয়া ঘোষ সঙ্গীতের কার্য্য করেন।

সংবাদ।

নামকরণ—গত ১লা আশ্বিন, রবিবার, অপরাহ্ণে, গোবরা রঙ্গের কারখানায়, শ্রীমান্ অনিলকুমার ঘোষের দুই বৎসরবয়স্ক শিশুপুত্রের জন্মদিনে, শিশুর শুভনামকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন এবং শিশুকে "অলোককুমার" নাম প্রদান করেন। এই উপলক্ষে শিশুর পিতা প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ৮ই আশ্বিন, কাশীপুরে, স্বর্গীয় রায়বাহাদুর ডাঃ মতিলাল মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ বিনয়েন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের শিশুপুত্রের শুভনামকরণ অনুষ্ঠানে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন এবং শিশুকে "রণজিৎ" নাম দান করেন। এই উপলক্ষে শিশুর পিতা প্রচারভাণ্ডারে ৫৲ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দান করেন।

গত ৯ই আশ্বিন, হাওড়ায়, ১৯নং কুচিলসরকার লেনে, শ্রীমান্ সন্তোষকুমার দাসের গৃহে, তাঁহার ভাগিনেয় ও লক্ষ্ণৌপ্রবাসী

শ্রীমান্ শর্ব্বরীকান্ত ধরের শিশুপুত্রের শুভ নামকরণে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন, এবং শিশুকে "প্রসূনকুমার" নাম প্রদান করেন। শ্রীমান্ শর্ব্বরীকান্ত শিশুপুত্রের নামকরণে প্রচারভাণ্ডারে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

ভগবান্ শিশুদিগকে ও তাহাদের পিতামাতাকে শুভাশীষ দান করুন।

শুভবিবাহ—গত ১০ই আশ্বিন, কলিকাতায়, ৫৫নং হ্যারিসন রোড ভবনে, লক্ষ্ণৌপ্রবাসী স্বর্গীয় নীলমণিকান্ত ধরের তৃতীয় পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ প্রভাতকান্তের সহিত, কলিকাতা-প্রবাসী শ্রীযুক্ত মনোনাথ সরকারের কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী প্রতিমার শুভবিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই অক্ষয়কুমার লধ এই অনুষ্ঠানে আচার্য্য ও পুরোহিতের কাজ করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ শর্ব্বরীকান্ত ভ্রাতার শুভবিবাহে প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ১৭ই আশ্বিন, কুচবিহারে, রাণীগঞ্জ-নিবাসী স্বর্গীয় আশুতোষ চক্রবর্ত্তী কাব্যবিশারদের তৃতীয় পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ গিরিধর চক্রবর্ত্তীর সহিত, কুচবিহার-প্রবাসী শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী ইন্দুলেখার শুভবিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র আইচ এই অনুষ্ঠানে আচার্য্য ও পুরোহিতের কাজ করেন।

গত ১৮ই আশ্বিন, ঢাকায়, ময়মনসিংহ-প্রবাসী শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দত্তের দ্বিতীয় পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ সুধীরকুমারের সহিত, ঢাকা-প্রবাসী শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের প্রথমা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী বনজ্যোৎস্নার শুভবিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে।

ভগবান্ সংসারযাত্রী নবদম্পতিত্রয়কে শুভাশীষ দান করুন।

পরলোকগমন—অতীব দুঃখের সহিত, শোকসহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ে, নিম্নলিখিত পরলোকগমন-সংবাদ প্রকাশ করিতেছি:—

আমাদের স্বর্গীয় বন্ধু বিনোদবিহারী বসুর চতুর্থ জামাতা ডাক্তার অখিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (এম,বি,) তাঁর দমদমার প্রবাসভবনে, গত ৬ই সেপ্টেম্বর সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ৮ই নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া, পরিবার ও ২টী শিশুকে অনাথ করিয়া পরলোকগত হইয়াছেন। এই শোকার্ত্ত পরিবারের শোকে সান্ত্বনা দিবার জন্য ভাই অখিলচন্দ্র প্রায় তিন দিন বিশেষভাবে উপাসনা ও প্রার্থনা করিয়াছেন। শোকসন্তাপহারিণী মা পরলোকগত আত্মাকে তাঁর শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান দান করুন এবং পতিহীনা বিধবা দুঃখিনী শ্রীমতী স্নেহকণাকে ও দুটী অনাথ শিশুকে রক্ষা করুন।

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর, প্রত্যূষে, রাজর্ষি রামমোহনের স্বর্গারোহণের শতবার্ষিকীর পুণ্যদিনে, কলিকাতায় ৪২।এ হাজরা রোডে, ডিষ্ট্রিক্ট এবং সেসন্স জজ স্বর্গীয় কেদারনাথ রায়ের সহধর্ম্মিণী, স্বনামধন্য লেখক স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা, বিখ্যাত "আলো ও ছায়া" গ্রন্থের রচয়িত্রী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কর্ত্তৃক "জগত্তারিণী" পদকভূষিতা, বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি শ্রীমতী কামিনী রায়, ৬৯ বৎসর বয়সে, সাহিত্যে, সমাজে, দেশে ও নারীকল্যাণে অমর কীর্ত্তি রাখিয়া, নিউমোনিয়া রোগে তিনচারি দিনের মধ্যে, শোকতাপদগ্ধ জীর্ণ শরীর রাখিয়া, অমরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে পবিত্র অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তথায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত প্রার্থনা করেন। সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং আমাদের মণ্ডলীর শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস ও ডাঃ সত্যানন্দ রায় শ্মশানে উপস্থিত হইয়া স্বর্গীয় আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। শ্রীযুক্তা রায় স্বামীর স্বর্গারোহণের পর নববিধান প্রচারভাণ্ডারে, স্বামীর পুণ্যস্মৃতিতে এক সহস্র টাকার কোম্পানী কাগজ স্থায়ীফণ্ডরূপে দান করিয়া আমাদের পরম কৃতজ্ঞতাভাজনীয়া হইয়াছেন। পরম জননী তাঁহার কন্যাকে অনন্ত শান্তিক্রোড়ে স্থান দান করুন এবং শোকার্ত্ত পরিবারে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

নববিধানসাধক, হ্যালুলুজা ব্যাণ্ডের উদ্যোগী সেবক, আমাদিগের সমবিশ্বাসী শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র রায় অনেক দিন যাবৎ কঠিন দুরারোগ্য বহুমূত্র-রোগে ভুগিয়া, অন্তে মা আনন্দময়ীর শান্তি-ক্রোড়ে, গত ২৩শে আশ্বিন, সোমবার দ্বিপ্রহরে, কুলটীতে (সীতারামপুর) বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। তিনি হরিপাল গ্রামে বহু প্রাচীন সম্ভ্রান্ত রায় বংশে, ৩১শে ভাদ্র ১২৭৫ সালে ভূমিষ্ঠ হন। নববিধানে যোগ্যা ভক্তির আদর্শ প্রেরিত ভাই অমৃতলালের নিকট ভাদ্রোৎসবের [illegible] তিনি দীক্ষিত হন ও আমাদিগের মণ্ডলীর প্রিয়তম শ্রদ্ধাস্পদ ভাই প্রমথলালের নিকট তিনি মাঘোৎসবে সাধকব্রত গ্রহণ করেন। তাঁহার আদ্য শ্রাদ্ধক্রিয়া আগামী ২রা কার্ত্তিক কুলটীতে সম্পন্ন হইবে। মা বিধানজননী তাঁহার প্রিয় সন্তানকে ব্রহ্মানন্দদলে চিরশান্তি ও তাঁহার সন্তানদিগকে এবং পরমাত্মীয়গণকে সান্ত্বনা প্রদান করুন।

ভস্ম-প্রতিষ্ঠা—গত ২১শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায়, কমলকুটীরস্থ নবদেবালয়-প্রাঙ্গণে, আচার্য্যদেবের মধ্যমা কন্যা স্বর্গীয়া শ্রীমতী সাবিত্রী দেবীর পবিত্র ভস্ম স্থাপন করা হয়। ভাই প্রিয়নাথ নবসংহিতার প্রার্থনাযোগে ভস্ম স্থাপন করিয়া পরে প্রার্থনা করেন।

রাজর্ষির শতবার্ষিকী—পুরী নবপর্ণকুটীরে তত্রত্য কয়েকটী বিশ্বাসী বিশ্বাসিনী সহ, গত ২৭শে সেপ্টেম্বর, গম্ভীরভাবে রাজর্ষি রামমোহনের শতবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন এবং স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী সঙ্গীত করেন। সান্ধ্য উপাসনাও এখানে হয়। তৎপূর্ব্বে পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ আই, এন্, দে মহাশয়ের বাড়ীতে কমিটীর অধিবেশন হয় এবং স্থির হয়, ৭ই অক্টোবর সর্ব্বসাধারণকে লইয়া শতবার্ষিকী স্মৃতিসভা হইবে।

গত ৭ই অক্টোবর পুরীর ক্লার্ক হলে সর্ব্বসাধারণের সমযোগে শতবার্ষিকী স্মৃতিসভা হয়। কালেক্টর মিঃ এন্, পি, থডানি, আই, সি, এস্, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সন্তান-সন্ততিগণ সহ তাঁর সহধর্ম্মিণী, অনেক গণ্যমান্য ভদ্রমহিলা ও পদস্থ ব্যক্তি এবং জনসাধারণ যোগদান করেন। হল ও বারাণ্ডা লোকে পূর্ণ হইয়াছিল। বেদগান ও বালিকাগণের মঙ্গলাচরণ হইলে, ভাই প্রিয়নাথ প্রার্থনা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন এবং কুমারী রেণুকা দেবী সঙ্গীত করিলে, শ্রদ্ধেয় ভাই মল্লিক মহাশয়ই ধর্ম্মপিতামহের মহজ্জীবনের বিবরণ বিবৃত করিয়া, তিনি যে বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের এবং বর্ত্তমান নবজাগরণের বীজ বপন করিতে ঈশ্বর-প্রেরিত হইয়া আসিয়াছিলেন, এই বলিয়া সভার উদ্বোধন করেন। তাহার পর ভ্রাতা বীরেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ দুই তিন জন বাঙ্গালা রচনা, ধর্ম্মপিতামহের বাণী ইত্যাদি আবৃত্তি করিলে, একটী কুমারী মহিলা শ্রীমতী আনন্দিতা দেবীর সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং মিঃ বি, কে, সেন ইংরাজীতে পাশ্চাত্য জগতে রাজর্ষির সম্মাননা বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। মধ্যে মধ্যে সঙ্গীতও হয়। শেষে সভাপতি মিঃ থডানি ইংরাজীতে অভিভাষণ করিলে, হাইকোর্টের একজন উকীল ধন্যবাদ দেন। মল্লিক মহাশয় সমর্থন করিলে, শেষ সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর, রাজর্ষি রামমোহন রায়ের স্বর্গগমনের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান, কলিকাতায় রামমোহন রায় লাইব্রেরী হলে, লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষ ও ব্রাহ্মসমাজের তিন শাখা সম্মিলিতভাবে সম্পন্ন করিয়াছেন। প্রাতে ৯ ঘটিকায় ব্রহ্মোপাসনা হয়; আদি সমাজের শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্যতীর্থ উদ্বোধন, নববিধান-সমাজের শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস আরাধনা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র উপদেশ দান করিয়া প্রার্থনা করেন। উপদেশে মিত্র মহাশয় বিশেষভাবে রামমোহনের নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা এবং নারীজাতির কল্যাণার্থ কার্য্যাবলী উল্লেখ করেন। সন্ধ্যা ৬টায় সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীর সম্মিলিত প্রার্থনা ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য পাঠ করেন। ৬৷৷০টায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে স্মৃতিসভা হয়। প্রিন্সিপাল জে, আর, বানার্জ্জি, শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত জয়কালী দত্ত, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি রাজর্ষির গুণাবলী উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করেন।

শুভাশীর্ব্বাদ—গত ২০শে সেপ্টেম্বর, মসূরীতে সেভয় হোটেলে, লাহোরের অবসরপ্রাপ্ত সেসনস্ জজ রায় বাহাদুর গঙ্গারাম সোনির চতুর্থ পুত্র কল্যাণীয় মিঃ হীরালাল সোনির (Bar-at-Law) সহিত, কলিকাতার শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দদেবের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সেনের ও শ্রীমতী মৃণালিনী দেবীর কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী অঞ্জলির শুভবিবাহসম্বন্ধ স্থির হইয়া উপাসনান্তে আশীর্ব্বাদানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। ভগবান্ তাঁহার পুত্র ও কন্যাকে শুভাশীর্ব্বাদদানে পবিত্র ব্রতের জন্য প্রস্তুত করিয়া লউন।

সাম্বৎসরিক—ভক্ত ব্রহ্মানন্দের দ্বিতীয়া কন্যা, কুচবিহারের স্বর্গীয় কুমার গজেন্দ্রনারায়ণের সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া সাবিত্রী দেবীর স্বর্গারোহণের প্রথম সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, গত ২২শে সেপ্টেম্বর, প্রাতে ২৮।১ চক্রবেড়ে লেনে পুত্রদের গৃহে ভাই অক্ষয়কুমার লধ, সন্ধ্যায় ৭৬ নিউথিয়েটার রোডে জ্যেষ্ঠা কন্যার গৃহে ডাঃ সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন। প্রাতে শ্রীমতী মণিকা দেবী ও সন্ধ্যায় ভাই অখিলচন্দ্র রায় বিশেষ প্রার্থনা করেন। প্রাতে নবদেবালয়ে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিকও এই উপলক্ষে বিশেষভাবে উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রচারভাণ্ডারে ৫৲, মধ্যম পুত্র চুঁচুড়া ব্রহ্মমন্দিরে ৪৲, জ্যেষ্ঠা কন্যা পুরী নববিধানপ্রতিষ্ঠানে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ৭ই অক্টোবর, কলুটোলায় কৃষ্ণভবনে, স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেনের স্বর্গীয়া কন্যা সুষমা সেনের স্বর্গারোহণের প্রথম সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন। শ্রীমতী বেলা সেন সঙ্গীত করেন এবং নবসংহিতার প্রধান শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করেন।

গত ৮ই অক্টোবর, ১৬ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে ডাঃ উপেন্দ্রনাথ সরকারের গৃহে, তাঁহাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ সরকারের স্বর্গারোহণের প্রথম সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত দিননাথ সরকার স্বরচিত সময়োপযোগী সংগীত করেন। এই উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

কোচবিহারসংবাদ—মহারাজা শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণের স্বর্গারোহণদিনের সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠান সম্পাদন করিতে ভাই প্রিয়নাথ গত ১৬ই সেপ্টেম্বর, কোচবিহারে আগমন করেন। সহকারী সম্পাদক ভ্রাতা কেদারনাথের "করুণাকুটীর" গৃহে কয়দিন অবস্থান করেন। প্রাতঃ উপাসনান্তে ১৬ই এখানকার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণের সহিত দেখাশুনা করিয়া সদালাপ করেন। ভ্রাতা মনোরঞ্জন দের পরিবার সঙ্গেও প্রার্থনাদি করেন। পরদিন ১৭ই প্রাতে, কেশবাশ্রমে কয়েকটী বন্ধুসহ উপাসনা করেন ও সন্ধ্যায় মন্দিরে উপাসনা করেন। পরলোকসাধন বিষয়ে আত্মনিবেদন ও প্রার্থনাদি হয়। মন্দিরে কুমারী কোহিনুর মধুর সঙ্গীত করেন। ১৮ই শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণের সমাধি-মণ্ডপে প্রাতে ৮৷৷০টার সময় সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান গম্ভীরভাবে সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষেও কুমারী কোহিনুর সঙ্গীত করেন। গায়কও দুএকটি গান করেন। অপরাহ্ণ ৫টার সময়, মহারাজার মর্ম্মর-মূর্ত্তির পশ্চাতে, কাউন্সিল হলের বারাণ্ডায় স্মৃতিসভা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত উমাচরণ দাস মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ভাই প্রিয়নাথ উদ্বোধনসূচক প্রার্থনা করিলে, একটি যুবা স্বরচিত শ্রীনৃপেন্দ্র-স্মৃতি আবৃত্তি করেন। ভাই প্রিয়নাথ শ্রীনৃপেন্দ্রসমাগম সম্বন্ধে অভিভাষণ পাঠ করেন। থানড়াবাড়ীর

রাজপুরোহিতবংশীয় একজন উকীল মহারাজার মহদ্গুণাবলীর পুণ্যস্মৃতি বিশদরূপে বিবৃত করিলে, সভাপতি মহাশয় সুন্দরভাবে মহারাজার মহত্ত্বের বিষয় বলিয়া, পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তাদিগকে ধন্যবাদ দেন। পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ কান্তিলাল মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে সভা ভঙ্গ হয়। ডাঃ লাটু বাবু প্রমুখ কীর্ত্তনকারিদল সমাধিমণ্ডপে সমবেত হইয়া অনেকক্ষণ ভক্তি-উন্মত্তভাবে সংকীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনের পর ভাই প্রিয়নাথ প্রার্থনা করেন। শেষে হরির লুট হয়। ১৯শে প্রাতে করুণা-কুটীরে সকলকে লইয়া ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন ও একটি ব্রাহ্মণপরিবারে প্রার্থনা করেন। অপরাহ্ণে মণ্ডলীর উপাসক-দিগের সভা হয়। মিঃ চন্দ মহাশয় সভাপতির কার্য্য করেন। এখানে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা থাকার আবশ্যকতা ও মন্দিরের উপাসনার ব্যবস্থাদি বিষয়ে আলোচনাদি হয়। এই দিনই সন্ধ্যার গাড়ীতে ভাই প্রিয়নাথ কলিকাতা পুনর্যাত্রা করেন।

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর, রাজর্ষি রামমোহনের স্বর্গারোহণের শতবার্ষিকী উপলক্ষে কেশবাশ্রমস্থকুটীরে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় উপাসনা করেন।

১লা অক্টোবর, ব্রহ্মমন্দিরে, শ্রীমতী কুমুদিনী দাস উপাসনা করেন, মহিলারা সঙ্গীত করেন। ৩রা অক্টোবর, সন্ধ্যায়, কেশবাশ্রমস্থকুটীরে শারদীয় উৎসব উপলক্ষে কেদারবাবুই উপাসনাদি করেন।

প্রাপ্তগ্রন্থের সমালোচনা।

শ্রীকেশবকাহিনী—শ্রীমতিলাল দাশ প্রণীত। ৩২৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ১।০টাকা। মঙ্গলকুটীর, বিধানপল্লী, রমণা, ঢাকা—গ্রন্থকারের নিকট এবং ৮৯, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—নববিধান পাব্লিকেশন কমিটীর সেক্রেটারীর নিকট প্রাপ্তব্য।

ভাস্করগণ মৃন্ময়, দারুময় অথবা ধাতুময় পাত্রে এবং মূর্ত্তিতে মনোহর বিচিত্র রঙ্গ ফলাইয়া, সেই পাত্র বা মূর্ত্তিকে অতি সুন্দর বর্ণে রঞ্জিত করিয়া, লোকের মন আকর্ষণ করেন। কবিগণ আপনার মনের আদর্শকে নানা কল্পনার সাজে সজ্জিত করিয়া, সুন্দর কবিত্বময় সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে পাঠকের চিত্তকে আকর্ষণ করেন। যাঁহারা ভক্ত, বিশ্বাসী, সাধু, মহাজনদিগের জীবন চিত্রিত করিয়া লোক-সমাজের নিকট ধরিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের কার্য্য যেমন উচ্চ ও স্বর্গীয়, তেমনি কঠিন। তাঁহারা তো সাধু ভক্ত মহাজনদিগের জীবন পৃথিবীর ভাস্করোচিত কোন বাহ্যরঙ্গে কিম্বা কবিজনোচিত কোন কল্পনার তুলিতে চিত্রিত করিতে পারেন না। ভক্তি শ্রদ্ধার তুলিতে, নিখুঁত সত্যের রঙ্গে, তাঁহাদিগকে ভক্ত বিশ্বাসীদিগের জীবন চিত্রিত করিতে হয়; একটু কল্পনার অসত্যের ছিটা ফোটা তাহার উপর পড়িলে, সকলই কদাকার হইয়া যায়। কেননা, ভক্ত মহাজনদিগের জীবন নিখুঁত স্বর্গের উপাদানে গঠিত। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বলিলেন, "আমি মার হাতে গঠিত।" *"Every inch of my life is tremendously real."* তিনি বিশ্বাসী সাধকের জীবন-সম্পর্কে বলিলেন, বেদ বেদান্ত অপেক্ষা সাধকের জীবন বড়। সাধকের জীবনই শ্রেষ্ঠ বেদ। এই নবযুগে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যেমন সাধকের জীবন ও নিজের জীবনের মূল্য বুঝিয়া-ছেন, এমন আর কেহ বুঝিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। এইরূপ জীবনকে সেই জীবনের নানা কাহিনী দ্বারা চিত্রিত করিয়া, সত্যের রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া, সর্ব্বসাধারণের নিকট উপস্থিত করা যেমন সৌভাগ্যের ব্যাপার, তেমনই বড় কঠিন কর্ত্তব্য। আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত মতিলাল দাশ মহাশয় সেই কঠিন কার্য্যভার গ্রহণ করি-য়াছেন। তিনি ভক্ত ব্রহ্মানন্দের জীবন পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া, তাঁহার জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনী দ্বারা সেই জীবনকে সুন্দররূপে ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করিয়া, "শ্রীকেশবকাহিনী" গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। যুগপ্রেরিত সাধু মহাজনদিগের জীবন চিরদিনই লোকের নিকট বড় রহস্যময়, প্রহেলিকাময়। বিশেষ ভাবে ভক্ত ব্রহ্মানন্দের জীবন—সংসারের বাহ্যসাজে সজ্জিত, অথচ উচ্চ বৈরাগ্যের জীবন—কর্ম্ম-কোলাহলে, কর্ম্ম-ব্যস্ততায় পূর্ণ, অথচ সমাধিমগ্ন—যোগ, ভক্তি, প্রেম ও জ্ঞানের সমন্বয়ে বিচিত্র উচ্চ আধ্যাত্মিক সাধনার শ্রেষ্ঠ আদর্শ জীবন। স্বপক্ষের ও বিপক্ষের বাণী এই, কেশবচন্দ্রের ধর্ম্ম ও জীবন ধরিতে ও বুঝিতে বহু যুগ কাটিয়া যাইবে। তাঁহার ধর্ম্ম ও জীবন ভবিষ্যতের সামগ্রী। এই বিরাট অদ্ভুত নিষ্কলঙ্ক জীবনের উপর, বুঝিয়া না বুঝিয়া, অনেকেই ধূলা কাদা নিক্ষেপ করিয়াছেন। কথিত আছে, সোনার গৌরাঙ্গের সুন্দর অঙ্গে বাহিরের ধূলা কাদা নিক্ষিপ্ত [illegible] ছিল; শ্রীকেশবের নিষ্কলঙ্ক সোনার জীবনের উপর নিন্দা অপমানের ধূলা কাদা নিক্ষিপ্ত হইবে, ইহা অসম্ভব নয়। সেই নিক্ষিপ্ত ধূলা কাদা প্রক্ষালন করিয়া, শ্রীকেশবজীবনের বিবিধ সাধনসম্পদকে সহজ কথায়, সহজ কাহিনী-যোগে উজ্জ্বলরূপে সকলের মানস চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করার জন্যই "শ্রীকেশবকাহিনী"-প্রণয়নে বিশেষ প্রচেষ্টা। মতিবাবু সে বিষয়ে যে বিশেষ কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার প্রণীত "শ্রীকেশবকাহিনী" তাহার প্রমাণ দিবে। কেশবচন্দ্র শুধু বঙ্গভারতের সম্পদ নয়, কেশবচন্দ্র পৃথিবীর সম্পদ। কেশবচন্দ্রের অগাধ অমূল্য আধ্যাত্মিক জীবন, হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি পৃথিবীর সকল ধর্ম্মা-বলম্বীরই অতি আদরের সামগ্রী। তাই আশা করি, সর্ব্ব-শ্রেণীর ধর্ম্মার্থী সাধকদিগের নিকট, বিশেষভাবে ব্রাহ্মসমাজের ও নববিধানমণ্ডলীর পরিবারে পরিবারে, ধর্ম্মপিপাসু ব্যাকুলাত্মা সাধক সাধিকার নিকট, এ গ্রন্থ সাধনপথে বিশেষ সহায় বলিয়া আদৃত হইবে এবং ইহা পাঠে ধর্ম্মের অতি গভীর ও অমূল্য অনেক গূঢ়তত্ত্ব সহজে সকলের প্রাণে প্রতিভাত হইবে।

শ্রীগোপালচন্দ্র গুহ।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priya-nath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.
কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৮ ভাগ। ২০শ সংখ্যা। | ১৬ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩৪০সাল, ১৮৫৫শক, ১০৪ব্রাহ্মাব্দ। 2nd. November, 1933. | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

বিশ্বরাজ, পরম দেবতা! পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া প্রথমে মানুষের রাজ্য দেখিলাম, পশু পক্ষীর রাজ্য দেখিলাম, তৎপর পৃথিবীর রাজার রাজ্যও দেখিলাম। এখন তোমার নবযুগধর্ম্মের প্রভাবে এবং তোমার কৃপার বিশেষ আলোকে, এই ধরাধামে স্বর্গরাজ্যের শোভা-সৌন্দর্য্যময় এক অপূর্ব্ব দৃশ্য আমাদের অন্তরে প্রতিভাত হইতেছে। উর্দ্ধে অদেহী লোকেও তোমার স্বর্গরাজ্য, নিম্নে দেহধারী সাধু সজ্জনদের জীবনেও তোমার স্বর্গরাজ্য। উর্দ্ধ লোকেই বা স্বর্গরাজ্যের সীমা কোথায়? ইহলোকেই বা স্বর্গরাজ্যের সীমা কোথায়? উভয় লোকের সকলই তো আমাদের সম্বল ও সম্পদ্। ইহলোকে, দূরে নিকটে, স্বদেশে বিদেশে, যে কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ধর্ম্মজীবনে ধর্ম্মের যে কোন সম্পদ্ রহিয়াছে—যোগ, ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম্ম, বিশ্বাস, বাধ্যতা, শ্রদ্ধা, প্রীতি, নিষ্ঠা—সে সকলই আমাদের সম্বল ও সম্পদ। আমাদের জানিত সাধু ভক্ত আর কয়জন? স্বদেশের, বিদেশের অজানিত সাধু, ভক্ত, সজ্জন যে কত রহিয়াছেন। আকাশের নক্ষত্ররাজি যেমন কেহ গণনা করিয়া শেষ করিতে পারে না, অজানিত সাধু, ভক্ত, সজ্জনদিগের জীবনও তেমনি গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। জানিত সাধু সজ্জনদিগের সঙ্গে যেমন অকাট্য ভাবে জীবনের সম্বন্ধ, অজানিত সাধু সজ্জনদিগের সঙ্গে তেমনই অকাট্য অচ্ছেদ্য ভাবে জীবনের সম্বন্ধ, ইহাতো পূর্ব্বে ভাবিতেও পারি নাই। এখন অনিবার্য্য ভাবে, জীবন্ত স্বর্গীয় সম্বন্ধের আকারে, মানস চক্ষে, জানিত অজানিত ছোট বড় সকলের সঙ্গে জীবন্ত সম্পর্ক ও অখণ্ড যোগ প্রতিভাত হইতেছে। আমরা তো ভাবিয়া চিন্তিয়া, জানিত অজানিত সকল সাধু সজ্জনের জীবনকে, অখণ্ড ভাবে প্রত্যক্ষ গ্রহণ করিতে, সম্ভোগের বিষয় করিতে পারি নাই। সবই হইতেছে তোমার কৃপাতে, তোমার শিক্ষাতে। তুমি যদি নিজ কৃপাগুণে, তোমার নববিধানের বিশেষ আলোকে, আমাদের অন্তরে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে, এই ধরাধামে জানিত অজানিত সকল সাধু সজ্জনের আত্মিক জীবন লইয়া এক অখণ্ড স্বর্গরাজ্যের দৃশ্য দেখাইলে এবং সম্ভোগ করিতে দিলে, তবে আশীর্ব্বাদ কর, এ ধারণা, এ সাধনা, এ সম্ভোগ ক্রমে যেন আমাদের মধ্যে আরও উজ্জ্বল হয়, জীবন্ত হয়। তোমার কৃপার

দান অনেক পাই, অনেক হারাইয়া ফেলি। এ দান, এ সম্পদ যেন না হারাই।

শান্তিঃ ! শান্তিঃ !! শান্তিঃ !!!

—০—

সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের সাম্রাজ্য।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজকে জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সকলের জন্য, জগতের একমাত্র স্রষ্টা, পাতা, গতিমুক্তিদাতা ঈশ্বরের পূজার স্থানরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সার্ব্বভৌমিক মহা সম্মিলনের ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যথাসময়ে নব ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মোপাসনাকে জীবনের সমগ্র শক্তি ও সাধনা দ্বারা জীবন্ত করিয়া তুলিলেন। এই ব্রহ্মোপাসনা সম্পর্কে তিনি কত আশার কথা শুনাইলেন, এবং এই ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক ভাব সম্পর্কে তাঁহার ভাবে বিশেষ ব্যাখ্যা রাখিয়া গেলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পর ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র আসিলেন। তিনি ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকতাকে বিশেষ রূপেই বাড়াইলেন এবং তাহার কত বৈশিষ্ট্য দান করিয়া বিশেষ রূপেই তাহা দেশ বিদেশে প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ক্রমে স্বদেশ ও বিদেশের সমগ্র মানবসমাজ এই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মকে গ্রহণের জন্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবে, সমষ্টিগত ও ব্যষ্টিগত ভাবে, জীবনে জীবনে গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকতার সাক্ষ্যদান করিবে, ইহাই তো এই প্রেরিত মহাপুরুষদিগের জীবনের প্রাণগত চেষ্টা ও ভবিষ্যতের জন্য আশার বাণী।

ধর্ম্ম যদি ক্রমে অধিক হইতে অধিকতর ব্যক্তি গ্রহণ করিতে অগ্রসর না হইল, ধর্ম্ম যদি ক্রমে সকল মানুষের জীবনভূমিকে অধিকার করিয়া আপনার সার্ব্বভৌমিকতার লক্ষণ মানুষের আচার ও আচরণে না দেখাইতে পারিল, তাহা হইলে জগতেরই বা আশা কোথায়, আর সাধু ভক্ত মহাজনদিগেরই বা জীবনের সাফল্য কোথায়? প্রত্যেক মহাপুরুষ জীবনের রক্ত দিয়া, ছোট বড় সকলের জীবনে স্বর্গের ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রাণপাত করিলেন। মহাপুরুষ শ্রীবুদ্ধ বলিলেন, যে পর্য্যন্ত পৃথিবীর একটী লোকও নির্ব্বাণের ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত থাকে, সে পর্য্যন্ত আমি স্বর্গপ্রাপ্তি ইচ্ছা করি না। মহাপুরুষদিগের জীবনের বাণীতে ঈশ্বরেরই বাণী। সে বাণী তো কখন ব্যর্থ হইবার নয়। সময়ে সে বাণী জয়যুক্ত হইবেই হইবে। ইহকাল ও পরকাল ঈশ্বরের নিকট একই কাল। ইহকাল পরকাল ব্যাপিয়া মানবাত্মার ক্রমোন্নতির ফলে এ বাণীর সাফল্য হইবেই হইবে।

পৃথিবীতে ছোট বড় সকলের জীবনে যাতে সত্য ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়, পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যের সমাগম হয়, তজ্জন্যই প্রেরিত সাধু মহাজনদিগের পৃথিবীতে আগমন। ধর্ম্মের পরিপন্থী যাহা কিছু উপস্থিত হয়, তাহা দূর করিয়া দিয়া ধর্ম্মের পথকে সুগম করিয়া দেওয়াই সাধু সজ্জনদিগের কার্য্যের বিশেষ লক্ষ্য। নবযুগে যেমন সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের বিকাশ, প্রতিষ্ঠা ও প্রচার বিশেষ ভাবে হইয়াছে ও হইতেছে, তেমনি ধর্ম্মপথের পরিপন্থিরূপে কত কিছু নূতন নূতন আকারে প্রবলবেগে লোকের মনকে আক্রমণ ও অধিকার করিতেছে। স্কুল কলেজের ধর্ম্মহীন শিক্ষা এই পরিপন্থী মধ্যে প্রধান একটী। বর্ত্তমান শিক্ষার ভিতরে, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, জড়বাদ, অজ্ঞেয়বাদ, দুজ্ঞের্য়বাদ, নাস্তিকবাদ শিক্ষারত স্কুল কলেজের যুবক যুবতীদিগের মনকে বিকৃত করিয়া ফেলিতেছে। ইহার উপর বর্ত্তমান বাহ্য চাকচক্যপূর্ণ সভ্যতার প্রভাব। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উচ্চ শিক্ষিত এবং গভর্ণমেণ্টের কার্য্য-ক্ষেত্রে কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি [illegible]ণত বয়সে ধর্ম্মের বিশেষ আস্বাদন প্রাপ্ত হইয়া এবং মূল্য বুঝিয়া আপনার প্রাণের কথা সহজ ভাবে কোন বন্ধুকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপে বলিয়াছিলেন, "বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতার মত বড় বড় সহরে যাহারা পড়াশুনা উপলক্ষে স্কুল কলেজে গমনাগমন করে, তাহারা রাস্তায় দেখিতে পায়, বড় বড় জুড়িগাড়ী হাকাইয়া বাবুরা কোর্টে যাইতেছেন; তাঁহারা কেহ হাইকোর্টের জজ, কেহ ব্যারিষ্টার, কেহ উকীল, এটর্ণী প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। পথের ধারে অনেক বড় বড় বাড়ী সেই শ্রেণীর পদস্থ ব্যক্তিরই। এইরূপ দৃশ্য দেখিয়া তাহাদের প্রাণে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে, তাহারাও সময়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া কিসে বড় বাড়ী, বড় গাড়ীর অধিকারী হইতে পারে।" শিক্ষার্থীদের এইরূপ মনের অবস্থা বর্ণনা করিয়া তিনি দুঃখ করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, বর্ত্তমানের শিক্ষিত শ্রেণী যেন বড় বাড়ী, বড় গাড়ী এবং পৃথিবীর অন্যান্য ধন সম্পদের অধিকারী হইলেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের

হইল কি? অর্থাৎ এত 'দুদিনের খেলা, দু'দিনের মেলা, দুদিনে ফুরায়ে যায়।' তাঁহাদের স্থায়ী সম্পদ লাভ কি হইল? ধর্ম্ম-সম্পদ ভিন্ন কি ইহকালে পরকালে জীবনের স্থায়ী সম্বল, স্থায়ী সুখ শান্তির সামগ্রী কিছু আছে? পৃথিবীর ধন সম্পদের পশ্চাতে যে কেবল উৎকণ্ঠা, কেবল ভাবনা অশান্তি ও দুঃখ কষ্ট।" এই বিশিষ্ট ব্যক্তির নিজ জীবনের অভিজ্ঞতার বর্ণনার মধ্যে আমরা বর্ত্তমান সময়ের অধিকাংশ শিক্ষিত এবং শিক্ষার্থীদিগের মানসিক অবস্থার একটা চিত্র প্রতিফলিত দেখিতে পাই। ধর্ম্মের পথে বর্ত্তমান শিক্ষা ও সভ্যতার মধ্যে কত প্রতিকূল অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, গভীর ভাবে চিন্তা ও আলোচনা করিবার বিষয়। এ বিষয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ বাণী নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া আমাদের প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

"যে ব্যক্তি কার্য্য দ্বারা বিষয়রস ভোগ, বাক্য দ্বারা সেই রস চর্ব্বিতচর্ব্বণ এবং মনেতেও বিষয়রস চিন্তন ব্যতীত ক্ষণকালের জন্যও অন্য কোন বিষয়ের অনুশীলন করে না, যে ব্যক্তি দিবানিশির মধ্যে একবার ভ্রমেও ঈশ্বরের তত্ত্বরসের আলাপ করে না, তাঁহার মহিমা চিন্তনপূর্ব্বক তাঁহাতে একবার মনোনিবেশ করেনা এবং বাক্যেতে একবার তাঁহার গুণকীর্ত্তন করে না, সে ব্যক্তি কি প্রকারে অনুপম ঈশ্বরতত্ত্বের পরিচয় পাইবে এবং কি রূপেই তাঁহার প্রেমামৃত পানে প্রবৃত্ত হইবে। মনুষ্যের এইরূপ প্রকৃতি যে, যে বিষয় সর্ব্বদা অনুশীলন করা যায়, তাহাই অধিক আয়ত্ত হয় এবং যাহা নিত্য নিত্য অভ্যাস করা হয়, তাহাতেই বিশেষ অধিকার জন্মে। আমরা বালক কাল হইতে যেরূপ বিষয়-জ্ঞানের উপদেশ পাই, বিষয় লইয়া অনুশীলন করি এবং বিষয়-রসের চিন্তা করি, যদি তদনুসারে জগদীশ্বরের অপূর্ব্ব তত্ত্বের জ্ঞান প্রাপ্ত হই এবং তাঁহার তত্ত্বানুশীলন করা অভ্যাস করি, তাহা হইলে বিলক্ষণ দেখিতে পাই যে, তাঁহার সেই সুধাতুল্য অসামান্য প্রীতি-রসের নিকট সামান্য বিষয় সম্পদ কিছু মাত্র বোধ হয় না। তাঁহার প্রেমামৃতপান-জনিত অপূর্ব্ব সুখের নিকট বিষয়-ভোগ-জনিত সুখ সুখ বলিয়াই গণ্য হয় না এবং তাঁহার সেই পূর্ণ স্বরূপের নিকট এ জগৎ পদার্থ বলিয়াই অনুভূত হয় না। এই বিষয়ে যদি কাহারও সংশয় থাকে, তবে তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখুন, এখনই প্রমাণ পাইবেন। তিনি প্রতিদিন যথানিয়মে জগদীশ্বরের তত্ত্বরস আলোচনা করিয়া তাঁহার প্রকৃত পরিচয় লাভ করুন, প্রত্যহ নিয়মিত রূপে ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি দয়া প্রীতি প্রভৃতি অনির্ব্বচনীয় মহিমা সকল চিন্তা করিয়া তাঁহাতে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করুন এবং প্রতিক্ষণে হৃদয়ধামে সেই সর্ব্বসাক্ষী সনাতন পুরুষকে বর্ত্তমান রূপে প্রত্যক্ষ করুন; তাহা হইলে তাঁহার হৃদয়স্থিত প্রেমধারা আপনা হইতে উত্থিত হইয়া সেই অনন্ত প্রীতির সাগর জগদীশ্বরে প্রবাহিত হইবে এবং তাঁহার মন সেই অনুপম প্রেমরসের আস্বাদ পাইয়া পুনঃ পুনঃ তাহাই ভোগ করিতে ব্যস্ত হইবে, সংসারের সকল সুখই তাঁহার নিকট সামান্যবৎ প্রতীয়মান হইবে এবং পার্থিব সকল সম্পদ তাঁহার নিকট অগ্রাহ্য হইয়া উঠিবে।"

শ্রীমন্মহর্ষি দেবের উপরি উক্তি পাঠের সঙ্গে আমরা প্রাচীন ঋষিযুগের শিক্ষা-প্রণালী স্মরণ করি; এবং প্রতি পরিবারের পুত্রকন্যাদিগকে শিক্ষাকালে তাহাদের স্বাধীনতার নামে অবস্থা-স্রোতে ভাসাইয়া না দিয়া, বাহিরের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কিসে তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মশিক্ষা বিস্তার হয়, কিসে তাহাদের হৃদয় মন ধর্ম্মালোকে আলোকিত হইতে পারে, প্রাণগত যত্নে তাহার উপায় করি। তাহা হইলে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের সাম্রাজ্য ভবিষ্যৎ বংশের মধ্যে সহজে এবং স্বাভাবিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে। বিদ্যালয়ের যথার্থ শিক্ষা তো ধর্ম্ম-পথের অনুকূল ভিন্ন প্রতিকূল নয়। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র আশার বাণী রাখিয়া গেলেন, "দেশে যত শিক্ষা বিস্তার হইবে, দেশের লোক যত শিক্ষিত হইবে, তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম তাহাদিগকর্ত্তৃক ততই গৃহীত হইবে।"

ধর্ম্মতত্ত্ব।

স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচার।

আত্মশক্তির অধীনতা স্বাধীনতা। আত্মশক্তির যথেচ্ছ ব্যবহার স্বেচ্ছাচার। আত্মশক্তি ব্রহ্মশক্তি, আমার আমি যিনি তাঁর শক্তি, সেই ব্রহ্মশক্তির অধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা। আপন ইচ্ছামত তাহার অপব্যবহার করা স্বাধীনতা নয়, তাহা

স্বেচ্ছাচার। স্বাধীনতায় মানুষ সমুন্নত হয়, স্বেচ্ছাচারে মানুষের অধঃপতন হয়। অতএব স্বাধীন হও, স্বেচ্ছাচারী হইও না।

আত্মহত্যা ও নরহত্যা।

জীবনদাতাই জীবনের অধীনেতা। যিনিই জীবন দিতে পারেন, তিনিই জীবন নিতেও পারেন। মানুষ জীবন দিতেও পারে না, জীবন লইতেও পারে না। তাই আত্মহত্যা, জীবনহত্যা সর্ব্বধর্ম্মশাস্ত্রেই মহাপাপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত পর্য্যন্ত নাই। হিন্দুশাস্ত্র তাই বলেন, নরঘাতকের মুক্তি নাই। নববিধানের শিক্ষা আরো উচ্চ। যে ব্যক্তি ভাইকে না ভালবাসে বা কোন মানুষকে দ্বেষ করে বা ঘৃণা করে, সেই নরহত্যা করে।

রাজর্ষি রামমোহন, ব্রহ্মর্ষি ব্রহ্মানন্দ।

বিদ্যা বুদ্ধি, স্তব স্তুতিবলে সর্ব্বধর্ম্মশাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া রাজর্ষি রামমোহন সিদ্ধান্ত করিলেন, সর্ব্বধর্ম্মশাস্ত্র-মর্ম্ম এক ব্রহ্ম নিরঞ্জন, একমেবাদ্বিতীয়ম্। ব্রহ্মর্ষি ব্রহ্মানন্দ আত্মজ্ঞানে আত্মজীবনে ব্রহ্মপ্রেরণার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ও দর্শন করিলেন, সর্ব্বধর্ম্মই সেই একেরই বিধান, একই সত্য সনাতনের ধর্ম্ম। সকল ভক্তের, ঈশা, গৌরাঙ্গ, বুদ্ধ, মহম্মদেরও একই ঈশ্বর। সেই একমেবাদ্বিতীয়মের ধর্ম্মও একমেবাদ্বিতীয়ম্। সকল সন্তানও একমেবাদ্বিতীয়ম্। তাই হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান একই পরিবার। ঈশ্বর কেবল এক নন, ঈশ্বর একই, ইহাই নববিধানের দর্শন।

রাজর্ষি রামমোহনের বাণী।

"ওঁ তৎসৎ বেদের পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞার দ্বারা এবং বেদান্তশাস্ত্রের বিবরণের দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, সকল বেদের প্রতিপাদ্য সদ্রূপ পরব্রহ্ম হইয়াছেন।··· অধিকন্তু কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিলে সকলে অনায়াসে নিশ্চয় করিবেন যে, যদি রূপগুণবিশিষ্ট কোন দেবতা কিম্বা মনুষ্য বেদান্তশাস্ত্রের বক্তব্য হইতেন, তবে বেদান্ত পঞ্চাশদধিক পাঁচশত সূত্রে কোন স্থানে সে দেবতার কিম্বা মনুষ্যের প্রসিদ্ধ নামের কিম্বা রূপের বর্ণনা অবশ্য হইত; কিন্তু ঐ সকল সূত্রে ব্রহ্মবাচক শব্দ বিনা দেবতা কিম্বা মনুষ্যের কোন প্রসিদ্ধ নামের চর্চ্চার লেশ নাই।"

"ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞেয় নহে, কিন্তু তাঁহার উপাসনা কালে তাঁহাকে জগতের স্রষ্টা, পাতা, সংহর্ত্তা ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা লক্ষ্য করিতে হয়; তাঁহার কল্পনা কোন নশ্বর নাম রূপে কিরূপ করা যাইতে পা[illegible] ঈশ্বর ইন্দ্রিয়ের অগোচর, তাঁহার স্বরূপ [illegible]রূপে জানা যায়; জগতের নানাবিধ রচনার এবং নিয়মের দৃষ্টিতে তাঁহার কর্তৃত্ব নিয়ন্তৃত্ব নিশ্চয় হইলে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভব হয়।"

"আমাদিগের উচিত যে শাস্ত্র এবং বুদ্ধি উভয়ের নির্দ্ধারিত পথের সর্ব্বথা চেষ্টা করি এবং ইহার অবলম্বন করিয়া ইহলোকে ও পরলোকে কৃতার্থ হই।"

"সর্ব্বত্র বেদান্তে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মের উপাসনার উপদেশ আছে, অতএব ব্রহ্মই উপাস্য হয়েন।"

"যেখানে চিত্ত স্থির হয়, সেই স্থানে আত্মোপাসনা করিবেক, তীর্থাদি স্থানের বিশেষ নাই।"

"হে সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর, তুমি আমাদিগকে দ্বেষ মাৎসর্য্যাদি মিথ্যাপবাদে প্রবৃত্ত করাইবেনা।"

"ব্রাহ্মণ কে?—করতলস্থিত আমলকী ফলে যেমন নিশ্চয় হয়, তাহার ন্যায় পরমাত্মার সত্তাতে বিশ্বাস দ্বারা কৃতার্থ হইয়া, শম দমাদি সাধনে যত্নশীল এবং দয়া ও সরলতা, সত্য, সন্তোষ ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট ও মাৎসর্য্য, দম্ভ, মোহ ইত্যাদির দমনে যত্নবান্ যে ব্যক্তি হন, তাঁহাকেই কেবল ব্রাহ্মণ শব্দে কহা যায়; যেহেতু শাস্ত্রে কহে, 'জন্মপ্রাপ্ত হইলে সর্ব্বসাধারণ শূদ্র হয়। উপনয়নাদি সংস্কার হইলে দ্বিজ শব্দবাচ্য হন, বেদাভ্যাসদ্বারা বিপ্র, আর ব্রহ্মকে জানিলে ব্রাহ্মণ হন।' অতএব ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিই কেবল ব্রাহ্মণ, অন্য নহে, ইহা নিশ্চয় হইল।"

"যাঁহা হতে এই সকল ভূতের জন্ম হয়, জন্মিয়া যাঁহার অধিষ্ঠানে স্থিতি করে এবং ম্রিয়মাণ হইয়া যাঁহাতে পুনর্গমন করে, তিনি ব্রহ্ম, তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর।" "ব্রহ্ম একমাত্র দ্বিতীয়রহিত হন"। "নাম রূপ হইতে যিনি ভিন্ন হন, তিনি ব্রহ্ম, ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ সেই ব্রহ্ম, যাঁহাকে জানিলে ব্রাহ্মণ হয়। সেই জ্ঞানের ন্যূনাধিক্য দ্বারা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, [illegible] তাহার অভাব দ্বারা শূদ্র হয়, এই সিদ্ধান্ত।"

রাজর্ষি রামমোহনের আলেখ্য সম্বোধনে।

(নববিধানাচার্য্য শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের উক্তি অনূদিত)

কি সৌম্যমূর্ত্তি! কি জ্যোতিশ্চক্ষু! বর্ত্তমান নববংশের সর্ব্বজনসমাদৃত জন্মদাতা, ভারতের গৌরব। তোমার পবিত্র স্মৃতি দেশের সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে চিরতরে খোদিত হউক। শতাব্দী হইল, তোমার ঈশ্বর-প্রেরিত উজ্জ্বল মহত্ত্ব-প্রভাবে নূতন চিন্তাধারা প্রবাহিত হইয়াছে। অজ্ঞান দেশবাসীর জন্য এক নব ধর্ম্ম উদ্ভাসিত হইয়াছে। হায়! তুমি কি অতুল সম্পদ তাঁহাদের জন্য দিয়াছ, তাহা তাঁহারা এখনও জানিতে পারেন নাই। তোমার উপযুক্ত সম্মান তাই তাঁহারা দিতে পারেন নাই। কতই তোমার উচ্চ ভাব, কতই তোমার আত্মার মহানুভবতা, সমগ্র জগতের ন্যায় বিশাল এবং আকাশের ন্যায় উচ্চ মহৎ ভাব তুমি সঞ্চার করিয়াছ। কে সে ভাবের উচ্চতা এবং গভীরতার পরিমাণ করিতে পারে? জড়পূজা এবং কুসংস্কারে যে অগণ্য লোক

আচ্ছন্ন হইয়াছিল, মহাবলে তুমি তাহাদিগের নিকট এক ঈশ্বর-তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছ ; এবং শুধু তাহাই নয়, মহান্ প্রতিবাদ সত্ত্বেও তুমি তাহাদিগের জন্য এক ঈশ্বরপূজার মন্দির স্থাপন করিয়াছ। ইহা হইতে কি ফল ফলিতেছে ও ফলিবে, হে মহাপুরুষ, তাহা তুমি দেখিয়া যাও নাই। তুমি কেবল বীজ বপন করিয়াছ, আমরা এখন তাহার ফল ভোগ করিতেছি। তুমি কোনও মহান পরিবর্ত্তন সম্পাদন যদিও কর নাই, কিন্তু তুমি জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া প্রাচীন বেদান্তের পুনঃপ্রবর্ত্তনা করিয়াছ ; এবং কেবল তাহাতেই তৃপ্ত না হইয়া সৎসাহসের সহিত বিজাতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ হইতেও সত্য সংগ্রহ করিয়া দেশবাসীদিগকে তাহার শিক্ষা অর্পণ করিয়াছ। অভ্রান্ত নীতিবিধি শিক্ষা দিবার জন্য, ঈশার নীতি শান্তি সুখের পথপ্রদর্শক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছ। হিন্দু জাতিকে খৃষ্টকে অর্পণ করা কি সামান্য বীরত্ব? কিন্তু তোমার অন্তর তাহাতে কম্পিত হয় নাই। ভারত-সংস্কারের সেই উষাকালে প্রাচীন আর্য্যধর্ম্মের একেশ্বরবাদের সহিত খৃষ্টীয় ধর্ম্মের উচ্চ জীবন এবং পবিত্রতার সমন্বয় সাধন তোমারই পূজার চিন্তার প্রবর্ত্তনা। বিশ্বাস এবং চরিত্র, মত এবং ধর্ম্মজীবন, উপাসনা এবং বিবেকের সমস্রোত তোমার সময় হইতেই ভারতের শিক্ষিতসমাজে প্রবাহিত হইয়াছে। ধন্য ধন্য হও, হে ভারতের পরম উপকারী বন্ধু। ঈশ্বর-প্রেরিত শিক্ষা-গুরু, তোমারই পদপ্রান্তে বসিয়া আমরা সমন্বয়তত্ত্ব এবং সাধন শিক্ষা করি। এখনও তোমার রসনা হইতে সুগম্ভীর ভাবে যে জড়বাদের প্রতিবাদ সমুত্থিত হইতেছে, তাহা সমগ্রদেশে ধ্বনিত এবং প্রতিধ্ব[illegible] হউক। তোমার স্বদেশ-প্রেম এবং দেশ-হিতৈষণা ভারতের সহস্র সহস্র যুবকদিগকে সঞ্জীবিত করুক। নব্য ভারত তোমার উদার ধর্ম্মসমন্বয় গ্রহণ করিয়া, জড়বাদ এবং কুসংস্কার পরিহার করুক এবং খৃষ্টকে সম্মান করিয়া তাঁহার উচ্চ নীতি অবলম্বনে সক্ষম হউক। তোমার মহৎ জীবনের জ্ঞান-পিপাসা, নির্ভীকতা এবং ধর্ম্মোৎসাহ আমাদের চরিত্রে যেন সঞ্চারিত হয়। হে স্বদেশ-প্রেমিক, জাতির উপকারী বন্ধু, ভারতের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ, তোমার একেশ্বরের নব তত্ত্ব আমাদিগকে শিক্ষা দাও। আমাদের শিক্ষা-গুরু ও ধর্ম্মনেতা, তোমার জ্যোতির্ম্ময় আত্মা স্বর্গের আনন্দলোকে, জ্যোতির্ম্ময় লোকে নিত্য গৌরবান্বিত হউক, ইহাই সকৃতজ্ঞ ভারতের প্রাণের প্রার্থনা।

—০—

ধর্ম্মপিতামহ রাজর্ষি রামমোহন রায়।

(স্বর্গারোহণের শতবার্ষিক উৎসব-সভায় পুরী "ক্লার্ক হলে" ভাই প্রিয়নাথ মল্লিকের প্রার্থনা ও আত্মনিবেদন)

হে অদ্বিতীয় পরমেশ্বর, আমাদিগের আর্য্য ঋষিদিগের নিকট তুমি এক অদ্বিতীয় পরমাত্মারূপে প্রকট হইয়াছিলে ; কিন্তু তাঁদের পরবর্ত্তীরা তোমাকে এক ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিলেও, হায়, তোমাকে কতরূপে, কত মূর্ত্তিতে কল্পনা করিয়া, কত মতে, কত পথে, কত সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলেন। অন্নকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াও, কেন "বার রাজপুতের তের হাঁড়ি" হইল? এইরূপে কতই পরস্পরকে পর পর দূর দূর মনে করিয়া, ধর্ম্মের নামেও বিবাদ বিসম্বাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাই দেখিয়া তুমি তোমার সন্তান রামমোহনকে প্রেরণ করিয়া, সেই প্রাচীন বেদবেদান্ত-প্রতিপাদ্য এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর যে তুমি, তোমার উপাসনা করিতে শিখাইলে। তোমার অভিপ্রায় এই যে, আমরা এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইয়া এক ধর্ম্ম লাভ করিব। এক ধর্ম্ম বিনা কেমনে আমরা এক পরিবার, এক অভিন্ন জাতি হইব? এক জগন্নাথের মহাপ্রসাদ জানিয়া এক অন্ন আহার না করিলে, কেমন করিয়া একান্নবর্ত্তী পরিবার হইব? আশীর্ব্বাদ কর, সেই রাজর্ষি ধর্ম্মপিতামহের অনুসরণে, এক ঈশ্বর বলিয়া কেবল নয়, তোমাকে একই পিতামাতা জানিয়া, একেরই পূজা করিয়া, আবার এক অখণ্ড জাতি হই এবং তোমার যুগধর্ম্মবিধান নববিধান পূর্ণ করি। তাহা হইলেই তোমার প্রেরিত ধর্ম্মপিতামহ রাজর্ষির প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আমরা ভারতবাসী সকলে ধন্য হইব।

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানং অধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভগবৎগীতায় যাহা বলিয়াছিলেন, সেই ভাবেই বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্মগ্লানি সংশোধনপূর্ব্বক নব যুগধর্ম্মের বীজবপনার্থেই আমাদিগের ধর্ম্মপিতামহ রাজর্ষি রামমোহন ঈশ্বর-প্রেরিত।

আজ শতবর্ষ পূর্ণ হইল তিনি সুদূর সাগরপারস্থ ব্রিষ্টল নগরে তিরোধান করেন। তাহারই শতবার্ষিকী উপলক্ষে, সেই দিব্য আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবার জন্যই আমরা এখানে সমবেত। তাঁহার জীবনকাহিনী যদিও অনেকেরই জানা আছে, সংক্ষেপে তাহা আজ স্মরণ করাইয়া দিলে, বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আমারও জন্মস্থান হুগলি জেলায়। এই জিলার খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকট রাধানগর গ্রামে, ২২শে মে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে, মহাত্মা রামমোহন জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রামকান্ত রায়। দেশীয় প্রথানুসারে গ্রাম্য পাঠশালায় রামমোহন অতি অল্প বাঙ্গালা শিক্ষা করেন। তাঁর পিতা পারস্য ভাষা শিখিবার জন্য শৈশবেই তাঁহাকে পাটনায় পাঠাইয়া দেন। তাঁর বয়স যখন ৯বৎসর, তার মধ্যে তিন বার বিবাহ হয়। তিনি অল্পায়াসেই পাটনায় গিয়া পারশী ও আরবী ভাষায় এমনি ব্যুৎপত্তি লাভ করেন যে, আরবী ভাষায় ইউক্লিড ও আরিষ্টটলের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে সক্ষম হন। ইহা হইতেই তাঁহার প্রচলিত

হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আস্থা চলিয়া যায় এবং ১৬ বৎসর বয়সে পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম্মের সংস্কারের বিরুদ্ধে একটী গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে তিনি প্রতিপাদন করেন যে, বৈদিক আর্য্য ধর্ম্মই যথার্থ হিন্দু ধর্ম্ম। বাস্তবিক হিন্দুনামও সিন্ধুনদের এপারস্থ ব্যক্তি-দিগের প্রতি মুসলমানধর্ম্মাবলম্বীদিগের বিদ্রূপাত্মক আখ্যা মাত্র।

যাহা হউক, তাঁহার পিতা তাঁহার উপর উত্যক্ত হওয়াতে, রামমোহন গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। কি অদম্য তাঁহার ধর্ম্মোৎসাহ! সেই ১৬ বৎসর বয়সেই তিনি পদব্রজে তিব্বত দেশে গমন করিলেন এবং প্রায় ৩ বৎসর কাল তথায় থাকিয়া তিব্বতীয় বৌদ্ধ ধর্ম্মের তত্ত্ব অনুসন্ধান করেন। সেখানেও লামাদিগের পৌত্তলিক আচরণ দেখিয়া তাহারও প্রতিবাদ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই; তাহাতে তাঁহার জীবন অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে এবং কোনও প্রকারে তথাকার মহিলাগণের সাহায্যে অব্যাহতি পাইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। কাশীতে আসিয়া বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়নে নিরত হন। যখন তাঁর বয়স প্রায় ২০ বৎসর, তাঁর পিতা তাঁহার প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া ঘরে আসিতে দেন। এই বয়সে জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য, তিনি প্রথম ইংরাজী ভাষা শিখিতে অনুরাগী হন। তাঁহার ধর্ম্মমত তখনও যেমন তেমনিই থাকাতে, তিনি পুনরায় পিতার বিরাগভাজন হন। তিনি এই সময় ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কাজ লন ও পরে রঙ্গপুরে গিয়া কলেক্টরের আপিসে দেওয়ানী কার্য্য গ্রহণ করেন। শেষে রংপুরের অন্তর্গত এক জমীদারের নাবালকদিগের রক্ষকরূপেও কাজ করেন।

১৮০৩খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। পিতৃবিয়োগের পর প্রায় ৪১বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতায় গিয়া, নানা শাস্ত্রগ্রন্থ অনুশীলন করিয়া, পণ্ডিতগণের সহিত ধর্ম্মবিষয়ে বিচারে প্রবৃত্ত হন। তিনি এই সময়ে পাঁচখানি উপনিষদ মূল ভাষ্যের সহিত মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করেন এবং পরে বেদান্তসূত্রেরও বাঙ্গালা অর্থ প্রকাশিত করেন। ইহাতে হিন্দুসমাজে মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। পণ্ডিতগণ কেহ কেহ তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিয়া, তাঁহার মত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহাদের মধ্যে সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী নামে এক ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু রামমোহনের গভীর গবেষণাপূর্ণ এবং বিচারসঙ্গত যুক্তির নিকট তিনি পরাস্ত হন। সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দি ও ইংরাজিতে রামমোহন সেই পণ্ডিতের মতের প্রতিবাদ প্রকাশ করেন। শঙ্কর শাস্ত্রী নামক জনৈক মান্দ্রাজী পণ্ডিতকেও এমনি ভাবে পরাস্ত করেন। কয়েকখানি উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াও তিনি প্রকাশ করেন। খৃষ্টানমিশনারিগণের সহিতও তাঁহার যথেষ্ট বাদানুবাদ হয়। হিব্রু ও গ্রীকভাষায় তিনি বাইবেল গ্রন্থ পাঠ করিয়া, খৃষ্টীয় ত্রিনীতিবাদের যথাযথ প্রতিবাদ করেন এবং এডাম নামক একজন ত্রিনীতিবাদীকে আপন মতে আনিতে সক্ষম হন। এই সময়ে তিনি খৃষ্টের নীতি শান্তি এবং সুখ লাভের সহায় বলিয়া খৃষ্টের উক্তি সকল সংগ্রহ-পূর্ব্বক একখানি পুস্তক প্রকাশিত করেন।

মুসলমান ধর্ম্মেরও কুসংস্কারের ও মুসলমানধর্ম্মাবলম্বিগণের জোর করিয়া মুসলমান করার ভয়ানক প্রতিবাদ করেন এবং তাহা সংশোধনের জন্য পারস্য ভাষায় "তহফতোল মহদ্দীন" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত করেন। তাহাতে লিখিয়াছেন, "আমি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টানাদি নানা সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত ও ধর্ম্ম-শাস্ত্রের গূঢ় আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, ঈশ্বর একমাত্র অদ্বিতীয় এবং তিনিই উপাস্য। এই মূল মতে সকলেরই ঐক্য আছে, কেবল অবান্তর বিষয় লইয়া বিবাদ বিসম্বাদ।"

আমাদের ধর্ম্মপিতামহ এই ভাবে সর্ব্বধর্ম্মসম্প্রদায়ের অবান্তর বিষয়ে যে বিবাদ, ইহা নিষ্পন্ন করিয়া, সর্ব্বশাস্ত্রের সার মর্ম্ম যে এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম, তাহাই শিক্ষাদান করিতে বিশেষ ভাবে আসিয়াছিলেন। তাই তিনি বন্ধু বান্ধবদের উৎসাহে ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনার জন্য প্রথমে "আত্মীয় সভা" নামে একটী সভা গঠন করেন। "হরকরা" নামক সংবাদপত্রের সংলগ্ন একটী গৃহে এডাম সাহেব ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশ দান করিতেন, বন্ধুগণের সহিত রামমোহন সেই উপদেশ শুনিতে যাইতেন। তাঁহার বন্ধুগণ এক দিন দুঃখ করিয়া বলিলেন, "ধর্ম্মোপদেশলাভের জন্যে বিদেশীয়ের শরণাপন্ন হওয়া কি নীচতা নয়?" ইহা শুনিয়া মাণিকতলাস্থ কমল বসুর বাটীতে রামমোহন একটী উপাসনা-সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে এক বৎসর মাত্র উপাসনার পর, ১৮৩০খৃঃ জানুয়ারী মাসে বা ১৭৫১শকের ১১ই মাঘ, চিৎপুর রোডস্থ আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়া, সেখানে বেদ-বিহিত উপাসনা প্রবর্ত্তন করেন।

এই গৃহের *Trust Deed*এ, তাঁহার উচ্চ উদার মত অতি বিশদরূপে তিনি বিবৃত করেন। ইহার মর্ম্ম এই, "সকল শ্রেণীর এবং সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তি, যাঁর ধর্ম্মমত যাহা হউক না কেন, এখানে সকলেই জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে, সেই অনন্ত অজ্ঞেয় অসীম পরব্রহ্ম, যিনি সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা এবং পাতা, তাঁহার উপাসনা করিবেন। এখানে কোন মূর্ত্তি বা ছবি বা অঙ্কিত কোনও পদার্থের পূজা অর্চ্চনা হইবে না। এখানে কোনও প্রকার জীবহত্যা হইবে না এবং এখানে জীবন-রক্ষার প্রয়োজন ব্যতীত কোনও প্রকার পান ভোজন করিতে কেহ পারিবেন না। এখানে কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কোন উপদেশাদি কেহ দিবেন না। কিংবা কোনও মূর্ত্তি বা ব্যক্তির পূজা অর্চ্চনা যদি কোনও সম্প্রদায়ের কেহ করেন বা করিবেন, তাঁহাদেরও বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ এখানে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না। এখানে যেমন সেই সর্ব্বভুবনেশ্বরের ধ্যান, চিন্তা, উপাসনা হইবে, তেমনি পুণ্য প্রেম দয়া দাক্ষিণ্যাদিরও সকল প্রকার অনুষ্ঠান সম্পাদিত হইবে এবং সর্ব্ববিষয়ে সকল সম্প্রদায়স্থ জনগণের মধ্যে সম্প্রীতি ও সদ্ভাব যাহাতে সংস্থাপিত হয়, তাহারই জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে চেষ্টা করা হইবে।

এই সার্ব্বজনীন এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের পূজার বিধি ইতিপূর্ব্বে কখনও এভাবে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। মহাত্মা রামমোহনের মহাপ্রাণে স্বয়ং বিধাতাই এই নবালোক সঞ্চার করিয়া, তাঁহাকে বর্ত্তমান যুগধর্ম্মবিধানের প্রথম বীজবপনে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই উদার উচ্চ সার্ব্বজনীন ধর্ম্মবিধানের ভিত্তিতে উপাসনা তখনও কার্য্যতঃ সাধনের সময় হয় নাই বলিয়াই হোক, কিংবা যে কারণেই হোক, রাজা রামমোহন এখানে যে উপাসনার ব্যবস্থা করেন, তাহা বেদোক্ত গায়ত্রীর মন্ত্রসাধন। একটী প্রকোষ্ঠে যদিও বেদপাঠের ব্যবস্থা হয়, কিন্তু সেখানে কেবল ব্রাহ্মণেরা প্রবেশ করিতে পারিতেন; অপর সাধারণের জন্য অন্য প্রকোষ্ঠে ধর্ম্মসঙ্গীত এবং ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ দেওয়া হইত। তিনি যদিও নিয়ম করেন, হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান সকলই সম্প্রদায়ের লোকেই এখানে একত্রে এক ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারিবেন, কিন্তু কার্য্যতঃ কেবল হিন্দু সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণ যাহাতে বেদ-প্রতিপাদ্য একেশ্বরের উপাসনা সাধন ও শিক্ষা করিতে সমর্থ হন, তাহারই ব্যবস্থা তিনি করিলেন। বীজ কখনও একেবারে বৃক্ষে পরিণত হয় না। তাই বিধাতা তাঁহাকে দিয়া যাহা করাইবার করাইলেন; পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ দ্বারাই সেই বীজে জলসিঞ্চন এবং পরে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে দিয়া তাহা ফল ফুলে শোভিত উদ্যানে পরিণত করাইলেন।

রামমোহন যেমন এই বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের সূত্রপাত করিলেন, তেমনি সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা-বিস্তার, বাঙ্গলা ভাষায় গদ্যরচনা ইত্যাদিও তাঁহারই মহা ঐশীশক্তির কার্য্য।

সতীদাহ প্রথার ভীষণ দৃশ্য তিনি স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তাঁহার করুণ হৃদয় এতই ব্যথিত হইল যে, তিনি সে প্রথা-নিবারণের জন্য মহাবীরের ন্যায় খড়্গ উত্তোলন করিলেন। হিন্দু শাস্ত্র হইতে বচন সকল উদ্ধৃত করিয়া, এই প্রথার অযৌক্তিকতা দেখাইয়া শুধু পুস্তক রচনা করিলেন তাহা নয়, তখনকার মহানুভব গভর্ণর স্যার উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ককে প্রোৎসাহিত করিয়া তাঁহা দ্বারা আইনানুসারে এই কুপ্রথা বন্ধ করিয়া দিলেন। ইংরাজীশিক্ষা-বিস্তারের জন্য ডেভিড হেয়ার সাহেবের সাহায্যে বিদ্যালয় স্থাপন করাইলেন এবং আপনিও নিজ তত্ত্বাবধানে একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তখনকার ইংরাজ মিশনারীদেরও সংস্কার ছিল, ইংরাজী লেখাপড়া শিখিলে দেশীয় সরলমতি ব্যক্তিরা ইংরাজনাবিকদের মত মদ খাওয়াইয়া এবং ঠকাইয়া কেবল পয়সা রোজগার করিবে এবং ক্রমে পাশ্চাত্য শঠতা শিক্ষা করিবে। ইহা নিতান্ত অলীক না হইলেও, মহাত্মা রামমোহনের জ্ঞান-গরিমা-প্রভাবেই এদেশে ইংরাজী শিক্ষার সূত্রপাত হইয়াছে এবং তাহা হইতেই যে বর্ত্তমান নবজাগরণের অভ্যুদয়, কে না তাহা স্বীকার করিবেন?

বাঙ্গলা ভাষায় গদ্য-রচনার প্রবর্ত্তনাও রামমোহনের দ্বারাই হয়। তিনি এজন্য স্বয়ং একখানি ব্যাকরণ লিখিয়া বাঙ্গলার গদ্য লেখার প্রণালী শিক্ষাদান করেন। ইতিপূর্ব্বে পদ্য-রচনারই চলন অধিক ছিল।

এদেশের রাজ্যশাসন-বিষয়ক উন্নতি বিধান-সম্বন্ধেও তৎকালীন রাজকর্ম্মচারিগণ শ্রীরামমোহনেরই সুচিন্তিত পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। বিলাতস্থ রাজপুরুষগণকেও রাজ্যশাসনবিষয়ে সৎপরামর্শ দিবার জন্য এবং দিল্লীর বাদসাহের মাসহারা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতে তিনি বিলাতযাত্রা করিতে কৃতসংকল্প হন।

দিল্লীর বাদসাহই তাঁহাকে রাজা উপাধি দিয়া তাঁহার প্রতিনিধিরূপে রাজদরবারে পাঠাইতে চান। কিন্তু ইংরাজ প্রতিনিধিগণ তাহাতে সম্মত হন নাই। তাই তিনি নিজ দায়িত্বে ব্যক্তিগত ভাবে ১৮৩১খৃঃ "এলবিয়ন" নামক সমুদ্রপোতে তিনজন সহচর সহ ইংলণ্ড যাত্রা করেন। ইহাই প্রথম বঙ্গসন্তানের সমুদ্রযাত্রা। সেখানে গিয়া তিনি ধনী মানী বিদ্বান ধার্ম্মিক সকল শ্রেণীর ব্যক্তিদের দ্বারা সমাদৃত হন। রাজপুরুষগণও তাঁহার উদার সদ্ব্যবহার ও মহত্ত্বে মুগ্ধ হন। রাজপুরুষগণও তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করেন ও তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করেন। কয়েক মাস ইংলণ্ডে থাকিয়া তিনি ফরাসী দেশে গমন করেন, সেখানেও যথেষ্ট সম্মানিত হন। ফ্রান্সে কয়েকমাস থাকিয়া তিনি পুনরায় ইংলণ্ডে গিয়া ডেভিডহেয়ার সাহেবের ভ্রাতার আতিথ্য লইয়া ব্রিষ্টল নগরে গমন করেন। এখানে আসিয়া ৯দিন পরেই জ্বর হয় এবং ১৮৩৩খৃঃ ২৭শে সেপ্টেম্বর, ৫৯ বৎসর বয়ঃক্রম কালে, দেহপুরবাস ত্যাগ করিয়া তিনি অমরধামে যাত্রা করেন। শেষ নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় নাকি রাজর্ষি ওঁ শব্দ উচ্চারণ করিয়াছেন। এই ব্রিষ্টল নগরেই তাঁহার দেহাবশিষ্ট প্রোথিত হয়। এখানে আমাদের ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পিতৃদেব প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের উদ্যোগে ও সাহায্যে এক মর্ম্মরসমাধি সার্ব্বজনীন তীর্থরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সূর্য্যদেব যেমন পূর্ব্বাকাশে উদিত হইয়া, আপন প্রখর-কিরণ সর্ব্বদেশে বিতরণ করিয়া, পশ্চিমাকাশে অস্তমিত হন, আমাদের ধর্ম্মপিতামহও ঠিক যেন তেমনি এই পূর্ব্বদেশের ক্ষুদ্র পল্লীতে জন্মগ্রহণ করিয়া, সমগ্র দেশ এবং সমগ্র জগৎকে নবসত্যালোকে আলোকিত করিয়া, পূর্ব্ব পশ্চিমকে যেন একই উদার প্রেমে আলিঙ্গন দান করতঃ, সেই পশ্চিম দেশে অস্তমিত হইলেন।

আজ সেই দিন, যেদিন রামমোহনের দিব্য আত্মা তিরোধান করিয়াছেন। একশত বৎসর হইল তাঁহার দিব্য দেহ তিরোহিত; কিন্তু তাঁহার দিব্য আত্মা, অমর আত্মা অমৃতলোকে চিরজীবিত। পতিত ভারতের পুনরুদ্ধারের জন্য, অজ্ঞান অন্ধকারাচ্ছন্ন আমাদের দেশবাসীদিগের মধ্যে প্রাচীন বেদ বেদান্তের ধর্ম্ম পুনঃপ্রবর্ত্তনের জন্য, তিনি যথার্থই ব্রহ্মপ্রেরিত। ভারতে যুগযুগান্তে কতই ধর্ম্মাবতার মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, বর্ত্তমান কলিযুগও যে পরিত্যজ্য নয়, তাহারই প্রমাণ—মহাত্মা রামমোহনের

আবির্ভাব ও তিরোভাব। এস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত তর্ক-যুদ্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, "মহম্মদ কেবল শেষ পয়গম্বর নন, আরও দেশ দেশান্তে, যুগ যুগান্তে অনেক পয়গম্বর আসিবেন।" শ্রীরামমোহনও যে সেই শ্রেণীরই একজন, আমরা মুক্তকণ্ঠে আজ স্বীকার করি। ঋষিগণ যেমন প্রাজ্ঞবাসরে প্রার্থনা করিতেন, "যত্তে বিশ্বমিদং জগন্মনো জগাম দূরকং। তত্ত আবর্ত্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে"॥ আমরাও তেমনি আজ শ্রীরামমোহনের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করি, "তোমার যে আত্মা এই নিখিল বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে, আমরা তাহাকে পুনরাহ্বান করিতেছি, তাহা আমাদের মধ্যে বাস করুক এবং জীবিত থাকুক।" মানবজাতির ঐক্যবন্ধনের প্রকৃত উপায়—একেশ্বরের উপাসনায় একধর্ম্মসাধনে একান্নবর্ত্তী পরিবাররূপে নিবদ্ধ হওয়া। শ্রীরামমোহন তাহারই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। আজ তাঁহারই অনুসরণে যেন আমরা কৃত সংকল্প হই।

(২)

(চট্টগ্রামে, ২৭শে সেপ্টেম্বর, স্মৃতি-সভায়, শ্রীমান্ সুব্রত চৌধুরী কর্ত্তৃক নিবেদিত)

বিগত ১৮৩৩খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর রাজা রামমোহন ব্রিষ্টল সহরে দেহরক্ষা করেন। আজ ১৯৩৩ সনের ২৭শে সেপ্টেম্বর। এই একশত বৎসর যাবৎ স্কুলপাঠ্য পুস্তকে, ইতিহাসে, জীবনচরিতে এবং অন্যান্য সদ্‌গ্রন্থে তাঁহার সম্বন্ধে যে সমস্ত কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, আমার পূর্ব্ববর্ত্তিগণের অনুকরণে তাহার পুনরাবৃত্তির পুনরভিনয় করিয়া আমি আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি করিব না। আমি নূতন কথা কহিব। রামমোহন রায়কে আমি একজন intellectual superman এবং father of Indian Renaissance (ভারতীয় নবযুগের জন্মদাতা) জ্ঞানে শ্রদ্ধা করি। দীর্ঘকালব্যাপী তমসাচ্ছন্ন মধ্যযুগের পর, জ্ঞানের নবরশ্মি ভারতে তিনিই প্রথম প্রজ্বলিত করেন; চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইতালিতে pagan renaissance-এর প্রতিষ্ঠাতাদের ন্যায়, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যাহা একান্ত উত্তম, তাহা সম্মিলিত করিয়া ভারতের সর্ব্বত্র তিনি নব ভাবধারার প্রবাহ প্রেরণ করেন। এবং তাঁহারই প্রারব্ধ কার্য্য পূর্ণতর রূপে সম্পন্ন করিয়াছেন, এ যুগের তিনজন প্রতিভাবান্ কর্ম্মবীর, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী এবং কবি রবীন্দ্রনাথ।

আর্য্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, শঙ্করাচার্য্য, ভাস্কর প্রভৃতি মনস্বীদের দেহাবসানের পর, সুদীর্ঘ পঞ্চশতাধিকবর্ষব্যাপী গভীর তমিস্রা ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। কবীর, দাদু, নানক, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণ অনুভূতির দিক দিয়া (emotionalism) অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দেন বটে, কিন্তু অনুশীলন-মার্গে (intellectualism) তাঁহাদের সাধনার কোনও পরিচয় আমরা পাই না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পূর্ব্বকথিত পণ্ডিতাগ্রগণ্যদের মানসিক উত্তরাধিকারী রামমোহন প্রতিভার বৈজয়ন্তিকরূপে দেখা দিলেন। তাঁহাকে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, সাধু বা religious fanatic মনে করিবার কোনই কারণ নাই, তিনি কর্ম্মবীর এবং মহামানব। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি এবং তৎপ্রচারিত ধর্ম্ম জনসাধারণের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ইহার প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করিতেছি, আজ মহাষ্টমীর সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম সহরস্থ বাহান্ন হাজার অধিবাসীর মধ্যে ন্যূনাধিক বারো হাজার নরনারী দেবী প্রতিমাকে প্রণাম করিতে বাহির হইয়াছে; কিন্তু বাহান্ন জন ব্যক্তিও রাজা রামমোহনের স্মৃতি-তর্পণ-সভায় উপস্থিত নাই।

রামমোহনের চরিত্রের আর যে দিক আমাদিগকে বিস্মিত করে, তাহা তাঁহার iconoclasm। Iconoclast অর্থে আমি, destroyer of all idols of social, moral and religious fictions (সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভ্রান্ত মতের সংহারক) বলিতে চাহি। বিচারবুদ্ধি দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলেন, মানুষ দেবতা নহে, শাস্ত্র অভ্রান্ত নহে এবং শুষ্ক দেবমন্দির স্বর্গ নহে। এত বড় iconoclastকে দেবতা জ্ঞানে অর্চ্চনা করিলে নিতান্তই অন্যায় করা হইবে। তাঁহার সম্বন্ধে প্রচারিত জীবনচরিতগত উপকথা (biographical fictions) সমূহ খণ্ডন করার সময় আসিয়াছে। আশ্বিন মাসের "বঙ্গশ্রীতে" প্রকাশিত বিশিষ্ট ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "রামমোহন রায়ের প্রথম জীবন" শীর্ষক প্রবন্ধে তাঁহার চরিত্রগত অনেক দুর্ব্বলতার কথাই প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইতে ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, রাজা রামমোহন তপস্বী ছিলেন না, ছিলেন দোষে গুণে মানুষ; বরঞ্চ এই সমস্ত ব্যাপারেও তাঁহার বহুমুখী প্রতিভারই পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্ম্মপ্রচারকার্য্য তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্যও ছিল না এবং প্রথম লক্ষ্যও ছিল না।

অপরদিকে, গত সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতীয় ইতিহাসে তাঁহার ন্যায় মনস্বী, উদ্যমপরায়ণ কর্ম্মবীরের পরিচয় অতি অল্পই পাওয়া যায়। তাঁহার জ্ঞানের প্রাচুর্য্য ও বুদ্ধির প্রখরতার সম্মুখে ভারতীয়গণ সম্মিলিত ভাবে চিরকাল শ্রদ্ধা নিবেদন করিবে। তাঁহার ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে, এমন মনুষ্য বিরল। তিনি সম্প্রদায়-বিশেষের সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ religious reformer নহেন, তিনি সমগ্র ভারতের গৌরব intellectual giant। তাঁহাকে আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি, তাঁহার ধার্ম্মিকতার জন্য নহে, জ্ঞানানুশীলনের ও পাণ্ডিত্য-প্রতিভার জন্যই।

পূর্ব্ববাঙ্গলা নববিধান ব্রাহ্মসমাজ।

(ত্রিপঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক উৎসব)

পূর্ব্ববাঙ্গলা নববিধান ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ এ বৎসর একটী জমাট সাম্বৎসরিক মহোৎসব সম্ভোগ করিয়াছেন। কলিকাতা এবং ময়মনসিংহ হইতে সমবিশ্বাসী শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুগণ আসিয়া উৎসবানন্দ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ৩১শে আগষ্ট, বৃহস্পতিবার, সায়ংকালে আরমাণীটোলাস্থ ব্রহ্মমন্দিরে আরতি ও উদ্বোধন-সূচক উপাসনা হয়। ভাই মহিমচন্দ্র সেন উপাসনা করেন এবং "উৎসবানন্দ-ভোগের অধিকারী কে ?" এই বিষয়ে একটী সুন্দর উপদেশ প্রদান করেন। উপদেশটী অতি সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই বলিতে হয় যে, নববিধানের ঈশ্বর জীবন্ত ঈশ্বর এবং জীবিতদিগের ঈশ্বর ; কেন না, তাঁহাতে যারা জীবিত, তাহারাই উৎসবের অধিকারী। অনুতাপের গুরু মহাত্মা যোহন বলিলেন, "অনুতাপ কর, স্বর্গরাজ্য নিকটে"। মহর্ষি ঈশা বলেন, "যাহাদিগের অনুতাপের কোন প্রয়োজন নাই, তাদৃশ নবনবতিজন পুণ্যাত্মা অপেক্ষা একজন পাপী অনুতাপ করিলে স্বর্গে সেইরূপ আনন্দ হইবে।" অতএব যাঁহারা উৎসবানন্দ ভোগ করিবেন, তাঁহারা আপন আপন পাপ স্মরণ করিয়া উৎসবের জন্য অনুতপ্ত-হৃদয়ে প্রস্তুত হউন। যদি কেহ বলে, আমাতে পাপ নাই, নিশ্চয় তাহাতে সত্য নাই। নববিধানের ঈশ্বর বলেন, "আমি সহজে মিলিত হই পাপীর সনে, যদি ডাকে সে একবার আমায় কাতর-প্রাণে। অহঙ্কারী পাপী যারা, আমার দেখা পায় না তারা, দীনজনের বন্ধু আমি সকলে জানে (ভগ্নহৃদয়বাসী আমি সকলে জানে)।" নববিধান পবিত্র আত্মার বিধান, সুতরাং পাপবোধ এখানে প্রবল। আমরা প্রবল পাপবোধ লইয়া, অনুতপ্তহৃদয়ে উৎসবের জন্য প্রস্তুত হই।

১লা সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, সায়ংকালে মালাকার টোলায় উপাসনা হয়। উপাসনার কার্য্য শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায় সম্পন্ন করেন। উপদেশে "রিপুসংহার বিনা ভক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই" এইরূপ ভাবে আলোচনা হয়।

২রা সেপ্টেম্বর, শনিবার, সায়ংকালে মগবাজারে রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে উপাসনা হয়। উপাসনার কার্য্য শ্রদ্ধেয় ভাই চন্দ্রমোহন দাস সম্পন্ন করেন।

৩রা সেপ্টেম্বর, রবিবার, সায়ংকালে আরমাণিটোলাস্থ ব্রহ্ম-মন্দিরে সাপ্তাহিক সামাজিক উপাসনা শ্রদ্ধেয় ভাই চন্দ্রমোহন দাস সম্পন্ন করেন।

৪ঠা সেপ্টেম্বর, সোমবার, সায়ংকালে দিগ্‌বাজারে স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয়ের ভবনে উপাসনা শ্রদ্ধেয় ভাই চন্দ্রমোহন দাস করেন।

৫ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার, সায়ংকালে, নিমতলী শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার দাস এম,এ, মহাশয়ের গৃহে উপাসনা ভাই মহিমচন্দ্র সেন করেন এবং উপদেশে ঈশ্বরের পরিচয় সম্বন্ধে একটী সুন্দর কথা বলেন। মনুসংহিতাতে আছে—"হে ভদ্র, আমি একাকী আছি, এই যে তুমি মনে করিতেছ, এরূপ মনে করিবে না ; কেন না, পুণ্যপাপদর্শী সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ নিত্যকাল তোমার হৃদয়ে স্থিতি করিতেছেন"। এই যে পুণ্যপাপদর্শী সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ নিত্যকাল হৃদয়ে আছেন এবং অন্তর্যামীরূপে সকল জানিতেছেন, ইঁহার সঙ্গে যে পরিচয়, ইহাই অন্তরে ব্রহ্মপরিচয়।

৬ই সেপ্টেম্বর, বুধবার, বিশেষ কারণে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সেন মহাশয়ের ভবনে সায়ংকালে উপাসনা হওয়ার ব্যাঘাত হওয়াতে দেবালয়ে উপাসনা হয় ; উপাসনার কার্য্য রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় সম্পন্ন করেন।

৭ই সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার. সায়ংকালে, ফরাসগঞ্জে স্বর্গীয় আনন্দমোহন দাস মহাশয়ের ভবনে উপাসনা হয়। উপাসনায় কার্য্য শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাস সম্পন্ন করেন।

৮ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, সায়ংকালে আর্ম্মাণীটোলা ব্রহ্ম-মন্দিরে বক্তৃতা হয়, বক্তৃতার বিষয় ছিল, "পূর্ব্ববাঙ্গলা দাস-মণ্ডলী।" এবং বক্তা ছিলেন—শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায়, শ্রদ্ধেয় ভাই চন্দ্রমোহন দাস এবং বাবু রাজকুমার দাস।

৯ই সেপ্টেম্বর, শনিবার, আরমাণীটোলা ব্রহ্মমন্দিরে সংকীর্ত্তনে উপাসনা। ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত জমাট কীর্ত্তন দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপ সকল শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দিয়া উৎসবানন্দ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ভক্তি-পিপাসু নরনারীর দ্বারা মন্দির এবং তাহার পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠদ্বয় পূর্ণ হইয়াছিল।

১০ই সেপ্টেম্বর, রবিবার, মন্দিরে পূর্ব্বাহ্নে ৭৷৷০টায় কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়া ৯টাতে উপাসনা আরম্ভ হয়। শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায় উপাসনা করেন। সাধারণ প্রার্থনার পর সঙ্গীতান্তে রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের উপদেশ পাঠ করেন। এবং বেদী হইতে প্রার্থনার পর সঙ্গীতান্তে উপাসনা শেষ হয়। ১২টার সময় সাধুসেবা হয়। তৎপর ৩টায় কার্য্য আরম্ভ হইলে, শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা বৈদ্যনাথ রায় মধ্যাহ্নিক উপাসনা সম্পন্ন করেন। অতঃপর পাঠ ও আলোচনা এবং প্রার্থনাদির পর জমাট কীর্ত্তন হইয়া সায়ংকালের উপাসনা আরম্ভ হয়। উপাসনা শ্রদ্ধেয় ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক সম্পন্ন করেন এবং ঈশ্বরের সহিত ও ভাইভগ্নীর সহিত প্রেমের মিলনেই যে স্বর্গরাজ্যের ব্যাপার সম্পন্ন হয়, তৎসম্বন্ধে প্রাতঃকালীন পঠিত উপদেশের সহিত যোগ রাখিয়া, আমাদের শ্রদ্ধেয় ভাই অতি উপাদেয় একটী উপদেশ প্রদান করেন।

১১ই সেপ্‌টেম্বর, সোমবার সায়ংকালে মন্দিরে সংকীর্ত্তন হয়।

১২ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার, সায়ংকা[illegible] আর্ম্মাণীটোলাস্থ ব্রহ্মমন্দিরে বক্তৃতা হয়। শ্রদ্ধেয় ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক "নব-বিধানের বিকাশ" বিষয়ে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বিষয়টী বিবৃত

করিয়া শ্রোতৃবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। বক্তৃতা-শ্রবণে অনেকেই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। বক্তৃতার সারাংশ শ্রদ্ধেয় প্রিয়বাবু লিখিয়া ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশ করিলে, পাঠকগণ দেখিয়া সুখী হইবেন।

১৩ই সেপ্টেম্বর, বুধবার, সমাজ ও মন্দিরের প্রতিষ্ঠার দিন। পূর্ব্বাহ্ণে ব্রহ্মমন্দিরে শ্রদ্ধেয় ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন। সায়ংকালে শ্রদ্ধেয় ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনা করেন। বেদী হইতে কোন উপদেশ প্রদত্ত হয় নাই। ভাই মহিমচন্দ্র সেন উপাসকমণ্ডলীর পক্ষ হইতে একটী প্রার্থনা করেন। প্রার্থনার সার ছিল, "সরল প্রার্থনাই মুক্তির সাধনা।" এই সরল প্রার্থনাই যাহাতে সকলে গ্রহণ করেন, ইহাই তিনি ভক্তিবিগলিতচিত্তে প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

১৪ই সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার, সায়ংকালে উপাসকমণ্ডলীর সাধারণ সভার বার্ষিক অধিবেশন হয়। রায় বাহাদুর ললিত মোহন চট্টোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সহকারী সম্পাদক পণ্ডিত সারদাপ্রসন্ন সেন সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রেরিত সমাজের বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করেন এবং আয় ব্যয়ের হিসাব উপস্থিত করেন। কিঞ্চিৎ আলোচনার পর উহা সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হইলে, নববর্ষের জন্য সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য মনোনীত হন। যথা :—

বাবু অবিনাশচন্দ্র সেন সম্পাদক, বাবু রমেশচন্দ্র সমাদ্দার সহকারী সম্পাদক। এবং সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক লইয়া বাবু রাজকুমার দাস, বাবু পুণ্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, বাবু নির্ম্মলচন্দ্র নন্দী, ডাঃ বাবু উমাপ্রসন্ন ঘোষ এবং শ্রীযুক্তা কুমুদকুমারী রায় কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য মনোনীত হয়।

১৫ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, সায়ংকালে সঙ্গতের সাম্বৎসরিক উৎসব হয়। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় উপাসনা করেন এবং একটী সুন্দর উপদেশ প্রদান করেন।

১৬ই সেপ্টেম্বর, শনিবার, সায়ংকালে মন্দিরে যুবকদিগের সম্মিলন হয়। ডাঃ শ্রীযুক্ত বাবু উমাপ্রসন্ন ঘোষ উপাসনা করেন এবং সহজ ভাষায় একটী সুন্দর উপদেশ প্রদান করেন।

১৭ই সেপ্টেম্বর, রবিবার, পূর্ব্বাহ্ণে ব্রহ্মমন্দিরে মহিলাদিগের উৎসব। শ্রীযুক্তা ইন্দুমতি দাস উপাসনা করেন। অপরাহ্ণ ৪টার বালকবালিকা-সম্মিলন হয়। সায়ংকালে কীর্ত্তনান্তে শান্তিবাচনের উপাসনা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাস সম্পন্ন করেন। উপাসনার শেষভাগে একটী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। সাধারণ প্রার্থনার পর ভাই মহিমচন্দ্র সেন বেদীতে বসিয়া কার্য্য করেন। অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই, আমাদিগের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা ডাঃ উমাপ্রসন্ন ঘোষ ভগবানের সন্তোষসাধনের জন্য, বেদীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া উপাসক উপাসিকাগণের এবং ঈশ্বরের পবিত্র সন্নিধানে, পবিত্র সেবাব্রত গ্রহণ করেন। তিনি প্রার্থনা করিয়া এই পবিত্র ব্রত গ্রহণ করিলে পর, বেদী হইতে ব্রতপালনের উপযোগী একটী উপদেশ প্রদত্ত হয়। উপদেশের সার নিম্নলিখিত সংগীতে সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। যথা :—

আলেয়া—একতালা।

তুমি সেবকপ্রধান। (ওহে) দ্যুলোকে ভূলোকে, ইহ-পরলোকে, কে আছে তব সমান। (সেবক)

করেছ মায়েরে সেবিকা সংসারে, স্বয়ং অবতীর্ণ যাঁহার ভিতরে; কত যত্ন তাঁর সন্তানের তরে, অকাতরে দিয়ে প্রাণ।

অপরূপ তব সংসার-পালন, সেবাব্রত সবে করে উদ্‌যাপন; তব প্রেম ডোরে বাঁধা পরস্পরে, বিচিত্রতা বিধান। (কিবা)

তোমার প্রেরিত সাধু ভক্তজন, সেবাব্রত সবে পালে অনুক্ষণ, তব সহবাসে তোমারি মতন, ত্যজি স্বার্থ অভিমান।

কবে হবে মম সেই শুভক্ষণ, সার্থক দেখিব মলিন জীবন, তোমারি অধীন তব দত্ত ধন, নাহি ভেদ ব্যবধান।

উৎসবের সময় বিধানপল্লীস্থ দেবালয়ে প্রতিদিন প্রাতঃকালে নামকীর্ত্তন, সাধুদিগকে স্মরণ এবং প্রার্থনা হইয়াছে। মন্দির ব্যতীত অন্যান্য দিন দেবালয়ে মাধ্যাহ্নিক উপাসনা হইয়াছে।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সেন, সম্পাদক.

—০—

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ১২ই সেপ্টেম্বর, পূর্ব্বাহ্ণে রাঁচি নামকুমে, শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদারের গৃহে, তাঁহার দ্বিতীয়া পৌত্রী কল্যাণীয়া কুমারী আইলীন মীরার এবং ১২ই অক্টোবর, মোরাবাদী পাহাড়ের সম্মুখবর্ত্তী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাসের "উৎপল-ভবনে" প্রথমা পৌত্রী কল্যাণীয়া কুমারী চিত্রার শুভজন্মদিনে, পিতামহ উপাসনা করেন এবং পিতামহী বিশেষ প্রার্থনা করেন।

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর, সন্ধ্যায়, ৬৫।১নং হ্যারিশন রোডে, মণ্ডলীর অন্যতম জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্তের ষড়শীতিতম জন্মদিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। শ্রীনাথবাবু ব্যাকুলপ্রাণে পরিবারের সকলের জন্য, বন্ধুবান্ধবদের জন্য, বিশেষ ভাবে বিধানমুরলী পুত্রের জন্য প্রার্থনা করেন।

শুভাশীর্ব্বাদ—গত ২১শে অক্টোবর, ৬।২ একডালিয়া রোডে, শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ গুপ্তের জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী প্রতিভার সহিত, স্বর্গীয় গুরুদাস চক্রবর্ত্তীর পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ প্রেমকুমার চক্রবর্ত্তীর শুভবিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়া আশীর্ব্বাদানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস উপাসনা করেন। ভগবান্ তাঁর পুত্রকন্যাকে আশীর্ব্বাদ করুন এবং পবিত্র ব্রতের জন্য প্রস্তুত করিয়া লউন।

সফলতা—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্তের দৌহিত্রী শ্রীমতী সুহাসি ঘোষ দর্শনশাস্ত্রে এম,এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ভগবান্ তাঁহার কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

পারলৌকিক—বিগত ২রা কার্ত্তিক, (১৯শে অক্টোবর) বৃহস্পতিবার, কুল্‌টীতে পরলোকগত সাধক স্বর্গীয় অনুকূলচন্দ্র রায়ের পারলৌকিক ক্রিয়া নবসংহিতামতে সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মল্লিক আচার্য্যের কার্য্য করেন, শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসু পাঠ করেন। এই উপলক্ষে কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত ভাই অখিলচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত স্বপ্রকাশচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি আগমন করেন, এবং শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সঙ্গীত করেন। ভাগলপুর হইতে মিসেস প্রেমসুন্দর বসুও আগমন করেন। আসানসোল হইতে সস্ত্রীক ডাক্তার ললিতমোহন সেন এবং আত্মীয় স্বজন ও স্থানীয় বন্ধু বান্ধব সকলেই উপস্থিত ছিলেন। নববিধানজননীর আশীর্ব্বাদে শ্রাদ্ধক্রিয়া অতি সুচারুরূপে এবং নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। শ্রাদ্ধবাসরে সাধক শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র রায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী পঠিত হয়। তাহা বারান্তরে প্রকাশিত হইবে। বিদেশস্থ বহু আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবগণ সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া পত্র দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে রাঁচি হইতে শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদার, ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত ভাই চন্দ্রমোহন দাস, জলন্ধর হইতে ক্যাপ্টেন কৃপাসুন্দর বসু, ভাগলপুর হইতে শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসু, কলিকাতা হইতে শ্রীমতী নির্ঝরপ্রিয়া ঘোষ, রায়সাহেব বলরাম সেন, রায় বাহাদুর বিজয়কৃষ্ণ বসু, শ্রীযুক্ত আশুতোষ মজুমদার, উকিল মোহিতচন্দ্র ব্যানার্জ্জি ও প্রফেসর দেবেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই উপলক্ষে যে সকল দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

কলিকাতা নববিধান ব্রহ্মমন্দির ২০৲, প্রচার আশ্রম ২০৲, নববিধান পাব্‌লিকেশন কমিটী ১০৲, পুণ্যাশ্রম ৫৲, ভগ্নিসমিতি ৫৲, আর্য্যনারীসমাজ ৫৲, নববিধান ট্রাষ্ট ৫৲, কেশব একাডেমীর বাড়ী ২০৲, উল্‌টাডিঙ্গি কান্তিচন্দ্র নিবাস ৫৲, হরিপাল অনাথ আশ্রম ১০৲, জীর্ণস্মৃতিসংস্কার ফণ্ড ৪৲, প্রমথলাল বিদ্যালয় ৪৲, ভিক্টোরিয়া বিদ্যালয় ৪৲, মুঙ্গের নববিধান মন্দির ৪৲, মুঙ্গের প্রমথলাল আশ্রম ১০৲, জামালপুর মন্দির ২৲, ভাগলপুর মন্দির ১০৲, কলিকাতা বালিকাদিগের নীতিবিদ্যালয় ১০৲, গিধনী বিদ্যালয় ১০৲, গাজীপুর ব্রহ্মমন্দির ২৲, পাটনা ব্রহ্মমন্দির ২৲ হাজারিবাগ ব্রহ্মমন্দির ২৲, সিমলা ব্রহ্মমন্দির ২৲, লাহোর ব্রহ্মমন্দির ২৲, গিরিধি ব্রহ্মমন্দির ২৲, ঢাকা ব্রহ্মমন্দির ৫৲, শিলং ব্রহ্মমন্দির ২৲, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে ৩৮৲ টাকা। মোট ২২০৲ টাকা। এতদ্ব্যতীত ভুজ্যি ৩টী, কাঁসার গ্লাস ৩টী, আসন ৩খানি, গৈরিক ৬খানি, নূতন থান ৩খানি, নূতন ধুতি ১২জোড়া, বিনামা ৩জোড়া ও ৩টী ছাতা দান করা হইয়াছে।

শতবার্ষিকী—স্বর্গীয় ভাই দীননাথ মজুমদারের জ্যেষ্ঠ পৌত্র, বি, এন, ডব্‌লিউ রেলওয়ের অ্যাসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ মজুমদারের মৌ-জংসনস্থিত প্রবাসগৃহে শারদীয় পূজার ছুটীতে অনেক আত্মীয় স্বজন একত্রিত হইয়াছিলেন। গত ২৭শে সেপ্টেম্বর, রাজা রামমোহন রায়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষে সকলে মিলিত হইয়া বিশেষ উপাসনার আয়োজন করেন। অধ্যাপক পুণ্যেন্দ্রনাথ মজুমদার উপাসনা ও রাজার জীবনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন।

সেবা—বাগনানের শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু কটকে শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ রাওর গৃহে অবস্থান করিয়া, ৩রা ভাদ্র হইতে ৩রা আশ্বিন পর্য্যন্ত, প্রতিদিন দ্বারে দ্বারে ঊষাকীর্ত্তন ও প্রার্থনা, তিন রবিবার ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা, ছয়টী পরিবারে উপাসনা ও প্রার্থনাদি দ্বারা ব্রহ্মনাম প্রচার করেন।

সাধু প্রমথলাল লেক্‌চার—কলিকাতার ছাত্রবৃন্দের হিতার্থে, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ৮৯নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে, গত ১৬ই সেপ্টেম্বর, ডাঃ কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "সিদ্ধার্থের পরিচয়" বিষয়ে বক্তৃতা দান করেন।

শারদীয় উৎসব—গত ৩রা অক্টোবর, শারদীয়া পূর্ণিমা দিন সন্ধ্যায়, পুরীর পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ আই, এন, দে মহাশয়ের আবাসে শারদীয় উৎসব হয়। স্থানীয় অনেক গণ্যমান্য ভদ্রব্যক্তি এবং ভদ্র মহিলা যোগদান করেন। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা ও পাঠাদি করেন। স্যার আর, এন, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সুকন্যা শ্রীমতী প্রেমলতা দেবী সঙ্গীত করেন। মুনসেফ শ্রীযুক্ত ভ্রাতা জিতেন্দ্রনাথ বিশ্বাসও একটী সংগীত করেন। গত ২৬শে, ২৭শে, ২৮শে ও ২৯শে সেপ্টেম্বর, পুরী নবপর্ণকুটীরে নবদুর্গোৎসবও সম্পন্ন হইয়াছে।

রাঁচিতে, মোরাবাদী পাহাড়ের পাদদেশে, হাওড়ার শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাসের নূতন ভবনে, দুর্গোৎসবের ভাবে শারদীয় উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। বসন্তবাবু ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সপরিবারে তথায় গিয়াছিলেন। তত্রত্য শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদার সপরিবারে তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দেন। গৌরীবাবুই উপাসনা করেন, মেয়েরা সংগীত ও আচার্য্যদেবের শারদীয় উৎসবের প্রতিদিনের প্রার্থনা পাঠ করেন।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া—ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে, গত ২০শে অক্টোবর কুল্‌টীতে রায় বাহাদুর ডাঃ অতুলচন্দ্র রায়ের ভবনে এবং ২১শে বাঁকিপুরে ডাঃ পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ভবনে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন। ২০শে প্রাতে ও সন্ধ্যায় রাঁচিতে মোরাবাদী পাহাড়ের পাদদেশে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাসের গৃহেও এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদার উপাসনা ও প্রার্থনাদি করেন।

সাম্বৎসরিক—দেরাদুন হইতে ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষের ভগ্নী শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ লিখিয়াছেন—গত ১৬ই সেপ্টেম্বর পিতৃদেবের ও ভগ্নী পুণ্যপ্রভার এবং ১০ই সেপ্টেম্বর আদরের বোন স্নুনুর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে এখানে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমারী চৌধুরী উপাসনা করেন। উভয় দিবসে পরম প্রিয়জনের স্মৃতিকল্পে কলিকাতা নববিধান প্রচার ভাণ্ডারে ২৲,

লক্ষ্ণৌ নববিধান ব্রাহ্মসমাজে ১০৲টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর, প্রাতে কমলকুটীরস্থ নবদেবালয়ে, কুচবিহারের স্বর্গীয় মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুরের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, ডাঃ সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন; মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী প্রার্থনা করেন। রাঁচিতে, শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদারের গৃহেও, মহারাজার পুণ্যস্মৃতি স্মরণ করিয়া উপাসনাদি হইয়াছে।

গত ২৭শে ভাদ্র, মধ্যাহ্নে, ঢাকায় হোসনীদালান রোডে, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ রায়ের গৃহে, তাঁর সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সুনীতি বালার আহ্বানে, অমরাগড়ীর ভ্রাতা হরলাল রায়ের ও ভাই অখিলচন্দ্র রায়ের মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিকে, ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। ভাই অখিলচন্দ্র উভয় মাতার প্রতি শ্রদ্ধার্পণ করিয়া প্রার্থনা করেন।

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর, প্রাতে, ৬৫।১ হ্যারিশন রোডে, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্তের শ্বশুরের সাম্বৎসরিকে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। কন্যা শ্রীমতী বিরাজমোহিনী দত্ত প্রার্থনা করেন।

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর, ৫৬বি বিডন ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত নিত্যেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের গৃহে, তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গীয় বরদাপ্রসাদ ঘোষের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

গত ১৩ই আশ্বিন, প্রাতে, ৪২।২ হরিঘোষ ষ্ট্রীটে, স্বর্গীয় বিনোদবিহারী বসুর এবং ঐ দিন সন্ধ্যায় অমরাগড়ী শ্মশানভূমিতে স্বর্গীয় ভাই ফকির দাসের পিতৃদেব পুণ্যশ্লোক সূর্য্যকুমার রায়ের সাম্বৎসরিকে ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন।

২রা অক্টোবর, ২৮নং রামকমল সেন লেনে, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সেনের গৃহে, তাঁহার ভ্রাতা স্বর্গীয় নন্দলাল সেনের সাম্বৎসরিকে শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত কোয়ার উপাসনা করেন।

গত ৪ঠা অক্টোবর, ১০।২ পটুয়াটোলা লেনে, শ্রীযুক্ত বিভুরঞ্জন দাসের গৃহে, তাঁহাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা চট্টগ্রামের শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন দাসের সহধর্ম্মিণীর সাম্বৎসরিক দিনে, কলিকাতাস্থ পুত্রগণের আগ্রহে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

গত ১৭ই অক্টোবর, দেউলটী গ্রামে ভ্রাতা সত্যচরণ সিংহের গৃহে, তাঁহার জামাতা গিরিধির স্বর্গীয় অমৃতলাল ঘোষের দ্বিতীয় পুত্র স্বর্গীয় শ্যামলালের স্বর্গারোহণ দিন স্মরণে বিশেষ উপাসনা ভাই প্রিয়নাথ করেন। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে একটাকা দান করা হইয়াছে।

গত ১১ই অক্টোবর, বি, এন্, রেলের দেউল্‌টি গ্রামে ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সিংহের গৃহে, তাঁহার কন্যা ও স্বর্গীয় শ্যামলাল ঘোষের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী প্রতিভা দেবীর প্রথম সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। সত্যচরণ বাবু, শ্রীমতী মাখনবালা বসু ও শ্রীযুক্ত পাণ্ডবচরণ সিংহ বিশেষ প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে নিম্নলিখিত দান উৎসর্গ করা হয়:—নববিধান প্রচার ভাণ্ডার ২৲, নববিধান-শ্রীমন্দির ১৲, প্রমথলাল-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ২৲, পুরী নববিধান-প্রতিষ্ঠান ১৲, শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রম ১৲।

গত ১২ই অক্টোবর, মঙ্গলবাড়ীতে, স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ভাই রামচন্দ্র সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র, স্বর্গীয় জনকচন্দ্র সিংহের প্রথম সাম্বৎসরিক দিন স্মরণে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন, ভাই অক্ষয় কুমার লধ ও ভাই গোপালচন্দ্র গুহ পাঠাদিতে সাহায্য করেন এবং ভাই অখিলচন্দ্র ও ভাই গোপালচন্দ্র বিশেষ প্রার্থনা করেন। সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী ইন্দুরেখা সিংহ এই উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে ৫৲ টাকা দান করেন।

গত ১১ই ও ১৬ই অক্টোবর, নববিধানসাধক স্বর্গীয় নৃত্যগোপাল মিত্র ও তদীয় সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া অন্নদামণি দেবীর সাম্বৎসরিক দিবসোপলক্ষে কলিকাতার ২৮নং জুগীপাড়া লেনস্থ ডাক্তার অনুকূলচন্দ্র মিত্রের বাসভবনে বিশেষ উপাসনা যথাক্রমে ভাই অখিলচন্দ্র রায় ও ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক সম্পন্ন করিয়াছেন। পিসিমাতা স্বর্গীয়া ক্ষীরোদমোহিনী বসুর সাম্বৎসরিক দিনে, গত ২৩শে অক্টোবর, ডাক্তার অমূল্যচন্দ্র মিত্রের প্রবাসভবনে আগ্রা নগরীতে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক বিশেষ উপাসনা করেন। ভাই অখিলচন্দ্র রায় যোগদান করিয়াছিলেন এবং উক্ত দিবসত্রয় প্রেমাস্পদ ভ্রাতা ডাক্তার অনুকূলচন্দ্র মিত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং আত্মার সপরিবারে যোগ দিয়াছিলেন। এই সকল পারলৌকিক অনুষ্ঠানে ৩৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

ভস্ম-স্থাপন—গত ২১শে সেপ্টেম্বর, প্রথম সাম্বৎসরিকের পূর্ব্বদিনে, সন্ধ্যায়, কমলকুটীরস্থ নবদেবালয়ের প্রাঙ্গণে [illegible] আচার্য্যদেবের মধ্যমা কন্যা স্বর্গীয়া সাবিত্রী দেবীর পবিত্র চিতাভস্ম ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক নবসংহিতার প্রার্থনা যোগে স্থাপন করিয়া, পরে বিশেষ প্রার্থনা করেন।

তীর্থভ্রমণ ও সেবা—কলিকাতায় ভাদ্রোৎসবসাধনের পর, ভাই প্রিয়নাথ ৩০শে আগষ্ট, পুরী যাত্রা করিয়া কয়দিন তথায় অবস্থান করিয়া উপাসনা ও সেবা করেন; স্থানীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের সহিত দেখাশুনা করিয়া রাজর্ষি রামমোহনের স্বর্গারোহণের শতবার্ষিকী সম্পাদনের আয়োজন করেন। ৫ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, নবদেবালয়ে দৈনিক উপাসনা করেন। ৭ই ভাই অখিলচন্দ্রের সহযোগে সস্ত্রীক ঢাকাতীর্থে যাত্রা করিয়া, তত্রত্য অগ্রজ ও জ্যেষ্ঠদিগের সঙ্গে উৎসবানন্দ সম্ভোগ করেন। একদিন শ্রীমতী হরিপ্রভা তাকেদার আমন্ত্রণে তাঁহাদের সঙ্গে উপাসনাদি করেন। ভ্রাতা ডাঃ উমাপ্রসন্ন বাবুর গৃহেও সংক্ষিপ্ত উপাসনা করেন, আরও দুই একটী বাড়ীতে গিয়া প্রার্থনাদি করেন। ১৪ই সেপ্টেম্বর ঢাকা হইতে ময়মনসিংহে ভক্তিভাজন স্বর্গীয় ভাই দীননাথ কর্ম্মকার ও ভাই চন্দ্রমোহন দাস মহাশয়দের সাধনতীর্থে গমন করিয়া, পরদিন তত্রত্য দেবালয়ে ভ্রাতা বৈদ্যনাথের পরিবারবর্গসহ উপাসনাদি করিয়া কৃতার্থ হন। সেখান হইতে কোচবিহার যাত্রা করেন।

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৮ ভাগ। ২১শ সংখ্যা। ১লা অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৩৪০সাল, ১৮৫৫শক, ১০৪ব্রাহ্মাব্দ। 17th. November, 1933. অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে জীবন্ত ঈশ্বর, অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম, তুমিই নবযুগধর্ম্ম নববিধানে নবশিশুপ্রসবিনী জননী। আমাদের আর্য্যঋষি-গণ জ্ঞানযোগে প্রতিপন্ন করিলেন, তুমি একমেবাদ্বিতীয়ম্। তাঁহাদের পরে যাঁহারা আসিলেন, তাঁহারা "একো বহুধা" উপলব্ধি করিয়া, তোমার বিচিত্র প্রেমলীলাদর্শনে ভক্তি-প্রমত্ততায় প্রমত্ত হইলেন। কিন্তু পরে মানবীয় ভ্রম কুসংস্কার তাহাতে আরোপিত হইয়া, তোমাকে এক ঈশ্বর মানিয়াও বহু সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। অন্ন ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াও, ধর্ম্মভেদে কর্ম্মভেদ, কর্ম্মভেদে জাতি-ভেদ সৃষ্টি করিয়া, "বারো রাজপুতের তের হাঁড়ী" হইল। কেহ কাহারও অন্ন ছুঁইলেও জাতিচ্যুত হইতে হয়, এই ভ্রান্ত সংস্কারের আবর্ত্তে পড়িল। তাই আমাদের ধর্ম্ম-পিতামহ রাজর্ষি রামমোহনকে তুমি পাঠাইলে। তিনি তোমারই প্রেরণায় বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্মের এই গ্লানি নিরাকরণার্থ বিদ্যা-যুক্তি-বলে সর্ব্বধর্ম্মশাস্ত্র মন্থন করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিলেন, "সর্ব্বধর্ম্মশাস্ত্রই স্বীকার করেন, ঈশ্বর এক, এই মতে সবারই ঐক্য আছে, কেবল অবান্তর বিষয়ে মতভেদ ও বিবাদ বিসম্বাদ।" এই বিবাদ-মীমাংসার জন্য তিনি "ব্রাহ্মীয়সভা" প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং আদিসমাজ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সার্ব্বজনীন যুগধর্ম্ম-বিধানের বীজ বপন করিলেন। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, যাঁর যাহা ধর্ম্ম হউক, সকলকে জাতিনির্ব্বিশেষে মিলিত হইয়া, এখানে এক ঈশ্বরের ভজনা করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু কার্য্যতঃ তখন ইহা সাধনের সময় হয় নাই বলিয়া, ব্রাহ্মণদের জন্য বেদপাঠ ও সাধারণের জন্য সঙ্গীত ও উপদেশের ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার দ্বারা যাহা করাইবার তুমি তাহা করাইয়া, তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইলে। তাহার পর ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথকে দিয়া, ব্রাহ্মসমাজ গঠন ও ব্রহ্মোপাসনা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করাইলে। ইঁহারা উভয়েই প্রাচীন হিন্দুর জাতীয় ভাব রক্ষা করিয়া ব্রাহ্মসমাজ গঠন করি-লেন। পরে তুমিই পাঠাইলে ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্রকে এবং তোমারই প্রেরণায় মহর্ষিকে দিয়া তাঁহাকে ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্যপদে অভিষিক্ত করিলে; কিন্তু এই ব্রাহ্ম-সমাজ হিন্দুর সাম্প্রদায়িক গণ্ডিতে নিবদ্ধ হইতেছে দেখিয়া, তোমারই পবিত্র প্রেরণায় তিনি, ইহাই যে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় নব যুগধর্ম্মবিধান, ইহা উপলব্ধি করিয়া "নববিধান" বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ধর্ম্মপিতামহ যে বীজ বপন করেন এবং ধর্ম্মপিতা মহর্ষি যাহাতে জলসিঞ্চন করেন, তাহাকে তিনি ফলফুলশোভিত পরিণত বৃক্ষরূপে, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সার্ব্বজনীন

বিধান বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিলেন। ধর্ম্মপিতামহ রাজর্ষি রামমোহন যাহা জ্ঞানমতে সিদ্ধান্ত করেন, জগজ্জন ভাই ব্রহ্মানন্দ তাহাই জীবনের সাধনে সপ্রমাণ করিলেন। তিনি প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তুমি কেবল এক ঈশ্বর নও, সকলেরই তুমি একই পিতা, একই মাতা এবং তোমার মানবসন্তান সন্ততি সকলেই ভাই ভগ্নী, এক পরিবার। তাই নববিধানের প্রধান উপাদান সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃ-প্রেম। এই উপাদানে তুমি নববিধানজীবন রচনা করিলে। তাই জগজ্জন-ভাই ব্রহ্মানন্দের শুভজন্মদিনে, আমরাও মার কোলে নবজন্মলাভে তাঁর সহিত ভ্রাতৃপ্রেমে সংবদ্ধ হইয়া, তোমাকে সবারই একই পিতামাতা জানিয়া, পরস্পরকে ভাই বলে ভগ্নী বলে গ্রহণ করি, ভালবাসি ও জগতে এক অখণ্ড প্রেমপরিবার রচনা করিয়া নববিধানকে গৌরবান্বিত করি, তুমি এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

নব জন্মোৎসব।

নববিধানাচার্য্য শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের শুভ জন্মোৎসব সমাগত। ইং ১৮৩৮খৃষ্টাব্দের ১৯শে নবেম্বর তিনি পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হন। সুতরাং আগামী ১৯শে নবেম্বর তাঁর পঞ্চনবতিতম জন্মদিন। এই দিন জগতে এক বিশেষ দিন। এইদিন নববিধানবিশ্বাসী ও নববিধান-বিশ্বাসিনীদিগেরও নবজন্মদিন।

কেন না, আমরা বিশ্বাস করি, যাঁর জীবনে নববিধান মূর্ত্তিমান হইয়াছে, আমরা তাঁহার সহিত একই দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। তিনিও বলিলেন, "আমি ও আমার ভাই এক।" তাঁর শেষ জন্মদিনের প্রার্থনাতেও বলিলেন, "আজ ইঁহাদের জীবনের পরিবর্ত্তনের দিন।"

এবারকার জন্মোৎসবে, তাঁর এই প্রার্থনার গভীর মর্ম্ম কি আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে ও সাধনযোগে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিব না?

জগজ্জন যে এক অখণ্ড মানব, ইহা প্রতিপন্ন করিতেই নববিধান অবতীর্ণ। সুতরাং নববিধানমতে মানবের ভিন্নতা, স্বতন্ত্রতা "আমি" "আমি", ভ্রান্তি-জনিত সংস্কার মাত্র। এ নববিধানে বিশ্বাসী হইয়াও যদি আমরা "আমি" "আমি" করিয়া অহংকৃত ও ব্যক্তিত্ব-পরতন্ত্র হই, আমরা এ বিধানের উপযুক্ত কেমনে হইব?

অতএব এখনও আমাদের মধ্যে অহংকৃত ব্যক্তিত্ব-বশতঃ যে ভিন্নতা স্বতন্ত্রতা আছে, তাহার পরিবর্ত্তন সংসাধন করিতে পারিলেই আমাদের এই নবজন্মোৎসবসাধন সার্থক হয়।

আমরা অবশ্যই এক একজন এক এক অবস্থায় পৃথিবীতে জন্ম লাভ করিয়াছি; কিন্তু এখন যখন আমাদিগকে মা নব জন্ম দান করিবার জন্যই নববিধানে আনিয়াছেন এবং নববিধানের নবশিশুর সঙ্গে তাঁরই অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপে মিলাইয়াছেন, তখন আমরা তাঁহার শুভ জন্মদিনে সকল ভাই ভগ্নী যেন একই বিধানজননীর আত্মজ হইয়া একাত্মতা লাভ করি এবং তদ্দ্বারা নববিধানের নবজন্ম লাভ করি।

এই জন্মোৎসবের পরেই ব্রহ্মানন্দের স্বর্গারোহণের পঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক দিন আসিতেছে। তাঁহার জন্মদিনে আমরা তাঁহার অনুসরণে যদি মার কোলে নববিধানের এক অখণ্ড মানবত্বে নবজন্ম লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা তাঁহার সহিত "সমযোগী সমভক্ত সমবিশ্বাসী" সহোদর ভাই হইয়া সহ স্বর্গারোহণেও সক্ষম হইব।

এজন্য এই জন্মোৎসব হইতেই যেন আমরা বিশেষ সাধনে প্রবৃত্ত হই। পরিবারগত ও মণ্ডলীগত দৈনিক উপাসনা ও পাঠ প্রসঙ্গ এবং ভাবের আদান প্রদান দ্বারা তপস্যায় নিরত হই। নববিধানে "একাকী যাইলে পথে নাহি পরিত্রাণ"; সেইজন্য এ সম্বন্ধে পারিবারিক ও মণ্ডলীগত ভাবে ব্রতগ্রহণ নিতান্ত প্রয়োজন।

প্রত্যেক পরিবারে পরিবারেই যেমন নিজ নিজ গৃহে আমরা উপাসনা করিব, তেমনি মণ্ডলীস্থ সকলে যে যেখানে থাকি, একই সময়ে যদি উপাসনা করিবার নিয়ম করি এবং একই পাঠ প্রার্থনা অবলম্বনে যদি পাঠ প্রার্থনা করি, উপাসনা-সাধনে একাত্মতা লাভের বিশেষ সহায়তা হইতে পারে।

আচার্য্যদেবের যে দিনের যে প্রার্থনা আছে, দৈনন্দিন উপাসনা কালে যে যেখানে থাকি, যদি সকলে এই সময়ে উপাসনা-যোগে একই দিনের একই প্রার্থনা অবলম্বন করিয়া প্রার্থনা করি এবং একই পাঠ সকলে পড়ি, তাহা হইলে আত্মিক ঐক্য ও যোগ অনেক পরিমাণে সমাধান হইবার সম্ভাবনা।

"প্রকৃত-বিশ্বাস" "জীবনবেদ" এবং ব্রহ্মানন্দের

আত্মপরিচয়-সম্বন্ধীয় উক্তি সকল সকলে এই উপলক্ষে প্রতিদিন পাঠ করিলে, এ সময়ে সাধনের বিশেষ সহায়তা হইবে। শ্রীদরবার ও মণ্ডলীস্থ ভাই ভগ্নীগণ এ বিষয়ে সমযোগে নির্দ্ধারণ করিয়া সাধনে নিরত হন, ইহাই প্রার্থনা।

—০—

ভ্রাতৃত্বে-মিলন।

ধর্ম্মশাস্ত্রের সার কথা দুইটী, একটি পিতা, একটি ভ্রাতা; ঈশ্বর পিতা, নরনারী ভ্রাতা ভগ্নী। এইটী সত্য করিয়া মনে ধারণা করা, কার্য্যে আচরণ করাই সার ধর্ম্ম। সর্ব্বধর্ম্মের সার মর্ম্ম এই। বর্ত্তমান যুগধর্ম্মবিধান নববিধানও কার্য্যতঃ ইহাই প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অবতীর্ণ।

ঈশ্বরের পিতৃত্ব বিশেষ ভাবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কেন না, তাঁহারা ভক্ত মহাপুরুষদিগেতে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়াছেন; তাহা ঈশ্বরেরই ঈশ্বরত্ব বা পিতৃত্ব স্বীকার করা ভিন্ন আর কি?

তাই বর্ত্তমান যুগধর্ম্মবিধান মহাপুরুষগণকে ব্রহ্মপুত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া, মানুষের ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিলেন। ঈশ্বরই ঈশ্বর—পিতা, মানুষ তাঁর সন্তান—ভ্রাতা, ইহাই নববিধান সাব্যস্ত করিয়াছেন। যে কোন মানুষ, তিনি ঈশাই হউন, শ্রীগৌরাঙ্গই হউন, কেহই ঈশ্বর-স্থানীয় রূপে পূজ্য নন। তাঁহারা ঈশ্বরের প্রেরিত সন্তান যা তাঁহার স্বরূপজাত হইয়া মহাপুরুষরূপে অবতীর্ণ। তাঁহারা কখনই স্বয়ং ঈশ্বর নন। তাঁহারা ঈশ্বরের আত্মজ, ঈশ্বরের সন্তান, আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

তাই ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া স্বীকার করা এবং তাঁর সকল সন্তান সন্ততিকে আমাদের ভাই বোন বলিয়া পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করা ও কার্য্যতঃ ভালবাসা, ইহাই নববিধান।

পৃথিবীর সম্পর্কে দেখি, একটী পরিবারে যাঁরা একই পিতামাতার সন্তান সন্ততি, তাঁরাই পরস্পরকে ভাই বোন বলিয়াই স্বীকার করেন, গ্রহণ করেন, ভালবাসেন ও বিশ্বাস করেন। এক একটি পরিবারে এক একটি পিতামাতার সন্তান সন্ততি যেমন ভাই বোন, তেমনি এক বিশ্ব পিতামাতাকে পিতামাতা বলিয়া বিশ্বাস করিলে, সকল মানবে মানবে পরস্পর ভাই ভগ্নী বলিয়া স্বীকার ও বিশ্বাস না করিব কেন? কিন্তু বাস্তবিক ইহা মতে বা যুক্তিতে সিদ্ধান্ত হইলেও, কই আমরা কার্য্যতঃ তাহা করিতেছি?

মতে সকলেই বলেন, ঈশ্বর এক, কিন্তু ঈশ্বরকে এক বলিয়া স্বীকার করিয়াও বস্তুতঃ যেন এক এক জনের এক এক ঈশ্বর হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, সকলেই বলিতেছেন ঈশ্বর এক; কিন্তু মতে বা মুখে তাহা স্বীকার করিয়াও, মনে মনে প্রত্যেকেই মনঃকল্পিত বা বুদ্ধিসংসিদ্ধ এক এক ঈশ্বর খাড়া করিয়া, পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন এবং সম্প্রদায়বিভাগে বিভক্ত হইয়া, আপনাপন মনের মতানুসারে চলিতেছেন এবং পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ করিতেছেন। এমন কি, অন্নকে ব্রহ্ম বলিয়া মতে স্বীকার করিয়াও, কেহ কাহারও অন্ন গ্রহণ করেন না এবং তাহা করিলে জাতিচ্যুত হইল মনে করিতেছেন।

এ সকলই যে প্রকৃত বিশ্বাসের অভাবে হয়, তাহা কে না স্বীকার করিবেন? যদি প্রকৃত বিশ্বাস হয়, ঈশ্বর এক, তবে কেমন করিয়া হিন্দুর ঈশ্বর একজন, মুসলমানের ঈশ্বর আর এক জন হইবেন? আবার এক হিন্দুর ভিতরেও শাক্তের এক ঈশ্বর, বৈষ্ণবের এক ঈশ্বর এবং তাহা লইয়াও এত বিবাদ বিসম্বাদ।

বাস্তবিক ঈশ্বর যিনি, তিনি ত এক ভিন্ন দুই নন, ইহা জীবন্তরূপে বিশ্বাস করিলে, কখনই এরূপ ধর্ম্মসম্প্রাদায়িক ভেদাভেদ হইতে পারিত না। এক সূর্য্যের আলোক যেমন স্থান-কাল-ভেদে পার্থক্য বোধ হইলেও সর্ব্বত্রই একই সূর্য্যের আলোক, তেমনি ধর্ম্মের ভিতরেও একই ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিলে, দর্শনের তারতম্যে বা ভেদাভেদে সম্প্রদায়-ভেদ কখনই আসিতে পারে না। অন্ততঃ ঈশ্বর যিনি, তাঁহাকে জীবন্ত ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিলে, কখনই কি এ ভিন্নতা হইতে পারে?

তেমনি যদি বাস্তবিকই আমরা একই ঈশ্বরকে পিতামাতা বলিয়া উপলব্ধি করি, আমরা কি কখনও ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইতে পারি? পরস্পরকে কি পর ভাবিতে পারি? এক পরিবারে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হয় কখন, পরিবারের পিতামাতা না থাকেন যখন; ঠিক তেমনি ঈশ্বর পিতা জীবন্তরূপে আছেন, এই বিশ্বাস উজ্জ্বল থাকিলে আমরা কখনই পরস্পরকে পর ভাবিয়া, পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে বা পরস্পরের সহিত বিবাদ করিতে পারি না।

সুতরাং পরস্পরকে ভাই ভগিনী বলিয়া স্বীকার যখন না করি, তখনই দেখাই, আমাদের পিতামাতা নাই বা মৃত, কিম্বা আমাদের পিতামাতা এক নন। তাই ভাই

ভগিনীকে অস্বীকার করা বা ভাই ভগিনীর সহিত বিবাদ করা ঈশ্বরকে অস্বীকার করা। আবার যেমন একই পিতামাতার সন্তান সন্ততি পরস্পর ভাই ভগিনী হন, তেমনি সবারই ঈশ্বর যে একই ঈশ্বর, ইহা প্রত্যক্ষ দর্শন এবং উপলব্ধি করিয়া পরস্পর ভাই ভগ্নী হইতে হইবে।

সাধারণতঃ পরিবারে দেখা যায়, বাড়ীর বড় ছেলের নামে ছেলেদের মাকে পাড়ার লোকে ডাকিয়া থাকে। যদিও সেই একই মা সবারই মা, কিন্তু জ্যেষ্ঠের নামেই মা অভিহিত হন। তেমনি আমাদের জ্যেষ্ঠগণ যাঁহাকে মা বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাকেই তাঁহাদের অনুসরণে যদি মা বলি, তাহা হইলে মাতৃ-পিতৃ-বিশ্বাস সম্বন্ধে আমাদের অভিন্নতা হয়।

তাই ভ্রাতৃত্ব-মিলনের অভিন্নতা সম্পাদন করিতে হইলে, আমাদের অগ্রজ যে মাকে মা বলিয়াছেন, তাঁহাকেই মা বলিলে, তবে তাঁহার সহিত অভিন্ন ভ্রাতৃত্বসম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইতে পারি এবং পরস্পরকেও একই মার সন্তান জানিয়া ভাই বলিয়া ভগিনী বলিয়া ভালবাসিতে, শ্রদ্ধা করিতে, আদর করিতে পারিব। তাহারই জন্য যেন বিশেষ ভাবে কৃতসংকল্প হই।

আমাদের দেশে ভ্রাতৃত্বসাধনের সুন্দর একটি অনুষ্ঠান হিন্দুসমাজে প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। তাহা বিশেষ স্মরণীয়। এই ভাইফোঁটা উপলক্ষে ভগিনীগণ ভাইয়ের কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়া মিষ্টান্ন খাওইয়া আদর করেন। ইহার মর্ম্মও অতি গভীর ভগিনীগণ বিবাহিত হইলে পিতামাতার গোত্র হইতে গোত্রান্তর হইয়া যান; তাহা হইলেও যে তাঁহারা পরস্পরে একই পিতামাতার সন্তান সন্ততি, একই রক্ত মাংসে গঠিত, একই স্তন্যপানে পরিপুষ্ট, ইহা চিরস্মরণীয় রাখিবার জন্যই এই পবিত্র অনুষ্ঠান সাধন করেন।

কি চমৎকার প্রথাই আমাদের নবযুগধর্ম্মবিধানের জন্য এই অনুষ্ঠানে নিহিত রহিয়াছে। ইহা অনুসরণ করিয়া আমরা সকল নরনারীকে—বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত বা পর গোত্র হইলেও, একই মা বাপের সন্তান সন্ততি, অতএব আমাদের ভাই ভগ্নী, এই বলিয়া—যদি পবিত্র প্রীতির চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া প্রগাঢ় অনুরাগ ও প্রণয়ে আবদ্ধ করিতে পারি, যথার্থই সাম্প্রদায়িক ভিন্নতা, অপ্রেম ও দ্বেষহিংসারূপ পাপ-যমের দ্বারে কাঁটা পড়িয়া যায়। পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

যম আ[illegible]? পাপই যম,—কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা সাম্প্রদায়িকতা ইহারাই ভীষণ যম—যে যম মানুষকে গ্রাস করিয়া জীবনের জীবন যিনি, সেই ঈশ্বরের হাত হইতে বিনাশ করিতেছে। যমই আমাদিগকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আপন রাজ্য বিস্তার করিতেছে। পৃথিবী কোথায় ঈশ্বরের রাজ্য, স্বর্গরাজ্য হইবে, না, যমের রাজ্য—পাপ, সাংসারিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, দ্বেষ হিংসার রাজ্য হইল। ইহা নিরাকরণ করিয়া পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যস্থাপনের জন্যই নববিধান আসিয়াছেন।

তাই ভ্রাতৃত্বে মিলন সংসাধন করাই নববিধানের প্রধান উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান সময়ে কি সমাজবন্ধনে, কি রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় ব্যাপারে সর্ব্বত্রই ভ্রাতৃত্বমিলন বা সংঘবন্ধনের আবশ্যকতা ও আকাঙ্ক্ষা সকলের মনে উদ্দীপিত হইয়াছে। ইহা বিধাতারই কৃপাবিধান।

এক্ষণে এই ভ্রাতৃত্বে ঐক্যবন্ধনের একমাত্র উপায়—একই ঈশ্বরকে একই পিতামাতা বলিয়া বিশ্বাস ও স্বীকার করা, সর্ব্ব ধর্ম্মের সমন্বয়ে যে এক ধর্ম্ম তাহার অনুসরণ করা এবং সর্ব্বমানবের মিলনে একান্নবর্ত্তী পরিবাররূপে সংবদ্ধ হওয়া। ইহাই বিধান করিতে বর্ত্তমান যুগধর্ম্মবিধান সমাগত। এই বিধান জীবন্ত ঈশ্বরের বিধান বলিয়া বিশ্বাস করিয়া, এস আমরা একই পিতামাতার সন্তানসন্ততিজ্ঞানে পরস্পরকে ভাই বোন বলিয়া চিহ্নিত করি, সংবর্দ্ধনা করি, আদর অভিনন্দন করি, পরস্পরের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্বের সম্মান রক্ষা করিয়া পরস্পরকে স্বীকার করি, গ্রহণ করি, একই ভক্ত-জীবনান্ন আহার পানে একান্নবর্ত্তী পরিবার হই; তাহা হইলে নিশ্চয়ই পাপ-যমের দ্বারে কণ্টক চিরতরে রোপিত হইবে এবং আমরা সশরীরে সপরিবারে স্বর্গরাজ্য সম্ভোগ করিয়া ধন্য হইব। মা আশীর্ব্বাদ করুন, যেন তাহাই হয়।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

নববিধানের রথে স্বর্গের পথে।

হিমাচলের রেলপথ যেমন ক্রমোচ্চ, তেমনি কতই বক্রগতি। রেলগাড়ীকে সামনে একটা এঞ্জিন উর্দ্ধ হইতে টানিতেছে, একটা এঞ্জিন পশ্চাৎ হইতে ঠেলিতেছে। এই দুইটী এঞ্জিনের জোরে রেলগাড়ী উর্দ্ধপথে বক্রপথে অবাধে অনায়াসে চলিতেছে। পতনের কতই সম্ভাবনা সত্বেও, পতিত বা নিম্নগামী হইতেছে না। নববিধানের রথও উর্দ্ধগামী বক্রপথগামী হইলেও, একদিকে টানিতেছেন বিধাতা স্বয়ং, আর এক দিকে ঠেলিতেছেন ভক্ত। সুতরাং এই রথের যাত্রী হইলে আমরা নির্ভয়ে নিরাপদে স্বর্গের পথে অনায়াসে যাইব। ভগবানের আকর্ষণ ও ভক্তের সহযোগ আমাদের সহায়। রেলগাড়ী যেমন একখানি মাত্র গাড়ী নয়, অনেকগুলি গাড়ী সমযোগে গাথা, নববিধানরথও তেমনি পরিবার দলের মিলনে গ্রথিত।

বৈশিষ্ট্য ও বিচিত্রতায় প্রেমের একতা।

বিশ্ববিমানের কতই উচ্চতম স্তরে দিনমণি সূর্য্য অবস্থিত রহিয়াছে বা নিজ গম্য পথে বিচরণ করিতেছে; আবার চন্দ্রও অন্য এক নিম্নতর স্তরে অবস্থিত থাকিয়া নিজ নির্দ্দিষ্ট পথেই ভ্রমণ করিতেছে; কিন্তু বিধাতার অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টিকৌশলে উভয়ে উভয়ের নিয়োজিত কার্য্য সম্পাদন করিয়াও কেহ কাহারও প্রতিদ্বন্দ্বী হয় না; বরং প্রেমযোগে দিন রাত্রি সদ্ভাবে পরস্পর পরস্পরের সহযোগিরূপে নিজ প্রভুর ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সন্তান সন্ততি এবং জীবগণের কতই সেবা করিতেছে। নিরাকার প্রেমশক্তির একটা বাঁধন যেন উভয়কে এবং তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে আর আর সৌর জগতের গ্রহনক্ষত্রদিগকে চালাইতেছে। বিধাতার নববিধানেও মানবজগৎ এমনই নিরাকার এক প্রেমসূত্রে বাঁধা রহিয়াছে। স্বর্গস্থ অমর ভক্তগণের এক এক জন এক এক স্তরে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য-প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইলেও, চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায়, যেন এক প্রেমসূত্রে ভ্রাম্যমাণ হইয়া নিজ আলোক ও জ্যোৎস্না দিয়া জীব-সেবা করিতেছেন। আমাদেরও সাধন-শিক্ষার ভিন্নতা থাকিলেও, ইঁহাদের অনুসরণে যেন এক প্রেমযোগে মিলিত থাকিয়া বিধানের সেবা করিতে পারি। নববিধানাচার্য্য যেমন বলিলেন, "সহস্র মতভেদ সত্ত্বেও যেন আমরা পরস্পরকে পরস্পরের ভৃত্যের ন্যায় হইয়া সেবা করিতে পারি।"

আচার্য্য কেশবচন্দ্র।*

(১৯শে নবেম্বর, ১৯৩৩)

যে শুভদিনে, যে শুভক্ষণে, কলিকাতার প্রান্তভাগে, ধনীর গৃহে, এক ক্ষুদ্র নিভৃত স্থানে কেশবচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল—সে দিনের কথা স্মরণেও প্রাণে এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হয়। সেইদিন বঙ্গদেশের, ভারতের, জগতের ভাগ্যে কোন্ সৌভাগ্যরবির উদয় হইয়াছিল, কি উজ্জ্বল স্বর্গীয় জ্যোতিঃপাতের সূচনা হয়েছিল, কে বল্‌বে? ইতিহাস নিশ্চয়ই তার সাক্ষ্য দেবে। "যুগ যুগান্তের দুই একজন, জনমে এমন মানবরতন, বিলায় জগতে হরি-প্রেমধন, ভক্তগণ সঙ্গে মিলি।"

যে আলোকের ঝরণাধারায় ধরণীকে পরে ধুইয়ে নিয়ে যাবে, তার কথা কি কেউ আগে ভাব্‌তে পারে? যে শক্তি উত্তর কালে ভারতকে একশো বছর অগ্রসর করে দিয়েছিল, তার বিষয় তখন কি কেউ জান্‌তে পেরেছিল? মনীষী যাঁর আগমনকে শাক্য-সমাগমতুল্য জ্ঞান করেন, ভক্ত যাঁকে "আমি রাধা, তুমি শ্যাম" বলে জড়িয়ে ধরেন, কে তখন তাঁর পরিচয় পেয়েছিল, কে তাঁকে চিন্‌তে পেরেছিল? যিনি শেষে নিজে বলে গেলেন, "বিপদ অন্ধকারে কেশবচন্দ্র (আশার) চন্দ্র হবে," তাঁর জীবনভাগবতের মহিমাময় রহস্য কি বুঝা এতই সহজ? যাহ'ক, তাঁর সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার, অশেষ গুণরাশির, অদম্য উৎসাহ ও কর্ম্মশক্তির সদনুষ্ঠানের আলোচনা বা পুনরুল্লেখ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি তাঁর সৌন্দর্য্যবোধ, কবিত্বশক্তি, অভিনব বাংলা ভাষাসৃষ্টির কথাই বল্‌বো; যা, বোধ হয়, ইতিপূর্ব্বে সবিশেষ আলোচিত হয়নি।

কবি কে? যিনি কবিতা লেখেন, তিনিই কি কেবল কবি? কবিতা না লিখে কি কবি হওয়া যায় না? যাঁর সৌন্দর্য্যবোধ আছে, বর্ণজ্ঞান আছে, কবিদৃষ্টি আছে, সুন্দরকে ভালবাসবার হৃদয় আছে, তাঁকেই কবি বলা যায়। আচার্য্য কেশবচন্দ্রের তাই ছিল। যথা, "শরৎকালে পৃথিবী যে...আশ্চর্য্য শ্রী ধারণ করে, লক্ষ্মীর আবির্ভাবই তাহার কারণ। * * যে মাঠ দেখিলে কিছুকাল পূর্ব্বে বিষাদ হইত, আজ তাহা প্রচুর ধান প্রসব করিয়া আপনিই হাসিতেছে। গৃহস্থকে হাসাইতেছে এবং দর্শকের নয়নরঞ্জন করিতেছে। * * * মাঠ যেমন সম্পদ, ঐশ্বর্য্য, শ্রীতে পরিপূর্ণ হইয়া হাসিল, আমাদিগের প্রাণও তেমনি হাসিল। * * * শরৎকালের সৌন্দর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে কেবল বৃদ্ধি, আনন্দবৃদ্ধি, সম্পদবৃদ্ধি, ধান্যবৃদ্ধি, ধনবৃদ্ধি, আজ সকল গৃহস্থের ঘরে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পূর্ণ।.........আজ সকল ঘরে শঙ্খধ্বনি, আনন্দধ্বনি, মঙ্গলধ্বনি, সম্পদের ধ্বনি হোক। আজ দেখছি গঙ্গা পরিপূর্ণ, আমাদের বাড়ীর কমলসরোবর জলে পূর্ণ, চারিদিকে কমল ফুটিয়াছে বুঝিতেছি। বৃদ্ধির দিন আজ, আনন্দের দিন আজ। আজ সকলের মুখে হাসি।.........শরৎকালে গঙ্গার আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছে।... শরৎকালে গঙ্গা পূর্ণাকৃতি লাভ করেন।.........দেখ, আজ গঙ্গার কি আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছে। বায়ুর হিল্লোলের সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার হিল্লোল খেলা করিতেছে। তাহার উপরে পূর্ণিমার শরচ্চন্দ্রের জ্যোৎস্না প্রতিফলিত হইতেছে। একে ত গঙ্গা আপনি মনোহর, তাহার উপরে আবার শরচ্চন্দ্রের সুধারশ্মি। কি আশ্চর্য্য শোভাই হইয়াছে। চন্দ্রের সৌন্দর্য্য, সুমন্দ সমীরণের শীতলতা, জলের স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য্য এ সমুদায় একত্র হইয়া আজ প্রকৃতির প্রিয় মুখকে কেমন আশ্চর্য্যরূপে সুন্দর করিয়াছে।...... আমাদিগের জননীর ঐ চন্দ্র আজ কেমন সুধাময় জ্যোৎস্না বিকীর্ণ করিতেছেন; গঙ্গার বক্ষ কেমন সুন্দর হইয়াছে, আবার শরৎকালের গঙ্গাতে স্নান করিয়া চন্দ্র আরও সুন্দর এবং মনোহর হইয়াছেন। যার মুখে পদ্য নাই, হৃদয়ে ভাব নাই, যে লক্ষ্মীবিহীন, সে নিতান্ত দুঃখী, পাপী।" অন্যত্র, "শরৎকালের এক প্রকার সৌন্দর্য্য দেখিয়াছি, এখন বসন্তকালে আর এক প্রকার শোভা পৃথিবীকে শোভিত করিয়াছে। এই কালের সৌন্দর্য্যের সঙ্গে অন্য কোন ঋতুর তুলনা হইতে পারে না।......

* 'কেশবের কাছে যাই' বলে, গত ৩০ নভেম্বর, দেবেন্দ্রনাথ বসু চলে গেলেন সেই পরম লোকে, সেখানে আচার্য্যদেবের জন্মোৎসব করতে। আচার্য্যের জন্মোৎসব সম্বন্ধে এই প্রবন্ধটী মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে তাঁর লেখা।

এই বসন্তের ফুলের কাছে শরৎকালের ধান্য হারিয়া গেল। বসন্তকালে চারিদিকে ফুলের সৌন্দর্য্য এবং ফুলের সৌরভ জগৎ আমোদিত করিতেছে। বসন্তের পূর্ণিমার চন্দ্র, বসন্তের মধুর সমীরণ, বসন্তের পুষ্প এই তিন পদার্থই অতি সুন্দর। সমীরণ একদিকে যেমন গগন হইতে সুধাময় পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্না বহন করিয়া আনিতেছে, তেমনি অন্যদিকে আবার পুষ্পোদ্যানের সৌরভ বহন করিয়া আমাদিগের নিকট লইয়া আসিতেছে। যে সমীরণ এমন সুন্দর জ্যোৎস্না এবং স্বর্গের সুগন্ধ বিস্তার করিল, সেই সমীরণের ন্যায় এমন উপকারী বন্ধু আর কে কোথায় দেখিয়াছ? পৃথিবীতে একখানি স্বর্গের ছবি প্রকাশ করিবার জন্য ঈশ্বর বসন্তকাল প্রেরণ করেন। বাছা বাছা সুন্দর জিনিষগুলি সঙ্গে লইয়া পৃথিবীতে বসন্তকাল আসেন। বসন্তোৎসবের তুলনা হইতে পারে না। শারদীয় উৎসবে বিধাতার কৌশলে গৃহস্থের ঘরে কেমন প্রচুর পরিমাণে ধন, ধান্য, অন্ন, লক্ষ্মী, শ্রী সঞ্চিত হয়; এ সকল চিন্তার বিষয় ছিল; কিন্তু বসন্তোৎসবে কেবল সৌন্দর্য্যের কথা শুনিতেছি। আজ হিতবাদীর কথা নহে, আজ সুখবাদীর আনন্দোৎসব। আজ সুখবাদী সুখময়ের পূজা করিতে আসিয়াছেন। সেই দিন ছিল সংসারের সুখ, আজ হ'ল হৃদয়ের আনন্দ।.........বসন্তকাল আমাদিগকে স্বর্গে লইয়া যাইতে আসিয়াছে, বসন্তকালের অন্য অর্থ দেখি না।.........ফুল, চন্দ্র, বায়ু সকলই পাইলাম, এখন কেবল একটী সখা চাই, হৃদয়-নিকুঞ্জবনে সেই সখাকে লইয়া সুখী হইব।.........ভক্ত বসন্তের ফুলগুলির দিকে তাকাইয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ফুল, তোমরা হাসিতেছ কেন? হে সুন্দর গোলাপ, হে চমৎকার বেল ফুল, তোমরা কখনও কাঁদ না কেন? তোমাদের সহাস্য বদন দেখিয়া আমার প্রাণ-সখার প্রসন্ন মুখ স্মরণ হইতেছে।.........প্রিয় গন্ধরাজ, ভাই গন্ধরাজ, মিত্র গন্ধরাজ, তোমাকে হাতে লইলাম, তোমাকে ভাই বলিলাম, মিত্র বলিলাম। বল দেখি, ভাই, তোমাকে ঈশ্বর সৃজন করিলেন কেন?......আমার হৃদয় যাহাতে তোমার মত কোমল এবং লাবণ্যযুক্ত হয়, তুমি এই শিক্ষা দাও।'......পর্ব্বতে তোমার গাম্ভীর্য্য, হে বিশ্বপতি, পুষ্পেতে তোমার সৌন্দর্য্য, হে বিশ্বনাথ। ....হে সুকোমল পুষ্প, তোমার বাড়ী কোথায়? দেখিতে ভাল, শুকিতে ভাল, বুকে রাখিতে ভাল। এমন ফুল পেয়ে আমি রাখিব কোথায়? মাথার উপরে রাখি, বুকের ভিতরে রাখি। বায়ু ফুল, আকাশ ফুল, বৈকুণ্ঠ ফুল, ফুলে, ফুলে একাকার। '......... ফুল কাঁধে রাখি, বুকে ধরি, হস্তে করি, প্রাণ কুসুম হউক।.........যেন ফুলের মতন সাধু এবং কোমল হই।"

উপরোদ্ধৃত অংশ থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হচ্ছে যে, কেশবচন্দ্র একজন প্রকৃত কবি ছিলেন। ভক্তই যথার্থ কবি। ভগবদ্-ভক্তিই কাব্যের জন্মদাতা। রামপ্রসাদ ভক্তির প্রাবল্যেই গান রচনা করেছিলেন। আগে ভক্তি, তবে কবিত্ব। কবি হয়ত ভগবদ্ভক্ত না হ'তে পারেন, কিন্তু ভক্ত কখনই কবিত্বহীন, রসহীন, শুষ্ক, কঠোরহৃদয় হতে পারেন না। সৌন্দর্য্যবোধ, প্রাকৃতিক শোভা দর্শন, ঈশ্বরের মহিমা উপলব্ধি, তাঁর রক্তে লেখা। তিনিই বল্‌তে পারেন, "পত্র পুষ্প ফলে দেখি যে সব রেখা, রেখা নয় তোমার দয়াল নামটি লেখা।"

দ্বিতীয় কথা, তাঁর বাংলা ভাষাসৃষ্টি। আমার একজন পরম শ্রদ্ধেয় প্রিয় সুহৃদের কাছে শুনেছি, কেশবচন্দ্রের বাংলা বক্তৃতা, উপদেশ, প্রার্থনাদির ভাষাই বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী স্থান অধিকার করবে এবং ভবিষ্যতে চলবে, এই মত স্বর্গীয় মহা-মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় ব্যক্ত করেছিলেন। এই ভাষা শিখ্‌তেই সাহিত্য সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র তখন ব্রহ্মমন্দিরে আস্‌তেন। এমন সরল, সোজা, সুললিত, প্রাণস্পর্শী, বিশুদ্ধ, মার্জ্জিত, অনাবিল শুভ্র জলপ্রপাতের মত বাংলা আর কোথাও দেখা যায় না। নিরাকার বাগ্‌দেবীর সাকার মন্ত্র কেশববদনার দ্বারা উচ্চারিত হতো, মধু বর্ষণ কর্‌তো।

প্রায়ই দেখা যায়, কলাবিদ্যার সঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যার গূঢ় যোগ স্বীকৃত হয় না। কলাবিদ্যার চর্চ্চা, সাধনা, সাধককে ব্রহ্ম-সকাশে উপস্থিত করে, একথাও সংশয়াপন্ন, সন্দেহাধীন। সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, কবিত্ব, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য এই পাঁচটী কলাবিদ্যা, সূক্ষ্ম-শিল্পের অন্তর্গত। বাস্তবিক একটী গান শুনলে, একখানি ভাল ছবি দেখলে, প্রস্তরখোদিত দেবমূর্ত্তির কাছে গেলে, সুন্দর সৌধের সম্মুখীন হ'লে, "তাজমহলে" উঠলে অথবা কাব্যামৃতরসাস্বাদন করলে, অন্তর কুসুমের মত কোমল ও বিকশিত হয়, চিত্ত অপূর্ব্ব, উদ্ভাসিত-সৌন্দর্য্যের অলকাপুরীতে সমুপস্থিত হয়ে "রসো বৈ সঃ" বলে পূজা করে। সৌন্দর্য্যের মধ্যে ব্রহ্মদর্শন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যেমন দেখিয়ে গেছেন, অন্যত্র তাহা বিরল। Nature is the manifestation of God নিয়ে অল্পাংশ উদ্ধৃত করছি :—

"সাধনকানন—সেখানে প্রকৃতি হাসে, পাখী গান করে, সেখানকার গাছগুলি নারদমুনি। তাহারা বীণা হাতে করিয়া সনাতন ব্রহ্মনাম গান করে।...গাছ বল, পাখী বল, ফুল বল, জল বল, বায়ু বল, প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু দেখিতে পাও, সকলই সেই রাজ্যের ব্যাপার। তাহারা সকলেই সাধকদিগকে স্বর্গরাজ্যে লইয়া যাইবার জন্য সেখান হইতে আসিয়াছে।......সৌন্দর্য্যের আকর ঈশ্বর সৌন্দর্য্য রচনা করিয়া জগৎকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করেন। সৌন্দর্য্য স্বর্গের দুর্লভ সামগ্রী। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য কুৎসিত ও কঠোর মনকেও পবিত্র এবং সরস করে। ....বাহিরের ফুল, বাহিরের চন্দ্র, বাহিরের সমীরণ চিরকাল থাকে না; কিন্তু হৃদয়ের ভক্তিফুল, হৃদয়ের প্রেমচন্দ্র, হৃদয়ের পুণ্য হিল্লোল চিরকাল থাকিবে। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, এই বাহিরের বসন্ত আমাদিগের মনের বসন্ত হউক্। মনের মধ্যে আমরা ঈশ্বরের চির বসন্ত, চির সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করি। ঈশ্বর ভক্তের ভাব বুঝিয়া বলিতেছেন,—'ওরে ভক্ত, আমার প্রেরিত

এই বসন্তের গূঢ় রহস্য তুই জানিয়াছিস্, প্রাণ ভরিয়া তুই স্বর্গের সুধারস পান কর।' যে দয়াময়, সুধাময় পরমেশ্বর এই বসন্তোৎসব প্রেরণ করিলেন, তিনি চিরকালের জন্য আমাদিগকে তাঁহার অনাদ্য বসন্তোৎসবে মত্ত করুন।"

যে অজানা, অজ্ঞাত দেশ থেকে মানুষ এখানে এসে কিছুদিন থেকে, লীলা সাঙ্গ করে' আবার সেই অজানা লোকে চলে যায়, তার বিষয় কেহই অবগত নহে। কিন্তু সে এখানকার পরিমিত সময়টুকু সুখে, স্বচ্ছন্দে, আরামে কাটাতে চায়। কত স্বপ্ন, কত সাধ, কত আশা প্রাণে পোষণ করে; আবার কত অতৃপ্ত বাসনা, অপূর্ণ সাধ, বিলুপ্ত আশা বুকে করে, ভগ্নহৃদয়ে বিষাদব্যথিত প্রাণে ধূলাঘর ভেঙ্গে দিয়ে অকালে চলে যায়। মায়ার সংসার, মায়ার বেড়া কেটে, আপন জনকে কাঁদিয়ে, হঠাৎ অসময়ে স্বর্গ-লোকে উড়ে যায়। এই অপূর্ণ, মরীচিকাময় সংসারে তবে কি শান্তিনিকেতন, সুখের আলয়, আরামের বাসগৃহ নাই? শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কি বলেন? "সুখী কে? না যে বিধানবাদী।..............বাড়িটী সুখের বাড়ী, বন্ধুগুলি সুখের বন্ধু, ধর্ম্ম সুখের ধর্ম্ম, সমুদায় সুখের সংযোগে সকলই প্রস্তুত। ঘোর অন্ধকারের মধ্যে যাহাদের হৃদয়ে নিত্যানন্দের বাগান, শান্তি তাহাদের ভিতরে খেলা করে। বেদ, বেদান্ত, রামায়ণ, মহাভারত প্রকাশ হইল, কিন্তু তোমার (ঈশ্বরের) সুখোপনিষদ এখনও প্রচার হইল না। এই পাড়ায় কাহারও মনে কষ্ট হইতে পারে না। কাহারও দুঃখ থাকিতে পারে না। মনের কষ্ট, শরীরের কষ্ট, খাবার পরিবার কষ্ট, একথা যে বলে, আমরা খাঁড়া লইয়া সেই কথার প্রতিবাদ করিব। আমাদের কষ্ট নাই, দুঃখ কখনও এ জীবনে পাই নাই। সাধকদল বাহির হউন, এই কথা প্রচার করুন যে, বিষাদে কখন বিষণ্ণ হই নাই, জীবনে কষ্ট কখনও পাই নাই, শান্তিতে হৃদয় পূর্ণ, কোন বিষয়ে দুঃখ আমাদের নাই।" বিশ্বাসীর, ভক্তের এই কথা। তিনি বিশ্বের নিবিড়তম তমসার মধ্যে আনন্দলোকের ধ্রুব দীপ্তি দেখিতে পান, আনন্দরূপমমৃতমের জয়ধ্বনি করেন। কবি না হ'লে, বিশ্বের সৌন্দর্য্য দেখে মোহিত হবার কার অধিকার? ভক্ত না হলে, সংসার নিরবচ্ছিন্ন সুখের আলয়, কে বলতে পারেন? প্রকৃত কবি ভক্ত যে, সেই সুখবাদী।

যাঁরা আচার্য্যদেবকে দেখেছেন, তাঁরাই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, তাঁর অপরূপ স্নিগ্ধ জ্যোতিভরা চোখ দিয়ে, মুখ দিয়ে, "মঙ্গলে সুন্দরে সর্ব্ব চরাচর লীন,' 'বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ-ধারা' এই গম্ভীরতম মর্ম্মবাণী স্পষ্ট ব্যক্ত হতো। কাননের ফুল, পাখীর গান, তটিনীর নৃত্য, শিশুর হাসি, "আবিষ্কৃতচারুতারম্ শরৎপ্রসন্নম্ আকাশম্," এর শোভা তাঁকে পাগল করতো, সৃষ্টিকর্ত্তার অসন্দিগ্ধ, নিঃসংশয় অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিত। ঘন মেঘাবৃত আকাশ, নীলিমাচ্ছন্ন অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ, "তমাল-তালীবনরাজিনীলা," গাঢ়তমসাবৃত ধরণী, প্রকৃতির অব্যক্ত, অস্ফুট আনন্দরাশি প্রকাশ করতো। তাঁর এই স্বভাবগত প্রচ্ছন্ন কবিহৃদয় তাঁকে কোথায় নিয়ে গেল? সভ্যতার হাতে গড়া সীমার বাঁধ ভেঙ্গে দিয়ে আত্মাকে এক অগাধ, অনাবৃত, বন্ধনমুক্ত অবস্থায় উপস্থিত করলো। বিপুল-জন-কোলাহল মধ্যে নীরব, নিস্তব্ধ, নিবিড় ব্রহ্মানন্দরসে মগ্ন করলো। তিনি শেষে বল্লেন, "আমরা তোমার হাতে গঠিত। আমাদের গায়ের রং, মুখের আকার সব তোমার হাতের করা। তুমি তুলি দিয়ে যখন আঁকিয়া ছিলে, সেই রংয়ের সুগন্ধ আমাদের গায়ে। ....আমরা তোমার নিজহস্তে রচিত। অন্য কেহ স্পর্শ করে নাই। চন্দন কাঠ আনিয়া তুমি নির্ম্মাণ করেছ।......... আমাদের অস্থর পর্য্যন্ত যেন আতর গোলাপের গন্ধ হয়। যে দেশে যাব, চরিত্রের সৌরভ বাহির হইবে। দয়াময়ী মার হাতে গড়া জিনিষ যে কেমন হয়, দেখাব।" আরো বল্লেন, মাতাল না হলে, পাগল না হলে, ভোলানাথ শিশু না হলে, পরিত্রাণ নেই। গোড়াথেকেই এই তিন ভাব তাঁর চরিত্রে মেশানো ছিল। যথা, "এই জীবনের ভিতরে তিন পুরুষ বর্ত্তমান। তিনি প্রকৃতি এই জীবনে বিরাজ করিতেছে। তিন প্রকার স্বভাবের সমন্বয় হইয়াছে; তিন প্রকার ধাতুর একত্র মিলন হইয়াছে। একটী বালক, একটী উন্মাদ, আর একটি মাতাল। ....হে দীনবন্ধু, হে করুণার অনন্ত সমুদ্র, বালক করিয়া রেখো, বৃদ্ধ যেন কখনও না হই। মাথার চুল যদি পাকে, ক্ষতি নাই; আত্মার বার্দ্ধক্য যেন না হয়। দোহাই ঠাকুর, বালক থাকা বড় সুখের।"

বৈদিক যুগের ঋষিকণ্ঠ-নিঃসৃত, তানলয়স্বরযুক্ত সামরব, সদ্যানুষ্ঠিত-যজ্ঞোৎক্ষিপ্ত পূত, সুরভি হোমানলধূম, যজ্ঞবেদিকার গঠন-সৌকর্য্য, বৌদ্ধযুগের হর্ম্ম্য, মঠ, দেবালয়, গুহা, স্তূপ, চৈত্য, বিহার, দেবমূর্ত্তি, আলেখ্য প্রভৃতি পাঁচটি বিভিন্ন কলাবিদ্যা-সাধনার চরমোৎকর্ষ সন্দেহ নাই। শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দের ভাষায় উক্ত পাঁচটিই আছে। সঙ্গীতের ঝঙ্কার, চিত্রকরের তুলির রং, কবিদের ধ্বনি, ভাস্করের কারুকার্য্য, স্থপতির সৌধনির্ম্মাণকৌশল, সবেরই মিলন হয়েছে। তাঁর জীবনকুঞ্জে জীবনদেবতার রাগিণী সততই বাজতো, হৃদয়পদ্মে হৃদয়সখার আসন সদা বিরাজিত ছিল; তাই তাঁর ভাষা শ্রোতার হৃদয়ে স্বপ্নলোকের ইন্দ্রজাল বিস্তার করতো। ছত্রে ছত্রে, তালে তালে ছন্দের অপূর্ব্ব নৃত্য দেখা দিত। চিদানন্দ-সিন্ধুনীরের প্রেমানন্দলহরী খেলা করত। শ্রোতাকে আনন্দ-লোকে নিয়ে যেত। কেশবচন্দ্র নিঃসন্দেহ কবি, চিত্রকর ছিলেন এবং তাঁর বাংলা ভাষা এক অপূর্ব্ব, অতুলনীয় সামগ্রী, অলৌকিক বস্তু। ধন্য কেশবচন্দ্র, তুমি ধন্য!

"যত দিন রবে ধরা, রবি শশী গ্রহ তারা
কেশবে না হ'বে হারা তাবৎ সংসার।"

রাজা রামমোহন রায়।

(এলাহাবাদে শতবার্ষিকী স্মৃতিসভায়, সভাপতি শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিভাষণ)

যে দেশে মহাপুরুষদিগের আদর ও সম্মাননা আছে, সেই দেশই যথার্থ জীবিত। যে দেশ মৃত ও সেই জন্য সঙ্কীর্ণমনা, সে দেশে প্রকৃত মহাপুরুষ ও মহামানবের আদর ও সম্মান নাই। তৎস্থলে অযথা নিন্দা ও নির্য্যাতন আছে। তাঁহাদের কৃতকার্য্যের সুফল ভোগ করে, কিন্তু তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ না হইয়া অকৃতজ্ঞই হয় ও অযথা নিন্দাবাদ করে, ইহাই দেখা যায়। আমাদের দেশেও এই মৃত অবস্থার দোষগুলি প্রভূত পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া আসিয়াছে। সুখের বিষয়, আজকাল এই দূষিত ভাবটী ক্রমে অপসৃত হইয়া, সুস্থ ও জীবিত অবস্থার ভাবের উন্মেষের সূচনা দেখা যাইতেছে; তাই আজ আমরা এখানে একত্রিত হইতে সমর্থ হইয়াছি। যাঁহার মৃত্যুর শতবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবার জন্য আমরা সমবেত, তাঁহার এবং তদ্রূপ অন্যান্য মহাত্মাদিগের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিবার প্রয়াস আরম্ভ হইয়াছে, দৃষ্ট হয়। কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রামমোহন রায় ও সেই শ্রেণীর মহাত্মাদিগের নামে দেশবাসী নাসিকা সঙ্কুচিত করিতেন। রামমোহনের দোষ, তিনি পৌত্তলিকতা, সতীদাহ প্রভৃতি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। রামমোহনের সময় দেশের কি ভীষণ অবস্থা ছিল, দেশ যে কিরূপ অন্ধকারে ও কুসংস্কারে আবৃত ছিল, তাহা এখন ধারণা করিতে পারা কঠিন। ইতিহাসপাঠে তাহা কতকটা জানা যায়। দেশের যে সকল কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তখন রামমোহন একাকী দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, আজকাল ভগবৎকৃপায় অনেকেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, এই সকল কুসংস্কারে দেশের কত ক্ষতি হইয়াছে এবং রামমোহন সেইগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার ফলে দেশের কত উপকার ও উন্নতি হইয়াছে। আমরা যদি রামমোহন এবং তৎপরবর্ত্তী প্রকৃত মনীষীদের পথ দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিতে পারিতাম, আজ দেশ কত উচ্চ স্থানে উঠিয়া যাইত—আমাদের এত দুর্দ্দশা থাকিত না। এখন আমাদের দৃষ্টি কতক পরিমাণে এইদিকে পড়াতেই, আজ আমরা গুণীর প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে সক্ষম হইতেছি।

মহাজনগণ যখনই কোন মহৎ উদ্দেশ্যে কোন নূতন সংস্কার আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তখনই তাঁহাদের ভাগ্যে উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনা-ভোগ ঘটিয়াছে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে ক্রমে তাঁহাদের গুণ ও কার্য্যের ফল গৃহীত হইয়াছে। যিশুখৃষ্ট, রামমোহন, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রভৃতির কার্য্যকলাপ প্রথমে নিন্দিত হইয়া ক্রমে গৃহীত হইতেছে।

যে দেশ যত সজীব, সে দেশের লোকের অপরের, এমন কি অন্য দেশের লোকের গুণাবলী গ্রহণ করিবার শক্তি ততই প্রবল। সেখানে তাঁহাদের জাতি, দেশ ইত্যাদি প্রভেদ বিচার থাকে না। এমন কি, মৃত দেশের কোন কোন মহাত্মার গুণ গ্রহণ করিতে ও তাঁহাকে মর্য্যাদা দান করিতে উক্ত মহাত্মার স্বদেশবাসী অপেক্ষা ঐ বিদেশবাসিগণকেই বেশী তৎপর দেখা যায়। রামমোহনের মৃত্যুর পর সেই সুদূর বিদেশে তাঁহার গুণগ্রাহী ইংরাজ বন্ধুগণ রাজার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তাঁহার কেশপাশের কিয়দংশ কয়েকটী লেপেফার মধ্যে সযত্নে রক্ষা করিয়া, রাজার মৃত্যুর প্রায় আশী বৎসর পরে, অন্যান্য স্মৃতিচিহ্নের সহিত ব্রাহ্মসমাজের হস্তে প্রদান করেন। ইহা কি তাঁহার প্রতি বিদেশবাসীর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও গুণগ্রাহিতার পরিচয় নহে?

একশত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের নেতা ও ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মপিতামহ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যখন স্বদেশ, আত্মীয় ও বন্ধুগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূর ব্রিষ্টল নগরে রোগশয্যায় দারুণ কষ্ট ভোগ করিতে ছিলেন, তখন তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া সেই বিদেশবাসীরাই অতি যত্ন সহকারে ও অকাতরে পরিশ্রম করিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। আজ আমি ঐ সকল উদারমনা বিদেশী মহোদয়গণকে প্রাণের সহিত কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি। তাঁহাদের নিকট হইতে মহত্ত্বের সম্মাননা আমাদের শিক্ষণীয়।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের বিষয় যতই আলোচনা করা যায়, এবং যে সকল প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া ও বিরুদ্ধ ভাবের সহিত তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল দেখা যায়, ততই তাঁহাকে ভগবচ্ছক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত মহামানব বলিয়া বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হয়। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেই জন্য তাঁহাকে Jiant mind বলিয়া গিয়াছেন। রামমোহন ও তাঁহার পশ্চাৎবর্ত্তী মনীষিগণ বহু পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করিয়া এবং নানা প্রকারে লাঞ্ছিত হইয়া, বনাকীর্ণ ভূমি পরিষ্কৃত করিয়া যে মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন, তদুপরি দণ্ডায়মান হইয়া কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ স্থলে কেহ কেহ নিন্দাবাদই করিয়া থাকেন। ইহা অতি ক্ষোভের বিষয়। সুখের বিষয়, এ প্রকৃতির লোক ক্রমে কমিয়া আসিতেছে।

সংস্কারক যে সকল সংস্কার প্রবর্ত্তন করিয়া দেশবাসীর নিকট বিদ্বেষভাজন হয়েন, পরে দেশবাসী ঐ সকল সংস্কার গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেও, পূর্ব্ব বিদ্বেষভাব অনেক দিন ধরিয়া বদ্ধমূল ভাবে চলিয়া আইসে। অতি ধীরে ধীরে তাহা অপসারিত হয়। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছে।

"হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ।"

মহানুভবদিগের প্রতি যাঁহারা অন্যায় আচরণ করেন, সেই অন্যায় আচরণই অন্যায়কারীদের ধ্বংসের পথে অগ্রসর করে। আমাদের দেশও এই নিয়মের বহির্ভূত নহে। তবে সুখের বিষয়, আমাদের এখন চক্ষু খুলিতে আরম্ভ হইয়াছে ইহাতে ভবিষ্যতে আশার চিহ্ন দেখা যায়। (ক্রমশঃ)

ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ বসু পরলোকে।

আমরা সন্তপ্তচিত্তে প্রকাশ করিতেছি, ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ বসু, ৬৬ বৎসর বয়সে, গত ৪ঠা নবেম্বর, শনিবার, রাত্রি প্রায় ৯॥টার সময়, আন্ত্রিক জ্বররোগে. শান্তিকুটীর হইতে নিত্য শান্তিধামে যাত্রা করিয়াছেন। হাবড়া জিলার পাচলা গ্রামে জমীদার বসুবংশে তাঁহার জন্ম হয়, এবং হাটখোলার প্রসিদ্ধ দত্তবংশে তাঁহার বিবাহ হয়। আলবার্ট স্কুলে ভাই প্রমথলাল, বিনয়েন্দ্রনাথ ও মোহিতচন্দ্রের সহিত এক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতে করিতে, আচার্য্যদেবের অনুজ শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণবিহারী সেনের প্রভাবাধীনে আসিয়া, তিনি নববিধানধর্ম্মে আকৃষ্ট হন; এবং আমাদের ব্যাণ্ড অব হোপে ও পরে ভাই প্রমথলাল, বিনয়েন্দ্রনাথ, মোহিতচন্দ্র এবং ভাই কালীনাথ ঘোষের সহযোগে যে যুবাদিগের প্রার্থনাসমাজ গঠিত হয়, তাহাতে উৎসাহের সহিত যোগ দিয়া নববিধানমণ্ডলীভুক্ত হন। অবস্থার চক্রে পড়িয়া পৈত্রিক ধন সম্পত্তি হইতে অনেকটা বঞ্চিত হইয়া যে চাকরী করিতেছিলেন, তাহাও না থাকাতে এবং কয়েকটী পুত্র কন্যা ও জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীমান্ লোকনাথ মল্লিককে হারাইয়া অত্যন্ত বিপন্ন অবস্থায় পতিত হন। সম্প্রতি বি,এ, উপাধিধারিণী মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী ননীবালারও আকস্মিকভাবে মৃত্যু হইলে তাঁহার শরীর মন শোকে তাপে অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে। আপাততঃ শান্তিকুটীরের পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে সপরিবারে অধিবাস করিতেছিলেন। "সুনীতিশিক্ষালয়ের"ও হিসাবরক্ষকের কার্য্য করিতেন। মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মমন্দিরেও উপাসনার ভার প্রাপ্ত হইতেন। নববিধান ট্রষ্টের কার্য্যকরী সমতির সভ্য এবং খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরের তত্ত্বাবধানের কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। মাত্র দশদিন পূর্ব্বে সামান্য সর্দ্দি জ্বরে আক্রান্ত হন, পরে তাহা ম্যালেরিয়া বলিয়া মনে হয়; বুধবারে ডবল নিউমোনিয়া বলিয়া ধরা পড়ায় ভ্রাতা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের চিকিৎসাধীনে অর্পণ করা হয় ও তাঁর পরামর্শ মত ডাক্তার ধীরেন্দ্রভূষণ বসু এবং ডাঃ শচীকুমার চট্টোপাধ্যায় অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া যথাসাধ্য চিকিৎসা করেন; ডাক্তার অনিলকুমার চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধুও তাঁহাদিগের যথেষ্ট সহায়তা বিধান করেন।" কিন্তু নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে, কোন প্রকার চিকিৎসা ও, সন্তান সন্ততি এবং আত্মীয়গণের প্রাণগত সেবা কিছুই কার্য্যকারী হইল না। শেষ নিঃশ্বাসত্যাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি কিছুই সংজ্ঞা হারান নাই। যাইবার পূর্ব্বে একবার বলেন, "আমি কেশবের কাছে যাবো।" "আমাকে এগিয়ে দাও না।" "সেই শান্তিকুটীরে যাবো।" এই ত শান্তিকুটীর বলাতে বলিলেন, "না, সে শান্তিকুটীর অনেক দূর।" একবার বলিলেন "ত্রৈলোক্যবাবুর গান শুনবো।" একটি গান হবার পর বলিলেন, "আর একটী গান হোক।" প্রার্থনা করবো কিনা জিজ্ঞাসা করায়, প্রার্থনা কত্তে বল্লেন ও যোগ দিলেন। শেষ ভাই প্রিয়নাথ মাতৃস্তোত্র আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিলে, তাহাতে যোগ দিতে দিতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে বন্ধু বান্ধবগণ সমবেত হইলে, ভাই প্রিয়নাথই উপাসনা করিলে শব লইয়া যাত্রা করা হয়। ব্রহ্মমন্দিরের সম্মুখেও শব রক্ষা করিয়া প্রার্থনা হয়। পরে কেশব একাডেমীর সম্মুখে শব রক্ষা করিয়া ভ্রাতা ধীরেন্দ্রনাথ সেন প্রার্থনা করেন। শব শ্মশানে নীত হইলে যথাবিহিত নবসংহিতার প্রার্থনা-সহকারে শবদাহ হয়। মা বিধানজননী পরলোকগত আত্মাকে তাঁর শান্তি-ক্রোড়ে লইয়া নিত্য শান্তিবিধান করুন এবং সন্তান সন্ততি এবং দুঃখিনী বিধবাকে তিনিই সান্ত্বনা দান করুন।

স্বর্গীয় অনুকূলচন্দ্র রায়।

(শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত)

আমাদের পূজনীয় পরমারাধ্য পিতৃদেব শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র রায় মহাশয় হুগলী জেলার ৺রিপাল গ্রামে বিখ্যাত রায়বংশে, ৩০শে ভাদ্র, ১২৭৫সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺ব্রজনাথ রায় এবং মাতার নাম ৺পাকমণি দেবী ছিল।

অতি শৈশবেই পিতৃদেব তাঁহার পিতা ও খুল্লতাতকে হারাইয়া সম্পূর্ণ অভিভাবকহীন হইয়া পড়েন। তাঁহারা চার সহোদর এবং চার সহোদরা ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে পিতৃদেব ছিলেন চতুর্থ সন্তান এবং ভ্রাতৃগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। বাল্যকালেই অভিভাবকহীন হইয়া পিতৃদেব অত্যন্ত নিঃসহায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। বৃহৎ পরিবারের ভার তাঁহার উপর পড়িয়াছিল। সেইজন্য অধ্যাপনা-কালেই তাঁহাকে অর্থোপার্জ্জনের জন্য চেষ্টা করিতে হইয়াছিল এবং অধ্যাপনা অসমাপ্ত রাখিয়া সুদূর আসাম অঞ্চলে চাকুরি গ্রহণ করিয়া যাইতে হইয়াছিল।

তৎপূর্ব্বে ১২৯৪সালে খাগড়ানিবাসী স্বর্গগত শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বসু মহাশয়ের মধ্যমা কন্যা স্বর্গগতা শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তখন পিতৃদেবের বয়স ১৯ বৎসর। কিছুদিন আসামে চাকুরি করিবার পর পিতামহী ঠাকুরাণীর অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং পিতামহীর স্বর্গলাভের পরে তিনি আর চাকুরি স্থলে ফিরিয়া যান নাই।

পরে কলিকাতা নগরীতেই অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হন, এবং অল্প আয়ের উপর নির্ভর করিয়া বৃহৎ পরিবারের ভরণপোষণ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণের অধ্যাপনার ব্যবস্থা তাঁহাকেই করিতে হইয়াছিল। বাল্যকাল অবধি পিতৃদেবের প্রকৃতি ধীর ও শান্ত ছিল, এবং তিনি অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু ও পরোপকারী ছিলেন। সাংসারিক অভাব ও দুঃখ কষ্টের সহিত যৌবনের প্রারম্ভেই তাঁহাকে যথেষ্ট সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। এই সময়ই তিনি ধীরে ধীরে ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁহার সম্পর্কে দুই কাকা স্বর্গীয় শ্রীযুক্ত রামগোবিন্দ রায় ও স্বর্গীয় শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ রায় এবং জ্ঞাতিভ্রাতা স্বর্গগত শ্রীযুক্ত বিনোদ

বিহারী রায় মহাশয়দিগের প্রভাবে তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত আরম্ভ করেন; এবং ক্রমে শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্রের বক্তৃতায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার ভাবে অনুপ্রাণিত হন। এই ভাবে তাঁহার ধর্ম্ম-জীবন আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত রামগোবিন্দ রায় মহাশয় সুগায়ক ছিলেন; ৺রাধাগোবিন্দ, রামগোবিন্দ ও বিনোদ বাবুকে লইয়া পিতৃদেব নিজ গ্রামে একটী ছোট মণ্ডলী গঠন করেন। তাহাতে আমাদের স্বর্গগতা পিসিমাতা ঠাকুরাণী ও মাতৃদেবীও যোগদান করেন। "শান্তিকানন" নাম দিয়া উপাসনা-গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তথায় নিয়মিত উপাসনা ও সংকীর্ত্তনাদি আরম্ভ হয়।

তৎকালে হরিপাল একটী বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। এইরূপ গ্রামে ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তন করা তখনকার কালে কিরূপ কষ্ট-সাধ্য ব্যাপার ছিল, তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। বিরোধিদলের সহিত পিতৃদেবকে যেরূপ সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল, তাহার তুলনায় সাংসারিক সংগ্রামকে সামান্যই বলা যায়। আত্মীয় স্বজনগণও বিরূপ হইয়াছিলেন। এমন কি, আমাদের মাতামহী পর্য্যন্ত মাতৃদেবীর সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু করুণাময় পিতা পরমেশ্বরের করুণায় তাঁহারা সকল বাধা অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পরে পিতৃদেব স্বর্গগত প্রেরিত ভাই অমৃতলাল বসু মহাশয়ের নিকট নববিধানধর্ম্মমতে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং নববিধানের সাধক ভক্তের ন্যায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। তৎকালে তিনি নববিধানের সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত চিরঞ্জীব শর্ম্মা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত "হালিলুজা ব্যাণ্ড" এর একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন এবং নববিধানের শাস্ত্রালোচনায় ও সঙ্গত প্রভৃতিতে যোগ দেওয়া বিষয়ে তাঁহার গভীর আগ্রহ ছিল। সেই সময় হইতেই ক্রমশঃ ভগবানের কৃপায় চাকুরিতে তাঁহার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল।

এই সময়ে তাঁহার জীবনে এবং আমাদের পরিবারে একটী মহা পরিবর্ত্তন ঘটিল। পূজনীয়া মাতৃদেবী কিছুকাল যাবৎ রোগে ভুগিতে ছিলেন, তাঁহাকে সুস্থ করিবার নানা চেষ্টা করা হইল, কিন্তু কোনই ফল পাওয়া গেল না। তিনি অকালে আমাদিগকে শোকসাগরে ভাসাইয়া চলিয়া গেলেন। পিতৃদেবের জীবনের সহিত তাঁহার জীবন যে কি ভাবে জড়িত ছিল এবং তাঁহাদের দাম্পত্য-জীবন যে কিরূপ শান্তিপ্রদ ছিল, তাহা কথায় প্রকাশ করিয়া বলা শক্ত। পিতৃদেবের সকল প্রকার দুঃখ কষ্ট শোক ও পরীক্ষার অংশ মাতৃদেবী গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার স্বর্গগমনে পিতৃদেব শোকে এত কাতর হইয়া পড়িলেন যে, সংসারে আর তাঁহার কোন আকর্ষণ রহিল না। আমাদের কাকাবাবুর হাতে বৃহৎ সংসারের সকল ভার দিয়া, কিছু কাল তিনি নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে তিনি আবার অর্থোপার্জ্জনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু সংসারে তাঁহার আর কোন আসক্তি দেখা যায় নাই।

পিতৃদেব ১৩১৭ সালে স্বর্গগত সাধু প্রমথলাল সেনের নিকট সাধকব্রত গ্রহণ করেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত নববিধানের আদর্শের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অতি গভীর ছিল। কয়েক বৎসর হইল, তিনি বহুমূত্র-রোগে ভুগিতে ছিলেন; গত দুই বৎসর হইল, তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। ইদানীং তিনি কুলটীতেই বাস করিতে ছিলেন। এখানে কাকাবাবুর তত্ত্বাবধানে ও সেবা শুশ্রূষার গুণে রোগের কষ্ট বহু পরিমাণে লাঘব হইয়াছিল। দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়াও, তিনি কোন দিন কখনও রোগের যন্ত্রণায় বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই এবং অতি শান্ত ও ধীর চিত্তে সকল প্রকার দুঃখ কষ্ট বহন করিয়াছিলেন।

পিতৃদেব আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু পারিবারিক জীবনের যে আদর্শ তিনি আমাদের সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন, আমরা যেন তাহা পালন করিতে পারি। আমাদের পরিবারে গৌরব করিবার কিছু আছে কিনা, আমরা তাহা বলিতে পারি না; তবে একটী বিষয়ে আমরা মনে মনে তৃপ্তি অনুভব করি যে, পিতৃদেব যে পারিবারিক বন্ধনে সকলকে বাঁধিয়া ছিলেন, ভগবানের কৃপায় তাহা অটুট আছে। পিতৃদেব যে ভার আমাদের কাকাবাবুর হস্তে দিয়াছিলেন—দুর্ব্বল হস্তে সে ভার পড়ে নাই। আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব আশ্রিত জন সকলকেই একত্র করিয়া রাখাই তাঁহার জীবনের কাজ। বিভিন্ন ধর্ম্ম অবলম্বন করা সত্ত্বেও, পিতৃদেব ও কাকাবাবুর মধ্যে যে প্রেম চিরকাল অচ্ছেদ্য ছিল এবং আমরাও চিরকাল সকলে এক পরিবারে সমভাবে প্রতিপালিত হইয়াছি, এখনও হইতেছি।

পিতৃদেব জগজ্জননীর শান্তিময় ক্রোড়ে চিরশান্তি লাভ করুন এবং আমরা তাঁহার প্রদর্শিত আদর্শ অনুসারে যেন জীবন পথে অগ্রসর হইতে পারি, করুণাময় পরম পিতার নিকট সেই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি।

ভাগ্যহীন

১৯শে অক্টোবর, ১৯৩৩। নির্ম্মল রায়।

—•—

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ২৭শে সেপ্টেম্বর, ২৮নং জুগীপাড়া লেনে, ডাক্তার অনুকূলচন্দ্র মিত্রের সহধর্ম্মিণীর জন্মদিনে ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন।

গত ২৮শে অক্টোবর, কলুটোলায় কৃষ্ণভবনে শ্রীযুক্ত কুমুদ বিহারী সেনের জন্মদিন উপলক্ষে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

জাতকর্ম্ম—গত ৫ই নবেম্বর, ১২৮নং হ্যারিশন রোডে, মারোয়াড়ী হাসপাতালে, রায় সাহেব ডাঃ প্রবোধচন্দ্র রায়ের দৌহিত্র, ডাঃ শরচ্চন্দ্র নন্দীর নবজাত শিশুপুত্রের শুভজাতকর্ম্ম-

মুষ্ঠানে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। শিশুটী গত ৬ই অক্টোবর জন্মগ্রহণ করে। এই উপলক্ষে প্রবোধবাবু প্রচার-ভাণ্ডারে ৫৲ টাকা ও অনাথাশ্রমে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

নামকরণ—বিগত ১৮ই অক্টোবর, বুধবার প্রাতে, হাওড়ায় ২৮নং নরসিংহ দত্ত রোডে, শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার দাসের দ্বিতীয় ও কনিষ্ঠ পুত্রের নামকরণ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই অখিলচন্দ্র রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। দ্বিতীয় পুত্র অরুণকুমার ও কনিষ্ঠ পুত্র সুশান্তকুমার নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। মা বিধানজননী শিশুদিগকে ও তাহাদের পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

পারলৌকিক—বাগনান, চন্দ্রপুর গ্রামে, স্বর্গীয় ভ্রাতা শশিভূষণ চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র এবং শ্রীমান্ নৃপেন্দ্রনাথ চৌধুরীর পুত্র শ্রীমান্ বাচু সামান্য জ্বরে আকস্মিক ভাবে পরম জননীর ক্রোড়ে আরোহণ করিয়াছে। তাহার আত্মার কল্যাণার্থ এবং শোকসন্তপ্ত পিতামাতা এবং পরিজনগণের সান্ত্বনার জন্য, গত ২৯শে অক্টোবর, বাগনানে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক বিশেষ উপাসনা করেন এবং স্থানীয় সকল পরিবার যোগদান করেন।

আলবার্ট কলেজের ভূতপূর্ব্ব ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র রায় গত শারদীয় পূর্ণিমা-তিথিতে স্বর্গারোহণ করেন। গত ১লা কার্ত্তিক তাঁর আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠানে শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণকুমার মিত্র এবং ডাঃ প্রসন্নকুমার মজুমদার উভয়ে আচার্য্যের কার্য্য করেন। রায় মহাশয়ের মৃত্যুর দশ দিন পরে তাঁহার একমাত্র কন্যা শ্রীমতী কুমারীরত্ন আটটী সন্তান ও স্বামীকে রাখিয়া পরলোকে গমন করেন। ডাঃ প্রসন্নকুমার মজুমদার সস্ত্রীক রোগে শোকে দুঃস্থ পরিবারের সর্ব্বতোভাবে অক্লান্ত সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছেন। ভগবান্ শোকার্ত্ত প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

শতবার্ষিকী—গত ২৯শে আশ্বিন (১৫ই অক্টোবর), এলাহাবাদে, মহিলা বিদ্যাপীঠ হলে, বাণীমন্দিরের আনুকূল্যে, জাতীয়তার আদিগুরু যুগমানব রাজা রামমোহন রায়ের স্বর্গারোহণের শতবার্ষিক উৎসব বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সুন্দরভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। "প্রবাসী"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য ভদ্রমহোদয়গণ বিভিন্ন ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছেন। জ্ঞানবাবুর সুন্দর অভিভাষণটী ক্রমে ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হইবে, আশা করা যায়।

প্রথম সাম্বৎসরিক—এক বৎসর পূর্ণ হইল, আচার্য্যদেব কন্যা মহারাণী সুনীতি দেবী স্বধামে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার স্বর্গারোহণের প্রথম সাম্বৎসরিক সম্পাদনের জন্য, শ্রীদরবারের সম্পাদক, উপাসক মণ্ডলীর সম্পাদক এবং আচার্য্যপরিবারের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সেনের নাম স্বাক্ষরে নিমন্ত্রণপত্র বাহির করিয়া, উপাসকমণ্ডলীকে এবং মহারাণীর প্রতি শ্রদ্ধাবান্ বন্ধুবান্ধবদিগকে নিমন্ত্রণ করা হয় এবং অনুষ্ঠানটী সুন্দররূপে সম্পাদনের নিমিত্ত ভ্রাতা নির্ম্মলচন্দ্র বিশেষ আয়োজন করেন। নবদেবালয়ের রোয়াকে উপাসনার মণ্ডপ বাঁধিয়া, ১০ই নবেম্বর, প্রাতে ৭৷৷টার সময় এইখানেই উপাসনা হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উদ্বোধন ও প্রার্থনা করেন। ভাই প্রিয়নাথ আরাধনা ও শান্তিবাচন উচ্চারণ করেন। ভাই অক্ষয়কুমার শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং আচার্য্যদেবের প্রার্থনা আবৃত্তি করেন এবং বিধানমুরলী সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সংগীত করেন। সমস্ত উপাসনাটী অতি সুন্দর ও গম্ভীরভাবে সম্পন্ন হয়। উপাসনান্তে সমাগত ভাই ভগ্নীদিগকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। সন্ধ্যার পর প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামকমল ভট্টাচার্য্য অতি সুন্দর সংকীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে মোহিত করেন। ১২ই ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে, সামাজিক উপাসনায় ভাই প্রিয়নাথ তাঁহার সুন্দর জীবন বিবৃত করেন।

১০ই নভেম্বর, রাঁচি তৃপ্তিকুটীরেও, সংঘভগিনী স্বর্গীয়া মহারাণী সুনীতি দেবীর প্রথম সাম্বৎসরিক দিন স্মরণে, শ্রীমতী হেমলতা চন্দ ও শ্রীমতী নির্ম্মলা বসু মণ্ডলীর সহিত যোগ রক্ষা করিয়া, প্রাতে ৭৷৷টার সময় মিলিত ভাবে উপাসনা করিয়াছেন। বৈকালে সুবর্ণরেখা নদীতীরে যাত্রা করা হয়।

অদ্য পাটনায়, ৪নং ম্যাঙ্গলস্ রোডে, শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ মজুমদারের গৃহেও, পারিবারিক উপাসনায় নবীনা মীরা মহারাণী সুনীতি দেবীর পবিত্র স্মৃতি স্মরণ করা হয়। গৌরীবাবু উপাসনা করেন, শ্রীমতী সুমতি মজুমদার প্রার্থনা করেন। কুচবিহারেও সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠান সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। তাহার বিবরণ হস্তগত হইলে, আগামীবারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

সাম্বৎসরিক—গত ২৯শে অক্টোবর, কলুটোলায়, কৃষ্ণভবনে, স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেনের সহধর্ম্মিণীর স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিকে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

গত ২৬শে অক্টোবর, মুঙ্গেরে স্বর্গীয় শ্রদ্ধেয় শশিভূষণ মল্লিকের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, তাঁর মধ্যমা কন্যা লেডি ডাক্তার কুমারী শান্তিপ্রভার প্রবাসভবনে বিশেষ উপাসনা ভাই অখিলচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয়। শান্তিপ্রভা এই উপলক্ষে মুঙ্গের সমাজে ৪৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ৩০শে অক্টোবর, ৭৬নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে, স্বর্গীয় রামেশ্বর দাসের সাম্বৎসরিকে, ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন। পুত্র শ্রীযুক্ত স্বপ্রকাশচন্দ্র দাস প্রার্থনা করেন এবং শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র দাস প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করেন।

গত ৫ই নবেম্বর, ৭৮।১ হ্যারিশন রোডে, শ্রীযুক্ত নীতিলাল ঘোষের গৃহে, তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গীয় অমৃতলাল ঘোষের সাম্বৎসরিকে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

চিরঞ্জীব-সঙ্গীতাবলী—আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, এলাহাবাদপ্রবাসী আমাদের শ্রদ্ধেয় উপকারী প্রবীণ বন্ধু শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ও অর্থসাহায্যে সঙ্গীতাচার্য্য স্বর্গগত প্রেরিত ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যালের রচিত সঙ্গীতগুলি একত্রে "চিরঞ্জীব-সঙ্গীতাবলী" নামে মুদ্রিত হইতেছে। আগামী মাঘোৎসবের মধ্যেই ইহা প্রকাশিত হইবে, আশা করা যায়। নববিধান-সাহিত্যে ভক্তিরসপূর্ণ, সাধনপথে সহায় চিরঞ্জীব-সঙ্গীতগুলি অমূল্য সম্পদ। এই অমূল্য সম্পদ সকলের হাতে দিবার জন্য শ্রদ্ধেয় জ্ঞানবাবু যে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, সেজন্য তিনি আমাদের সকলেরই ধন্যবাদার্হ।

ব্রহ্মানন্দ-মহোৎসব।

১৯শে নবেম্বর হইতে ৮ই জানুয়ারী পর্যান্ত বিশেষ ভাবে সাধন ভজন করিয়া, নববিধান জীবনে এবং চরিত্রে সংক্রামিত হইতে দেওয়া অতি সুন্দর প্রস্তাব। ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে গেলে সাধনার্থীর যাহা যাহা প্রয়োজন, তৎসম্বন্ধে মোটা-মুটী দুই একটী বিষয়ের আলোচনা করা কর্ত্তব্য মনে হয়। আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র আশার চন্দ্র। বর্ত্তমান যুগে মনুষ্য-সন্তান চারিদিকে জড়বাদ, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, অহংকার ও জ্ঞানাভি-মানের মধ্যে স্থিতি করিয়াও, কিরূপ ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মধ্যানে পরায়ণ হইয়া ব্রহ্মানন্দরস আস্বাদন করিতে পারে, কেশবচন্দ্র তাহার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সুতরাং তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাবের মাঝখানে, তাঁহার জীবন ও চরিত্রের যাহা যাহা নববিধান-সাধকের সম্মুখে পবিত্রাত্মা স্বয়ং সমুপস্থিত করেন, তাহা সংক্ষিপ্ত ভাবে এই রূপে লিপিবদ্ধ হইতে পারে। যথা :—ব্রহ্মানন্দজীবনের তিনটী বিশেষ ভাগ—(১ম) স্মরণীয়, (২য়) গ্রহণীয়, (৩য়) সাধনীয় ; এই তিনটী পরস্পর অবিচ্ছিন্ন ভাবে সম্বদ্ধ। ব্রহ্মকৃপায় যাহা স্মরণ করা যায়, তাহাই তৎকৃপায় গ্রহণ করিতে অর্থাৎ জীবনে আয়ত্ত করিতে আগ্রহ হয়। ভগবৎকৃপায় সেই আগ্রহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া তাহা উপাসনা, প্রার্থনা, ধ্যান, ধারণাদি যোগে সাধন করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। এই প্রবৃত্তির মূলে সাধক ব্রহ্মকৃপা দেখিতে পান। এজন্য বলিতে বাধ্য হইতেছি, এই যে ১৯শে নবেম্বর হইতে ৮ই জানুয়ারী পর্যান্ত বিশেষ ভাবে সাধন ভজনের প্রস্তাব, এ প্রস্তাব ব্রহ্মকৃপামূলক, তাহাতে সন্দেহ নাই। এক্ষণে আশার চন্দ্র কেশবচন্দ্রের জীবন ও চরিত্রের কি কি আমাদের স্মর-ণীয়, গ্রহণীয় ও সাধনীয়, অগ্রে তাহা আলোচনা করা যাইতেছে।

১। স্মরণীয়—"কেশব-চরিত্র, পরম পবিত্র, মূর্ত্তিমান নব-বিধান।"

(ক) জ্ঞানে প্রবীণ, (খ) যোগে শান্ত, (গ) কর্ম্মে উৎসাহী জীবন্ত, (ঘ) প্রেমে মত্ত মাতঙ্গের প্রায়। অর্থাৎ (ক) ব্রহ্মজ্ঞান, (খ) ব্রহ্মধ্যান (যোগ), (গ) ব্রহ্মানন্দরসপান।

(ক) ব্রহ্মজ্ঞান—হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টীয়, ইসলাম প্রভৃতি সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্রে সমাদর।

(খ) ব্রহ্মধ্যান—একতন্ত্রী লইয়া নির্জ্জনে গৃহে, বাগানে, সাধনকাননে, দার্জ্জিলিং, নাইনিতাল এবং সিমলা পাহাড়ে ধ্যানে মগ্ন।

(গ) ব্রহ্মানন্দরসপান—উপাসনা, নামসাধন, সঙ্গতসভা, উৎসব ও কীর্ত্তন।

২। গ্রহণীয়—(ক) অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা, বৈরাগ্য, শিষ্য-প্রকৃতি। (খ) ব্রহ্মদর্শন, প্রেম, পবিত্রতা ও উদারতা। (গ) ব্রহ্মবাণী-শ্রবণ এবং পবিত্রাত্মা দ্বারা চালিত হওয়া।

৩। সাধনীয়—সাধন সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা লিপিবদ্ধ হইতে পারে না। কেন না, উহা ব্যক্তিগত এবং এক এক স্থানের মণ্ডলীগত। পবিত্রাত্মার আলোকে উহা ব্যক্তিগত ভাবে গ্রহণীয় এবং যেখানে যাঁহারা একত্র উপাসনা এবং সাধন ভজন করেন, তাঁহারাও সেই আলোকে সাধন অবলম্বন করিবেন।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন।

ব্রহ্মানন্দের জন্মোৎসব।

সবিনয় নিবেদন,

শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পঞ্চনবতিতম শুভ জন্মোৎ-সব উপলক্ষে, আগামী ১৯শে নভেম্বর, রবিবার, প্রাতে ৯ঘটিকার সময়, কমলকুটীরস্থ নবদেবালয়ে (৭৮বি আপার সার্কুলার রোড) বিশেষ উপাসনা হইবে। মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী উপাসনা করিবেন। অপরাহ্ণ ৪॥ঘটিকার সময় নবদেবালয়-প্রাঙ্গণে কল্পতরুর অনুষ্ঠান হইবে, তৎপর সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে শ্রদ্ধেয় ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করিবেন। সকলের সপরিবারে ও সবান্ধবে যোগদান বাঞ্ছনীয়।

আগামী ৮ই জানুয়ারী, ১৯৩৪, আচার্য্যদেবের পঞ্চাশত্তম স্বর্গারোহণ-সাম্বৎসরিক দিন। এই জন্মোৎসব হইতে স্বর্গা-রোহণের সাম্বৎসরিক পর্য্যন্ত, বিশেষভাবে তাঁহার জীবন-গ্রহণার্থ, রবিবার ব্যতীত ২০শে নভেম্বর হইতে প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬॥ঘটিকার সময়, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে আলোচনা, পাঠ ও প্রসঙ্গাদি হইবে। সকলে ইহাতেও যোগদান করেন, প্রার্থনা। মন্দিরে যোগদানে অসমর্থ হইলে, স্ব স্ব গৃহে এইভাবে পাঠ প্রসঙ্গাদি করেন, বিনীত অনুরোধ।

বিনীত—

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ
সম্পাদক।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির,
৮৯, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা ;
১৪ই নভেম্বর, ১৯৩৩।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priya-nath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.
কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে", শ্রীগিরিজোর ঘোষ কর্ত্তৃক ১লা অগ্রহায়ণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৮ ভাগ। ২২শ সংখ্যা। | ১৬ই অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৪০ সাল, ১৮৫৫ শক, ১০৪ ব্রাহ্মাব্দ। 2nd. December, 1933. | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে আমাদের পরম পিতা, পরমা জননী! তুমি ক্রমা[illegible] আজ একজন, কাল আর একজন করিয়া আমাদের অতি আদরের, অতি প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় ভাই ভগ্নীদিগকে ইহলোক হইতে পরলোকে লইয়া যাইতেছ। পরলোককে ক্রমাগত আমাদের পরিচয়ের ভূমি, সাধনের ভূমি, প্রিয়ভূমি, আপনার অতি আদরের ভূমি করিয়া, আমাদের মধ্যে পরলোকসাধন যেন একটা বিশেষ সাধন করিয়া তুলিতেছ। কিন্তু পরলোকের কথা বলিতে, পরলোক বিষয়ে কিছু শুনিতে, পরলোক ভাবিতে এখনও কি আমাদের মধ্যে অল্পাধিক ভয় ভীতি ও দূরত্বের ভাব মনে হয় না? পরলোক কত উচ্চ, কত অপরিচিত, তাহাতো মনে হয়ই; অপরদিকে পরলোক ভয় ও ভীতির স্থান, এ ভাবও আমাদের প্রকৃতির অস্থি মজ্জার ভিতরে রহিয়াছে। তবে পরলোকে যখন আমাদের এত গুরুজন প্রিয়জন চলিয়া যাইতেছেন, আমাদিগকেও তোমার আহ্বান আসিলেই যাইতে হইবে, নিশ্চয়ই যাইতে হইবে, সে অবস্থায় আমাদের অন্তর হইতে পরলোক সম্পর্কে সকল প্রকার ভয়ভীতি, দূরত্ব, পরত্ব, এ সব দূর না হইলে চলিবে কেন? এ সব সহজে দূর হয় কি করিয়া, বল। তুমি আমাদের পরম পিতা মাতা, সর্ব্বাপেক্ষা সুহৃদ বন্ধু। আমরা যত দূর তোমাকে চিনিয়াছি, জানিয়াছি, তাহাতে নিশ্চয় বুঝিয়াছি, তোমার মত আপনার জন, প্রিয়জন আর আমাদের কেহই নাই। আবার তুমি আমাদের পরম স্থান ও অতি প্রিয়স্থান। উপাসনাদি-যোগে যখন তোমাতে সজ্ঞানে সচেতনে স্থিতি করি, সে অবস্থার ন্যায় সুখের অবস্থা, সৌভাগ্যের অবস্থা আমাদের আর ত কিছু মনে হয় না। সে অবস্থায় এখনও দীর্ঘ সময় সজ্ঞানে তোমাতে বাস করিতে পারিতেছিনা, সে সৌভাগ্যের অবস্থা এখনও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতেছেনা, ইহাই আমাদের সম্বন্ধে অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। প্রকৃত পক্ষে তোমাকে সাধন, আর পরলোকসাধন একই; তোমাতে সজ্ঞানে সচেতনে স্থিতি, আর পরলোকে বাস একই। তোমাকে গভীররূপে উজ্জ্বলরূপে সাধন এখনও তেমন করিয়া আমাদের হইতেছে না, তোমাতে সজ্ঞানে সচেতনে দীর্ঘকাল স্থিতির সাধনও তেমন করিয়া আমাদের হয় নাই; তাই আমাদের পরলোকের জ্ঞান উজ্জ্বল হইতেছে না, পরলোকসাধন গভীর হইতেছেনা, পরলোক-সম্পর্কে ভয়ভীতির ভাব, দূরত্বের ভাব [illegible] করিয়া দূর হইতেছে না। যখন তোমাকে সাধন [illegible] তোমাতে সজ্ঞানে বাস করি, তখন ইহকালের সক[illegible] ভুলিতে

হয়, আমাদের শরীর পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতে হয়। বস্তুতঃ বাহিরের স্থূল জগতের সকলই ত্যাগ করিয়া, তোমাতে নিরাবিল যোগে স্থিতি, সেই তো পরলোকে বাস ও পরলোকে স্থিতি। ব্রহ্মেতে বাস, ব্রহ্মগত জীবনই কি আমাদের স্বর্গবাস এবং স্বর্গীয় জীবন, পরলোকের অমৃত জীবন নয়? এই স্বর্গীয় জীবনে যখন তোমাতে বাসের অবস্থা উজ্জ্বল হয়, এবং তোমাতে অশরীরী রাজ্যে আমাদের গুরুজন প্রিয়জনের সঙ্গে মিলন ও মিলনে স্থিতির অধিকার লাভ হয়, তখন আমাদের আরও কত সৌভাগ্য, কত আনন্দ, কত সম্ভোগ হয়। তখন কোথায় ভয়, কোথায় ভীতি, কোথায় দূরত্ব পরলোক বিষয়ে? পরলোকসাধনের সঙ্গে সঙ্গে, যদি তুমি কৃপা করিয়া এবার ব্রহ্মানন্দের জন্মোৎসব ও স্বর্গগমনের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে পাঠ ও প্রসঙ্গাদি যোগে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবন ও ধর্ম্ম সাধনের ব্যবস্থা করিয়া দিলে, তবে এ সময় তোমার কৃপার অবতরণ আমাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে ভিক্ষা করি। আমাদের মধ্যে তোমার কৃপার অবতরণে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবন ও ধর্ম্মসাধন, পরলোকসাধন, তোমাতে স্থিতি ও তোমাগত জীবন-সাধন, পরলোকে আমাদের সকল গুরুজন প্রিয়জনের সঙ্গে মিলনসাধন স্বাভাবিক হইবে, আনন্দের ও সম্ভোগের ব্যাপার হইবে, এই আশা করিয়া তব পদে বার বার প্রণাম করি।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

—০—

জন্মোৎসবের সার্থকতা।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জন্মোৎসব বৎসরের পর বৎসর হইতেছে, এই জন্মোৎসবের সার্থকতা কাহার জীবনে কতদূর হইয়াছে ও হইতেছে, এই জন্মোৎসবের সার্থকতা আমাদের আত্মিক জীবনে যথার্থতঃ কিরূপে সম্ভবে, এ সময় চিন্তা ও আলোচনা করিবার বিষয়। আমরা ব্রহ্মানন্দের জীবন ও জীবনের সাধনা পবিত্রাত্মার আলোক ও প্রেরণায় আমাদের প্রতি জীবনে যতদূর গ্রহণ ও আত্মস্থ করিতে সমর্থ হইয়াছি, সেই পরিমাণেই সত্যতঃ আমরা তাঁহাকে বুঝিয়াছি এবং সেই পরিমাণেই তাঁহার সঙ্গে আমাদের আধ্যাত্মিক যোগ সংস্থাপিত হইয়াছে। সেই পরিমাণেই আমাদের জীবনে তাঁহার আদর সম্মান যথার্থ আদর সম্মান, সেই পরিমাণেই তিনি আমাদের, আমরা তাঁহার, তদতিরিক্ত নহে। গ্রন্থাদি পাঠ ও প্রসঙ্গে তাঁহাকে আমরা যতই কেন বুঝিতে চেষ্টা না করি, এবং এরূপ পাঠ প্রসঙ্গের যোগে যতই কেন তাঁহাকে আদর সম্মান না করি, সে আদর সম্মানের মূল্য অতি সামান্য। এরূপ আদর সম্মানে তিনিও আমাদিগকে তেমন অন্তরঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না, আমরাও তাঁহাকে তেমন অন্তরঙ্গ করিয়া ধন্য হইতে পারি না। ব্রহ্মানন্দের ধর্ম্মজীবন যে পরিমাণে আমরা আধ্যাত্মিক ভাবে আমাদের নিজ নিজ জীবনে সাধন ও গ্রহণ করিতে পারিয়াছি, সেই পরিমাণেই তাঁহার জীবন লইয়া তাঁহার জন্মদিন উপলক্ষে আমাদের উৎসবানন্দ; এবং সেই পরিমাণেই তাঁহার জন্মোৎসবের সফলতা, সার্থকতা আমাদের জীবনের পক্ষে আমরা গণ্য করিব।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মজীবন বিচিত্র ভাবের বিচিত্র সাধনার বিরাট জীবন। সে জীবনের অতি অল্পই আমাদের মত সামান্য জীবনে এ পর্য্যন্ত সাধন করিতে, গ্রহণ করিতে ও ধারণ করিতে আমরা সমর্থ হইয়াছি। সে জীবনের সঙ্গে আমাদের ধর্ম্মজীবনের তুলনা করিলে বলিতে হয়, সাধনার বেলাভূমিতে আমরা বিচরণ করিতেছি, আমাদের পুরোভাগে অপার, অনধিগম্য, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনরূপ সাধনসমুদ্র স্থিতি করিতেছে। যাহা হউক, সে জীবনের কোন্ দিক আমরা কতটুকু গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা যদি এ সময় বিশেষ আলোচনার ভিতর দিয়া বুঝিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদের কল্যাণ হইতে পারে। তাঁহার বিরাট জীবনের কয়টী বিষয় অবলম্বন করিয়া এরূপ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আলোচনা সম্ভবে? আমরা এ প্রবন্ধে তাঁহার ধর্ম্মজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলির অল্প কয়েকটি বিষয় লইয়া সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

১। "বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলংহি"। বিশ্বাসই ধর্ম্মজীবনের মূল। প্রথমে তাঁহার জীবনের বিশ্বাস, নবযুগের নব বিশ্বাস লইয়া আলোচনা করি। "Man of Faith" বিশ্বাসাত্মা বলিয়া তিনি বিশেষ ভাবে চিহ্নিত ও পরিচিত। তাঁহার বিশ্বাস জীবন্ত বিশ্বাস। Living faith in living God. তাঁর জীবনের বিশ্বাস নবযুগের নব বিশ্বাস। নব বিশ্বাস কেন বলি? ধর্ম্মরাজ্যে বিশ্বাসের দুইটী ধারা আমরা দেখিতে পাই। আমাদের ভারতের ঋষিজীবনের বিশ্বাস, ভারতীয় সাধুভক্ত যোগীদিগের

বিশ্বাস প্রধানতঃ ঈশ্বরের দর্শন ও সাক্ষাৎ অনুভূতি-মূলক। ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মানুভূতি তাঁহাদের বিশ্বাসের ভূমি। বিদেশী সাধু মহাজন এব্রাহিম, মুষা, ঈশা, মহম্মদ প্রভৃতির জীবনের বিশ্বাস প্রধানতঃ ঈশ্বরের বাণীশ্রবণ-মূলক। ঈশ্বরের বাণী সেই বিশ্বাসের ভিত্তি-ভূমি। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনে ভারতীয় ঋষি, ভক্ত যোগীদিগের ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মানুভূতি এবং মুষা, ঈশা, মহম্মদ প্রভৃতির জীবনের ব্রহ্মবাণীশ্রবণ, এ উভয়ই সমভাবে গৃহীত ও জীবন্ত ভাবে মূর্ত্তিমান। বিশ্বাসের এই দুইটী ভিত্তিভূমি কেশবচন্দ্রে মিলিত বলিয়া, তাঁহার জীবনের বিশ্বাস নবযুগের নব বিশ্বাস এবং পূর্ণতম বিশ্বাস। Perception ও hearing দুইটী পক্ষপুটে আরোহণ করিয়া ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বিশ্বাসের উচ্চাকাশে কতই উড্ডীয়মান হইতেন।

ব্রহ্মানুভূতি এবং ব্রহ্মবাণীশ্রবণ তাঁহার বিশ্বাসের আশ্রয় ভূমি এবং পোষণ সামগ্রী, তাঁহার নিজের বাণী তাহার সাক্ষ্যদান করে। প্রার্থনায় তাঁহার ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ, প্রার্থনায় তাঁহার ধর্ম্মজীবনের ক্রমোন্নতি ও উচ্চ পরিণতি, সকলেই জানেন। প্রার্থনার ফল বাণীশ্রবণে তাঁহার বিশ্বাস পরিপুষ্ট হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। তিনি পরিত্রাণপ্র[illegible] জীবন্ত বিশ্বাসের লক্ষণ বলিতে গিয়া বলিলেন—"But very few have faith in God in the true sense of the term, namely, spiritual perception. Do we vividly see His reality? Do we feel His awful presence? Unless we do so, how can we be said to have faith in Him?" আমরা সত্য ঈশ্বরের সত্য দর্শন, অনুভূতি ও বাণীশ্রবণ-যোগে কে কতদূর জীবনের বিশ্বাসকে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত করিতে পারিয়াছি, তাহা এ সময় জীবনের কষ্টি পাথরে পরীক্ষা করিয়া দেখি, বুঝি এবং চেতনা লাভ করি, কে কতদূর কেশবচন্দ্রের বিশ্বাস-ধনে ধনী হইয়াছি।

দ্বিতীয়—কেশবচন্দ্রের জীবনের ভক্তি। ভারতের প্রাচীন ভক্তিশাস্ত্র ভক্তিকে বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বলিলেন, প্রধানতঃ ভক্তি দুই প্রকার, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি ও রাগানুগা ভক্তি। তত্ত্বজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া জীবনে যে ভক্তি লাভ হয়, তাহাকে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বলে; আর সত্য, শিব, সুন্দরের সাক্ষাৎ অনুভূতি ও দর্শনের মধুরতা-মূলক, তাঁহার রসাল নামগুণাদির কীর্ত্তনমূলক অনুরাগরঞ্জিত ভক্তিকে রাগানুগা ভক্তি বলে। আমরা সংক্ষেপে ভক্তির এই দুইটী দিক উল্লেখ করিলাম। কেশব বিজ্ঞানাত্মা কেশব। তাঁহার জীবনের ধর্ম্ম Science of religion। যাহা বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ, তাহা তাঁহার ধর্ম্ম নহে। তাঁহার জীবনের ব্রহ্ম-দর্শন, ব্রহ্মবাণীশ্রবণ সকলই বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। এরূপ জীবনের ভক্তি তো জ্ঞানমিশ্রা হইবেই। আবার সত্য শিব সুন্দর যিনি, তিনি হইয়াছেন কেশবচন্দ্রের ভক্তির পাত্র। হৃদয়বিহারী প্রেমঘন শ্রীহরিরূপে এবং সর্ব্বশেষে অনন্ত স্নেহরূপা ভুবনমোহিনী জননীরূপে কেশব-জীবনে সেই সত্য শিব সুন্দরের ঘনীভূত মধুর প্রকাশ। তাই কেশবচন্দ্রের জীবনে রাগানুগা ভক্তির উচ্চ স্ফুরণ আমরা প্রত্যক্ষ করি। অতএব জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি ও রাগানুগা ভক্তির মিলনে কেশবজীবনের নবভক্তি। এই নব ভক্তি আমাদের কাহার জীবনে কতটুকু স্ফুরিত হইয়াছে, এ সময় নিজ নিজ জীবন পরীক্ষা করিয়া দেখি।

তৃতীয়—তাঁহার জীবনের বিবেক ও বৈরাগ্য। প্রাচীন কালে জনক ঋষি সংসারবাসী হইয়াও সংসার-নির্লিপ্ত ঋষিজীবনের উচ্চ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন কিন্তু সে যুগ আর বর্ত্তমান যুগ তো এক নয়। এ যুগে বাহ্য সভ্যতার ষোল আনা আয়োজনের মধ্যে সংসারীর সাজে সজ্জিত থাকিয়া, অন্তরে তীব্র বৈরাগ্যের অগ্নি প্রজ্বলিত রাখা কত কঠিন ব্যাপার। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেই অগ্নিময় বৈরাগ্যে পরিপুষ্ট হইয়া, নির্ম্মল বিবেকবাণীর অনুসরণে জীবন্ত ঈশ্বর-প্রেরণায় জীবনের বিচিত্র কঠিন কর্ত্তব্য সকল সম্পন্ন করিলেন। পারিবারিক, সামাজিক এবং জাতীয় জীবনে নৈতিক উচ্চ কর্ত্তব্যের এমন এক উচ্চ আদর্শ রাখিয়া গেলেন, যাহা ভবিষ্যতে এ দেশে এক যুগান্তর আনয়ন করিবে। এ সময় জীবন পরীক্ষা করিয়া দেখি, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনের ধর্ম্ম এ বিষয়ে কতটুকু এ পর্য্যন্ত সাধন ও পালন করিতে সমর্থ হইয়াছি।

চতুর্থ—কেশবচন্দ্রের জীবনের শিষ্যভাব। অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার জীবন যদি নূতন হয়, শিষ্যভাবে তাঁহার জীবন হৃদয়ভেদী নূতন। ধর্মক্ষেত্রে শিষ্য সকলেই, কিন্তু কেশবচন্দ্র মহাশিষ্য। শ্রীগৌরাঙ্গ নাকি চৌষট্টি স্থানে গুরু-করণ করিয়াছিলেন। যে জীবনের আরম্ভে গুরু নাই, গ্রন্থ নাই, সেই কেশবচন্দ্রের জীবনের ক্রমবিকাশ ও ক্রম-

প্রকাশে, সুধু অতীতের বর্ত্তমানের ও স্বদেশের বিদেশের সাধু মহাজনগণ গুরু নন, ছোট বড় যে কোন ব্যক্তিই তাঁহার গুরু হইলেন। তিনি বলিতেন, "আমার হৃদয় ব্লটিং কাগজের ন্যায়, কেহ আমার নিকট আসিয়া কিছু না দিয়ে যাইতে পারেন না, আমি প্রতিজনের নিকট হইতে কিছু আদায় করিয়া লইবই লইব।" বিচারপ্রধান আমাদের এই জীবনে আমরা কতটুকু এই মহাশিষ্যভাবসাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছি, এ সময় জীবনের হিসাব মিলাইয়া দেখি।

পঞ্চমতঃ—তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনে মহা সম্মিলন। সম্মিলনের ভাব পূর্ব্ব পূর্ব্ব কোন কোন মহাপুরুষের জীবনেও ছিল। কিন্তু স্বর্গ হইতে কেশবচন্দ্র যে সম্মিলন-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, যে সম্মিলন সাধন করিয়া গেলেন, তাহার তুলনা কোথায়? মহাসম্মিলন সাধন, মহাসম্মিলনের প্রভাব বিস্তার যদি তাঁহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিশেষত্ব হয়, তবে সে বিশেষত্বের কতটুকু আমাদের জীবনকে বিশেষত্ব দান করিতেছে, এ সময় ভাবিয়া দেখি।

এই সকল সম্পদের যতটুকু আমরা আমাদের আত্মিক জীবনে গ্রহণ করিয়াছি, আত্মস্থ করিয়াছি, সেই পরিমাণে আমরা ধন্য হইয়াছি। সেই সাধন-সম্পদের ভিতর দিয়া এ সময় শ্রীকেশবচন্দ্রকে আমরা প্রাণে লইয়া ধন্য, এবং আমাদের জীবনলক্ষ্য সেই সাধনসম্পদের পরিমাণেই আমাদের জীবনে শ্রীকেশবচন্দ্রের জন্মোৎসবের সার্থকতা।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

নববিধানে নবজন্ম।

নববিধান দ্বিজত্বের বিধান। নববিধান নব নব জন্ম, নব নব জীবন দিবার জন্যই অবতীর্ণ। দেহপুরবাসে জন্ম মানুষের প্রথম জন্ম। অধ্যাত্ম জীবনে জন্ম দ্বিতীয় জন্ম। শাস্ত্রে উক্ত আছে, ব্রাহ্মণ শূদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করে, দীক্ষা-লাভে দ্বিতীয় জন্ম প্রাপ্ত হয়। নববিধান এই অধ্যাত্ম জন্ম বা দ্বিজত্ব দিবার জন্যই অবতীর্ণ; অতএব নববিধানে বিশ্বাসই নব জন্ম বা দ্বিজত্বলাভ।

অমরত্ব।

দেহী মাত্রেই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলে, অমরলোকে গমন করে বা অমরত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু নববিধানবিশ্বাসীকে দেহের মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না। তিনি দেহে থাকিয়াই অদেহী হইতে পারেন, ইহলোকে থাকিয়াই পরলোকে বাস করিতে পারেন। উপাসনা-বলে, প্রার্থনা-বলে, যোগ-বলে আমরা অনায়াসেই দেহমুক্ত হইয়া অমরত্ব প্রাপ্ত হইতে পারি। এই জন্যই ব্রহ্মানন্দ প্রার্থনা করিলেন, "এই বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে শরীরবিহীন হইয়া যাই। হে আত্মন্ তোমার জীবন বৃদ্ধি হউক। তুমি অশরীরী হও। এই পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতে তুমি শরীরবিহীন হও। যারা অমর, তারা আর মৃত্যুর দিন গণনা করে না। স্বর্গ তাদের চক্ষে, স্বর্গ তাদের বক্ষে, স্বর্গ তাদের হৃদয়ে। আমার মৃত্যু নাই।" এই ত অমরত্ব।

শ্রীমহোম্মদের দিন।

"লা ইলাহি এল্লেল্লা হিয়ে মোহম্মদ রসুলাল্লা" ঈশ্বর ভিন্ন ঈশ্বর নাই, মোহম্মদ কেবল তাঁর প্রেরিত। ঈশ্বর এক অদ্বিতীয়, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাপুরুষ যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ বলিয়া গিয়াছেন, আর কিছু বলেন নাই, নিজেদের সম্বন্ধে নির্ব্বাক্ ছিলেন। তার ফলে তাঁদের শিষ্যগণ তাঁহাদিগকে ঈশ্বরাবতার বা স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়াই পূজা করিলেন। এমন কি, আমাদের চোখের সামনেই কত সাধুজন ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এসলামবাদিগণ এ ভ্রান্তিতে একেবারে না পড়েন, এই জন্যই মোহম্মদ আপনাকে ঈশ্বরের প্রেরিত বলিয়া চির প্রতিষ্ঠিত করিয়া গেলেন। বাস্তবিক, যথার্থ ই তিনি প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ ছিলেন। ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ বাণী শ্রবণ এবং তাঁহার প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা, ঘোর পৌত্তলিক পাশবপ্রকৃতি কোরেশ ও পার্ব্বত্য জাতিদিগকে এক ঈশ্বরের উপাসক ও এক জাতি করিতে যে মোহম্মদ প্রেরিত হইয়াছিলেন, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আরব-দেশীয় রাখাল ছেলে জীবন্ত ঈশ্বরাদেশে আদিষ্ট না হইলে কি এমন উচ্চধর্ম্ম অজ্ঞ লোকদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠা হয়? তিনি এমনই ভাবে সাধারণ লোকদিগের মধ্যে অপৌত্তলিক সাধনা সঞ্চার করিলেন যে, পাছে তাঁর অনুবর্ত্তিগণ মানুষের পূজা করিতে প্রলুব্ধ হন, সে জন্যে তাঁর ছবি পর্য্যন্ত রাখিতে দেন নাই। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাদানের কোন বিশেষ অনুষ্ঠানও একদিন ছিল না; এখন এই নবযুগধর্ম্মবিধানের প্রভাবে তাঁর দিন স্মরণের জন্য এক ইস্লামীয় সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে। আমরাও তাঁহাদের সঙ্গে সমযোগে এই পবিত্র দিন স্মরণ করি এবং মহাপুরুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি অর্পণ করি। তিনি যে একেশ্বরের নামে একজাতীয়তা, আমির ফকিরের সমযোগিতা, পূর্ণ অপৌত্তলিকতা প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং বার বার নমাজ সাধনে নিষ্ঠা ভক্তি শিক্ষাদান করিলেন, ইহা যেন অনুসরণ করিতে পারি।

শ্রীঈশা ও শ্রীকেশব।

পুরাতন ধর্ম্মপুস্তকে আছে, সর্ব্বপ্রথমে আদি মানব জন্ম লাভ করিলেন। তিনি পাপের প্রলোভনে প্রমুগ্ধ হইয়া পতিত হইলেন। তাই ব্রহ্মনন্দন ঈশা জন্মলাভ করিলেন, তাঁহার জন্মে প্রতি মানবের বিজয় লাভ হইল। মানব স্বর্গে পুনরুত্থান করিলেন। প্রতি জীবনে এই বিজয়লাভের পথ শ্রীঈশা দেখাইলেন। কিন্তু কেশব তাহাতে তুষ্ট হইলেন না, সপরিবারে সদলে বিজয় ও অমরত্বের সম্ভোগ, ইহাই নববিধানাচার্য্য শ্রীকেশবের জীবনাদর্শ।

স্বয়ং হরি গুরু।

(গত ২৯শে ভাদ্র, যুবকদিগের উৎসবে, আর্পালিটোলা নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে, ডাঃ উমাপ্রসন্ন ঘোষের উপদেশের সারাংশ)

ভগবান্ অদ্য আমাদিগকে যুবকদিগের উৎসবে আহ্বান করেছেন। কাহারা কাহারা এখানে আহ্বান পেয়েছেন? যাঁহারা যুবক, যাঁহাদের হৃদয় মনে উৎসাহের অগ্নি জ্বলিতেছে, যাঁহারা শক্তি ও সাহসের বর্ম্মে আবৃত হয়েছেন। যাঁহাদের আধ্যাত্মিক চক্ষের দৃষ্টি এখনও প্রখর রয়েছে এবং হৃদয়ের আলোকে ভগবানের মুখ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন—এরূপ আধ্যাত্মিক যুবকহৃদয়-সম্পন্নগণের আজ উৎসব। হে যুবক বন্ধুগণ, হে যুবক হৃদয়ান্বিত বৃদ্ধ সাধকগণ, আপনাদের চরণে আজ দুই একটা কথা নিবেদন করিতেছি।

পুরা কাল হইতে, স্মৃতির অতীত সময় হইতে আমাদের নিকট কত যোগ ধ্যানের কথা, কত ভক্তি বিশ্বাসের তত্ত্ব ও জ্ঞানের তত্ত্ব স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে ও আমাদের মনকে অতুল সম্পত্তিতে পূর্ণ করিতেছে। কত শাস্ত্রের কথা, কত স্মৃতি ও শ্রুতির কথা এবং মহাজন-বাক্য আমাদের আধ্যাত্মিক ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমানেও আমরা নববিধানে যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম ও জ্ঞানের সমন্বয়-কারী আচার্য্য হইতে এবং অন্যান্য সাধক ও সুধীগণ হইতে প্রাপ্ত অতুল সম্পত্তির ভোগের অধিকারী হইয়াছি। বলিতে গেলে, আমাদের সম্পত্তি বা inheritence প্রায় আকাশবিপুলসম। এসকল সম্পত্তি আমাদের মনোরাজ্য ও জ্ঞানরাজ্যের, ভক্তি ও প্রেমরাজ্যের কোষাগার পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে। এখন জিজ্ঞাসা এই যে, অতুল সম্পত্তি কি আমাদিগকে তৃপ্তিদান করিয়াছে? না, ইহা আমরা বোঝার ন্যায় বহন করিতেছি? ঈশ্বরপুত্র ঈশার সম্বন্ধে একটী গল্প আছে যে, কোনও এক সময় একজন ধনী যুবা তাঁহার নিকট ধর্ম্মপিপাসু হইয়া ধর্ম্ম-সম্বন্ধে উপদেশ পাইতে গিয়াছিলেন। তিনি সম্পত্তি দ্বারা অনেক দান, ধ্যান ও ধর্ম্মকার্য্য করিয়াছেন; তাঁহার ধর্ম্মকার্য্যের সম্পত্তিও বিপুল। শ্রীঈশা তাঁহাকে বলিলেন, তোমার সমস্ত ধন সম্পত্তি ও বিপুল আধ্যাত্মিক কার্য্যের সম্পত্তি সমস্ত বিলাইয়া দিয়া এস—ধর্ম্ম-শিক্ষা দিব।

আমরাও দেখিতেছি যে, inheritence হিসাবে আমরা অনেক আধ্যাত্মিক সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছি। আজ উৎসবের দিনে, আমাদের গুরু, শিক্ষাদাতা হরির নিকট আমরা আমাদের বিপুল আধ্যাত্মিক সম্পত্তি হাতে করিয়া ধর্ম্মজিজ্ঞাসু হইয়া উপস্থিত হইয়াছি। বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, কোরাণ, বাইবেল সহ জীবনবেদ, আচার্য্যের উপদেশ ও সেবকের নিবেদনাদি বহু সম্পত্তির অধিকারী হইয়া আমরা উপস্থিত হইয়াছি। আমরা সকলেই যুবকহৃদয়, এ সকল শাস্ত্র আমাদিগের কণ্ঠস্থ। আমাদের উৎসাহের সীমা নাই, আমাদের চক্ষের জ্যোতি তীব্র, আমরা বিপুল সম্পত্তির অধিকারী। তবু কাহাকে বলে, আমরা জানিতেছি না। আমরা মেধা-বলে আকাশবিপুল শাস্ত্র-সমূহ আয়ত্ত করিয়াছি; কিন্তু ভাই, মনোযোগ দিয়া শুন, হরি কি বলিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, এ সব সম্পত্তি সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া আসিতে হইবে। যাহা কিছু inherit করিয়াছি, সমস্ত বিলাইয়া দিতে হইবে। একেবারে রিক্তহস্ত, শূন্যহৃদয় হয়ে হরির দ্বারে ভিখারী হতে হবে। নববিধানের এই অনুজ্ঞা।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ" ॥—গীতা

হরি বলেন, নববিধানে আমি তোদের প্রত্যেককে শিক্ষা দিতেছি, তোরা প্রত্যেকে আমার সন্তান। আমিই তোদের সম্পত্তি, শক্তি, ধর্ম্ম—সমস্তই আমি। আমি নিজে তোমাদিগকে সমস্ত শিক্ষা দিব। নববিধানে যাহা কিছু inheritance ভাবে পাইয়াছ ও শিখিয়াছ, সমস্ত ভুলিয়া যাও। আমি স্বয়ং গুরু ও শিক্ষাদাতা। আমি অন্য শিক্ষাদাতা সহিতে পারি না। আমি নিত্য নূতন করিয়া, আমার প্রত্যেক সন্তানের উপযোগী করিয়া, নূতন নূতন কথা এবং পুরাণো কথাকেও নূতন করিয়া শিক্ষা দিয়া থাকি। সন্তান, আমি তোমাকে যদি কোনও শাস্ত্রের মধ্যে নিয়া যাই, তবে আমি নিজেই সেই সব শাস্ত্রের টীকা ও ব্যাখ্যা তোমার নিকট করিব। অন্য শিক্ষাদাতা আমি মানি না। আমি স্বয়ং শিক্ষাদাতা হইয়া সমস্ত নববিধান—এ, বি, সি, ডি, হইতে আরম্ভ করিয়া—নববিধানের সমস্ত শাস্ত্র, ব্যাখ্যান ও টীকা সহ, আমি তোমাদিগকে, তোমাদের হৃদয়ে যে আমার আলো প্রকাশিত করে রেখেছি, তাহার সাহায্যে শিক্ষা দিব। বৃদ্ধের নিকট তিনি একথা বলিলেন না। কেবল আধ্যাত্মিক যুবক যাঁহারা, তাঁহাদিগকেই তিনি একথা বলিতেছেন। আচার্য্য কেশব কি করিলেন? ভাইগণ, স্মরণ কর। তিনি কোনও শাস্ত্রের দোহাই দিলেন না। কোনও অভ্রান্ত গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন না। কেবল তাঁহার হৃদয়বিহারী হরির নিকট হৃদয় লুটাইয়া কাঁদিলেন, প্রার্থনা করিলেন, শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ

করিলেন। নববিধানের হরি, নববিধানের সকল শাস্ত্র, টীকা ও ব্যাখ্যান সহ, তাঁহার হৃদয়পটে অঙ্কিত করে দিলেন। যুবক বন্ধুগণ, আপনারা কি মায়ের এ আহ্বানে ভীত হইয়েছেন? ভাইগণ, ভয়ের কোনও কারণ নাই। ভীরুতা যুবকের লক্ষণ নহে। আপনাদের ও লক্ষণ হতে পারে না। উহা বৃদ্ধত্বের লক্ষণ। আজ উৎসাহে হৃদয় পূর্ণ করুন। হরির চরণে মাথা লুটাইয়া প্রণাম করুন। হরি উৎসাহ দিবেন, প্রণাম শিখাইবেন, সব করিবেন। এরূপ হলে আপনাদের হৃদয়ে দৈবী শক্তি প্রবাহিত হবে। আপনারা নববিধানের সমস্ত বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, ইতিহাস, স্মৃতি, শ্রুতি ও বাণী, জীবনবেদ, আচার্য্যের উপদেশ ও সেবকের নিবেদন, হরির কথামৃত হইতে লাভ করিবেন। কারণ হরিই বেদ, হরিই বেদান্ত, তিনিই আচার্য্য ও সেবক এবং তিনিই জীবনবেদলেখক। হরি নিজেই আপনাদিগকে দীক্ষা দিয়ে আপনাদের হৃদয় মন, সমস্ত নববিধানশাস্ত্র দ্বারা পূর্ণ করে দিবেন। আর যদি inheritenceএর বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইতে চান—দেখিবেন শীঘ্রই উহার ভার আর বহন করিতে পারিতেছেন না। আপনি পরিশ্রম করিয়া দৃঢ় ও বলিষ্ঠ হন নাই। অসময়ে অতিরিক্ত আধ্যাত্মিক পানাহার করিয়া vital শক্তি শিথিল হইয়া গিয়াছে। আপনার সম্মুখে অতুল সম্পত্তি বিস্তৃত থাকিলেও, তাহাতে আপনার রুচি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, উহা পান্তা ভাতের সামিল হইয়া বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। উহা জ্বলন্ত অগ্নিতে সিদ্ধ, আধ্যাত্মিক অগ্নিতে তৈয়ারী গরম ভাত নহে, যাহা আত্মা ও মনকে সরস, জীবন্ত ও fresh করিবে। আপনি আর সে সম্পত্তি হইতে কোনও তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছেন না।

—০—

ব্যাকুল প্রার্থনা ও ঈশ্বরের কৃপা।

জগতে মানবসভ্যতার প্রথম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই, এই দৃশ্যমান সৃষ্টির অন্তরালে যে শক্তি কাজ করছে, তাকে বিস্মিত অন্তরে মানব প্রণাম করেছে। অগ্নিময় সূর্য্যগোলক, শীতরশ্মি ও জ্যোৎস্নাময় চন্দ্রমা, প্রবল ঝঞ্ঝাবৃষ্টি ও মহারবে বজ্রপাত, চক্ষু অন্ধকারী বিদ্যুৎ ও নয়নানন্দকর ইন্দ্রধনুর শোভা, উল্কাপাত ও সূর্য্যচন্দ্রের গ্রহণ প্রভৃতি বিস্ময়কর ঘটনা এবং সর্ব্বোপরি জন্ম ও মৃত্যুর রহস্য মানবচিত্তকে আন্দোলিত করেছে; এবং মানবের সমুদয় শক্তিকে বিফল ও অগ্রাহ্য করে যে শক্তি এই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডকে নিয়মিত করছে, তার প্রতি মানব ভীতিচিত্তে সম্মান প্রদর্শন করেছে ও তার করুণা ভিক্ষা করেছে। এই অজ্ঞাত শক্তির পরিচয়ের ফলে মানব-অন্তরে ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও সাধনার উদ্ভব। সেইজন্য আমাদের দেশের প্রাচীনতম ধর্ম্ম-সাহিত্যে ইন্দ্রবরুণ প্রভৃতি দেবতার পরিকল্পনা এবং যাগযজ্ঞ প্রভৃতি দ্বারা উঁহাদের পরিতুষ্টির চেষ্টা। পরে এই সৃষ্টিরহস্য ও পরলোকসম্বন্ধে চিন্তা মানবের মধ্যে নানা দর্শন ও শাস্ত্রের সৃষ্টি করল।

এ পর্য্যন্ত জগৎস্রষ্টার সম্বন্ধে নানা মতবাদের উৎপত্তি হয়েছে এবং বহুলোক এ বিষয়ে একেবারেই চিন্তাবিহীন ও উদাসীন। ইহার কারণ এই যে, অধ্যাত্মবিষয়ে জ্ঞানলাভ জড়বস্তুর জ্ঞান-লাভের প্রক্রিয়াতে সম্ভব নয়। আধ্যাত্মিক সত্য যাঁরা দর্শন ও অনুভব করেছেন, তাঁরা যে সমুদয় প্রণালী নির্দ্দিষ্ট করেছেন, তা অবলম্বন করা লৌকিক জ্ঞানের সম্যক্ অধিকারীর পক্ষেও অতিশয় কঠিন এবং অনেক সময় অসম্ভব। এই জন্যই অনেক মহাজ্ঞানী জগতে নাস্তিক আখ্যা পেয়েছেন। কিন্তু যাঁরা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলে খ্যাতি লাভ করেছেন, তাঁরাও কি এ বিষয়ে সম্যক জ্ঞানলাভ করেছেন? তাও ত নয়। তাঁদের নিজেদের উক্তিই এ বিষয়ে প্রমাণ। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হয়। ভাষা ত দূরের কথা, চিন্তা কল্পনাও তাঁর অন্ত পায় না। আধ্যাত্মিক সত্য যাঁরা লাভ করেছেন, তাঁরাও সম্পূর্ণভাবে সফল হন নাই। "নাহং মন্যে সুবেদেতি, নো ন বেদেতি বেদ চ"—আমি ব্রহ্মকে সুন্দররূপে জানিয়াছি, এমন মনে করি না; আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনও নহে, জানি যে এমনও নহে।

আধ্যাত্মিক সত্য কাহারও পক্ষে সম্পূর্ণরূপে লাভ করা সম্ভব নয়। সসীম মানবমন অসীমের সম্যক্ ধারণা করতে পারে না। সত্যদর্শন ও উপলব্ধি যতটাও বা সম্ভব হয়, ভাষাতে তার প্রকাশ ও ব্যাখ্যা আরও কঠিন। বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থে "ধম্ম", বিষয়ে অনেক উপদেশ আছে; কিন্তু কি যে সেই "ধম্ম", তা পরিষ্কার বোঝা যায় না। বাইবেলে "Kingdom of God" সম্বন্ধে অনেক বর্ণনা ও উক্তি আছে, উহার নানা উপমা আছে; কিন্তু উহার প্রকৃত স্বরূপ যে কি, তা সে সমুদয় পাঠ করে নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা যায় না।

অমর মানবাত্মা অনন্তকাল ধরে তার স্রষ্টার অনন্তস্বরূপ ধ্যান করবে, এই যদি বিধাতার অভিপ্রায় হয়, তা হলেও তাঁকে এই মর জগতের জীবনকালের মধ্যে জানবার ও লাভ করবার চেষ্টা করা দরকার। তার কারণ এই যে,—"ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"—ইঁহাকে দেখিলে হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয়, এবং সমুদয় কর্ম্ম ক্ষয় হয়।

কিন্তু কি উপায়ে এ বিষয়ে কতকটা সফলতা লাভ করা যায়? এ বিষয়ে নানা উপদেশ আমরা দেখিতে পাই। এক স্থলে আছে—"বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ। সোঽধ্বনঃ পরমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং॥"—যিনি আপনার মনকে জ্ঞান ও ধর্ম্মের বশীভূত করেন, তিনি সংসারের দুর্জ্জয় মোহ হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মকে লাভ করেন। আর এক স্থলে আছে—"অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষ-

শোকৌ জহাতি"—ধীর ব্যক্তি পরমাত্মাতে স্বীয় আত্মার সংযোগ দ্বারা অধ্যাত্মযোগে সেই পরমদেবতাকে জানিয়া হর্ষশোক হইতে মুক্ত হন। আর এক স্থলে আছে, "হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো"—ইনি সংশয়রহিত বুদ্ধিদ্বারা দৃষ্ট হইলে প্রকাশিত হন।

কিন্তু যেমন পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, আধ্যাত্মিক সত্য সমগ্ররূপে লাভ করা কঠিন, তেমনি সেই সত্য জীবনে ধরে রাখা ও পালন করা আরও কঠিন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি গানে বলেছেন, "মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না ?" যাঁরা সাধু বলে জগতে বিখ্যাত, তাঁরাও কত সময় সত্যের আলোকের অভাবে গভীর ক্লেশ বোধ করেছেন। এই কারণে মানবসমাজে নানা সাধনার প্রণালী প্রবর্ত্তিতও হয়েছে, কিন্তু কিছুতেই মানব সম্পূর্ণরূপে সফল হয় নাই। সরল বিশ্বাস, একান্ত নির্ভর ও ঈশ্বরের অনুগ্রহই এবিষয়ে একমাত্র এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। তাই ঋষিরা বলেছেন—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া, ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্"॥ যদি তাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত অনুরাগ ও যত্ন না থাকে, তবে প্রবল মেধাই থাকুক, আর প্রচুর উপদেশবাক্যই শ্রুত হউক, কিছুতেই তাঁহাকে লাভ করা যায় না। যিনি পিপাসাতুর পথিকের ন্যায় ব্যাকুল হইয়া একান্তে তাঁহাকে প্রার্থনা করেন, তাঁহারই সন্নিধানে পরমাত্মা আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন। এই প্রার্থনাকে সম্বল করিয়া ঈশ্বরকৃপার উপর নির্ভর করিতে হয়। তাই সাধক বলেছেন, "তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্ব্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে"—আমি মুমুক্ষু হইয়া সেই আত্মবুদ্ধি-প্রকাশক পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হই। ঈশ্বর স্বপ্রকাশ। আমরাও প্রার্থনা করি, "আবিরাবীর্ম্ম এধি"—হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকট প্রকাশিত হও।

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার হালদার।

রাজা রামমোহন রায়।

(এলাহবাদে শতবার্ষিকী স্মৃতিসভায়, সভাপতি শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিভাষণ)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মহাত্মা রামমোহনের গুণাবলী ও কার্য্যকলাপ এত অধিক যে, বহুকাল ধরিয়া কীর্ত্তন করিয়াও তাহা নিঃশেষ করা যায় না। অল্পসময়ের মধ্যে বর্ণনা করা সম্ভবপরও নহে। এখানে তাঁহার কয়েকটী বিশিষ্ট কার্য্যের ও গুণের উল্লেখ মাত্র করিব।

এ বিষয়ে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তাঁহার ইংরাজী প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে কিয়দংশ আবৃত্তি করিলে রামমোহন সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য জানা যায়। আমি ব্রহ্মানন্দের ভাষাই উদ্ধৃত করিয়া আবৃত্তি করিতেছি।

"Great men live for the world, and not for their own account, they rise superior to circumstances, and by force of manly will and in the face of the stoutest resistance, stamp on the age the noble ideas of their soul, leaving an everlasting and priceless heritage to posterity and to all mankind. They 'live, move and have their being' in those ideas. The power and influence they exhibit are not their own; they belong to those ideas entrusted to them by Providence as their sacred errand on earth.

"Among India's great men Ram Mohun Roy holds a high rank. Like all great men he brought into the world his own idea and devoted his life to its realisation. That idea was catholic worship. Whoever has deeply studied his life and carefully looked into his speculations and movements, cannot but admit this to have been his guiding principle. That he was a religious reformer of India is universally admitted, and as such he is universally admired. He is also reputed as an extraordinary theologian. He knew English, Arabic, Sanskrit, Greek, Latin and Hebrew, and his writings bear testimony to his vast and varied learning. He it was who abolished the obnoxious custom of Suttee; he was one of the foremost pioneers of native education, and his name also figures in the valuable suggestions he offered in furtherance of the reforms which took place in the early political administration of this country. But such compliments to his great mind do not mark the real secret of his excellence: they do not point to the ruling principle of his mind which constitutes his greatness. His name shines in undying glory not only in India but in England and America for the valuable theological works which his mastermind indited, and religious and social reforms which his philanthrophic heart promoted; but the real mission of his life, his peculiar ideal, so far appears to us on careful analysis, was to give to the world a system of catholic worship. This was prominently exhibited in the establishment of the church or place of worship which was subsequently designated the Brahmo Somaj.

"From his very early days, Ram Mohun Roy's mind manifested a strong and unmistakable religious tendency..........His great mind was not to be long in fetters, born as it was for the noblest type of religious independence.......His obstinate and unflinching aversion to superstition and

superstitious ptacrices soon rekindled the spirit of persecution.

"An unsparing and thorough-going Iconoclast, he yet failed not to extract the simple and saving truth of monotheism from every creed with a view to lead every religious sect with the light of his own religion to abjure idolatry and acknowledge the One Supreme.

"The ruling idea of his mind was to promote the universal worship of the One Supreme Creator, the Common Father of mankind. This catholic idea, while it led him to embrace all creeds and all sects in his comprehensive scheme of faith and worship, precluded the possibility of his being classified with any particular religious denomination. His eclectic soul spurned sectarian bondage; it apprehended in the unity of the Godhead the indissoluble fraternity of all mankind. ......His great ambition was to bring together men of all existing religious persuations, irrespective distinctions of caste, colour or creed, into a system of universal worship of the One True God. Thus his catholic heart belonged to no sect, and to every sect; he was a member of no church and yet of all churches. He felt it his mission to construct a Universal Church based on the principle of Unitarian worship. His earlier controversies and discussions with the different religious sects exhibit but partial glimpses or dim forebodings of that grand scheme which was subsequently matured and perfected in his mind. Its fullest development and final realization was consummated, in the fulness of time, in the establishment of that institution which bears the name of the Brahmo Somaj and which stands as a memorable monument of the founder's real creed—Ram Mohun Roy's grand idea realized. The trust-deed of the Somaj premises contains, we believe, the clearest exposition of his idea. It inter-alia provides :—

"......The premises with their appurtenances should be used, occupied, enjoyed, applied and appropriated as, and for, a place of public meeting of all sorts and descriptions of people without distinction as shall behave and conduct themselves in an orderly sober religious and devout manner for the worship and adoration of the eternal, unsearchable and immutable Being Who is the Author and Preserver of the universe not under or by any other name, designation or title peculiarly used for, and applied to, any particular being or beings by any man or set of men whatsoever and that no graven image, statue, or sculpture, carving, painting, picture, portrait or the likeness of anything shall be admitted within the said messuage, building and premises and that no sacrifice offering or oblation of any kind or thing shall ever be permitted therein and that no animal or living creature shall within or on the said building and premises be deprived of life either for religious purpose or for food and that no eating or drinking (except such as shall be necessary by any accident for the preservation of life), feasting or rioting be permitted therein or thereon and in conducting the said worship and adoration no object, animate or inanimate that has been or is, or shall hereafter become, or be recognised as an object of worship by any man or set of men, shall be reviled or slightingly or contemptuously spoken of or alluded to either in preaching, praying or in the hymns or other mode of worship that may be delivered, made or used in the said premises, messuage or building and that no sermon or preaching, discourse, prayer or hymn be delivered, made or used in such worship but such as have a tendency to the promotion of the contemplation of the Author and Preserver of the Universe, to the promotion of charity, morality, piety, benevolence, virtue and the strengthening the bonds of union between men of all religious persuasions and creeds".

(ক্রমশঃ)

নবীনা মীরার নবীন জীবন।

দেখিতে দেখিতে আমাদের নববিধানের নবীনা মীরার নূতন জীবনের এক বৎসর অতীত হইয়া গেল। বিগত ১০ই নভেম্বর, মহাসমাধিতে সমাহিতা যে মীরামূর্ত্তি আমাদের সম্মুখে নীরব সাধনে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, সে মূর্ত্তি এখনও সম্মুখে জীবন্ত চিত্রের মত বর্ত্তমান। সেই নিস্পন্দ নীরব মূর্ত্তি, সেই স্তিমিত চক্ষু এবং সেই স্বর্গীয় জ্যোতিপূর্ণ প্রশান্ত মুখ এখনও আমাদের সম্মুখে তাঁহার সাধনা-সিদ্ধ নিগূঢ় নববিধান প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার সে নববিধানে যতই অধ্যয়ন করিতে যাই, ততই সে অধ্যয়ন আর শেষ হয় না। এখন বুঝিতেছি, আমরা তাঁহার সে নববিধান হইতে অনেক দূরে পড়িয়া রহিয়াছি। তাঁহার জীবনের ঊষাকালে যে নববিধান তাঁহার ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল, আমাদিগের ভিতরে সে নববিধান এখনও আসে নাই। বিধাতার

আদেশপালনরূপ মহা নববিধানে নবীনা মীরা দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এই দীক্ষাই তাঁহাকে কোন্ স্থানে লইয়া গিয়াছিল, আমরা এখনও তাহা বুঝিতে পারি নাই। বিধাতার বিধানে ব্রহ্মানন্দের ভিতরে আদেশ-পালনরূপ যে মহা নববিধান আসিয়াছিল, নবীনা মীরা তাঁহার কুচবিহার প্রদেশে সেই মহা দীক্ষায় দীক্ষিতা হইয়াছিলেন। "সুনীতি, মনে করিও না যে তুমি রাণী হইলে, আমি দেখিতেছি তুমি দাসী হইলে।" কুচবিহার বিবাহে বিধাতা ব্রহ্মানন্দের ভিতর দিয়া যে সত্য প্রকাশ করিলেন, সেই সত্য জীবনের মহাসত্যরূপে দেবী সুনীতির ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল।

নবীনা মীরা তাঁহার প্রিয়তমা সহযোগিনী ভগিনী সাবিত্রী দেবীকে হারাইয়া, অত্যন্ত ভগ্ন প্রাণ ও ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া, সুদূর পার্ব্বত্য ভূমিতে অদূরবর্ত্তী কলস্বনা সুবর্ণরেখার সঙ্গীতপূর্ণ স্রোতের সঙ্গে সুর মিলাইয়া, নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে তাঁহার নববিধানের উচ্চ সাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন। একদিকে তাঁহার চিকিৎসকগণ নিরাশার সংবাদ দিতেছেন, আর এক দিকে তিনি নববিধানের নূতন সংবাদ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। এই স্থানে তাঁহার প্রতিদিনের জীবন নববিধানের সে সাক্ষ্য দিবার জন্য নিয়োজিত হইয়াছিল। জীর্ণ দেহ ও জীর্ণ শক্তি লইয়া নবীনা মীরা তাঁহার সম্মুখস্থ সুবর্ণরেখার বেলাভূমিতে নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে উপাসনার আসনে আসীনা; আর তাঁহার ক্ষীণ কণ্ঠ হইতে প্রার্থনার ক্ষীণ স্বর উত্থিত হইতেছে এবং তাঁহার প্রতিদিনের উপাসনায় তাঁহার ভাবের সঙ্গে ভাব মিলাইয়া শ্রীমদাচার্য্যের এক একটী প্রার্থনা পাঠ করিতেছেন। যেদিন তিনি তাঁহার মহা প্রস্থানে প্রস্থান করিলেন, সেদিনের জন্য আচার্য্যদেবের সময়োপযোগী প্রার্থনা পূর্ব্বদিন নির্ব্বাচন করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই মহা সমাধিতে সমাহিতা নীরব তপস্বিনীর সম্মুখে সেই প্রার্থনা পঠিত হইয়াছিল। নববিধানবিশ্বাসী ভাই ভগিনীগণ! তাঁহার পবিত্র স্মৃতির দিনে একবার অধ্যয়ন কর এবং বুঝিয়া লও, আমাদের নববিধান আমাদিগকে কোথায় লইয়া যাইতে পারেন। নববিধানের নবীনা মীরা আমাদিগকে জীবনের মহা বেদ বেদান্ত দিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার কুচবিহারে প্রবেশ আমাদের নববিধানে এক মহা বেদবেদান্তরূপে বিকশিত হইয়াছে। আদেশপালন ভিন্ন আমাদের ভিতরে নববিধান আসিবে না।

নববিধানের নূতন আদেশে আহূত, সেই মীরা ও সাবিত্রীর জীবন এবং সেই রাজর্ষি নৃপেন্দ্রনারায়ণ ও কুমার গজেন্দ্রনারায়ণের জীবন আদেশের মহা সাক্ষ্য দিবার জন্য এবং বিধাতার বিধানে সেই পুরাতন ও কুসংস্কারাবিষ্ট কুচবিহারে নবধর্ম্মের বীজবপন জন্য তাঁহা কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়াছিল। নববিধানের এই নিগূঢ় বিধান প্রমাণ করিবার জন্য বিধাতার এই মহা আয়োজন।

বিশ্বাসী ভাই ভগিনীগণ, যদি বিধাতার পূর্ব্বায়োজন এবং বিধাতার গূঢ় সত্য তোমাদের ভিতর আসিয়া থাকে, তাহা হইলে তোমরা নববিধানের মহা আদেশবাদ এবং ব্রহ্মানন্দ ও সুনীতি জীবনের নিগূঢ় অধ্যায় বুঝিতে পারিবে। আজ এই মহা স্মৃতির দিনে, এক বৎসর পরে, আমার অধ্যয়নের মহা সাক্ষ্য ভাই ভগিনীদিগের নিকট নিবেদন করিলাম।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

—•—

রাজকীয় তিরোভাব।

(যিনি সঙ্কোচ পদ সকলের নিরস্তা,
শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ, তাঁহারই স্মরণান্তর)
কি শুনিনু! চলে গেছ? চলে গেছ ভবনদীকূলে,
ফেলিয়া নিঠুর ধরা শোকতাপরাশি,
প্রদানিবে নাহি আর সে বাণী দুর্দ্দামা।
ধরেছিলে যে পতাকা বিভুর চরণে ওগো মহীয়সী!
উঠেছিল ঊর্দ্ধমুখে বিশাল ধরণী বুকে;
গেয়ে গেছ যেই নাম পূর্ণ বক্ষে ভাসি,
গেয়ে গেছ কুতূহলে, বিতরেছ নারীদলে,
ফুরাল ফুরাল, তাই দুঃখ-নীরে ভাসি।
স্মরি তাই পূর্ব্ব কথা, মনে মনে বাজে ব্যথা,
দুঃখিনী রহিল পড়ে ধরা-কারাগারে;
স্মরিতে সে দিন ভয়, বিষম পরীক্ষাময়,
কবে লইবেন প্রভু দীনে দয়া করে।
সকলেই গেল চলে, সবার প্রাচীন বলে,
রহিলাম ক্ষিতিতলে আমি অভাগিনী পাষাণ হৃদয় ধরে,
পূর্ব্বাপর মনে করে কাঁদি, কভু হাসি।
জলবুদ্বুদের প্রায় কত উঠে চলে যায়,
কত স্মৃতি রেখে যায় অনন্তেতে পশি।
যে প্রেমের কণ্ঠমণি তব ও হৃদয়খনি,
করেছিল অধিকার যাবত জীবনে,
কত ধৈর্য্যক্ষমাময়, কি ঔদার্য্য ভাবচয়, মর মূর্ত্তি অবিনাশী।
সতত মনে হয় ও কোমল গুণচয়,
আর কি এ ধরাধামে কভু জনমিবে আসি?
আচার্য্যনন্দিনীগণ সকলেই অনুপম,
প্রাণে দেব আবির্ভাব, প্রেম-ভক্তি-রাশি—
পুলকে বহিয়া যায়, বিমল তটিনী প্রায়,
অফুরন্ত মহিমায় ভালবাসা বাসি।
কে কোথায় আছ ওগো যত ভক্তদল,
এমনি ফুটাও সব প্রাণ-শতদল;
দাও দাও মহানীরে পবিত্র প্রেমপাথারে,
অনন্ত গগনতলে অনন্তেরি পায়।
কত রত্ন জন্মে হায়, কত রত্ন চলে যায়,

রাখে শুধু স্মৃতি তার প্রেমের সরসী।
যার যেথা সাধ্যমত, যোগাসনে রয়ে তায়,
অন্যের বিচার করা উচিত ত নয় ;
অন্তর-জলধি-তলে সন্তরিয়া মহাবলে,
যেথা বিভুপদতলে কোহিনুর চায়।
জানেনা মর্ত্ত্যের লোক, কিবা কার রয় ভোগ,
কার হৃদিতল কিসে নিমেষে জুড়ায় ;
চিন্ময় পরশে কেবা, ভবাতীতে ভাবে সেথা,
নিজ নিজ ভাবে মনে নিজ মার্গ পায়।
কে জানে রহস্য তার, শুধু বুদ্ধির বিচার,
সাধনার একপথ নহে সবাকার,
বিধির নিয়মে হয় কত যে প্রকার।
কে জানে রহস্য তার,
অজ্ঞাত সবি সবার, করো না বিচার তার ;—
শুধু মগ্ন হও সবে স্মরি উচ্চ গুণরাশি,
বিকাশি উঠিবে তবে হৃদি-কমল ভাসি।
বল জয় জগপতি, তোমার ইচ্ছার জ্যোতিঃ—
ভরিয়া উঠুক প্রাণে সদা অবিনাশী।
ব্যথায় লুটায়ে আজ করি গো প্রণাম,
স্বরগের রাজদ্বারে ওগো প্রাণারাম !
খালি করে দিয়ে বুক, কত আর দিবে দুঃখ ?
তুমি কি বসিবে নাথ শূন্য পূর্ণ করে ?
খুলিয়ে দিয়েছি প্রাণ বিশ্ব চরাচরে।
বিরাট বিশ্বের পরে অনন্ত আলোক,
ধরিয়াছ রাজরাজ দিতে জ্ঞানালোক,
দাও তবে ত্রিনয়ন হেরি সে আলোক।

শ্রীশরৎকুমারী সেন।

শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন।

(পুরী ক্লার্ক হলে জন্মোৎসব-সভায় রায় সাহেব উপেন্দ্রনাথ দে কর্ত্তৃক পঠিত)

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥"

শ্রীমদ্ আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য অগ্রসর হওয়া আমার পক্ষে মূকের বাচালতা বা পঙ্গুর গিরি-লঙ্ঘনের অপেক্ষা অনেক অধিক হাস্যকর। তথাপি, তাঁহার নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী আছি, অতএব কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন আমার কর্ত্তব্য এই ভাবিয়া, বন্ধুবর পূজনীয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মল্লিক মহাশয় দ্বারা উৎসাহিত হইয়া, "ব্রহ্ম-কৃপাহি কেবলম্" [illegible] উঠিয়াছি। আশা করি, আপনারা দয়া করিয়া ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রীমৎ কেশবচন্দ্রকে যে ভাবে আমার সামান্য বুদ্ধিতে আমি বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি, তাহাই একটু নিবেদন করিব। তাঁহাকে বুঝিতে গেলে, প্রথমে বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম কি, যে বিষয়ে একটু চিন্তা করিতে হয়। বর্ত্তমান যুগ—সমন্বয়ের যুগ—ইহার ভাবের স্রোত সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়। এ যুগের ভাষা হইতে "ম্লেচ্ছ" "কাফের" ইত্যাদি কথা উঠিয়া গিয়াছে। এই যুগ-স্রোতে আমার মত মূর্খ সাধনাবিহীন লোকেও বুঝিতে পেরেছে যে, হিন্দু কি মুসলমান, বৌদ্ধ কি খৃষ্টান, কোন জীব সন্তান কি হুনিয়া, সকলেই সেই একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরেরই উপাসনা করে, তা যেমন করেই হোক, যে আকারেই হোক *। যেমন মানুষ স্থূল রূপে নানাবিধ বর্ণ ও নানাবিধ আকারের দেহধারী, কিন্তু স্বরূপে এক সচ্চিদানন্দাংশ আত্মাবস্তু, সেইরূপ ধর্ম্মও রূপে অর্থাৎ বহিরঙ্গ সাধনে (in forms of worship) বহু, কিন্তু স্বরূপে (in essence of spirit) এক। ভারতে এই বিশ্বাস অতি প্রাচীন। ধর্ম্মশাস্ত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥"

কাব্যে মহাকবি কালিদাস বলেছেন—

"বহুধাপ্যাগমৈর্ভিন্নাঃ পন্থানঃ সিদ্ধিহেতবঃ।
ত্বয্যেব নিপতন্ত্যোঘাঃ জাহ্নবীয়া ইবার্ণবে ॥"

মহিম্নস্তোত্রে পাওয়া যায়—

"ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদম্ অদঃ পথ্যং ইতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥"

কিন্তু কালে এমন অবস্থা ভারতের হয়েছিল যে, এই উদার সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের ভাব এক প্রকার লুপ্তপ্রায় হয়েছিল। ধর্ম্মের রূপ বা বহিরঙ্গ সাধনগুলিও যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন অজ্ঞানের পথে উপস্থিত হয়েছিল।

এই সময়ে ভারতের আকাশে ক্রমান্বয়ে তিনটি সূর্য্য উদিত হয়েন—রাজা রামমোহন রায়, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ও পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব। বাঙ্গালীর পরম সৌভাগ্য যে, তিন জনেই বঙ্গদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরন্তু ইহাও বড় লজ্জার কথা যে, বাঙ্গালী জাতি এই সুযোগের উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করিতে পারে নাই। ইঁহারা তিনজনেই ঈশ্বর-প্রেরিত লোকাতীত

---

* Prof Maxmuller—"Introduction to the science of Religion".

"The intention of Religion, wherever we meet it, it always holy. However imperfect, however childish a religion may be, it always places the human soul in the presence of God; and however imperfect and however childish the conception of God may be, it always represents the highest ideal of perfection which the human soul, for the time being, can reach or grasp."

পুরুষ, মহামানব, অতিমানব, Super-Man, এ পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে, বোধ হয়, (বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদের কার্য্যের ফল দেখিয়া) কেহই আপত্তি করিতে পারেন না। ইঁহারা তিনজনেই একই কার্য্যের জন্য প্রেরিত—এবং সেই কার্য্য কেবল ভারতে নয়—সমগ্র জগতে সকল ধর্ম্মের স্বরূপের (spirit) পুনরুত্থান—সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় (unity in diversity)—এবং বিশ্বজনীন ধর্ম্ম-স্থাপন (establishing the basic principles of Universal religion)।

রাজা রামমোহন রায় প্রথমে এই কার্য্য আরম্ভ করিলেন। সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের মূলভিত্তি তাঁহার এই দৃঢ় বিশ্বাস যে, "প্রত্যেক দেবতার উপাসকেরা সেই সেই দেবতাকে জগৎকারণ ও জগতের নির্ব্বাহকর্ত্তা এই বিশ্বাসপূর্ব্বক উপাসনা করেন"। বাস্তবিকই "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই বাক্যই সকল জাতির, সকল সম্প্রদায়ের মূল বিশ্বাসবিবৃতি। জ্ঞানমার্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র বেদান্তদর্শন ঐ বাক্যেই আরম্ভ হইয়াছে—ভক্তিমার্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র শ্রীমদ্ ভাগবতও ঐ বাক্যেই আরম্ভ হইয়াছে। সকল দেশ, সকল জাতি ও সকল সম্প্রদায়ের সহিত অবিরোধী ভাব সংস্থাপন করা তাঁহার লক্ষ্য ছিল। খৃষ্টীয়ান ও মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্র তিনি প্রচুর পরিমাণে অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়া তাঁহাদের কুসংস্কার-গুলির প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সকল শাস্ত্রের অন্ত-র্নিহিত সত্যগুলিও নিজ নিজ সাধনায় গ্রহণ করিতে হইবে, এ সত্যানুভূতি সত্ত্বেও, সেগুলি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "আত্মীয় সভা" অথবা [illegible]সভায় গৃহীত হইত না। তাঁহার পরবর্ত্তী প্রধানাচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময়েও, ব্রাহ্মসমাজ মতে কোন এক বিশেষ সম্প্রদায় বা শাস্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন না বলিয়া প্রকাশ করিতেন, কিন্তু কার্য্যে হিন্দুশাস্ত্র ভিন্ন অন্য শাস্ত্র গ্রহণ করিতেন না। কেশবচন্দ্র কেবল মতে নহে, বস্তুতঃ কার্য্যেও ঘোষণা করিলেন—"সত্য কাহারও নিজস্ব ধন নহে। অথচ ইহাতে সকলেরই অধিকার। সত্য অর্থের দাস নহে; সম্রাটেরও অনু-গত নহে। ইহার নিকট রাজপ্রাসাদ ও পর্ণকুটীর উভয়ই সমান। ধনবান্ ও নির্ধন সকলেরই জন্য ইহার স্রোত নিরপেক্ষ ভাবে প্রসারিত রহিয়াছে। ইহা লোকবিশেষে, অথবা সম্প্রদায়বিশেষে, অথবা জাতিবিশেষে বিক্রীত হয় নাই। ইহা দেশে বদ্ধ নহে, কালেও বদ্ধ নহে; সকল দেশে ও সকল সময়ে ইহার আধি-পত্য। সত্য মহৎ উদার।"

(ক্রমশঃ)

—০—

সংবাদ।

নামকরণ—গত ১০ই অগ্রহায়ণ, ৭৬নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত সুপ্রকাশচন্দ্র দাসের শিশুপুত্রের শুভ নামকরণ উপলক্ষে, ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন এবং শিশুকে "দিব্যেন্দ্র" নাম প্রদান করেন। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার জনকজননীকে শুভাশীষ দান করুন।

সেবা—গত ২৩শে অক্টোবর হইতে ২৩শে নবেম্বর পর্য্যন্ত মুঙ্গের ভক্তিতীর্থে বাস করিয়া ভাই অখিলচন্দ্র রায় নিম্নলিখিতভাবে সেবাব্রত পালন করিয়াছেন। ২৬শে অক্টোবর কুমারী শান্তিপ্রভা মল্লিকের পিতৃদেবের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে উপাসনা, ১৩ই কার্ত্তিক অমরাগড়ী নববিধানসমাজের স্বর্গীয় উপাচার্য্য ভাই ফকিরদাস রায়ের জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর মধ্যম জামাতা ডাক্তার শশিভূষণ দাস গুপ্তের প্রবাসভবনে বিশেষ উপাসনা, ১০ই নবেম্বর প্রাতে ও সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে ও ব্রহ্মমন্দির প্রাঙ্গণে স্বর্গীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা, ১৯শে নভেম্বর শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দের শুভজন্মদিনে প্রাতে ও সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে বিশেষ উপাসনা, মধ্যাহ্নে দরিদ্র ভাই ভগিনীদের লইয়া আচার্য্যদেবের সমাধিপ্রাঙ্গণে ভজন ও ব্রহ্মানন্দস্তোত্র হয়। প্রায় ৪০ জন দরিদ্র বালক বালিকা-দিগকে তৃপ্তিপূর্ব্বক খেচরান্ন খাওয়ান হয়। ঐ সঙ্গে বয়োবৃদ্ধদেরও সেবা হয়। ঐদিন সায়ংকালে জীবনবেদ হইতে ভক্তিসঞ্চার বিষয়টী পাঠ ও আলোচনা, তৎপরে উপাসনা হয় এবং মুঙ্গের ব্রহ্ম-মন্দিরের ক্ষুদ্র পুস্তকালয়টীকে "শ্রীব্রহ্মানন্দপুস্তকালয়" প্রার্থনাপূর্ব্বক নাম দিয়া, স্থানীয় সাধারণের পাঠের উপযোগী করার প্রস্তাব হয়। গত ৭ই নভেম্বর হইতে মুঙ্গের ব্রহ্মমন্দিরের পশ্চিম বারাণ্ডায় একটী নৈশবিদ্যালয় খোলা হইয়াছে; ঐ বিদ্যালয়টীকে "সাধু প্রমথলাল নৈশশিক্ষাতীর্থ" নাম দেওয়া হইয়াছে এবং নৈশ বিদ্যালয় ও পুস্তকালয় বিধিপূর্ব্বক পরিচালনার জন্য দুইটী কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে। মুঙ্গের ব্রহ্মমন্দিরের অনতি-দূরের অধিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ গুপ্ত বি. এল, উভয় সভার সম্পাদকের কার্য্যভার লইয়াছেন। গত জানুয়ারি মাসে "ভক্ত দীননাথ শিক্ষাতীর্থ" নামে যে বালিকাবিদ্যালয় খোলা হইয়াছিল, কিছুদিন পরে উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অভাবে বিদ্যালয়ের কার্য্য বন্ধ ছিল। গত ২০শে নভেম্বর হইতে পুনরায় একটী ব্রাহ্মিকা শিক্ষয়িত্রীর দ্বারা উক্ত বিদ্যালয়ের কার্য্য চলিতেছে। প্রতি রবিবারেও সায়ংকালে একমাসকাল ব্রহ্মোপাসনা চলিয়াছিল। মাঝে মাঝে যাত্রিগণ এই ভক্তিতীর্থে গমন করিয়া সাধনা ও সেবাদির অনুষ্ঠান করিলে, নব ভক্তের প্রাণের মুঙ্গের সোনার মুঙ্গেরে পরিণত হইবে। আশা করি, আগামী উৎসবে যোগদান করিতে এখন হইতে সাধনার্থিগণ প্রস্তুত হইবেন।

নব জন্মোৎসব—পুরী নবপর্ণকুটীরে, গত ১৭ই নবেম্বর, নববিধানাচার্য্য শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের শুভজন্মোৎসব উপলক্ষে প্রাতে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় স্থানীয় "ক্লার্ক হল" রায় সাহেব উমানাথ দাস ডেপুটী কালেক্টরের সভাপতিত্বে স্মৃতিসভা হয়। সংগীতান্তে ভাই প্রিয়নাথ প্রার্থনা-পূর্ব্বক, শ্রীব্রহ্মানন্দের জীবনকাহিনী বিবৃত করিয়া সভার উদ্বোধন

করেন। পরে রায় সাহেব উপেন্দ্রনাথ দে শ্রীকেশবচন্দ্রের সর্ব্ব-ধর্ম্মসমন্বয় সম্বন্ধে সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। মৌলবী রহমুল্লা সাহেব বি,এ, ইংরাজীতে এবং সভাপতি মহাশয় উড়িয়া ভাষায় মহাপুরুষের উচ্চ জীবনের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। রায় সাহেব শ্রীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

১৯শে নবেম্বর, কলিকাতায়, কেহ কেহ প্রত্যুষে কলুটোলার বাড়ীতে কেশবচন্দ্রের জন্মতীর্থ দর্শনাদি করিয়া আসেন। ৯টার পর নবদেবালয়ে উপাসনা হয়। মাননীয়া ময়ূরভঞ্জের মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী উপাসনা করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ব্যক্তিগত প্রার্থনা করেন, ভাই প্রিয়নাথ শ্লোক পাঠ ও শ্রীমতী জগন্মোহিনী দেবীর প্রার্থনা আবৃত্তি করিয়া বিশেষ প্রার্থনা করেন; ভ্রাতা নির্ম্মলচন্দ্র সেন শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের জন্মদিনের প্রার্থনা আবৃত্তি করেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে শ্রীমতী মহারাণী সুচারু দেবীর নেতৃত্বে নবদেবালয়ের রোয়াকে কল্পতরু প্রদর্শন হয়; ভাই প্রিয়নাথ শিশুদের নবশিশুর কথা বলেন। সন্ধ্যায় ব্রহ্ম-মন্দিরেও ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন ও বিশ্বমানব নবশিশুর জন্মদিনে আমাদেরও নব জন্মদিন বিষয়ে আত্মনিবেদন ও প্রার্থনা করেন।

বাঙ্গলা তারিখ হিসাবে, ৫ই অগ্রহায়ণ শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের জন্মদিনে, শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে প্রাতে ও সন্ধ্যা দুই বেলাই ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন ও শ্রীমতী সুনীতি মল্লিক সবান্ধবে সঙ্গীত করেন। মধ্যাহ্নে জন্মোৎসবের পরমান্ন প্রীতিভোজন হয়। অপরাহ্নে শিশুসম্মিলন ও কল্পতরু প্রদর্শন হয়, শিশুদিগকে শ্রীকেশবচন্দ্রের শিশু জীবনের গল্প বলা হয়। সন্ধ্যার উপাসনার পর আচার্য্যজীবন সম্বন্ধে প্রসঙ্গ হয়। পরে একদল কীর্ত্তনীয়া সুন্দর কীর্ত্তন করেন।

পরলোকগমন—আবার একটী শ্রদ্ধেয়া ও প্রিয়তমা ভগ্নী-স্থানীয়া সতী সাধ্বী দেবীপ্রতিমাকে হারাইয়া আমরা বড়ই শোকাহত হইলাম। স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেনের সহধর্ম্মিণী, প্রেসিডেন্সি বিভাগের এডিশন্যাল ইন্স্পেক্টর, আমাদের পরমপ্রীতিভাজন ভ্রাতা শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেনের মাতৃদেবী শ্রীমতী সরলা সেন, ৬২ বৎসর বয়সে, পুত্র ও পুত্রবধূ, দুই কন্যা ও জামাতাদ্বয়, নাতি ও নাতিনী এবং বহু আত্মীয় স্বজনদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, নববঙ্গের জন্মোৎসবে দিবাজন্মলাভে, গত ২০শে নভেম্বর, প্রত্যুষে ৫-১০মিনিটের সময়, অমরভবনে পরম-জননীর প্রেমবক্ষে পতিদেবতা এবং গুরুজন ও প্রিয়জনদের সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন। গত ১০ই নভেম্বর, কুচবিহারের মাননীয়া মহারাণী সুনীতি দেবীর স্বর্গারোহণের প্রথম সাম্বৎ-সরিক দিনে, বাবু প্রভৃতি রাজকমল ভট্টাচার্য্যের মধুর কীর্ত্তন তিনঘণ্টা ধরিয়া শ্রবণ করেন। বাহিরে বসাতে, বোধ করি, কোন রকমে ঠাণ্ডা লাগে। তাহাতে পরদিন একটু অসুস্থতা বোধ করেন। ১২ই রবিবার, প্রবল জ্বর ও সঙ্গে সঙ্গে নিউ-মোনিয়া প্রকাশ পায়। সুচিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষার কিছু মাত্র ত্রুটী হয় নাই। কিছুতেই আত্মাপাখীকে আর দেহপিঞ্জরে বদ্ধ রাখা গেল না। একবার কঠিন রোগে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া যায়; এই ভগ্ন শরীর লইয়াই এতদিন পতিসেবা, সন্তানসেবা, গৃহধর্ম্মসাধন, মণ্ডলীর নানা অনুষ্ঠানে, উৎসবাদিতে ও মন্দিরে সামাজিক উপাসনায় নিয়মিত যোগদান, মণ্ডলীর বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনগণের বাড়ী বাড়ী গিয়া খোঁজখবর নেওয়া ইত্যাদি কর্ত্তব্য কর্ম্ম কত স্নেহ, প্রীতি, অনুরাগ ও ভক্তির সহিত সাধন করিয়া আসিতেছিলেন। শোকতাপ তিনি জীবনে অনেক পেয়েছেন। বিশেষতঃ ১৯২৮সনে প্রিয়তম দেবরকে, ১৯৩০সনে প্রিয়তম নানুদাকে, ১৯৩১সনের ১লা ফেব্রুয়ারী পতিদেবতাকে এবং ২২শে ফেব্রুয়ারী ভ্রাতা মোহিতচন্দ্র সেনের কনিষ্ঠা কন্যা অতি আদরের "বুলাকে" (উমাদেবী) এবং আগে পরে আরো কত প্রিয়জন, আপনার জনকে হারাইয়া তিনি যেন পরলোকে যাইবার জন্যই প্রস্তুত হইতেছিলেন। সদা হাসি মুখে সরল সুন্দর মিষ্ট মধুর ব্যব-হারে সকলের প্রাণে আনন্দ ঢালিয়া, হাসিতে হাসিতে আনন্দ-লোকে চিরহাসির রাজ্যে চলিয়া গেলেন। পরমজননী তাঁর সতী কন্যার জীবনকে ওলোকে আরও গৌরবমণ্ডিত করুন এবং এখানে সকল শোকার্ত্ত প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ৩০শে কার্ত্তিক, ১৪ মন্মথ ভট্টাচার্য্য ষ্ট্রীটে, চট্টগ্রামের শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র চৌধুরীর সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া সরোজিনী দেবীর সাম্বৎসরিক দিনে, পিসীমাতা শ্রীমতী বিন্দু-বাসিনী সেনের গৃহে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। পিসীমাতা বিশেষ প্রার্থনা করেন এবং কন্যা শ্রীমতী সাধনা চৌধুরী "মাতৃতর্পণ" পাঠ করেন এবং কন্যা শ্রীমতী অমিয়া চৌধুরী প্রচারভাণ্ডারে ১৲ টাকা দান করেন।

গত ১লা অগ্রহায়ণ, ৬৫।১ হ্যারিসন রোডে, বিধানযুবনী শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের গৃহে, তাঁহার শ্বশ্রূমাতার সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। ভগ্নী শ্রীমতী কুমুদিনী দাস বিশেষ প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে কন্যা শ্রীমতী প্রীতিলতা দত্ত প্রচার ভাণ্ডারে ১৲ টাকা দান করেন।

গত ২রা অগ্রহায়ণ, ১৫।১বি প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে, ডাক্তার শৈলেন্দ্রভূষণ দত্তের গৃহে, তাঁহাদের মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ১০ই অগ্রহায়ণ, ১২।১ বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীটে, অনাথ-আশ্রমে, আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গগত ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্তের সাম্বৎ-সরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priya-nath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.
কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৮ ভাগ। ২৩শ সংখ্যা। | ১লা পৌষ, শনিবার, ১৩৪০সাল, ১৮৫৫শক, ১০৪ব্রাহ্মাব্দ। 16th. December, 1933. | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

মা, ভারতমাতার মা, তোমার এই ভারতে যুগে যুগে কতই যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ জন্মদান করিয়াছ। সত্য ত্রেতা দ্বাপরের পর কলিযুগ। এই কলিযুগকেও তুমি এ বিষয়ে বঞ্চিত কর নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যাঁহাদিগের দ্বারা তোমার যুগধর্ম্মবিধান প্রবর্ত্তন করিয়াছিলে, তাঁহারাতো তোমার অবতার বলিয়া পূজিত হইয়াছেন। তাই বর্ত্তমান যুগে, কলিযুগে এমন একজনকে দিয়া তোমার নবযুগধর্ম্মবিধান সর্ব্বসমন্বয়বিধান নূতন বিধান প্রবর্ত্তন করিলে, যিনি আপনাকে পাপী মানবের সহিত সহানুভূতি-যোগে পাপী মানুষ বলিয়া আত্মপরিচয় দান করিলেন, যেন পাপী আমরাও তাঁহার সহিত সমযোগে সম নবজীবন লাভ করি। তাই সেই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের শুভজন্মদিন সাধন করাইয়া কৃতার্থ করিলে এবং সেই দিন হইতে স্বর্গারোহণদিন পর্য্যন্ত তাঁর নব জীবনের অনুসরণ করিয়া যাহাতে নববিধানের নবজীবন-যাপনে আমরা ধন্য হই, তাহারও জন্য ব্রতধারী করিয়াছ। ব্যক্তিগত জীবনে নবজীবন অনেকেই যুগে যুগে লাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগধর্ম্মসাধনে ব্যক্তিগত নবজীবন লাভ করিলে তোমার নববিধান পূর্ণ হইবে না। তাই তুমি চাও, আমরা পরিবারগত ভাবে, দলগত ভাবে নববিধান-মূর্ত্তিমান ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবের অনুসরণব্রত লইয়া, সপরিবারে সদলে মিলিতভাবে জীবনে তোমার নববিধান যেন সপ্রমাণ করি। আশীর্ব্বাদ কর, যেন এবার আমরা এই পবিত্র ব্রত সপরিবারে সদলে গ্রহণ করিয়া, নববিধানের অখণ্ড প্রেমপরিবার ধরায় প্রতিষ্ঠা করিয়া, ব্যক্তিগত জীবনে ও মণ্ডলীগত জীবনে ধন্য হই এবং জগতে স্বর্গরাজ্য স্থাপনের আশা বর্দ্ধন করি।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

—•—

নববিধানে নবজীবন।

নবেম্বর মাস আমাদের নবজীবন ও নবজন্ম লাভের মাস গেল। নববিধান নব জীবনেরই বিধান। আমরা মনুষ্যজন্ম লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছি। দ্বিজজন্ম পাইয়া, নবজীবন পাইয়া স্বর্গে গমন করিব, এই আমাদের জীবনের নিয়তি। সেই নিয়তি যাহাতে সংসিদ্ধ হয়, তাহাই নববিধানের উদ্দেশ্য।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমরা এসময়ে পৃথিবীতে জন্মলাভ করিয়াছি এবং নববিধানে[illegible]শ্রয়ে স্থান পাইয়াছি। ইহা আমরা নিজ পুরুষকারে বা নিজ

চেষ্টায় পাই নাই। সাধ্য সাধনার বিধান নববিধান নয়। বিধাতার বিশেষ কৃপার নামই নববিধান। তাই এ ধর্ম্মও সাধ্য সাধনার ধর্ম্ম নয়। পুরাতন ধর্ম্মবিধানে সাধ্য সাধনার প্রাধান্য, পুরুষকারের মহত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। নববিধান বিধাতার প্রত্যক্ষ কৃপার বিধান, কৃপার দান। এ ধর্ম্মের আগাগোড়া বিধাতার হাতে, মানুষের হাতে কিছুই নয়।

ধর্ম্ম কর্ম্ম করা আগে মানুষের হাতে ছিল; কিন্তু যেমন কথায় বলে, "মানুষ শিব গড়তে বানর গড়ে," তেমনি ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে গিয়া মানুষ ধর্ম্মের অহংকারে স্ফীত হয়, বা বিদ্যা বুদ্ধির আবর্ত্তে পড়িয়া ধর্ম্মের ভিতর মানবীয় কুসংস্কারাদি বা মতের গোলযোগ আনিয়া ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত করে। তাহাই দেখিয়া এবার বিধাতা স্বয়ং ধর্ম্মরথের সারথি হইয়া নববিধানের রথ পরিচালন করিতেছেন। ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যেমন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সারথি হইয়া পঞ্চ পাণ্ডবকে পরিচালন করিয়াছিলেন, আখ্যায়িকা আছে, তেমনি নববিধানের পাঁচজনকে জীবন্ত বিধাতা বিজয় দান করিবার জন্য পরিচালক হইয়াছেন; অর্থাৎ সংসারসংগ্রামে পাঁচজন একজন হইয়া, বিধাতার অনুজ্ঞা পালন করিয়া বিজয় লাভ করিবেন। তাই নববিধান যে কি নূতন বিধান, ইহা আমাদের হৃদয়ঙ্গম করা বিশেষ প্রয়োজন। বাস্তবিক ইহা মানুষের কারখানা নয়, কিন্তু মানুষকে মহামানুষ করিবার জন্য ইহা অবতীর্ণ।

আমাদের এ সম্বন্ধে বিশ্বাস তেমন উজ্জ্বল হয় নাই বলিয়া, আমরা নববিধানের পূর্ণ মর্ম্ম এখনও বুঝিতে পারিতেছি না। আমাদিগকে জ্ঞান-বিচার ও পুরুষকারের পথ দিয়া আসিতে হইয়াছে, তাই তাহার সংস্কার আমরা এখনও ত্যাগ করিতে পারি নাই। নিজ চেষ্টায় বা সাধ্য সাধনায় ভাল হওয়া, আর মার প্রত্যক্ষ কৃপায় গঠিত হওয়া অনেক প্রভেদ। যতদিন নিজের বুদ্ধি বিদ্যার অহং মন হইতে না যায়, ততদিন আমরা মার কৃপার ভিখারীও হই না, মার কৃপাও পাই না।

এই জন্য নববিধানের প্রথম সাধন আমিত্ব বা পুরুষকারের মৃত্যু। মৃত্যুর পরেই মানুষ স্বর্গে যেমন আরোহণ করে, তেমনি এই 'আমি' 'আমার' মৃত হইলেই আমরা নববিধানের নবজীবন লাভ করি। সাধ্য সাধনা করিয়া আমাদের ভাল হইতে হইবে, ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে হইবে, যতদিন আমাদের এই ভ্রান্ত বুদ্ধি থাকে, ততদিন আমরা নববিধানের নবজীবন পাবার উপযুক্ত হই না। তাই তাহা পাইও না।

ধন্য মা নববিধান-বিধায়িনী! এই বিধান যেমন তাঁর নিজ পবিত্রাত্মাজাত, তেমনই ইহার সাধনব্যবস্থাও তাঁর অনির্ব্বচনীয় লীলায় বিহিত করিয়া আমাদিগকে ধন্য করিয়াছেন। এই যে আমাদের মধ্যে মৃত্যুর পর মৃত্যু ঘটিতেছে, ইহা হইতেই আমাদিগের সম্মুখে নবজীবন-লাভের পথ খুলিয়া যাইতেছে। নবজীবনের অর্থ নূতন জন্ম। পৃথিবীতে আমরা দেহধারী হইয়া জন্মগ্রহণ করি। এই দৈহিক জীবন যখন না থাকে, তখনই আমরা নব-জীবন প্রাপ্ত হই। যাঁহারা দৈহিক লোক হইতে আত্মা-লোকে গমন করেন, তাঁহারা ত স্বর্গীয় নবজীবনলাভে ধন্য হনই; কিন্তু দেহ থাকতে থাকতেই আমরা দৈহিক জীবন পরিহার করিয়া আত্মস্থ এবং নবজীবন প্রাপ্ত হইব, ইহাই নববিধান।

ব্রহ্মগত জীবনই নবজীবন। আমাদের এই রিপু-পরতন্ত্র দৈহিক জীবন বা আমিত্ব হইতে মুক্ত হইলেই, আমরা নবজীবনে উজ্জীবিত হই। পৃথিবীতে আজ দৈহিক জীবনে যিনি মৃত হইলেন, তিনি মরিলেন না, তিনি নবজীবনে বাঁচিলেন। তিনি অমর জীবনে, অনন্ত জীবনে প্রবেশ করিলেন। মৃত্যু কেবল দেহ হইতে আত্মার মুক্তি। এই যে প্রতিদিন আমরা যখন উপাসনা করি, তখনই কি আমরা দেহমুক্ত হই না বা দেহে মৃত হই না? সুতরাং মৃত্যু ত আমাদের অভ্যস্ত, মৃত্যু আর ভয়ের বিষয় নয়। মৃত্যু আমাদের নিকট অমৃতের সোপান। এই জন্যই আমরা প্রতিদিন প্রার্থনা করি, মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতেতে লইয়া যাও।

বাস্তবিক দেহের মৃত্যু মৃত্যু নয়, পাপই মৃত্যু। দৈহিক জীবন জড়েতে, কামনায় বাসনায়, পাপে তাপে যখন জর্জ্জরিত হয়, তখনই যথার্থ মৃত্যু; সেই মৃত্যুই ভয়ঙ্কর। সেই মৃত্যু হইতে বাঁচাইবার জন্যই দেহের মৃত্যু আসে। দেহের মৃত্যু বস্তুতঃ একটা ফাঁকি। এই দেহে যে জীবন আছে, এক নিঃশ্বাসে সে জীবন বাহির হইয়া গেল, এবং মানবাত্মা পরমাত্মায় গিয়া মিশিল। তিনিই ত জীবনের জীবন, তাঁহাতে জীবিত থাকাই জীবিত থাকা। মৃত্যু আসিয়া কেমন সহজে তাহা সংযোগ করিয়া দিল। তবে এ মৃত্যুকে ভয়ঙ্কর কেমন করিয়া বলিব?

যদ্দ্বারা আমরা জীবনের জীবনকে সহজে প্রাপ্ত হই, তাহা ভয়ঙ্কর কিসে? আমরা যে নবজীবন পাইতে চাই, উদ্দ্বারা আমরা তাহা পাই। মৃত্যুকে আমাদিগের উজ্জীবনলাভের সহায় বলিয়া, বন্ধু বলিয়া আমরা কেন না আদর করিব?

বাস্তবিক মৃত্যু আমাদিগের বন্ধু হইয়া আমাদিগকে যেমন অমর জীবন দান করে, তেমনি বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু হইলেও পরলোকের চিন্তা আনিয়া দিয়া এবং বৈরাগ্য ও সংসারের অসারতা উপলব্ধি করাইয়া, আমাদিগকে কতই কৃতার্থতা দান করে, এবং মৃত্যু-ভয়ে ভীত হইয়া মা মা বলিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিবার জন্যও আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপন করে। আবার যে বন্ধু বা আত্মীয়, পিতামাতা বা সন্তান সন্ততি চলিয়া যান, তাঁদের সঙ্গেও পরলোকে গিয়া মিশিবার জন্য কতই মনের আকাঙ্ক্ষা হয়। এবং তাহা প্রকৃত হইলে, ব্রহ্মোপাসনা এবং ব্রহ্মসঙ্গ-সাধনা বিনা তাহা পূর্ণও হয় না। তাহা পূর্ণ হইলেই নবজীবনের সম্ভোগ করিয়া আমাদের আত্মা ধন্য হয়। নববিধান আমাদিগকে যে নবজীবন দিবার জন্য প্রতিশ্রুত, এই মৃত্যুর সহায়তা দ্বারা তাহা প্রাপ্ত হইয়া কতই নববিধানকে জীবনে সপ্রমাণ করিতে সক্ষম হই। এক [illegible]নে যেমন পরিবারস্থ সকলের মৃত্যু হয়, তেমনি সপরিবারে সদলে এই দৈহিক জীবনের মৃত্যু সংসাধন করিয়া, সপরিবারে সদলে নবজীবনলাভে নববিধান-মূর্ত্তিমান-জীবন হই, মা এমন বিধান করুন।

প্রশ্নতত্ত্ব।

"আমি নাই," "আমি আমি"।

আমি যখন উপাসনা করি, তখন আমার "আমি" আমাতে থাকে না। "আমি আছি" যিনি, তিনি আমার "আমি"কে উড়াইয়া দিয়া, "আমি নাই" করিয়া, আমাকে অধিকার করিয়া বসেন, তখন আর "আমি আমি" বলিতে দেন না। পবিত্রাত্মা রূপে তিনি যখন আমাকে অধিকার করেন, তখন ভূতগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় আমার অবস্থা হয় বা আমার আমিত্ব তখন মৃত্যুর অবস্থায় পতিত হয়। তখন আমি বিশ্বমানবের সঙ্গে এক হইয়া উচ্চ উচ্চ যোগের তত্ত্ব বলি এবং ভক্তির অনুরাগে অনুরঞ্জিত হই। আবার যখন আমি সে অবস্থা হইতে বিচ্যুত হই বা উপাসনার নেশা ছুটিয়া যায়, এবং পবিত্রাত্মাভূত ছাড়িয়া যায়, তখন যে আমি সেই আমি হই, নীচ আমিত্বগ্রস্ত হইয়া কাম ক্রোধ রিপুর অধীন হইয়া আত্মহারা হই। কবে চিরতরে "আমি নাই" হইয়া, এ "আমি আমি" ছাড়িব।

দু'জনে একজন, একজনে দু'জন।

দুই চক্ষু দেখে এক, দুই কাণ শুনে এক। এমনই যখন দুইটী প্রাণ একপ্রাণ হয়, দুই আত্মা এক আত্মা হয়, দুই দেহ এক দেহ হয়, তখন দুজনেও একজন হয়, এক ইচ্ছা, এক রুচি, এক মন, এক দর্শন, এক শ্রবণ হয়। আবার এক চক্ষুর দৃষ্টি যখন বিকৃত হয়, তখন একই ব্যক্তিকে দুই ব্যক্তি মনে হয়। তেমনি এক কর্ণ বিকৃত হইলে, এক শব্দ দুই শব্দ মনে হয়। সেইরূপ সংসার-বিকার-গ্রস্ত একই ব্যক্তির ভিতরও দুই দুই ভাব দেখা যায়। ভিতর বাহির দুই রকম। কাজে কথায় মিলন নাই, চিন্তায় ইচ্ছায় সমতা নাই। বাহিরে সাধু, ভিতরে কপট। এই ব্যক্তিই বিষম সাংঘাতিক।

শত্রুকে নমস্কার।

যিনি আমার শত্রুতা করেন তিনি যেমন শত্রু, আবার যিনি আমাকে তাঁর শত্রু মনে করেন বা আমার কার্য্যে শত্রুতা অনুভব করেন, তিনিও শত্রুপদবাচ্য। এই দুই ব্যক্তিকেই আমরা যেন নমস্কার করিতে পারি। যিনি শত্রুতা করেন, তাঁর বৈর নির্য্যাতন না করিয়া আমার উচিত, তাঁহার শত্রুতা দ্বারা যে শিক্ষালাভ করি এবং তজ্জনিত যে উপকার পাই, সেজন্য তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া যেন তাঁর নিকট প্রণত হই ও তাঁর কল্যাণ ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করি। আবার যিনি আমাকে তাঁর শত্রু মনে করিয়া আমাকে ঘৃণা করেন, সে জন্য আমি উত্ত্যক্ত না হইয়া, তাঁর যাহাতে শুভবুদ্ধি হয়, না জানিয়া অপরাধী না হন, সেজন্য প্রার্থনা করি। কিন্তু ঈশ্বরের যে শত্রু অর্থাৎ যে ব্যক্তি ধর্ম্মদ্রোহী বা বিধান-বিরোধী, তাহার যেন প্রশ্রয় না দি।

নববিধানের শত্রু।

নববিধানাচার্য্য বলেন, যাহারা [১] ঈশ্বরের বিধাতৃত্বে অবিশ্বাস করে, [২] প্রত্যাদেশকে বিদ্রূপ করে, [৩] বৈরাগ্যকে ঘৃণা করে, [৪] প্রার্থনা অপছন্দ করে, [৫] ভ্রমান্ধ ও গোঁয়ার, [৬] সুরাপায়ী ও ব্যভিচারী, [৭] সাম্প্রদায়িক, [৮] বিজ্ঞান-বিরোধী, [৯] বিষয়-বুদ্ধি-পরতন্ত্র, [১০] মৃত পুস্তক ও পুরাতন ভাবের উপাসক ও পক্ষপাতী, ইহারাই নববিধানের শত্রু।

সেই দিনের স্মৃতি।

[১৬ই নবেম্বর, মাতৃসাম্বৎসরিকে [illegible]]

বিশ্বজগৎ আবহমান কাল ধরিয়া পরিবর্ত্তনের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। কালের দ্রুতগতি স্রষ্টার সুনিপুণ সৃষ্টিকে ভাঙ্গিয়া

গড়িয়া নবরূপে সজ্জিত করিতেছে। আজ যাহা আছে কাল তাহা নাই, আজ যাহা নিকট কাল তাহা সুদূর, আজ যাহা মধুময় কাল তাহা বিষাদপূর্ণ। ইহাই জগতের নিয়ম। পৃথিবীতে কোনও কিছুই স্বরূপ লইয়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। পরিবর্ত্তনের প্রচণ্ড কবলে আত্মসমর্পণ করাই জীবের ধর্ম্ম।

কোন্ আদিযুগে এই মরজগতে মানুষের মেলা বসিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া মানুষের মৃত্যু লইয়া ভুবনে এক অপরূপ লীলার সৃষ্টি হইয়াছে।

মৃত্যু ইহকাল এবং পরকালের যবনিকাস্বরূপ। আজ যাঁহাকে দেখিলাম আমাদেরই মাঝে ইহজগতে, কালই হয়ত তাঁহাকে চরাচরময় খুঁজিয়া পাই না। তিনি সেই যবনিকার অন্তরালে অনন্তলোকে তিরোহিত হইয়াছেন।

মৃত্যু আপনার চতুর্দ্দিকে কি এক মোহময় সুরহস্য বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে, জানি না। অবেলায়, অসময়ে, সম্পদে, বিপদে যখনই মৃত্যুর আহ্বান দ্বারে আসিয়া পৌঁছয়, জীবমাত্রই তাহাতে সাড়া দিয়া ওঠে। সংসারের সকল প্রকার বন্ধন ছিন্ন করিয়া, সেই গূঢ় যবনিকা ভেদ করিয়া, অসীমের সন্ধানে ছুটিয়া চলে। পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিবার অবসর থাকে না। * * *

আজ আমাদের এই ক্ষুদ্র পরিবারে একটা বিশেষ দিন। এবং সেই বিশিষ্ট স্মৃতি স্মরণ করিয়াই আমাদের মন চঞ্চল হইতেছে। হৃদয়ে মৃত্যুর ছায়া নানা ভাবে উদিত হইতেছে। মৃত্যুর বিরুদ্ধে কোনও তর্ক বা অভিযোগ করা চলে না—দুয়ারে আগত মরণকে বরণ করিয়া লওয়াই শ্রেয়ঃ ; কিন্তু মৃত্যুর করাল মূর্ত্তির অন্তরালে প্রিয়জন যখন অন্তর্হিত হন, তখন এ সকল তত্ত্বে মন প্রবোধ মানে না।

আজ হইতে তিন বৎসর পূর্ব্বে, ১৬ই নবেম্বর, ৩০শে কার্ত্তিক, রবিবার, রাত্রি দশটার সময়, আমাদের ক্ষুদ্রবাসভবনে রুদ্রের পিনাক যাঁহাকে আহ্বান করিয়া নিজের সঙ্গে লইয়া চলিল, তিনি আমাদের মাতৃদেবী। সে নিনাদে যে সুর বাজিয়াছিল—মাতৃদেবী তাহাতে সাড়া না দিয়া পারেন নাই।

সেই রাত্রি হইতে আমরা তাঁহার সন্তান সন্ততি শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িলাম। শ্মশানের ভস্মমুষ্টি ভিন্ন তাঁহার অস্তিত্ব আর কোথাও দেখিতে পাইলাম না। শোকে কাতর হইয়া তাহারই ভিতর সান্ত্বনা অনুসন্ধান করিলাম, ব্যর্থ হইলাম। তখন মৃত্যু এবং মৃত্যুপ্রেরকের সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রশ্ন হৃদয়ে জাগিল—প্রেরকের উপর ক্ষোভ ও অভিমান সুরু হইল। আজ তিনবৎসর পর আবার সেই ভয়াবহ দিন আমাদিগকে মৃত্যুর প্রতাপের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

মৃত্যুর গম্ভীর আহ্বানে যে দিন মাতৃদেবী সাড়া দিলেন, সে দিন কোথায় বা রহিল তাঁহার সংসারবন্ধন, কোথায় বা রহিল তাঁহার স্নেহ, মায়া, প্রেম? সংসারের কোটি কোটী বন্ধন তাঁহার পথ রোধ করিতে পারিল না—তিনি সকল প্রকার ঐহিক চিন্তা দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রশান্ত চিত্তে যাত্রা সুরু করিলেন। সে দিন আমাদের চারিদিকে হাহাকার, বেদনা, তীব্র দীর্ঘশ্বাস সমবেত হইয়া যে বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছিল—কোনও দিন ভাবি নাই, সেই কালোমেঘ আবার কাটিয়া যাইবে। সেই দুর্দ্দিনে অবলম্বনহীন হইয়া, অসহায় হইয়া কেবলমাত্র অদৃষ্টকে ভৎর্সনা করা ভিন্ন কোনও প্রশস্ত উপায় দেখি নাই। যেদিকে চাহিলাম, দেখিলাম মাতা নাই—শুনিলাম তিনি নাই—বলিলাম তিনি নাই। গৃহে নাই, বাহিরে নাই, ঊর্দ্ধে নাই, নিম্নে নাই, দূরে নাই, নিকটে নাই, কোনও স্থানে নাই!

প্রভাতী গানে পাখী জানাইল, তিনি নাই—প্রভাতে ফুলের রাশি ম্লান হাসিয়া জানাইল, তিনি নাই—হেমন্তের বিগতপ্রায় কুহেলিকা জানাইল, তিনি তাঁহারই মতন অস্পষ্ট হইয়াছেন, অদৃশ্য হইয়াছেন। দিগন্তব্যাপী এই শূন্যতা দেখিয়া হাহাকার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ক্রন্দনে আকাশ বাতাস মথিত হইয়া চারিদিক হইতে প্রতিধ্বনি উঠিতে লাগিল, নাই নাই নাই।

সেইদিন ভাবিয়া ছিলাম, তাঁহাকে বাদ দিয়া আমাদের সংসার চলিবেনা। তিনিই যে সংসারের প্রতিষ্ঠাত্রী দেবী—আমাদের জননী। তিনি আর আমাদের হাসিতে, অশ্রুতে, সম্পদে বিপদে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে আসিবেন না ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। কিন্তু আজ দেখিতেছি, তাঁহাকে বাদ দিয়া আমরা সকলেই আবার হাসিতেছি, চলিতেছি। হৃদয়ের এই ক্ষত কে যে নিঃশব্দে আসিয়া ধীরে ধীরে শুকাইয়া দিল, তাহা নিজেরাই জানি না। সকলের অজ্ঞাতে কাহার কমণ্ডলু হইতে আমাদের ব্যথাহত হৃদয়ে সান্ত্বনাবারি সিঞ্চিত হইল? সান্ত্বনা বাহিরে যেদিন খুঁজিয়া ছিলাম—পাই নাই, আজ সে সান্ত্বনার অযাচিত পরশ হৃদয়ে অনুভব করিতেছি। এই সান্ত্বনা তিনিই দিয়াছেন, যিনি মাতৃদেবীকে মরজগতে পাঠাইয়াছিলেন এবং তুলিয়া লইয়াছেন।

এই লীলাময়ের সংস্পর্শে আসিলে শোক, তাপ, অভাব, অভিযোগ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়—তাঁহার সত্তা হৃদয়ে অনুভব করিলে তাঁহার চরণতলে মাথা নত হইয়া আসে। মৃত্যুর গূঢ় যবনিকা যেন ধীরে ধীরে পরিষ্কার রূপ ধারণ করিয়া, অতি স্পষ্ট রূপে প্রকটিত হইয়া উঠে।

মনে হয়, মরণসংঘাতের ভিতর দিয়া বিধাতা মানুষকে যাচাই করিয়া লইতেছেন। মনে হয়, আঘাতের পর আঘাত করিয়া, হৃদয়ে দহনানল জ্বালাইয়া, বিশ্বনিয়ন্তা আমাদের পরীক্ষা করিয়া লন। আজ আর কিছু বলিবার নাই। শুধু সেই পরমকল্যাণময় পরমেশ্বরের কাছে এই কাতর প্রার্থনা, যেন তিনি আঘাতানুযায়ী সহ্য করিবার ক্ষমতাও দান করেন। তবেই তাঁহাকে বলিতে পারিব—"আরো আঘাত সইবে আমার, সইবে আমারো; আরো কঠিন সুরে জীবন-তারে ঝঙ্কারো। * * * জনে

উঠুক সকল তুফান, গর্জ্জি উঠুক সকল বাতাস, জাগিয়ে দিয়ে সকল আকাশ পূর্ণতা বিস্তারো।"

সাধনা চৌধুরী।

—০—

পরলোকগতা শ্রীমতী সরলা সেন।

(জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা রায় কর্তৃক, ৩রা ডিসেম্বর, শ্রাদ্ধবাসরে বিবৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি)

আজ এই পবিত্র শ্রাদ্ধবাসরে যাঁর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্পণ করে প্রাণে একটু শান্তিলাভ করব বলে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি—তাঁকে আমরা এ সংসারে মাতৃরূপে পেয়ে ধন্য হয়েছিলাম। এই একপক্ষ কাল আমরা এ গৃহে তাঁর সেই হাসিমাখা উজ্জ্বল মুখখানি আর দেখতে পাচ্ছিনা; কিন্তু তাঁর স্নেহমাখা স্পর্শ, তাঁর কণ্ঠস্বর এখানকার প্রতি ঘরে, প্রতি জায়গায় অনুভব করছি। আজ আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলে এখানে উপস্থিত হয়েছি—ইহলোক ও পরলোক উভয়ের মিলন পাশে অনুভব করছি; আজ তিনিও বিদেহী হয়ে পরলোকগত পিতা ও সকল প্রিয়জনের সঙ্গে এখানে উপস্থিত। পরম পিতার নিকট তাঁর আত্মার কল্যাণ কামনা করে কৃতার্থ হব, এই আশা।

প্রায় ৬২ বৎসর পূর্ব্বে কলুটোলার বিখ্যাত সেনবংশে আমাদের মাতৃদেবীর জন্ম হয়। মাতামহ স্বর্গীয় জয়কৃষ্ণ সেন ও মাতামহী স্বর্গীয়া নিস্তারিণী দেবীর দ্বিতীয় সন্তান ও একমাত্র কন্যা আমাদের মা বড়ই আদরে প্রতিপালিত হয়েছিলেন। তাঁর বাল্যজীবনের কথা আমরা বিশেষ কিছু জানি না। শুধু জানি, মাতৃদেবী ১০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাঁর পিতামহ স্বর্গীয় দেওয়ান মাধবচন্দ্র সেনের গৃহে বহু পরিবার ও সুখ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বাস করতেন। মাতৃদেবীর বাল্যকালেই মাতামহ জয়কৃষ্ণ সেন আচার্য্য কেশবচন্দ্রের প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজে আসেন। পিতা মাতার পুণ্য চরিত্রের প্রভাব আমাদের মার জীবনে অনেকখানি পড়েছিল। মা আমাদের দিদিমার মত সরল হাসিতে, যে কেহ তাঁর সংস্পর্শে আসত, তাকেই মুগ্ধ করতেন। অপরকে ভালবাসা শৈশব হতেই তাঁর জীবনে বিশেষ গুণ ছিল। শুধু আপনার পরিবারকে নয়—আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলকেই তিনি প্রাণ ঢেলে ভালবাসতেন। তাই আজ তাঁকে হারিয়ে তাঁরা কত ব্যথিত ও দুঃখিত।

বাল্যকালে বিশেষ কোনও বিদ্যালয়ে তাঁর যাওয়া হয় নি। Miss Pigot নাম্নী ইংরাজ মহিলা—যিনি সেন পরিবারের অধিকাংশ বালিকার শিক্ষকতা করেছিলেন—তাঁর নিকটই মার শিক্ষালাভ হয়। প্রায় ১৪ বৎসর বয়সে আমাদের পূজনীয় পিতৃদেব স্বর্গগত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেনের সহিত বিবাহ হয়। আমাদের মাতামহ প্রকাশ্য ভাবে এই প্রথম ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান করেন।

পিতামহ স্বর্গগত গোপীকৃষ্ণ সেন মহাশয়ের ঢাকার বাসগৃহে মার বিবাহিত জীবনের প্রথম কয়েক বৎসর কেটেছিল; সেখানেও সকলকে ভালবেসে সকলের ভালবাসা পেয়েছিলেন। তারপর পুত্র ও জ্যেষ্ঠা কন্যার জন্মের পর, পিতৃদেবের কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতায় এসে তাঁরা সংসার আরম্ভ করেন। এই সময় আমাদের মাতামহের বিয়োগে মা প্রথম শোক পেলেন। কলিকাতায় সংসারের আরম্ভে নানা অভাব ও পরীক্ষার মধ্যে পড়েও, ভগবানে প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকায়, সে সকলই বাবা ও মা হাসিমুখে বহন করতে পেরেছিলেন।

নববিধান ধর্ম্মে তাঁদের পূর্ণ বিশ্বাস ও ভালবাসা ছিল—এই সময় থেকেই সমাজের সঙ্গে তাঁদের বিশেষ যোগ আরম্ভ হয়। সংসারের প্রত্যেক খুঁটিনাটি কাজ সম্পন্ন করেও, যখন যেখানে উপাসনা, কীর্ত্তন, বক্তৃতা হত, আমাদের মা সকলের আগেই সেখানে উপস্থিত হতেন। বাইশ বৎসর পূর্ব্বে সঙ্কটাপন্ন রোগে তাঁর শরীর ভগ্ন হয়ে যায়—অকালে জরা ও বার্দ্ধক্য আসে—তবু শেষ পর্য্যন্ত তাঁর ঐ সবে যোগ দেবার উৎসাহ একদিনও কমে নি। ব্রহ্মসঙ্গীতে মার বড় অনুরাগ ছিল। গান শুনতে যেমন ভালবাসতেন—গাইতেও তেমনি ভালবাসতেন। ব্রহ্মসঙ্গীতের সমস্ত গানই প্রায় তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। যেখানে উপাসনা হ'ত, মা গানে সর্ব্বদা যোগ দিতেন। তাঁর অযোগ্য কন্যা আমরা,—যেটুকু ব্রহ্মসঙ্গীত জানি—তা মার কাছেই শেখা।

২৮ বৎসর বয়সে মা আমাদের দিদিমাকে হারিয়ে নিজেকে বড় অসহায় মনে করেছিলেন; কিন্তু কয়েক বৎসর পরেই জ্যেষ্ঠ সহোদর স্বর্গগত মোহিতচন্দ্র সেনের অকস্মাৎ পরলোকগমনে মা বড় কাতর হয়ে পড়েছিলেন। আমাদের বড় মামা ৩৭বৎসর এই পৃথিবীতে থেকে, চারিদিকে তাঁর সদ্‌গুণের কত সৌরভ ছড়িয়ে গিয়েছেন, তা সেই সময়ের সকলেই জানেন। শ্রদ্ধেয় মোহিতচন্দ্র, বিনয়েন্দ্রনাথ ও প্রমথলাল এঁরা তিনজনেই মার অতি প্রিয় ছিলেন, অগাধ ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রাণভরে তাঁদের ভালবাসতেন। শ্রদ্ধেয় বিনয়েন্দ্রনাথ ও প্রমথলালের সঙ্গে শুধু আত্মীয়তা ছাড়া ধর্ম্মের দিক দিয়েও তাঁর গভীর যোগ ছিল। একে একে তাঁরা তিনজনেই পরলোকে—আমাদের মাও আজ সেখানে তাঁদের সঙ্গে মিলে আনন্দ করছেন।

মার একটি পুত্র ও তিনটি কন্যার মধ্যে কনিষ্ঠা কন্যাকে অসময়ে তার পাঁচ বৎসর বয়সে হারিয়েছিলেন। অন্য তিনটী সন্তানকে উপযুক্ত সময়ে বিয়ে দিয়েছিলেন। গৃহের ছোট বড় প্রত্যেক অনুষ্ঠানগুলিতে সমাজের প্রচারক ও কর্ম্মীদের সকলকেই ডাকতেন। সংসারের সকল কাজেই তাঁর সুশৃঙ্খলতা ও সুবন্দোবস্ত থাকত। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা তাঁর জীবনের আর একটি গুণ ছিল। রুগ্ন ভগ্ন শরীর নিয়েও গৃহের প্রত্যেকটি

জিনিষ পরিষ্কার ও শৃঙ্খলায় আছে কি না, সে দিকে তাঁর সর্ব্বদা দৃষ্টি ছিল। অলসতা কাকে বলে, তিনি কোনও দিন তা জানতেন না। ভগ্ন শরীর নিয়েও সব সময়ই সংসারের কিছু না কিছু কাজ বা সেলাই করতেন। পরিচিত আত্মীয় বন্ধু সকল পরিবারের ছোট ছোট শিশুদের নিজের হাতে টুপী মোজা জামা বুনে দিয়ে বড় আনন্দ পেতেন। আর সকলকে খাওয়াইতে বড় ভালবাসতেন। যে কেহ বাড়ীতে আসতেন, তাঁকেই খাওয়াবার জন্যে ব্যস্ত হতেন। এমন কি, রোগশয্যায়ও যে কেহ তাঁকে দেখতে এসেছেন, সন্দেশ খাওয়াবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন। সংসারের ঝি চাকরদের পুত্র কন্যার মত স্নেহ ও যত্ন করতেন। আজ তাঁকে হারিয়ে ত্রিশ বছরের পুরাণো ঝিও চোখের জলে ভাসছে।

ব্রহ্মানন্দদেবের উপর তাঁর অসীম ভক্তি ও আকর্ষণ ছিল। তা ভাষায় বলবার নয়। সেই আকর্ষণেই তাঁর পরিবারের প্রত্যেকের উপরেই মার অত্যন্ত ভালবাসা ছিল। তাঁদের সকলের রোগে, শোকে, সুখে, দুঃখে তিনি শেষ দিন পর্য্যন্ত যোগ রেখেছিলেন। মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী তাঁর সমকালীন ছিলেন বলে, ছোটবেলা থেকেই তাঁর সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্ব ও ভালবাসা ছিল।

ক্রমে ক্রমে পরিবারে আরও কয়েকটী শোক পাবার পর, প্রায় তিন বছর হল, আমাদের পিতার স্বর্গারোহণ হয়। সেই সময়ে স্বামীর রোগশয্যার পাশে ব'সে—কি অসীম ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে কয়দিন দিবারাত্রি তাঁকে মধুর গান শুনিয়ে পরলোকযাত্রার জন্য প্রস্তুত করিয়েছিলেন—এমন তো কাহাকেও প্রায় করতে দেখা যায় না। এই দৃষ্টান্ত থেকে মার ভগবানে বিশ্বাস ও নির্ভরতার পরিচয় আরও পাওয়া যায়। কিন্তু পিতৃদেবের তিরোধানের পর থেকে তিনি নিজেও সেইলোকে যাবার জন্য ক্রমে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। শেষে স্বামীর বিয়োগের মাত্র বাইশ দিন পরেই, কন্যাসমা প্রতিপালিতা আদরের ভ্রাতুষ্পুত্রী উমাকে অকস্মাৎ হারিয়ে, তাঁর মনে যে কি গভীর আঘাত লেগেছিল—আমরা তা বেশ বুঝতে পারিতাম।

বাবা আমাদের ছেড়ে যাবার দু'বছর ও দশমাস পরেই মা যে চলে যাবেন; তা আমরা একবারও ভাবি নি। মার শারীরিক অসুস্থতার বাহ্যিক প্রকাশ ছিল না ব'লে আমাদের মনে স্থির বিশ্বাস ছিল যে; মা তাঁর স্নেহের আঁচলে আরও কিছুদিন আমাদের ঘিরে থাকবেন। মা যে সংসারের মায়া এত শীঘ্র কাটবেন, তা স্বপ্নের অতীত। আত্মীয়দের প্রতি তাঁর কত মায়া, কত মমতা। তাঁদের ও সমাজের বন্ধু পরিচিতদের সুখে দুঃখে, বিপদে খোঁজ নিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত হতেন, আর রুগ্ন ভগ্ন শরীর নিয়েও সকলের কাছে যেতেন। শেষ রোগশয্যায় শোবার আগের দিন পর্য্যন্ত সকলের সঙ্গে দেখা করে এসেছিলেন। বিবাহিত জীবনের প্রথমাংশে ঢাকা সহরে বাসকালে যে সব আত্মীয় তিনি লাভ করেছিলেন—তাঁদের ভিতরে অনেকেই এখন পরলোকে। তবুও যাঁরা আছেন, তাঁদের সঙ্গে দেখা করবার উদ্দেশ্য নিয়েই মা এবার পূজোর সময় ঢাকায় গেলেন। আমাদের পিতৃমাতৃহীন খুড়তুতো ভাইবোনদের দুঃখে মার প্রাণ বড়ই ব্যথিত হ'ত। পূজোর ১২দিন তাদের কাছে কাটিয়ে মা পরম তৃপ্তিলাভ করলেন এবং সেই সঙ্গে ঢাকা সহরের বৃদ্ধ প্রচারকবৃন্দের সঙ্গে নিজের শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও গিয়ে দেখা করে নিজেকে ধন্য মনে করলেন। এখন মনে হয়, যেন সকলের কাছে শেষ বিদায় নিতেই গিয়েছিলেন।

কলিকাতায় ফেরবার সময় আমাদের খুড়তুতো বোন লাবণ্যকে নিয়ে এলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত তার হাতের সেবা পেয়ে কত তৃপ্ত হলেন। ঢাকা থেকে ফিরে মা ঠিক দেড়মাস আমাদের মাঝে রইলেন। গত ১০ই নভেম্বর, শ্রদ্ধেয়া মহারাণী সুনীতি দেবীর প্রথম সাম্বৎসরিক দিনে কমলকুটীরে দুবেলা উপাসনা ও কীর্ত্তনে কত উৎসাহ করে গেলেন। ১২ই রবিবার, মার জ্বর প্রকাশ পেল, সঙ্গে সঙ্গে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হলেন। প্রথম দিনও সকালে মা জ্বরকে অগ্রাহ্য করে সংসারের দৈনন্দিন কার্য্য সমাপন করলেন। মা বরাবর বলতেন যে; "আমার হাত পা থাকতে থাকতে আমি যেন চলে যাই।" বিশ্বাসীর কথা ভগবান শুনলেন। তাই মা মাত্র ৮দিন রোগশয্যায় রোগযাতনা ভোগ করলেন। তাও মা কোন দিন রোগের কথা ভাবলেন না এবং আমরা যাতে না ভাবি; তার দিকেই মার লক্ষ্য ছিল। স্নেহের সন্তানদের প্রতি, দৌহিত্র দৌহিত্রীদের প্রতি মার কি অসীম স্নেহ ছিল; কিন্তু রোগশয্যায় শুয়ে মার মন কোন অমৃতলোকের সন্ধান পেয়েছিল জানিনা; মা সংসারের আসক্তি থেকে নিজেকে মুক্ত করে সেই উর্দ্ধলোকের প্রতীক্ষা করছিলেন। সুদূর বিদেশে স্নেহের কন্যার কথাও মা ভাবলেন না; মার জীবনে মা এই বুঝিয়ে গেলেন যে, সেই পরম মাতার প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হলে, সংসারের আসক্তি, মায়ার বন্ধন কত সহজে কাটিয়ে মুক্ত হওয়া যায়।

মাগো, তোমাকে হারিয়ে আজ আমরা কত অসহায়। ইহলোকে থাকতে তুমি যে স্নেহের আঁচলে আমাদের ঢেকে রেখেছিলে—আজও আমরা সেই স্নেহের ছায়ায় রয়েছি—

"মার হাতখানি সদা আছে জানি
সন্তানের শিরোপর;
মায়ের সে প্রাণ আছে বর্ত্তমান
সন্তানের কাছে কাছে।"

এই গানের সার্থকতা যেন সব সময় আমরা উপলব্ধি করতে পারি। মা তুমি কোথায় জানিনা—কিন্তু রোগশয্যায় যে আনন্দ-উৎসবের কথা বার বার বলে গিয়েছিলে, আজ তা আমাদের বিশ্বাস-নয়ন খুলে দেখতে দাও; আর বুঝিয়ে দাও যে, অনন্ত আনন্দময়ীর কোলে পিতৃদেবের সঙ্গে মিলিত হয়ে তুমি আনন্দ-উৎসব সম্ভোগ করছ।

স্বর্গীয় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু।

(৪ঠা ডিসেম্বর, শ্রাদ্ধবাসরে, কন্যা শ্রীমতী মাধববালা মল্লিক কর্ত্তৃক পঠিত)

আমাদের পরমারাধ্য পিতৃদেব শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় হাওড়া জেলার অন্তর্গত পাঁচলা গ্রামে প্রসিদ্ধ বসুবংশে ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

অতি বাল্যকালে তিনি তাঁহার পিতার সহিত কলিকাতায় আসেন ও পরে আলবার্ট স্কুলে ভর্ত্তি হন। সেইখান হইতেই তাঁহার ধর্ম্মজীবনের প্রথম সূত্রপাত হয়। বিনয়েন্দ্রনাথ, মোহিত চন্দ্র ও প্রমথলাল সেনের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রবণ প্রাণ যেন এক নূতন আলোকের সন্ধান পাইল। সেই তরুণ বয়সে স্বয়ং আচার্য্যদেবের অনুপ্রেরণায় পিতৃদেব নববিধানের পথে যাত্রা সুরু করিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণার্থ তাঁহাকে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল; কিন্তু আর্থিক এবং অন্য কোন প্রকার ক্ষতি তাঁহাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই। "তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা" একথা তিনি জীবনে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

তারপর "যুবকদিগের প্রার্থনা-সমাজে"র কার্য্যাবলীর মধ্য দিয়া তাঁর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য পরিণতি লাভ করিতে থাকে। ব্রহ্মসঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন পিতৃদেবের মনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। যদিও তিনি সংগীতচর্চ্চা করিতেন না, তবুও ব্রহ্মসঙ্গীতের প্রায় সকল গানই তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। সংযমে, বিশ্বাসে, জ্ঞানে ও কর্ম্মে তাঁর এই যে ধর্ম্মজীবন গঠিত হইল, উহা আমাদের আদর্শ হউক, ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করি।

তারপর একে একে তাঁর প্রাণের বন্ধুগণ পরলোকগমন করিলেন, অপরদিকে পারিবারিক শোকের ত' তাঁর অবধি ছিল না; কিন্তু নীরবে তিনি সকল ব্যথা সহ্য করে' জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত এক অখণ্ড ভগবদ্‌বিশ্বাসের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। দারিদ্র্য, মনঃকষ্ট তাঁহাকে কখনও কর্ম্মভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। তাই যেদিন তিনি প্রিয়তম কন্যার আকস্মিক মৃত্যুতে শোকাকুল হইয়া বলিয়াছিলেন, "ভগবান্! তুমি এ বজ্র দিয়েছ, তাইত সহ্য হয়"—সেদিনও কর্ম্মবিমুখতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। ঝড় বৃষ্টিতেও তিনি জীবনের শেষ সেবাস্থল "সুনীতি-শিক্ষালয়ে" অতি প্রত্যূষে শোকজীর্ণ শরীরটীকে টানিয়া লইয়া যাইতেন—মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেও বলিয়াছেন, "ওরে আমার সমাজের কাজ যে সব বাকী রইল," নিজেকে কর্ত্তব্যের বেদীমূলে উৎসর্গ করিবার জন্য তাঁর এতই ব্যাকুলতা ছিল।

তাঁর ধর্ম্মজীবনের বহিঃপ্রকাশ আড়ম্বরশূন্য ছিল, কিন্তু অন্তরের অন্তঃস্থলে যে নিত্য মহোৎসব চলিত, তার স্পর্শ পাইয়া নিজেদের কত ধন্য মনে করিয়াছি।

অন্তিম রোগের আবির্ভাবের সহিত পিতৃদেবের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুহূর্ত্তগুলির সূচনা হইল। নববিধানে বিশ্বাস মানবের প্রাণে যে কত বল সঞ্চার করে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা পেলাম তাঁর মৃত্যুশয্যায়। অশেষ যন্ত্রণার মধ্যেও পরলোকের স্বর্ণচ্ছবি তাঁর অন্তরালোকে উদ্ভাসিত চক্ষুর সম্মুখে এতটুকুও ম্লান হয় নাই। যে মৃত্যু আমাদের নিকট বজ্রসমান, তাহা তাঁহার নিকট প্রেমের বার্ত্তা, মিলনের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিল।

দেহের যন্ত্রণা যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, পরমেশ্বরের সহিত মিলিত হইবার জন্য তিনি ততই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। ক্রমে সেই পরমক্ষণ উপস্থিত হইল; জীবনে ঈশ্বরের পরিচয় প্রদান করিয়া, মরণে তাঁহারই জয় ঘোষণা করিতে করিতে, তিনি সেই বাঞ্ছিত লোকে চলিয়া গেলেন।

প্রভু! তুমি ত বেদনা দাও না, তবে কেন আমরা শোক করিব। তোমার দিকে চাহিলেই ত দেখিতে পাই, স্বর্গীয় আত্মা তোমার শান্তি-ক্রোড়ে পরম আনন্দে, পরম তৃপ্তিতে মগ্ন—আমরা তাঁহাকে শান্তি দিতে পারি নাই, তাই বুঝি তাঁকে অনন্ত শান্তিতে, অনন্ত আনন্দে রাখিয়াছ!

হে করুণাময় প্রভু! পরলোকগত আত্মার তৃপ্তির জন্য আমরা যেন আমাদের জীবন, মন তোমার চরণে উৎসর্গ করিতে পারি, আজ তুমি সেই আশীর্ব্বাদ কর। পিতৃদেব যে মরণ-জয়ী বিশ্বাসের নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন, তাহারই কণামাত্র লাভ করিয়া আমরা যেন ধন্য হই—তোমার চরণে এই ভিক্ষা করি।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

—০—

শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন।

(পুরী ক্লার্ক হলে জন্মোৎসব-সভায় রায় সাহেব উপেন্দ্রনাথ দে কর্ত্তৃক পঠিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এই উদার মতের দ্বারা কেশবচন্দ্র কেবল ভারতের নহে, সমগ্র জগতের সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিলেন। এই মত কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য, তিনি হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টিয়ান, শিখ, পারসীক, য়িহুদী সকল ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে সার সত্য সংগ্রহ করিয়া, সাধনের সুবিধার জন্য একখানি গ্রন্থাকারে উহা প্রকাশ করিলেন। সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের এই বর্ত্তমান যুগে ইহাই কেশবের স্থান অর্থাৎ সংকীর্ণতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া, হৃদয়ের কবাট খুলিয়া দিয়া, দেশ কাল জাতি সম্প্রদায় ইত্যাদি দ্বারা অনাবদ্ধ সত্যকে সাধন দ্বারা জীবনে আধ্যাত্মিক ভাবে (Spiritually) আত্মসাৎ করা। ১৮৬৯খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র "The Future Church" সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে ধর্ম্মসাধনে স্বাধীনতা

সম্বন্ধে এবং ভবিষ্যৎ বিশ্বজনীন ধর্ম্মসম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছিলেন—[Lectures in India—p. 100, 122—25 দ্রষ্টব্য]

তথাপি ভারতের প্রতীকোপাসনাকে তিনি পৌত্তলিকতাজ্ঞানে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ভবিষ্যৎ বিশ্বজনীন ধর্ম্মে প্রতীকোপাসনার স্থান থাকিবে না। [See Lectures in India—p. 112—13.]

এই স্থানে বিশ্বজনীন ধর্ম্মগঠনের যে একটু অপূর্ণতা রহিল, উহাই পূর্ণ করিবার জন্ম পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব। স্বামী বিবেকানন্দ, Roman Rolland প্রভৃতি বর্ত্তমান যুগের অনেক মনীষী ব্যক্তিদিগের মত এই যে, যতদিন পর্য্যন্ত জগতে সৃষ্টির বিচিত্রতা থাকিবে, ততদিন ধর্ম্মসাধনের অর্থাৎ বহিরঙ্গসাধনের [Forms of worship] বৈচিত্র্যও থাকিবে—কোন প্রকার গণ্ডীর মধ্যে এই Future Church কে বদ্ধ করা যায় না। কারণ জগতের অধিকাংশ লোক প্রতীকোপাসক এখনও আছে এবং আমাদের বিশ্বাস, যতদিন সৃষ্টি থাকিবে, ততদিন থাকিবে। ইহাদিগকে বাহিরে ফেলিয়া বিশ্বজনীন ধর্ম্ম গঠিত হইতে পারে না। অতএব শ্রীভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুখে এই মত প্রচার করিলেন যে, "ঈশ্বর সাকারও বটে, নিরাকারও বটে, আবার সাকারও নহেন, নিরাকারও নহেন অর্থাৎ উভয়ের অতীত।" গীতার মতে তিনি "অচিন্ত্যরূপ" অথচ "অনন্তরূপ"—সমগ্র বিশ্ব তাঁহার একটী রূপ—আবার তাঁহার মানুষরূপও আছে। পরমহংসদেব বলেছেন—"নিরাকারে বিশ্বাস সে ত ভালই; কিন্তু একথা বলিও না যে, সাকার উপাসনা কিছুই নহে, উহা ভ্রম।"

এইরূপে করুণাময় ঈশ্বর সকল গণ্ডী, সকল সাম্প্রদায়িকতা ভাঙ্গিয়া দিয়া, এই তিনজন মহাজনের দ্বারা এই উদার—"উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্"—বিশ্বগ্রাসী বিশ্বধর্ম্ম প্রচার করিলেন। অতএব রামমোহন, কেশব ও রামকৃষ্ণ সেই অনন্তশক্তি ঈশ্বরের বিশ্বধর্ম্মপ্রকাশরূপ শক্তি-শৃঙ্খলে এক একটী link। ইঁহাদিগকে এক করিয়া যিনি দেখেন, তিনিই দেখেন; যিনি ভিন্ন করিয়া কে ছোট, কে বড় নির্ণয় করিতে চান, তিনি অন্ধ।

বর্ত্তমান যুগের হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিগণ আচার্য্য কেশবচন্দ্রের নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী। সে জন্য আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাইয়া এই সামান্য বক্তব্য শেষ করিব। হিন্দুর প্রতীকোপাসনা (symbolism) যে পৌত্তলিকতা (Idolatry) নহে, তাহা তিনি বুঝিতেন না, এমন নহে। তবে যে তিনি উহা স্বরূপতঃ গ্রহণ করেন নাই, তাহার কারণ মনে হয় যে, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, অন্ততঃ একদল লোক উহার প্রতিবাদ করিবার জন্য [illegible]ছিলে, উহা প্রকৃতই পৌত্তলিকতায় দাঁড়াইয়া যাইবে। হিন্দুধর্ম্মের দুর্গোৎসবাদি তিনি ভাবে [in spirit] নব দুর্গোৎসবাদি নাম দ্বারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং এরূপ করিয়া দুর্গোৎসবাদির প্রকৃত মর্ম্ম কি, তাহা তিনি হিন্দুসমাজের সম্মুখে উজ্জ্বল করিয়া ধরিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা আমাদের যে বিশেষ উপকার হইয়াছে, একথা কোন মতে অস্বীকার করা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ আচার্য্য কেশবচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া এবং তাঁহারই জীবনের আলোকে, ঋষিপ্রবর শ্রীমদ্ উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় যে কয়েকখানি হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের ভাষ্য প্রকাশিত করিয়াছেন—যথা বেদান্তসমন্বয়ভাষ্য, গীতাসমন্বয়ভাষ্য এবং গীতাপ্রপূর্ত্তি বা শ্রীমদ্ভাগবত—সেগুলি বর্ত্তমান বিজ্ঞান-প্রধান্ যুগে এই সকল শাস্ত্র বুঝিবার পক্ষে লোকের কি পর্য্যন্ত সহায়তা করিতেছে ও করিবে, তাহা কথায় বলা যায় না। এই সকল ভাষ্যের মধ্যে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্র সকলের গভীর গবেষণামূলক এবং নিজ জীবনের প্রত্যক্ষ সাধনামূলক যে সকল তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, উহা জগতে অতুলনীয়। তাঁহার প্রণীত "শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম" নামক গ্রন্থে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মানবলীলা রূপ জীবন যে কত উচ্চ আদর্শে গঠিত, তাহা অতি নিপুণভাবে বর্ত্তমানের সভ্য সমাজের নিকট দেখাইয়াছেন। (এ গ্রন্থখানি শ্রীমদ্ বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণচরিত্র প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল।) এই সকলের জন্য আজ বিশেষ ভাবে শ্রীমদ্ আচার্য্য কেশবচন্দ্রের চরণে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ প্রণাম জানাইতেছি।

মন্তব্য—রাজর্ষি রামমোহন সমন্বয়ধর্ম্মের সূত্রপাত জ্ঞানে করিয়াছিলেন, কার্য্যতঃ তিনি একমাত্র বৈদিক ধর্ম্মই সাধনের বিষয় করিলেন। শ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণ দেবও যদিও সমন্বয়ধর্ম্ম স্বীকার করিলেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি একমাত্র হিন্দুভাবকেই প্রাধান্য দিলেন কিম্বা হিন্দু সমন্বয়ভাবই তাঁর অনুগামী শিষ্যগণ গ্রহণ করিলেন। জীবনের সাধন দ্বারা পূর্ণ সমন্বয়বিধান শ্রীকেশবচন্দ্রই প্রতিষ্ঠা করিলেন। দুগ্ধ এবং আলতাকে মিলাইলে, দুধের রংও থাকে না, আলতার রংও থাকে না, আর এক নূতন রং হয়। অমূর্ত্তের উপাসনার সহিত মূর্ত্তের উপাসনার সমন্বয় কেমনে হয়, চিন্ময়ের পূজা মৃন্ময় আধারে কেমন করিয়া হয়, একেশ্বরের পূজার ভিতর দিয়া দেবদেবী-পূজার আধ্যাত্মিকতা কিরূপে উপলব্ধি করা যায়, যুগধর্ম্মবিধানে তাহাই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।—[ধঃ সঃ]

ভক্ত প্রকাশচন্দ্র ও মধুসূদন।

[বাৎসরিক স্মৃতির দিনে]

নববিধানমণ্ডলীর ইতিহাসে ভক্ত প্রকাশচন্দ্র ও ভক্ত মধুসূদনের জীবন-কাহিনী বর্ত্তমান ব্রাহ্ম পরিবারের নিকট শিক্ষণীয় ও অনুকরণীয়। ভক্তজীবন অধ্যয়ন করিলে দিব্য

নূতন শিক্ষা লাভ হয়। ভক্ত প্রকাশচন্দ্রের জীবনে দেখিয়াছি, বিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্রের মধ্যে ও মানুষ ভগবানের ভিতরে বাস করিতে পারে। ভক্ত প্রকাশচন্দ্রের বিহার প্রদেশে ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যব্যস্ততার মধ্যেও উপাসনার মহাভাব গঙ্গার অবিশ্রান্ত প্রবাহের মত চলিয়াছে। সে স্রোত কোন দিন মন্দীভূত হয় নাই। প্রতিদিন দুইবার পারিবারিক উপাসনা ব্যতীত আরও তিনবার নির্জ্জনে ভগবানের নিকটস্থ হইতেন। উপাসনা তাঁহার জীবনে সঙ্গের সঙ্গী ছিল। বাঁকিপুর অবস্থান কালে এক সময়ে তাঁহার কার্য্যস্থান গয়া নগর হইতে বহুদূরে বিন্ধাগিরিতে "কোকনদ" নামক এক জলপ্রপাত দেখিতে কয়েকটী যুবকবন্ধুসহ তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলাম। পাহাড়ের প্রস্তরখণ্ডে উপাসনার আসনে সকলে বসিলেন। এক দিকে সেই প্রপাতের ধারারাশি সহস্র ধারার মত ঝর্ঝর শব্দ করিয়া সঙ্গীত তুলিয়াছে, আর অপর দিকে প্রকাশচন্দ্রের প্রাণ-স্পর্শী উপাসনার ধারা আমাদের প্রাণের ভিতরে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি উপাসনার ভিতর দিয়া সকলকে আকর্ষণ করিতেন। তিনি যখন বাঁকিপুরে, তখন নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে এক অখণ্ড সমাজে পরিণত করিয়াছিলেন। তিনি এখানে স্বীয় ভবনে তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী দেবী অঘোর কামিনীর নামে যে "অঘোরপরিবার" প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহাতে উভয় সমাজেরই কন্যা ও মহিলাগণ নানাস্থান হইতে আসিয়া বাস করিতেন এবং দেবী অঘোর কামিনীর প্রতিষ্ঠিত উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন। এই পরিবারের ভিতর প্রাতে ও সন্ধ্যায় পারিবারিক উপাসনার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। নববিধানে প্রকাশচন্দ্রের বিশ্বাস ও নববিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি বর্ত্তমান যুগে শিক্ষণীয় ও অনুকরণীয়। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের মনীষা-সম্পন্ন শ্রেষ্ঠতম নেতা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার বাল্য ও যুবক জীবনের সমপাঠী ছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের এ মধুর সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ ছিল। উভয়েই উভয়কে নাম ধরিয়া ও "তুমি" "তুমি" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কুচ-বিহার বিবাহের পর শাস্ত্রী মহাশয় বিরোধী দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন, কিন্তু বিশ্বাসী প্রকাশচন্দ্র টলিলেন না। তিনি বলিতেন, "এমন দিন আসিবে, যখন বিরোধী মিত্র হইবে এবং অস্বীকারকারী স্বীকার করিবে।" বর্ত্তমান শতাব্দীর উষাকালে যখন ভক্ত প্রকাশচন্দ্র ও শাস্ত্রী মহাশয় দার্জ্জিলিংয়ে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন শাস্ত্রী মহাশয়ের ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস যন্ত্রস্থ হয় নাই। শাস্ত্রী মহাশয় তখন তাঁহার হস্তাক্ষরে লিখিত ইতিহাস খানি বন্ধু প্রকাশচন্দ্রকে দেখিতে দিয়াছিলেন। ভক্ত প্রকাশচন্দ্র সমগ্র গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া যখন বন্ধুকে ফিরাইয়া দেন, তখন [illegible] বলিলেন, "শিবনাথ! তুমি যদি পক্ষপাতশূন্য না হইয়া এই ইতিহাস প্রকাশ কর, ভবিষ্যৎ তোমাকে গ্রহণ করিবেনা।" পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনীলেখক চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার তেজস্বী লেখনী ধারণ করিয়া "নব্যভারত" পত্রে প্রকাশিত ইতিহাসের তীব্র সমালোচনা ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করিলেন। তাহার পর অধ্যাপক দ্বিজদাস দত্ত মহাশয় তাঁহার "Behold The Man" গ্রন্থ সাধারণের হস্তে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার ডাঃ ডি, রায় মহাশয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের "জীবন-বেদ" ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া তাহার মুখবন্ধে লিখিলেন, "Keshub Chunder Sen, up to now, is the highest water-mark in the universal religion of the Brahmo Somaj;" এবং আচার্য্যদেবের ইংরাজি "True Faith" গ্রন্থেরও বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিলেন। তাহার পর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যখন শতবার্ষিক উৎসব করিলেন, তখন উক্ত সমাজের মনীষী ও অন্যতম নেতা ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয় আমেরিকা হইতে সমাগত খৃষ্টবাদী ভক্ত South Worth এর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার তেজস্বিনী ভাষায় ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্রের বিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্রের কথা বলিলেন। পণ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয়ও তাঁহার শুভ মুহূর্ত্ত অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তিনি যে গুরুর সামনে বসিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই গুরুর জন্মদিনের উৎসবে, পঞ্জাব প্রদেশের লাহোর নগরে প্রকাশ্য সভায়, ১৯১০সালে, তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায় গুরুর জীবনী সম্বন্ধে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। ভক্ত প্রকাশের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইতেছে।

তাহার পর ভক্ত মধুসূদনের জীবন একটী বিশেষ আলোচ্য বিষয়। নবীন শিশু নববিধানের অভ্যুদয় কালে যখন ভক্ত ব্রহ্মানন্দ নববিধানের নবীন মন্ত্র লইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, সেই উষঃকালে ভক্ত ব্রহ্মানন্দের পারিপার্শ্বিকরূপে মধুসূদন দাঁড়াইয়া ছিলেন। প্রভাত সূর্য্যের নবীন রশ্মিতে যেমন নবশিশু ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে, শিশুপ্রকৃতি মধুসূদন সেই নবধর্ম্মের নবীন রশ্মিতে সেইরূপ বাড়িতে লাগিলেন। যুবক মধুসূদন কলিকাতায় হেয়ার স্কুলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বেঙ্গল ব্যাঙ্কে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন এবং সামাজিক ও পারিবারিক অন্তরায় অতিক্রম করিয়া ভক্ত ব্রহ্মানন্দের সহিত ধর্ম্ম-বিশ্বাসের অক্ষুণ্ণ যোগে যুক্ত হইয়াছিলেন। অবশ্য সে সময়ে তাঁহার আত্মীয় ও স্বজনবর্গের ভিতর হইতে অনেক বাধা বিঘ্ন ও নিন্দাবাদ তাঁহার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু সে সমুদয় তাঁহার নিকট হইতে বায়ু-বিতাড়িত শুষ্কপত্রের মত চলিয়া গিয়াছিল। বিশ্বাসবীর যুবক মধুসূদন আপনার বিশ্বাস-কেন্দ্র হইতে কোনদিন বিচলিত হন নাই। বিশ্বাসের কার্য্যে বিধাতার কার্য্যও অলৌকিক। তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী মঙ্গলা দেবী এক নিষ্ঠাবান্ হিন্দু পরিবার হইতে [illegible]ছিলেন। তিনিও ক্রমশঃ নবধর্ম্মবিশ্বাসী স্বামীর এই নবজীবনের প্রভাবের মধ্যে পড়িয়া গেলেন। কোমল লতিকা যেমন লম্বমান বৃক্ষকে

আশ্রয় করিলে সেই বৃক্ষের সঙ্গে ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে এবং অভেদ্য যোগে যুক্ত হয়, দেবী মঙ্গলাও সেইরূপ প্রেমভক্তিরসে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। ভক্তিমতী মঙ্গলা দেবী তৎকালীন কলিকাতাস্থ মেডিকেল কলেজের রাসায়নিক বিভাগের প্রধানতম রাসায়নিক পরীক্ষক রায় বাহাদুর তারাপ্রসন্ন রায় মহাশয়ের একমাত্র ভগিনী ছিলেন। রায় বাহাদুর তারাপ্রসন্ন রায় মহাশয় শ্রেষ্ঠ বৈদ্যবংশজাত নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। দেবী মঙ্গলা তাঁহার প্রেমভক্তি ও বিশ্বাসের প্রভাবে তাঁহার পিতা ও ভ্রাতৃবর্গের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। ভগিনী ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলেও তাঁহাদের ভিতরে ভগিনীর প্রতি অচলা ভক্তি ও ভালবাসা ছিল।

নববিধানে গঠিত এই নবীন পরিবারের আর এক সাহসিকতার ইতিহাস বিবৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সেই পুরাতন সংস্কারের যুগে কন্যাকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা সহজ সাহসের কাজ ছিল না। ব্রাহ্ম পরিবারও এই সাহসিক কার্য্যে সহজে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। ভক্ত মধুসূদন ও ভক্তিমতী দেবী মঙ্গলা ভগবানের আলোক পাইয়া সেই যুগে তাঁহাদের প্রথমা কন্যা দেবী সুমতিকে ব্রহ্মানন্দ-প্রতিষ্ঠিত নেটিভ লেডিজ নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া ছিলেন। এই সময়ে নিষ্ঠাবান্ হিন্দু নারীবিদ্যালয়কে ভাল চক্ষে দেখিতে পারেন নাই। বিবাহের পরও দেবী সুমতিকে নারীবিদ্যালয়ে পাঠাইয়া ছিলেন। সেই সময়ে এই বিদ্যালয় ভিক্টোরিয়া ইন্‌স্‌টিটিউসন নামে আখ্যাত হইয়াছিল।

যাহা হউক, ভক্ত মধুসূদন নানারূপ অনুকূল ও প্রতিকূল স্রোতের মধ্যে পড়িয়াও একটী আদর্শ পরিবার গঠন করিতে পারিয়াছিলেন। এই পরিবার হইতেই পরিবারের গৌরবস্থানীয় অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ উত্থিত হইয়াছিলেন।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

সংবাদ।

শুভবিবাহ—বিগত ১৪ই অগ্রহায়ণ, মেদিনীপুর কাঁথি-সহরে, মালদহ নিবাসী স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর কন্যা কল্যাণীয়া কুমারী আশালতার সহিত, ডাক্তার শশিভূষণ দাস গুপ্তের তৃতীয় পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ সত্যভূষণের শুভবিবাহ নবসংহিতামতে সম্পন্ন হইয়াছে। কন্যার মাতা সম্প্রদান করেন। ভাই অখিলচন্দ্র রায় আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করেন।

গত ১৩ই ডিসেম্বর, ঢাকা নগরীতে, বিধানপল্লীস্থ দেবালয়-প্রাঙ্গণে, শ্রদ্ধেয় ভাই মহিমচন্দ্র সেনের একমাত্র কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী ক্ষীরোদমণির সহিত, তত্রত্য ডাক্তার উমাপ্রসন্ন ঘোষের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায় উপাসনা এবং ভাই গোপালচন্দ্র গুহ পৌরোহিত্য করেন।

গত ১৩ই ডিসেম্বর, গিরিধিতে, কলিকাতা-নিবাসী স্বর্গীয় বিনোদবিহারী বসুর তৃতীয় পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ মনোমোহনের সহিত, গিরিধি-প্রবাসী শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ দের কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী উমার শুভবিবাহ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক এই অনুষ্ঠানে আচার্য্য ও পুরোহিতের কাজ করেন।

গত ১৫ই ডিসেম্বর, ৬২বি একডালিয়া রোডে, সাধু অঘোরনাথের পৌত্রী, শ্রীযুক্ত প্রমানন্দ গুপ্ত রায়ের প্রথমা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী প্রতিভার সহিত, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক স্বর্গীয় গুরুদাস চক্রবর্ত্তীর কনিষ্ঠ পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ প্রেমকুমারের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস শুভানুষ্ঠানে আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করেন।

ভগবান্ দম্পতি-চতুষ্টয়কে স্বর্গের শুভাশীষ দান করিয়া, নিত্য কল্যাণের পথে রক্ষা করুন।

গৃহ-প্রবেশ—গত ৯ই ডিসেম্বর, পুরীধামে ভ্রাতা শ্রীযুক্ত গোপাল স্বামী নাইডুর "গোপাল ভিলি" নামক গৃহ নবসংহিতার প্রার্থনা সহ উৎসর্গীকৃত হয়। গৃহস্বামী ও একজন ইংরাজ বন্ধু ও দুইটী ইংরাজ মহিলা প্রার্থনায় যোগদান করেন।

সেবা—গত নবেম্বর মাসের, চারিটী রবিবার ও ডিসেম্বর মাসের প্রথম রবিবার ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। ২৮শে নবেম্বর জামসেদপুরে গিয়া ভ্রাতা মিঃ অমূল্যচরণ বসুর বাড়ী দুইদিন অবস্থান করিয়া উপাসনাদি করেন, কয়েকটী বাড়ী বাড়ী গিয়াও প্রার্থনা ও প্রসঙ্গাদি করেন। ৩০শে গিধনিতে গিয়া শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ বসুর বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া, সন্ধ্যায় স্থানীয় বন্ধুবান্ধবদিগকে লইয়া উপাসনা ও প্রসঙ্গাদি করেন। ১লা ডিসেম্বর, সেখানেই উপাসনা করিয়া বাগনান শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে আগমন করেন। ৭ই ডিসেম্বর, পুরী গিয়া দুইদিন সেবা করেন ও ১০ই ডিসেম্বর, কটক ব্রহ্মমন্দিরে সামাজিক উপাসনা করেন। ১১ই ডিসেম্বর, শ্রীমান্ অধ্যাপক নিরঞ্জন নিয়োগীর বাড়ীতে পারিবারিক উপাসনা করেন ও স্থানীয় কয়েক বাড়ীতে প্রার্থনা প্রসঙ্গাদি করিয়া আসিয়াছেন।

বিগত ১৭ই অগ্রহায়ণ, রবিবার, প্রাতে কাঁথি ব্রহ্মমন্দিরে ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনার কার্য্য করেন, "অখণ্ড মানবত্বের সাধনায় ধরায় স্বর্গস্থাপন" বিষয়ে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন।

পারলৌকিক—গত ১২ই ডিসেম্বর, ২৮নং রামকমল সেন লেনে, আমাদের প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার সেনের প্রথম শিশু দৌহিত্রের অকস্মাৎ মৃত্যুর একমাস পূর্ণ দিনে, মাতা ও পরিজনবর্গের সান্ত্বনার্থ বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। শ্রীমতী মণিকা গুপ্ত মধুর সংগীতে সকলের প্রাণে তৃপ্তি দান করেন। ভগবান্ বালগোপালরূপে সন্তানহারা মার কোলের শূন্য স্থান পূর্ণ করে থাকুন, এবং সকল শোকার্ত্ত প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনা দান করুন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ৩রা ডিসেম্বর, ১নং গিরিশ বিদ্যারত্ন লেনে, স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেনের সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া দেবী সরলা

সেনের আদ্যশ্রাদ্ধ পুত্র কন্যা শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন, শ্রীমতী ইন্দিরা রায় ও শ্রীমতী মণিকা গুপ্ত কর্ত্তৃক, নবসংহিতানুসারে সুন্দররূপে ও গম্ভীরভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছে। মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী গম্ভীর ও প্রাণস্পর্শী উদ্বোধন ও আরাধনা দ্বারা সকলের প্রাণে তৃপ্তিদান করেন। ভাই অক্ষয়কুমার লধ পাঠ, প্রার্থনা ও অনুষ্ঠানের অন্যান্য অংশ সম্পন্ন করেন। বন্ধুবান্ধব অনেকেই শ্রদ্ধাবিনতভাবে অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া পরলোকগতা দেবীর পূত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা রায় মাতৃদেবীর উদ্দেশে হৃদয়ের "শ্রদ্ধাঞ্জলি" পাঠ করিলে, পুত্র শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন নবসংহিতার প্রধান শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করেন। অনুষ্ঠানের প্রথমেই "জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে!" সঙ্গীত করিতে করিতে, পবিত্র ভস্মাধার সহ সমাধিমন্দিরে যাইয়া, তথায় নবসংহিতার প্রার্থনান্তে তাহা রক্ষিত হয়। এই পবিত্র অনুষ্ঠানে পুত্র ও কন্যাগণ মিলিত হইয়া প্রচারক ও অন্যান্য বন্ধুদের জন্য বস্ত্র ও স্মৃতিচিহ্ন ব্যতীত নিম্নলিখিত দান উৎসর্গ করিয়াছেন :—

নববিধান প্রচারভাণ্ডার ২০৲, কান্তিচন্দ্র স্মৃতিভাণ্ডার ২০৲, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির ১৫৲, লক্ষ্ণৌ ব্রহ্মমন্দির ১০৲, ঢাকা ব্রহ্মমন্দির ১০৲, পুরী ব্রহ্মমন্দির ১০৲, করাচী ব্রহ্মমন্দির ৫৲, ময়মনসিং ব্রহ্মমন্দির ৫৲, ব্রাহ্ম রিলিফ ফণ্ড ৫৲, বালকদিগের নীতিবিদ্যালয় ৫৲, বালিকাদিগের নীতিবিদ্যালয় ৫৲, ভগ্নীসমিতি ৫৲, পুণ্যাশ্রম ৫৲, অন্ধবিদ্যালয় ৫৲, কালা বোবাদের স্কুল ৫৲, বাঁকুড়ার হীরানন্দ আশ্রম ৫৲, অনাথাশ্রম ৫৲, গোবিন্দকুমার আশ্রম ৫৲, হিরণ্ময়ী বিধবা শিল্পাশ্রম ৫৲, মোট ১৫০৲ টাকা।

গত ৪ঠা ডিসেম্বর, শান্তিকুটীরে, স্বর্গীয় ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ বসুর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পুত্রকন্যাকর্ত্তৃক গম্ভীরভাবে সম্পন্ন হয়। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ এবং ভাই অক্ষয়কুমার লধ সমযোগে অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন। পুত্র প্রভাতকুমার প্রধান শোককারীর প্রার্থনা করেন এবং কন্যা শ্রীমতী মাধববালা মল্লিক পিতৃ-তর্পণ পাঠ করেন। এই অনুষ্ঠানে নিম্নলিখিত দান উৎসর্গীত হয় :—ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির ৪৲, প্রচারভাণ্ডার ৪৲, নববিধান ট্রষ্ট ২৲, অনাথ আশ্রম ২৲, ব্রাহ্মরিলিফ ফণ্ড ২৲, Little sisters of the poor ২৲, শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রম ২৲, পুরী সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় নববিধান প্রতিষ্ঠান ২৲, খাঁটুরা ব্রাহ্মসমাজ ২৲, সুনীতিশিক্ষালয় ৪৲, এবং ৩টী ভোজ্য, বস্ত্র, শয্যা, পাদুকা, ছাতা ও তৈজসাদি।

ভগবান্ পরলোকগত আত্মা সকলের কল্যাণ করুন এবং পৃথিবীস্থ শোকার্ত্তজনের প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

উৎসব—গত ১৮ই নভেম্বর, রাঁচি হইতে নির্ম্মলা বসু ও শ্রীমতী হেমলতা চন্দ শ্রীমতী চপলা মজুমদারের আহ্বানে হাজারীবাগে যাত্রা করেন। ১৯শে ব্রহ্মানন্দের জন্মদিনে, রবিবার উষাকালে, "চঞ্চলা কুটীরে" উষাকীর্ত্তন হয়, প্রাতে চাটায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চাটার্জ্জির উপাসনায় যোগ দেওয়া হয়, মধ্যাহ্নে "চঞ্চলাকুটীরে" ব্রহ্মানন্দ-ভোজ হয়, বৈকালে রামমোহনের শতবার্ষিক উপলক্ষে কেশবহলে, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চাটার্জ্জির সভা-নেতৃত্বে হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান বক্তৃতা করেন; সন্ধ্যাকালে নববিধান মন্দিরে শ্রীযুক্ত ব্রজকুমার নিয়োগী উপাসনা করেন, শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মজুমদারে গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়ের উপদেশ "কেশবচন্দ্র কোথায়" পাঠ করেন। ২০শে প্রাতে স্বর্গীয় শ্রদ্ধেয় বালুদার সমাধিস্থান দর্শন করিয়া মাতৃস্তোত্র পাঠ হয়; বৈকালে কেশবহলে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চাটার্জ্জি বক্তৃতা করেন। ২১শে হইতে ২৪শে পর্য্যন্ত প্রাতে "চঞ্চলাকুটীরস্থ" উপাসনাগৃহে কেশবচন্দ্রের জন্মদিন-স্মরণে বিশেষ ভাবে উপাসনাদি হয়। ২৫শে প্রাতে হাজারীবাগের সূর্য্যকুণ্ড দর্শন করিয়া, স্নানাদির পর গৃহস্থ "চঞ্চলাকুটীরে" বিশেষ উপাসনা হয়; শ্রীমতী হেমলতা চন্দ উপাসনার কার্য্য করেন। ২৬শে, রবিবার, বৈকালে "চঞ্চলাকুটীরে" শ্রীমতী নির্ম্মলা বসুর আগ্রহে ও শ্রীমতী চপলা মজুমদারের প্রস্তাবে একটী মহিলা-সম্মিলনে স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ২৫-৩০ জন মহিলা উপস্থিত হন। সংগীত, প্রার্থনা ও পাঠাদির পর স্বর্গীয়া চঞ্চলা নিয়োগীর জীবন-চরিত আলোচনা হয়। কয়েকটী মহিলা তাঁর স্থাপিত মহিলা-সমিতি, যাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহার পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। উক্ত প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হয়। সন্ধ্যাকালে নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু উপাসনার কার্য্য করেন।

আগামী ১৭ই ডিসেম্বর হইতে ২৬শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মুঙ্গের ভক্তিতীর্থে উৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। নবভক্তিসাধনার্থী ভাইভগিনীগণের উপস্থিতি ও যোগদান প্রার্থনীয়।

প্রত্যাবর্ত্তন—স্বর্গীয় মদনমোহন সেনের কনিষ্ঠ পুত্র ডাঃ বিবেকমোহন সেন (এম, বি,) দুই বৎসর জার্ম্মাণীতে চিকিৎসা বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন উপলক্ষে, গত ৩০শে নভেম্বর, সন্ধ্যায়, ১।এ মন্মথ ভট্টাচার্য্য ষ্ট্রীটে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ বিশেষ উপাসনা করেন। মাতৃদেবী শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী সেন ভগবানের চরণে কৃতজ্ঞতা দান করিয়া সন্তানের কল্যাণার্থ প্রার্থনা করেন। শ্রীমতী কুমুদিনী দাসও কল্যাণ ভিক্ষা করিয়া প্রার্থনা করেন। ভগবান্ তাঁর পুত্রকে শুভাশীষ দান করুন। এই উপলক্ষে মাতৃদেবী প্রচারভাণ্ডারে ১৲ ও ব্রহ্মমন্দির ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

সমাধি-প্রতিষ্ঠা—গত ১০ই ডিসেম্বর, পূর্ব্বাহ্নে, ৭৮।বি অপার সার্কুলার রোডে, কমলকুটীরস্থ নবদেবালয়ের সম্মুখে, আচার্য্যদেব ও আচার্য্যপত্নীর সমাধিমণ্ডপে, তাঁহাদের জ্যেষ্ঠা কন্যা কুচবিহারের মাননীয়া মহারাণী স্বর্গীয়া শ্রীমতী সুনীতি দেবীর পবিত্র ভস্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুন্দর [illegible] প্রস্তর-নির্ম্মিত সমাধি-স্তম্ভের প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। ময়ূরভঞ্জের মাননীয়া

মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী সমাধিপার্শ্বে উপাসনা করিয়া সমাধি-প্রতিষ্ঠার পবিত্র অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সেন আচার্য্যদেবের প্রার্থনা এবং শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র সেন মাতৃদেবীর প্রার্থনা পাঠ করেন।

পাটনার সংবাদ—বিগত ১৯শে নবেম্বর, বাঁকিপুর নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীমদাচার্য্যদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে, বি, এন, কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ ডি, এন, সেন উপাসনা করেন। ২১শে ও ২২শে নবেম্বর, রাজা রামমোহন রায়ের স্বর্গারোহণের শতবার্ষিকী উপলক্ষে বি, এন, কলেজের প্রশস্তহলে, বৃহতী সভায়, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টীয়ান ও ব্রাহ্মবন্ধুগণ এবং ২১জন ইংরাজও উপস্থিত ছিলেন। রাজা রামমোহনের গুণাবলি কীর্ত্তন জন্য সকল সম্প্রদায় হইতেই বক্তা দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।

পাটনায়, ৪নং ম্যাঙ্গলস্ রোডে, গত ১লা ডিসেম্বর, শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ মজুমদারের জন্মদিনে, ৩রা ও ৪ঠা ডিসেম্বর, কলিকাতার সহিত যোগ রক্ষা করিয়া, স্বর্গীয়া সরলা সেন এবং স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ বসুর প্রতি শ্রদ্ধাপ্রকাশার্থে এবং ৭ই ও ১০ই ডিসেম্বর ভক্ত স্বর্গীয় প্রকাশচন্দ্র ও মধুসূদনের স্বর্গারোহণদিন-স্মরণার্থ উপাসনা হইয়া ছিল। সবদিনই শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদার উপাসনা করেন।

কোচবিহারের সংবাদ—গত ৭ই নভেম্বর, স্বর্গীয় মহারাজকুমার হিতেন্দ্রনারায়ণের সাম্বৎসরিক দিনে, সমাধিপার্শ্বে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় উপাসনা করেন। ১০ই নবেম্বর, শ্রীশ্রীমতী মহারাণী সুনীতি দেবীর প্রথম সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে কেশবাশ্রমস্থ সমাধিপার্শ্বে বিশেষ উপাসনা হয়। কলিকাতা হইতে আগত পাটনার এডভোকেট শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সরকার উপাসনা করেন এবং রাজামাত্যবর্গ ও কর্ম্মচারিবৃন্দ সকলেই প্রায় যোগদান করেন। সন্ধ্যায় ল্যান্সডাউন হলে স্মৃতিসভা হয়। ষ্টেট জজ মিঃ সতীন্দ্রনাথ গুহ সভাপতির কার্য্য করেন। উকীল সুরেন্দ্রকান্ত বসু মজুমদার ও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সরকার মহারাণীর জীবনী সম্বন্ধে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করেন। সন্ধ্যায় সমাধিপার্শ্বে কীর্ত্তনাদি হয়। ১৯শে নবেম্বর শ্রীমৎ নববিধানাচার্য্যদেবের জন্মদিন উপলক্ষেও আশ্রমকুটীরে ভ্রাতা কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় উপাসনা করেন। ৩রা ডিসেম্বর, রাজর্ষি রামমোহনের শতবার্ষিকী উপলক্ষে ল্যান্সডাউন হলে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্তের সভাপতিত্বে স্মৃতিসভা হয়।

সাম্বৎসরিক—গত ১২ই অগ্রহায়ণ, অমরাগড়ীর শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায়ের সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া যাদুমণি দেবীর সাম্বৎসরিক দিনে, অমরাগড়ীতে "কৃপাকুটীরে" সমাধিপার্শ্বে ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন এবং কেদারবাবু বিশেষ প্রার্থনা করেন। কলিকাতায় ৮৩।১।১ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে, জামাতা শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ দাসের গৃহে ভাই অক্ষয়কুমার নাথ উপাসনা করেন এবং জামাতা বিশেষ প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে জামাতা প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ১৩ই অগ্রহায়ণ, (২৯শে নবেম্বর) দিনাজপুরে, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বসুর মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিকে, শ্রীযুক্ত মধুসূদন সেন উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে বিধুবাবু প্রচারভাণ্ডারে ৪৲ ও অনাথ আশ্রমে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

১লা ডিসেম্বর, প্রেরিত ভাই উমানাথের সাম্বৎসরিক দিনে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে, ৫ই ডিসেম্বর, বিধান-বিশ্বাসী গৃহস্থ বৈরাগী ভক্ত রাজকৃষ্ণ বসুর সাম্বৎসরিক দিনে ভবানীপুরে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। ৫ই শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে ভ্রাতা যতীন্দ্রনাথ বসু ও কটকে শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কর উপাসনা করেন। ৮ই ডিসেম্বর, স্বর্গীয় ভাই কালীনাথের, ৯ই স্বর্গীয় সাধু অঘোরনাথের সাম্বৎসরিক দিন স্মরণে পুরী নবপর্ণকুটীরে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন এবং স্বর্গীয় ভ্রাতা চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী ভাই কালীনাথের দিনে বিশেষ প্রার্থনা করেন ও দুই দিনই সংগীত করেন।

৫ই ডিসেম্বর, ৭৮।১ হ্যারিসন রোডে, শ্রীযুক্ত নীতিকান্ত ঘোষের মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার নাথ উপাসনা করেন।

গত ৮ই ডিসেম্বর, স্বর্গগত ভাই কালীনাথ ঘোষের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিকে, ২৪নং তারক চাটার্জি লেনে, প্রাতে ভাই অক্ষয়কুমার নাথ, সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস উপাসনা করেন। ভাবে ভোলা, প্রেমে মাতোয়ারা, দিলদরদী, ভগবানের চরণে আত্মোৎসর্গকারী, বৈরাগ্যের সুন্দর জীবনখানি উপাসনার ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল।

গত ৯ই ডিসেম্বর, ৬।২বি একডালিয়া রোডে, সাধু অঘোরনাথের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক দিনে, তাঁর পুত্রদের গৃহে, ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ উপাসনা করেন। তিনি লক্ষ্ণৌনগরীতে মহাপ্রয়াণকালের সুন্দর ও পবিত্র চিত্র বর্ণনা করিয়া বলেন, নববিধানের যোগী ভক্ত শ্রীযুক্তের নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই, এমন সুন্দর "শাক্যমুনিচরিত" লিখিতে পারিয়াছিলেন।

গত ১০ই ডিসেম্বর, ২৮নং নিউরোডে, আলীপুরে, ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ সেনের গৃহে, তাঁহাদের পিতৃদেব গৃহস্থসাধক স্বর্গীয় মধুসূদন সেনের সাম্বৎসরিকে নগেন্দ্রবাবু উপাসনা করেন।

গত ১০ই ডিসেম্বর, ২৯।১এ বলদিয়া পাড়া লেনে, স্বর্গগত শাস্ত্রসাধক ভাই কেদারনাথ দের পুত্র স্বর্গীয় মনোগঞ্জন দের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার নাথ উপাসনা করেন। ভগ্নী শ্রীমতী অশোকলতা দাস বিশেষ প্রার্থনা করেন।

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেস" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক ৫ই পৌষ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।